

সমরেশ মজুমদার

অর্জুন সমগ্র/১



অর্জুন সমগ্র ১

সমরেশ মজুমদার



অনীশ দেব
স্বপন সাহা
ভ্রাতৃপ্রতিমেষু—

সূচিপত্র

খুনখারাপি ১১

সীতাহরণ রহস্য ৮১

লাইটার ২১৫

জুতোয় রক্তের দাগ ২৯৫

দেড়দিন ৪৬৫

গ্রন্থপরিচয় ৫৪৫



খুনখারাপি

খুঁটিমারি রেঞ্জ

আজকের খবরের কাগজে কোনো চাকরির বিজ্ঞাপন নেই। অর্জুন কাগজটাকে ভাঁজ করে আকাশের দিকে তাকাতেই যেন বুড়িদিকে দেখতে পেল। দু’বছর আগেও এই জলপাইগুড়ি শহরে বুড়িদির মতো ফরসা সুন্দরী বোধহয় কেউ ছিল না। এমন রঙ ছবিতেও দেখা যায় না। তারপর কী হল কে জানে, বুড়িদির মুখে কালো ছোপ জমতে লাগল। এখন সেগুলোয় ছেয়ে গেছে মুখ, তবু ফাঁকে ফাঁকে ফরসা চামড়াটাকে বোঝা যায়। কিন্তু সেটাই যে অস্বস্তির। এই দুপুরের আকাশটা যেন অবিকল বুড়িদি, সারা মুখে মেঘের মেচেতা নিয়ে বসে আছে।

অন্যসময় হলে এ নিয়ে পদ্য লিখতে বসা যেত, কিন্তু অর্জুন আজ ঘড়ির দিকে তাকাল। এখানে মেঘ দেখে বৃষ্টির আন্দাজ করা যায় না। সঙ্গে একটা ছাতা রাখা ভাল। যেতে হবে ডি সি অফিসে। ওখানে আজ একটা খবর পাওয়া যেতে পারে। অশোকদা বলেছেন দেখা করতে।

জামা গলিয়ে দরজা খুলে ও চেষ্টা, “মা, আমি বেরছি।”

আশালতা কিছু বললেন না। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মা এমন চুপচাপ হয়ে গেছেন।

বাইরে এখন ঘন ছায়া। দুপুর বলেই রাস্তায় লোকজন নেই। বাবুপাড়া থেকে ডি সি অফিস এমন কিছু দূরে নয়। তারাপদ উকিলের বাড়ির বারান্দায় চোখ যেতেই বুড়িদিকে দেখতে পেল সে। দেখে নিজের অজান্তেই হেসে ফেলল। খোলা চুলে বারান্দার রেলিং-এ কনুই রেখে বুড়িদি দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি হতেই বলল, “হাসছিস কেন রে?”

“একটু আগে তোমার কথা মনে পড়েছিল, আর বেরিয়েই দেখি তুমি!”

“আমার কথা? ওমা, কেন?”

উত্তর দিতে গিয়ে হোঁচট খেল অর্জুন। ও জানে বুড়িদি নিজের মুখ নিয়ে খুব বিব্রত, সেই প্রসঙ্গ তোলা খুব অন্যায় হবে। অতএব একটা মিথ্যে কথা বলল সে, “চাঁদের পাহাড়টা তোমার কাছ থেকে আর-একবার নেব, তাই।”

“ওটা তো তোর পড়া।”

“আর একবার পড়ব। এই শংকরটাকে আমার খুব হিংসে হয়। চাকরি-বাকরি না পেয়ে কী সুন্দর চলে গেল আফ্রিকায়। আর আমার অবস্থা দ্যাখো।”

“এখনও রেজাল্ট বের হয়নি আর চাকরি চাকরি করে বেড়াচ্ছি। তা এই মেঘ মাথায় করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে বাবুর?”

“ডি সি অফিসে। একটা চাকরির খবর পাওয়া যাবে বলে আশা আছে।”

একটা লেডিজ ছাতা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল বুড়িদি। ছাতাটা হাতে নিয়ে সে বলল, “এঃ, এটা তো লেডিজ ছাতা, লোকে বলবে কী?”

“তুই কোন্ কালের ছেলে রে? আজকাল আর ওসব নেই। আর মাথায় বৃষ্টি পড়লে ছাতার জাত নিয়ে কেউ ভাবে না। শুধু দয়া করে হারিয়ে আসিস না।”

পোস্ট অফিসের পাশ ঘেঁষে সুন্দর রাস্তাটা ধরে অর্জুন করলা নদীর কাছে আসতেই অদ্ভুত গন্ধ পেল। ঠিক টাটকা মাছের গায়ের গন্ধ অথচ আঁশটে নয়। করলা নদীতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরে ওরা এইটে বুকেছিল। টাটকা মাছের গায়ে কেমন একটা বুনা গন্ধ থাকে, মাছ কাটলেই আঁশটে গন্ধ ছড়ায়।

বাঁ দিকে নেতাজির স্ট্যাচুটাকে রেখে ও ডি সি অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। চারপাশ থমথমে, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত সিঁটিয়ে আছে, কিন্তু বৃষ্টি যেন পড়তেই চাইছে না। ডি সি অফিসে পৌঁছে অর্জুন অশোকদার খোঁজ করল। অশোকদা টাউন ক্লাবের একজন কর্তা। সবাই চেনে। একটা বড় হলঘরে তিনজন লোককে সামনে নিয়ে বসে ছিলেন। অর্জুনকে দেখে ডাকলেন, “আয়!”

অর্জুন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল কারণ আর চেয়ার খালি নেই। অশোকদা ওঁদের সঙ্গে কথা বলছেন তো বলছেনই। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, “কলকাতা থেকে একজন অ্যাথলেট কোচ আসছে, জানিস?”

ঘাড় নাড়ল অর্জুন। একথা তাকে বলার মানে কী? সে তো আর স্পোর্টসে নাম দেবে না। এখন তার একটা চাকরি চাই। প্রায় মিনিট-পনের কেটে যাওয়ার পর সময় হল অশোকদার। তিনজনকে বিদায় করে বললেন, “বোস! অর্জুন, তোর কথা আমি ভেবেছি। ইনফ্যাক্ট, কয়েকজনকে বলেও রেখেছি। কলকাতা হলে স্পোর্টসম্যান বললেই চাকরি পাওয়া যায়। এখানে—। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড আছে?”

“আছে।”

“শুড। তুই যাতে খুব শিগগির ইন্টারভিউ পাস তার ব্যবস্থা করব। আর এই শহরে যে ইন্টারভিউ নেবে তাকে রাজী করাতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমি চাই তুই অ্যাথলেট ট্রেনিংটা নিবি। সামনের বছরও আমাদের ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন

করতে হবে। কী, রাজী ?” অশোকদা সিগারেট ধরালেন।

“দেখি।”

“দেখি-ফেকি নয়। আমি যখন বলেছি তখন তোর চাকরি হবেই। রায়সাহেবের চা-বাগানগুলোর হেড অফিসে তোকে এখনই ঢুকিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সেটা ভাল হবে না।” এই সময় টেবিলের কোণে টেলিফোনটা টেঁচিয়ে উঠল আচমকা। অশোকদা কায়দা করে রিসিভার তুলে বললেন, “বলুন! আরে কী খবর! অ্যাঁ, কী বললেন? আচ্ছা, তাই নাকি। এ আর এমন কী! ডি এফ ও আমাকে ভালভাবে চেনেন। বেশ, গাড়িটা পাঠিয়ে দিন, বৃষ্টি আসতে পারে।”

টেলিফোন রেখে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে অশোকদা বললেন, “তাহলে তুই আজ আয়। একটা কিছু হয়ে যাবে, ঘাবড়াস না!”

অর্জুনের মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ও খুব নিশ্চিত ছিল চাকরিটা হয়ে যাবে, অন্তত অশোকদা একটা পাকা খবর দেবে।

অর্জুন নিঃশব্দে বাইরের বারান্দায় আসতেই আকাশটা গলে গেল। ঝুপঝুপিয়ে জল ঝুঁড়ছে মেঘেরা। জলের এত তোড় যে ছাতায় আটকাবে না। অর্জুনের ইচ্ছে হল এই বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় একটা জিপ এসে সামনে দাঁড়াল। বৃষ্টির জল উখালপাখাল হচ্ছে জিপের গায়ে। জিপটা দাঁড়িয়ে দুবার হর্ন দিল।

একটু বাদেই হস্তদস্ত হয়ে অশোকদা বেরিয়ে এলেন, “আরে, তুই এখনও যাসনি। যা বৃষ্টি যাবিই বা কী করে! আচ্ছা, দাঁড়া, মাথায় একটা মতলব এসে গেছে। তুই চলে আয় আমার সঙ্গে।”

দৌড়ে জিপে উঠতে গিয়ে জল এড়াল না। ছাতা খুলল না অর্জুন, খুব কিছু ভেজেনি সে। গাড়ি চলতে শুরু করলে অশোকদা বললেন, “তুই মাসখানেকের জন্য একটা কাজ করবি? মাসখানেক কি তার বেশিও হতে পারে!”

“কী কাজ?”

অশোকদা সিরিয়াস মুখে বললেন, “হাতিদের তাড়াতে হবে। জঙ্গলের হাতিরা দলবঁধে বেরিয়ে এসে চাষী শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে, মানুষ মারছে। সরকার থেকে ওদের জঙ্গলে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তোকে এই হাতিদের তাড়াতে হবে। রাজী?”

সামনে বৃষ্টির জলে পৃথিবীটা সাদা। মাথার ওপর টিনের ছাদে প্রচণ্ড শব্দ। অর্জুন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু কাছের গাছগুলোকে হঠাৎ হাতির মতো মনে হল। সে হেসে বলল, “দারুণ”।

শ্রীতম সিং থাকেন গয়েরকটায়। ওখানে গুঁর একটা পেট্রলের দোকান,

গোটাচারেক ট্রাক এবং জঙ্গলের ব্যবসা আছে। এই জঙ্গলের ব্যবসাটি হল, বনের কাঠ কেটে মিলে নিয়ে এসে সেগুলোকে চেরাই করে বিভিন্ন আকৃতিতে ভারতবর্ষের চারদিকে পাঠানো। এই কারণে সিংজিকে প্রায়ই জলপাইগুড়ি শহরে আসতে হয়। সেখানে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের তত্ত্বাবধানে কুপ ডাকা হয়। প্রতি বছর যেমন নতুন গাছ জঙ্গলে লাগানো হয় তেমনি পুরনো বুড়ো গাছগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হয় কনট্রাক্টরদের কাছে। প্রতিটি গাছের একটা নম্বর বনবিভাগের কাছে রাখা থাকে। যে গাছগুলো বিক্রি হবে তার নম্বর এবং এলাকা ঘোষণা করে নিলাম ডাকা হয়। সিংজি নিজে এই নিলামে অংশ নেন। অত বড়লোক হয়েও কোনো কর্মচারীকে এই দায়িত্ব দেন না। অশোকদার চেষ্টায় এই সিংজির কাছেই চাকরিটা হয়ে গেল অর্জুনের।

ডি এফ ও অফিসের বারান্দায় বসেছিলেন প্রীতম সিং। জিপ থেকে নেমে বৃষ্টি এড়িয়ে অশোকদা তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি দু’হাত বাড়িয়ে অশোকদার হাত চেপে ধরলেন উচ্ছ্বসিত হয়ে, “কেমন আছেন অশোকবাবু!”

“ভাল। আপনি কেমন?”

“চলে যাচ্ছে। মুশকিল করেছে এই হাতিগুলো। আমার লোক জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। তার ওপর দলে দলে বেরিয়ে এসে ওরা হামলা করছে। ব্যবসা করাই মুশকিল হয়ে গেল!” সিংজিকে বিমর্ষ দেখাল।

“আপনি টেলিফোনে যে-কথা বললেন সেটার কী হল?”

“আমি গতকাল টেন্ডার দিয়ে দিয়েছি। এটা ইমার্জেন্সি কেস। আজই রেজাল্ট জানার কথা। আপনি একটু দেখুন অশোকবাবু!”

অশোকদা মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলেন। অর্জুন চুপচাপ কথাবার্তা শুনছিল। সিংজির বয়স পঞ্চাশের ওধারে। চকচকে মোম লাগানো দাড়িতে সাদাটে ভাব। সিংজি যখন নিজে থেকে কথা বলছেন না তখন অর্জুন বারান্দার রেলিং-এর ধারে চলে এল। এখন বৃষ্টির ধার অনেকটা ভোঁতা।

অশোকদার গলা পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল অর্জুন “যাক, আপনিই কনট্রাক্টটা পাচ্ছেন। সেকেন্ড টেন্ডারটা অবাস্তব। আপনি ডি এফ ওর সঙ্গে দেখা করেননি?”

“না, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।”

“যান যান, উনি আপনাকে ডাকছেন।”

“কিন্তু উনি নিজে তো লোকাল কাউকে এই কনট্রাক্ট দিতে রাজী ছিলেন না। এখানে আমার একটু, মানে ইয়ে আছে, আমি জানি।”

“ছিলেন না কিন্তু হয়ে গেলেন।”

“অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি আপনি সব মুশকিল আসান করতে পারেন।”

অশোকদা বললেন, “কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।”

“বলুন বলুন, নিশ্চয়ই রাখব। চাঁদা?”

“না না। এই ছেলের নাম অর্জুন। খুব ভাল স্পোর্টসম্যান। আপনার অরগানাইজেশনে ওকে একটা চাকার দিতে হবে।”

“আমার ওখানে তো কোনো জায়গা খালি নেই অশোকবাবু।”

“এই কনট্রাক্ট পেলো—।”

“ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে বেশিদিন তো নয়—।”

“আগে হোক, তারপর দেখা যাবে।”

কদমতলার বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অর্জুনের। এর আগে মাঝেমধ্যে বন্ধুদের পাশে পড়ে সিগারেট খেয়েছে সে কিন্তু নিজে কখনো কেনেনি। সিগারেটের ধোঁয়াতে সে কোনো মজাই পায়নি।

কিন্তু আজ সাইডব্যাগটা হাতে নিয়ে ওর খুব ইচ্ছে করছিল সিগারেট খেতে। আজ যাকে বলে ঠিক সাবালক তাই হতে যাচ্ছে যে। বুকের মধ্যে বিশ্রী অনুভূতি, বেরুবার সময় মায়ের মুখটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম সে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে।

নিজেকে ঠিকঠাক রাখতে ও সিগারেটের দোকানের দিকে পা বাড়াতেই থমকে গেল। আলিপুরদুয়ারের বাসটা আসছে। এইটে ধরলে দুপুর তিনটে নাগাদ গয়েরকাটায় পৌঁছানো যাবে। অর্জুন শেষবার শহরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। সে যে চলে যাচ্ছে এ খবর মা এবং অশোকদা ছাড়া কেউ জানে না। কোনো বন্ধুকেও জানায়নি সে। বাস এসে দাঁড়াতেই ও চটপট উঠে জানলার ধারে জায়গা পেয়ে গেল। শান্তিপাড়া থেকে আসছে বলেই এখনও খালি। ব্যাগটাকে পায়ের নীচে রেখে বাইরে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল অর্জুন। একটা রিকশা থেকে বুড়িদি নামছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে দেখে অর্জুন চিৎকার করল, “বুড়িদি!”

ছোপ-ছোপ মুখ তুলে বুড়িদি ওকে দেখতে পেয়েই দ্রুত জানালার নীচে চলে এল, “বাঃ, বেশ না বলে চলে যাচ্ছিস। খাওয়াতে হবে এই ভয়ে?”

অর্জুন সত্যি লজ্জা পেল, “তুমি জানলে কী করে?”

বুড়িদি একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিল, “তোরা তোয়ালে ফেলে এসেছিলি। মাসিমা আমাকে ডেকে বলতে তবে জানতে পারলাম।”

অর্জুন কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পেল না। বুকের কষ্টটা এতক্ষণে অক্টোপাস হয়ে গেছে। যে-কোনো মুহূর্তেই চোখে জল আসতে পারে। ঠিক সেই সময় বাস গর্জন করে উঠতেই বুড়িদি সরে দাঁড়াল। কদমতলার মোড় ছাড়িয়ে বাসটা চলা শুরু করতেই বুড়িদি চোঁচিয়ে বলল, “চিঠি দিস কিন্তু!”

অর্জুন কোনো কথা বলতে পারছিল না। বুড়িদি মিলিয়ে গেলেও চোখের

সামনে সবকিছু আড়াল করে কালো ছোপমাথা বীভৎস কিন্তু সুন্দর মুখটা এসে দাঁড়াচ্ছিল। তারপর নিজেকে শক্ত করতেই যেন সে প্যাকেটটা ব্যাগের ভেতর ঢোকাতে চাইল। সেই সময় ওর হাতে প্যাকেটের ভেতর রাখা শক্ত কিছু ঠেকতেই বুঝতে পারল শুধু তোয়ালে নয়, আরো কিছু সঙ্গে আছে। দ্রুত কাগজের মোড়কটা খুলে তোয়ালের ভাঁজ সরাতে চোখে পড়ল বইটা। পিঠে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলমাথা পাহাড়ে শঙ্কর হেঁটে যাচ্ছে। এই বইটাই সে চেয়েছিল সেদিন বুড়িদির কাছে। বুড়িদি তাকে এত ভালবাসে? ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে উঠল অর্জুনের। এই সময় কণ্ঠস্বর বলল, “টিকিট?”

চোখের জল মুছবার কথা ভুলে গিয়ে অর্জুন পকেট থেকে টাকা বের করে বলল, “গয়েরকাটায় যাব।”

তিস্তার ব্রিজ পর্যন্ত অর্জুনদের যাতায়াত ছিল। বাঁ দিকে বাতিল রেলপথ, আদিগন্ত খোলা আকাশের বুকে বাসটা গড়িয়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণে অর্জুন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। গাড়ির ভেতরেও বেশ ভিড়। ময়নাগুড়ি ধুপগুড়ি এবং তারপরেই গয়েরকাটা। মাত্র আঠাশ মাইল। গয়েরকাটাই ওর হেডকোয়ার্টার্স হবে। গতকালই অশোকদা বললেন, “শ্রীতম সিং আজই তোকে যেতে বলেছেন। এক মাস কাজ করলে পাঁচশো টাকা পাওয়া যাবে। তারপর তোর কাজে যদি ও সন্তুষ্ট হয় তাহলে বলা যায় না, অন্য ব্রাঞ্চে পাকা চাকরি পেতে পারিস।”

অশোকদার কাছে ব্যাপারটা আরো বিশদ জানতে পেরেছিল অর্জুন। বনবিভাগের অফিসাররা লক্ষ রাখেন কোনো চোরাকারী জন্তু-জানোয়ারদের হত্যা করেছে কিনা। আবার জন্তু-জানোয়াররা যদি লোকালয়ের ওপর হামলা করে তাহলে তাদের বুকিয়ে-সুকিয়ে জঙ্গলে ফেরত পাঠাবার জন্যে একটা স্কোয়াড আছে। এমনভাবে ফেরত পাঠাতে হবে যা শাস্তিপূর্ণ। বানারহাট-নাথুয়া এলাকার দায়িত্ব পেয়েছেন সিংজি।

ঠিক এই মুহূর্তে অর্জুন জানে না হাতিদের কী উপায়ে তাড়াতে হবে। সিংজি নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছেন। তবে কথাটা শোনার পর থেকেই ওর মনে হচ্ছিল, সরকার নিজে এ-কাজ না করে বাইরের লোককে দিয়ে কেন করচ্ছে। অশোকদা বলেছিল তাড়াহুড়ো থাকলে অনেক সময় প্রাইভেট কনসার্নকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই সিংজিকে পরামর্শ দেবে। জলঢাকা নদীর ওপর যখন বাস উঠে এল তখন নিজের মনেই হেসে ফেলল সে। ঠিক ব্রিজের আগেই একটি মাঠে কাকতাদুয়াকে চোখে পড়েছিল। আড়াআড়ি দুটো লাঠির গায়ে জামা পরিয়ে মাথায় কালো হাঁড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার চোখ নাক দাঁত সাদা। নিজেকে ঠিক ওইরকম হাতিতাদুয়া বলে মনে হল।

বাস যেখানে থামল সেই জায়গাটা বাজার এলাকা। সাইনবোর্ডে লেখা নাম,

ধুপগুড়ি। কণ্ঠস্বর অবিরত হাঁকছে গয়েরকাটা-বীরপাড়া-আলিপুরদুয়ার। এই কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসযাত্রীদের চেহারাও পাল্টাতে শুরু করেছে লক্ষ করল অর্জুন। সে জানে এর পরেই গয়েরকাটা। বোধহয় মাইল-আটেক বাকি। এতক্ষণ শুধু খোলা মাঠ সরা আকাশ ছাড়া দুপাশে কিছু ছিল না। জঙ্গলের কোনো চেহারাও চোখে পড়েনি। তরাই-এর বনাঞ্চল শুরু হবে গয়েরকাটা থেকে। কী মনে করে সে ব্যাগ থেকে বুড়িদির বইটা বের করল। আর পাতা খুলতেই যে লাইনে চোখ পড়ল সেটা কি আকস্মিক? অর্জুন সোজা হয়ে বসে লাইনগুলো পড়ল। “সেই ঘন বাঁশবন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড়-বড় গাছ, নীচে পচাপাতার রাশ, মাঝে-মাঝে পাহাড়ের খালি গা, আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যাংল্‌নায় ধোয়া শাদা ধবধবে চিরতুবারে ঢাকা পর্বত-শিখরটি এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার বনের আড়ালে চাপা পড়ছে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে-ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুন্দো হাতির গর্জন শুনতে পেলো...সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল...এত বাস্তব মনে হল, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল।”

বই থেকে চোখ তুলে বাইরে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে উঠল অর্জুন। এ কী বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আকাশে মেঘ জমছে। সরা পিচের পথ দিয়ে হুহু করে ছুটে চলেছে বাস। শীতল বাতাস মেঘদের শরীর থেকেই যেন নেমে আসছে পৃথিবীতে। আর দুপাশে সেই মেঘের ছায়া মেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সবুজ গালিচার মতো চায়ের বাগান। সেই শূন্য চরাচরে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা যা আরো গাঢ় করে তুলেছে চা-বাগানের ওপাশে শুরু হয়ে যাওয়া ঘন জঙ্গল। প্রথমেই যে চিন্তাটা অর্জুনের মাথায় এল তা হল ওই জঙ্গলে হাতিরা বাস করে।

একটু বাদেই বাস একটা ছিমছাম বাজার এলাকায় ঢুকে চৌমাথায় এসে থামল। অর্জুন নেমে এসে চারদিকে তাকাল। সামনেই একটা পেট্রল পাম্প, পান-বিড়ির দোকান। মোটামুটি যা-কিছু প্রয়োজন সাধারণভাবে থাকার জন্যে তার সবই বোধহয় এখানে পাওয়া যায়। জায়গাটা মোটেই পাহাড়ি নয় অথচ পাহাড়ি গন্ধ আছে। বেশিরভাগ বাড়িই কাঠের তৈরি। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা, প্রীতম সিং কোথায় থাকেন?”

“ওই ওপাশে ওর বাড়ি, কিন্তু এখন মিলে পাবেন।”

“মিল?”

“কাঠের মিল। বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে চলে যান, দেখতে পাবেন।”

জায়গাটাকে ভাল লাগছিল হাঁটতে হাঁটতে। দুপাশে বড় বড় দেবদারু গাছ কিন্তু তারই ফাঁকে বকুল চোখে পড়ল। মিনিট-পাঁচেক হাঁটতেই রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরল। আর তক্ষুনি অর্জুনের চোখে দুটো জিনিস একসঙ্গে ফুটে উঠল। বিরাট কাঠচেরাইয়ের একটা কারখানা যার গেটের ওপর সাইনবোর্ডে লেখা,

“প্রীতম স.মিল”। আর রাস্তাটা যেখানে প্রায় আধ মাইল ছুটে গিয়ে মিলিয়ে গেছে সেখানে চাপ-চাপ অন্ধকার-মাথা জঙ্গল।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দাঁড়াল অর্জুন। সামনেই একটা দরজা। ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। নীচে অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঠচেরাইয়ের কারখানা। কাঁচা কাঠের গন্ধ আর উৎকট শব্দে জায়গাটার চেহারা হি আলাদা। কারখানার ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে হচ্ছিল না প্রীতম সিং-এর দেখা করবার আগে, ঠিক সেই সময় জিপটা এসে দাঁড়াল। এই জিপ তার পরিচিত, অশোকদার সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে এটাতেই চেপেছিল। প্রীতম সিং লাফ দিয়ে নেমেই ওকে দেখতে পেয়ে যেন পরিচয়টাকে সঠিক করার জন্যেই জিজ্ঞাসা করলেন, “অর্জুন?”

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে অর্জুন সম্মতি জানাল।

“বাং, ফাস্ট ক্লাস। শোনো ভাই অর্জুন, আমি চাই তুমি কাজের সময় কাজ করবে আর বিশ্রামের সময় বিশ্রাম। কাজ করবে চটপট যাতে আমি বিরক্ত না হই। আগারস্ট্যাণ্ড?” দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করলেন প্রীতম সিং।

অর্জুন আবার ঘাড় নাড়ল।

“শাবাশ।” বলে প্রীতম সিং চিৎকার করে ডাকলেন, “এ বাহাদুর, ইয়ে হ্যায় অর্জুন। উসকো রহনেকো কামরা দেখাও।” প্রীতম সিং আর দাঁড়ালেন না। হনহুন করে চলে গেলেন কারখানার ভেতর। বাহাদুরের সঙ্গে কারখানার লন পেরিয়ে আসতে গিয়ে অর্জুন লম্বা লম্বা কাঠের লগ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল। সে টের পেল কাঠের শরীরের ভেতরের গন্ধ গাছের গন্ধ থেকে আলাদা। এক নাগাড়ে শব্দ হচ্ছে কারখানায়। সেটাকে ডিঙিয়ে আসতেই অর্জুন দুটো কাঠের বাড়ি দেখতে পেল। লম্বা লম্বা গোটা-ছয়েক বিমের ওপর দুটো কাঠের ঘর, বারান্দা আর নীচ থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি উঠে সেই বারান্দায় গিয়ে ঠেকেছে। বাহাদুর দরজা খুলে দিতে অর্জুন দেখল ঘরটা মন্দ নয়। একটা তক্তাপোশের ওপর তোশক পাতা, টেবিল এবং দুটো চেয়ার হল ঘরটার সম্পত্তি। কিন্তু সবচেয়ে সুখবর হল ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে ঝোলা তারের ডগায় বাল্ব রয়েছে। সুইচে হাত দিতেই আলো জ্বলে উঠল। বাহাদুর বলল, “ডায়নামো চলতা হ্যায়।”

ঘরের পেছন দিকে ছোট্ট একটা ব্যালকনি আছে এবং তার গায়েই স্নানঘর। সেখানে বালতিতে জল তোলা ছিল। পরিষ্কার হয়ে ব্যালকনির রেলিং-এ হাত রেখে অর্জুন জঙ্গলটাকে দেখছিল। বড় জোর একশো গজ গেলেই জঙ্গলটা। অথচ কী শান্ত মনে হচ্ছে এখন।

এই সময় বাহাদুর এসে জানাল সিংজি তলব করেছেন। অর্জুন দ্রুত নেমে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। দরজায় তালা দেওয়া হয়নি। বাহাদুর বারান্দায়

দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্কোচে মন পালটাল অর্জুন। গেলে তো একটা স্যুটকেসই শুধু যাবে।

সিংজি বসে ছিলেন জিপে। ওকে দেখেই ইশারা করলেন উঠে বসতে। অর্জুন বিনাবাক্যব্যয়ে পেছনে লাফিয়ে উঠতেই জিপটা চলতে শুরু করল। সিংজি বললেন, “শোনো ভাই অর্জুন, ছয়জনের একটা টিম দিচ্ছি তোমার চার্জে। কী করে হাতি তাড়াতে হবে তা তোমাকে বলে দেব। কালই ওষুধ এসে যাচ্ছে। তুমি সেগুলো নিয়ে জঙ্গলে চলে যাবে।”

“ওষুধ?”

সিংজি হাসলেন, “হ্যাঁ ভাই, ওষুধ। সব রোগের ওষুধ আছে আর হাতির থাকবে না? আমি তো তারই টেন্ডার দিয়েছি। কেন, অশোকবাবু বলেনি তোমাকে?”

“না।”

“হাতিকে মারা চলবে না, আহত করা চলবে না, শুধু পাল্লিকের কাছে ওর আসা বন্ধ করতে হবে। তুমি এর আগে জঙ্গলে এসেছ?”

“না, আসিনি।”

“আরে বাপ! জঙ্গল দ্যাখোনি আর আমি তোমাকে লিডার করে দিলাম? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?”

অর্জুন ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “কিন্তু আমি জঙ্গলের ওপর অনেক বই পড়েছি। হাতির ওপরও।”

“আরে ভাই, রান্নার বই মুখস্থ করা আর রান্না কি এক কথা! অশোকবাবুকে আমি না বলতে পারি না তাই—। ঠিক আছে, রেঞ্জার তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে এ-ব্যাপারে অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছে। কক্ষনো বলবে না যে, জঙ্গলে তুমি কখনো যাওনি। আন্ডারস্ট্যান্ড?”

“ঠিক আছে।”

জিপ একটা বাক পেরিয়ে ফরেস্ট অফিসের লনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রীতম সিংকে দেখে যে লোকটি কাঠের বাড়ির দোতলা থেকে নেমে এলেন তিনিই যে রেঞ্জার এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না অর্জুনের।

রেঞ্জার হলেন এক-একটা ফরেস্ট রেঞ্জার কর্তা। তাঁর অধীনে বিট অফিসাররা ছড়িয়ে আছেন জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁদের কাজ গাছ এবং বন্যজন্তুদের পাহারা দেওয়া। কন্ট্রাক্টররা যাতে নির্দিষ্ট গাছ কাটে তাই লক্ষ করা। অতএব একজন রেঞ্জার প্রকৃত অর্থে অনেক ক্ষমতার অধিকারী। এইসব খবর গত কদিনে জেনেছে অর্জুন।

গাড়ি থেকে নামতেই অর্জুনকে দেখিয়ে প্রীতম সিং বললেন, “এর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম। এ হল অর্জুন, আমার স্কোয়াডের লিডার।”

রেঞ্জার অর্জুনকে দেখলেন, “বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা আছে ?”

শ্রীতম সিং বললেন, “আপনি আমাকে জানেন, আমি ব্যবসায় ভুল করি না। তাহলে পাঞ্জাব থেকে এখানে এসে করে খেতে পারতাম না।”

রেঞ্জার হেসে বললেন, “সত্যি, আপনি কী করে এইটে হাতালেন ভেবে পাচ্ছি না। সরকারি কাজ বাইরের লোককে দিয়ে করানো—। যাক, আপনার ওষুধ এসে গেছে ?”

“হ্যাঁ। দার্জিলিং-এর চিড়িয়াখানা থেকে পেয়েছি, কলকাতা থেকে আনবার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না।”

“আমিও মনে করি না। কিন্তু এক্সপার্টরা এক্সপেরিমেন্ট করবেন, আমাদের কী করার আছে। তা বাই দ্য বাই, তিন নম্বরের বিট অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, খবরটা আপনি জানেন ?”

অর্জুনের চোখ এড়াল না। শ্রীতম সিং-এর মুখ এক লহমার জন্য ফ্যাকাশে হয়েও ঠিক হয়ে গেল। অবশ্য দাড়িগোঁফ থাকায় ওদের মুখ দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু ব্যাপারটাতে উনি হোঁচট খেয়েছেন টের পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীতম সিং বললেন, “তাই নাকি! আজকাল কারো ওপর বিশ্বাস করা যায় না।”

রেঞ্জার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, “সাব, মেছুয়াপুলকা পাস হাতি নিকাল।”

রেঞ্জার শ্রীতম সিংকে বললেন, “চলুন, দেখে আসি কী ব্যাপার!”

গাড়ি ছুটে চলল সরু পিচের পথ ধরে। একটু বাদেই বাড়ি ঘরদোর শেষ হয়ে চা-বাগান আরম্ভ হল। রেঞ্জার এবং ড্রাইভার ছাড়া শ্রীতম সিং সামনের সিটে বসে, পেছনের খোলা অংশ দিয়ে অর্জুন দেখছিল কালো রাস্তাটা ফিতের মতো খুলে খুলে যাচ্ছে। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে জিপ থেমে গেল। তারপর রেঞ্জারের নির্দেশে গাড়িয়ে গাড়িয়ে চলতে লাগল। একটু বাদেই ছোট্ট পুল নজরে এল। তার পাশ থেকেই ঘন জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। পুলের গায়ে দুটো সাইনবোর্ড। ছোট্টায় লেখা, মেছুয়াপুল। বড়টায় বাঘ, হরিণ, হাতির ছবির পাশে লেখা “অভয় অরণ্য, খুঁটিমারি রেঞ্জ”।

তাহলে এটাই মেছুয়াপুল এবং এখানেই হাতিরা বেরিয়েছে। শ্রীতম সিং কিংবা রেঞ্জার এখন চুপচাপ চারপাশে সতর্ক নজর বোলাচ্ছেন। শুধু পুলের নীচে বয়ে যাওয়া জলের ধারার শব্দ ছাড়া এখানে আর প্রাণের অস্তিত্ব নেই। শেষ পর্যন্ত রেঞ্জার বললেন, “এরা এত প্যানিকি হয়ে আছে, সত্যি-মিথ্যে ফারাক করতে পারছে না। কেউ হয়তো বলেছে মেছুয়াপুলের কাছে হাতি বেরোতে পারে, সেটাই আমার ওখানে বেরিয়েছে বলে পৌঁছেছে। চলুন ফেরা যাক।”

অর্জুনের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। প্রথম দিনেই বুনা হাতির দেখা পাবে ভেবেছিল এখানে এসে কিন্তু তা বোধহয় ভাগ্যে নেই। এমন-কী জঙ্গলের দরজায় এসেও তারা ফিরে যাচ্ছে। সামনের সিটে শ্রীতম সিং রেঞ্জারের সঙ্গে

আলোচনা করে প্ল্যান ঠিক করে নিচ্ছেন। অর্জুন শুনতে পাচ্ছিল, তরাই-এর এই এলাকায় গত ছয় মাসে মোট একত্রিশজন মানুষ হাতির পায়ে জীবন দিয়েছে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অর্জুনকে নামিয়ে দিয়ে প্রীতম সিং চলে গেলেন রেঞ্জারের সঙ্গে। অর্জুন দেখল শুধু প্রীতম সিং-এর নয়, রাস্তার ওপারে আরো গোটা-তিনেক স-মিল আছে। সন্দের পাতলা অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে পিঠে লম্বা বেতের ঝুড়ি ঝুলিয়ে মদেশিয়া মেয়েরা ফিরে যাচ্ছে কাজ সেরে। এ-রকম অদ্ভুত শান্ত জীবন হঠাৎ অশান্ত করে তুলেছে হাতিরা, যাদের দেখলে এতদিন তার খুব ঠাণ্ডা বলে মনে হত।

অর্জুনের খেয়াল হল বিকেলে কিছুই খাওয়া হয়নি। এক কাপ চা-ও না। তাছাড়া রাতে খাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে তাও সে জানে না। অশোকদা মাইনের কথা বলেছিলেন, সিংজি কি সেই সঙ্গে খাবার দেবেন? অর্জুন চা খাবে বলে চৌমাথার দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে খাবার-দাবারের যে দোকান আছে সেটা সে বাস থেকে নেমেই দেখতে পেয়েছিল।

চৌমাথায় তেমন লোকজন নেই। চায়ের দোকানে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে অর্জুন হ্যাজাকের আলোয় চারদিক দেখে নিল। গয়েরকাটায় ইলেকট্রিক বোধহয় ব্যাপকভাবে আসেনি। সিংজির ওখানে তো জেনারেটর চলছে। চা আর নিমকির অর্ডার দিয়ে ও চৌমাথার দিকে তাকিয়ে ছিল এমন সময় কেউ একজন ফিসফিসিয়ে বলল, “চাকরি করতে আসা হল?”

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন বয়স্ক মানুষ কখন তার পাশের বেঞ্চিতে এসে বসেছে। লোকটি লম্বা এবং দড়িপাকানো চেহারা, দুটো চোখ এতখানি গর্তের মধ্যে যেন ঝুঁকে দেখতে হয়। মানুষের শব্দহীন হাসি যে কতখানি অস্বস্তিকর হয় একে না দেখলে বোঝা যাবে না। জবাব শোনার জন্যে লোকটা যদি অনন্তকাল অমন করে চেয়ে থাকে? অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে বলল, “হ্যাঁ, আমি চাকরি করতে এসেছি।”

“হাতি তাড়াবার চাকরি বড় মজাদার চাকরি।” লোকটা এবার হাসল।

খিকখিকে শব্দ করে কেউ হাসতে পারে ধারণা ছিল না অর্জুনের। কিন্তু সে যে ওই চাকরি নিয়ে এসেছে তা এ জানল কী করে? অর্জুন একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করল, আপনি এখানে থাকেন?”

“অবশ্যই। আট বছর ধরে আছি। নাম তিনকড়ি। এখন তো বাসটাস সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বাইরের লোক হলে এখানে রাতে থাকতাম কোথায়? এই হতচ্ছাড়া জায়গাটা একটা হোটেল পর্যন্ত নেই। কত মাইনে?”

অর্জুন উত্তর দিল না। কিন্তু বুঝতে পারছিল লোকটি অনেকক্ষণ খায়নি। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে কাউন্টারে গিয়ে দাম মিটিয়ে রাস্তায় নামতেই তিনকড়ি সুদূত করে নেমে এল ওর পাশে। এসে জিজ্ঞাসা করল,

“রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ? এখানকার দোকান আটটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় ।”

অর্জুন বলল, “একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আপনি এত চিন্তা করছেন কেন ?”

“কী করব ভাই, ওটা যে আমার স্বভাব । কদিন থেকেই শুনছি সিংজি হাতি তাড়বার কন্ট্রাক্ট বাগিয়েছে আর জলপাইগুড়ি থেকে লোক আসছে । তা আজ দেখলাম তুমি এলে । দেখে ভাল লাগল, আর থাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে কথা বলতে দোষ কী !”

“আপনি কী করেন ?”

“বড় কষ্টে আছি ভাই । বয়স হয়েছে বলে কেউ কাজকর্ম দেয় না । কীভাবে যে দিন কাটে— ! ওই ফটোমাস্টার না থাকলে এতদিনে মরে যেতাম । তোমায় তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো !”

এই মুহূর্তে তিনকড়ির মুখটা অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না সে । কিন্তু মন কেমন হয়ে গেল অর্জুনের । লোকটা বোধহয় ভাল । সে বলল, “আপনি সিংজির ওখানে কাজ করেন না কেন ?”

“আমাকে নেবে না ।”

“কেন ?”

“ব্যাটা এক নম্বরের চোর । ওই যে পেট্রল পাম্প দেখলে সেটাও ওর । দু’নম্বরের তেল বিক্রি করে । ব্যাপারটা তুমি বুঝবে না । ফরেষ্টের কুপ অল্প পয়সায় ডেকে বেশি বেশি কাঠ কেটে নিয়ে আসে । লোকটা অসৎ ।” তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, “রেঞ্জারের সঙ্গে ষড় আছে ।”

“আর কেউ নেই যে চাকরি দিতে পারে ?”

“না । একটাও সৎ লোক দেখতে পেলাম না যার কাছে চাকরি করি, ওই এক ফটোমাস্টার ছাড়া । তা ওরই ভাল আয় হয় না যে আমাকে কাজ দেবে । তবু দুবেলা খেতে তো দেয় ।”

অর্জুন একটু ভাবল । তারপর বলল, “খুঁটিমারির জঙ্গলটাকে আপনি চেনেন ?”

ঘাড় নাড়ল তিনকড়ি, “খু-উ-ব । জঙ্গল জায়গাটা কিন্তু লোকালয়ের চেয়ে ভাল ।”

অর্জুন বলল, “আমরা যে টিম যাব হাতি তাড়াতে সেখানে আপনাকে নেওয়ার জন্যে সিংজিকে বলতে পারি ।”

তিনকড়ি বলল, “ব্যাপারটা একটু ভাবতে হবে । আচ্ছা, পরে ভেবে বলব ।”

অর্জুন অবাক হল । যার চাকরি নেই, ঠিকমতো খেতে পায় না, সেই লোক চাকরির প্রস্তাব পেয়ে বলে ভাবব ? যেচে মানুষের উপকার করতে নেই ।

সিংজির স-মিলের কাছে এসে তিনকড়ি নড়িয়ে গেল, “তাহলে রাত্রে না খেয়ে থাকবে ? এক-আধ দিন উপোস করা অবশ্য ভাল । অভ্যাস হয়ে গেলে আমার মতো অসুবিধে হবে না । একটা টাকা দাও, আমি মাঝরাতিরে খোঁজ নিয়ে যাব খেতে কি না !”

“মাঝরাতির ? আপনি তখন জেগে থাকেন নাকি ?”

খিকখিক করে হাসল তিনকড়ি । তারপর বলল, “থাকি তো : না থাকলে জঙ্গলে কী ঘটছে, রাত্তিরে কারা যায় আসে টের পেতাম কী করে !”

এখন কাঠের কারখানা ঘুমিয়ে আছে । কোথাও কোনো শব্দ নেই । এমনকী বাহাদুরের দর্শনও পাওয়া যাচ্ছে না । অর্জুন সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে দেখেছিল ঘরের দরজা ভেজানো । সুইচে হাত দিয়েও বালবটাকে জ্বালাতে পারল না সে । কারখানায় জেনারেটর চলছে না । বোধহয় সরকারি আলো এখন নেই । অর্জুন জামাকাপড় ছেড়ে পাজামা গেঞ্জি পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল । জানলাটা খুলে দেওয়ায় এক ধরনের ফিকে জ্যোৎস্না ঘরে আসছে । সে ভেবেছিল, সিংজির তো উচিত ছিল তার খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া । বাহাদুরকে খোঁজ করা দরকার । সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে কয়েকবার চিৎকার করে বাহাদুরকে ডাকল । অনেকক্ষণ বাদে কেউ উত্তর দিল, “বাহাদুর নেই হ্যাঁ ।”

এই সময় অর্জুনের মনে হল তিনকড়ির কথা শুনলে হত । জ্ঞান হবার পর সে কখনো রাত্রে না খেয়ে থাকেনি । এক ধরনের অভিমান জন্ম নিচ্ছিল, কিন্তু অর্জুন সেটাকে ঝেড়ে ফেলল ।

সামনের ঢালু মাঠ, নদী এবং বিশাল জঙ্গলের গায়ে জ্যোৎস্না যেন কেউ পাউডারের মতো ছড়িয়ে দিয়েছে । দূরে আকাশে ঝুলে থাকা চাঁদ দেখে মনে হচ্ছে জঙ্গলটা যেন মাথায় চাঁদের কলসি নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে । এই অদ্ভুত মায়ার আলোমাখা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অর্জুন তার সব সমস্যার কথা ভুলে গেল । এত রূপসী আকাশ সে কখনো দেখেনি । হয়তো ওই চিলতে নদীর চকচকে জল আর কালো জঙ্গল আকাশটাকে আরো সুন্দর করে তুলেছে । অর্জুন একদৃষ্টে যখন তাকিয়েছিল তখন পেছনে শব্দ হল । কেউ যেন পা টিপে আসার চেষ্টা করেও শব্দটাকে ঢাকতে পারেনি । অর্জুন কানখাড়া করল । তাহলে কি বাহাদুর ফিরে এল ? কিন্তু এত নিঃশব্দে সে আসতে যাবে কেন ? জানলা থেকে ফিরে দাঁড়াতেই অর্জুনের মনে হল ওর হৃৎপিণ্ড এক লাফে বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল । সারা শরীর কালো কাপড়ে মোড়া, মুখচোখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, মূর্তিটি স্থির, নিষ্পন্দ । তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে । অর্জুনের গলা শুকিয়ে গেল ।

ঠিক সেইসময় খিকখিকে হাসিটা বাজল । “রুটি নিয়ে এলাম, আর কুমড়োর

ঘ্যাট।”

এবার আর একটা ধাক্কা। বুকের ভেতরটা শান্ত হতে সময় লাগল। শরীর হঠাৎ শীতল হয়ে গেল ভয়ানকভাবে। একটা ঠোঙা আর ভাঁড় টেবিলের ওপর রেখে চট করে দরজাটা ভেজিয়ে তিনকড়ি মাথা থেকে কালো চাদরটা খুলল। এবার একই সঙ্গে বিরক্ত এবং কৃতজ্ঞ হল অর্জুন। সে একটু কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, “এইরকম ঢেকেঢুকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মানে কী?”

“তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে ভাই? এইটুকুনিতে ভয় পেলে কী করে চলবে? তোমাকে যে আরো বড় ভয়ের সামনে দাঁড়াতে হবে। হ্যাঁ, আমার তো এখানে ঢোকা নিষেধ, প্রীতম সিং দেখলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। তাই ছায়ায় ছায়ায় নিজেকে ঢেকে-ঢুকে এলাম। আজ আবার জোছনাটা এমন হতচ্ছাড়া হয়েছে! তা খাওয়া হয়নি তো!” তিনকড়ি দাঁত বের করে হাসল।

“প্রীতম সিং আপনাকে নিষেধ করেছে কেন?”

“ওর দু নম্বর ব্যাপারটা আমি জানি বলে। ওসব কথা ছেড়ে দাও। এখানকার ব্যবসায়ীদের মনগুলো এই ডুয়ার্সের জঙ্গলের মতনই। নাও, চটপট খেয়ে শুয়ে পড়ো।”

অর্জুন জানলা ছেড়ে চলে এল টেবিলের কাছে। এবং হঠাৎই সে তিনকড়ির কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগল।

তিনকড়ি উসখুস করছিল। বলল, “আর একটা টাকা ছাড়ো, দোকান বন্ধ হয়ে গেলে না খেয়ে থাকতে হবে আমাকে।”

অর্জুন তাড়াতাড়ি টাকাটা বের করে দিলে তিনকড়ি নিঃশব্দে চলে গেল। খাবারটা মোটেই সুখাদ্য নয় তবু পেট ভরিয়ে জল খেয়ে অর্জুন শুয়ে পড়ল। জ্যোৎস্না এখন ঘরের মধ্যে।

তখন কত রাত কে জানে, অর্জুনের ঘুম ভেঙে গেল। অবিরত চিৎকার হচ্ছে চারধারে। যেমন চিৎকার মানুষ বোধহয় ডাকাত পড়লেই করে। সে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে ছুটে গেল। এখন চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। জোছনা নেই বললেই চলে। অথচ চোখের সামনে একটা বিশাল পাহাড় দেখতে পেল সে। ঢালু জমিটার শেষে যে নদী তার জলে পা রেখে হাতিটা শুঁড় নাড়ছে। পেছনে অন্ধকার থাকায় ওকে আরো বিশাল দেখাচ্ছে। সার্কাস কিংবা চিড়িয়াখানার হাতিদের সঙ্গে তুলনাই চলে না। এত চিৎকার এবং ড্রামের আওয়াজ ও ভ্রূক্ষেপই করছে না। এই সময় হাতিটা মাথার ওপর শুঁড় তুলে গর্জন করল। অর্জুন এতক্ষণ নার্ভাস ছিল, এবার ওই শব্দে ওর বুকের ভেতরটাও নড়ে উঠল। ঠিক তখন জানলার নীচে ফোঁস ফোঁস শব্দ হতেই অর্জুন সাবধানে মাথা বের করল। একটা নরম স্পর্শ তার চুল ছুঁয়ে যেতেই চট করে মাথা সরিয়ে নিল সে। কিন্তু তখনও শুঁড়টা জানলায় নেতিয়ে রয়েছে। ভয় কেটে গিয়ে মজা লাগল অর্জুনের। একটা নেহাতই পুঁচকে হাতি।

বোধহয় একটু দুট্টু তাই ওর মা ওখানে দাঁড়িয়ে ধমকাচ্ছে। অর্জুনের মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি এসে গেল। না-খেতে-পারা একটা রুটি টেবিলে ছিল। সেইটে এনে এগিয়ে ধরতেই বাচ্চাটা ঠুঁড় ঘুরিয়ে টেনে নিয়ে একদম মুখে পুরে দিল। এই সময় বড় হাতিটা আবার ধমকাতেই পুঁচকেটা তুলতুলে পায়ে ছুটে গেল সেদিকে। যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অর্জুনের দিকে তাকাল এবং তারপরই মায়ের শরীরের সঙ্গে মিশে গেল।

চেষ্টা করেও সে-রাত্রে আর ঘুম এল না। মা-হাতির বিশাল চেহারার ভয়ঙ্কর ভঙ্গিটা সত্ত্বেও তুলতুলে বাচ্চাটার কথা ওর খুব বেশি মনে হচ্ছিল। সমস্ত শিশুরাই একইরকম, দুট্টু এবং মিষ্টি।

ভোরে বাহাদুর এল, প্রীতম সিং তাকে ডাকছেন। চটপট পোশাক পাল্টে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। অফিসবাড়ির বারান্দায় প্রীতম সিং বেতের চেয়ারে বসে আছেন। আজ ওঁর পরনে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি আর খাকি হাফপ্যান্ট। টেবিলে চায়ের পট, কাপ আর কিছু শিঙাড়া। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই প্রীতম সিং বললেন, “কাল রাত্রে হাতি দেখলে?”

“হ্যাঁ।”

“কী মনে হল?”

“ফাইন।” কথাটা ইচ্ছে করে বলল অর্জুন। ও যে ভয় পেয়েছিল সেটা প্রীতম সিংকে না জানানোই ভাল। তাছাড়া তিনকড়ির কথা যদি ঠিক হয় তাহলে এই লোকটি সুবিধের নয়। ও যে মোটেই ভিত্তু সম্প্রদায়ের নয় সেটা বোঝানো দরকার। প্রীতম সিং একটু অবাধ হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর হেসে বললেন, “বুনো হাতিকে দেখে কারো সুন্দর মনে হয় জানতাম না। যাক, তোমার এই জায়গা কেমন লাগছে?”

“বেশ ভাল।”

“কিন্তু আজ সকালেই তোমাকে জঙ্গলের ভেতরে যেতে হবে। এ-ব্যাপারে তোমাকে যা-যা করতে হবে আমি ডিটেইলসে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ফালতু ঝামেলা হাতে নিয়ে আমার অন্য বিজনেস নষ্ট হতে চলেছে! আমি তোমার ওপর দায়িত্ব দিতে চাই।” সিংজি দুটো কাপে চা ঢেলে একটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন, “কাল রাত্রে এখানে হাতি এসেছিল তা তো দেখেছ। মেছুয়াপুলের ওপাশে কুলি লাইনে ওরা তাণ্ডব করে গিয়েছে। আটটা ঘর ভেঙেছে, যা পেরেছে খেয়েছে।”

অর্জুন ইচ্ছে করেই চায়ের কাপে চুমুক দিল শব্দ করে, “আমায় কী করতে হবে?”

জঙ্গলের ভেতরে একটা ক্যাম্প করবে প্রথমে। তোমার হাতে একটা জিপ থাকবে। চারজনের একটা টিম নিয়ে চলে যাবে তুমি। হাতি জঙ্গল থেকে বের হয় বিশেষ কয়েকটা পথ দিয়ে। এই পথগুলো ছাড়া ওরা নতুন পথ সচরাচর

ব্যবহার করে না। সবক'র পান অনুযায়ী ওই পথগুলোতে তুমি কিছু জিনিস ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।' সিংজি এরপর বিস্তারিতভাবে ওকে বুঝিয়ে দিলেন। ওঁব হুকুমে বাহাদুর দশটা কেরোসিনের টিন নীচে নিয়ে এল গুদামঘর থেকে। সেদিকে তাকিয়ে অর্জুনের গা ঘিনঘিন করে উঠছিল।

সিংজি বললেন, “আমি মনে করি না এতে কোনো কাজ হবে, কারণ সামান্য বৃষ্টি হলেই ওসব ধুয়ে মুছে সাফ হবে। কাল রাতে হয়নি বলে যে আজ হবে না তা কেউ বলতে পারে না। ওরা চাইছে তাই আমাদের করতে হবে। তবে রেঞ্জারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তোমাকে এক বাস্ক অ্যালার্ম বোমা দেওয়া হবে। এগুলো ফাটানো খুব সহজ এবং যা শব্দ হয় তাতে হাতি কাছে ঘেঁষবে না। তুমি কি ফায়ার আর্মস্ ব্যবহার করেছ কখনও?”

অর্জুনের মনে পড়ল এন সি সি-তে থাকতে ওরা রাইফেল ছুঁড়েছিল কয়েকবার। অতএব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ!”

“তাহলে তোমাকে একটা রিভলভার দেব, খুব বিপদে না পড়লে ব্যবহার করবে না। এবং মনে রেখো হাতির বিরুদ্ধে কখনোই না। কারণ রিভলভারের গুলিতে হাতি সামান্য জখম হতে পারে মাত্র কিন্তু তোমার জীবন নিয়ে নেবে। জঙ্গলে হাতি ছাড়াও এমন অনেক জন্তু আছে তাদের জন্যেই ওটা দিচ্ছি। দুদিন অন্তর রিপোর্ট পাঠাবে আমাকে। তোমাদের রেশন সেইসময় আমি পাঠিয়ে দেব। আন্তারস্ট্যান্ড?”

চা শেষ করে প্রীতম সিং উঠে পড়লেন। পিছু পিছু অর্জুনও নেমে এল। প্রীতম সিং বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে চারজন লোককে আসতে বলা হয়েছিল তারা এসেছে কিনা? বাহাদুর চটপট তাদের হাজির করল। প্রত্যেকেই মজবুত চেহারার নেপালি। হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ে গেল তিনকড়ির কথা। লোকটার জন্যে একটু চেষ্টা করলে হয় না?

সে বলল, “এরা সবাই বিশ্বস্ত?”

সিংজি বললেন, “ও শিওর।”

“রান্না করতে পারে?”

প্রশ্নটা সিংজি নিজে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিতে ওরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। সিংজি সেটাকে আমল না দিয়ে বললেন, “তোমরা তো ওখানে রাজভোগ খেতে যাচ্ছ না। সুতরাং সেন্দ্র করতে পারলেই চলে যাবে।”

“কাল বিকেলে আমার একজন পরিচিত লোককে দেখতে পেলাম। বেচারার কাজকর্ম নেই। ওকে সঙ্গে নিতে পারি?”

“গয়েরকাটায় থাকে? কে?”

“খুব সামান্য লোক, আপনি চিনবেন না।”

প্রীতম সিং সামান্য চিন্তা করলেন, “নিতে পারো। কিন্তু আমি ডেইলি চার টাকার বেশি দিতে পারব না। আর কোনো অ্যাকসিডেন্ট হলে আমি দায়িত্ব

নেব না, আন্ডারস্ট্যান্ড .”

দুপুর নাগাদ ওরা রওনা হল। রেঞ্জারের অফিস থেকে জঙ্গলের একটা ম্যাপ পেয়েছে অর্জুন। ওরা মেছুয়াপুলের উত্তরে পাঁচ মাইল গভীরে ক্যাম্প করবে। বোমার বাস্কুলো কেরোসিনের টিনের সঙ্গে গাড়িতে তোলা হল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি বিশেষ পরিচয়পত্র ওদের সঙ্গে রইল, যদিও সমস্ত বিট অফিসারদের এ-ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এক ফাঁকে চৌমাথার আপ্যায়নে খেতে গিয়েছিল অর্জুন। সেই সময় তিনকড়ি উদয় হল, “কাল হাতি দেখলে?”

অর্জুনের খেয়াল হল লোকটা কখন যেন অবলীলাক্রমে তাকে তুমি বলতে শুরু করেছে। দিনের আলোয় আজ ভাল করে দেখল সে। টিয়াপাখির মতো বাঁকানো নাক এবং অসম্ভব রোগা, ঢাঙা শরীর। অর্জুন গভীর গলায় বলল, “আপনি মাসখানেক কাজ করবেন?”

খুব দ্রুত মাথাটাকে ওপর-নীচ করল তিনকড়ি।

“তাহলে একদম দাঁড়াবেন না। সোজা মেছুয়াপুলের রাস্তায় চলে যান। পথে আপনাকে তুলে নেব।” অর্জুন হুকুম করল।

তিনকড়ির মুখটা উদ্ভাসিত। তারপরই হাত বাড়াল, “আট আনা পয়সা দাও, মুড়ি খেতে খেতে চলে যাই।”

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক সঙ্গে চলল। সে জায়গা দেখিয়ে দেবে। যদিও তার কোনো দরকার ছিল না। ম্যাপটা জলের মতো পরিষ্কার। খুঁটিমারি ফরেস্ট রেঞ্জ শুরু হয়েছে সেই ডুডুয়া-আংরাভাসা থেকে। তারপর উঠতে উঠতে নানান রেঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে হিমালয়ের কোথায়-না-কোথায় মিলিয়ে গেছে। চারজন নেপালি, প্রত্যেকেই সশস্ত্র, জিপের সঙ্গে একটা কেরিয়ারে মালপত্র নিয়ে ওরা রওনা হল তখন বেলা দুটো। একটু আগেই আকাশের রঙ সাবানধোয়া জলের মতো হয়ে পড়ল আচমকা। হিসেবমতো জঙ্গলে ঢুকে এক ঘণ্টায় স্পটে পৌঁছে যাবে এবং তার মধ্যে বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা নেই।

ড্রাইভারের পাশে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক, যার নাম চতুর এবং একবারে ধারে ছিল অর্জুন। কাঠের গোলাগুলো ছাড়িয়ে দুপাশে সবুজ গালচের মতো চা-গাছগুলোকে রেখে জিপ সাঁইসাঁই করে ছুটে যাচ্ছিল। চোখে মুখে বাতাস লাগায় চমৎকার লাগছিল। চা-বাগান যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই রাস্তাটা ঢালু এবং ফালি কুমড়োর মতো বাঁক নিয়েছে। কাছাকাছি আসতেই অর্জুনের হাসি পেয়ে গেল। ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট আর ছেঁড়া-ছেঁড়া কোট পরে তিনকড়ি তীব্রবেগে হাত নাড়ছে। ওর ঢাঙা শরীরটাও নড়ছে সেই সঙ্গে। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, ওর মাথায় একটা কাপড়ের টুপি জাতীয় কিছু যেটা বেশ

ছোটমাপের। অর্জুন গাড়িটা থামাতে বলতে চতুর বলল, “তিনুপাগলাকে চেনেন বাবু?”

অর্জুন বলল, “হ্যাঁ। তবে পাগল কিনা জানি না, কিন্তু সিংজির সঙ্গে কথা হয়েছে, ও আমাদের দলে কাজ করবে।”

চতুর বলল, “কিন্তু লোকটা প্রচণ্ড কুঁড়ে, ফটোমাস্টারের কাছে পড়ে থাকে।”

ততক্ষণে গাড়ি থেমেছে। মাটি থেকে একটা ঝোলা কুড়িয়ে দৌড়ে কাছে চলে এল তিনকড়ি। এসে গস্তীর গলায় বলল, “মশারি আনা হয়েছে?”

অর্জুন থতমত খেল, “ম-শা-রি!”

“আনা হয়নি? বুঝেছিলাম ঠিকই। জঙ্গলের মশারা শকুনের চেয়ে অভদ্র।” তারপর সঙ্গের ঝোলাটা দেখিয়ে বলল, “আমি এনেছি। নটা ফুটো ছিল তাও গিট দিয়ে রেখেছি। পেছনে বসব, না সামনে?”

অর্জুনের প্রচণ্ড হাসি পেয়ে গিয়েছিল। এখন ওরা জঙ্গল এবং অনেক অজানা বিপদের মুখোমুখি, আর লোকটা কিনা মশারি ঝোলায় নিয়ে দাঁড়িয়ে! তিনকড়ি ততক্ষণে পেছনে উঠে বসেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুন দেখল ওর দুটো পা বাইরে ঝোলানো। সে উপদেশের গলায় বলল, “ঠিক হয়ে বসুন।”

“ঠিকই আছি। এনি ডেঞ্জার মোমেন্ট আর ঝাঁপ দেব তৎক্ষণাৎ। কিন্তু মুশকিল হল বিড়ি আনা হয়নি। তুমলোগকো পাস বিড়ি হ্যাঁ ভাই?” প্রশ্নটা নেপালিদের উদ্দেশে। উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন, “খইনি? বাঃ, ঠিক আছে, বুঝলে ভাই, খইনির মতো নেশা আর নেই।”

একটু বিরক্ত হল অর্জুন, “চুপ করুন।”

ওরা তখন মেছুয়াপুল ছাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে। যদিও এটা পিচের পথ, সিঁথির মতো পরিষ্কার চেহারা নিয়ে নাথুয়ার দিকে গিয়েছে, তবু নাকে জঙ্গলে গন্ধ এল। লম্বা সেগুন শাল আর লতা জাতীয় কিছু রাস্তার দুপাশকে অন্ধকার করে রেখেছে। একটানা ঝিঝি ডাকছে চারধারে। একটাও লোক চোখে পড়ল না এদিকে। আধমাইলটাক এগিয়ে চতুর ডান দিকে ঘোরাতে বলল জিপটাকে।

দুপাশের গাছের ওপর অনবরত চিৎকার এবং ছটোপুটি চলছে। অর্জুন ব্যাপারটা দেখবার জন্যে মাথা বের করতে পেছন থেকে তিনকড়ি বলল, “বাঁদরামি করছে। মাথা ঢুকিয়ে রাখাই ভাল।”

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “কেন?”

“সাপখোপ থাকা বিচিত্র নয়।”

চতুর বলল, “এখন সাপের সময় না বাবু।”

ধমকাল তিনকড়ি, “খুব জেনে বসে আছে। শীতকালে যেন বৃষ্টি হয় না। আর এটা তো বর্ষাকাল। সাপ গাছের মাথায় উঠে বসে থাকে। বুঝে
৩০

দ্যাখো ভাই, সরকার কী রকম লোককে মাইনে দেয় । ”

চতুর চিৎকার করে উঠল, “অ্যাঁই, খবরদার । ”

এই সময় সামনের জঙ্গলে ছটোপুটি শব্দ উঠতেই ড্রাইভার ব্রেক টানল ।

কয়েক মুহূর্ত দমবন্ধ স্তব্ধতা, জিপের প্রত্যেকের চোখ সামনের দিকে । অর্জুন পকেটে হাত দিল । রিভলভারটা বের করবে কিনা চিন্তা করল । তার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবার কোনো লাইসেন্স নেই, প্রীতম সিং অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাকে ওটা দিয়েছেন । বারংবার বলেছেন অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া ওটা যেন সে বের না করে ! ঠিক সেইসময় জঙ্গল সরিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে একটা বিরাট শুয়োর বেরিয়ে এসে ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল । খুব অবাক এবং সেই সঙ্গে বিরক্তি ফুটে উঠল তার মুখে । ওর পিছনে তিন-চারটে তুলতুলে বাচ্চা । এক মুহূর্তমাত্র, তারপরই মা বাচ্চাদের নিয়ে উধাও হয়ে গেল । চতুর বলল, “বাবু, শুয়োর দিয়ে বউনি হল আমাদের । ”

পেছন থেকে তিনকড়ি ফুট কাটল, “সেই সঙ্গে শুয়োরের বাচ্চা । ”

সুন্দর জায়গা পাওয়া গেল । আকাশ থেকে দেখলে মনে হত আচমকা এখানে টাক পড়েছে । ফুট চল্লিশেক জায়গায় শুধু ঘাস, কোনো গাছপালা নেই । ওরা সেখানেই তাঁবু ফেলল । নেপালি ছেলেগুলো খুব করিৎকর্মা । চতুর নির্দেশ দিতেই ওরা পাশাপাশি দুটো তাঁবু টাঙিয়ে ফেলল । এর কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের তাঁবুতে দুটো ফোল্ডিং চেয়ার, টেবিল এবং ক্যাম্পখাট সাজানো হলে বেশ সভ্যভাবা দেখাল । চতুর দুটো তাঁবুর চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হল ।

চেয়ারটা বাইরে টেনে নিয়ে এসে অর্জুন আরাম করে গাছগুলোর দিকে তাকাল । কতকাল ওরা এমনি ভাবে আছে । অনেকের শরীরে শ্যাওলা জমে শক্ত হয়ে আছে । এখনই ছায়া নেমেছে জঙ্গলের গোড়ায় । অর্জুনের খেয়াল হল বুড়িদির কথা । ভাগ্যিস চাঁদের পাহাড়টা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল । এই পরিবেশে চমৎকার লাগবে বইটা পড়তে । এই সময় তিনকড়ি জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল । অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন ? ”

লোকটাকে ঢোলা প্যান্ট ছেঁড়া কোট আর বেথাপ্লা টুপিতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে । দুটো হাত-তিনকে লম্বা লাঠি তিনকড়ির হাতে । একটা সামনে রেখে বলল, “সার্ভে করে এলাম । ঠিক পেছনেই একটা বরনা আছে । পাথরচোকরা মাছ চেনো ? দারুণ টেস্ট । কিলবিল করছে ওখানে । লাঠিটা রাখো, প্রয়োজনে লাগবে । ”

অর্জুন লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল । বেশ শক্ত, হাতে নিলে আত্মবিশ্বাস আসে । সে তিনকড়িকে গম্ভীর গলায় বলল, “আপনি এলোমেলো না ঘুরে বেড়িয়ে ওদের সঙ্গে হাত মেলান । অনেক কাজ বাকি আছে । ”

“আমি ? লেবারের কাজ করব ? ” তিনকড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ল ।

“আপনি তো কাজ করতেই এসেছেন।”

“ইয়েস। সেটা তোমাকে হেল্প কবতে। আমি কুলি নই।”

অর্জুন লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েও শেষ পর্যন্ত কঠোর হতে পারল না। নরম গলায় বলল, “ঠিক আছে, এখন তো রান্নাটা দেখুন। চা খেতে ইচ্ছে করছে।”

“সে তো আমারও ইচ্ছে। ঠিক হয়, দেখছি।”

অর্জুন দেখল ওপাশে উনুন খোঁড়ার তোড়জোড় চলছে। কেরোসিনের টিনগুলো এখনও জিপের কেরিয়ারে। কাল সকাল থেকে কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু অ্যালার্ম বোমের বাজ্ঞগুলোকে চতুর তাঁবুর ভেতরে আনিয়েছে।

লাঠিটা শক্ত হতে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগোল অর্জুন। গাছগুলোর নীচে পচাপাতায় কাদা জমেছে। তাছাড়া আগাছার জন্যে হাঁটাও মুশকিল।

এই জঙ্গলেই হাতিরা আছে। আনুমানিক সংখ্যা রেঞ্জে দুশো। ওরা দিনের বেলা কোথায় থাকে? খুঁটিমারি ফরেস্ট রেঞ্জে দুটো বড় বাঘ আছে। একটি নাকি বেশ অর্থর্ব। সম্প্রতি চিতার সংখ্যা বেড়েছে। পায়ের ছাপ দেখে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। আজ রেঞ্জারের মুখে কথাগুলো শুনেছে অর্জুন। আর একটু এগোতে সে বুঝতে পারছিল মাটি সমান নয়। খানিকটা উচুতে উঠে এসেছে সে। তারপরই কুলকুল শব্দটা কানে এল। জঙ্গল সরিয়ে সরিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই ঝরনাটা চোখে পড়ল। খুব শান্ত ভঙ্গিতে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। এক কোমরও হবে না এবং চওড়ায় ফুট-পনেরোর মধ্যে। জলের কাছে সহজে চলে আসা গেল পাথরে পা ফেলে। জিম করবেট থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব গুহ, সবার বইতেই অর্জুন পড়েছে জঙ্গলের ঝরনার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। জল খেতে প্রাণীরা আসে এখানেই। হাতিও নিশ্চয়ই আসে। অর্জুন চারপাশে তাকাল। ঝরনাটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আবার জঙ্গলেই ঢুকে গেছে। এবং সত্যি, প্রচুর মাছ আছে এখানে। ফরেস্টে জন্তু মারা যেমন নিষেধ মাছ ধরাও বোধহয় বারণ। কিন্তু পাখি নেই কেন? বুদ্ধদেব গুহ তো জঙ্গলে গেলেই নানারকম পাখির ডাক শুনতে পান। ভদ্রলোক দারুণ বানাতে পারেন। টিটিটি, হাতিটি, পিটিটুং। এর একটাও তো শোনা যাচ্ছে না।

আকাশের রঙ খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে। হেঁড়া-হেঁড়া মেঘগুলো এবার ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে। নির্যাত বৃষ্টি হবে। এইসময় অর্জুনের চোখ ঝরনার ওপাশে আটকে গেল। লম্বা লম্বা ঘাসগুলো কি সামান্য নড়ছে! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। হঠাৎ পেছন থেকে একটা হ্যাঁচকা টান আসতেই অনেকটা ভেতরে ছিটকে এল অর্জুন। এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে তিনকড়িকে চিনতে সময় লাগল। কিন্তু তিনকড়ি কথা বলার সুযোগ দিল না। প্রবল বিক্রমে ডান হাতের লাঠিতে গাছ ভাঙছে আর মুখে বিকট আওয়াজ করে অর্জুনকে টানতে টানতে জিপের রাস্তায় নিয়ে এসে বলল, “ওটা সেই বুড়ো

বাঘ। ব্যাটা ঝাঁপ দিতে সাহস পাচ্ছিল না। নইলে এতক্ষণ হাতি তাড়ানো বেরিয়ে যেত।”

কথাটা শোনামাত্র শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল অর্জুনের। তিনকড়ি কি তাহলে চোখে চোখে রেখেছিল। ভাগ্যিস এসেছিল পেছনে, না হলে—। লোকটার ওপর আরো বেশি নির্ভরতা বাড়ল। কিন্তু কয়েক পা হাঁটতেই ওর চোখ একটা সিগারেটের প্যাকেটে আটকে গেল। ঘাসের ওপর নেতিয়ে পড়ল সিগারেটের প্যাকেটটা সামনে এগিয়ে যাওয়া তিনকড়ির পকেট থেকে।

তিনকড়ি সামনের দিকে তাকিয়ে সমানে বকবক করে যাচ্ছে। কী মনে হতে সামান্য ঝুঁকে প্যাকেটটা দ্রুত পকেটে পুরে ফেলল অর্জুন। তিনকড়ির লক্ষ্য নেই এদিকে কিন্তু অর্জুন ভাবছিল সিগারেটের প্যাকেটটা লোকটার পকেটে কেন? দুদিন ধরে দেখছে ওকে বিড়ি খেতে এবং এ যাত্রায় বিড়ি আনতে ভুলে যাওয়ায় খইনি চেয়ে থাকছে। তোলবার সময় ওজনে বোঝা গেছে প্যাকেটে সিগারেট নেই। তাহলে গয়েরকাটা থেকে খালি প্যাকেট বয়ে আনবে কেন তিনকড়ি!

চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে চারপাশে তাকাল অর্জুন। ওদিকে রাএর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা চলছে। তিনকড়ির গলা সবাইকে ছাপিয়ে। বুনো গন্ধমাখা বাতাস বইছে তিনতিরিয়ে। দুটো বাঁদর খুব কাছেই একটা নিচু ডালে বসে ওর দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে যে অর্জুনের হাসি পেয়ে গেল। সঙ্গে কিছু খাবার নেই, নাহলে ওদের দেওয়া যেত। তারপর কথাটা মনে পড়তেই ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখে নিল ধারে-কাছে কেউ নেই। সম্ভরণে পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করল অর্জুন। সাধারণ সিগারেটের প্যাকেটটা খুলতেই ভেতরের কাগজে চোখ আটকে গেল। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে, “রাত একটায় কান খাড়া রেখো।”

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল অর্জুন। এ যে রীতিমত রহস্য-উপন্যাস! কেউ কি এই নির্দেশ দিয়েছে তিনকড়িকে? হঠাৎ মনে হল, কাল থেকে তিনকড়ি স্রেফ গায়ে পড়েই ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, উপকার করেছে যাতে অর্জুনের বিশ্বস্ত হওয়া যায়। কেউ কি ওকে এ-ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছে?

প্যাকেটটা পকেটে রেখে উঠতে যাবে এমন সময় তিনকড়ি হস্তদস্ত হয়ে উদয় হল, “বাঁদরগুলো বাঁদরামির একটা সীমা আছে।”

অর্জুনের চোয়াল শক্ত হল, “মানে?”

“ব্যাটারা রান্নার কিছু বোঝে না তবু আমার অর্ডার শুনবে না। ঝাল আমার একদম সহ্য হয় না তবু গাদা-গুচ্ছের লঙ্কা ঢালছে।” তিনকড়ি যেন প্রতিবাদ করল।

অর্জুন লোকটার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। তারপর বলল, “আমি ড্রাইভারকে বলছি আপনাকে মেছুয়াপুলে ছেড়ে আসতে। ওখান থেকে আপনি

হেঁটে ফিরে যেতে পারবেন।”

হতভম্ব হয়ে গেল তিনকড়ি, “মা—মানে?”

“ঝাল যখন সহ্য হচ্ছে না তখন আপনার না থাকাই ভাল।”

তিনকড়ি খুব দ্রুত নাভাসি ভাবটা কাটিয়ে উঠল, “বেশ, তুমি যখন বলছ। তবে সন্ধে হয়ে এল, আজকের রাতটা থাকতে দাও কাল সকালেই চলে যাব। মাইরি বলছি।”

হঠাৎ অর্জুনের মন পরিবর্তিত হল। ঠিক আছে, আজকের রাতটা সে লক্ষ রাখবে লোকটার ওপর। দেখা যাক না মতলবখানা কী! সে নীরবে ঘাড় নাড়ল, “বেশ।”

সাতটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দিতে হল। টুপটুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সন্দের মুখ থেকেই। কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক হল মশা। সত্যি, চড়ুইপাখির সাইজের এক-একটা, হল বসালে প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। তাঁবুতে ঢুকে দেখল ফোল্ডিং টেবিলটা বিছানার পাশে টেনে আনা হয়েছে। তার ওপর হ্যারিকেন জ্বলছে। এবং চারটে লাঠি মাটিতে গুঁজে তাতে গিঁটবাধা একটি ময়লা মশারি বেঁধে ক্যাম্পখাটকে ঘিরে রাখা হয়েছে। জঙ্গলে বোধহয় একটু ঠাণ্ডা পড়ে। বৃষ্টির জন্যেও হতে পারে। অর্জুন যখন শোওয়ার তোড়জোড় করছে তখন চতুর এল।

“বৃষ্টি তো আগুন জ্বালা যাবে না, মুশকিল হল।”

অর্জুনের মনে পড়ল রাত্রে জঙ্গলে আগুন জ্বেলে রাখলে বন্যজন্তুরা দূরে থাকে। সে জিজ্ঞাসা করল, “ভয়ের কিছু আছে?”

“ভয় নেই বলি কী করে? হাতির পাল আসতে পারে। চিতারা আছে, দুটো বাঘও ঘোরে। হায়না আছে। আমি কি এক-একজনকে দু’ ঘণ্টা করে পাহারা দিতে বলব বাবু?” চতুর অনুমতি চাইল।

“হ্যাঁ তাই ভাল। তবে তিনকড়িকে পাহারা দিতে হবে না।”

“আমিও তাই ভেবেছি বাবু।”

“কেন?”

“দিতে বললে ঘুমুবে। ও একা দুজনের ভাত খেয়েছে।”

চতুর চলে গেলে তাঁবুর মুখ বন্ধ করে মশারির ভেতর ঢুকে গেল অর্জুন। ক্যাম্পখাটে শোয়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। খাস জঙ্গলে সেটা মন্দ লাগছে না। তিনকড়ির জন্যে মন খুঁতখুঁত করছে। লোকটা সত্যি রহস্যময়। হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে বইটা টেনে নিল সে।

বইটা চোখের সামনে রেখে সামান্য কান খাড়া করতেই অজস্র শব্দ শুনতে পেল সে। রাত্তিরের জঙ্গল শুধুই শব্দ করে যায় কেন? তবে এই শব্দগুলোর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই। কোথাও হয়তো কোনো পাখি বিরক্তিতে টেঁচিয়ে উঠল, ডাব ডাব। সেই শুনে একটা হায়না খানিক হেসে নিল।

ঘড়ির দিকে তাকাল অর্জুন, একটা বাজতে এখনও অনেক দেরি।

তারপর ও কান পেতে শুনলে— তাঁবুর চারপাশে কে যেন ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে অন্ধকারেই বেশি, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল—গাছপালা ভেঙে একটা ভারি জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালালো যেন। বইটা চট করে বন্ধ করে কোমরে হাত রাখল অর্জুন। রিভলভারটা বের করে সে উঠে বসল ক্যাম্পফাটটার ওপর। হুড়মুড় করে নয়, খুব সতর্ক-শব্দ একটা হয়েছে যেটা জঙ্গলের নয়। কেউ যেন পা টিপে টিপে তাঁবুর কাছে আসছে।

খানিকটা সময় ব্যয় করে অর্জুন সন্তুর্ণণে মাটিতে নামল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা টর্চটাকে তুলে নিঃশব্দে তাঁবুর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ডান হাতের মুঠোয় রিভলভারের বাঁটটায় কাঁপুনি লেগেছে। তাঁবুর দরজা ফাঁক করে বাইরে তাকাল সে। যুটযুটে অন্ধকার। আকাশে মেঘ থাকায় আলোর নামমাত্র নেই। প্রথমে কিছুই নজরে এল না। তারপর একটু একটু করে চোখ সয়ে নিতে লাগল। অন্ধকারেরও একটা নিজস্ব আলো থাকে। সেই আলোটা একবার খুঁজে পেলে আর অসুবিধে হয় না। অর্জুন এবার গাছগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পেল। টর্চের বোতাম টিপে সে বনের গায়ে আলো ফেলল। একটা সরু থেকে মোটা হয়ে যাওয়া আলোয় জঙ্গলটাকে খুঁজতে লাগল সে। যার পাহারা দেবার কথা ছিল সে কোথায়? আর এইসময় তার নজরে এল হাতিটা। কুতকুতে চোখে তাকে দেখছে বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে। সেই বাচ্চাটা। ওকে দেখে দু’পা এগিয়ে এসে গুঁড় নাড়তে লাগল মজাদার ভঙ্গিতে। ঠিক তখনি পেছনের জঙ্গলে শব্দ হতেই বাচ্চাটা মুখ ঘুরিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল সেদিকে। অর্জুন সতর্ক ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই চাপা গলায় শুনতে পেল, “ওপরে উঠে এসো ভাই।”

হাতি দেখে যতটা না ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেল অর্জুন। চকিতে আলোটা ওপরের দিকে ফেলতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে এল। তিনকড়ি হাত নেড়ে তাকে ইশারা করছে গাছে উঠতে। ওর সারা শরীর কাপড়ে মোড়া কিন্তু গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। অর্জুন কোনোরকমে বলল, “আপনি!”

“আলো নেভাও। চটপট উঠে এসো ওপরে, কথা আছে।”

এত রাত্রে খামোখা গাছে উঠতে যাবে কেন, ভাবার মুহূর্তে জঙ্গল ভাঙার শব্দ হল। অর্জুন আর কিছু না ভেবে টর্চ কোমরে গুঁজে গাছটার ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। অনেক কষ্টে টানাহ্যাঁচড়া করে সে ওপরে উঠে এলে তিনকড়ি বলল, “এই গুলতির মতো ডালটায় আরাম করে বোসো। বসে চারপাশে তাকাও।”

অন্ধকারে প্রথমে ঠাণ্ডা করতে অসুবিধে হল, কিন্তু তারপর আর বুঝতে বাকি

রইল না। বিরাট এক হাতির পাল তাদের তাঁবু ঘিরে ফেলেছে। ছোট ছোট পাহাড়ের মতো লাগছে ওদের দেখতে। একটু একটু করে ওরা বৃত্তটাকে ছোট করছে। ওরা যদি ইচ্ছে করে যে-কোনো মুহূর্তে তাঁবু গুঁড়িয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় তাঁবুর মানুষগুলো ঘুমে কাদা হয়ে রয়েছে। আক্রান্ত হলে টেরও পাবে না। অর্জুনের হঠাৎ তিনকড়ির কথা মনে পড়ল, “আপনি এখানে কেন?”

“তাঁবুতে ঘুমুতে পারলাম না। সবকটার নাক ডাকে বাঘের মতো, বাপস।” খুব নিচু গলায় বলল তিনকড়ি। অর্জুন এমন অবাক কখনও হয়নি। স্রেফ নাকডাকা সহ্য হয় না বলে কেউ গাছের ওপর উঠে বসতে পারে? কিন্তু এদিকে কিছু একটা করা দরকার। ওই হাতিগুলোকে তাড়বার মতো অস্ত্র হাতে নেই কিন্তু তাঁবুতে তো বোমা আছে। চিৎকার করে চতুরকে ডাকার জন্যে মুখ খুলতেই তিনকড়ি বলল, ক’টা বাজে?”

“কেন?”

“একটা বেজে গেছে?”

“না।” অর্জুনের হাতের মুঠো সতর্ক হল। সিগারেটের প্যাকেটটা—

“বাজলেই হাতিরা চলে যাবে জঙ্গল ছেড়ে।”

“আপনি জানলেন কী করে?”

“জানি। একটু বাদেই শব্দটা শুনতে পাবে। যেটার কথা লিখেছিলাম।”

এবার সত্যি চমকে উঠল অর্জুন। তাহলে তিনকড়িই প্যাকেটের গায়ে কথাগুলো লিখে তাকে দিয়েছে। কিন্তু হাতে না দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল কেন?

ঠিক এইসময় হাতিরা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনকড়ি খপ করে অর্জুনের কবজি ধরে বলল, “কান খাড়া রাখো।”

খুব মৃদু একটা শব্দ হচ্ছে। যেন মোটর সাইকেল চেপে অনেক দূরে কেউ ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু তার একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গলে। সঙ্গে সঙ্গে হাতিরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ল। তারপর লম্বা লাইন করে চলে যেতে লাগল উন্টো দিকে। একটার পেছনে একটা। ওরা চোখের আড়াল হয়ে গেলে তিনকড়ি বলল, “এই শব্দটার কথা বলেছিলাম।”

“কিসের শব্দ?”

“জানি না। শুধু জানি ওটা হলেই হাতিরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর ভোরের আলো ফুটলে আবার ফিরে আসে।”

“এসব কথা রেঞ্জারকে বলেননি কেন?”

“বললে কে বিশ্বাস করবে? আমি তো পাগলা, বিশ্বাস না হয় ওই চতুরকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো।”

“বেশ, একটা কথা বলুন তো, মুখে না বলে আমাকে লিখে জানানেন কেন?”

“তোমায় পরীক্ষা করলাম তুমি সতর্ক কিনা। তাছাড়া মুখে কিছু বলা নিরাপদ নয়। এই যে আমরা কথা বলছি অন্য কেউ শুনছে কিনা কে জানে। আচ্ছা, যাও, এবার শুয়ে পড়ো।”

“সে কী! শব্দটা কোথায় হচ্ছে খোঁজ নেব না?”

“কান পেতে শোনো এখন আর হচ্ছে না। আর আমরা তো কালই চলে যাচ্ছি না, নাকি যাচ্ছি?”

অর্জুন হেসে ফেলল, “না যাচ্ছি না।” তারপর লাফ দিয়ে নীচে নামল, কোমর থেকে চর্চ বের করে ও দ্বিতীয় তাঁবুটার দরজায় এসে দাঁড়াল। চারজন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। সত্যি নাক ডাকছে জব্বর। নিজের টেস্টে ফিরে এসে মশারির ভেতর ঢুকে চোখ বন্ধ করতে গিয়েই কথাটা খেয়াল হল! দ্বিতীয় টেস্টে চারজনের ঘুমন্ত শরীরের আদল দেখতে পেল কেন? ওখানে তো পাঁচজনের থাকার কথা। যদি পঞ্চম জন পাহারা দেবার জন্যে না ঘুমোয় তাহলে তাকে তো নজরে পড়তই। তাহলে পঞ্চম জন গেল কোথায়?

সকালবেলায় জঙ্গলটাকে চমৎকার লাগল। চাঁপাফুলের মতো রোদ জমেছে গাছের মাথায়। ওদের তাঁবুর কাছে এখনও শিশিরভেজা ছায়া। চায়ের কাপ নিয়ে বসেছিল অর্জুন, এমন সময় চতুর এল, “বাবু, এখনই কাজ শুরু করবেন?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ। একজনকে রান্নাবান্নার জন্যে এখানে রেখে যাও।”

চতুর বলল, “না বাবু, কেউ একা থাকতে চাইছে না। কাল এখানে হাতি এসেছিল সবাই বুঝতে পেরেছে আজ। তাই—।”

এমন সময় তিনকড়ির গলা পাওয়া গেল, “ঠিক আছে, আমি থাকছি। ডিমের ঝোল আর ভাত রঁধে রাখব।”

অর্জুন দেখল তিনকড়ি বিরাট মগে করে চা খাচ্ছে। কথাটা বোধহয় চতুরের পছন্দ হল না, “বাবু, পাগলাটাকে একা একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “থাক। ও বরং এইসব কাজই করুক।”

একটু বাদেই ওরা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যেসব পরিচিত পথে হাতিরা জঙ্গল থেকে বের হয়ে লোকালয়ে যায় সেগুলো চতুরের ভালই চেনা। তার দু'একটা তো গতকালের যাওয়া-আসায় আরও স্পষ্ট। এই রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। না, কোনো দেওয়াল বা বেড় দিয়ে নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন হাতি বাঘকে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। বাঘ যে অঞ্চলে থাকে হাতি তার ধারেকাছে ঘেঁষে না। অতএব এই হাতিগুলোকে বাঘের ভয় দেখাতে হবে। **শ্রীতম** সিং যে টেন্ডার দিয়েছেন তা হল হাতির কাছে বাঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করার রাসদ সংগ্রহ করে এই সব বনপথে ছড়িয়ে দেওয়া।

কেরোসিনের টিনগুলো খোলা হল। ওগুলো এয়ার-টাইট রাখা হলেও শুকিয়ে এসেছে এর মধ্যেই। ব্যাপারটা জানা সত্ত্বেও গা-ঘিনঘিন ভাবটা এড়াতে পারছিল না অর্জুন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ও নির্দেশ দিতে লাগল। কীভাবে বাঘের মল ছড়িয়ে দিতে হবে প্রীতম সিং ওকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই মলের গন্ধ পেলে হাতি এ রাস্তায় কখনো পা রাখবে না। ওরা যদি উল্টো পথ বেয়ে জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে যায় তো রক্ষে। সেই সুযোগই নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শুধু এই খুঁটিমারি রেঞ্জ কেন, তরাই-এর সর্বত্র হাতি জঙ্গল থেকে নানান কারণে বেরিয়ে আসছে। সব রাস্তা বন্ধ করার মতো ওই দ্রব্য যে পরিমাণে প্রয়োজন তত বাঘই নেই ভারতবর্ষে। তাছাড়া চিড়িয়াখানা থেকেই ওটা আনা সম্ভব। আর কটাই বা চিড়িয়াখানা আছে! তিনটে কেরোসিনের টিন খালি হওয়া দেখতে দেখতে নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। সে চাকরিটা পেয়েছে বটে কিন্তু কত আজগুবি পথে সরকারের পয়সা জলে চলে যায়। যদি আজ দুপুরে বৃষ্টি হয় তাহলে এসব পণ্ডশ্রম হবে না? চতুর কোনো কাজ করছিল না। সে বনবিভাগের লোক, প্রীতম সিং-এর কাজ সে কেন করবে। জিপের গায়ে হেলান দিয়ে সে নেপালিদের কাজ লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ অর্জুন লক্ষ্য করল চতুরের কনুইয়ের ওপরে ব্যাণ্ডেজ। গতকাল তো ওটাকে লক্ষ্য করেনি সে, সে জিজ্ঞাসা করল, “তোমার হাতে কী হয়েছে চতুর?”

একটু যেন হকচকিয়ে গেল ও তারপর জোর করে হাসবার চেষ্টা করল, “ও কিছু না। আজ সকালে গাছের ডাল লেগে একটু ছুড়ে গেছে।”

অর্জুন কিছু বলল না। কিন্তু ওর বিশ্বাস হল চতুর মিথ্যে কথা বলছে। কারণ এত ভাল ব্যাণ্ডেজ সঙ্গে নিয়ে ওরা জঙ্গলে আসেনি। এবং চতুরের মতো একজন সামান্য কর্মচারীর কাছে ওরকম ব্যাণ্ডেজ থাকাটা একটু অস্বাভাবিক। তাহলে কি গত রাতে চতুরই তাঁবুতে ছিল না?

বেলা বারোটা নাগাদ ওরা গয়েরকাটায় যাবার সব ক’টা জঙ্গুলে পথে বাঘের মল ছড়ানো শেষ করল। মাথার ওপর চনমনে রোদ জ্বললেও ঘর গাছের ছায়া ওদের আড়ালে রেখেছিল। আর মাত্র দুটি টিন রয়েছে বাকি। অর্জুন সেগুলোকে আজই খরচ খরতে চাইল না। তাছাড়া খিদেও পেয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড। অর্জুন ওদের টেস্টে ফিরবার নির্দেশ দিল।

গাছে গাছে অজস্র বাঁদর ছাড়া আর কোনো প্রাণী চোখে পড়ছে না। এমন কী আজও পাখিদের ডাক শুনতে পাচ্ছে না অর্জুন। চতুরকে কারণটা জিজ্ঞাসা করবে ভেবেও করল না। লোকটার সঙ্গে বেশি কথা বলতে আর ইচ্ছে করছে না। মাটির রাস্তায় প্রায় লাফাতে লাফাতে জিপটা ওদের নিয়ে চলছিল। পেছনে ক্যারিয়ারটা থাকায় আরো অসুবিধে হচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরতেই ড্রাইভার চিৎকার করে ব্রেক কষতে জিপটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠে থেমে গেল।

সামনে তাকিয়ে অর্জুনের হৃদপিণ্ড যেন এক লহমার জন্য অকেজো হয়ে

গেল। একটি বিশাল মেটেরঙা হাতি ঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। তার দুটো চোখ জিপের দিকে, কান স্থির। এখন দূরত্ব পঁচিশ গজও হবে না। রাস্তাটা এমন যে কোনোভাবেই জিপটাকে ঘোরানো যাবে না। ক্যারিয়ার পিছনে নিয়ে ব্যাক করাও অসম্ভব। চতুর বলল, “বোম ফাটাব বাবু?”

“বোম? বোমা এনেছ নাকি?”

একগাল হাসল চতুর ওরই মধ্যে, “হ্যাঁ বাবু, তিনুপাগলার কাছে ওগুলো না রেখে সঙ্গে এনেছি। ক্যারিয়ারে আছে। দু-তিনটে ফাটালেই ব্যাটা পালাবে।”

হাতিটা নড়ছে না, সরে যাওয়ারও কোনো গরজ নেই। অর্জুন রিভলভারটাকে একবার ছুঁয়ে নিল। অত বড় জন্তুটার বিরুদ্ধে এটা কোনো কাজেই লাগবে না। সে ঘাড় নাড়তেই চতুর লাফিয়ে নীচে নেমে ক্যারিয়ারের দিকে ছুটে গেল। তারপর বাস্ক ভেঙে দুটো বোমা বের করে জিপের সামনে এগিয়ে এল। অর্জুন বলল, “দেখো, গায়ে মেরো না, শুধু ভয় দেখাও।”

চতুর বলল, “এটায় খালি শব্দ হয়, শব্দতেই ব্যাটা ভয় পাবে।” বলামাত্রই একটা বোমা ফাটল চতুর। প্রচণ্ড শব্দ হতেই হাতিটা নড়ে উঠে এক পা পিছিয়ে গিয়ে মাথার ওপর ঝুঁড় তুলে চিৎকার করে উঠল। চতুরের বোধহয় সাহস বেড়ে গিয়েছিল, সে আরও একটু এগিয়ে দ্বিতীয় বোমাটা ফাটানোমাত্র দৃশ্যটা চোখে পড়ল। দুপাশ থেকে আরও চারটে দাঁতাল হাতি জঙ্গল ভেঙে ছুটে আসছে জিপের দিকে। ড্রাইভার বলল, “সাব, ভাগিয়ে।”

বলামাত্র ওরা ছয়জন জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পেছন দিকে ছুটেতে শুরু করল, কিন্তু ওদিকের জঙ্গলেও শব্দ হচ্ছে। তার মানে হাতিরা এই পথে লুকিয়ে অপেক্ষায় বসে ছিল। হঠাৎ একটা রক্ত হিম-করা আর্তনাদ কানে আসতেই অর্জুন পেছন ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চতুর বোধহয় দুপাশের হাতিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল না। অর্জুন দেখল একটা দাঁতাল চতুরের শরীরটাকে ঝুঁড়ে জড়িয়ে শূন্য তুলে জিপের গায়ে আছাড় মারল। চতুর কিন্তু তারপর আর একবারও আর্তনাদ করেনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে হাতি প্রায় একই সঙ্গে জিপটার ওপর পা তুলে ওটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে লাগল। চোখের সামনে এমন বীভৎস মৃত্যু এর আগে দেখেনি অর্জুন। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। চতুর যে বেঁচে নেই এটা নিশ্চিত, কিন্তু ওর শরীরটাকে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

হঠাৎ কাঁধে নরম ভিজে স্পর্শ এবং নিশ্বাস পেয়ে চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্জুন বরফ হয়ে গেল। প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে হাতিরা ওকে ঘিরে রেখেছে। ওর ঠিক সামনে সেই বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে ঝুঁড় নাড়ছে। বাচ্চাটার মুখ বেশ হাসি-হাসি। যেন অর্জুনকে নিয়ে একটু খেলা করার মতলব ওর। ঝুঁড়টা বারংবার সে অর্জুনের সামনে নাচাচ্ছে। একবার একটা গাছের ডাল ভেঙে এগিয়ে দিল।

অর্জুন সেটা নিতেই বেশ চক্কর মেরে নিজের দলকে দেখে নিয়ে ঝুঁড় দিয়ে অর্জুনকে ঠেলতে লাগল। জীবনের বিন্দুমাত্র ভরসা নেই, অর্জুন পেছনে তাকাল। হাতির পাল অত্যন্ত সতর্ক চোখে তাদের দেখছে। যেন শিশুটিকে খেলা করতে দেওয়া চলে, কিন্তু সে যদি বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে ওরা যে-কোনো মুহুর্তেই তেড়ে আসবে। বাচ্চাটা সমানে অর্জুনকে সামনে ঠেলছে। যেন যেতে বলছে এগিয়ে। একটু দ্বিধা করে অথবা মূতের মতো অর্জুন সামনে হাঁটতে লাগল। বাচ্চাটাও পাশাপাশি হাঁটছে। আর সর্কোতুকে লেজ নাড়ছে। ভাঙা মোচড়ানো জিপটাকে ডিঙিয়ে অর্জুন প্রায় চোখ বন্ধ করে কয়েক পা এগিয়ে আসতেই ঝুঁড়ের টান অনুভব করল। বাচ্চাটা যেন তাকে থামতে বলছে। সে দেখল তিনটে বিশাল দাঁতাল ক্ষিপ্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সামনে দাঁড়িয়ে। এই তিনটেই জিপ ভেঙেছে, চতুরকে মেরেছে। বাচ্চাটা হঠাৎ অর্জুনকে ছেড়ে তিরতির পায়ে দাঁতালদের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ঝুঁড় দিয়ে ওদের একটু আদর করে আবার ফিরে এল। অর্জুন দেখল দাঁতাল তিনটির যেন মন পান্টাল, ওরা রাস্তা থেকে সরে জঙ্গলের মধ্যে আলস্যে গা ছেড়ে দিল। বাচ্চাটার সঙ্গে আবার হাঁটতে শুরু করল অর্জুন। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর পেছনে একটা গর্জন উঠতেই বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে গেল। অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অন্য হাতিদের আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মা-হাতিটা পেছনে পেছনে অনেকটা এসে তার বাচ্চাকে ডাকছে। আর একবার তার মাথায় ঝুঁড় বুলিয়ে বাচ্চাটা মায়ের কাছে ফিরে যেতেই অর্জুন দৌড় শুরু করল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে টলতে টলতে অর্জুন যখন তাঁবুর কাছে পৌঁছাল তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। ওকে দেখে তিনকড়ি দৌড়ে এল। অর্জুন এক পলক দেখে নিল, চারটে নেপালি তার অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ ওরা প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছে। ওরা ওকে ধরাধরি করে ক্যাম্পখাটে শুইয়ে দিলে অর্জুনের মনে হল এর চেয়ে আরাম বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই।

খানিকবাদে একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসতেই তিনকড়ি বলল, খরগোশের মাংস খেয়েছ কখনো? আজ খাওয়াব। ব্যাটাকে ধরে ফেললাম বলে ডিমে হাত দিতে হল না। আজ আর স্নান-টান করতে হবে না, মুখে জল দিয়ে পেট ভরে খেয়ে নাও।”

অর্জুন অপলক তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, কিছু নিশ্চয়ই শুনেছে নেপালিদের মুখে, কিন্তু সেসব কথা একবারও জিজ্ঞাসা করল না লোকটা! অদ্ভুত!

সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে পড়ল সে। এখন খিদে নেই, শুধু অবসাদ। চোখের সামনে লোকটা মরে গেল! আর একটু হলে সেও যেত। তার চেয়ে বড় চমক, বাচ্চা হাতিটা ওকে বাঁচাল! কেন? সেদিন রুটি খাইয়েছিল বলে?

কুলিরাও বেশ ভয় পেয়ে গেছে। ওরা খেয়েদেয়ে সামনে এসে বসল।

তিনকড়ি এল বেশ খানিক বাদ। এসে বলল, “গয়েরকাটায় একটা খবর পাঠাতে হয়।”

অর্জুন মাথা নাড়ল। কথাটা সে ভেবেছে। অন্তত চতুরের মৃতদেহের যা অবশিষ্ট আছে তার একটা গতি করা দরকার। কিন্তু এতখানি জঙ্গল ভেঙে কে যাবে। গেলে সবাই একসঙ্গে যাবে। কথাটা বলতেই তিনকড়ি মাথা নাড়ল, “খেপেছ! একটু বাদেই রূপ করে রাস্তার হয়ে যাবে। আজ কিছু হবে না, কাল সকালে দেখা যাবে।”

একজন নেপালি হিন্দিতে বলল, “কিন্তু রাত্রে তো হাতি আসতে পারে।”

মাথা নাড়ল তিনকড়ি, “না, আজ আসবে না। এলে বাবুকে ছেড়ে দিত না। বাচ্চাদের মন বুঝলে সবসময় ভাল। যত গোলমাল করি আমরা, এই বুড়োরা। কী হয়েছিল বলো দেখি।”

অর্জুন সব কথা খুলে বলল। শুনে তিনকড়ি হাসল, “পাপের বেতন দিয়েছে চতুর। বার বার ধান খাবে একবার ফাঁদে পড়বে না, তা কি হয়?”

অর্জুন বলল, “কী বলছেন?”

তিনকড়ি বলল, “ঠিকই বলছি। কাল রাত্রেও ব্যাটা বেরিয়েছিল। কিন্তু আজ রাত্রে একটা হেস্তনেস্ত করব যদি তুমি রাজী থাকো।”

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “হেস্তনেস্ত! কার সঙ্গে?”

তিনকড়ি অদ্ভুত হাসল, “সেইটেই তো জানি না। আজ রাত্রে তাই খুঁজতে হবে।”

কথা বলতে বলতে তিনকড়ি হঠাৎ এরকম হেঁয়ালি করতে বিরক্ত হল অর্জুন। কিন্তু এই মানুষটি ছাড়া আপাতত তার কোনো গতি নেই, তাও তো ঠিক।

তিনকড়ি উঠল, “একবার স্পটে যেতে হয় আলো থাকতে থাকতে।”

চমকে উঠল অর্জুন, “স্পটে?”

“নইলে তো রাস্তার চতুরের যেটুকু বাকি আছে তাও জানোয়ারের পেটে চলে যাবে। সেটা ঠিক হবে না।”

“কিন্তু হাতিরা—।”

“দূর! হাতিরা কি মানুষের মতো এক জায়গায় বসে আড্ডা মারে। এতক্ষণে তারা কোথায় না কোথায় চলে গেছে।”

“আপনি ডেডবডি এখানে নিয়ে আসবেন?”

“একটা কিছু তো করা দরকার। তোমার গিয়ে কাজ নেই। এক দিনেই যা ধকল গেল সারাজীবন মনে রাখবে। এই, তোরা তিনজন আমার সঙ্গে চল, একজন বাবুর সঙ্গে থাক।” নেপালিদের দিকে তাকিয়ে তিনকড়ি হুকুম করল।

অর্জুন দেখল বোচারারা মুখ চাওয়াচায়ি করছে। এই অবেলায় কেউ মার্চ

করে আর বিপদের মুখ যেতে চাইছে না । কিন্তু তিনকড়ি ছাড়বার পাত্র নয় । সে বকেবকে আদর করে তিনজনকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল তক্ষুনি ।

গাছের মাথায় রোদ উঠে গেছে । একটানা বিবিধ শব্দটা এখন সয়ে গেছে ।

অর্জুন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল । প্রথমত, ডুয়ার্সের সব জঙ্গল থেকেই হাতিরা বেরিয়ে লোকালয়ের ওপর যে হামলা করছে তার দুটো কারণ থাকতে পারে । হয় জঙ্গলে খাদ্যাভাব, নয় তাদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি । প্রীতম সিং এই অঞ্চলে যে কনস্ট্রাক্ট পেয়েছেন সেটা যদিও হাস্যকর তবু খুঁটিমারি দিয়ে না বেরিয়ে হাসিমারা বা গরুমারা দিয়ে হাতিদের বের হতে কোনো অসুবিধে নেই । অবশ্য যদি না সব অঞ্চলেই একই সঙ্গে হাতি আটকানোর কাজ শুরু হয় । এসব নিয়ে মাথাব্যথা করে অর্জুনের কোনো লাভ নেই, কিন্তু রহস্য হল ওই রাত একটার শব্দটা । ওটা কিসের ? ওটা আরম্ভ হলেই হাতিরা দল বেঁধে জঙ্গল ছেড়ে যায় কেন ? কাল রাতে চতুর এই গভীর জঙ্গলে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল । তাহলে কি এই জঙ্গলে মাঝরাতিরে কেউ বা কারা আসা-যাওয়া করে যাদের হাতিরা ভয় পায় ? এমনকী পাখিরাও ? কারণ এই বিশাল জঙ্গলে কোনো পাখি নেই । অন্য জঙ্গলে কী হচ্ছে কে জানে, কিন্তু এই রেঞ্জে যদি রাত্তিরের রহস্যটি সমাধান করা যায় তাহলে হাতিদের আটকানো যেতে পারে । জঙ্গলে তো বনরক্ষী আছে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিট অফিসার আছে, তারা কিছু টের পাচ্ছে না ? তারা ওই শব্দটা শুনতে পায় না ? অর্জুনের বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যা মিলল না ।

ঠিক সেই সময় একটা হাঁউমাউ চিৎকার শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়াতে অর্জুন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল । নেপালি ছেলেটি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং দ্বিতীয় তাঁবুটি ঘিরে আগুনের শিখা উঠছে । অর্জুনের চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলে গেল তাঁবুটা । এক ছুটে নেপালিটির পাশে পৌঁছে তাকে টেনে তুলল অর্জুন । বেচারার জামার কয়েক জায়গায় পোড়া দাগ । চামড়ায় আগুন লাগেনি । বোকার মতো দৌড়াদৌড়ি না করে গড়াগড়ি দিয়েছিল বলে রক্ষে । লোকটাকে ধাতস্থ করতে সময় লাগল । তাঁবুটা ছাই হয়ে গেলেও ভেতরের জিনিসপত্রে তখন সদ্য আগুন লেগেছে । অর্জুন ছেলেটিকে নিয়ে যতটা পারল সেগুলোকে বাঁচাল । আগুন নিভে যাওয়ার পর উৎকট ধোঁয়া বের হচ্ছে । অর্জুন নেপালিটিকে নিয়ে পড়ল । যা জানা গেল তা হল সে নাকি তাঁবুর গায়ে হেলান দিয়ে হাতিদের কথা ভাবছিল এমন সময় পিঠে গরম হলকা লাগে । তারপরেই জ্বলুনি শুরু হতেই সে গড়াগড়ি খায় । তার কাছে বিড়ি নেই অতএব তার আগুন জ্বালানোর প্রসঙ্গই ওঠে না । দুপুরের রান্নার পর উনুন নিভিয়ে দিয়েছিল তিনকড়ি । সেখানে গিয়ে এক ফোঁটা আগুন দেখতে পেল না অর্জুন । তাহলে তাঁবুতে আগুন লাগল কী করে । ওরা কি দিনদুপুরে লঠন

জ্বালিয়ে গিয়েছিল ? উদ্ধার করা লঠনে হাতে দিয়ে অর্জুন বুঝতে পারল অনেকক্ষণ তাতে আগুন পড়েনি। তাহলে ? বাইরের কেউ এসে আগুন দিয়েছে ? এই গভীর জঙ্গলে কে আসবে ? অর্জুনের শরীর শিরশির করে উঠল। একটু আগে যে কথা ভাবছিল তা কি কেউ টের পেয়ে গেছে ? অর্জুন সতর্ক চোখে চারপাশে তাকাল। তারপর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে পুড়ে যাওয়া তাঁবুর পিছনে পায়ে পায়ে চলে এল। ওকে এই ভঙ্গিতে দেখে নেপালিটিও বোধহয় আন্দাজ করে নিয়ে তার ভোজালির বাঁটে হাত রেখে সতর্ক ভঙ্গিতে অনুসরণ করল। তাঁবুর কিছু পরেই জঙ্গল। কেউ এসেছিল কিনা বোঝার উপায় নেই। ঘাসের ওপর পায়ে ছাপ নেই। এমনকী সামনের জঙ্গলটায়ও মানুষ যাওয়া-আসার কোনো চিহ্ন নেই। অর্জুন আর একটু এগোল। চক্রাকারে অনেকটা ঘুরেও কোনো হৃদিস পেল না। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরে আসছে তখন নেপালিটি একটা বুনো গাছের গোড়াকে ভোজালির এক কোপে কেটে দিল। শেকড় জাতীয় গাছ। অর্জুন বিশেষ লক্ষ করল না।

পোড়া টেটের সামনে এসে কিন্তু গা ছমছম করতে লাগল। অর্জুনের মনে হতে লাগল কেউ যেন সারাক্ষণ তাদের লক্ষ করে যাচ্ছে।

সন্দের আগেই ফিরে এল ওরা। চারজন কয়েকটা বাক্স বয়ে এনেছে। কিন্তু চতুরের শরীর দেখতে পেল না অর্জুন। সে কিছু প্রশ্ন করার আগে তিনকড়ি ছুটে গেল পোড়া তাঁবুর কাছে। তারপর ইশারায় অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে। অর্জুন সংক্ষেপে যতটা পারল ঘটনাটা বলল। তিনকড়ির মুখ এখন শক্ত। তার সঙ্গীরা বিস্মিত। লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনকড়ি পোড়া ছাইয়ের মধ্যে চলে গেল। তারপর হঠাৎই হাত বাড়িয়ে একটা গোলাকার দক্ষ বস্তু তুলে ধরল, “এইটে ছুঁড়ে পুড়িয়েছে।”

অর্জুন দেখল ওটা দড়ির বলের মতো। ততক্ষণে নাকের কাছে তুলে ঘ্রাণ নিয়েছে তিনকড়ি, “পেট্রলে চোবানো ছিল। আশেপাশে কিছু দেখতে পাওনি ?”

ঘাড় নাড়ল অর্জুন, “না। আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম।” সে নেপালি ছেলেটিকে দেখাল। ছেলেটি তখন ঘাসের ওপর বসে কী একটা জিনিস উরুতে ঘষছে। অর্জুন দেখল উরুটা অসম্ভব কালো। ওর হলদেটে শরীরের সঙ্গে যা কিনা খুব বেমানান। কথাটা বলেই অর্জুনের খেয়াল হল সে তো এই বলটাকে আগে দেখতে পায়নি, অতএব কিছু তো তার নজরের বাইরেও থাকতে পারে।

অর্জুন বলল, “থাক, এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। চতুরের কী হল !”

তিনকড়ি উত্তর দিল, “আনা যাবে না। একদম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। একটা ঘুঁটের মতো আদল হয়ে গেছে শরীরটা। গাড়ির ভাঙা

টিন-ফিন দিয়ে ঢেকেচুকে এলাম । ” তারপর একটু থেমে বলল, “তোমার সঙ্গে কথা আছে । ”

“বলুন । ”

“এখানে নয় । চলো, ওই গাছটায় উঠে বসি । ”

“সে কী ! খামোকা গাছে উঠব কেন ? ” এই রকম হেঁয়ালিতে বিরক্ত হল অর্জুন ।

“দেওয়ালের যদি দশটা কান থাকে তো জঙ্গলের একশোটা । ওপরে উঠলে তো শব্দ হাওয়ায় ভেসে যাবে— তাই ; ঠিক আছে, তোমার তাঁবুর ভেতরে চলো । ”

অর্জুন নেপালিদের বলল, “তোমরা একটু চারদিকে লক্ষ রেখো । খারাপ কিছু মনে হলেই আমাকে ডাকবে । ”

তাঁবুতে ঢুকে অর্জুন দেখল তিনকড়ি পকেট থেকে অনেকগুলো লালচে নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখছে । ওকে দেখে বলল, “মোট দেড় হাজার টাকা, ব্যাটা তিনশো টাকা মাইনে পেত কিনা সন্দেহ । ”

“কোথায় পেলেন এত টাকা ? ”

“চতুরের পকেটে । বডিটা গেছে কিন্তু জামাকাপড় তো যায়নি ? তবে এই টাকাগুলোতে বড় রক্ত লেগেছে এই যা । ”

“টাকাগুলো ওর কাছে কী করে এল ? ”

“সেইটেই তো ভাবছি । এত টাকা পকেটে নিয়ে কেউ জঙ্গলে বেড়াতে আসে না । তাছাড়া ওর অবস্থা যে ভাল ছিল না সেটা তো আমি জানি । বড় গোলমাল লাগছে হে । লোভ মানুষের বড় শত্রু । ”

“তাহলে কেউ নিশ্চয়ই এখানেই টাকা দিয়েছে ওকে । ”

“আলবাত । ”

“গতরাতে ও ছিল না এখানে । আজ আমি ওর হাতে একটা ব্যাগুজ দেখেছি । আপনি এতগুলো নোট নিয়ে এলেন । আমার মনে হচ্ছে এসব খবর এখনই গয়েরকাটায় জানানো দরকার । চলুন দল বেঁধে রওনা দিই । ”

তিনকড়ি ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল । অস্বস্তি হচ্ছিল অর্জুনের । সে জিজ্ঞাসা করল, “কী হল ? ”

“দূরত্বটা জানো ? এই রাতে পথ চিনে যেতে পারবে ? বারংবার তোমাকে হাতির বাচ্চা বাঁচাতে আসবে না । তাছাড়া, চলে যাওয়া জন্যে তো আমি এখানে আসিনি । ভেবেছিলাম, তোমাকে কিছু জানাব না, কিন্তু এখন আর চেপে রেখে কোনো লাভ নেই । ” তারপর আবার মাথা নাড়ল, “না, এখন নয় । সময় এলেই তুমি জানতে পারবে । আজ রাতে আমাদের ঘুমুলে চলবে না । এই জঙ্গলের হাতিরা যাতে হটপাট করে না বের হয় তার ব্যবস্থা আজই করতে হবে । ”

কথাগুলো এত রহস্যমাখানো যে অর্জুনের চট করে মুখে কোনো কথা এল না। তারপর সে বলল, “কিন্তু আমরা তো সিংজির চাকরি নিয়ে জঙ্গলে এসেছি। আমাদের যা যা করতে বলা হয়েছে তাই করব। অন্য ব্যাপারে নাক গলিয়ে কী লাভ।”

তিনকড়ি হাসল, “আজ যারা তাঁবু জ্বালিয়েছে তারা যদি রাত্রে তোমাকে পুড়িয়ে মারে? শোনো ভাই, আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে আক্রমণ করা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?”

রাত্রের খাওয়া খুব নমো নমো করে সারা হল। তিনকড়ি নেপালি চারজনকে কী বুঝিয়েছে সেই জানে। ওরাও দেখা যাচ্ছে বেশ উত্তেজিত। সন্দের পর থেকেই আজ বেশ ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে আকাশ চুইয়ে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা সবাই কিছুক্ষণ অর্জুনের তাঁবুতে বসে ছিল। যদিও সবাই মিলে একসঙ্গে বসে থাকাটা অর্জুনের পছন্দ ছিল না, কিন্তু তিনকড়ি বলেছিল, “না, এখন আর দুশ্চিন্তা নেই। ওটা হবে রাত গভীর হলে।”

বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের চেহারা পাণ্টে যাচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে চতুর্দিক থেকে। এতসব পতঙ্গ কিংবা প্রাণী যে ছড়িয়ে ছিল তা গতরাতেও বোঝা যায়নি। তিনকড়ি বলল, “ঈশ্বর খুব সং মানুষ।”

অর্জুন চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, “হঠাৎ একথা মনে হল কেন?”

“নাহলে বৃষ্টিটা নামত না। বৃষ্টিটা আমাদের অনেক কিছু থেকে আড়াল করবে। তিনি আমাদের পক্ষে আছেন।”

“এই বৃষ্টি মাথায় করে বের হবেন নাকি?”

“আলবাত। এই সুবর্ণসুযোগ ছাড়া যায়?”

রাত বারোটা নাগাদ ওরা তাঁবু ছেড়ে বের হল। তিনকড়ি একটা পলিথিনের প্যাকেটের ভেতর বেশ খানিকটা লবণ নিয়ে নিয়েছে। জল পড়লেই নাকি জেঁক কিলবিল করবে জঙ্গলে। কারো কাছেই বর্ষাতি নেই, অতএব ভিজতে ভিজতে হাঁটা শুরু হল। একটা সিঙ্গল লাইন করে ওরা এগোচ্ছে। অব্যবহৃত আগে তিনকড়ি, তার পরই অর্জুন। তাঁবুটা যেমন ছিল সেই অবস্থায় রেখে আসা হয়েছে। এমনকী হ্যারিকেনটা পর্যন্ত নেভানো হয়নি।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে পা ফেলা খুব মুশকিল। এর মধ্যে তিনবার হাঁটু থেকে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে অর্জুন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল আর কোনোদিন সে জলপাইগুড়িতে ফিরে যেতে পারবে না। এই জঙ্গলের আদিম অন্ধকারেই তাকে পড়ে থাকতে হবে আমৃত্যু। হঠাৎ সামনে সড়সড় করে শব্দ হতেই তিনকড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। আর একটু হলেই ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগত অর্জুনের। আসবার সময় অর্জুনের টর্চটা হাতিয়েছিল তিনকড়ি। একটু সময় দিয়ে হঠাৎ আলো ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে দুলতে দেখল অর্জুন। একটা বিশাল গোখরো কাঁপতে কাঁপতে ফণা মেলছে। মাটি থেকে অনেকটা ওপরে

উঠে এসেছে ওর শরীর। কুচকুচে কালো মুখটায় আলো পড়ায় বোধহয়
বিশ্ময়। অর্জুন চকিতে রিভলভার বের করতেই তিনকড়ি ওর হাত চেপে ধরল,
“না।”

অর্জুনের খুব রাগ হয়ে গেল। আর দেরি করলেই সাপটা ছোবল বসাবে।
ওর পক্ষে তিনকড়িকে আঘাত করাই সবচেয়ে সুবিধের। কিন্তু পলক ফেলার
আগেই একটা কাণ্ড হয়ে গেল। অর্জুনের মনে হল কিছু একটা উড়ে গিয়ে
সাপটার গলার কাছে আঘাত করতেই সেটা ঝুপ করে মাথা নামাল। আর
তারপরেই তড়িৎবেগে ওর পেছনে দাঁড়ানো নেপালি ছেলোটো এগিয়ে গিয়ে
সাপের লেজটা ধরে বনবন করে চরকির মতো ঘোরাতে লাগল। তিনকড়ির
হাত কাঁপেনি। সে টর্চটা জ্বলেই রেখেছিল। বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে
সাপটাকে একটা গাছের ডালে বেশ কয়েকবার আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে
নিজের ভোজালিটা কুড়িয়ে নিল ছেলোটো। সাপের প্রায় অনেকটা আগেই উড়ে
গিয়েছিল, এখন একটা দড়ির মতো দেখাচ্ছে। অর্জুন দেখল নেপালি ছেলোটো
নির্বিকার মুখে ঘাসে ভোজালির রক্ত মুছে নিচ্ছে। এবং তারপরেই তিড়িংবিড়িং
করে লাফাতে লাগল। তিনকড়ি পলিথিনের প্যাকেট থেকে খানিকটা নুন তার
পায়ে ঢেলে দিতে একটা টোপা কুলের মতো জোঁক ওর পা থেকে খসে
পড়ল। অর্জুনের হাসি পেয়ে গেল। যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ভয় পায়নি সে একটা
জোঁক দেখে কী কাণ্ড করল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে চলা শুরু করে
চাপা গলায় তিনকড়ি বলল, “গুলি চালালে সমস্ত বন জেনে যেত আমরা
এদিকে এসেছি।” এতক্ষণে কারুণটা ধরতে পেরে অর্জুন মাথা নাড়ল।

আপাদমস্তক ভিজ়ে শপশপ করছে, মাঝে মাঝে কাঁপুনিও আসছে।
তিনকড়ি ফিসফিসিয়ে বলল, “ওঃ, দারুণ রাত।”

দারুণটা কী অর্থে অর্জুন বুঝতে পারল না। বৃষ্টির জন্যে সেটা নিশ্চয়ই
আরামদায়ক অর্থে নয়। কিন্তু নেপালি চারজন একটুও প্রতিবাদ করছে না
কেন? ওরাও তো ঈমান্ে ভিজ়ছে।

ঠিক তখন আওয়াজটা শুরু হল। পায়ের তলার মাটিতে তিরতিরে
কাঁপুনি। খুব সজাগ না হলে অবশ্য বোঝা যায় না। তিনকড়ি ইশারায়
সবাইকে থামতে বলল। তারপর কান খাড়া করে শব্দটাকে শুনতে লাগল।
অর্জুন বুঝতে পারল গতরাতের চেয়ে আজ শব্দটা অনেক স্পষ্ট। অর্থাৎ তারা
শব্দ যেখানেই হোক তার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এই সময় দুদাড় করে
জঙ্গল ভাঙার শব্দ ভেসে এল। তিনকড়ি দ্রুত জরিপ করে নিয়ে বলল, “সবাই
গাছে উঠে পড়ো জলদি, নইলে প্রাণ যাবে।”

বলা যত সহজ কাজটা করা তত নয়। কারণ গাছগুলো যথেষ্ট মোটা এবং
শ্যাওলা বৃষ্টির জলে ভিজ়ে আরো পিছল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনকড়ি যখন
একটা নিচু ডাল ধরে শরীরটাকে বেঁকিয়ে সামান্য একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে
৪৬

উঠে গেল তখন হতভম্ব হয়ে পড়ল অর্জুন। খুব ভাল জিমন্যাস্টিক না জানলে এ রকম করা যায় না। ডালটায় উঠে হাত বাড়িয়ে অর্জুনকে ওপরে তুলে নিল তিনকড়ি। নেপালিরা অবশ্য এর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেছে। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না অর্জুন। তবু তারই মধ্যে সে তিনকড়িকে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কে?”

সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ি ওর মুখ চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, “চুপ।”

অর্জুন দেখল এক-একটা অন্ধকারের পাহাড় বেশ ব্যস্ত পায়ে ওদের নীচ দিয়ে চলে যাচ্ছে সার দিয়ে। যেন দ্রুত জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে হবে ওদের। এই দলটায় সেই বাচ্চাটাকেও যেন আন্দাজ করতে পারল অর্জুন। চলতে চলতে সে একটু অন্যদিকে মুখ ফেরাতে তার মা শুঁড় দিয়ে লাইনে টেনে আনল। ওরা চলে গেলে তিনকড়ি বলল, “ভাগ্যিস জল পড়ছে আর হাওয়াটা উণ্টো দিকে, নইলে—।”

“কিন্তু ওরা তো আজ বের হতে পারবে না।”

“কেন?”

“বাঃ, সারাটা সকাল আমরা ওদের পথে—।”

“তুমি পাগল! সে সব বৃষ্টিতে এতক্ষণে কাদা হয়ে গেছে। সরকারের পয়সা যেভাবে নষ্ট হচ্ছে দেখলে গা জ্বলে যায়।”

কথাটা যে মিথ্যে নয় খানিক বাদেই বুঝতে পারল অর্জুন। কারণ হাতিরা আর ফিরে এল না। তাহলে আজ সকালে যা করা হল তা কোনো কাজেই লাগল না! বিশেষজ্ঞ যিনি, যার মাথায় এটি এসেছিল অথবা প্রীতম সিং কি এই খবরটা জানতেন না?

টুপটাপ করে সবাই গাছ থেকে নেমে পড়ল। নেপালিরাও চলে এল পাশাপাশি। শব্দটা কোনো যন্ত্র থেকে বের হচ্ছে, না এক ধরনের পোকার পাখার ঘষটানি, চট করে ঠাওর করা মুশকিল। তিনকড়ি ওদের নিয়ে এগোল।

এইখানে জায়গাটা যেন আরো অন্ধকার। জঙ্গল বেশ গভীর। পায়ে-চলা পথ জঙ্গল একটা রেখেই দেয়, এখানে তাও নেই। তিনকড়ি একটু চিন্তা করল। কিন্তু হঠাৎই আওয়াজটা থেমে গেছে। এবং আশ্চর্য, এখানে বিঝিরাও ডাকছে না।

আর তখনই তিনকড়ি সজাগ হয়ে গেল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ ছাপিয়েও যেন কিছু শুনতে পেয়েছে সে। উবু হয়ে বসে কিছু একটা করতেই খুব কাছেই ঝোপে কুঁই করে একটা আওয়াজ উঠল আর তারপরেই মাটিতে ছটফট করতে লাগল ভারী কিছু। দু’মুহূর্তের মধ্যে সব শান্ত ওখানে। তিনকড়ি ইশারা করা মাত্র দুটো নেপালি ছেলে সন্তর্পণে ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। এবং পরক্ষণেই

যাকে নিয়ে বেরিয়ে এল তাকে একলা অন্ধকারে দেখলে বাঘ বলেই মনে হত ।
বিরিট খ্যাবড়া মুখটায় টর্চের আলো ফেলেই নিভিয়ে দিল তিনকড়ি । তারপর
কুকুরটার গলা থেকে বকলস খুলে নিয়ে হাসল, “একটা গেল আর ক’টা আছে
কে জানে !”

“পোষা কুকুর ?”

“হ্যাঁ । বুলডগ । এ অঞ্চলে দেখিনি ।”

ঠিক সেই সময় দূরে নাথুয়ার দিকে একটা ভারী শব্দ গড়িয়ে এল । লরি
জাতীয় কিছু আসছে । গাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সিঁথির মতো পিচের রাস্তা
দিয়ে ছুটে যেতে যেতে আচমকা থেমে গেল । আর কোনো শব্দ নেই
কোনোখানে ।

তিনকড়ি আবার সন্তর্পণে ওদের এগোতে বলল । একটু বাদেই একটা শিস
বাজল বৃষ্টির শব্দটাকে ছাপিয়ে । প্রথমে খুব স্বাভাবিক স্বর, তারপর একটু
বিরক্তি । ওরা ততক্ষণে চারটে গাছের আড়ালে চলে এসেছে । শিসটা এগিয়ে
আসছিল । এবং অন্ধকারেও মূর্তিটাকে দেখতে পেল অর্জুন । ওটা যে মানুষের
আদল বুঝতে অসুবিধে হয় না ।

এবার স্পষ্ট গলা কানে বাজল “টমি ! টমি !”

সেই সময় ওপাশের জঙ্গল থেকে তিনটে মানুষ বেরিয়ে এল আচমকা ।
তাদের একজন এগিয়ে প্রথম লোকটিকে সেলাম করলে সে ইঙ্গিত করল । ওরা
তিনজনই লোকটাকে ডিঙিয়ে কয়েক পা যেতেই যেন হঠাৎই চোখের সামনে
থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল । প্রথম লোকটি কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে আবার শিস
দিচ্ছে । অর্জুন বুঝতে পারল যে কুকুরটাকেই ডাকছে ও ।

একটু বাদেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে এল । লম্বা লম্বা গাছের শরীর
মানুষেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে । অর্জুন গুনল সংখ্যায় ওরা দশজন হবে ।
প্রায় আধঘণ্টা ধরে এই নিয়ে যাওয়া চলল ।

এই সময় আর একটি মানুষ যেন দৌড়েই সেখানে উদয় হল, “সাব,
উনলোক ভাগ গিয়া ।”

“ভাগ গিয়া ?” লোকটির গলা থমথমে ।

“হ্যাঁ সাব । তাগুমে কোই নেহি হ্যায় ।”

“চতুর ?”

“উও ভি নেহি হ্যায় ।”

“মেরা কুত্তা ভি নেহি আতা । জারা টুঁড়কে দেখো ।”

নতুন লোকটা শিস দিতে দিতে জঙ্গলে ঢুকে গেল । তিনকড়ি বলল,
“পরের লট বেরিয়ে গেলেই আমরা অ্যাটাক করব ।”

সেই মুহূর্তে আবার এক লট কাঠ বেরিয়ে গেল সামনে থেকে । এবার
তিনকড়ি ওদের ইশারা করে গুঁড়ি মেরে এগোতে বলল । হাতদশেকের মধ্যে
৪৮

পৌছে যেতেই তিনকড়ি চিৎকার করে উঠল “হ্যান্ডস আপ।”

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। এক লহমায় অর্জুন বুঝতে পারল আপাদমস্তক বষাতি-ঢাকা মানুষটি চমকে উঠেছে। কিন্তু তারপরেই সে পেছনে লাফাল। ততক্ষণে অর্জুনের পাশে দাঁড়ানো নেপালিটি হাতের কাজ সেরে ফেলেছে। লোকটির আত্ননাদ শোনা গেলেও সে যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল। তিনকড়ি লাফিয়ে জায়গাটা ডিঙিয়ে কী একটা জিনিস চেপে ধরে বলল, “অর্জুন, তুমি একজনকে নিয়ে লরিটা আটকাও, আমরা এদিকটা দেখছি।”

অর্জুন দেখল তিনকড়ি প্রাণপণে একটা বন্ধ হয়ে আসা ঢাকনা আটকাবার চেষ্টা করছে। বাকি তিনজন নেপালি ওর সঙ্গে হাত লাগালে অর্জুন চতুর্থ জনকে নিয়ে দৌড়াল যদিকে কাঠ যাচ্ছিল সেইদিকে।

জঙ্গলটা আমচকা ফুরিয়ে গেল। ওরা দেখতে পেল লরিটাতে কাঠ প্রায় বোঝাই। কিন্তু চিৎকারটা শুনেই বোধহয় লোকগুলো হতভম্ব হয়ে গেছে। অর্জুন আর সময় নষ্ট করল না। রিভলভার উচিয়ে বলল, “সবাই হাত তুলে দাঁড়াও।”

লোকগুলো ভাবাচাকা খেয়ে হাঁউমাউ করে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে ড্রাইভার লরিটাকে চালু করে দিয়েছে। গাড়িটা গড়াতেই লোকগুলো তাতে লাফিয়ে উঠতে লাগল।

জীবনে প্রথমবার রিভলবার চালান অর্জুন। প্রথম গুলিটা কোনদিকে গেল সে নিজেই বুঝতে পারল না। কিন্তু দ্বিতীয়টি ছুঁড়তেই বিকট শব্দ করে গাড়িটা থেমে গেল। তারপর অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল ওরা। লোকগুলো গাড়ি বিকল দেখে লাফিয়ে নেমে চোঁ-চোঁ করে দৌড়াতে লাগল সামনের দিকে। অর্জুনের সঙ্গী বলল, “সাব, উনলোক ভাগতা হয়।”

এরা যে সামান্য কর্মচারী তা বোঝা যায়। অকারণে মানুষ খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না অর্জুনের। ওরা গাড়িটার কাছে গিয়ে বুঝতে পারল টায়ার গেছে। অত ভার না থাকলে হয়তো চলে যেতেও পারত। লোকগুলো ফ্রমশ চোখের আড়ালে চলে গেলে পিচের রাস্তা ছেড়ে ওরা আবার জঙ্গলে ফিরে এল। বাইরে থেকে পথ আছে বলে বোঝা যায় না, কিন্তু সামান্য ভেতরে ঢুকলে ঠাণ্ড করতে অসুবিধে হয় না। ওরা যখন নির্দিষ্ট জায়গাটির কাছে চলে এসেছে তখন কুকুর খুঁজতে যাওয়া লোকটিকে দেখতে পেল। বেচারী মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঠাণ্ড করতে চাইল চেনে কিনা। কিন্তু তার আগেই নেপালি ছেলটি ওকে কজা করে ফেলেছে। মাটিতে চিত করে ফেলে তিন-চারবার রন্দা মারতেই বেচারী অজ্ঞান হয়ে গেল। এবং তারপরই সেই শব্দটা বেজে উঠল।

অর্জুন এবার আর একটু সামনে এগিয়ে যেতেই হতভম্ব হয়ে গেল। মাটির নীচে আলো জ্বলছে। যেন হঠাৎ একটা গহ্বর তৈরি হয়ে গেছে ওখানে।

লোকটা এতক্ষণ বোধহয় এইটেই দেখছিল। সঙ্গীকে নিয়ে খুব সতর্কভাবে অর্জুন সেই গর্তে পা রাখল। সিঁড়ির ধাপের মতো জায়গায় পা ফেলে নীচে নেমে আসতেই সে চমকে গেল। যেন বিশাল ঘর সামনে। দুটো বাল্ব জ্বলছে সেখানে। তিরতিরে আওয়াজটা এখন স্পষ্ট। ওটা যে জেনারেটরের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ঘরটা কাঠ-বোঝাই। রিভলভার উচিয়ে খানিক এগোতেই স্পষ্ট গলা শুনতে পেল সে, “ওটা নামিয়ে রাখো অর্জুন। আর কোনো ভয় নেই।”

তারপরেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। তিনকড়ি একটা চেয়ারে বসে চুরুট খাচ্ছে। তিনজন নেপালি তার সামনে বসা লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে লোকটার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অর্জুন। তার মাথা নীচের দিকে, লোকটা বলল, “আমি এক লক্ষ টাকা দিতে রাজী আছি— প্লিজ—।”

তিনকড়ি উঠে দাঁড়াল। তারপর অর্জুনের কাছে এসে বলল, “তোমার হাতের অস্ত্রটার লাইসেন্স নেই। ওটা সঙ্গে না রাখাই ভাল।” বলে রিভলভারটা নিয়ে বাকি গুলি বের করে পকেটে পুরে রাখল। তারপর হেসে বলল, “যে শব্দটা হত তা ওই জেনারেটরের। মাটির তলায় শব্দ করে হাতিদের ভয় পাইয়ে ইনি জঙ্গলের কাঠ কাটিয়ে এখানে স্টক করতেন। দুটো হাতির দাঁতও দেখতে পেলাম। চমৎকার।”

অর্জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না। যার অত টাকা সে এসব করবে কেন? কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছে তা তো সত্যি।

তিনকড়ি বলল, “চোরাকাঠের সন্ধানে এসেছিলাম, অ্যাডমিনে খোঁজ পেলাম। তুমি অবশ্য মাইনেটা পাবে না অর্জুন, তবে চেষ্টা করব যাতে একটা পুরস্কার সরকার তোমাকে দেয়।”

“হাতি আটকানোর টেন্ডারটা—।”

“সবটাই টোপ। যার লোভ বেশি সেই গেলে। দেখছ তো।”

হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কে!”

তিনকড়ি হাসল। তারপর পকেট থেকে একটা আইডেনটিটি কার্ড বের করে সামনে ধরল। অমল সোম, বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ। অমল সোম বললেন, “কাল সকাল অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অর্জুন। হাতিদের ফেরার আগে প্রীতম সিংকে নিয়ে বের হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সকাল ছটায় রেঞ্জারের জিপ আমাদের নিতে আসবে।”

গয়েরকাটা থেকে যে গাড়িতে করে অমল সোম প্রীতম সিংকে জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন অর্জুন সেটাতেই ফিরছিল। আজ সারাটা সকাল খুব ঝামেলা গেছে। গত রাতের পরিশ্রম এবং উত্তেজনার পর এখন খুব

শ্রান্ত লাগছে। অমল সোমের কাছে অর্জুন জেনেছে কী দীর্ঘ সময় কত অভিনয় করে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সুযোগের জন্য। অর্জুন যদি ওঁর সঙ্গে সহযোগিতা না করত তাহলে হয়তো এ-যাত্রায় এই রহস্য ভেদ করা যেত না। তিনি কী করে এতটা জেনেছেন তা বলছিলেন না। শুধু অনবরত অর্জুনের প্রশংসা ওঁর মুখে। রেঞ্জারও নাকি গোড়া থেকে সাহায্য করেছেন।

পুলিশের জিপটা ছুটছিল। তিস্তার ব্রিজ দূরে দেখা যাচ্ছে। যতই হোক মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল অর্জুনের। প্রথম চাকরি করতে এসে কপালে সইল না। টাকাগুলো হাতে পেলে কাজে দিত। যদিও অমল সোম বলেছেন রিওয়ার্ড সে পাবেই, তবু—। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অর্জুন। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বন্দী প্রীতম সিং এবং অমল সোম। পেছনে চারজন নেপালির সঙ্গে সে। কিন্তু তার নজর সেই নেপালিটির পায়ের দিকে। গত সন্ধ্যায় কত কুচকুচে কালো হয়ে ছিল চামড়াটা, এখন তো তেমন দেখাচ্ছে না। অনেক ফরসা হয়ে এসেছে। সে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, “ওটা কী হয়েছে?”

ছেলেটি হলুদ দাঁত বের করে হাসল, “কালো হয়ে গিয়েছিল। ওই শেকড় তিনদিন ঘষলেই পরিষ্কার হয়ে যায়।”

অর্জুন উত্তেজিত হল, “তোমার কাছে ওই শেকড় আছে?”

তার ঝোলা থেকে অনেকখানি বের করে সে দেখাল। অর্জুন বলল, “আমাকে কিছু দেবে?”

ছেলেটি ঘাড় কাত করে অনেকটাই অর্জুনকে দিয়ে দিল। এই চারজনই যে অমল সোমের লোক তা পরে জেনেছে অর্জুন।

কিন্তু শেকড়গুলো হাতে নিয়ে থরথর করে উঠল ওর মন। না, আর একটুও দুঃখ নেই চাকরিটার জন্যে। এমনকী প্রতিশ্রুত পুরস্কার না পেলেও তার কিছু যাবে-আসবে না।

এই শেকড় যদি বুড়িদির মুখের দাগগুলো মিলিয়ে দেয় তার চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী সে পেতে পারে? কোথায় যেন সে পড়েছিল, প্রিয়জনকে খুশি দেখার আনন্দ পৃথিবীর কোনো দামে কেনা যায় না।

খুনখারাপি

দ্রুত পা চালিয়ে গলিটা পেরিয়ে আসছিল অর্জুন। ঠিক সাড়ে-ছটায় কদমতলার মোড় থেকে মিনিবাসটা ছাড়বে। এই সময় বুড়িদি ওকে ডাকল। অর্জুন দেখল বুড়িদি ওর ভাইঝিকে নিয়ে মর্নিং-ওয়াক সেরে ফিরছে। ভোরে হাঁটলে মানুষের চেহারাটা বেশ পবিত্র দেখায়। সেই খুঁটিমারি থেকে আনা শেকড় রস করে লাগিয়ে এখন বুড়িদির মুখ টলটলে দিঘির মতো ছিমছাম, এক ফোঁটা পানা নেই।

“এই সাত-সকালে ব্যাগ ঝুলিয়ে চললি কোথায়?”

“কালিম্পাংয়ে।” অর্জুন হাসল।

“ওমা, তাই নাকি! কেন রে? চাকরি পেয়েছিস?” বুড়িদি উদ্গ্রীব হল।

“না। অমলদা যাচ্ছেন তাই। যদি ভাগ্যে থাকে জুটেও যেতে পারে।”

“ও, অমলবাবুর সঙ্গে তোর এখন খুব ভাব হয়েছে, তুই গোয়েন্দা হয়ে যা। এই ধর শার্লক হোমস্ কিংবা ফেলুদা। খবরদার বগু হবি না!” চোখ পাকাল বুড়িদি।

মিনিবাসে বসে এই কথাগুলো ভাবছিল অর্জুন। জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে শিলিগুড়ির পথে ছুটছে গাড়ি। এই সকালে মোটেই ভিড় নেই। ওদের সামনে দুজন মোটাসোটা মানুষ নাক ডাকছেন। ঘুম থেকে উঠে এটুকু পথ এসেই আবার কী করে যে ঘুমিয়ে পড়লেন কে জানে। ঘুম ছোঁয়াচে নয়, অসময়ে কাউকে ঘুমোতে দেখলে বিরক্তি আসে। ওপাশে আর একটি লোক ওর দৃষ্টি টানছিল। চকচকে জুতো, চাপা কালো প্যান্টের ওপর দাবার বোর্ডের মতন কোট আর মাথায় কাউবয় টুপি পরে লোকটা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। মুখের একফালি দেখতে পাচ্ছে সে। খুব রহস্যজনক ভঙ্গি। এই ধরনের মানুষই অপরাধী হয়। অবশ্য অপরাধ না ঘটলে অপরাধীকে খোঁজার কোনো মানে হয় না। অর্জুন দেখল বাইরের আকাশ চমৎকার সূর্যের প্রথম আলো এত নরম যে সবকিছু সুন্দর দেখাচ্ছে। তার চাকরি দরকার। কিন্তু চাকরি না করে সে যদি গোয়েন্দা হয়ে যেত তাহলে—! অমলদা নিজে খুব

ভাল গোয়েন্দা ! কিন্তু এখনও সরকারি চাকরি করেন। এদেশে শুধু গোয়েন্দাগিরি করে বেঁচে থাকা নাকি মুশকিল। রোজ-রোজ মক্কেল পাওয়া যায় না। কিন্তু খুঁটিমারি রেঞ্জের ঘটনার পর থেকে অর্জুন এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে।

গাড়িটা চলতে শুরু করা মাত্রই অমল সোম ব্যাগ থেকে বই বের করে মুখের সামনে ধরেছিলেন। এবার চাপা গলায় বললেন, “ওপাশের লোকটার দিকে অত তাকাতে হবে না। সিকিমিজরা একটু ইয়াক্সি প্যাটার্নের সাজ পছন্দ করে।” অর্জুন একটু হেঁচট খেল। সে এতক্ষণ লোকটাকে নেপালি ভাবছিল, সিকিম নেপাল এবং ভুটানের মানুষদের চেনা খুব মুশকিল। অথচ অমলদা একবারেই বলে দিলেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “ও যে সিকিমিজ কী করে বুঝলেন?”

“চেহারাও বলে দেয়। নেপালিরা সাধারণত খাটো হয়, চোখ ও নাক ফোলা। ভুটানিদের শরীর মোটার দিকে, লম্বা কিন্তু চোখ প্রায় ঢাকা। ওদের নাকও বেশ ছড়ানো। সিকিমিজদের নাক সাধারণত তীক্ষ্ণ, ছিমছাম লম্বা শরীর, চোখ ছোট কিন্তু ফোলা নয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে কিন্তু এই লোকটির ক্ষেত্রে ভুল হয়নি।” অমল সোম কথাগুলো বলে আবার বইয়ে ডুবে গেলেন। অর্জুন আড়চোখে দেখল বইটি রামকৃষ্ণ কথামৃত। আজ অবধি কোনো গল্পের গোয়েন্দাকে ওই বই পড়তে দেখেনি সে।

জলপাইগুড়ি থেকে কালিম্পংয়ে আসতে সাড়ে-চার ঘণ্টা সময় লাগে। সেবক ব্রিজ অবধি চেনা পথ অর্জুনের, তারপর যত মিনিবাসটা ওপরে উঠতে লাগল তত ওর রোমাঞ্চ বাড়ছিল। কালিবোরা ডাকবাংলোকে ডান দিকে রেখে পাহাড়টাকে লাটুর লেঙির মতো পাক খেয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা। নীচে অতলাস্ত খাদ। শুধু একটানা ঝিঝির শব্দ বাসের ইঞ্জিনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। তিস্তাবাজারে এসে ওটা দশ মিনিটের জন্যে থামতেই সবাই নেমে পড়ল চা খেতে। অর্জুন দেখল সেই সিকিমিজ ছেলেটি কিন্তু নামল না। টুপিতে চোখ ঢেকে জানলায় মাথা এলিয়ে রয়ে গেল আসনেই।

বাইরে পা দিতেই বেশ গর্জন কানে এল। ওপাশে একটা সাঁকোর তলা দিয়ে তিস্তা ছুটে নামছে। অমল সোম বললেন, “আটঘড়ির বন্যার সময় এই এলাকাটা তলিয়ে গিয়েছিল জলের তলায়। ভাবতে পারো?”

চায়ের গরম গ্লাস হাতে নিয়ে অর্জুন ঝুঁকে নদীটাকে আবার দেখল। অন্তত তিরিট ফুট নীচে জল। ওই নদী এত উচুতে উঠবে বিশ্বাস করা মুশকিল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে কিন্তু মোটেই কনকনে নয়। বেশ কিছু ঘরবাড়ি দোকানপাট রয়েছে এখানে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে। অমল সোমের জন্যেই ওর এই বেড়ানোটা হচ্ছে। সাতদিনের ছুটি কাটাতে অমল সোম কালিম্পংয়ে যাচ্ছেন। জলপাইগুড়িতে থাকলে রোজ সন্কেবেলায় গুঁর বাড়িতে আড্ডা বসে ওদের।

ব্যাচেলার মানুষ অমল খুব খাওয়াতে ভালবাসেন। এই লোকের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে কিনারা করতে পারে না অর্জুন, কাঠচোর ধরতে গয়েরকাটায় উনি তিনকড়ির ছদ্মবেশে কী করে ছিলেন। অমল সোমই বলেছিলেন, “চল আমার সঙ্গে, দিন-সাতেক বই তো নয়।” তারপর জুড়েছিলেন, “আমার এক বন্ধু আছে কালিম্পংয়ে। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ও চেষ্টা করলে তোমার একটা চাকরি হয়েও যেতে পারে।” চাকরি না গোয়েন্দাগিরি, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে অর্জুনের এবারের কালিম্পং যাত্রা।

চায়ের গ্লাস দোকানি ছোঁড়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বাসের দিকে তাকাতেই অর্জুন দেখতে পেল একটা লোক হনহন করে এসে বাসে উঠে পড়ল। লোকটার হাতে ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ। কিন্তু সে এক মিনিটও ভেতরে রইল না। যেমন এসেছিল তেমন ভঙ্গিতে বাস থেকে নেমে চলে গেল ওপাশে। একটা দোকানের আড়ালে তার শরীর মিলিয়ে গেল। না, এবার ভুল হয়নি অর্জুনের। এই লোকটাও নির্যাত্ত সিকিমিজ। অমলদার বর্ণনামতো মিলিয়ে নিয়েছিল সে। কিন্তু লোকটা ঢুকলই বা কেন আর বেরিয়েই বা এল কেন? চলে যাওয়ার সময় ওর হাতে কোনো ব্যাগ ছিল না। তার মানে ওটা হাতবদল হয়েছে। চকিতে ওর মনে সেই সিকিমিজ ছেলেটি ভেসে উঠল। এই লোকটির হাঁটাচলা খুবই সন্দেহজনক। যেন কিছু তাড়া করেছিল ওকে। কথাটা অমলদাকে জানাতে যেতেই খুব জোরে হর্ন বাজতে লাগল। বাস ছাড়বে, কণ্ডাক্টর চৈচাচ্ছে। ওরা তড়িঘড়ি ফিরে এল যে যার আসনে। অর্জুন দেখল সেই সিকিমিজ ছেলেটির ভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি। এবং তার কোলের ওপর ছোট্ট চামড়ার ব্যাগটা পড়ে আছে অবহেলায়। অর্জুন লজ্জা পেল। ওই ব্যাগটায় দামী বা গোপনীয় কিছু থাকলে লোকটা ওইভাবে ফেলে রাখত না। বাস চলতে শুরু করলে সে একসময় প্রকৃতির মধ্যে ডুবে গেল।

কালিম্পং শহরের বাসস্ট্যান্ডে ওরা যখন পৌঁছল তখনও রোদ ওঠেনি, কুয়াশা ছড়িয়ে আছে চারধারে। অথচ স্ট্যান্ডের ঠিক পাশেই পাহাড় কেটে গড়া ফুটবল মাঠটায় ছেলেরা বেশ প্র্যাকটিস করছে। ঠাণ্ডা তেমন কিছু নয়, হাফ-হাতা সোয়েটারেই বেশ কাজ চলে যাচ্ছে। সবাই যখন বাস থেকে নামছে তখন অর্জুনের দৃষ্টি সেই সিকিমিজ লোকটিকে খুঁজছিল। কী আশ্চর্য! লোকটা উধাও হয়ে গেল নাকি! কালিম্পংয়ের বাসস্ট্যান্ডে আসবার আগেই কোথাও নেমে গেছে সে খেয়াল করেনি। অমল সোমের এদিকে নজর নেই। তিনি বললেন, “কালিম্পং রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় জায়গা ছিল। ওঁর বন্ধু গ্রাহামসাহেবের নামে একটা স্কুল আছে এখানে। বিষ্টুর সঙ্গে দেখা হলে এসব জানতে পারবে। আরে, ওই যে বিষ্টুসাহেব এসে গেছেন।” কথাটা শেষ করেই হাত নাড়লেন অমল সোম।

অর্জুন দেখল বেশ রোগা, খাটো এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন হাসিমুখে।

সুট-টাই এবং কনুইয়ে ঝোলানো লাঠিতে কেমন যেন বেমানান দেখাচ্ছে ওঁকে। সামনে আসতেই অমল সোম এক পা এগিয়ে বললেন, “আমি জানতাম আপনি আসবেন এবং এইমাত্র আপনার কথা বলছিলাম, তাই অনেকদিন বেঁচে থাকবেন। কেমন আছেন?”

“আমি তো কখনও খারাপ থাকি না। ওয়েলকাম টু কালিম্পং! মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গী ইনি? আমার নাম বিষ্ণুচরণ পত্রনবীশ। কালিম্পংয়ে সবাই অবশ্য বিষ্ণুসাহেব বলে ডাকে।” হাত বাড়িয়ে দিলেন বিষ্ণুসাহেব এমন ভঙ্গিতে যে অর্জুন তাড়াতাড়ি সেই হাত স্পর্শ করেই ছেড়ে দিল।

অমল সোম বললেন, “ওর নাম অর্জুন। খুব ভাল ছেলে। খুঁটিমারি রেঞ্জে আমায় খুব সাহায্য করেছিল। একটা চাকরির দরকার ওর।”

“হয়ে যাবে ভাই।” সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করলেন বিষ্ণুসাহেব। আর অর্জুন অবাক হয়ে গেল। লোকটা ফোরটোয়েন্টি নাকি! কত ক্ষমতাবান লোকের কাছে সে চাকরি চেয়েছে কিন্তু অতি পরিচিত সেই ব্যক্তির কখনোই এমন কথা বলতে পারেনি, আর ইনি তো তাকে চেনেন না। অমল সোম হাসলেন, “অর্জুন, অবাক হয়ে না। বিষ্ণুসাহেব হলেন কালিম্পংয়ের মুকুটহীন রাজকুমার। বাঙালি দেখলেই উনি কিছু না কিছু উপকার করবেনই। ক’দিন থাকলেই সেটা টের পাবে।”

বিষ্ণুসাহেব বিদ্যুদ্গতি বিনয় দেখালেন না, গম্ভীর মুখে বললেন, “আমি খুব লজ্জিত সোমবাবু, আজকের দিনটা আপনাদের কষ্ট করতে হবে।”

“কী ব্যাপার?”

“সার্কিট হাইস বুক করে রেখেছিলাম কিন্তু বিহারের একজন মিনিস্টার এসেছেন বলে এস ডি ও রিকোয়েস্ট করেছেন আজকের দিনটা ওঁকে ছেড়ে দিতে। কাল সকালেই আপনারা ওখানে শিফট করবেন। আজকে একটু কষ্ট করে প্রধানের ওখানে থাকতে হবে।” বিষ্ণুসাহেবকে বিমর্ষ দেখাল।

অমল সোম হাসলেন, “ঠিক আছে, আপনি অত বিব্রত হবেন না।”

প্রধানের হোটেল বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া। প্রধান হলেন একজন নেপালি ব্যবসায়ী, হোটেল ছাড়া ট্রান্সপোর্ট বিজনেস আছে। বিষ্ণুসাহেবকে দেখে এগিয়ে এলেন তাঁর অফিস ছেড়ে, “আপনার গেস্ট এসে গেছেন! ঠিক আছে, আর এ কাঙ্ক্ষা, এত্তা আইজা, ছিটো।”

ঘুরপাক খাওয়া সিঁড়ি বেয়ে ওরা যে ঘরটায় পৌঁছল সেটি খুব ভাল নয় তবে পরিষ্কার। জানলা দিয়ে খেলার মাঠটা দেখা যায়। দুটো খাট পাশাপাশি, অ্যাটাচড বাথে জল আছে। বিষ্ণুসাহেবকে অমল সোম বিদায় করে স্নান করতে ঢুকিয়েছিলেন। অর্জুনের ইচ্ছে করছিল না মোটেই। সে জানলার ধারে চেয়ার নিয়ে রাস্তা দেখছিল। সন্ধ্যা একটা রাস্তা বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে এই হোটেলের গা ঘেঁষে নীচে নেমে গেছে। রাস্তাটার দুধারে নানা রকম অদ্ভুত

জিনিসের দোকান। এইগুলো জলপাইগুড়িতে দেখা যায় না। মানুষের হাঁটা, চলা, পোশাক, এমনকী তাকানোর ভঙ্গিতেও কত পার্থক্য। মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে না এবং ক্রমশ শীত বাড়ছে। খিদে পেয়েছে বেশ। হঠাৎ ওর চোখ বেশ নাড়া খেল। সেই সিকিমিজ ভদ্রলোক চটপটে পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। ওর দৃষ্টি দুপাশের বাড়িগুলোর গায়ে ঝোলানো সাইনবোর্ডের ওপর। অর্থাৎ নতুন লোক, ঠিকানা খুঁজছে। তারপর প্রধানসাহেবের ট্রান্সপোর্ট অফিসের হদিস পেয়ে নিশ্চিত মুখে ঢুকে গেল ভেতরে। বছর-তিরিশ বয়স হবে এবং মুখের ভঙ্গিতে বেশ শীতল কাঠিন্য আছে। প্রধানের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? লোকটাকে কিছুতেই সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

মিনিট-পাঁচেক বাদে প্রধানের অফিস থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, সঙ্গে আর একজন নেপালি। অফিসের সামনে দাঁড় করানো অনেকগুলো জিপের একটায় উঠে বসার পর অর্জুন বুঝতে পারল নেপালি ছেলোট ড্রাইভার। সিকিমিজ ওর পাশে বসার পর জিপটা বেরিয়ে গেল সামনে থেকে।

অমল সোম বাথরুম থেকে বেরিয়ে বললেন, “যত ঠাণ্ডাই হোক, স্নান করার একটা আলাদা চার্ম আছে। তুমি করবে না অর্জুন?”

“আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে নেব। অমলদা, সেই সিকিমিজটা প্রধানসাহেবের কাছ থেকে একটা জিপ ভাড়া করে নিয়ে গেল।”

“কোন সিকিমিজ?”

“সেই যে বাসে টুপিতে মুখ ঢেকে বসেছিল।”

অমল সোম হাসলেন, “তুমি দেখছি লোকটাকে ভুলতে পারছ না!” এমনভাবে কথা শেষ করে চুল আঁচড়াতে লাগলেন যেন আর এ-বিষয়ে কিছু বলার নেই। অবশ্য সত্যি তো কিছু নেই কিন্তু তবু স্বস্তি পাচ্ছিল না অর্জুন। লোকটা সন্দেহজনক।

দুপুরের খাওয়া ওরা একটা রেস্টোরাঁতে সারল। বিল মোটামুটি খারাপ নয়। অর্জুনের খারাপ লাগছিল। অমলদার ওপর নির্ভর করতে খারাপ লাগছে। অথচ তার পকেটে বেশি টাকাও নেই। সে ঠিক করল চাকরি পেলে সে এসব খরচ মিটিয়ে দেবে।

রেস্টোরাঁ থেকে বের হয়ে অমল সোম বললেন, “চলো, একটু হাঁটাহাঁটি করা দরকার।” এক ফোঁটা রোদ নেই অথচ এখন দুপুর। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দুপাশের দোকানপাট বেশ সাজানো। একপাশে পাহাড়ের গায়ে এই শহরের মানচিত্র আঁকা আছে। অর্জুন দেখল, ম্যাপটার বিশেষত্ব হল সমস্ত শহরটার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো সুন্দরভাবে চিহ্নিত করা আছে। ঢালু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা তেমাথায় চলে এল। অমল সোম বললেন, “চলো, এখানে একটা হস্তশিল্পের গ্যালারি আছে, খুব সুন্দর। দেখে আসি।”

অর্জুনের জায়গাটা খুব ভাল লাগছিল। একটা ভাঙা গেট দিয়ে ওরা ওপরে

উঠে এল। দুপাশের খোলা জায়গায় কিছু মুরগি আর ছাগল চরছিল। খানিকটা এগোতেই মনে হল মাঠটা আমচকা শেষ হয়ে গিয়েছে। কাছাকাছি হতেই চোখ জড়িয়ে গেল অর্জুনের। পায়ের নীচে পাহাড় আর পাহাড়। অদ্ভুত নীল ছায়া মেখে সেই পাহাড়গুলো বিমোছে। আর তাদের ফাঁকে-ফাঁকে চিকচিক করছে দুটি ধারা। দুটো নদী দুপাশ থেকে এসে মিলে গেছে ওইখানে। অমল সোম মুগ্ধ চোখে সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, “অপূর্ব না? জলপাইগুড়িতে দাঁড়িয়ে কখনও ভাবতে পেরেছ আমাদের সেই চেনা তিস্তা এখানে কী রকম?”

“তিস্তা?” অর্জুন অবাক হয়ে গেল।

“হ্যাঁ। ও-দুটো হল তিস্তা আর রঙ্গিত। মিলেছে এইখানে আর মিলবার পর তিস্তার মধ্যে রঙ্গিতের নামটা হারিয়ে গিয়েছে।”

এইসময় দুজন টিবেটিয়ান একটা বিরাট ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আর তাঁদের পেছন পেছন বিষ্টুসাহেব। ওদের দেখে হাত নাড়লেন তিনি। তারপর দ্রুত কিছু বলে প্রায় দৌড়ে এলেন কাছে, “আপনাদের আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি কখন থেকে। জলদি হোটেলে চলে গিয়ে জিনিসপত্র প্যাক করে নিন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। ঠিক আছে?”

অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার? তাড়াচ্ছেন কেন?”

“সার্কিট হাউস পাওয়া গেছে। এখন দখল না করলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আমি এই তিব্বতিদের ঘাড় থেকে নামিয়েই হোটেলে আসছি। ঠিক আছে? বলে আর উত্তরের জন্যে না দাঁড়িয়ে লোক দুটোর পেছনে ছুটলেন।

অমল সোম বললেন, “কী অদ্ভুত মানুষ! যাক, প্রধানের হোটেলে থাকবে না সার্কিট হাউসে যাবে?”

অর্জুন বলল, “সার্কিট হাউসে তো শুনেছি ভি আই পি-রা ওঠেন। তাঁরা কেউ এলে আমাদের চলে আসতে হবে না তো?”

“সে দায় বিষ্টুসাহেবের। তবে সেখানে গেলে এই বাজার, দোকানপাট, মানুষজন চাইলেই দেখতে পাবে না। খুব নির্জনে, এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাংলো। আমার পক্ষে ভাল, চুপচাপ রেস্ট নেওয়া যাবে, তোমার কেমন লাগবে তাই বলো?” অমল সোম প্রশ্ন করলেন।

সার্কিট হাউস বোঝা যাচ্ছে পাণ্ডববর্জিত জায়গায়। কিন্তু সেখানে গেলে অমলদা খুশি হবেন এবং বিষ্টুসাহেবের সান্নিধ্যে থাকা যাবে। বিষ্টুসাহেব যখন চাকরি দিতে পারেন তখন তার কথা শোনাই তো ভাল।

প্রধানের জিপে চড়ে ওরা সার্কিট হাউসে চলে এল। বিষ্টুসাহেব আর অমল সোম পেছনের সিটে বসেছিলেন, অর্জুন ড্রাইভারের পাশে। পাহাড়টাকে পাক খেতে খেতে ওরা উঠে আসছিল ওপরে। বিষ্টুসাহেব রিলে করার ভঙ্গিতে রাস্তার পাশে যেসব উল্লেখযোগ্য বাড়ি পড়ছে তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। একটা

বাড়ি দেখিয়ে চাপা গলায় বললেন, “এটা হল গোয়েন্দাদের বাড়ি। চিনাদের আক্রমণের সময় আমাদের হেডকোয়ার্টার্স ছিল। ঠিক আছে?”

অর্জুন চমকে উঠল, বিষ্ণুসাহেবও গোয়েন্দা ছিলেন নাকি! সেটা লক্ষ করে বিষ্ণুসাহেব হাসলেন, “সে বিরাট গল্প। পরে বলব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওই, যে রাস্তাটা ডানদিকে বেঁকে গেছে, ওদিকে পড়বে গৌরীপুর হাউস। ওই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে থাকতেন। বিউটিফুল। ঠিক আছে?”

অর্জুনের বেশ মজা লাগছিল। ‘ঠিক আছে’ শব্দ দুটো ওঁর মুদ্রাদোষ কিন্তু এমন স্বরে উচ্চারণ করেন যে মনে হয় খুব সিরিয়াস।

সার্কিট হাউসে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল অর্জুনের। এদিকটায় মানুষের বাড়িঘর বেশি নেই। সার্কিট হাউসের গেটের পাশেই আর্মির বড় অফিসারের গেট, সেখানে প্রহরী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে। ভেতরের প্যাসেজ দিয়ে অনেকটা এসে গাড়িটা থামতেই অর্জুন চোখের সামনে বিশাল ভ্যালি দেখতে পেল। সবুজ কার্পেট যেন ঢালু হয়ে সুদূরে হারিয়ে গিয়েছে। সার্কিট হাউস জুড়ে নানান ধরনের ফুলের গাছ। একটা গ্র্যান্ডিফ্লোরার গাছ তো ফুলের ভারে নুইয়ে পড়েছে। বিষ্ণুসাহেবকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই চৌকিদার ছুটে এল, “হজুর!”

বিষ্ণুসাহেব বললেন, “সাবলোককো তিন নম্বর কামরামে লে যাও। এস ডি ও সাহেব ফোন কিয়া থা?”

“জি হজুর!”

জিনিসপত্র ঘরে রেখে এসে ওরা বারান্দার বেতের চেয়ারে বসল। সামনের ভ্যালিতে মিলিটারিরা গল্ফ খেলছে। সাদা বলটাকে হিট করা মাত্র উড়ে যাচ্ছে অনেক দূরে। একটু বাদেই কুয়াশা উঠে আসতে শুরু করল নীচের খাদ থেকে। বাংলোর বারান্দা থেকে পিচের রাস্তাটার একটা অংশ আবছা দেখা যায়। পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। অর্জুন প্রথম আবিষ্কার করল গন্ধ কখনও-কখনও জীবন্ত সঙ্গীর মতো নির্জনে কাজ করে। অদ্ভুত মিষ্টি ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ফুলগুলোর শরীর থেকে বেরিয়ে।

বিষ্ণুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “চা চলবে?”

অমল সোম বললেন, “একটু পরে। কিন্তু বিষ্ণুসাহেব, আপনি যে আমাদের এই স্বর্গরাজ্যে নিয়ে এলেন কেউ আবার উৎখাত করবে না তো?”

বিষ্ণুসাহেব চোখ ঘুরিয়ে হাসলেন। ওঁর হাতের লাঠিটা বারান্দার মেঝেতে দুবার শব্দ করল, “আমার ওপর দেখছি আপনার আস্থা নেই। একবার যখন এখানে এসেছেন তখন যাওয়ার ইচ্ছে না হলে কেউ আপনাদের যেতে বলবে না। ঠিক আছে? আমাকে ছটার মধ্যে ক্লাবে যেতে হবে। তার আগে চলুন আপনাদের দূরবিনটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঠিক আছে?”

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে অমল সোম বললেন, “আমি আর কোথাও

নড়ছি না আজ । এরকম জায়গা ছেড়ে স্বর্গেও যেতে রাজী নই । অর্জুন, তুমি বরং বিটুসাহেবের সঙ্গে ঘুরে এসো । ইন্টারেস্ট পাবে ।”

বিটুসাহেব জিপে উঠতে উঠতে বললেন, “তোমার চাকরি চাই ?”

দ্রুত মাথা নেড়ে ওর পাশে বসল অর্জুন । ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে বিটুসাহেব বললেন, “গোয়েন্দাগিরিতে ইন্টারেস্ট আছে মনে হচ্ছে ?”

অর্জুন নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল সম্মতির । বিটুসাহেব বললেন, “গুড । আমি অনেকেদিন থেকে এইরকম ভাবছিলাম । এই কালিম্পং শহরটা ক্রিমিনালে ভরে গিয়েছে । প্রত্যেকদিন দুটো করে ক্রাইম হচ্ছে । পুলিশের সাধ্য কি তার সমাধান করে । তুমি যদি লাইসেন্স নিয়ে এখানে অফিস করে বসো তাহলে দেখবে চাকরির একশো গুণ বেশি রোজগার করবে । ঠিক আছে ?”

অর্জুন প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে গেল । সে একা কী করে এখানে ওসব করবে ? বিটুসাহেব ওর মুখ দেখে হাসলেন, “যতক্ষণ এই শর্মা আছে ততক্ষণ তোমার কোনো চিন্তা নেই । অফিসের ব্যবস্থা আমিই করে দেব । তাছাড়া তোমার অ্যাডভাইসার হিসেবে তো আমি রইলামই । প্রচুর পড়াশুনা করেছি বুঝলে ক্রাইম নিয়ে । ক্রিমিনাল হলে কেউ আমাকে ধরতে পারত না । তার ওপর অমলবাবু আছেন । প্রয়োজনে ওরও সাহায্য পাব আমরা । ঠিক আছে ?”

বেশ মজা লাগছিল অর্জুনের । সে ঘাড় নেড়ে বলল, “একটা চাকরির সঙ্গে ওসব করলে ভাল হত না ?”

বিটুসাহেব বললেন, “ক্রিমিনালদের যেমন দ্বিধায় পড়লে বিপদ তেমনি গোয়েন্দাদের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় । ঠিক আছে ? আচ্ছা, এইটে হল মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট । চিনারা টুস দেওয়ার পর তৈরি হয়েছে ।”

অর্জুন দেখল ওরা মিলিটারি এলাকার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে । রাস্তার দুপাশে নানান বোর্ডে মিলিটারিদের পথনির্দেশ রয়েছে । অস্ত্রধারী জোয়ানরা সতর্ক চোখে ওদের দেখছে । পুরো এলাকাটাই ক্যান্টনমেন্ট । চকচকে পরিষ্কার পথঘাট । অনেকটা উঠে গাড়ি একটা বৌদ্ধমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াতেই বিটুসাহেব বললেন, “এইটেই হল কালিম্পংয়ের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ।”

কিন্তু অর্জুন তখন মুগ্ধ হয়ে মনাস্টারির দিকে তাকিয়েছিল । এই নির্জনে মনাস্টারির ভেতর থেকে ভেসে আসা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ অদ্ভুত আবহাওয়া সৃষ্টি করছে । বিটুসাহেব ওকে নিয়ে প্রথম চারদিক প্রদক্ষিণ করলেন । পাশের খোলা জমিতে অনেক রকম কাপড় টাঙানো আছে । অর্জুন কোথায় যেন পড়েছিল ওগুলো হয় মৃত আত্মাদের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো মানত করার সময় টাঙানো হয় । ভেতরে ঢোকা মাত্র একটা বড় হলঘর দেখতে পেল অর্জুন । জুতো বাইরে রেখে সেই ঘরে ঢুকে প্রথমেই নজরে এল বিশাল বুদ্ধমূর্তি । তাঁর সামনে একটা পদ্ম । দুজন লামা সেই মূর্তির সামনে ধুনো জ্বালছেন । একজন ৬০

লামা সেই বাদ্যযন্ত্রটি বাজাচ্ছেন এক কোণে বসে। অনেক পুঁথি সাজানো আছে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে। বেদির এপাশে অনেকগুলো আসন। বড় থেকে ছোট ওই আসনগুলো পদমর্যাদানুযায়ী। বিষ্ণুসাহেব চাপা গলায় কথাগুলো বললেন। দলাই লামার আসন সবচেয়ে উঁচুতে।

বৃদ্ধদেবের মূর্তিটি বইতে দেখা চেনা বুদ্ধ নয়। একটু যেন রাগী-রাগী, বিষ্ণুসাহেব চাপা গলায় বললেন, “ইনি মহাকাল। চিনারা যখন তিব্বতে ঢুকে পড়েছিল তখন লামারা এই মূর্তিটিকে বিভিন্ন খণ্ডে অত্যন্ত পবিত্রভাবে এদেশে নিয়ে আসে। এখানে তাঁকে আবার জোড়া দেওয়া হয়।”

বিষ্ণুসাহেব কথা শেষ করে মাটিতে প্রায় শুয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। অর্জুন দেখাদেখি হাত জোড় করে নমস্কার জানাতে গিয়ে মন পালটাল। একটা লোক শুয়ে প্রণতি জানাচ্ছে আর সে দাঁড়িয়ে? কেমন ধৃষ্টতা হয়ে যাচ্ছে। প্রায় বাধ্য ছেলের মতো সে বিষ্ণুসাহেবের পাশে শুয়ে পড়তেই চাপা গলা কানে এল, “তুমি আমি যেখানে শুয়ে আছি তার তলায় পঞ্চাশ কোটি টাকার হিরে রাখা আছে।”

হাতের তালুর নীচে ঠাণ্ডা মোজায়েক করা মেঝে কিন্তু আচম্বিতে মনে হল সেটা ছাঁক করে উঠল। বিষ্ণুসাহেব বললেন, “কথা নয় আর, বাইরে চলো।”

ওরা চুপচাপ মনাস্টারি ছেড়ে বেরিয়ে এল। বেশ হিম বাতাস বইছে এখন। অর্জুন বিষ্ণুসাহেবের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, “কেমন দারুণ ব্যাপার, না? কোটি কোটি টাকার হিরের ওপর শুয়ে এলাম। আমি এখানে এলেই তাই একবার শুয়ে নিই। ঠিক আছে?”

অর্জুন এবার না বলে পারল না, “না, ঠিক নেই।”

বিষ্ণুসাহেব চোখ ছোট করলেন, “নেই মানে? বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা?”

“খামোকা অত টাকার হিরে ওখানে থাকবেই বা কেন?”

যেন অবোধ শিশুর সঙ্গে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে হাসলেন বিষ্ণুসাহেব, “দলাই লামা যখন এদেশে চলে আসেন তখন কত ধনরত্ন সঙ্গে এনেছিলেন তা জানো? জানো না! এদিক দিয়ে যে সব লামারা এসেছিলেন তারা ওই হিরে সঙ্গে এনেছিলেন। সব বৌদ্ধমঠের সম্পত্তি। ভারত সরকার সেগুলো সীমান্তেই আটকে দেয়। কিন্তু বৌদ্ধরা প্রাণ থাকতে ওই দেবতার সম্পত্তি হাতছাড়া করতে রাজী হল না। রক্তারক্তি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে দেখে সরকার একটা চুক্তি করলেন। ওই হিরে কোনোভাবেই দেশের বাজারে যাতে না যায় তার ব্যবস্থা হল। এই দূরবিন পাহাড়ের ওপর এমন চমৎকার মনাস্টারি তৈরি করে দিলেন সরকার। ঠিক হল মনাস্টারির মেঝের নীচে একটা ইম্পাতের ভন্টে ওই হিরেগুলো রাখা থাকবে। দেবতার জিনিস তাঁর সামনেই রইল। কিন্তু ওই ইম্পাতের ভন্ট কখনও খোলা যাবে না। ঠিক আছে?”

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল অর্জুন। একবার মনাস্টারির দিকে ভাল করে তাকাল সে। কেউ বুঝতে পারবে না ওখানে অতখানি সম্পদ লুকনো রয়েছে।

কিন্তু খবরটা যখন বিটুসাহেব জানেন তখন আরও অনেকেই জানেন। অথচ কোনো গার্ড বা সতর্কতা চোখে পড়ছে না কেন?

বিটুসাহেব বললেন, “চলো, আমরা সানসেট দেখি। ঠিক আছে?”

সূর্য তো ওঠেইনি আজ চোখের সামনে তো অস্ত যাবে কী! তবু ঊঁর পেছনে যেতে যেতে অর্জুন প্রশ্ন করল, “এইভাবে এত হিরে রয়েছে, বিপদটিপদ হতে পারে না?”

“না।” খুব দ্রুত পুতুলের মতো মাথা নাড়লেন বিটুসাহেব। দশ ইঞ্চি পুরু ইম্পাতের দেওয়াল মাটির নীচে বসে কাটা যায় না। যদি কেউ সে চেষ্টা করে তাহলে ওই ইম্পাতে কোনো মেটাল ছোঁয়ানো মাত্র অ্যালার্ম বেল বেজে উঠবে। লামারা এমনিতে খুব শাস্ত কিন্তু বুদ্ধের কোনো ক্ষতি ঊঁরা প্রাণ থাকতে সহ্য করবেন না। যে আসবে তাকে জীবন্ত ফিরতে হবে না। তার ওপর এই পাহাড়ের চূড়াকে ঘিরে রয়েছে বিরাট মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। এখানে আসতে হলে ওদের চোখের সামনে দিয়ে দীর্ঘপথ উঠে আসতে হবে। কারও বুদ্ধের পাটা নেই এখানে এসে ডাকাতি করে। ঠিক আছে?”

হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। অর্জুন নিশ্চিত হল, এখানে কখনও কোনো বিপদ ঘটবে না। বেশ ছায়া নেমে গেছে চারধারে। যেহেতু ওরা পাহাড়ের চূড়ায় তাই নীচের অন্ধকার ওপরে উঠে আসেনি। মনাস্টারির পিছনে বিশাল মাঠ। বোধহয় মিলিটারিরা এখানে খেলাধুলা করে কিন্তু একটা হেলিপ্যাড আছে বলে মনে হচ্ছে। সত্যি জায়গাটা বেশ সুন্দর।

ওরা যখন গাড়ির কাছে পৌঁছল তখন মনাস্টারি থেকে মন্ত্রসঙ্গীত ভেসে আসছে। যতদূর শব্দ যাচ্ছে ততদূর যেন পবিত্র হয়ে উঠছে। অর্জুন ঠিক করল এখানে রোজ একবার করে আসবে। সার্কিট হাউস থেকে হেঁটে আসতে মিনিট কুড়ির বেশি লাগবে না।

গাড়িতে বসে বিটুসাহেব বললেন, “তাহলে আমার প্রস্তাবটা ভেবে দ্যাখো। অমলবাবুর সঙ্গে আলোচনা করো। বুঝলে হে, কালিম্পংয়ে ক্রিমিনালরা থিকথিক করছে। তুমি আমি মিলে সবকটাকে পুঁটিমাছের মতো টপাটপ ধরতে পারি। ঠিক আছে?” সার্কিট হাউসের গেটে অর্জুনকে নামিয়ে বিটুসাহেব ক্লাবে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন পারলে রাত্রে একবার খোঁজ নিতে আসবেন। ভদ্রলোককে বেশ লেগেছে অর্জুনের। একটু মেয়েলি গলায় কথা বলেন আর ওই ‘ঠিক আছে’ জিজ্ঞাসাটা অস্বস্তিকর ঠেকলেও মানুষটা ভাল।

সার্কিট হাউসে আলো জ্বলছে। প্যাসেজ দিয়ে ফুলের গন্ধ মেখে হেঁটে এল অর্জুন। ভীষণ চুপচাপ চারধার। সন্ধে হতেই ঠাণ্ডা দাঁত বসাতে শুরু করেছে। এমনকী চৌকিদারটাও বাইরে নেই। অর্জুন বাংলোর বারান্দায় উঠে দেখল চেয়ার খালি, অমল সোম নেই।

ঘরের দরজা বন্ধ, সেখানে একটা তালা ঝুলছে। তালায় গায়ে ছোট্ট একটা

চিরকুট। অবাক হয়ে কাগজটা খুলে নিয়ে বারান্দায় জ্বালানো আলোর তলায় এসে ভাঁজ খুলল অর্জুন, “ঘুরে আসছি। চৌকিদারের কাছে গিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি নিও।”

অমল সোম এরকম চিরকুট রেখে কোথায় গেলেন বুঝতে পারল না অর্জুন। বিকেলেও বলেননি যে উনি বের হবেন। তাছাড়া এই পাণ্ডুবর্জিত জায়গায় যাওয়ার মতো—, অবশ্য বেড়াতে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে সঙ্গে হলেই ফিরে আসার কথা। অর্জুন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসল। অন্ধকারেও বোঝা যায় সামনের ভ্যালিটা কুয়াশায় সাদা হয়ে গেছে। গাছের শরীরে হাওয়ারা ফিসফিসানি শব্দ তুলছে। গ্রাণ্ডিফ্লোরার গন্ধে যখন নিশ্বাস ভারী হয়ে উঠল তখনও অমল সোম ফিরলেন না।

শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্জন বলেই অর্জুনের অস্তিত্ব শুরু হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে সে বাগানের প্যাসেজ দিয়ে চৌকিদারের ঘরের কাছে চলে এল। দরজা বন্ধ। ডাকতে গিয়ে পায়ের আওয়াজ পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। গেট পেরিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মূর্তিটা। আলোর তলায় এলেই অর্জুন স্পষ্ট দেখতে পেল। বেশ লম্বা মহিলা, টিবেটিয়ান কিংবা সিকিমিজ। পরনে পা ঢাকা ছুঁয়া। দুটো হাত ভাঁজ করে বুকের নীচে রেখে এগিয়ে আসছেন। অর্জুন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই ভদ্রমহিলা দেখতে পাননি। পাশ দিয়ে যখন উনি ডানদিকের বাংলোর বারান্দায় উঠে গেলেন তখন চমকে উঠল অর্জুন। এ মুখ সে দেখেছে। ভদ্রমহিলাকে খুব চেনা লাগছে তার অথচ ঐকে আগে কখনও দেখেনি। এটা কী করে সম্ভব হয়! তারপরেই কারণটা ধরা পড়ে গেল তার কাছে। আজ জলপাইগুড়ি থেকে আসার সময় মিনিবাসে কিংবা প্রধানের অফিসের সামনে যাকে সে দেখেছিল এই মহিলার মুখের সঙ্গে তার মুখের কোনো ফারাক নেই। সাদৃশ্য এতখানি যে, অবাক হতে হয়। কিন্তু বাসের সন্দেহজনক লোকটি পুরুষ আর ইনি হলেন পুরোপুরি মহিলা। নকল সাজ যে নয় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাহলে? সাদৃশ্য বলে যেটাকে মনে হচ্ছে তা দুজনেই সিকিমিজ বলে নয় তো? মঙ্গোলিয়ান মুখ তো একইরকম হয়।

বেশ উত্তেজিত হয়ে চৌকিদারকে ডাকতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল অর্জুন। আর একজন আসছে। একটু লেংচে লেংচে, আপ্যাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। আলোর নীচে এলেও ঠিক বুঝতে পারল না অর্জুন। লোকটা আর একটু এগিয়ে এসে বাঁ দিকের বাংলোর দিকে ঘুরে যেতেই সজাগ হল সে। ওটা তো তাদের আস্তানা। লোকটা ওখানে যাচ্ছে কেন? সে নিঃশব্দে পিছু নিল। লোকটা লেংচে লেংচে ততক্ষণে বারান্দায় উঠে একটা চেয়ার টেনে সশব্দে বসে পড়ে মাথা থেকে শার্শাটা খুলে ফেলল। আর অর্জুন এমন ঠকে যাওয়াটা নিঃশব্দে হজম করল কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন

ভঙ্গিতে বারান্দায় উঠে জিজ্ঞাসা করল, “অমলদা, আপনার পায়ে কী হয়েছে?”

অমল সোম বললেন, “পড়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি কতক্ষণ এসেছ?”

“বেশ কিছুক্ষণ! আপনি বের হবেন বলেননি তো।”

“হঠাৎ মনে হল ঘুরে আসি তাই ঘুরে এলাম। তা কী কী দেখলে?”

অর্জুন বলল, “দূরবিন পাহাড়ের ওপর একটা বৌদ্ধদের মন্দির আছে। সেই মন্দিরের তলায় কোটি কোটি টাকার হিরে রাখা হয়েছে।”

“হিরে?” অমল সোম সোজা হয়ে বসলেন, “বিটুসাহেবের কাছে শুনেছ?”

“হ্যাঁ। কেন, উনি কি মিথ্যে বলবেন?”

“জানি না, তবে বলার তো কোনো কারণ নেই।” অমল সোমকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। অর্জুন সেটা লক্ষ করে বলল, “অবশ্য হিরে যেভাবে রয়েছে তাতে কারও সাধ্য হবে না ওগুলোকে স্পর্শ করা। ইম্পাতের ভন্ট, অ্যালাম বেল, লামা এবং মিলিটারি—এতগুলো বাধা কে টপকাবে।”

অমল সোম বললেন, “বিরাট বাহিনী ঘিরে রেখেছিল, পাশে স্ত্রী পাহারা দিয়েছিল তবু লোহার বাসরে ছিদ্র খুঁজে পেয়েছিল সাপ। তাই না?”

অর্জুনের মনে চট করে লখিম্দের-বেহুলার ঘটনাটা ভেসে এল। সত্যি কথা। আর তখনই সে কথাটা বলে ফেলল, “জানেন অমলদা, একটু আগে এখানে একজন মহিলাকে দেখলাম, ভুটানিদের মতো ছুশা পরা, কিন্তু মুখখানা অবিকল সেই লোকটার মতো। যাকে বাসে দেখেছিলাম, সিকিমিজ!”

অমল সোম হাসলেন। তারপর উঠে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে চলে গেলেন। এইভাবে তার কথার গুরুত্ব না দেওয়াতে বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছিল অর্জুন। তার মনে পড়ল এই অমলদা যখন তিনকড়ি ছিল তখন সে কেমন ধমকাতে পারত। যেই লোকটা খোলস ছাড়ল সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

মিনিট-খানেক ঠাণ্ডায় থেকে ওর মাথায় আর একটা মতলব খেলে গেল। সার্কিট হাউসের অফিসঘরে যে খাতাটা আছে সেখানে নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলার নাম লেখা হয়েছে। কারণ, বিটুসাহেব ওকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় ওদের হয়ে কাজটা করে গিয়েছিলেন। অর্জুন উঠল। বাগানের প্যাসেজ দিয়ে নিঃশব্দে সে সার্কিট হাউসের অফিসঘরের বারান্দায় উঠে এল। দরজা বন্ধ, ঘর অন্ধকার। চৌকিদার নিশ্চয়ই চাবি দিয়ে কোথাও গেছে। অর্থাৎ এইটে আজ জানা যাবে না।

রাত্রের খাওয়া খানসামা পৌঁছে দিয়েছিল ঘরে। মুরগির মাংস আর রুটি। খাওয়াদাওয়া শেষ করে কস্বলের তলায় ঢুকে পড়েছিল ওরা। পাশের খাটে ৬৪

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে অমল সোম কথামৃত পড়ছেন। আজকে হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি কম হয়নি। তবু ঘুম আসছিল না অর্জুনের। বিষ্টুসাহেবের কথা মনে পড়ছিল। উনি চাকরির বদলে এখানে গোয়েন্দা হয়ে থাকতে বলছেন। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কিন্তু গোয়েন্দা হতে হলে তো নিশ্চয়ই কিছু ট্রেনিং দরকার হয়। না হলে তো সবাই গোয়েন্দা হয়ে যেত। দূর, তার চেয়ে ছোটখাটো একটা চাকরি করে সে মাকে টাকা পাঠাতে পারত আর অবসর সময়ে এইসব করত— সেটাই ভাল ছিল। বিষ্টুসাহেবটা গুলবাজ নিশ্চয়ই। যে এক কথায় সার্কিট হাউস ব্যবস্থা করে দিতে পারে সে তাকে যে কোনো চাকরি দিতে পারে না! আসলে কাটিয়ে দেবার মতলব আর কি! কিন্তু কালিম্পংয়ে নাকি ক্রিমিনাল থিকথিক করছে। কিন্তু তাদের একজনেরও তো সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না এখনও।

বাইরে শব্দ হচ্ছে টুপটাপ। কাচের জানালায় ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। অর্জুনের মনে হল আকাশের অনেকটা কাছাকাছি আসায় বিদ্যুতের জেল্লা আরও বেড়ে গেছে। আর তারপরেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। অর্জুন নাক অবধি কম্বলে ঢেকে পদরি ফাঁক দিয়ে আকাশটা দেখছিল। হঠাৎ মনে হল বিদ্যুতের ঝলকানি বুঝি বাগানে নেমে এসেছে। অস্পষ্ট জলের ধারার ওপর পড়ে একটু একটু করে বাড়ছে। তারপরেই ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। একটা গাড়ি এসে থামল বারান্দার নীচে এবং তার হেডলাইট এখনও জ্বলছে।

দরজায় নক হল। অমল সোম বই বন্ধ করে অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলেন। এই ঠাণ্ডায় কম্বলের আরাম থেকে বের হতে অর্জুনের একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু এত রাত্রে আর আগন্তুকটিকে দেখার আগ্রহে সে অমল সোমের পিছু-পিছু হলঘরে এল। আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলতেই মনে হল বাইরে মহাপ্রলয় শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। আর বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে বিষ্টুসাহেব একগাল হাসলেন, “আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ, জানে তা কি এ কালিম্পং?”

অমল সোম খুশি হয়ে বললেন, “আপনি?”

“উত্তরটা দিয়ে দিলাম। আমাদের বৃদ্ধ এসব উত্তর অনেক আগেই রেখে গেছেন। এই যে মেঘের আওয়াজ আর আলোয়-আঁধারে যে রঙের খেলা, এইসব নিয়েই তো বেঁচে থাকা। কেমন আছেন দেখতে এলাম। ঠিক আছে?” বিষ্টুসাহেব ঘরে ঢুকলেন।

অর্জুনের মনে পড়ল সন্ধ্যাবেলায় উনি বলে গিয়েছিলেন রাত্রে একবার দেখা করে যাবেন। তাই বলে এত রাত্রে! ভেতরে এসে বসলেন বিষ্টুসাহেব, “আপনাদের খাওয়াদাওয়া চুকে গেছে তো?”

কথাটা শেষ করলেন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে। তাই সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

“তাহলে তিনটে কাপ নিয়ে এসো । কফি খাই ।” অর্জুনের নজরে পড়ল বিষ্টুসাহেবের কাঁধে একটা ফ্লাস্ক ঝুলছে ।

কফি খেতে খেতে অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, “বাড়িতে ভাবছে না ?”

“না । ভাববার তো কেউ নেই, তাই না । অনেক আগেই আসতাম এখানে । ক্লাব থেকে বেরিয়ে বাজারের সামনে দিয়ে আসতে গিয়ে দেখলাম এক বাঙালি ভদ্রলোক ফ্যামিলি নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন । কোনো হোটেলে জায়গা পাচ্ছে না । ওদের তুলে নিলাম গাড়িতে, তারপর নানান জায়গায় চেষ্টা করে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল !” মাথা নাড়লেন বিষ্টুসাহেব, “আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ির একটা ঘর তিনি মাঝে মাঝে ভাড়া দেন । সেখানে ওঁদের তুলতেই বাঙালি ভদ্রলোক আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, তিনি সেখানে থাকতে পারবেন না । ঠিক আছে ?”

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “কেন ?”

“পায়ের তলায় ছ-ইঞ্চি কার্পেট, দেওয়ালে ফ্রেসকো দেখে ঘাবড়ে গিয়েছেন ভদ্রলোক । তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্যে আসছি এখানে, দেখতে পেলাম একটা জিপ পাহাড়ের গায়ে কাত হয়ে রয়েছে । অ্যাকসিডেন্ট, তবে কেউ আহত হয়নি । একটি সিকিমিজ ছেলে আমার কাছে লিকট চাইল । বলল, আমেরিকায় থাকে, এখানে বেড়াতে এসেছে । কিন্তু মশাই, সার্কিট হাউসের সামনে জিপ স্লো হয়েছিল সেই ফাঁকে কখন পেছন থেকে টুক করে নেমে গেছে । এমন অকৃতজ্ঞ যে ধন্যবাদটুকু দিল না । ভিজুক ব্যাটা বৃষ্টিতে, আমেরিকায় আর যেতে হবে না । ঠিক আছে ?”

কফির কাপ রেখে অমল সোম সোজা হয়ে বসলেন, “আপনি ঠিক দেখেছেন ছেলোটি সিকিমিজ ?”

“হ্যাঁ মশাই । ওতে আমার ভুল হয় না । আমি টিবেটিয়ানে ডক্টরেট করেছি তা নিশ্চয়ই জানেন ।” বেশ চটে গেলেন বিষ্টুসাহেব ।

“কিন্তু মানুষ মাত্রেরি ভুল হয় !” অর্জুন উত্তেজিত গলায় বলল ।

“ধ্যাত, লোকটার সঙ্গে আমি কথা বললাম, ভুল হবে কী করে !”

অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানে কোথায় উঠেছে কিছু বলল ?”

“না তো । কেন বলুন তো ?”

“কী-রকম পোশাক পরেছিল ?”

“কালো টাইট জিন্স, শার্টস্, তার ওপর দাবার বোর্ডের মতো কোট আর মাথায় একটা কাউবয় টুপি । লাইফ ম্যাগাজিনে যেমন দেখি আর কি । ঠিক আছে ? বিষ্টুসাহেব সন্দেহের গলায় এবার প্রশ্ন করলেন ।

“না, এবার বোধহয় ঠিক নেই বিষ্টুসাহেব ।” অমল সোম বললেন, “আপনার মনে হচ্ছে সার্কিট হাউসের সামনে এসে সে গাড়ি থেকে নেমেছে, তাই তো ? কিন্তু আগে যে নামেনি তা বুঝলেন কী করে ?”

“কারণ তার একটু আগেও আমি সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছিলাম । টিপিক্যাল । কিন্তু ব্যাপারটা কী মশাই ! রহস্য আছে মনে হচ্ছে ? লোকটা কি ক্রিমিনাল ?” বিটুসাহেব চেয়ারটাকে আর একটু সামনে টেনে আনলেন ।

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন, “অর্জুন, তুমি গুঁকে ব্যাপারটা বলো । আমি ঘুরে এসে বাকিটা বলব ।” ওদের বিস্মিত করে অমল সোম ভেতরে চলে গেলেন । এবং পরমুহূর্তেই একটা বর্ষাতিতে সর্বাঙ্গ ঢেকে নিঃশব্দে বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেলেন ।

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল অমল সোমের সঙ্গে যায় । ও নিশ্চিত জানে সেই লোকটা এই সার্কিট হাউসেই এসেছে এবং ওই মহিলার কাছেই । বিটুসাহেব না থাকলে সে অমল সোমের সঙ্গী হত । বিটুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “কেসটা কী একটু খুলে বলো তো ?”

অর্জুন তখন সকাল থেকে দেখা ঘটনাগুলো পরপর বলল । সব শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন বিটুসাহেব, “মাই গড । তোমাদের মাথাফাখা খারাপ হয়ে গেছে বোধহয় । একটা লোককে বাসে দেখেছ, তিস্তাবাজারে আর একজন তাকে কিছু দিতে পারে, প্রধানের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া করতে সে এসেছিল, ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্রিমিনাল ভাবলে ? আরে পোশাক দেখে কি মানবচরিত্র ঠাওর করা যায় আজকাল ? আর এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওর চেহারার মিল ? এক হাজার প্রায় একই রকম দেখতে ভুটানি, নেপালি, সিকিমিজ কিংবা টিবেটিয়ান আছে । প্রত্যেকে প্রত্যেকের আত্মীয় ? তোমরা ভাই সর্বের মধ্যে ভূত দেখছ । ঠিক আছে ?”

অর্জুন একটু চুপসে গেল । সত্যি তো, একটা লোককে দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল । শুধু এইটুকু সম্বল করে কাউকে ক্রিমিনাল ভাবা অন্যায় । কিন্তু লোকটা বিটুসাহেবকে না বলে জিপ থেকে নেমে গেল কেন ? এইসময় সর্বাঙ্গে বৃষ্টি মেখে অমল সোম ফিরে এলেন । বর্ষাতিটা খুলে বারান্দায় রেখে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানকার থানায় আপনার কেমন প্রভাব আছে বিটুসাহেব ?”

“থানা ? দার্জিলিঙের এস পি, ডি এস পি আমাদের দাদা বলে ডাকে । থানার দারোগা আমায় দেখলেই নমস্কার করে । কেন ?”

“বেশ । আপনার ইনফ্লুয়েন্স আমাদের দরকার হতে পারে । আপনি কি এখনই বাড়িতে ফিরছেন ।” অমল সোম গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ।

“এত রাতে আবার কোন্ চুলোয় যাব ! কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো ! এই রহস্যটুকু না শুনলে আমার ঘুম হবে না ।”

“আপনি যাকে লিফ্ট দিয়েছেন সে আমাদের পাশের বাংলোয় এসেছে । এসেই ব্যাটা ড্রিংক করতে বসেছে এবং তাই ভদ্রমহিলা খুব রাগারাগি করছেন । মনে হচ্ছে আজকের রাতে কালিম্পংয়ে বেশ বড়সড় গোলমাল হবে ।”

“ভদ্রমহিলা ? এর মধ্যে ভদ্রমহিলা আসলেন কোথেকে ?”

“কেন ? আপনাকে অর্জুন বলেনি ?”

“হ্যাঁ । কিন্তু এরা ক্রিমিনাল তার প্রমাণ কী ?”

অমল সোম বললেন, “বিকেলে আপনারা চলে গেলেন এখানে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না । ভাবলাম বাগানে একটু পায়চারি করি । গ্রাণ্ডফ্লোরার গাছগুলোর তলা দিয়ে খানিকটা এগোতেই মানুষের গলা শুনতে পেলাম । ইংরেজিতে কথা বলছিল ওরা । খুব চাপা গলায় । বলার ধরন দেখে সন্দেহ হল । আমি ওদের টের পেতে দিলাম না । মহিলা বলছিলেন, ‘আর একটা দিন অপেক্ষা করা দরকার ।’ সঙ্গীটি তাতে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ‘সেটা খুব ঝুঁকি হয়ে যাবে । যে কোনো মুহূর্তে সুডঙ্গটা লোকের চোখে পড়ে যেতে পারে ।’

“মহিলা হতাশ গলায় বলেছিলেন, ঠিক আছে । তাহলে আজ রাত একটায় তাঁরা তৈরি থাকবেন । ওঁর ভাই মাল নিয়ে হাজির হয়ে গেছে । এই কথাগুলো শুনে আমি সোজাপথ দিয়ে না ফিরে ওই গলফ মাঠে নেমে গেলাম ।”

অর্জুন উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করল, “তখনই কি আপনার পায়ে লেগেছিল ?”

“না, লাগেনি । মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় ফিরতেই ওই মহিলাকে দেখে ইচ্ছে করে লেংচে হাঁটছিলাম । এবার সব পরিষ্কার হয়েছে ?” অমল সোম ষড়ি দেখলেন ।

বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “সঙ্গের লোকটা কি ওই ছোঁড়া ?”

“না । এ মধ্যবয়সী ।”

“কিন্তু মতলবটা কী ওদের ? সুডঙ্গ করেছে কেন ?”

“জানি না । তবে যদি সম্ভব হয় আপনার দারোগাকে এখান থেকে ফোন করুন না । আপনি কিছু বলবেন না, যা বলবার আমি বলব ।” অমল সোমের কথা শেষ হতে বিষ্টুসাহেব উঠলেন । হলঘরের একপাশে স্ট্যান্ডের ওপর টেলিফোন রাখা ছিল । ওঁকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল । রিসিভার তুলে নাশ্বার ঘুরিয়ে বললেন, “কী, বলেছিলাম না, কালিম্পিংয়ে ক্রিমিনাল থিক-থিক করছে ।”

তারপর কানেকশান পেয়ে বললেন, “কে, রাইসায়েব ? আমি বিষ্টু । হ্যাঁ-হ্যাঁ ভাল আছি । কী করছেন ? বাড়ি ফিরছেন ! হ্যাঁ, জোর বৃষ্টি পড়ছে । আমি সার্কিট হাউস থেকে বলছি । আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে কথা বলবেন । ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস । নিন ধরুন ।”

অমল সোম এগিয়ে গিয়ে সিরিভারটা নিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে চাপা গলায় খানিকক্ষণ কথা বলে হাসিমুখে ফিরে এলেন, “এই দারোগাটিকে বেশ স্মার্ট মনে হচ্ছে । আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন । তা বিষ্টুসাহেব, বেশ রাত হয়েছে, আপনি আর দেরি করবেন না । বৃষ্টি আজ রাত্রে থামবে বলে মনে হচ্ছে না ।”

বিটুসাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন, “মানে ? আমি বাড়ি যাব মানে ? এত বড় একটা নাটক অভিনীত হবে সামনে আর আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমোব ? অ্যাম আই কাওয়ার্ড ? আমি আজ ফিরছি না, ঠিক আছে ?”

অর্জুনের মনে হল অনেকক্ষণ বাদে উনি ঠিক আছে শব্দ দুটো বললেন ।
বোধ হয় নার্ভাস হয়ে গেলে মুদ্রাদোষটি বন্ধ হয়ে যায় ।

অমল সোম বিব্রত গলায় বললেন, “বেশ । কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া ।”
“দরকার নেই । কফিই যথেষ্ট ।”

অমল সোম বললেন, “তা কি হয় ? অর্জুন, দ্যাখো তো খানসামার কাছে কিছু পাওয়া যায় কি না । ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে যাও ।”

অর্জুন চট করে উঠে পড়ল । এতক্ষণের কথাবার্তায় ওর শীতের আলসেমিটা চলে গিয়েছিল । এই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে হাঁটার একটা আলাদা মজা আছে । পাজামা গুটিয়ে নিয়ে বর্ষাতিটায় শরীর এবং মাথা ঢেকে সে বিটুসাহেবের আপত্তি সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ল । বাতাস নেই কিন্তু বৃষ্টির তেজ মারাত্মক । শরীরে জলের ধারা যেন আছড়ে পড়ছে । মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের বলসানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে । কোনোরকমে খানসামার ঘরের কাছে এসে দেখল দরজা বন্ধ এবং ভেতরে কোনো আলো জ্বলছে না । সবাইকে খাইয়ে লোকটা নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে । এই অবস্থায় ওকে ডেকে তুলে খাবার চাওয়াটা অমানবিক হবে । অর্জুন চারপাশে তাকাল । অদ্ভুত গা-ছমছমে অন্ধকার বৃষ্টিমাথা গাছগুলোর শরীরে । এমনকী প্যাসেজের আলোগুলোকে পর্যন্ত ভুতুড়ে মনে হচ্ছে বৃষ্টির ধারায় । কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসতে গিয়ে ওর চোখ ডানদিকের বাংলোর ওপর পড়ল । একটা ঘরের জানলা আলোমাথা, বাকিটা অন্ধকার । খুব কৌতূহল হল অর্জুনের । নিঃশব্দে ও গাছের ফাঁক গলে বারান্দায় উঠে এল । সবকটা দরজা-জানলা বন্ধ । দেওয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে সে জানলাটার কাছে পৌঁছে গেল । ভেতরের পর্দা বোধহয় ছোট, নইলে এক পাশে সামান্য ফাঁক থাকত না । অর্জুন সতর্ক চোখে ভেতরটা দেখল । মহিলা একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন । এখন তাঁর পরনে ছুন্সার বদলে কালো প্যান্ট আর সোয়েটার । সেই বাসের লোকটা তাঁর পাশে বসে একটা টুলের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে রিভলভার নিয়ে খেলা করছে । উলটো দিকে আরও দু’জন মোটা মধ্যবয়সী বসে । এদের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না অর্জুন । ওদের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা বড় বাস্ক খোলা । হঠাৎ দাবার ছক-মার্কা কোট পরা লোকটি চেষ্টা করে কিছু বলে উঠল । বৃষ্টি এবং জানলা বন্ধ থাকায় অর্জুন কিছুই শুনতে পেল না । উলটো দিকের লোকটা কপালে হাত দিয়ে কিছু বলতেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন । ওঁকে খুব অস্থির দেখাচ্ছিল । অর্জুনের মনে হল দাবার ছক এমন কিছু করেছে যার জন্যে এরা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছে । হঠাৎ তার নজরে পড়ল মহিলা দরজার দিকে আসছেন । আর দেরি

না করে সে নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে দ্রুত একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। একটু বাদেই দরজা খুলে গেল। মহিলা অলস হাতে চুল ছুঁয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বাঁ দিকে চোখ ফিরিয়ে যেন সজাগ হলেন। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে বৃষ্টির আড়াল সরিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করে চাপা গলায় একটা নাম ধরে ডাকতেই মোটা লোকদের একজন বেরিয়ে এল। হাত দিয়ে অর্জুনদের বাংলাটাকে দেখিয়ে দিলেন মহিলা। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মনে হল যে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা ওই বাংলাটা লক্ষ করছে কেন? ঘর থেকে কি মহিলা তাকে জানলায় দেখেছেন? মহিলার কথা শুনে মোটা লোকটা ঘরে ফিরে গিয়ে একটা ওয়াটারপ্রুফ পরে প্যাসেজে নেমে পড়ল। মহিলা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন, অতএব ঝোপের আড়াল ছেড়ে অর্জুন বাইরে আসতে পারছিল না। লোকটা সোজা চলে গেল বাংলার সামনে। হয়তো বৃষ্টির জন্যেই অর্জুন বের হবার পরে সোম দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভেতর থেকে, তাই বাইরে আলো আসছিল না। অর্জুন দেখল মোটা লোকটা বারান্দায় না উঠে সামনে দাঁড় করানো গাড়িটায় উঠে বসল। বিটুসাহেবের গাড়িতে ও কী করছে? বিকেলে যখন বিটুসাহেব গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন তখন ড্রাইভার ছিল। এখন কি ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন? একটু বাদে মোটা লোকটা গাড়ি থেকে নেমে ফিরে এল। বারান্দায় উঠতেই মহিলার উদ্গ্রীব মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ওকে!”

মহিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মোটা লোকটির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভেতরে চলে যেতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুন আর দাঁড়াল না। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে গাড়িটার পাশে পৌঁছে ভেতরে মুখ ঢোকাল। চাবিটা লাগানো আছে। কিন্তু পেছনের সিটে একটা লোক শুয়ে আছে। লোকটা বিটুসাহেবের ড্রাইভার। কিন্তু এমনভাবে ঘুমিয়ে আছে যে অর্জুন চাপা গলায় ডাকতেও তার ঘুম ভাঙল না। অর্জুন লোকটার শরীরে হাত দিয়ে ঠেলতে একটা পা সিট থেকে পড়ে গেল। আঁতকে উঠল অর্জুন। লোকটা মরে যায়নি তো! ওই মোটা লোকটা যখন গাড়িতে উঠেছিল তখন নিশ্চয়ই ড্রাইভার ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে খুন করে গিয়ে ‘ওকে’ বলল না তো! অর্জুন ধীরে ধীরে ড্রাইভারের নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে দেখল নিশ্বাস পড়ছে। সে আর দাঁড়াল না। এক লাফে বারান্দায় উঠে দরজা ঠেলতেই অমল সোম বললেন, “কী, খাবার পাওয়া গেল না?”

অর্জুন দ্রুত মাথা নেড়ে দরজা ভেজিয়ে বর্ষাতি খুলতে খুলতে এক নিশ্বাসে সব কথা খুলে বলতে বিটুসাহেব তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন, “কী! আমার ড্রাইভারকে খুন করেছে?”

অর্জুন বলল, “না, খুন করেনি, অজ্ঞান করে রেখেছে।”

বিটুসাহেব তখনি দেখবার জন্যে ছুটছিলেন, কিন্তু অমল সোম তাকে বাধা

দিলেন, “উত্তেজিত হবেন না বিষ্টুসাহেব, বসুন ।”

“বসব ? আমার ড্রাইভার সেমলেস আর আমি বসব ?”

“হ্যাঁ । আমার কথা শুনুন । ওদের মনে হচ্ছে জিপটা দরকার । ওই ছোকরার বোধহয় জিপ নিয়ে আসার কথা ছিল। অ্যাকসিডেন্ট করে এদের প্ল্যান ভেঙে দিয়েছিল বলে মহিলা উত্তেজিত হয়েছিলেন । কিন্তু এরা এফিসিয়েন্ট, পেশাদার, নইলে জিপে উঠে ঘুমন্ত ড্রাইভারকে নিঃশব্দে অজ্ঞান করতে পারত না । অজ্ঞান করে জিপেই রেখে দিয়েছে যাতে যদি আমরা এখন বের হই তাতে কিছু টের না পাই । আমরা যে টের পেয়েছি তা ওদের বুঝতে দেওয়া ঠিক হবে না । ওরা আপনার জিপটা নিয়ে কাজে বের হবে ।” অমল সোম বললেন ।

“আমার জিপ নিয়ে ক্রাইম করবে ?” বিষ্টুসাহেব আঁতকে উঠলেন ।

“ওদের তাই হচ্ছে । এটা করতে দিতে হবে ।”

“কিন্তু আমার ড্রাইভার যদি মরে যায় ?”

অমল সোম অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ড্রাইভারকে উন্ডেড বলে মনে হল তোমার ? রক্ত পড়ছে ?”

“না রক্ত দেখিনি । চুপচাপ পড়েছিল পেছনের সিটে ।”

“তাহলে ওকে না দেখার রিস্ক নিতেই হবে । ক’টা বাজল ?”

“বারোটা বেজে গেছে ।”

“ঘরের আলো নিবিয়ে দাও অর্জুন ।”

অর্জুন সুইচগুলো টিপতেই বাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেল । মিনিট পনেরো ওরা চুপচাপ বসে থাকল । অর্জুনের মনে পড়ল দারোগাবাবু আধঘণ্টার মধ্যেই আসবেন বলেছিলেন কিন্তু এখনও আসছেন না কেন ? প্রশ্নটা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করতে অমল সোম বললেন, “ওঁর এখানে আসার কথা নয় । আমাদের জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করবেন ।”

আরও কিছুক্ষণ পরে অমল সোম জানলায় দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললেন, “আসছে !”

বিষ্টুসাহেব উঠলেন না । অর্জুন লক্ষ করছিল উনি কেমন যেন চুপসে গিয়েছেন কিছুক্ষণ থেকে । অর্জুন অমল সোমের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল সেই মোটা লোকটা সটান গাড়ির মধ্যে উঠে গিয়ে ড্রাইভারকে টানতে টানতে বের করে পাঁজাকোলা করে ফুল্গাছের মধ্যে শুইয়ে দিল । তার পর গাড়িতে উঠে হেডলাইট না জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে ব্যাক করে নিয়ে গেল জিপটা । ডানদিকের বাংলোর সামনে সেটা দাঁড়াতেই বাকি তিনজন চটপট জিপে উঠে পড়ল । ওদের প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু জিনিস রয়েছে । হেডলাইট না জ্বেলেই জিপটা বাগানের ভেতর দিয়ে উঠে গেল ওপরের রাস্তায় ।

ওরা চোখের আড়াল হতেই অমল সোম দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলেন ।

তারপর সেই বৃষ্টির মধ্যেই নেমে গেলেন বাগানে। অর্জুনও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নীচে নামল। শীতল জলের ধারায় শরীর চমকে উঠেছিল ওর। অমল সোমের সঙ্গে ধরাধরি করে ড্রাইভারকে বারান্দায় তুলে আনতেই সে উঃ আঃ করতে লাগল। বিটুসাহেব ঝুঁকে পড়ে ঘন ঘন ডাকতে লাগলেন, “এ পদম, পদম বাহাদুর !”

ডাকের জোরেই বোধহয় ড্রাইভার সাড়া দিল, “জি !”

“রামরো হুঁ ?”

মাথা নাড়ল ড্রাইভার। হ্যাঁ সে ভাল আছে। অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন, “চলুন, ওকে ভেতরে নিয়ে যাই, সময় নষ্ট করা চলবে না।”

বৃষ্টিতে ভিজ়ে বোধহয় ড্রাইভারের চৈতন্য দ্রুত ফিরে এসেছিল। তাকে আর বেশি সাহায্য করতে হল না। বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে সে ঠিক হয়ে যাবে। ভেতরের ঘর থেকে একটা কন্সল এনে অমল সোম লোকটিকে বললেন ভেজা জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলতে। তারপর অর্জুনকে বললেন, “চলো। ওয়াটারগ্রুফটা পরে নাও।”

বিটুসাহেব বলে উঠলেন, “সে কী ! আমি বাড়ি না গিয়ে এখানে রইলাম কেন ? নো নো, আমাকে সঙ্গে নিতে হবে। তা ছাড়া আমি আর অর্জুন মিলে ভবিষ্যতে ইনভেস্টিগেশন সেন্টার খোলার প্ল্যান করেছি যখন তখন আমার যাওয়া দরকার।”

অর্জুন কী মনে করে বিটুসাহেবকেই ওয়াটারগ্রুফটা পরতে দিল। একটার বেশি নেই যখন তখন সেটা পরা অস্বস্তিকর। তা ছাড়া বৃষ্টিতে এর মধ্যেই ভেজা হয়ে গেছে। বিটুসাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে সেটা পরতে পরতে বললেন, “খুব লজ্জা লাগছে, তোমরা পরছ না আর আমি—, খুব লজ্জা লাগছে। ঠিক আছে ?”

ড্রাইভারকে দরজা বন্ধ করতে বলে ওরা বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। চিনচিনে ঠাণ্ডায় বিটুসাহেব বললেন, “ফ্যান্টাস্টিক !”

উত্তেজনা স্থান-কাল-পাত্রকে ভুলিয়ে রাখে। অর্জুন এই শীতের রাতে জল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অমল সোমের পাশাপাশি হাঁটছিল। বিটুসাহেব পেছনে থেকে বলে উঠলেন, “ওদের ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আর এই হতভাগা দারোগাটা আসবে বলেও এল না, কী দায়িত্বজ্ঞানহীন।” বড় রাস্তায় উঠে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াতেই একটা জিপের শব্দ কানে এল। খুব কাছেই পাহাড়ের আড়ালে সেটা যেন ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল, ওদের দেখেই হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে এল। সামনে এলে ভেতর থেকে একজন বলে উঠলেন, “নমস্কার বিটুসাহেব, উঠে পড়ুন।”

বিটুসাহেব গলাটা চিনতে পেরে বেশ উষ্ম গলায় বললেন, “ইশ, এতক্ষণে আসার সময় হল ? আর কিছু আগে এলেই—।”

দারোগাবাবু বললেন, “বাঃ, আমাকে তো এখানেই অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে আছি।”

গাড়িতে উঠে অমল সোম নিজের পরিচয় দিতে দারোগাবাবু হাত মেলালেন, “আরে আপনার নাম জানি মশাই। রিসেন্টলি সেই কাঠচুরির কেসটা আপনি ধরেছিলেন তো?”

অমল সোম বললেন, “একা আমি নই, এও ছিল।” বলে অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন। অর্জুন দেখল দারোগাবাবু ছাড়াও গাড়িতে আরও চারজন পুলিশ রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার বলুন তো?”

অমল সোম বললেন, “একটু আগে সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে একটা জিপ কোনদিকে গিয়েছে দেখেছেন?”

“হ্যাঁ। বাঁ দিকে।”

অর্জুনের হৃদপিণ্ড সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। ওইদিকেই তো দূরবিন পাহাড়, বৌদ্ধমন্দির, কোটি-কোটি টাকার হিরে।

অমল সোম বললেন, “খুব সাবধানে ওইদিকে গাড়িটা নিয়ে চলুন। পথে যদি জিপটাকে দেখতে পান তাহলে উপেক্ষা করবেন?”

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “ওই জিপে কারা আছে?”

এবার অমল সোম যতটা পারেন খুলে বললেন ঘটনাগুলি। এমনকী অর্জুন অবাক হল শুনে, তিস্তাবাজারে ব্যাগ বদল হওয়ার ঘটনাটাও বাদ দিলেন না অমল সোম। শুনতে শুনতে দারোগাবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, “আপনি আগেই ওদের ধরতে চাইলেন না কেন?”

“তাহলে কিছুই প্রমাণ করা যেত না। আমার স্থির বিশ্বাস ওরা বৌদ্ধমন্দিরের তলায় আজ রাতে ঢুকবে।” অমল সোম বললেন।

এবার বিষ্টুসাহেব কথা বললেন, “ইম্পসিবল। দশ ইঞ্চি পুরু ইম্পাতের দেওয়ালে মেটাল ছোঁয়ালেই সমস্ত কালিম্পং জেগে উঠবে।”

অমল সোম বললেন, “হয়তো। কিন্তু অসম্ভব শব্দটা বুদ্ধিমানদের অভিধানে নেই। দেখাই যাক না।”

অর্জুনের হাসি পাচ্ছিল এর মধ্যেই। অমল সোম কথাটা বেশ ঘুরিয়ে বললেন, অসম্ভব শব্দ শুধু মূর্খের অভিধানেই পাওয়া যায়। এতে অবশ্য বিষ্টুসাহেবকে মূর্খ বলা হল না। জিপটা খুব সুন্দর, শব্দ হচ্ছে না। হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টিধারা দেখা যাচ্ছে। এবং এই পথে ওই আলো না জেলে এক পা এইসময়ে এগিয়ে যাওয়া যায় না। অর্জুন দেখল মিলিটারিদের এলাকা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই বৃষ্টিতেও এত জওয়ান পাহারায় আছে। ওদের জিপের আলো দেখে হাত তুলল একজন। দারোগাবাবু গাড়িটা থামতেই বর্ষাতি পরে একজন ছুটে এল, “কাঁহা জায়েগা?”

“মনাস্টারি ! পুলিশ । ”

লোকটা এবার জিপটাকে এবং বোধহয় দারোগাকেও চিনতে পেরে মাথা নাড়ল, “উও জিপ থোড়া পহেলে গিয়া !”

“কৌন জিপ ?”

“জিসমে বড়া লামা আয়া রুমটেকসে !”

দারোগা তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অমল সোম চাপা গলায় বললেন, “না । এখন থাক । ”

গাড়িটা পাহাড়ি পথ বেয়ে আর একটু ওপরে উঠতেই মন্দির দেখা গেল । কারণ এখন আচমকাই, সুইচ টিপে আলো নেবানোর মতোই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল । রাত্রের আকাশটাকে মেঘেরা ধুয়েমুছে সাফ করে রেখেছিল । তার গায়ে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল মন্দিরটাকে ।

অমল সোম বললেন, “গাড়িটাকে এখানেই রাখুন । ওপরে নিয়ে গেলে ওরা টের পেয়ে যাবে । ”

ওরা গাড়ি থেকে টপাটপ নেমে পড়ল । বিষ্ণুসাহেব অর্জুনের কানের কাছে বললেন, “সঙ্গে অস্ত্র আছে তোমার ?”

অর্জুন ঘাড় নাড়ল, “না । ”

“আমারও নেই । এ যেন অহিংস আক্রমণ হচ্ছে ! ঠিক আছে । ”

অর্জুন ঘাড় নাড়ল । হ্যাঁ, সত্যি কথা । সঙ্গে একটা অস্ত্র থাকলে ভাল হত । মনে বেশ জোর আসত ।

দারোগাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে অমল সোম সোজা পথ ছেড়ে পাকদণ্ডী ধরলেন । বেশ খাড়া পথ, তার ওপর বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পেছল হয়ে গেছে । অর্জুনের তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না কিন্তু বিষ্ণুসাহেব পারছিলেন না । শেষ পর্যন্ত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি যদি সোজা পথে উঠি তাহলে কি খুব অসুবিধে হবে ?”

অর্জুন বলল, “বোধহয় ওরা দেখতে পেয়ে যাবে । ”

বিষ্ণুসাহেব হতাশ গলায় বললেন, “আমার ফিগার তো দেখবার মতো নয় !”

অর্জুনের কথাটা শুনে এমন বিষম লাগল যে শব্দটা চাপতে পারল না । দারোগা ধমকে উঠলেন, “সাইলেন্স !”

আরো খানিকটা ওঠার পর জিপটাকে দেখতে পেল ওরা । রাস্তার পাশে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে । ওরা যদি পাকদণ্ডী বেয়ে না উঠত তাহলে চোখে পড়ার কথা নয় । চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বোঝা গেল জিপে কেউ নেই । অমল সোম বিষ্ণুসাহেবকে চাপা গলায় বললেন, “কিছু মনে করবেন না, আপনার জিপটাকে একটু অকেজো করে দিতে হবে । ”

মাথা নিচু করে এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে অমল সোম জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন । তারপর জিপের বনেট খুলে কীসব করে ওদের ইশারা করলেন চলে

আসতে । একে একে সেই ভঙ্গিতে ওরা রাস্তাটা পেরিয়ে এল । বোঝা যাচ্ছে এখানে জিপ রেখে দলটা হেঁটে গেল ।

অমল সোম বললেন, “সবার একসঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই । দারোগাবাবু, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, বাকিরা এখানেই লুকিয়ে থাক । প্রয়োজন পড়লে আপনি হুইস্‌ল বাজালে যেন হেল্প পাই ।”

বিটুসাহেব বললেন, “সেই ভাল । অস্ত্রহীন হয়ে এগোনো বোকামি ।”

পুলিশরা যে যার জায়গা নিয়ে নিল । অমল সোমরা গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় অর্জুন বলল, “অমলদা, আমি যাব ।”

অমল সোম কী বললেন বোঝা গেল না কিন্তু অর্জুন সঙ্গ নিল । বেশ খানিকটা যাওয়ার পর আচমকা খোলা পাহাড় । ওরা দেখল প্রায় মন্দিরের নীচে এসে গেছে ওরা । কিন্তু কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই । ওপাশে ভুতুড়ে আলো জ্বলে কালিম্পং ঘুমুচ্ছে । ওরা সেই খেলার মাঠটার গায়ে এসে পড়েছিল । দারোগাবাবু বললেন, “এগোবেন ?”

অমল সোম ইশারা করলেন, না । কোনো অস্বাভাবিক জিনিস চোখে পড়ছিল না ওদের । চার-চারটে লোক একসঙ্গে উধাও হয়ে যেতে পারে না । এদিকটা এত খোলা যে কেউ নড়লেই চোখে পড়বে । ওরা কি এতখানি ঝুঁকি নেবে । অথচ জিপ রেখে ওরা তো এই পথেই এসেছে । মিনিট-পাঁচেক জঙ্গলের গায়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর অর্জুন সতর্ক হয়ে অমল সোমকে স্পর্শ করল । একটা লোক কোথায় ছিল কে জানে, হঠাৎ খোলা আকাশের তলায় বেরিয়ে এসে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিয়ে আবার উধাও হয়ে গেল ।

দারোগাবাবু বললেন, “চলুন ।”

অমল সোম বললেন, “না । আর একটু দেখি । ওখানে কি কোনো প্যাসেজ আছে ? ন্যাড়া পাহাড় ছাড়া কিছু নজরে পড়ছে না তো !”

দারোগাবাবু বললেন, “আমিও বুঝতে পারছি না ।”

আরও মিনিট-পাঁচেক যেতেই সেই লোকটাকে দেখা গেল । তেমনি সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বাইরে এসে দেখে নিচ্ছে ধারে-কাছে কেউ আছে কি না । একবার পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়েও ধরাল না । তারপর আবার ভেতরে ঢুকে গেল । তৎক্ষণাৎ অমল সোম দৌড়তে শুরু করলেন । দারোগাবাবু এবং অর্জুন পিছু নিল । ঢালু পথ বেয়ে দৌড়ে যেতে যেতে অর্জুন দেখল দারোগাবাবুর হাতের মুঠোয় রিভলভার ।

লোকটা যেখানে দেখা দিয়েছিল সেখানে পৌঁছে ওরা দেখল মোটা সিমেন্টের পাইপ ঐক্যে নীচে চলে গেছে । সেই পাইপের একটা জোড় থেকে খানিকটা খুলে বাইরে রাখা আছে । বোঝা গেল লোকটি ওই বিশাল পাইপ থেকেই বেরিয়ে আসছে পাঁচ মিনিট অন্তর ।

কাছাকাছি আড়াল বলতে একটা বিরাট পাথরের চাঁই, ওরা দ্রুত পায়ে

সেখানে পৌঁছে গেল। অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, “এটা কিসের পাইপ?”

“ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়ার জন্যে পাতা হয়েছিল কিন্তু একজন মামলা করায় এখনও কানেকশন দেওয়া হয়নি।”

“খাওয়ার জলের পাইপ এত বড়?”

“খাওয়ার এবং চাষের। আশপাশের সমস্ত গ্রামে জল সাপ্লাই করার পরিকল্পনা হয়েছিল। এরা দেখছি তার মধ্যেই ঢুকেছে। কী করবেন?”

অমল সোম বললেন, “আর একটু অপেক্ষা করুন। এদের আইডিয়া কিন্তু চমৎকার। পাইপের মধ্যে বসে স্বচ্ছন্দে সুড়ঙ্গ খোঁড়া যায়।”

এবার অর্জুন না বলে পারল না, “কিন্তু ইম্পাতের ভন্টে হাত দিলেই তো চারধারে অ্যালার্ম বাজতে থাকবে।”

“হাত না দিয়েও ইম্পাত কাটা যায়। বিজ্ঞান সেটুকু পারে। চুপ!”

অমল সোমের কথা শেষ হওয়া মাত্রই সেই লোকটি বেরিয়ে এল। মাত্র দশ-পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে লোকটা চারপাশে তাকাল। মোটাসোটা লোক যে গাড়ি চুরি করেছিল। এ বোধহয় ওদের পাহারাদার। নিশ্চিত হয়ে লোকটা ঘড়ি দেখল। তারপর পেছন ফিরে যেই ঢুকতে যাবে অমনি অমল সোম উবু হয়ে ছোট নুড়ি কুড়িয়ে একটু ওপাশে ছুঁড়ে দিল। শব্দটা কানে যেতেই লোকটা তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর হাতে এর মধ্যেই একটা চকচকে অস্ত্র উঠে এসেছে। গাড়িয়ে পড়া নুড়িটাকে সতর্ক চোখে দেখল সে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর পায়ে পায়ে খোলা আকাশের নীচে যেন জরিপ করতেই বেরিয়ে এল অস্ত্রটা সামনে ধরে। ওকে দেখেই যেন একটা রাতের পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল আর লোকটি বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। তারপর সামান্য এগিয়ে এসে পাথরের চাঁইটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। এখন ওর ভঙ্গি বেশ নিশ্চিত। অর্জুনরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার তিন-চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল সে। এমন সময় আর একটি কণ্ঠ পাওয়া গেল। সেই ভাকে সাড়া দিল লোকটা, ভঙ্গিটা এমন যে, দাঁড়াও এম্ফুনি যাচ্ছি। অর্জুন দেখল বেড়ালের মতো পা ফেলে অমল সোম পাথরের গা ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল অর্জুনের, কোনো কারণে লোকটা যদি সামান্য মুখ ফেরায় তাহলে অমল সোমকে ঝাঁঝা করে দেবে। নিজের হৃদপিণ্ডের আওয়াজ কানে আসছিল যেন। অমল সোম যখন প্রায় লোকটার পেছনে পৌঁছে গেছেন তখন সেই রাতের পাখিটা চিৎকার করে ফিরে এল। লোকটা মাথা তুলতেই ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত পেল। অত বড় মোটা মানুষটাকে কাটা গাছের মতো পড়ে যেতে দেখল অর্জুন। দারোগাবাবু বললেন, “শাবাশ।” তারপর দৌড়ে গিয়ে অমল সোমের সঙ্গে হাত লাগালেন। ওই ভারী শরীরটাকে টেনে পাথরের এপাশে আনা হল। অর্জুন দেখল লোকটার পিস্তল মাটিতে পড়ে আছে। সেই খুঁটিমারি রেঞ্জের সিংজির ৭৬

রিভলভার হাতে পেয়েছিল সে, গুলি ছোঁড়ার সুযোগ হয়নি। তারপরে এই। অমল সোমের গলা পাওয়া গেল, “ওটা আপাতত রেখে দাও হাতে, ভুল করে আবার ট্রিগারে চাপ দিও না।”

অর্জুন দেখল লোকটির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। অমল সোমের পকেটে যে অতটা নাইলনের দড়ি ছিল তা টের পায়নি সে। এইসময় ভেতর থেকে আবার ডাকটা ভেসে আসতেই অমল সোমের ইস্তিতে দারোগাবাবু চাপা গলায় সাড়া দিলেন। তারপর ওরা তিনজনেই অস্ত্র উচিয়ে পাইপের ভাঙা জোড়টার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেইসময় আর একবার ডাক ভেসে এল। এবার বেশ বিরক্ত গলা। তারপরই পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ এগিয়ে আসছে।

উবু হয়ে একটা মাথা বাইরে বেরিয়ে আসতেই প্রচণ্ড আঘাত, লোকটা কথা বলার সময় পেল না। দারোগাবাবু ওকে টেনে আনলেন বাইরে। অর্জুন দেখল সেই দু'নম্বর মোটা লোকটা। রিভলভারের আঘাতে মাথা থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে ঘাড় গড়িয়ে। আর ঠিক সেই সময়েই সাঁ করে একটা শব্দ হল এবং দারোগাবাবু চিৎকার করে আছড়ে পড়লেন। তারপরেই দ্বিতীয় শব্দ এবং অমল সোমের হাতের অস্ত্র খসে পড়ল। অর্জুন দেখল অমল সোমের হাত থেকে রক্ত পড়ছে। সেই অবস্থায় তিনি দৌড়ে গিয়ে ফিরে গেলেন পাথরের চাইয়ের দিকে, চিৎকার করে উঠলেন, “অর্জুন সরে এসো।”

কিন্তু তখন আরও কয়েকবার শব্দ হয়েছে। ভেতর থেকে কেউ অবিরত গুলি ছুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাইলেন্সার লাগানো থাকায় শব্দ হচ্ছে না। অর্জুন পাইপের ওপরের দিকে ছিল, সেইখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। অমল সোমকে সে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু দারোগাবাবু মোটা লোকটার পাশে শুয়ে এক হাতে কাঁধ চেপে রক্ত সামলাবার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ডান হাতটা দিয়ে পকেট থেকে হুইসল বের করে সজোরে বাজাতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় একজন ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। এক বলকেই অর্জুন দেখে নিল তার সামনে দাবার ছক টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে লম্বা মতন অস্ত্র এবং নিঃসন্দেহে তাতে সাইলেন্সার লাগানো। লোকটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকাল। তারপর চিৎকার করে কাউকে ডাকল। অর্জুন মড়ার মতো পড়ে থেকে দেখল দারোগাবাবু আর নড়ছেন না।

এই সময় দূরের জঙ্গল থেকে পুলিশরা দৌড়ে বেরিয়ে আসতেই দাবার ছক তাদের দিকে অস্ত্রটা উচিয়ে ধরল। দুটো পুলিশ চিৎকার করে পড়ে গেল মাটিতে, বাকিরা ভয়ে দৌড়ে গেল অন্যদিকে। দাবার ছক এবার দৌড়ে নীচের দিকে যেতেই থমকে দাঁড়াল। তারপর সতর্ক ভঙ্গিতে বাঁ দিকে অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে পশুর মতো চিৎকার করে উঠল। অর্জুন বুঝতে পারল লোকটা অমল সোমকে দেখতে পেয়েছে। ইদুরকে থাবায় পেয়ে ধূর্ত বেড়ালের উল্লাস দেখা দিল ওর মুখে। উপুড় হয়ে শুয়ে অর্জুন হাত সামনে প্রসারিত করল। ওর

আঙুলগুলো খুব কাঁপছিল। কিন্তু ট্রিগারে চাপ দিতেই ও নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। গুলিটা দাবার ছকের অস্ত্রে লেগেছে, ছটকে পড়েছে সেটা। ঠিক অরণ্যদেব যেভাবে গুলি ছোঁড়েন। প্রচণ্ড বিস্ময়ে দাবার ছক ওর দিকে ফিরে তাকাল। তারপর নিচু হয়ে অস্ত্রটাকে তুলতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। আর অর্জুন সামনে দাঁড়ানো অপ্রস্তুত লোকটাকে গুলি করতে পারল না। প্রথমবার সে সত্যি মারতে চেয়েছিল কারণ অমল সোম তখন মৃত্যুর দরজায়। কিন্তু লক্ষ্য স্থির না হওয়ায় লোকটার গায়ে গুলি লাগেনি। এখন সরাসরি একটা মানুষকে সে খুন করে কী করে! তা ছাড়া গুলির শব্দ তার কানে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। দাবার ছকের দুটো হাত মাথার ওপরে তোলা। কয়েক মুহূর্ত স্থিরচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে আচমকা লোকটা ছুটতে শুরু করল। আর তখনি গুলির শব্দ হল। ন, অর্জুন ট্রিগারে চাপ দেয়নি। গুলি এসেছে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাওয়া পুলিশদের বন্দুক থেকে। অর্জুন দেখল দাবার ছক আচমকা যেন কিছুটা শূন্যে উঠে গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে আটকে গেল একটা গাছের গুঁড়িতে।

ঠিক তখনি আহত বাঘিনীর মতো বেরিয়ে এলেন মহিলা। তাঁর পোশাক লামাদের মতন, কাঁধে একটা ব্যাগ। বাইরে বেরিয়েই তিনি কিছু একটা ছুঁড়তেই চারধার কঁপে উঠল। জঙ্গলের দিকটায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। তারপরেই মহিলা দৌড়ে নীচে নেমে গেলেন। এই সময় চারদিকে মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। গুলি এবং বিস্ফোরণের শব্দে মন্দিরের লামারা এবং নীচের ক্যান্টনমেন্ট জেগে উঠেছে। অমল সোমের চিৎকার শোনা গেল, “কেউ গুলি ছুঁড়বেন না।”

অর্জুন এগিয়ে এল সামনে। বোঝা যাচ্ছে মহিলা জিপের দিকে যাচ্ছেন। অমল সোম বললেন, “খামোকা একটা মেয়েকে গুলি করে কী হবে। মন্ত্রী গেছে, গজ ঘোড়া গেছে, বেচারী রাজা একা আর কী করবে।”

দারোগাবাবু এক হাতে কাঁধ চেপে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় বেশ কয়েকবার জিপটার ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিল না। হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল ওখানে বিটুসাহেব রয়েছেন। মহিলার সঙ্গে বিস্ফোরক তো আছেই, রিভলভারও থাকতে পারে! বিটুসাহেবের অবস্থা কী কে জানে!

এই সময় নীচের ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিলিটারির গাড়িগুলো সোঁ-সোঁ করে ওপরে উঠে আসছিল। ভোরের আকাশের তলায় লামারা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। ওরা দেখল মহিলা পড়ি-কি-মরি করে জিপ ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে ছুটছেন যে দিক দিয়ে মিলিটারি-পুলিশ আসছে। অমল সোম বললেন, “বেচারী!” তারপর দারোগাবাবুকে বললেন, “পরে সুযোগ পাব কি না জানি না, চট করে ভেতরটা ঘুরে আসি। আপনি ঠিক আছেন তো?”

দারোগাবাবু বললেন, “মনে হচ্ছে। আপনি?”

“সামান্য উন্ডেড । ” তারপর অর্জুনকে ইশারা করে পাইপের ভেতর নেমে গেলেন অমল সোম । অঙ্ককারে কয়েক পা হাঁটার পর আলো দেখতে পেল ওরা । পাইপের অর্ধেকটা মাটিতে ভরে আছে । আলোটা কাচের বাস্কে, সম্ভবত ব্যটারিতে জ্বলছে । সেখানে পৌঁছে ওরা দেখল পাইপটা ফটানো এবং সেখান থেকেই সুড়ঙ্গ শুরু হয়েছে । বোঝা যাচ্ছে মাটি কেটে এই পাইপে রাখা হয়েছে যাতে বাইরে থেকে কেউ টের না পায় । প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা । অর্জুন অবাক হচ্ছিল হাতে আঘাত লাগা সত্ত্বেও অমল সোম এতখানি তৎপর কী করে হলেন । ইটের গাঁথুনির মধ্যে দিয়ে গর্ত এবং তারপরেই ইম্পাতের দেওয়াল । সেখানেও ওই রকম একটা আলো জ্বলছিল । ওরা অবাক হয়ে দেখল ইম্পাতের দেওয়ালে দু'ফুট গোলাকার গর্ত হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে, আর সামান্য কাজ বাকি ছিল । ভেতরের বড় বড় বাস্কের গায়ে আলো পড়েছে ।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা অবাক হয়ে গেল । মিলিটারি পুলিশে ছেয়ে গেছে জায়গাটা । লামারা নেমে এসেছে । দারোগাবাবু একজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন । অমল সোম বেরিয়ে আসতেই দারোগাবাবু ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের । তিনি হাত বাড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে যেতেই অমল সোম বললেন, “ধন্যবাদ, কিন্তু কৃতিত্ব যদি কারো হয় তাহলে তা এই ছেলেটির । ও না থাকলে আমরা এই দলটাকে ধরতে পারতাম না, আমিও বাঁচতাম না । ”

অফিসার সবিম্ময়ে বললেন, “ইজ ইট ?”

অর্জুন মুখ নামাল । মিলিটারি পুলিশরা আহতদের তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে । ওরা জোর করে অমল সোমকেও নিয়ে গেল । অন্তত ফার্স্ট এইড দিয়ে তবে ছাড়বে । দারোগাবাবুকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে ।

লামারা নেমে গেছে পাইপের ভেতরে নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখতে । পুরো এলাকাটা মিলিটারিরা ঘিরে ফেলল দেখতে দেখতে । অফিসার বললেন, “আপনি আমার সঙ্গে চলুন । সমস্ত কথাটা রেকর্ড করতে হবে । শুধু আমি বুঝতে পারছি না, যদি আপনারা আগে থেকেই টের পেয়ে থাকেন এসব হবে, তাহলে আমাদের জানালেন না কেন ?”

অর্জুন বলল, “আমরা আগে থেকে জানতাম না । ”

ওরা কথা বলতে বলতে নেমে আসছিল । রাতের অঙ্ককারকে চটপট মুছে ফেলেছিল ভোরের আলো । হালকা বাতাস বইছে । শীত গায়ে মেখে । এইসময় উচ্চকণ্ঠে শুনতে পেল ওরা, “অর্জুন, অর্জুন । ”

অর্জুন অবাক চোখে দেখল একটা বড় গাছের ডালে কোনোরকমে বসে আছেন বিটুসাহেব । অফিসার চটপট তাঁর রিভলভার বের করতে যাচ্ছিলেন ।

অর্জুন তাঁকে বাধা দিল। “উনি আমাদের লোক। গাইড।”

অফিসার অবাক হলেন, “গাইড তো গাছে কেন?”

বিষ্ণুসাহেব বললেন, “মেয়েছেলেটা যেভাবে বোমা নিয়ে তেড়ে এল, আমি এছাড়া কোনো পথ দেখলাম না। দয়া করে আমাকে নামিয়ে নিন।”

অর্জুন বলল, “নিজে উঠলেন, নামতে পারছেন না কেন?”

বিষ্ণুসাহেব জবাব দিলেন, “ভাই, বুড়ো বয়সে পা ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না। তবে কিনা এখানে বসে কত কী দেখলাম!”

“কী দেখলেন?”

অর্জুনের মজা লাগছিল। “এই মেয়েছেলেটাকে কী কায়দায় ধরে ফেললো মিলিটারিরা। আর এত উপরে বাতাসটা কি চমৎকার। চোখের সামনে, বুঝলে, রাতটাকে সরিয়ে দিচ্ছিল দিন। এত নীল আকাশ মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। বৃদ্ধ ঠিকই লিখেছেন। প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং—শুনিছে কি এ কালিম্পং!”



সীতাহরণ রহস্য

কালিম্পাঙে সীতাহরণ

একবার মেঘ জমলে কোনও আলোর ক্ষমতা নেই তাদের ঝোঁটিয়ে দূর করে। ওদের দেখলেই হরিমাধবের ষাঁড়ের দলটার কথা মনে পড়ে যায়। হরিমাধব ষাঁড় পোষে। জলপাইগুড়ি শহরে এক প্রান্তে হরিমাধবের ঠাকুরবাড়ি। মদনমোহন আছেন সেখানে। আর আছে গোটা কয়েক জবরদস্ত ষাঁড়। ঘাড়ে গদর্দানে মাংস চর্বি থিকথিক করছে, তেল চুকচুকে শরীর। প্রত্যেকটা ষাঁড়ের গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। কোনও কর্ম করে না সেগুলো। শুধু দিনরাত জাবর কাটে। ঠাকুরবাড়ির একটা ছোঁড়া ছাঁটা দড়িতে ওগুলোকে বেঁধে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যায় পাশের মাঠে।

ভূভারতে কেউ ষাঁড় পোষে এমন খবর শোনেনি অর্জুন। হরিমাধব বলে, খাস কৃষ্ণের জীব। ওদের দেখলেই প্রভুর কথা মনে পড়ে যায়। তা সেই ষাঁড়গুলো যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ছোঁড়াটার সঙ্গে তখন কার সাধ্য পথ চলে। সম্রাটের মতো এপাশ ওপাশ তাকায়, হাঁটে কি হাঁটে না! এই বর্ষায় মেঘগুলোও ঠিক তেমনি। যেন ইচ্ছে না হলে ওরা আকাশ থেকে নড়বে না। আলোয় ঝিলিক দেবে দিনদুপুরে, চলতে চলতেও থমকে যাবে। জলপাইগুড়ি শহরের বর্ষার চরিত্রটাই এমন। একবার চললে আর রক্ষে নেই। তা নইলে হরিমাধবের ষাঁড়।

অর্জুন দ্রুত পা চালান। ওদের গলির মুখেই বুড়িদের বাড়ি। আজ বুড়িদের দেখতে আসবে শিলিগুড়ি থেকে। সেই খুঁটিমারির জঙ্গল থেকে আনা শেকড় ঘষে এখন বুড়িদের মুখ চমৎকার পরিষ্কার, বিদ্যুটে মেচেতার দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। অর্জুনের ইচ্ছে করছিল বুড়িদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আকাশটার দিকে তাকিয়ে তার সাহস হল না। বৃষ্টি নামবার আগেই অমলদার বাড়িতে পৌঁছতে হবে।

অর্জুন দ্রুত পা চালানো। অমল সোমের বাড়ি হাকিমপাড়ায়। অনেকটা পথ যেতে হবে। রিক্সায় চড়লে, না, খামোকা পয়সা নষ্ট করে কী লাভ!

এইসময় মুকুন্দদার দোকানটার দিকে নজর পড়ল ওর। মুকুন্দদা আসেন সাইকেলে, ওটা এখন দোকানের পাশে তালামারা। তাকে দেখতে পেয়ে মুকুন্দদা হাসলেন, ‘এই যে অর্জুনবাবু, কি খবর?’

‘ভাল।’

‘ওহো, তোমার বউদি বলছিল একবার বাড়িতে আসতে।’

‘কেন?’

‘আর বলো না, প্রায়ই কিছু না কিছু চুরি যাচ্ছে। সেদিন তোমার বউদির একটা কানের দুল উধাও। আমাদের বাড়িতে কোনও বাইরের লোক কাজ করে না যে সন্দেহ করব। পুলিশে খবর দিয়েছি তো তারা গুরুত্বই দিচ্ছে না। তাই তোমার বউদি বলল, অর্জুন ঠাকুরপোকে ডাকো। নিশ্চয়ই বিহিত করতে পারবে।’ মুকুন্দদা হাসলেন।

অর্জুন বলল, ‘সেকি? আমি কি ভগবান?’

‘তা জানি না ভাই। দু-দুটো রহস্যের কিনারা করে তুমি শহরে হিরো হয়ে গেছ।’

অর্জুন হাসল, ‘কিনারা করতে পারব কিনা জানি না তবে বউদিকে বলবেন একদিন যাব। আমি আপনার সাইকেলটা একটু নিতে পারি? খুব দরকার।’

মুকুন্দদা মাথা নেড়ে বললেন, ‘বেলা একটার মধ্যে ফেরত দিলেই চলবে।’

সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে অর্জুনের খুব ভাল লাগল। সত্যি সে শহরে বেশ বিখ্যাত। সবাই তার দিকে সমীহ করে তাকায়। খুঁটিমারির জঙ্গলে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা শহরের লোক জানতে পেরেছিল বটে, তবে কালিম্পিং-এ যেসব খুন-খারাপি হয়েছিল সেটা জানার কথা নয়। কিন্তু সব জানাজানি হয়ে গেল সমরেশদার জন্য। সমরেশদা জলপাইগুড়ির ছেলে, কলকাতায় থাকেন। অমল সোমের বন্ধু। অমলদার মুখে ওসব গল্প শুনে ‘খুন-খারাপি’ নামে যে বইটা লিখে ফেললেন তারপর থেকেই এই অবস্থা! সমরেশদাকে কোনও দিন চোখে দ্যাখেনি অর্জুন। তবে বইটা পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল অন্য গল্প পড়ছে যেন।

করলা গার্লস স্কুলের সামনে দিয়ে পাই পাই করে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্জুন। করলা নদীর শরীর থেকে উঠে আসছে আঁশটে গন্ধ। বিবর্ণ বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে সাইকেল চালিয়ে পাকা ব্রিজে উঠতেই দাদুর চানচুরের দেখা পেল সে। সাটিনের হলদে পাজামা পাঞ্জাবি পরে কপালে তিলক কেটে সুদর্শন ফেরিওয়ালা হাসলেন, ‘এই যে গোয়েন্দাদাদু, মেঘ মাথায় করে চললে কোথায়?’

‘অমলদার বাড়িতে।’ গতি হ্রাস করল সে সাইকেলের। ‘আপনি?’

‘আমিও সেখান থেকে ।’ মুচকি হেসে তিনি নেমে গেলেন থানার রাস্তায় ।
অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না । চান্দ্রদাদু অমলদার বাড়িতে কেন
যাবে ? নয়াবস্তি থেকে হাকিমপাড়ায় কেউ বিনা দরকারে যায় না । জ্ঞান
হওয়ার পর থেকেই মানুষটাকে সে ওই একই রকম চেহারা আর হাসিতে দেখে
আসছে । অমলদাদের সঙ্গে ওর কী দরকার পড়ল ?

তিস্তার বাঁধের গায়ে ছোট্ট বাগান ঘেরা কাঠের দোতলা বাড়িটা অমল
সোমের । অমলদা একা থাকেন ওখানে । ত্রিভুবনের কোনও আত্মীয়স্বজন
নেই ওঁর । শুধু একটা বোবা চাকর আছে কাজকর্ম করার জন্য । লোকটার
গায়ে খুব শক্তি । নাম, হাবু ।

বাগানের গেট খুলতেই হাবুকে দেখতে পেল অর্জুন । কোদাল দিয়ে মাটি
কোপাচ্ছে । ওকে দেখে একগাল হেসে আঙুল দিয়ে দোতলাটা ইশারা করল ।
অর্থাৎ অমলদা এখন সাধনার ঘরে । ওখানে ঢুকলে কেউ বিরক্ত করতে পারবে
না ওঁকে । ফ্যাসাদে পড়ল অর্জুন । খুব জরুরি সমস্যা না থাকলে অমল সোম
সাধনা গৃহে ঢোকে না । ওখানে কোনও দিন ওঠেনি সে । অমল
সোম একদিন হেসে বলেছিলেন, ‘ওই ঘরে ঢুকলে মনটা বেশ হালকা হয়ে
যায় ।’

এখন সে কী করবে ! সে হাবুকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কখন ঢুকেছে ?’ ঘাড়
নাড়ল হাবু । একটু বেশি করে । মানে অনেকক্ষণ, কিন্তু তাই বা কী করে
হবে ? দাদুর চান্দ্রদার তো একটু আগে এখান থেকে চলে গেছে । সে আবার
জিজ্ঞাসা করল, ‘সকালে কেউ এসেছিল ?’

সঙ্গে সঙ্গে ওপরে নীচে মাথা দোলাল হাবু, হ্যাঁ ।

সাইকেলটাকে বারান্দার সঙ্গে লাগিয়ে একতলার বসার ঘরে ঢুকল অর্জুন ।
চারটে চেয়ার এবং একটা কাঠের টেবিল ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই ।
এমন কী দেওয়ালে কোনও ছবি পর্যন্ত নেই । বড় ঘরটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া
দেখায় । পাশের ঘরে অমল সোম থাকেন । অর্জুন একটা চেয়ারে বসে দুবার
টেবিলে তবলা বাজাতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল । তড়াক করে লাফিয়ে
বারান্দায় এসে অর্জুন দেখল, না, সাইকেলে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে না । এতক্ষণ
গলা সাধার পর যে গান্ধী শুরু হল তা সত্যি ভয়াবহ । চারধার সাদা হয়ে গেছে
জলের ধারায় । আকাশটা যেন আচমকা গলে পড়ছে মাটিতে । ঠিক সেই
সময় একটি গাড়ির আওয়াজ কানে এল । বৃষ্টির পর্দার আড়াল ভেদ করে
অর্জুন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলো একটা নীল অ্যাম্বাসাডার ঠিক গেটের মুখটায়
এসে দাঁড়িয়েছে ।

হাবু এখন বাগানে নেই । বৃষ্টি পড়তেই নিশ্চয়ই পিছনের রান্নাঘরে
ঢুকেছে । অমলদার কাছে লোকজন প্রায়ই আসে । কিন্তু এই বৃষ্টি মাথায় করে
গাড়িতে চেপে কে আসবে ! একটু ইতস্তত করল বোধহয় আরোহী । কারণ

মিনিট দুয়েক পরে দরজাটা খুলল পিছনের। তারপর ফোন্ডিং ছাতা খুলে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। তাঁর কায়দার ছাতা জলের ধারাকে রুখতে পারছিল না। বারান্দায় উঠে যখন ছাতা নামালেন উনি তখন শরীরের অর্ধেকটা ভেজা। সিন্ধের পাঞ্জাবির নীচে চোস্ত পাজামা পরা মানুষটার বয়স চল্লিশের নিচে নয়। চোখের তলায় কমলা লেবুর কোয়ার মতো ফোলা মাংস। মাথায় বেশ বড় টাক। ধবধবে গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মানানসই চর্বিওয়ালা পেট। ছাতাটা বারান্দায় নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘এটা অমল সোমের বাড়ি তো?’ উচ্চারণে অবাঙালির টান স্পষ্ট।

অর্জুন মাথা নাড়ল, ‘হ্যাঁ। আসুন।’

ঘরে ঢুকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অর্জুন লক্ষ করল বাঁ হাতে নটা আংটি। বুড়ো আঙুল ছাড়া প্রত্যেকটায় দুটো করে। লোকটি বলল, ‘এই বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে! জান কয়লা করে দিল। অমলবাবুকে একটু খবর দিন।’

‘একটু অপেক্ষা করতে হবে।’

‘অপেক্ষা করব? কেন? আপনি বললেন যে তিনি বাড়িতেই আছেন।’ ভদ্রলোকের মুখ-চোখে বিরক্তি স্পষ্ট হল, গলার স্বরে ঝাঁঝ।

‘আছেন, তবে একটু ব্যস্ত। আমি খবর দিচ্ছি।’ লোকটার মেজাজ দেখে কথাটা বললেও অর্জুনের মনটা ভাল লাগছিল না। তাকে দেখে যে চট করে তুমি বলেনি এইটে কম কথা নয়। সে পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘরে এল। এইটে অমল সোমের শোওয়ার ঘর। একটা খাট আর বড় আলমারি ছাড়া দেওয়ালগুলো বইপত্তরে ভর্তি। এই সব বই নাকি অমলদার পড়া। বিষয় বেশ মজার। আফ্রিকার কোন পাখি তার এক মাসের জীবন কিভাবে কাটায় সেই বিষয়েই একটা গোটা বই লেখা। কোনটায় আমেরিকার পাঙ্ক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা। ওপরে একটি পাঙ্ক মেয়ের ছবি ছাপা। থাই অবধি কালো লম্বা জুতো, মিনি প্যান্টের ওপরে লাল জ্যাকেট, কানের দু’ পাশ থেকে মাথার মধ্যখানের দেড় ইঞ্চি বাদ দিয়ে পরিষ্কার কামানো; আর সেই দেড় ইঞ্চি চুলটায় নানান রঙ করা। উদ্ভট দেখতে সেই মেয়েটির চোখের মধ্যে কেমন একটা হিংস্র চাহনি। অর্জুনের অনেকবার মনে হয়েছে অমলদার কাছ থেকে বইটা চেয়ে নিয়ে পড়ে। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় লেখা একটা গোটা বই কখনও পড়েনি সে। ভয় হয় যদি বুঝতে না পারে। অমলদা বলেন ইংরেজি-ভীতিটা অবশ্যই কাটানো উচিত। না হলে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার অজানা রয়ে যাবে। উনি বলেছেন খবরের কাগজ পড়তে। ইংরেজি কাগজ পড়তে পড়তে ভয়টা কেটে যাবে। অর্জুন তাই করছিল। আজ ঠিক করল যাওয়ার সময় বইটা চেয়ে নিয়ে যাবে।

দরজায় হাবু দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে মুখ হাঁ করল দু’বার। তার অর্থ, চা

থাবে ? মন্দ হয় না । তা ছাড়া বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে । সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতেই হাবু বৃষ্টির মধ্যে রান্নাঘরে চলে গেল । এই সময় কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল কোথাও । এত শব্দ যে কাঠের বাড়িটাই যেন কঁপে উঠল । আর ঠিক তখন অমল সোম নেমে এলেন ওপর থেকে । সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, ‘আরে কখন এলে ?’

‘এইতো কিছুক্ষণ । আপনি ওপরে ছিলেন বলে ডিস্টার্ব করিনি ।’ অর্জুন হাসল ।

‘ভালই করেছ । তা এই অসময়ে, মতলবটা কী ?’

এই ধরনের কথাবার্তা মোটেই পছন্দ হয় না অর্জুনের । সে অনেকবার বলেছে চাকরি-বাকরি যদি না জোটে না জুটুক, অমল সোমের সহকারী হিসেবে কাজ করতে পারলে সে আর কিছু চায় না । অমলদা এই প্রস্তাবটা একদম গা করেন না । তিনি বলেন, ‘এটা কি লন্ডন-ন্যূয়র্ক ? মফঃস্বলের একটা ছোট্ট শহরে কখন কী কেস আসবে তার ঠিক নেই !’ এখন তার আসার কারণটা বলতে গিয়ে অর্জুনের খেয়াল হল, বাইরের ঘরে সেই লোকটা বসে আছে । সে গভীর গলায় বলল, ‘আপনার একজন গেস্ট এসেছেন ।’

‘তোমার সঙ্গে ?’

‘না, আমার পরে ।’

অমল সোমের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি । খদ্দের । সেই অবস্থায় তিনি পাশের ঘরে গিয়ে বললেন, ‘কই, কেউ নেই তো ।’ অর্জুনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল । সেও তাজ্জব হয়ে গেল । ঘর ফাঁকা, লোকটা নেই । কী আশ্চর্য ব্যাপার ! অমলদার সঙ্গে দেখা করতে এসে আবার এই বৃষ্টি মাথায় করে চলে গেল । যাওয়ার সময় গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যায়নি । অর্জুন দ্রুত বাইরে এল । ছাতাটা নেই এবং এখন গেটে গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না । লোকটা এলই বা কেন চলে গেলই বা কেন ? অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঠিক কী হয়েছিল বল তো ?’

অর্জুন বিশদে বলল । লোকটা যে খুব বিরক্ত হচ্ছিল তাও মনে হয়ে ছিল ।

অমল সোম বললেন, ‘মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই । যদি প্রয়োজন থাকে তা হলে আবার আসবেন ভদ্রলোক ।’ তারপর চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ‘এটা কী ?’

টেবিলে যে একটা কার্ড পড়ে আছে সেটা নজরে আসেনি এতক্ষণ । অমল সোম সেটাকে তুলে নিতে অর্জুন পিছনে এসে দাঁড়াল । সাদা কার্ডের পিছনে লেখা, ‘প্লিজ কল মি ।’ তারপর জলপাইগুড়ি এক্সচেঞ্জের একটা ফোন নম্বর । কার্ডটা ওপ্টালে নামটা দেখা গেল, ইউ. এন. রায় । আর কিছু নেই । শুধু

নামটাই সোনালি কালিতে ছাপা ।

অমল সোম চোখ বন্ধ করল, ইউ. এন । উহু । এত বছর জলপাইগুড়িতে আছি, কই এ নামের তো কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না । ইউ. এন । কী হতে পারে ইউ. এনে ?

আকাশ-পাতাল ভাবছিল অর্জুন । কোন বাঙালি নামের প্রথম অক্ষর ইউ ? এন-এ না হয় নাথ বোঝা গেল । শেষ পর্যন্ত মাথায় এসে গেল, সে হেসে বলল, ‘উত্তম নাথ রায় ।’

‘উত্তম ? হতে পারে । তবে তার সঙ্গে কি নামটা চলে ? উত্তম নারায়ণ ? কিন্তু লোকটার যা বয়স বলল সেই সময়ে উত্তম নামটা রাখার চল ছিল না । এবং উজ্জ্বলনারায়ণ চলতে পারে । যা হোক, লোকটা খুব ডিস্টার্বড, মন ঠিক রাখতে পারছে না এবং ধৈর্য নেই । এসবের কারণ লোকটার মাথার ওপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে । কিন্তু আমার খবর কী করে পেল ? এমনভাবে ফোন করার ছকুম দিয়ে গেছে যে মনে হয় শরীরে জমিদারি রক্ত আছে । ঠিক আছে, লোকটা অস্তুত যাওয়ার আগে তোমাকে বলে যাওয়ার ভদ্রতাটুকু করতে পারত । অবশ্য মাথার ঠিক না থাকলে— ।’ অমল সোম যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলেন ।

অর্জুনের তখন মাথায় অন্য চিন্তা । অমল সোমের বাড়িতে টেলিফোন নেই । কাছাকাছি কার বাড়িতে টেলিফোন আছে, সেই কথা ভাবছিল সে । এই সময় অমল সোম বললেন, ‘তারপর অর্জুনবাবু, আর কী সংবাদ ?’

তখনই খেয়াল হল । অর্জুন চেয়ার টেনে বসে বলল, ‘আপনার একটা চিঠি আছে ।’

‘আমার চিঠি ? কে দিয়েছে !’

‘কালিম্পং-এর বিষ্ণু সাহেব ।’

‘বুঝলাম না । বিষ্ণু সাহেব কেন আমার চিঠি তোমার কাছে পাঠাবেন ?’

‘বিষ্ণু সাহেব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন ।’ অর্জুন পকেট থেকে একটা বড় খাম বের করল ।

খামের মধ্যে একটা চিঠি আর তার সঙ্গে আর একটা ছোট মুখবন্ধ খাম । চিঠিটা পড়ল অর্জুন, ‘স্নেহের তৃতীয় পাণ্ডব, আশাকরি কুশলে আছ । তোমার পত্র পাইয়াছি । গোয়েন্দা সাহেব তো পত্র লেখার প্রয়োজনই বোধ করেন না । যা হোক, তোমাদের জানাইয়াছিলাম যে কালিম্পং শহরে এখন ক্রিমিন্যাল থিকথিক করিতেছে । এখানে চেম্বার খুলিলে গোয়েন্দা সাহেবের টাকার পাহাড় জমিয়া যাইবে । বাঙালির তো কোনও কালে ব্যবসায় মন নাই । ভাল কথা শুনিবে কেন ? যা হোক, একটি বিশেষ দরকারে এই পত্র লিখিতেছি । সঙ্গে একটি মুখবন্ধ খাম দেখিবে । উহা যথাসীঘ্র গোয়েন্দা সাহেবের হাতে পৌঁছাইয়া দিবে । সরাসরি তাহাকে পাঠাইলাম না, কারণ গোয়েন্দাদের প্রচুর শত্রু থাকে ।

মধ্যপথে পত্র উধাও হওয়া বিচিত্র নয়। আশীর্বাদক, বিষুচ্চরণ পত্রনবীশ ওরফে বিষ্ণু সাহেব।’

অমল সোম ঠোঁট টিপে হেসে খামটা নিলেন! তারপর সেটা ছিড়ে চিঠিটা পড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর ঠোঁট থেকে দুটো শব্দ বেরিয়ে এল আলতো করে, ‘তাই বলো।’

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল ওই চিঠিতে কী আছে জানতে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অমল সোম চিঠিটা পড়ে খুব নাড়া খেয়েছেন। এই সময় হাবু এসে দুঁকাপ চা রেখে গেল টেবিলে। অমল সোমের মুখে হাসি ফিরে এল, ‘বাঃ, হাবুটার বেশ বুদ্ধি আছে তো। নাও, চা খাও।’

শব্দ করে চায়ে চুমুক দিলেন অমল সোম। তারপর বললেন, ‘আমরা মিছেই ভেবে মরছিলাম অর্জুন, লোকটার নাম উপেন্দ্রনারায়ণ রায়।’

অর্জুন দেখল, অমল সোম মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ছেন। সে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। বিষ্ণু সাহেবের চিঠির সঙ্গে উপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কী সম্পর্ক! ইউ. এন. মানে যে উপেন্দ্রনারায়ণ সেই সূত্রটি কি ওই চিঠিতে আছে?

চিঠি পড়া শেষ হলে অমল সোম বললেন, ‘এই ব্যাপার!’ যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব। তারপর হেসে উঠলেন, ‘যাই বলো, বিষ্ণু সাহেব খুব হেল্পফুল।’

একটু দ্বিধা নিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ‘কী লিখেছেন বিষ্ণু সাহেব?’

‘লিখেছেন কালিম্পং-এর নতুন প্রতিবেশীর নাম উপেন্দ্রনারায়ণ রায়। চিরকাল আমেরিকার সানফ্রানসিসকো শহরে মানুষ। হঠাৎ দেশের জন্য টান বোধ করায় চলে এসেছেন কালিম্পং-এ। আদি বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরের পাশে, নামকরা জমিদারদের বংশ। কালিম্পং-এ ভদ্রলোক ডেয়ারি খুলেছেন। একদম আমেরিকান কায়দায়। উনি খবর পেয়েছেন খোদ জলপাইগুড়ি শহরে এক ব্যক্তি ছয়টি সুগঠিত তরুণ ষাঁড়ের মালিক। উনি এই জীবগুলিকে কিনতে চান, অতএব আপনি যদি সাহায্য করেন তা হলে বাধিত হইব। উপেন্দ্রবাবুকে আপনার নাম বলিয়াছি। তিনি যে কোনও দিন তথায় যাইতে পারেন। চিঠি থেকে এটুকু পড়ে শুনিয়া অমল সোম বললেন, ‘পুনশ্চ দিয়ে বিষ্ণু সাহেব লিখেছেন, লোকটি সন্দেহজনক। সি আই এ-র চরও হইতে পারে। উহার একমাত্র কন্যা নাকি পাক্ষ সম্প্রদায়ভুক্ত। সেটি কী বস্তু, তাহা জানি না।’

চিঠিটা টেবিলে ফেলে দিয়ে অমল সোম বললেন, ‘এইটে ইনটারেস্টিং, ইউ. এন. রায়ের সঙ্গে আমি শুধু ওর মেয়ের জন্য আলাপ করতে পারি। পাক্ষরা আমেরিকায় এখন শক্তিশালী। এখন অবধি ওরা কোনও অ্যাকশনে নামেনি কিন্তু পাক্ষরা যে পাড়ায় থাকে সেখানে সাধারণ মানুষ হাঁটতে স্বস্তি পায় না। উপেন্দ্রনারায়ণের মেয়ে পাক্ষ, একটা বাঙালি মেয়েকে ওই চরিত্রে ভাবতে বেশ মজা লাগছে!’

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ‘পাক্সরা কী করে—’

অমল সোম উঠলেন, ‘ও ঘরে একটা বই আছে। পড়ে ফ্যালো। আজকে আমি আর বেরুবো না। তুমি দুটো কাজ করো। ওই ইউ. এন. রায়কে টেলিফোন করে বলে দিও আমরা আজ সন্ধ্যাবেলায় দেখা করতে পারি। আর একবার মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে হরিমাধবকে জিজ্ঞাসা করবে, সে ষাঁড়গুলো বিক্রি করবে কিনা। আমার ছাতা নিয়ে চলে যাও।’

অর্জুন বাইরে তাকাল। বৃষ্টি ধরার কোনও নামগন্ধ নেই। ওই বৃষ্টিতে ছাতা হাতে সাইকেল চালানো অর্থহীন। সে মাথা নাড়ল, ‘সঙ্গে সাইকেল আছে। ছাতায় কাজ হবে না। আমি বইটা পরে নেব।’

‘সে কী? ভিজতে ভিজতে যাবে? না, না। তুমি বরং আমার বর্ষাতিটা নিয়ে যাও।’ পাশের ঘরের আলমারির গায়ে ঝোলানো বর্ষাতিটা বের করে দিলেন অমল সোম। বর্ষাতি পরলে বেশ খিল লাগে অর্জুনের। হাঁটুর তলা অবধি ঢাকা, মাথা, কান আড়ালে। নিজেকে বেশ গোয়েন্দা গোয়েন্দা মনে হয়।

বৃষ্টির মধ্যে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অর্জুন। যতই বর্ষাতি গায়ে থাকুক ছাঁট আটকাচ্ছে না মোটেই। হাওয়ার দাপটে হ্যান্ডেল সোজা রাখাই মুশকিল। দিনবাজারের মুখটাতে ওর বন্ধুর বাবার দোকান। দু’-দু’টো অ্যাডভেঞ্চারের পর ভদ্রলোক তাকে বেশ খাতির করেন। সেখান থেকে ইউ. এন. রায়ের নম্বরে টেলিফোন করল অর্জুন। খুব বিরক্ত গলায় এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে?’

‘এখানে কি ইউ. এন. রায় থাকেন?’

‘থাকেন। তিনজন ইউ. এন. রায় এই বাড়িতে থাকেন। আর একজন আজ এসেছেন। আপনি কোন ইউ. এন. রায়কে চান? উজ্জ্বল, উত্তম, উপল—।’

‘যিনি আমেরিকায় ছিলেন।’

‘ও, উপেন্দ্র। সে বাড়িতে নেই। এই নিয়ে অন্তত তিনটে ফোন এল তাঁর, কি ব্যাপার বলুন তো? কোনও কালে সে এখানে থাকত না। আজ সকালে আসামাত্র ঘন ঘন টেলিফোন আসতে লাগল!’

‘উনি কখন ফিরবেন জানেন?’

‘না।’

‘এলে বলবেন অমলবাবু বিকেলে দেখা করতে পারেন।’ রিসিভার নামিয়ে রেখে বন্ধুর বাবার সঙ্গে দু’-একটা মামুলি কথা বলে অর্জুন আবার সাইকেলে উঠল। বৃষ্টির চাপ সামান্য কমেছে। জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে না বটে, কিন্তু করলার জল রাস্তায় উঠে আসে। এরকম অপদার্থ নদী খুব কম শহরেই দেখা যায়। অর্জুন দেখল করলানদীর জল ডাঙা ছুঁই ছুঁই করছে।

রাজবাড়ীটাকে বাঁয়ে রেখে সে আরও একটু এগোতেই মন্দিরটাকে দেখতে পেল। মদনমোহন মন্দির। হরিমাধবের বেশ খ্যাতি হয়েছে শহরে। ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু মন্দিরের কাছাকাছি হয়ে অর্জুনের মনে হল সেখানে বেশ ভিড় জমেছে এ জলেও। ছাতা মাথায় সবাই মন্দিরের পাশে ভিড় করেছে। আর একটু এগোতেই কান্নার আওয়াজ কানে এল। পুরুষ কণ্ঠে আকুলি-বিকুলি।

সাইকেল থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন। মন্দিরের পাশে একটা আটচালার তলায় ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে ষাঁড়গুলো। বিশাল নখর শরীর এখন পাহাড়ের মতো শক্ত। ছাঁটা ষাঁড় পাশাপাশি মরে পড়ে আছে। আর তাদের মাঝখানে বসে হরিমাধব কপালে হাত চাপড়ে কেঁদে চলেছে সমানে।

একজন বলল, ‘গো-হত্যা মহাপাপ। কোন পাষাণ এমন কাজ করল!’

আর একজন বলল, ‘ছাঁটা মহাপাপ। ছাঁটা কৃষকের জীবকে খতম করে দিল!’

তৃতীয় জন মিনমিনে গলায় জানালো, ‘ওরা তো ঠিক গো নয়। ষাঁড়। সমান মহাপাপ হবে কিনা কে জানে! তবে হ্যাঁ, প্রভু তো ওদের পিঠে বসতে বড় ভালবাসতেন।’

দৃশ্যটা মোটেই ভাল লাগছিল না অর্জুনের। এমন স্বাস্থ্যবান ছাঁটা প্রাণীর মৃত শরীর বড় পীড়াদায়ক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এ হত্যাকাণ্ড। তারপরেই তার মাথার ভেতর একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ইউ. এন. রায় এগুলো কিনতে নেমে এসেছেন পাহাড় থেকে। আর তার আগেই কেউ এদের খতম করে দিয়েছে। অর্থাৎ কেউ কিংবা কারা ইউ. এন. রায়কে বাগড়া দিতে চায়! ভদ্রলোককে কি সেই কারণে ছটফটে দেখাচ্ছিল?

সে সামনের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী করে হল?’

কাঁধ নাচালো লোকটি, ‘সকালেও ওরা ঠিক ছিল। এই খানিক আগে এক ভদ্রলোক গাড়িতে এলেন। বললেন, উনি ষাঁড়গুলোকে কিনতে চান, একটু দেখবেন। হরিমাধবদা তো অবাক। কেউ ষাঁড়, মানে ছাঁ-ছাঁটা ষাঁড় কিনতে চাইছে কেন? তা প্রাণ থাকতে তো তিনি বিক্রি করবেন না ওদের। কিন্তু ভদ্রলোক এমন চাপাচাপি করতে লাগলো যে দেখাতে হল। আর এসেই এই দৃশ্য।’

‘ভদ্রলোক কোথায়?’

‘উনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। ওহে, হরিমাধবদাকে একটু শাস্ত হতে বলো। এ সবই প্রভুর ইচ্ছে। আমরা তো যন্ত্র মাত্র!’ লোকটি নির্বিকার মুখে বলল।

‘সেই লোকটিকে দেখতে কেমন?’ অর্জুন আবার খোঁচালো।

‘মাথায় টাক আছে । তুমি কে হে ? এত প্রশ্ন করছ ?’

‘থানায় খবর দিয়েছে ?’

পাশ থেকে একজন বলল, ‘লোক গিয়েছে থানায় ।’

অর্জুন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ সরে এল । সবাই এখন হরিমাধবকে সান্ত্বনা দিচ্ছে । হরিমাধব যেন পুত্রশোক কাতর ।

মেঘ এবং বৃষ্টিতে বেলা বোঝা মুশকিল । হাতেও ঘড়ি নেই । এই বর্ষায় রাস্তায় লোক দেখা যাচ্ছে না যে সময়টা জেনে নেবে । অথচ সাইকেলটাকে একটার মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার দরকার । কিন্তু একটা বড় রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে । ইউ. এন. রায়ের মেয়ে পাঙ্ক । সানফ্র্যানসিস্কোতে ছিল । ডেয়ারি করতে কালিম্পং-এ এসেছেন । একটা ডেয়ারির জন্য হুঁটা ষাঁড় কী দরকার ? তা এখানে আসামাত্র ঘন ঘন ফোন এসেছে ওঁর ঠিকানায় । তারপর স্পটে পৌঁছানোর আগেই কেউ ষাঁড়গুলোকে মেরে ফেলল । এই কেউটা কে ? এখনই খবরটা অমলদাকে জানানো দরকার । অথচ সাইকেল না ফিরিয়ে দিলে মুকুন্দা খেতে যেতে পারবেন না দোকান বন্ধ করে । অর্জুন আর দ্বিধা করল না । দ্রুত প্যাডেল ঘুরিয়ে মুকুন্দার দোকানে চলে এল ।

মুকুন্দা তখন গালে হাত দিয়ে কাউন্টারে বসে, ওকে দেখে বললেন, ‘যাক, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ । যা বৃষ্টি, একটা খদ্দেরেরও দেখা নেই । ও বেলা যদি এই অবস্থা থাকে তা হলে দোকান খুলব না ।’

‘ক’টা বাজে এখন ?’

‘পৌনে এক ।’

সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল অর্জুন । মা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে থাকবেন । কিন্তু সেটা শেষ করে অমলদার কাছে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে । ওর আর তর সইছিল না । রাস্তায় এখন রিক্সাও নেই । দেরি হয়েছে বলে বৃষ্টির দোহাই দেওয়া যাবে মায়ের কাছে । অমলদার বাড়ি হেঁটে ঘুরে আসতে গেলে আধ ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে । দেড়টা নাগাদ বাড়ি ফিরতে খুব অসুবিধা হবে না । অর্জুন দ্রুত পা চালালো । সাইকেলের সিটে বসে থাকার সময় অনুভূতিটা হয়নি । এখন শরীরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে । অথচ গায়ে লাগছে না—এ এক অন্য রকমের থ্রিল । আধঘণ্টার পথ প্রায় কুড়ি মিনিটে পেরিয়ে আসছিল । কিন্তু থানার পাশ দিয়ে নামতেই চমকে উঠল । করলার জল রাস্তাটা ডুবিয়েছে । ঠিক এই জায়গায় কিছু দিন আগে রাস্তা বাড়ির একটি ছেলে ডুবে গিয়েছিল । সঙ্গে সাইকেল ছিল তার । জলের তলায় রাস্তা দেখা মুশকিল । কিন্তু সেই নেতাজিপুল ঘুরে যেতে অনেক সময় লাগবে । সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগল সে । প্যান্ট গোটানো যায় কিন্তু বর্ষাতি কিভাবে গোটাবে । একশ গজ জল ভাঙতেই ভিজে একাকার হয়ে গেল অর্জুন । প্রায় থাই অবধি জলের তলায়, মাথার ওপর আকাশ গলে পড়ছে ।

অমল সোমের বাড়ির সামনে এসে সে চমকে গেল। নীল অ্যান্ডারসন ঠিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাচগুলো বন্ধ। শুধু ড্রাইভারের আসনে একটা ক্যাপ মাথায় নেপালি ছেলে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। বোধহয় বেশ ক্লান্ত, কারণ ওর চোখ দুটো বন্ধ। গেট খুলে বাগান পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেই অমল সোমের গলা শুনতে পেল সে, ‘কী খবর অর্জুন, পুলিশ এসে গিয়েছে?’

‘না, এখনও আসেনি।’ অর্জুনের আফশোস হচ্ছিল। এত বেলায় বৃষ্টিতে ভিজে এখানে না এলেও চলত। ইউ. এন. রায় খবরটা তো দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সামনে চায়ের কাপ কিন্তু সেটায় চুমুক দেওয়া হয়নি। ফিনফিনে সর পড়ে গেছে এর মধ্যে। অমল সোম বললেন, ‘মিস্টার রায়, এর সঙ্গে আপনার আগেই আলাপ হয়েছিল। এরই নাম অর্জুন। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, বিটুসাহেব নিশ্চয়ই বলেছেন ওর কথা। এই আপনার ভাইপো হবে।’

‘হ্যাঁ! কিন্তু আমাকে ফিরে যেতেই হবে কালিম্পং-এ।’

‘নিশ্চয়ই যাবেন। তবে অর্জুন আপনার সঙ্গে যাবে। আপত্তি নেই তো?’

‘নট অ্যাট অল। তবে আপনি গেলে সুবিধে হত।’

‘আমি যাব। আমার চাকরটা তো কথা বলতে পারে না। ওর ওপর বাড়িটা ছেড়ে যেতে সাহস হয় না। একটা ব্যবস্থা করেই আমি রওনা হব। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। অর্জুনের ওপর আমার আস্থা আছে।’ অমল সোম হাসলেন।

‘আমার মাথার ঠিক নেই মিঃ সোম। ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়েছে। প্লিজ হেল্প মি।’ রাজকীয় চেহারার মানুষটিকে খুব অসহায় দেখালো।

এ কথার জবাব দিলেন না অমল সোম। ঘড়ি দেখে বললেন, ‘বেলা হয়ে গিয়েছে। আপনাদের এই বৃষ্টির মধ্যে কালিম্পং-এ যেতে হবে। আর দেরি করবেন না। আপনি কি আপনার ভাই-এর বাড়ি হয়ে যাবেন?’

ইউ. এন. রায় মাথা নাড়লেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কত অ্যাডভান্স দিতে হবে?’

‘এক পয়সাও না। আপনার কাজ কতটা করতে পারি আগে দেখি।’ অমল সোম ওকে বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, ‘আপনি ড্রাইভারকে বলবেন ঠিক দুটোর সময় কদমতলার মোড়ে রূপমায়া সিনেমার সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে। অর্জুন ওখান থেকে আপনার গাড়িতে উঠবে। গুড বাই।’

‘বাই।’ ভদ্রলোক ভাঁজ করা ছাতা খুলে বৃষ্টিতে নেমে গেলেন। অর্জুন এ সবের কিছুই বুঝতে পারছিল না। ইউ. এন. রায় নীল অ্যান্ডারসনকে উঠে পড়লে অমল সোম পকেট থেকে তিনশো টাকা বের করে বললেন, ‘অর্জুন, আর দেরি কোরো না। এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে দুটোর মধ্যে কদমতলায় পৌঁছে যাও। মাসীমাকে বলো দিন কয়েকের জন্য তুমি কালিম্পং-এ যাচ্ছ।’

‘কেন?’ অর্জুনের হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটেনি।

‘ওহো, তোমাকে তো কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু এখন আর সময়ও নেই। বিটুসাহেব আমাদের বন্ধু, ওর অনুরোধ ফেলতে পারি না তাই এই কেসটা নিতে হল। তবে তুমি বিটুসাহেবের বাড়িতে উঠবে না। তোমাকে থাকতে হবে ইউ.এন. রায়ের সঙ্গেই। তোমার কাজ হল চোখ খোলা রাখা। দিনের বেলায় ঘুমাবে আর রাতে জাগবে। দেখবে ওই বাড়িতে কেউ আসছে কিনা, এলে তারা কে কে? দ্বিতীয়ত, রায়সাহেবের মেয়ে বাড়ি থেকে বের হয় কিনা, তার প্রকৃতি কেমন, কে কে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রতিদিনের খবর তুমি একবার বিটুসাহেবকে দিয়ে দেবে। তা হলে আমি পাব। তেমন কিছু না ঘটলে তুমি পাঁচ দিন বাদে ফিরে এসো। না হলে তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা করার কোনও রকম বাড়তি কৌতূহল দেখাবে না। তোমার পরিচয় হবে রায়সাহেবের ভাইপো, উজ্জ্বলনারায়ণ রায়ের ছেলে, উপল। এখানকার কলেজে পড়ছ। টাকাটা রাখ, প্রয়োজনে খরচ করো। ও. কে!’

অর্জুন জানে এই মুহূর্তে অমল সোমকে প্রশ্ন করা নিরর্থক। কালিম্পিং-এ যেতে তার নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে না, কিন্তু তাকে একবার প্রশ্নও করা হল না সে যেতে ইচ্ছুক কিনা। সে তো এখন বলতেই পারে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অসুবিধে আছে। কিন্তু অমল সোমের মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন সে সব কিছুই বলল না। অমলদা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ইউ.এন. রায়কে বলেছেন যে অর্জুন যাবে। এই আত্মবিশ্বাস পারস্পরিক সাহচর্যে গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া যা শুনল তাতে মনে হচ্ছে কালিম্পিং-এ তার জন্য বেশ ভাল রকমের রহস্য অপেক্ষা করছে। একমাত্র এই ছট করে যাওয়ার জন্য মা রাগারাগি করতে পারে। তবে অমলদার কথা বললে হয়তো নিমরাজি হবে।

সে টাকাটা নিয়ে বলল, ‘অমলদা, আমাকে বইটা দেবেন?’

‘কী বই?’

‘ওই যে পাক্ষদের নিয়ে লেখা। ওটা এই সুযোগে পড়ে ফেলি।’

‘গুড। কিন্তু সাবধান। তোমাকে যেন কেউ ওই বই পড়তে না দ্যাখে। স্পেশ্যালি রায়সাহেবের মেয়ে। ওরা জানবে তুমি একটি গোবেচারার মফঃস্বলের ছেলে। পাক্ষ শব্দটা তুমি জীবনে শোননি এবং তার অর্থ জানো না।’

বষাতিটা অমল সোমকে ফেরত দিতে হয়নি। বইটা একটা রঙিন প্লাস্টিক জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে প্যান্টের মধ্যে কোমরে গুঁজে নিয়েছিল অর্জুন। মলাটের ছবিটার দিকে এক নজর তাকিয়েছিল জ্যাকেটে ঢোকানোর সময়। বীভৎস সাজটা চোখে লেগে আছে। ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি মেয়েটার। ইউ.এন. রায়ের মেয়েকে কি ওই রকম দেখতে? অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না।

এককালে এন-সি-সি করেছে অর্জুন। না হলে অত দ্রুত স্নান খাওয়া শেষ করে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে পারত না। মাকে অনেক কষ্টে ম্যানেজ করা গেছে।

অমলদা ওকে ক'দিনের জন্য কালিম্পং পাঠাচ্ছে জেনে আঁতকে উঠেছিলেন তিনি। কালিম্পং-এই তো সেবার অমন গোলাগুলি চলেছিল। অর্জুন আশ্বাস দিয়েছে সেরকম কিছু হবে না এবার, হলে অমলদা তাকে একা পাঠাতেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অর্জুনের মনে হয়েছিল পৃথিবীর কোন দেশের গোয়েন্দাদের এই সমস্যা পড়তে হয় না। তাদের মায়েরা সব সময় স্নেহ থেকে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন না। কিন্তু সে ছাড়া মায়ের তো আর কেউ নেই!

বারান্দায় বুড়িদি দাঁড়িয়ে। মাথায় একরাশ খোলা চুল ফুলে ফেঁপে দু'পাশে ছড়িয়ে। ওকে দেখে ঠোট দাঁতে কাটল বুড়িদি। এখন ওর মুখ প্রায় আয়নার মতো বাকবাক। বুড়িদি খুব নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কালিম্পং। অ্যানাদার অ্যাডভেঞ্চার।'

'সত্যি!' বুড়িদির মুখে হাসি ফুটলো, 'কী ব্যাপার রে?'

'এখন বলার সময় নেই। ফিরে এসে বলব। তুমি এখনও সাজগোজ করোনি? তোমায় বর দেখতে আসবে কখন?' অর্জুন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না, আমার কিছু ভাল লাগছে না।' কথাটা শেষ করেই বুড়িদি ভেতরে চলে গেল।

এই যাওয়ার ধরনটা দেখে অর্জুনের বেশ ভাল লাগল। এত দিনে বুড়িদির এবং ওদের বাড়ির মানুষদের মুখে হাসি ফুটেছে। মুখ ভর্তি কালো দাগের জন্য কোনও পাত্রপক্ষ বুড়িদিকে পছন্দ করছিল না।

রূপমায়া সিনেমার কাছে এসে অর্জুন দেখল নীল অ্যানাসাডারটা দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছেন ইউ. এন. রায়। তাকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে সে দরজাটা খুলে দিল! টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল তখনও। কিন্তু ভেজা বর্ষাতি নিয়ে গাড়ির আসনে বসা যায় না। সেটাকে কোনও রকমে খুলে ভাঁজ করে পায়ের কাছে রেখে অর্জুন গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল। ব্যাগটাকে রাখল তার আর ড্রাইভারের মাঝখানের আসনে। সে ঠিক হয়ে বসামাত্র গাড়ি চলতে শুরু করল। ইউ. এন. রায় তার সঙ্গে একটা কথাও বলেননি। অর্জুন সামনের কাছে দেখতে পেল ইউ. এন. রায় চিন্তিত মুখে জানলা দিয়ে কিছু দেখছেন অথবা কিছুই দেখছেন না। অর্জুনের মনে হল, তার ভদ্রতা করে কথা বলা উচিত। কী কথা বলবে ঠাওর না করতে পেরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন?'

শব্দটাই কানে গিয়েছিল, বাক্যটা নয়। কারণ কিছুটা বিস্মিত হয়ে মুখ ফেরালেন রায়সাহেব। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কিসের অপেক্ষা? ওহো, হ্যাঁ কিছুক্ষণ। তবে দুটো বাজেনি! আপনারা এর আগে মিস্ট্রী সলভ করেছেন?'

প্রশ্নটা খুবই আকস্মিক তবু চটপট ঘাড় নাড়ল অর্জুন, 'হ্যাঁ। অমলদা খুব

বিখ্যাত ।’

‘উনি নিজে এলে ভাল করতেন ।’ কথাটা বলে সিটে শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন রায়সাহেব । তাঁর চোখ বন্ধ হল । কথাটা মোটেই ভাল লাগল না অর্জুনের । যেন সে একদম ফেকলু । তার যাওয়ার কোনও মানে হয় না । অমলদা বলেছেন বলে রায়সাহেব তাকে বাধ্য হয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । তার দ্বারা কোনও কাজ হবে না । একটু উষ্ম হয়ে অর্জুন বাইরে তাকাল । ডান দিকে মাসকলাই বাড়ির শাশানটা পেরিয়ে গেল সাঁ করে । তারপরেই সে মনে মনে হেসে ফেলল । কথাটা একদম অসত্য নয় । রায়সাহেব স্বচ্ছন্দে এ রকম ভাবতে পারেন । সে নিজেও জানে না ওঁর কতখানি উপকার করতে পারবে । সামান্য পেন্সিল কাটার ছুরি পর্যন্ত তার কাছে নেই । অমলদা না বললে তাকে উনি নিয়ে যাবেনই বা কেন ? কিন্তু অর্জুন ঠিক করল, যেমন করে হোক রায়সাহেবকে দেখাতে হবে সে কতটা কাজ করতে পারে । সে যে ফেকলু নয় এটা প্রমাণ করতে হবে । কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব মাথায় না আসায় সে ব্যাগে হাত দিল । জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির রাস্তাটা বারংবার দেখার কোনও আকর্ষণ নেই । তার চেয়ে অমলদার বইটা পড়া যাক ।

রঙিন প্লাস্টিকের কভার থাকায় কেউ বুঝতে পারবে না ওটা কী বই । প্রথম পাতা উন্টে অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল একবার প্রচ্ছদের ছবিটা দেখতে । কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে । প্রথম প্রথম সামান্য অস্বস্তি হলেও শেষ পর্যন্ত বইটার মধ্যে ডুবে গেল সে । পাক্ষ সম্প্রদায় সম্পর্কে নানান তথ্য অনেকটা গল্পের ভঙ্গিতে লেখা । কিছু কিছু ইংরেজি শব্দের মানে বুঝতে না পারলেও তার তেমন অসুবিধা হচ্ছিল না । হিপিরদের পরে এখন আমেরিকার নব্যসমাজে পাক্ষ হবার তীব্র প্রবণতা দেখা দিয়েছে । পাক্ষদের প্রথম বক্তব্য হচ্ছে পুরনো সংস্কার বা রীতিনীতি ওরা মানে না । চিরকাল মানুষকে একই নিয়মের মধ্যে বাস করতে হবে কেন ? এই সব ভাবনা যাদের মাথায় তারা দলে দলে বেরিয়ে আসে গৃহ ছেড়ে । সাধারণত নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি ঘনবসতি অঞ্চলে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে । হিপিরদের থেকে এদের পার্থক্য হল এরা ভবঘুরে টাইপের নয় । সাধারণত যে এলাকা এরা দখল নেয় সেই এলাকাটায় ওদের কথাই চূড়ান্ত । এদের দলে আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে ছেলেমেয়ে আছে । এরা খুবই নির্দয় এবং পাষণ্ড টাইপের । প্রয়োজনে এবং সুবিধে পেল পথচারীর জিনিসপত্র ছিনতাই করতে দ্বিধা করে না । সব সময়ে মানুষকে ব্যঙ্গ করে কথা বলে । ছেলে মেয়ে উভয়েই কানের দুই ইঞ্চির ওপর পর্যন্ত মসৃণভাবে কামিয়ে ফেলে । মাথার মাঝখানের চুল ছেঁটে তাতে নানান রকমের উজ্জ্বল রঙ মাখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এরা চামড়ার জ্যাকেট পরতে খুব ভালবাসে । প্রয়োজনে ভিক্ষে করতেও দ্বিধা করে না । এই দলে যেসব পরিবারের ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছে তাদের অনেকেই বেশ বড়লোক । কিন্তু

স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এরা অনিশ্চিত জীবনে পা বাড়িয়েছে স্বেচ্ছায়। অনেকেই মুখে নানান রঙ মাখে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে চায়। সবরকম শুকনো মাদক এরা নেশা হিসেবে ব্যবহার করে। পান্সরা ইচ্ছে করেই ভাল কথা বলে না এবং ভাল ব্যবহার করে না। কারণ তাতে পুরনো সংস্কারকে মর্যাদা দেওয়া হয়।

একটার পর একটা কেস-হিস্ট্রি পড়তে পড়তে অর্জুন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ গাড়ির হর্ন, মানুষের গলা পেয়ে চোখ তুলে দেখল শিলিগুড়ি শহরে ঢুকে পড়েছে তাদের গাড়ি। সামনের কাছে রায়সাহেবের মুদিত চোখ দেখা যাচ্ছে। সে ড্রাইভারের দিকে তাকাল। নেপালি ছেলেরা রোবটের মতো স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। অর্জুন বইটাকে ব্যাগে পুরে রাখল।

মেঘলা দিন। যদিও এখন বৃষ্টি বরছে না তবু আকাশ মুখ হাঁড়ি করে থাকায় দিনের আলো মরে গেছে। বেশ ছায়া ছায়া চারধার। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে আসার পর আর বই মুখে নিয়ে বসে থাকার মানে হয় না। পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দৃশ্যগুলো এখন পর পর সাজানো। ডান দিকে সেবক রেলওয়ে ব্রিজের কাছে আসতেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। লেবেল ক্রসিং। বোধহয় এক্সুনি কোনও ট্রেন যাবে তাই রাস্তায় বন্ধনী নেমে আসছে। ড্রাইভার গাড়ির হ্রদপিণ্ড থামিয়ে দিলেই অর্জুনের মনে হল একটু নেমে দাঁড়ানো যাক। সে দেখল রায়সাহেব একটুও নড়ছেন না। সন্তর্পণে দরজা খুলে পিচের রাস্তায় নামতেই এক বলক টাটকা ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরে লাগল। অর্জুন খুব জোর নিঃশ্বাস নিল। আঃ, ফুল অফ অক্সিজেন। সে দু'এক পা এগিয়ে পিছনে তাকাতেই মনে হল কেউ একজন থতমত খেয়ে একটা গাড়ির আড়ালে চলে গেল। লোকটার ভঙ্গি এত অস্বাভাবিক যে অর্জুন বেশ অবাক হয়ে গেল। তাদের গাড়ির পিছনে ইতিমধ্যে গোটা সাতেক গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। তার একটিতে লোকটি আড়াল নিল। অর্জুন নিঃসন্দেহ হল, যে লুকিয়েছে সে তার মুখোমুখি হতে চায়নি। যে এক বলক চেহারাটা নজরে এসেছিল তাতেই বোঝা যায় লোকটা বেশ শক্তিশালী, মাথার চুল সম্পূর্ণ কামানো এবং গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। পরনে চৌকো ছাপমারা জামা আছে। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল পিছিয়ে গিয়ে লোকটাকে ভালভাবে দেখতে। এই ফাঁকা জায়গায় গাড়িগুলোর আড়াল ছেড়ে নিশ্চয়ই কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু তারপরেই অমল সোমের কথা মনে হল। তাকে একজন মফস্বলের ছেলের মতো বোকা বোকা হয়ে থাকতে হবে। সে যে লোকটাকে দেখে সন্দেহ করছে এটা ওকে বুঝতে না দেওয়ারই ভাব। যদি কোনও কারণে লোকটা রায়সাহেবের পিছু নিয়ে থাকে তবে এখন অন্তত ও এই ভেবে নিশ্চিত থাকুক, তাকে কেউ লক্ষ্য করেনি।

একটা কয়লার ইঞ্জিন মালগাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর লেবেল ক্রসিংয়ের বাঁধন খুললো। নিজের আসনে বসেও অর্জুনের অস্বস্তি যাচ্ছিল

না। অত ফর্সা রং কোনও ভারতীয়ের হওয়া সম্ভব নয়। সিকিমিজ বা নেপালি হতে পারে। তবে ওদের রঙে একটা হলদে ভাব মিশে থাকে। যদিও দূর থেকে দেখা কিন্তু অর্জুনের মনে হচ্ছিল লোকটা এদেশি নয়। সে সামনের কাছে দেখলো রায়সাহেব তেমনি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন।

আর একটু বাদেই অর্জুনের মনটা ভাল হয়ে গেল। ডান দিকে অনেক নীচে তিস্তা আর তার ওপরে সেই বিখ্যাত করোনেশন সেবক ব্রিজ। নিস্তর্র এই পরিবেশে ব্রিজটাকে চমৎকার দেখাল। দুটো পাহাড়কে অর্ধবৃত্তের আকারে ব্রিজটা বেঁধে রেখেছে। ওর একদিকে দুটো পাথরের সিংহ, অন্য দিকে দুটো বাঘ থাকা মেলে বসে আছে। ব্রিজটাকে ডান দিকে রেখে ওদের গাড়ি পাহাড়ি পথে ঐঁকে বেঁকে উঠতে লাগল। ঘড়িতে এখন মাত্র সাড়ে তিনটে কিন্তু দিনের আলো খুব দ্রুত কমে যাচ্ছিল। অর্জুন বাইরে ঝুঁকে দেখল পিছনে গাড়ির সংখ্যা আরও বেড়েছে। তবে বাঁক থাকায় তাদের সম্পর্কে ধারণা করা যাচ্ছে না। হঠাৎ গর্জন কানে এল একটা এবং তারপরেই চোখে পড়ল বাঁ দিকের পাহাড় থেকে বিশাল জলরাশি আছড়ে পড়ছে রাস্তায়, সাদা ফেনা তুলে ছিটকে যাচ্ছে নীচের খাদে যেখানে তিস্তা বয়ে যাচ্ছে। স্রোত এত প্রবল যে সামনের গাড়িগুলো খুব দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল।

শব্দ শুনে উঠে বসেছিলেন রায়সাহেব। সামনের দৃশ্য না দেখে বললেন, ‘বিউটিফুল! কাল যাওয়ার সময় তো এটাকে দেখিনি।’

নেপালি ড্রাইভার এই প্রথম কথা বলল। ‘পাহাড়ে বৃষ্টি হলে পাগলাঝোরা এইরকমই খেপে ওঠে।’

পাগলাঝোরা পেরিয়ে আসার পর অর্জুন কথা বলল, ‘রায়সাহেব, আপনি কি জানেন কোনও বিদেশি আপনাকে অনুসরণ করছে কিনা।’

‘বিদেশি? হোয়াট ডু ইউ মিন?’

‘আমি আপনার কেসটা অমল সোমের কাছ থেকে শোনার সময় পাইনি। কিছু না জেনেই জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি কোনও বিদেশির কাছ থেকে বিপদ আশঙ্কা করছেন?’

‘প্রায় তাই। বাট হাউ ডু ইউ নো?’

‘আমার বিশ্বাস কেউ এই গাড়িকে ফলো করছে। লেবেল ক্রসিং-এ যখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তখন একটি বিদেশি চেহারার ন্যাড়া মাথার মানুষকে দেখলাম আমাদের গাড়ির দিকে আসতে আসতে চট করে লুকিয়ে পড়ল।’

‘তুমি ঠিক দেখেছ?’ এইবার স্পষ্ট তুমি বললেন রায়সাহেব।

‘হ্যাঁ।’

‘কী রকম দেখতে লোকটাকে?’

‘লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল, মাথা কামানো আর চৌকো ছাপমারা জামা পরনে।’

রায়সাহেবের মুখটাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা

মতলব এসে গেল। সে বলল, ‘সামনেই কালিঝোরা নামে একটা ঝরনার পাশে ডাকবাংলো পড়বে। ওখানে গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে। আমরা ওখানে অপেক্ষা করে পিছনের গাড়িগুলোকে দেখতে পারি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।’

রায়সাহেব মাথা নাড়লেন, ‘না। তার দরকার নেই। আমি তাড়াতাড়ি কালিম্পিং-এ ফিরে যেতে চাই। আই ওয়ান্ট টু সি মাই ডটার ফার্স্ট, ও অনেকক্ষণ একা আছে।’

অর্জুনের আফশোষ হচ্ছিল। এইরকম একটা সুযোগ পাহাড়ি পথে বড় একটা পাওয়া যায় না। তার সন্দেহটা সঠিক কিনা যাচাই করা যেত। চোখের সামনে দিয়ে কালিঝোরা বাংলাটাকে বেরিয়ে যেতে দেখল সে। ছবির মতো বাংলা। গতবার যাওয়া-আসার পথে এটাকে দেখে খুব লোভ হয়েছিল একবার ভেতরে যাওয়ার। ফেরার সময়ে দেখা যাবে।

তিস্তাবাজার হয়ে কালিম্পিং-এ পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বৃষ্টির জনাই বোধহয় গাড়ির কাচ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বেশ ঠাণ্ডা আসছিল। অর্জুন ব্যাগ খুলে একটা পুলওভার শরীরে চাপিয়ে নিল। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে গাড়িটা হঠাৎ বাঁদিকে মোড় নিল। অর্জুনের ভাল লাগছিল। এই রাস্তাটা সে চেনে। এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সেই দূরবীন দাঁড়া যেখানে খুনখারাপির অমন কাণ্ডটা ঘটেছিল। মিনিট দশেক যাওয়ার পর বড় রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ল গাড়ি। তারপর একটা বিরাট গেটওয়ালা অন্ধকার বাড়ির সামনে গিয়ে দু’বার হর্ন বাজাতে কেউ গেট খুলে দিল। সামনে গাছপালা একটু বেশি মাত্রায় থাকায় আলো দেখা যাচ্ছিল না। বাগান ঘুরে গাড়িটা দোতলা প্রাসাদ টাইপের বাড়ির নীচে দাঁড়াতে অর্জুন বুঝলো রায়সাহেব প্রকৃতই বড়লোক। প্রচুর টাকা না থাকলে এমন বাড়ি চট করে কেনা যায় না। বিদেশ থেকে এসে এইরকম বাড়ির সন্ধান পাওয়াও কম কথা নয়।

গাড়িটা থামতেই একটা দারোয়ান টাইপের লোক ছুটে এসে দরজা খুলে দিতে রায়সাহেব মাটিতে পা দিলেন। অর্জুন গুনল, ড্রাইভারকে ধরলে এটি তিন নম্বর কর্মচারী। রায়সাহেব বললেন, ‘এসো। জিনিসগুলো ওরাই ঘরে পৌঁছে দেবে।’

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা কিন্তু রায়সাহেব গরমজামা পরেননি। অর্জুন ঠুঁর পিছনে হেঁটে একটা চমৎকার ড্রাইংরুমে চলে এল। সবুজ কার্পেটে ঢাকা ঘরটায় প্রচুর দামী আসবাবপত্র, দেওয়াল সাজাবার মধ্যে শৌখিনতা স্পষ্ট। রায়সাহেব বললেন, ‘বসো।’ তারপর চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সব ঠিক আছে?’

প্রশ্নটা যার উদ্দেশ্যে তাকে এতক্ষণ দেখতে পায়নি অর্জুন। একটি শীর্ণ বৃদ্ধা আড়াল ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। গায়ের রঙ আর মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় না মহিলা কোন দেশের মানুষ। স্মিত হেসে তিনি জানালেন,

‘এভরিথিং পারফেক্ট ।’

উচ্চারণটা অদ্ভুত, ট-কে উনি ত বললেন ।

‘ওয়েল ।’ রায়সাহেবকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাল এতক্ষণে, ‘এর নাম হল উপল-নারায়ণ । আমার ভাইপো । খুব সিম্পল ছেলে । ও এখানে কিছুদিন থাকবে ।’

রায়সাহেব মহিলাকে ইংরাজিতে কথাগুলি বলতেই তিনি হাসলেন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে । তারপর ফিরে গেলেন পিছনের দরজায় । এবার সামনের সোফায় বসে রায়সাহেব নিচুগলায় বললেন, ‘শোন, তোমাকে দুটো কথা বলে দিচ্ছি । আমার মেয়ে খুব হিংস্র টাইপের । ওটা ও ইচ্ছে করেই করে । অতএব সব সময় চেষ্টা করবে ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে । আর তুমি কি সিগারেট খাও ?’

দ্রুত মাথা নাড়ল অর্জুন । তার সিগারেটের নেশা নেই, মাঝে-মাঝে খায় শখ হলে । ‘গুড । এই বাড়িতে আমরা কেউ কোনও নেশা করি না । এসো আমার সঙ্গে ।’

রায়সাহেব ওকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিয়ে এলেন । লম্বা করিডোরে আলো জ্বলছে । কোণের দিকে একটা ঘর দেখিয়ে তিনি বললেন, ‘ওই ঘরটা তুমি ব্যবহার করবে । আর দিনের বেলায় যতটা পারো ঘর থেকে কম বেরিও ।’

রায়সাহেব তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যেতে অর্জুন পদাটী তুলল । ঘরে আলো জ্বলছে । তার ব্যাগটা টেবিলের ওপর । পায়ের তলায় কার্পেট, বাহারি পর্দার ওপাশে জানালা বন্ধ । চারজনের বসার মতো সোফা রয়েছে একপাশে । ডানদিকের দেওয়াল জুড়ে সমুদ্রতীরের বাঁধান ছবি । বিছানাটা ধবধবে । হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতেই অর্জুন বুঝল এইরকম আরামদায়ক বিছানায় সে কখনও শোয়নি । শুধু বিছানায় কেন, এইরকম সাজানো ঘরে সে কোনওকালে বাস করেনি । রায়সাহেব যে প্রকৃতিই অবস্থাপন্ন তাতে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না ।

ডানদিকের ছবির পাশে যে দেওয়াল আলমারি সেখানে ব্যাগটাকে ঢুকিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকল অর্জুন । জলপাইগুড়িতে কারও বাড়িতে এমন বাথরুম আছে কিনা সে জানে না । কিছুক্ষণ চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে । পুরো ঘরটাই সাদা পাথরে ঢাকা । একদিকের দেওয়াল জুড়ে আয়না, উটেদিকে ছোট আয়নার গায়ে কত রকমের শ্যাম্পু, তেল, পেস্ট ও নতুন ব্রাশ । ওপাশটা পর্দা দিয়ে ঢাকা । সেটা সরিয়ে একটা শাওয়ার সমেত বাথটব আর কমোড দেখতে পেল সে । দুটো নতুন তোয়ালে রাখা আছে র‍্যাকে ।

পরিস্কার হয়ে এসে জানালায় দাঁড়াল অর্জুন । খুব সাবধানে পান্নাটা খুলে দিতে ঘরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরের গাছের ডালপাতায় । ঘুটঘুটে

অন্ধকারে বাগান ঢাকা । এই সময়ে কেউ যদি ওখানে যাওয়া-আসা করে তা হলে টের পাওয়া মুশকিল ।

দরজায় মৃদু শব্দ হতে অর্জুন পিছনে ফিরে দেখল একটি লোক, বয়স্ক, একটা ট্রে হাতে নিচু মাথায় ঘরে ঢুকে টেবিলে রেখে চুপচাপ বেরিয়ে গেল । ট্রের ওপর কাজ-করা ঢাকনা । তাতে সুন্দর টি-পট, কাপড়িশি, চিনি, দুধ আর একটা প্লেটে বড় কেক রয়েছে । এসব দেখেই খিদে পেয়ে গেল অর্জুনের । তাড়াহুড়োয় দুপুরের খাবার ভাল করে খাওয়া হয়নি । এই প্রথম সে নিজে চা বানিয়ে খেল ।

চা খাওয়া শেষ হতে অর্জুন সোফায় গিয়ে বসল । জানলা দিয়ে হিম ঢুকল খুব । কিন্তু সোয়েটার থাকায় বেশ ভালই লাগছে । ঠিক সেই সময় একটা মেয়েলি চিৎকার কানে বাজতেই অর্জুন প্রায় লাফিয়ে উঠল । এরকম ধারালো চিৎকার সে কোনও কালে শোনেনি । চিৎকারটা একবার হয়েই আবার সব চুপচাপ । শব্দটা এমন আকস্মিক ছিল যে অর্জুনের বুকের ভেতরটা তখনও কাঁপছিল । সে উঠে জানলা বন্ধ করল । তারপর ধীরে ধীরে দরজায় এসে দাঁড়াল । লম্বা করিডোরে আলো জ্বলছে । একটি লোক সিঁড়ির মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে । তাকে দেখে ভাবলেশবিহীন মুখে মাথা নোয়ালো । লোকটা কি পাহারাদার ? সে ওর সামনে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল, ‘কিসের চিৎকার ?’

লোকটা একবার বোবাচোখে ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল । অর্জুন বুঝল ও কথা বলতে চাইছে না, হয়তো সেইরকম নির্দেশ আছে ওর ওপর ।

কিছুটা কৌতূহলী হয়ে অর্জুন নীচে নেমে এল । সে লক্ষ করল, প্রত্যেক বাঁকে আলোর ব্যবস্থা আছে । এই বাড়ির কোথাও অন্ধকার নেই অথচ বাইরে থেকে গাছপালার আড়াল থাকায় সেটা একটুও টের পাওয়া যায় না ।

নীচের ঘরে এসে অর্জুনের বিটুসাহেবের কথা মনে পড়ল । বিটুসাহেব এর পাশেই থাকেন । আগের বার সময় না থাকায় বিটুসাহেবের বাড়িতে যাওয়া হয়নি । এই যোগাযোগটা উনিই যখন করিয়ে দিয়েছেন তখন একবার দেখা করাটা ভদ্রতা । যদিও এখন সামান্য রাত হয়েছে তবুও— । অর্জুনের মনে পড়ল অমল সোমের নিষেধাজ্ঞার কথা । কিন্তু সেটা তো শুধু ওঁর বাড়িতে যেন সে রাতে না থাকে এই পর্যন্তই । একবার দেখা করলে ক্ষতি কী ! তার মনে হচ্ছিল বিটুসাহেবের কাছ থেকে কিছু নতুন খবর পাওয়া যাবে । ওইরকম হঠাৎ-চিৎকারের রহস্যটা জানতে খুব ইচ্ছে করছিল ।

ঠিক এইসময় রায়সাহেব নেমে এলেন । এখন ওর সঙ্গে হাল্কা পোশাক । একটু গম্ভীর মুখ । অর্জুনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এনি প্রব্লেম ?’

‘তেমন কিছু নয় । ভাবছিলাম একবার বিটুসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাব কিনা !’ অর্জুন বিনীত গলায় বলল । সঙ্গে সঙ্গে রায়সাহেব ঠোঁট কামড়ালেন । তারপর নিচুগলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বিটুসাহেব মানে বিষ্ণুচরণ পত্নবীশ ?’

‘হ্যাঁ। ওঁকে আমরা ওই নামেই ডাকি।’

‘কিন্তু তুমি ওকে চিনলে কী করে?’

‘চিনব না মানে? উনি তো—।’ অর্জুনকে ইশারায় থামিয়ে দিলেন রায়সাহেব। তারপর আরও নিচু গলায় বললেন, ‘উপল, তুমি জলপাইগুড়ির কলেজে পড়—তাই না? বিষ্ণুবাবু কালিম্পং—এ থাকেন। তাই তো?’

এবার ইঙ্গিতটা ধরতে পারল অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বোকামির জন্য লজ্জা পেল ও। বিষ্ণুসাহেব তার পরিচিত কিন্তু উপলনারায়ণের নয়। এখন যদি সে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় তাহলে সবাই সন্দেহের চোখে দেখবে। সে নীরবে মাথা নাড়তেই রায়সাহেব বললেন, ‘একটু আগে আমি বিষ্ণুবাবুকে কল করেছিলাম। ওঁকে বলেছি জলপাইগুড়ি থেকে আমার ভাইপো এসেছে, ক’দিন থাকবে। তো উনি বলেছেন কাল সকালে একবার এখানে বেড়াতে আসবেন। আর হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। রাত্রে আমাকে না বলে কখনওই বাড়ির বাইরে বাগানে পা দেবে না। আমার চারটে পোষা হাউন্ড আছে। সাতটার পর ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব হিংস্র।’

‘হাউন্ড?’

‘খুব হিংস্র প্রাণী। আমাদের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। ওরা ছাড়া এই বাড়িতে আরও পাঁচজন গার্ড আছে। খুব রিলায়েবল। তবু আমি অস্বস্তি বোধ করছি।’ রায়সাহেব অন্যমনস্কভাবে তাঁর চুলে হাত বোলালেন।

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল রহস্যটা কী তা জানতে। রায়সাহেবের অস্বস্তির কারণ কী? কাকে ভয় করছেন তিনি? কিন্তু এত বয়স্ক একটা মানুষকে সরাসরি প্রশ্ন করার যোগ্যতা তো তার নেই। সে শুধু বলল, ‘অমলদা এলে নিশ্চয়ই উপকার হবে।’

‘তাই তো মনে হয়েছে। কিন্তু উনি আসতেই চাইলেন না। যা হোক, আজ রাত্রে তুমি একা খেয়ো। আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। তোমার যদি বইপত্র দরকার হয় তা হলে দোতলার সিঁড়ির ডানদিকের ঘরে যেয়ো। সেখানে কিছু বই আছে। গুড নাইট।’

রায়সাহেব আবার দোতলায় উঠে গেলেন।

অর্জুন দরজার দিকে তাকাল। সেটা ভেতর থেকে তালা বন্ধ। একটি মানুষ তার সামনে টুলে বসে। যে পাঁচজন গার্ড আছে এ তার একজন। স্বাস্থ্যবান নেপালি। কিছুক্ষণ বসে থেকে অর্জুন ওপরে উঠে এল। সেই পাহারাদারটি ওখানে ঠিক একই ভঙ্গিতে রয়েছে। অর্জুনকে ভ্রূক্ষেপ করছে না সে। রায়সাহেবের নির্দেশমতো ঘরটায় ঢুকে বেশ ভাল লাগল। প্রচুর বই আলমারিগুলোয়। তন্ময় হয়ে বইগুলো দেখছিল অর্জুন। সবই ইংরেজিতে লেখা। একটা আলমারিতে ভারি ভারি প্রবন্ধের বই। আর একটায় বিখ্যাত সব

ক্লাসিক। চার নম্বর আলমারিতে ক্রাইমের ওপর লেখা বই দেখতে পেয়ে সে দাঁড়াল। সেই সময় পিছন থেকে কেউ শিশু দিয়ে উঠল মৃদুস্বরে। ঠিক সাপের শিশুর মতন।

চমকে উঠে মুখ ফেরাতে অর্জুন অবাক হয়ে গেল। অপূর্বসুন্দরী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তার পরনে পা ঢাকা ম্যাক্সি, ঘন কালো চুল কাঁধ অবধি, নাক ঠোঁট এবং চিবুকে চমৎকার সৌন্দর্য কিন্তু চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। হিংস্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে সে অর্জুনের দিকে—সে চাহনির সামনে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল অর্জুন। তারপর যেন নিজেই ধাতস্থ করতেই বোকার মতো হাসল।

‘হু দ্য হেল যু আর?’

মেয়েটির ঠোঁট থেকে এই বাক্যটি বেরিয়ে এলেও অর্জুনের মনে হল এমন উচ্চারণ সে জীবনে শোনেনি। কেমন যেন জড়ানো জড়ানো। মাঝের দু-একটা শব্দ অনুমান করে নিতে হয়। কিন্তু বলার ভঙ্গিতে যে আদেশ আছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। মেয়েটি ততক্ষণে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার মুখে এখন কয়েকটি কঠিন রেখা ফুটে উঠল, ‘কে তুমি বল, নইলে আমি চোঁচাবো!’ কথাগুলো স্বচ্ছন্দ নয়, উচ্চারণে পরিষ্কার বিদেশি টান আছে।

এবার অর্জুন সোজা হল, এবং তার মনে পড়ল কী পরিচয় দিতে হবে, ‘আমার নাম উপলনারায়ণ রায়। আমি আপনার কাকার ছেলে। খুড়তুতো ভাই।’

‘ভাই?’ মুখ বিকৃত করল মেয়েটি, ‘তুমি আবার কোথেকে জুটলে?’

‘আপনার বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন এখানে।’

‘আমার বাবা?’ খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, ‘হাউ ডু যু নো হি ইজ মাই ফাদার? তুমি জানো আমি কে?’

এবার চমকে উঠল অর্জুন। সত্যিই তো সে জানে না এই মেয়েটি রায়সাহেবের মেয়ে কিনা? এই বাড়িতে রায়সাহেবের মেয়ে আছে জেনেই সে অনুমানে ওকে ওই পরিচয়ে ভেবেছে। কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়েছে, এর মধ্যেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, ‘ভূতের মতো বাবা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, টেল মি।’

এই সময় সেই শীর্ণ মহিলা দরজায় দেখা দিলেন, ‘ওঃ, সীতা, প্লিজ শাস্ত হও।’

ইংরেজিতে অনুরোধ করলেন তিনি।

‘নো। কী ভেবেছ তোমরা? যাকে তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবে? এই লোকটা কে আমি জানতে চাই।’ আঙুল তুলল সীতা।

‘ওয়েল, হি ইজ ইওর ব্রাদার। তোমার বাবার ভাই—এর ছেলে। মফস্বলে

থাকেন ।’

‘আই সি । ওকে একটা ভূতের মতন দেখতে । ডাল্ ।’

‘ঠিক আছে, তুমি এখন ঘরে চল । এত এক্সাইটমেন্ট ভাল নয় ।’

‘দ্যাটস নট ইওর বিজনেস ।’ বলেই সে অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ‘ভূত ইউ আর মাই ব্রাদার ?’

অর্জুন নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল । মেয়েটির ভাব-ভঙ্গিতে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল । কোনও স্বাভাবিক প্রকৃতির মেয়ে এই রকম আচরণ করে না ।

মেয়েটি বলল, ‘দেন ইউ শ্যুড নো । এরা আমাদের বন্দী করে রেখেছে । কিন্তু আমি এখানে থাকব না । ওরা আমাদের উদ্ধার করবেই । আই মাস্ট গো ব্যাক টু সানফ্র্যানসিসকো । এ সব তোমাকে কী বলছি, তুমি তো গ্রামের ভূত, তুমি এর কী বুঝবে !’

বিকারগ্রস্ত গলায় মেয়েটি কথা বলছিল । ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল । অর্জুন লক্ষ করল ওর চোঁট খরখর করে নড়ছে, নাকে এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম জমেছে । এবার ওই বৃদ্ধা এগিয়ে এসে মেয়েটির দুটো কাঁধ ধরলেন, ‘সীতা, শান্ত হও, ও তোমার ভাই । ওর সঙ্গে ওই ভাবে কথা বলা উচিত নয় ।’

‘আই ডোন্ট কেয়ার । এতদিন আমি একা ছিলাম, কোথেকে এই ভাই এসে জুটলো ! আর এত কথার দরকার কী ? আমি দেশে ফিরে যেতে চাই ।’ এক ঝটকায় বৃদ্ধার হাত সরিয়ে দিতে চাইল সীতা কিন্তু সক্ষম হল না । কিন্তু অর্জুন লক্ষ করছিল এতটা উত্তেজিত হওয়ার ফলেই বোধহয় সীতা আস্তে আস্তে বিমিয়ে পড়ছে । সে ধীর গলায় বলল, ‘আপনি মিছামিছি রাগ করছেন ।’

মেয়েটি কিছু কড়া কথা বলতে গিয়ে যেন পারল না । ওর চোখের পাতা একবার খুলেই বন্ধ হয়ে এল ।

বৃদ্ধা দু’হাতে ওকে জড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । ওরা চলে যাওয়ার পর অর্জুনের ধাতস্থ হতে বেশ সময় লাগল । সে আর আলমারিতে হাত দিল না ।

নিজের ঘরে এসে সোফায় শরীর এলিয়ে বসে পড়ল অর্জুন । সমস্ত ঘটনাগুলো সে এবার মনে মনে সাজাতে লাগল । অমলদা বলেছেন ভাল সত্যসন্ধানী বারংবার ঘটনাগুলোকে নানান দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করে থাকেন । কখনওই একটা অর্থের ভার পিঠে টেনে নেন না । তাঁকে রাখতে হবে চোখ খোলা এবং মন পরিষ্কার । কিন্তু এসব করেও সে নিজে মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারল না । অমলদা বলেছিলেন রায়সাহেবের মেয়ে পাঙ্ক হয়ে যাওয়ায় তিনি ওকে জোর করে এদেশে নিয়ে এসেছেন । পাঙ্ক-এর যে ছবি সে বই-এর প্রচ্ছদে দেখেছে তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই মেয়েটির । ওকে তো বেশ সভ্যভব্য মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে । শুধু সানফ্র্যানসিসকো শহরে ফিরে যাওয়ার দাবি ছাড়া অন্য কোনও ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি মেয়েটি । দ্বিতীয়ত, ওকে একটুও

সুস্থ বলে মনে হয়নি অর্জুনের। এ রকম অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে রায়সাহেবের অন্য আশঙ্কা হবেই বা কেমন করে !

অর্জুন আরও বিশদভাবে ঘটনাগুলো চিন্তা করছিল। রায়সাহেব কালিম্পং শহরে প্রাসাদের মতো একটি বাড়ি কিনেছেন। আমেরিকান টাকায় সেটা তিনি কিনতেই পারেন। সরকার যদি আপত্তিকর কিছু না পায় তা হলে কেনাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই বাড়িটাকে পাহারা দিতে পাঁচজন গার্ড রাখতে হয়েছে ওঁকে। কেন ? প্রত্যেকটা ঘরের আসবাব ওঁর সম্পদের পরিমাণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিন্তু নেহাৎ চোর-ডাকাতের ভয়ে এই রকম কড়া পাহারার ব্যবস্থা হতে পারে না। হাউন্ডদের ছেড়ে দেন বাগানে। হাউন্ডরা খুব হিংস্র হয়। কোনও ভাবেই তাদের প্রলুব্ধ করা যায় না। ওদের এড়িয়ে এই বাড়িতে কোনও মানুষের পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। হাউন্ডদের রাখা হল কেন ? তা ছাড়া ওই বৃদ্ধাটিকে রায়সাহেব নিশ্চিত বিদেশ থেকে এনেছেন। প্রথমে যতটা বৃদ্ধা মনে হয়েছিল একটু আগে ততটা মনে হয়নি। মহিলার শরীরে বেশ শক্তি আছে। ওঁকে কেন নিয়ে এলেন রায়সাহেব ? শুধু মেয়েকে একজন নার্সের কাছে রাখতে হবে এই যুক্তিতে বিদেশ থেকে কাউকে আনা হাস্যকর। কিন্তু মহিলা বেশ ভদ্র এটুকু বোঝা যাচ্ছে।

অর্জুন বুঝতে পারছিল এই বাড়িতে সন্দেহজনক অনেক কিছু রয়েছে কিন্তু সে তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। অমল সোমের সহকারী হিসেবে সে যদি সত্য সন্ধানের কাজে নামে তা হলে এই না বুঝতে পারাটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তাকে যেমন করেই হোক এই পাঁচদিনে এই সবেৰ উপযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা সমস্যার কথা তার মনে উদয় হল। অমল সোম তাকে বলেছেন দিনের বেলায় ঘুমোতে আর রাত্রে জাগতে। রাত্রে এই বাড়িতে কেউ আসে কিনা, এলে তারা কে, সে বিষয়ে নজর রাখতে। কিন্তু যে বাড়ির বাগানে হাউন্ডরা ঘুরে বেড়ায় সেই বাড়িতে কেউ প্রাণ হাতে করে রাত্রে ঢুকবে না। তা হলে সে কার ওপর নজর রাখবে রাত জেগে।

তবু অর্জুন ঠিক করল অমল সোমের নির্দেশ প্রথমে রাত্রে মানতেই হবে। কেউ আসুক বা না আসুক তাকে লক্ষ রাখতে হবেই। আগামীকাল বিটুসাহেব এলে এমন ব্যবস্থা করে নেবে যাতে অমলদাকে নিয়মিত খবর পাঠাতে পারা যায়। সে রাত জাগেনি এই খবরটা অমলদার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে না। অমলদা একবার বলেছিলেন, মনে রেখ অর্জুন, বুনো হাতি বল আর চালাক বাঘই বল, এ সবেৰ চেয়ে একটি ধূর্ত মানুষ অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ মানুষের মাথায় যে বুদ্ধি খেলে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য ঈশ্বরেরও নেই !

পাজামা পাঞ্জাবি আর চাদর জড়িয়ে আবার সোফায় বসল সে। পাঞ্জাবিটা খদ্দরের। অমলদার দেওয়া। এই কাপড়ের একটা পাঞ্জাবি ওঁর আছে। অর্জুন

আলমারি খুলে ব্যাগ থেকে বইটা বের করল। এখন তার আর ইংরেজির খটমটো শব্দগুলোয় অসুবিধে হচ্ছে না। শব্দের অর্থ না বুঝলেও পুরো বাক্যটা থেকে মোটামুটি একটা অর্থ অনুভব করা যাচ্ছে। তাতে বুঝতে পারছে বইটা খুব ইন্টারেস্টিং। অর্জুন ক্রমশ পাস্ক বই-এর পাতায় ডুবে গেল। পাস্করা খুব দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। ওদের একটা সতর্ক চেষ্টা থাকে যাতে পুলিশের সঙ্গে কোনও সংঘর্ষ না হয়। প্রত্যেকটা পাস্ক মাদকদ্রব্যের শিকার। তাদের মাদক-অভ্যাস এমন মারাত্মক যে কেউ কোনও অবস্থায় দল ছেড়ে যেতে সাহস করে না। কারণ দলের বাইরে গেলে ওই মাদক পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনে সেই মাদক না পেলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই তারা যে করে হোক দলে ফিরে যেতে চায়।

এইখানে অর্জুন সোজা হয়ে বসল। সীতা যে অসুস্থ তা এখন স্পষ্ট। সে নিশ্চয়ই মাদকদ্রব্যের শিকার। ওর ওই সানফ্র্যানসিস্কো ফিরে যাওয়ার বাসনা শুধু দলের সঙ্গে মিলতে পারবে বলেই। একবার দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলে নিশ্চয়ই আর মাদকদ্রব্য পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়েই থমকে গেল অর্জুন।

না, তার ভাবনাটা একপেশে হয়ে যাচ্ছে। অমলদার নির্দেশমতো তাকে মন খুলে রাখতে হবে। সে আবার বই-এর পাতায় মন দিল। এর পরের পাতাগুলোয় পাস্কদের নানারকম অত্যাচারের বিবরণ। পাস্করা যে ভদ্রতার ধার ধারে না, কুকথা তাদের জিভে থুতুর মতো লেগে আছে এই সব বিবরণ। একজন সাংবাদিক একটি পাস্ক মেয়ের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে কী রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সেই ঘটনাটা পড়ল অর্জুন। সাংবাদিক পরে বলেছিলেন, একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে যে অমন নোংরা কথা অকারণে বলতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না।

ঠিক এইসময় দরজায় শব্দ হতে অর্জুন চমকে বইটা আড়াল করার চেষ্টা করল। না, যে লোকটা চা দিয়ে গিয়েছিল তখন সেই ঢুকছে খাবারের ট্রে নিয়ে। চুপচাপ টেবিলে ওগুলোকে নামিয়ে যখন লোকটা ফিরে যাচ্ছে তখন অর্জুন ওকে ডাকল, 'এই যে, শুনুন।'

ইচ্ছে করেই আপনি বলল অর্জুন। কারণ যে-কোনও বয়স্ক মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বললে তারা যে খুশি হয় এটা সে জেনেছে। লোকটি মুখ নিচু করে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'রায়সাহেবের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?' লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ।' এই লোকটি নেপালি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ও ভাল বাংলা বোঝে। উত্তর দেওয়া হলে লোকটি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম কী ভাই?'

এবার সরাসরি চোখ তুলে তাকাল লোকটি। তারপর কোনও কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল দ্রুত পায়ে। অবাক হয়ে গেল অর্জুন। লোকটাকে দেখে ১০৬

বেশ সরল-স্বভাবের মনে হয়েছিল। এইরকম অভদ্রভাবে চলে যাওয়ার কোনও কারণ প্রথমে পেল না সে। তারপরেই মনে হল ওর ওপর কি নির্দেশ আছে কোনও প্রেমের উত্তর যেন না দেয়! রায়সাহেব কি তার কাছ থেকে এই বাড়ির রহস্য লুকিয়ে রাখতে চান? তাই যদি হয় তা হলে তিনি তাকে নিয়ে এলেন কেন এখানে? অর্জুনের খুব রাগ হচ্ছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল রায়সাহেব তাকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অমলদা এলে নিশ্চয়ই এরকম ব্যবহার করার সাহস করতেন না ভদ্রলোক। সে এই লোকটিকে কী আর এমন জিজ্ঞাসা করতে পারত। এখন যদিও অনুমান করতে পারছে তবু সঠিক হবার জন্যে জানতে চাইতো ওরা এই বাড়িতে আসার পর ওরকম তীক্ষ্ণগলায় কে চিৎকার করে উঠেছিল এবং কেন করেছিল? কোনও গোপনীয়তা না থাকলে উত্তরটা দিতে কী অসুবিধে হত লোকটার!

অর্জুন খাবারের টেবিলে উঠে এল। ভাত, তন্দুরি রুটি, মাংস আর দুধ, সামান্য জমানো। সম্পূর্ণ দিশি খাবার। রায়সাহেব কি সাহেবি খাবার খান না? স্বাদ বড় মনোরম, যে রান্না করে তার এলেম আছে। খিদেও পেয়েছিল বেশ। খুব দ্রুত খাওয়া শেষ হয়ে গেল অর্জুন বাথরুমে ঢুকল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সে অবাক হল। টেবিলে কোনও এঁটো বাসন নেই। তার অনুপস্থিতিতেই ওগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। লোকটা বোধহয় তার মুখোমুখি হতে চায়নি।

ঘড়িতে এখন মাত্র সাড়ে নটা। কিন্তু এতদূর গাড়িতে আসার জন্যেই হোক কিংবা অনেকক্ষণ পরে পেটে ভাল খাবার পড়ার জন্যেই হোক, অর্জুনের শরীর আরাম চাইছিল। সাদা বিছানার দিকে তাকাল সে। একবার ওখানে শরীর এলিয়ে দিলে রাতটা চোখের নিমেষে শেষ হয়ে যাবে।

আলো নেভাবার আগে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে অবাক হল অর্জুন। কোনও ছিটকিনি বা খিল নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা যাবে না। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু সে বুঝতে পারছিল না। শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা থাকবে না? সে ভাল করে লক্ষ করল। না, কখনও সে রকম কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে না। এই ঘরটা কি সব সময় এমনি খোলা থাকে? এই বাড়ির প্রতিটি ঘরেই কি এক ব্যবস্থা? অর্জুন হতাশ হল। তারপর ঘরের মাঝখান থেকে বড় টেবিলটাকে অনেক কষ্টে টেনেটুনে দরজার গায়ে আটকে দিল। এখন যদি কেউ এই ঘরে আসতে চায় তাকে ওই টেবিল গায়ের জোরে সরিয়ে ঢুকতে হবে। এবং তাতে টের পেয়ে যাবে সে।

আলো নিভিয়ে দিল অর্জুন। তারপর সন্তর্পণে জানলা খুলল। বাইরে শুধুই ঘন অন্ধকার। প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। পরে টের পেল একটা বাঁকড়া গাছ সামনে থাকায় দৃষ্টি আড়াল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখানে দাঁড়ালে কিছুই দেখতে পাবে না সে। পাশের জানলাটার অনেকখানি ওই গাছটা আড়াল

করে রেখেছে। অতএব এই ঘর থেকে বাগানের কিছুই দেখা যাবে না। অর্জুন জানলা বন্ধ করে দিল। সামান্য সময় খোলা থাকায় ঘরে বেশ ঠাণ্ডা ঢুকেছে। অথচ ওরা যখন সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসেছিল তখন এত ঠাণ্ডা ছিল না।

অর্জুনের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। রায়সাহেব কি জেনে-শুনেই তাকে এই ঘরে থাকতে দিয়েছেন! উনি কি চান না অর্জুন কিছু জানতে পারুক? এতে ওঁর লাভ কী? উনি তো যেচে অমলদার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন! হঠাৎ অর্জুনের মনে হল বাথরুমেও একটা জানলা দেখেছে। সে অন্ধকার হাতড়ে বাথরুমে চলে এল। তারপর সন্তর্পণে ছিটকিনি তুলতে চেষ্টা করল। সম্ভবত দীর্ঘকাল এই জানলা খোলা হয় না। প্রচণ্ড টাইট হয়ে আছে পাল্লাদুটো। বেশ কিছুক্ষণ চাপ দেওয়ার পর সামান্য শব্দ করে জানলাটা খুলল। শব্দটা এই রাতে বেশ কানে লাগতে অর্জুন স্থির হয়ে দাঁড়াল। মিনিট দুয়েক ধরে কোথাও কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখতে পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হল।

চাদরটায় অর্জুন মাথা ঢেকে নিল। ঠাণ্ডাটা বেশ কনকনে। সে টের পেল ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। এত পাতলা বৃষ্টি যে কোনও শব্দ হচ্ছে না। এই জানলার বাইরে কোনও আড়াল নেই। ঘন অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও বাগানটাকে আঁচ করতে পারল সে। সারাটা রাত তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভেবে অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। তার মনে পড়ল বাথটবের গায়ে একটা টুল দেখতে পেয়েছিল আগে। অন্ধকারে সেটাকে হাতড়ে খুঁজে পেল। টুলটাকে জানলার তলায় নিয়ে এসে বসতে বেশ আরাম লাগল। এখান থেকে মাথা বের করে সে সমস্ত বাগানটাকে দেখতে পাচ্ছে। ছায়া ছায়া একটু ঘোলাটে গাছপালা। অবশ্য সমস্ত বাগান বললে ভুল হবে—তিন ভাগের দু ভাগই তার নজরে আসছে। যেটা চোখের আড়ালে সেই দিকেই এই বাড়িতে ঢোকার সদর রাস্তা। হঠাৎ একটা খস খস শব্দ কানে আসতে অর্জুন সতর্ক হল। বাগানের ঘাসের ওপর এই বৃষ্টিতে একটা কালো ছায়া দৌড়ে গেল। অর্জুনের বুকের বাতাস এক লহমার জন্যে আটক ছিল। স্পষ্ট চেহারাটা না বুঝতে পারলেও ওটা যে সেই হাউন্ডগুলোর একটা তা টের পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে। তারপরেই আরও তিনটে ছায়া একই দিকে ছুটে চলে গেল, এই যাওয়ার ভঙ্গিতে বেশ ব্যস্ততা আছে। চারটে হাউন্ডই বিরাট বাগান থেকে চলে এল একই জায়গায়। কেন? হাউন্ডরা কি দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে? এ বিষয়ে কিছুই জানে না অর্জুন। নিজের ওপর তার রাগ হচ্ছিল। ভাল সত্যসন্ধানী হতে গেলে সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জ্ঞান না হলে দৃষ্টি পরিষ্কার হয় না। অমল সোম থাকলে এই মুহুর্তে কারণটা বলে দিতে পারতেন।

টিপ টিপ বৃষ্টিটা এবার সামান্য বাড়ল। চাদরের আড়ালে থেকেও তার শীত করছিল বেশ। সমস্ত বাড়িতে কোথাও সামান্য শব্দ নেই। এত রাতে

কালিম্পং-এর মানুষ সাধারণত জেগে থাকবে না। রায়সাহেব তো সাততাতাড়াডি শুতে গিয়েছিলেন। হয়তো প্রহরীরা নিঃশব্দে জেগে আছে। যেমন সে এই জানলার পাশে বসে। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল একটা সিগারেট খেতে।

সিগারেটে অর্জুনের নেশা নেই। গতবার পাশ করার পর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু-একবার টান দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হয়। সে কিছুদিন আগেও অ্যাথলেট ছিল, একশ, দুশো মিটার দৌড়াতে। সেই সুবাদে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের পক্ষে তার পড়াশুনা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। দৌড় ছেড়ে দিয়ে চাকরি করে রাত্রের কলেজে পড়বে বলে ঠিক করেছিল অর্জুন। কিন্তু পরপর দুটো অভিযান তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে গোয়েন্দা হবার। যা হোক, একটা আঠারো বছরের ছেলে জনপাইগুড়ি শহরে লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খেতে পারে। অর্জুনের বন্ধুরা যেমন খায়। কিন্তু তখন রায়সাহেবকে সে মিথ্যে কথা বলেছে বাধ্য হয়ে। একজন বয়স্ক গম্ভীর মানুষ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে সিগারেট খায় কিনা তা হলে তাঁর মুখের ওপর হ্যাঁ বলা যায় না। অর্জুনের ব্যাগে একটা সিগারেটের প্যাকেট আছে। প্যাকেটটা তার কেনা নয়। অসীম চারটে সিগারেট কিনেছিল। ওর বাড়িতে প্যাকেট নিয়ে যাওয়া মুশকিল বলে অর্জুনকে রাখতে দিয়েছিল। সেই প্যাকেটে এখনও দুটো পড়ে আছে। দুটো সিগারেট আর একটা দেশলাই। আজ বেরোবার সময় ওগুলো বাড়িতে রেখে আসতে ভরসা পায়নি। মায়ের নজরে পড়ুক তা চায় না সে।

এখন একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হল অর্জুনের। এই ঠাণ্ডায় সিগারেট খেলে নিশ্চয়ই আরাম হবে। তার মনে পড়ল রায়সাহেব বলেছেন এই বাড়িতে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন এই নির্জন রাত্রে বন্ধ ঘরে বসে সে যদি সিগারেট খায় তখন কারও পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব নয়। অর্জুন টুল ছেড়ে ওঠার কথা ভাবতেই মনে হল বাগানের মধ্যে একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা জ্বলেই নিভল এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে চাপা একটা শিষ মিশে গেল। মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল অর্জুনের। এবার থেকে শিষটা পাঁচ সেকেন্ড অন্তর বাজছে। এবং প্রত্যেকটা শিষের মধ্যে একটা সুর লুকানো আছে বলে মনে হচ্ছে। অর্জুন দু'চোখ বড় করে জায়গাটা লক্ষ করার চেষ্টা করল। আলোটা যেখানে জ্বলেছিল, সেখানে ঝাউগাছের মতো কিছু গাছের ভিড়, ফলে অন্ধকারটা জমট। হাউন্ডগুলোকে ওই দিকেই ছুটে যেতে দেখেছিল বলে মনে পড়ল। শিষটা ঠিক সময়ের ব্যবধানে বেজে যাচ্ছে। অর্জুন এসব ব্যাপারের মাথামুণ্ড বুঝতে পারছিল না। যে আলো জ্বালিয়েছে সে যদি এই বাড়ির লোক না হয় তা হলে তাকে তো এতক্ষণে হাউন্ডগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে। এই বাড়ির কেউ হলে নিশ্চয়ই এমন বৃষ্টিতে বাগানের জঙ্গলে যাবে না। তা হলে শিষ

দিচ্ছে কে ?

এই সময় ঝাউগাছের সামনে একটি মূর্তির উদয় হল। ছায়া ছায়া যে আকৃতিটাকে অর্জুন দেখতে পেল সে বেশ লম্বা। পরনে শরীর ঢাকা বর্ষাতি। মাথা টুপির আড়ালে এবং চেহারার কোনও বৈশিষ্ট্যই এখান থেকে নজরে আসছে না। লোকটার দুটো হাতই পকেটে ঢোকানো। বোধহয় চারপাশ সতর্ক চোখে জরিপ করে লোকটা সামান্য নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। ক্রমশঃ অর্জুনের চোখের আড়ালে চলে গেল সে। আর তখনই অর্জুন হাউন্ডগুলিকে দেখতে পেল। ছাগলের পালের মতো লোকটার পিছন পিছন যাচ্ছে ওরা। শিষটা মিলিয়ে যেতে অর্জুন একবার ভাবল চিৎকার চেষ্টামেচি করে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। রায়সাহেবের ঘুম ভাঙিয়ে বলে, একটা লোক তাঁর পাহারাদার হাউন্ডদের বশ করে ওই বাগানে শিষ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তখনই অমল সোমের নির্দেশ মনে পড়ল। অমলদা তাকে রোজকার রিপোর্ট পাঠাতে বলেছেন। এখনই চেষ্টামেচি করলে ওই লোকটাকে চিরকালের জন্যে সতর্ক করে দেওয়া হবে। ওকে ফিরতে হবে এই পথেই। ততক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল। এর মধ্যে বৃষ্টির তেজ বেড়েছে আরও। অন্ধকার ঘোলাটে হয়ে গেছে জলের ধারায়। তারই মধ্যে খুব কান খাড়া করে শিষের শব্দ পেল অর্জুন। শিষটার ছন্দ আছে। সুরটাকে মনে মনে তুলে নিল সে। লোকটা যেই হোক না কেন, এই পাহাড়ি রাত্রের বৃষ্টিতে চারটে শিকারী হাউন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যখন তখন নিশ্চয়ই প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। ঠিক সেই সময় একটা তীব্র চিৎকার রাতের নিশ্চিন্ততাকে খান খান করে দিল। ধারালো করাতে দাঁতের মতো ওই শব্দ বোধের ওপর আঘাত করে। অর্জুন চমকে উঠল। এবং তখনই ছুটন্ত মূর্তিটাকে দেখা গেল। দৌড়বার সময়েও লোকটা শিষ দিতে ভোলেনি। কুকুরগুলো অনুগত ভঙ্গিতে ওর পিছনে ঝাউগাছের আড়ালে মিলিয়ে যাওয়ায় একটা ঝাপসা আলো জ্বলে উঠে নিভে গেল।

তীক্ষ্ণ চিৎকারটা শেষ হতেই সীতার বিকৃত কণ্ঠ শোনা গেল, ‘আই মাস্ট গো ব্যাক, আই মাস্ট। ইউ কান্ট স্টপ মি।’ তারপর একটা ইংরেজি শব্দ। অর্জুনের মনে পড়ল পাস্ক বই-এ একটা তালিকা দিয়েছেন লেখক। তাতে তিনি পাস্করা যে সমস্ত শব্দ গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করে তার একটা বিবরণ আছে। এই শব্দটা সে ওখানে দেখতে পেয়েছিল। শব্দটার মানে সে জানে না কিন্তু ওটা যে গালাগালি, তাতে তার সন্দেহ নেই।

কিন্তু তারপরেই সব চূপচাপ। কান পাতলো অর্জুন। এই চিৎকারের পরও বাড়িতে কারও সাড়াশব্দ নেই। রায়সাহেবের অস্তিত্বই টের পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কোন ঘরে শোন কে জানে। অর্জুন ভাবল একবার বাইরে বেরিয়ে খোঁজ করে ব্যাপারটা কী হয়েছে। তারপরেই খেয়াল হল সে মফঃস্বলের কলেজে-পড়া বোকা টাইপের ছেলে। ওরকম ছেলের এত কৌতূহল দেখানো

শোভন নয় । রায়সাহেব তার এমন একটা পরিচয় খসড়া করেছেন যে সবরকম গতিবিধি এখন নিয়ন্ত্রিত । অর্জুন চুপচাপ বসে রইল । বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সমানে । বাগানে আর কারও পায়ের চিহ্ন পড়ছে না । শুধু কুকুরগুলো দুবার পাক খেয়ে গেছে এর মধ্যে । এই লোকটা যেই হোক না কেন, হাউন্ডরা তাকে ভালো করে জানে । না হলে ওদের সামনে দিয়ে বাগানে বেড়াবার সাহস হত না লোকটার । আগামীকাল বিটুসাহেবের মাধ্যমে তাকে যে রিপোর্ট পাঠাতে হবে তার বড় অংশ দখল করবে এই ঘটনাটা । অমলদাকে বোঝানো যাবে যে সে সহকারী হিসেবে যথেষ্ট উপযুক্ত ।

রাত আড়াইটে নাগাদ অর্জুনের খুব ঘুম এল । এইভাবে ঠায় বসে থাকতে সে আর পারছিল না । তবু মন বলছিল আজ রাতে আর কেউ আসবে না । কিন্তু এখন শুয়ে পড়লে অমলদার কাছে দেওয়া কথার খেলাপ হবে । অন্ধকার এখন চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে । অর্জুন নিশ্চিন্তে পা ফেলে ঘরে এল । তারপর ব্যাগটা খুলে একদম তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল । সিগারেটটা খুব সন্তর্পণে জ্বালিয়ে সে আবার বাথরুমের জানলায় ফিরে এল । তিন-চারবার ধোঁওয়া ছাড়তেই মনে হল ঠাণ্ডা গালে নাকে বেশ স্বস্তি হচ্ছে কিন্তু তারপরেই ওর গলা খুশ খুশ করে উঠতে সে চেষ্টা করেও কাশি থামাতে পারল না ।

নিজেকে খুব গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছিল । এখনও সিগারেট খেলেই তার কাশি হয় । অথচ বন্ধুরা নির্বিকার হয়ে টেনে যায় । সে সিগারেটটা ভিজিয়ে কমোডে ফেলে দিল । অর্জুন বুঝতে পারছিল আজকের রাতে জেগে থাকার কোনও মানে নেই । সে জানলা বন্ধ করল । তারপর বাথরুমের আলো জ্বেলে কমোডের ফ্ল্যাশ টেনে দিয়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল । যদি কেউ লক্ষ করে তা হলে সে ভাববে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়েছিল । সাদা নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অর্জুনের মনে হল পৃথিবীতে এর চাইতে আরামদায়ক আর কিছু নেই ।

দরজায় শব্দ হতে অর্জুনের ঘুম ভাঙল । এবং কয়েক মুহূর্তে জড়তা কেটে গেলে সে তড়াক করে উঠে বসল । তারপর দৌড়ে টেবিলটাকে সরিয়ে আনল দরজা থেকে যথাস্থানে । বাইরের আলো ফুটেছে কি ফোটেনি বোঝা যাচ্ছে না । কিন্তু ঘুমে চোখ টানছে তার । এখন কটা বাজে কে জানে । অর্জুন দরজা খুলে দেখল কেউ নেই । বারান্দায় ভোরের আলো পড়েছে । তা হলে দরজায় শব্দ করল কে ? অর্জুন আবার বিছানায় ফিরে গেল । এবং কন্ডলটা টেনে নিতেই ঘুমে তলিয়ে গেল ।

সকাল দশটা নাগাদ ঘুম ভাঙতেই অর্জুন অবাক হল । তার মাথার পাশে একটা টুলের ওপর রাখা ট্রেতে টিকোজিতে ঢাকা চায়ের পট এবং একটা কাচের

পাত্রে কিছু জেলি আর বিস্কুট। এগুলো কখন কে দিয়ে গেছে সে জানে না, দরজাটা ভেজানো।

চা ঠাণ্ডা হতে হতেও হয়নি। পরীক্ষার হয়ে তাই খেয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে আসতেই কালকের লোকটিকে দেখতে পেল। একবার মনে হল জিজ্ঞাসা করে, কেন গতকাল অমন অভদ্র ব্যবহার করল। কিন্তু তারপরেই মত পাশ্টল সে। বরং রায়সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করা যাক। আর তখনই তার খেয়াল হল তার মুখে রায়সাহেব শব্দটা বেমানান। ভাইপো কখনও কাকাকে রায়সাহেব বলে ডাকতে পারে না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল লোকটা তাকে দাঁড়াতে দেখে সুরুৎ করে সামনে থেকে সরে গেল। নীচে নেমে এল অর্জুন। রায়সাহেবকে সে দেখতে পেল না। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা যেন তাকে দেখেও দেখছে না। তাকে ক্যাবলা হতে হবে, ক্যাবলারা কখনও প্রশ্ন করে না। কচি কলাপাতার মতো রোদ উঠেছে। ভিজ়ে গাছপালায় সেই রোদ পড়ে চমৎকার দেখাচ্ছে এখন। অন্যমনস্ক ভান করে অর্জুন তার বাথরুমের নীচে চলে এল। এখান থেকে মাথা তুললে তার বাথরুমের জানালাটা দেখা যায়। সে এবার সামনের দিকে তাকাল। আলোটা কোথায় জ্বলেছিল, হাউন্ডগুলো কোথায় ছুটে গিয়েছিল, সেই জায়গাটা খোঁজার চেষ্টা করল মনে মনে। তারপর একটা লক্ষ্য ঠাওর করে সে এগিয়ে গেল। বাউগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে মানুষ স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। গাছের আড়ালে এসে পাঁচিলটাকে দেখতে পেল। পাহাড়ের গায়ে উঁচু পাঁচিল গাঁথা মুশকিল। মাটি থেকে হাত দুয়েক একটা গাঁথুনি বোধহয় অনেককাল আগে গাঁথা ছিল। তার ওপর দশ ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে নতুন। খুব ধারালো কাঁটা। কিন্তু লোকটা এই দিক দিয়ে আবার ফিরে গেছে। অর্জুন চট করে খেয়াল করতে পারল না প্রস্থানের পথটা কোথায়? নিশ্চয়ই এই তার ডিঙিয়ে লোকটা ফেরেনি।

এভাবে আড়ালে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। অর্জুন ফেরার জন্যে পা বাড়াতেই জুতোর ছাপ দেখতে পেল। কাঁচা ভিজ়ে মাটিতে ছাপটা স্পষ্ট হয়ে আছে। বাকিগুলো ঘাসের ওপর থাকায় ধরা যায়নি এতক্ষণ। অর্জুন বুঝতে পারল লোকটার পায়ে চামড়ার জুতো ছিল না। ঘন খাঁজওয়ালা কেডস পড়ে এসেছিল ও। আর তার বাঁ দিকটা একটু ক্ষয়ে এসেছে। এই ছাপটাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। অর্জুন মাটিতে পড়ে থাকা একটা বড় পাতা তুলে ওটাকে চাপা দিয়ে তার ওপর ইটের টুকরো বসিয়ে দিল। জুতোর ছাপ বাঁ পায়ের।

বাকি বাগানটা খামোকাই হেঁটে অর্জুন গেটের দিকে আসতে বিষ্টুসাহেবকে দেখতে পেল। রোগা বেঁটে বিষ্টুসাহেব এই সাতসকালে কমপ্লিট স্যুট গায়ে ছড়ি হাতে পাহাড় বেয়ে আসছেন। বয়সে অমলদার চেয়ে অনেক বড় কিন্তু নিজেদের বন্ধু বলেন ওঁরা। এই মজার মানুষটি বিপদের সময়ে বাতাসের ঘূর্ণি টের পান।

গেটের কাছাকাছি এসে বিটুসাহেব তাকে দেখতে পেয়ে চাঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে মধ্যম পাণ্ডব ! রাতটা কেমন কাটল ?'

অর্জুন চট করে চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর দ্রুত কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এখানে আমার নাম উপলনারায়ণ রায়। ইউ এন রায়ের ভাইপো। আপনার সঙ্গে আলাপ নেই।'

'ওহো। তাই তো। ভুলেই গিয়েছিলাম। তা এখানে কে শুনতে আসছে !'

'উহু।' অর্জুন মাথা নাড়ল, অমলদা বলেন গাছেরও কান আছে।'

'তা আছে, রায়সাহেব কোথায় ?'

'জানি না। সকালে ওঠার পর দেখতে পাইনি।'

'ডেয়ারিতে নেই তো ?'

অর্জুন অবাক হল। তার মনে পড়ল ইউ এন রায় এখানে একটা ডেয়ারি ফার্ম করবেন বলে শুনেছিল। কিন্তু সেটা কোথায় জানা হয়নি। বিটুসাহেব বললেন, 'চল, ডেয়ারিটা ঘুরে আসি।' এবং তারপরেই মত পাষ্টালেন, 'না, কাজের জায়গায় যাওয়া উচিত নয়। এসো আমরা এই বাগানেই খানিকক্ষণ বসি।'

অর্জুন লক্ষ করেনি বাগানের একপাশে একটা চত্বর বানানো, মাথার ওপরে ছাদ আর তলায় সিমেন্টের বেষ্টিত আছে। সেখানে আরাম করে বসে বিটুসাহেব বললেন, 'আঃ, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। এত যে লিখছি এখানে চলে এসো, দারুণ বিজনেস জমবে, তোমরা কানে তুলছ না। আরে কালিম্পং-এ ক্রিমিন্যাল থিক থিক করছে।'

অর্জুন হাসল। বিটুসাহেবের বলার ধরনটা এমন যেন পুকুর ভর্তি মাছ, মুঠো করে তুলে নাও। জায়গাটা চমৎকার। আশেপাশে কেঁড নেই এবং কথা বললেও কারও কানে যাবে না। রায়সাহেব আসার আগেই কালকের ঘটনাটা বলে দিতে হবে। উচিত ছিল লিখে দেওয়া। কিন্তু তার সময় নেই। সে বলল, 'আপনাকে একটা উপকার করতে হবে। অমলদা বলেছেন প্রতিদিনের রিপোর্ট আপনার মাধ্যমে পাঠাতে। আজ লেখার সুযোগ পাইনি।'

বিটুসাহেব বললেন, 'মুখেই বল। আমার মেমারি খুব শার্প। টেপেরেকর্ডারের মতো।'

অর্জুন হাসল। অমলদা বলেন প্রত্যেক মানুষের স্বভাব হল, যা শুনবে তা বলার সময় নিজের অজান্তেই দু-একটা শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করবে। ঘটনা সম্পর্কে নিজের অনুভূতির অভিব্যক্তি সেটা। অতএব মুখের কথায় বিশ্বাস করা বড় মুশকিল। কিন্তু এখন তো অন্য কোনও উপায় নেই। সে গতকাল সেবক রেলক্রসিং থেকে শুরু করে রাত্রে চিৎকার পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে বিটুসাহেবকে বলল। বিটুসাহেব চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা শুনছিলেন, অর্জুন

থামতে বললেন, ‘আরে ক্বাস । এতো রীতিমতো থিলার ।’ তারপর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা প্যাকেট বের করে হাতে জিনিসটা ঢেলে বললেন, ‘খাবে ?’

অর্জুন দেখল, বিষ্টুসাহেবের হাতে চানাচুর । সে খানিকটা অবাক হয়ে হাত পাততে বিষ্টুসাহেব প্রসন্নমুখে চানাচুর দিলেন । মুখে দিতেই অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল । এই চানাচুরের গন্ধটা তার খুব চেনা । সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথেকে পেলেন ?’

‘কেন ?’ বিষ্টুসাহেব চোখ বড় করলেন, ‘আমাদের কালিম্পিং-এ পাওয়া যায় না ভেবেছ ?’

‘তা যাবে না কেন । কিন্তু একমাত্র দাদুর চানাচুরই এইরকম খেতে ।’

অর্জুন বিশ্বাস করছিল না ।

‘দিদিমনির সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে ?’

‘দিদিমনি ?’ অর্জুন কথাটা বুঝতে সময় নিল, ‘ওঃ, না ।’

‘ওই যে তিনি ।’

বিষ্টুসাহেবের দৃষ্টি অনুসরণ করে অর্জুন প্রাসাদের একটা জানলার দিকে তাকাল । সীতা সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে । সকালবেলায় মেয়েটিকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে । হঠাৎ বিষ্টুসাহেব ছাদের আড়াল থেকে বেরিয়ে মাথার টুপি হাতে নিয়ে সেটাকে ঘন ঘন দুলিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, ‘হাই, হাই ডু য়ু ডু ? এই যে দিদিমনি ?’

চকিতে মুখ ফেরাল সীতা । তারপর রুম্ফ গলায় চিৎকার করল, ‘ডোন্ট কল মি দ্যাট । ননসেন্স ।’ বিষ্টুসাহেব চাপা গলায় বললেন, ‘রোগীর কথায় একদম কান দিতে নেই । তারপর গলা তুললেন, ‘তোমার ভাই-এর সঙ্গে আলাপ করছি । খুব ভাল ছেলে ।’

সীতা এর উত্তরে জানলা থেকে সরে গেল । বিষ্টুসাহেবকে কেমন ক্যাবলা ক্যাবলা দেখাচ্ছিল, ‘যাকগে ! মেয়েটা তো কখনও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে না । সামথিং রঙ । ওই যে, রায়সাহেব আসছেন । নমস্কার মিঃ রায় । সব কুশল তো ?’

ইউ এন রায়কে দেখা গেল । এই ঠাণ্ডায় একটা সাদা হাফ প্যান্ট আর স্পোর্টস জ্যাকেট পরে নীচ থেকে উঠে আসছেন । অর্জুন দেখল গুর পায়ে একটা সাদা কেডুস । সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল ওর । রায়সাহেব বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কখন এসেছেন ?’

‘এই কিছুক্ষণ । অর্জুন, আই মিন উপলনারায়ণের সঙ্গে আলাপ করছিলাম ।’

রায়সাহেব অর্জুনের দিকে তাকালেন, ‘হোপ ইউ এনজয়েড দ্য নাইট ।’

অর্জুনের অস্বস্তি হল । কথাটার মানে কী ? উনি কি টের পেয়েছেন যে সে

আড়াইটে তিনটে পর্যন্ত জেগেছিল ! রাতটাকে উপভোগ করা আর কাকে বলে ? কথা বলতে হয় তাই সে বলল, ‘না, ভাল ঘুম হয়নি ।’

বিষ্টুসাহেব বললেন, ‘তা তো না হবার কথাই । নতুন জায়গায় গেলে আমিও ঘুমুতে পারি না । সেবার দিল্লীতে গিয়ে তিনরাত না ঘুমিয়ে ছিলাম ।’

রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোনও চিৎকার শুনেছ ?’

‘চিৎকার !’ অর্জুন চট করে মিথ্যা কথা বলল, ‘হ্যাঁ, সেটা সন্ধেবেলায় । রাতে তো কোনও চিৎকার শুনিনি । কেন বলুন তো ?’

রায়সাহেব এবার যেন স্বচ্ছন্দ হলেন, ‘না । আমিই তা হলে ভুল শুনেছি । বাই দ্য বাই, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি, আমার বাড়ির সবকটা কাজের লোকই কথা বলতে পারে না । বুঝতেই পারছ নিরাপত্তার জন্যে এই রকম লোক রাখতে হয়েছে আমাকে । আসুন স্যার, আমার ঘরে গিয়ে বসি ।’

বিষ্টুসাহেব বললেন, ‘আপনার হাউন্ডগুলো কেমন আছে ? ওগুলোর ভয়ে তো দিন-দুপুরেই এদিকে আসতে সাহস হয় না আমার ।’

‘ভাল । ওরা সত্যিকারের শিকারী ।’

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ‘হাউন্ডগুলোকে পেলেন কোথায় ?’

‘সানফ্র্যানসিস্কোতেই । মিস্টার মুরহেড বলে এক ভদ্রলোকের পোষা ছিল ওগুলো । আনতে অনেক খরচ হয়ে গেছে । এনে উপকারই হয়েছে ।’

‘ওগুলোকে একবার দেখতে পারি ? আমি কখনও হাউন্ড দেখিনি ।’ অর্জুন বলল ।

রায়সাহেব একমুহূর্ত চিন্তা করলেন । তারপরে মাথা নেড়ে ওদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রাসাদের ডান দিকে । সেখানে একটা লোহার গরাদ দেওয়া । ওদের দেখে চারটে হাউন্ডই বীভৎস ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়াল ।

গতরাত্রের অন্ধকারে কিছু বোঝেনি অর্জুন, এখন দিনের আলোয় ওদের দেখে বুক হিম হয়ে গেল । ওরা চিৎকার করছে না কিন্তু চাহনি এবং মুখের ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সামান্য সুযোগ পেলে শিকারকে ছিড়ে ফেলবে । বিষ্টুসাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল । ঢোক গিলে বললেন, ‘ডেঞ্জারাস ।’ রায়সাহেব হাসলেন, ‘এরা একটা সিংহের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে । ওদের ভরসায় রাত্রে নিশ্চিন্ত থাকি । আপনি কি শুনেছেন জলপাইগুড়িতে পৌঁছেই দেখি ছ’খানা বাঁড় মেরে ফেলা হয়েছে ।’ পেডিগ্রি ভাল নয় অবশ্য কিন্তু খুব হেলদি ছিল ওরা । আমার ডেয়ারিতে কাজে লাগত ।’ তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘দে আর স্টিল অ্যাকটিভ ।’

‘কিন্তু আপনি জানেন না ওরা কারা ?’ বিষ্টুসাহেব হাউন্ডদের ওপর থেকে চোখ সরাস্ত্রিলেন না । তাঁর গলার স্বরে কোনও তাপ নেই ।

‘অনুমান করতে পারি ।’

‘তা হলে পুলিশকে রিপোর্ট করা উচিত ছিল । স্ক্যাডাল বড় কথা নয় ।’

‘আপনি তো সবই জানেন। এই কারণেই আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য চেয়েছি। বাট ইওর অমল সোম সামান্য কারণ দেখিয়ে এলেন না। বুঝতে পারছি না এই ছেলেটি কতখানি উপকারে লাগবে।’ মুখের ওপর বলে দিলেন রায়সাহেব।

বিষ্ণুসাহেব বললেন, ‘নিশ্চয়ই অমল সেটা জানে।’

অর্জুনের মেজাজ খারাপ লাগল। রায়সাহেব যে প্রথম থেকেই ওকে পছন্দ করছে না সেটা সে আন্দাজ করেছিল। সে কয়েক পা এগিয়ে গেল। হাউন্ডগুলো তাকে কাছাকাছি আসতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল। যদিও মাঝখানে লোহার শিক রয়েছে কিন্তু অর্জুনের মনে হল এতটা কাছে এগিয়ে না এলেই ভাল ছিল। এই সময় রায়সাহেব পিছন থেকে বলে উঠলেন, ‘কাছে যেও না, ওরা একবার ধরতে পারলে বাঁচার কোনও চান্স নেই। একমাত্র সীতার আশ্চি ছাড়া ওরা কারও কথা শোনে না।’

বিষ্ণুসাহেব বললেন, ‘উনিই কি ওদের বের করেন আর ঢোকান?’

‘হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা কিছুদিন মিস্টার মুরহেডের কাছেও কাজ করেছেন।’

এবার বিষ্ণুসাহেব ডাকলেন, ‘চলে এসো হে পঞ্চম—সরি, উপলনারায়ণ।’

অর্জুনের মাথায় হঠাৎ সেই সুরটা এসে গেল। সে খুব চাপা স্বরে শিষ দিল। ঠিক যেমনটি গতরাত্রে শুনেছিল ঠিক তেমনটি। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলোর সতর্ক ভঙ্গি উধাও হয়ে গেল। স্পষ্টত একটা আলিসি দেখা গেল ওদের শরীরে। চারজনই বেশ আদুরে ভঙ্গিতে রেলিং-এ শরীর ঘেঁষতে লাগল। এতে অর্জুনের সাহস বেড়ে গেল। সে শিষ বন্ধ না করে রেলিং-এর গায়ে চলে এল। কুকুরগুলোর মুখে সেই বীভৎস ভঙ্গিটা নেই। ওরা প্রায় বেড়ালের মতো আদর চাইছে। ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াল অর্জুন! তারপর একটা হাউন্ডের পিঠে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্যে আঙুল বোলালো। তারপর শিষ দিতে দিতে পেছিয়ে এসে ওটা বন্ধ করতেই হাউন্ডগুলোকে ঘাবড়ে যেতে দেখল। এবং তারপরেই ওরা ছুটে এল রেলিং-এর দিকে এবং হিংস্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল যেমন প্রথমে ছিল। অর্জুনের বুকের মধ্যে তখনও অস্থির হৃদপিণ্ড কিন্তু সে বিষ্ণুসাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ওদের দু’জনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বিষ্ণুসাহেবের হাঁ এত বড়, জিভ দেখা যাচ্ছে। রায়সাহেবের চোখ বিস্ফারিত। সে এগিয়ে আসতে তিনি কোনও রকমে বললেন, ‘এটা কী করে সম্ভব হল?’

অর্জুন বলল, ‘আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি ওদের নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি। সারাদিন তালা বন্ধ হয়ে থাকে বেচারারা।’

‘বাট হাউ। কী করে তুমি ওই শিষটা শিখলে!’ রায়সাহেব উত্তেজিত।

অর্জুনের তখন যেন আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছে, ‘ভাল গোয়েন্দাদের এ সব জানতে হয়। অমলদার কাছে পৃথিবীর কুখ্যাত কুকুরদের চরিত্র নিয়ে একটা বই

আছে। লাইফ পাবলিকেশন থেকে বেরিয়েছে। তাতে আছে কী করে হিংস্র কুকুরদের বশ করা যায়। এক এক জাতের কুকুরদের বশ করার পদ্ধতি এক এক রকম।’

‘বই আছে! বইতে কি শিখ লেখা আছে?’ রায়সাহেব হতভম্ব।

অর্জুনের মনে পড়ল বুড়িদির কাছে স্বরলিপির বই দেখেছে। তা দেখে সুর তোলে বুড়িদি। সে সহজ গলায় বলল, ‘সুরের স্বরলিপি আছে। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন।’

সঙ্গে সঙ্গে দু’হাতে মাথা চেপে ধরলেন রায়সাহেব, ‘তা হলে তো যে কেউ সেই বই থেকে ওটা শিখে এদের পোষ মানাতে পারে। ওং, এতদিন আমি মুখের স্বর্গে বাস করছিলাম। নাউ, হোয়াট টু ডু।’

এই সময় সেই বৃদ্ধা মহিলাকে এদিকে আসতে দেখা গেল। হাঁটুর নিচু ঢাকা স্কার্ট আর ফুলহাতা জামার ওপর বুক খোলা সোয়েটার। কাছে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইজ দেয়ার এনি প্রব্লেম মিঃ রায়? আমি ওপরের জানলা থেকে দেখলাম এই হাউন্ডগুলোর সামনে আপনারা খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন।’

‘ইয়েস।’ চিৎকার করে উঠলেন রায়সাহেব, ‘দে আর ইউজলেস। ওদের অত টাকা দিয়ে কিনে আমি প্রচণ্ড ভুল করেছি। ওদের চেয়ে একটা বেড়াল পোষা ভাল ছিল।’

‘কেন? হঠাৎ আপনার ধারণা পাল্টালো কেন? আপনি ওদের চরিত্র জানেন না?’

‘জানতাম। কিন্তু সেটা মিথ্যে। এই যে, এইটুকুনি ছেলে ওদের বেড়াল বানিয়েছে।’ রায়সাহেব শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেললেন। বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের মুখের দিকে তাকালেন, প্রচণ্ড বিস্ময় সেই দৃষ্টিতে। তারপর বললেন, ‘আপনার ভাইপো!’

‘হ্যাঁ। একটা মফস্বলের ক্যাবলা ছেলে ওদের পোষ মানিয়েছে। আই শ্যুড রাইট টু মিঃ মুরহেড। কিন্তু তার আগে আমি কী করব!’ ছটফট করলেন রায়সাহেব।

বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন, ‘কীভাবে পোষ মানিয়েছ ওদের—আমাকে দেখাও।’

অর্জুন টের পেল তার স্মার্ট ব্যবহার করা একদম চলবে না। এই মহিলার সামনে তাকে ক্যাবলা সাজতে হবে। সে বলল, ‘আমি শিখ দিলাম আর ওরা শান্ত হয়ে গেল।’

‘কী রকম শিখ? বাজাও তো দেখি।’

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। তারপর শিখ দেওয়া শুরু করল। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে শিষের সুরটা পাল্টালো। মাঝে মাঝে সে অবশ্য সেই সুরের কিছু অংশ রাখছিল। আর যখন সে মূল সুরটা বাজাচ্ছিল তখনই কুকুরগুলো শান্ত

হতে চাইছিল কিন্তু অচেনা সুর শোনামাত্র আবার তারা পূর্ব-অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা সতর্ক চোখে কুকুরদের পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। এবার বলে উঠলেন, ‘তুমি এই সুর কোথায় শিখলে?’

‘বই থেকে।’

‘কী বই? তার নাম কী?’

অর্জুন বলল, ‘নামটা আমি ভুলে গিয়েছি।’

‘হুঁ। কিন্তু তোমার সুর শুনে ওরা তো বেড়াল হল না! আপনি অযথা উত্তেজিত হয়েছেন। দেখলেন তো ওদের কোনও রি-অ্যাকশন হল না।’

‘কিন্তু শিষ্য দিতে দিতে ওই ছেলেটি হাউন্ডের পিঠে হাত দিয়েছে।’

‘সত্যি?’ গালে হাত দিলেন বৃদ্ধা। চমক তাঁর কম নয়, ‘তুমি এই সুর বাজিয়েছিলে?’

‘অনেকটা এই রকম। তবে আমার ভুল হতে পারে। সুরটাকে আমি এখন মনে করতে পারছি না।’ অর্জুন বোকা বোকা হাসল। রায়সাহেব বললেন, ‘কাম অন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।’

রায়সাহেব ঘুরে দাঁড়াতে অর্জুন তাঁর সঙ্গ নিল। বিষ্ণুসাহেবের পাশাপাশি হাঁটতে সে আড়চোখে দেখল বৃদ্ধা সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। সে বুঝতে পারল ভদ্রমহিলা অবশ্যই তাকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু উনি নিশ্চয়ই কারণটা ধরতে পারছেন না। আর তাতেই বিস্ময়টা বেড়ে যাচ্ছে।

ড্রয়িং রুমে বসে বিষ্ণুসাহেব বললেন, ‘আমি আর বসছি কেন! একটু বাজারের দিকে যেতে হবে। সোফায় বসে একটা পায়ের ওপর পা তুলে দিতেই রায়সাহেবের জুতোর তলা দেখতে পেল অর্জুন। রায়সাহেবের বাঁ পায়ের জুতোর তলা অটুট। সামান্য ক্ষয়নি। তার মানে বাগানে পাতা চাপা দেওয়া জুতোর ছাপটা রায়সাহেবের নয়।

অর্জুন বিষ্ণুসাহেবকে বলল, ‘আমি সেবার জায়গাটা ভাল করে দেখিনি। এবার আপনার সঙ্গে যেতে পারি?’

‘স্বচ্ছন্দে। কি রায়সাহেব আপনার আপত্তি নেই তো?’

‘আপত্তি? না, কিন্তু মিঃ সোম ওকে বাড়িতেই থাকতে বলেছেন পাঁচ দিন।’

চবিশ ঘণ্টা এই বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এমন কথা হয়েছিল কিনা মনে পড়ল না, তবু অর্জুন ঠিক করল সে অবাধ্য হবে না। বিষ্ণুসাহেব চলে গেলে সে দোতলায় উঠে এল। রায়সাহেবের অনেক কাজকর্ম আছে। ঘরে ঢুকে তার খুব মজা লাগছিল। হাউন্ডগুলোকে অত সহজে বশ মানানো যাবে তা ভাবতেই পারেনি সে। কিন্তু বৃদ্ধা কিছু আঁচ করেছে। অর্জুন ভাবল, বয়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে চমৎকার সূর্যের আলো এসেছে ঘরে। মনে হচ্ছে আজ দিনটা ভাল যাবে।

একটু বাদেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল। এত ভাল খাবার সে কোনও কালে

খায়নি। কাল রাত্রের লোকটাই এসেছিল কিন্তু আজ তার সঙ্গে কথা বলার একটুও চেষ্টা করল না অর্জুন। এই বাড়ির সবকটা চাকুরেই বোবা, একমাত্র বৃদ্ধা ব্যতিক্রম। এই সতর্কতা শুধু মেয়ের জন্যেই? তা হলে পুলিশে যাওয়ার কথা বাতিল করলেন কেন রায়সাহেব? বদনামের ভয় উনি করতে যাবেন কেন? রাত্রে এই বাড়িতে আগন্তুক আসে। তখনই মেয়েটি চোঁচায়। আগন্তুক হাউন্ডগুলোকে পোষ মানাতে জানে। আর জানে ওই বৃদ্ধা। বৃদ্ধার সঙ্গে আগন্তুকের কোনও সম্পর্ক নেই তো? অমল সোম থাকলে ঠিক বলতে পারতেন।

ব্রেকফাস্টের ঐটো প্লেটডিস লোকটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর অর্জুনের মনে হল এবার পাঙ্ক বইটা শেষ করা দরকার। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবে যাতে আজ রাত্রে জেগে থাকতে পারে। সে আলমারি থেকে ব্যাগটা খুলতেই চমকে উঠল। এত অগোছাল ভাবে জিনিসপত্র রাখেনি সে। দ্রুত ব্যাগের ভেতর হাতড়েও সে বইটার কোনও হদিশ পেল না। অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল অর্জুন। বইটাকে সে এই ব্যাগের ভেতরেই রেখে গিয়েছিল। তবু ঘরের চারপাশে নজর বোলালো সে। তারপর ধীরে ধীরে সোফায় এসে বসল। তার অনুপস্থিতিতে কেউ এই ঘরে এসেছিল এবং সে-ই ব্যাগ হাতড়ে বইটাকে পেয়ে নিয়ে গিয়েছে। কে হতে পারে? যে চাকরটা ঘর পরিষ্কার করেছে সে কি এত সাহস পাবে? অর্জুনের মনে হল রায়সাহেবকে এক্ষুনি ব্যাপারটা জানানো দরকার। তার ‘পাঙ্ক’ বইটা ছিল এই খবর তো ইতিমধ্যে চোর জেনে গিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে ফাঁস হয়ে গিয়েছে সে মফঃস্বলের নিরীহ ছেলে নয়। নইলে এই বাড়িতে ঢোকার সময় সে ওই বই সঙ্গে নিয়ে আসতো না। অর্জুনের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। সে যদি বইটার ব্যাপারে সামান্য সতর্ক হতো! তার মনে হল রায়সাহেবকে খবরটা দেওয়া যেত যদি বইটার নাম অন্যরকম হতো। সে এই বাড়িতে ওই রকম একটা বই এনেছে শুনলে ভদ্রলোক বিরক্তই হবেন। তার ওপর ওটা চুরি যাওয়া মানে শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়া। ফলে রায়সাহেবের এত সতর্কতায় চিড় ধরেছে বোঝা যাবে এবং তিনি আরও বিপন্ন বোধ করবেন। অর্জুন ঠিক করল কাউকেই জানাবে না। যে বই নিয়েছে তার নিশ্চয়ই একটা প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাই দেখা যাক।

দুপুর অবধি কোনও কিছু ঘটল না। তার খাবার ঘরেই দিয়ে যাওয়া হল। চুপচাপ শান্ত হয়ে রয়েছে বাড়িটা।

দুপুর থেকেই সূর্যের আলো নিভে গেল। হঠাৎ প্রচণ্ড কালো হয়ে গেল আকাশ। ঘরের আলো সরে গেছে। আলো জ্বাললে ভাল হয়। অর্জুন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। এ রকম দিনে ঘুম আসে চটপট। কিন্তু সেই সময় বাইরের বারান্দায় সীতার গলা পেল সে, ‘আই লাইক টু মিট মাই ব্রাদার, আন্টি!’

সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কানে এল, ‘ওহো ! কিন্তু সে হয়তো ঘুমাচ্ছে !’

‘এই দুপুরে কেউ ঘুমায় নাকি !’

‘ভিলেজ বয়রা ঘুমায় ।’

‘ঠিক আছে, আমি দেখব । আফটার অল তি ইজ মাই ব্রাদার ।’

তারপরেই ঘরের পর্দাটা নড়ল । বিছানায় শোওয়া অর্জুন টের পেল ওরা দু’জন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে । সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল । বৃদ্ধা ফিসফিসিয়ে বললেন, ‘দ্যাখো, আমি তোমাকে বলেছিলাম কিনা ! ও ঘুমাচ্ছে । চল ফিরে যাই ।’

‘নো !’ শব্দটা এত জোরে যে চোখ না খুলে পারল না অর্জুন । এবং খুলতেই দেখল সীতা তার সামনে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ; তার পিছনে বৃদ্ধা ! সে একটু বিব্রত ভঙ্গিতে উঠে বসল । সীতা মুখ বিকৃত করে বলল, ‘কী ধরনের ছেলে তুমি ? দুপুরে ঘুমাচ্ছ ?’

বিছানা ছেড়ে উঠে বসল অর্জুন, তারপর লাজুক হাসল ।

সীতা এবার বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘নাউ যু মে লিভ আস ।’

‘বাট— ।’ বৃদ্ধাকে স্পষ্টতই আপত্তির ভঙ্গিতে দেখল অর্জুন !

‘ওহো ! ড্যাডি বলেছে আমি ওর সঙ্গে ইচ্ছে হলে কথা বলতে পারি । আমার ইচ্ছে হয়েছে ।’

বৃদ্ধা নিতান্ত অনিচ্ছায় ঘর ছেড়ে গেলেন । যাওয়ার আগে তাঁর দুই চোখ অর্জুনকে জরিপ করে গেল যেন । এবং তখনই পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল কালিম্পিং—এর আকাশ থেকে । অন্ধকার নেমে এল দ্রুত ভরদুপুরেও । এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হল । একটু অস্বাভাবিক পায়ে সীতা জানলার কাছে পৌঁছে বলল, ‘ফ্যান্টাস্টিক ।’

জলের গতি উল্টোদিকে হওয়ায় ভেতরে ছাঁট আসছে না । অর্জুন বুঝতে পারছিল না সে কী করবে ? একজন ভাল সত্যসন্ধানী এই অবস্থায় কী আচরণ করত ?

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সীতা, ‘নাউ টেল মি, হু আর যু ?’

‘মানে ?’ হকচকিয়ে গেল অর্জুন । জানলার গায়ে সীতা, তার পিছনে সাদা বৃষ্টির ধারা ।

‘ইটস সিম্পল । তুমি আমার ভাই নও ।’

‘কে বলল তোমাকে ?’ ইচ্ছে করেই তুমি বলল সে ।

‘ড্যাডি বলেছে তুমি ভিলেজে থাকো, সেখানকার কলেজে পড়, শাই এবং আনস্মার্ট । কিন্তু এর কোনওটাই সত্যি নয় । ড্যাডি আমাদের কখনওই বলেনি যে তার ভাইপো আছে । হঠাৎ পরশু কোথায় গিয়ে তোমাকে নিয়ে হাজির করল । নো, যু আর নট মাই ব্রাদার ।’

কথা বলতে বলতে সীতা সোফার গায়ে এসে হেলান দিল ।

‘কী করে মনে হল তোমার ড্যাডির কথা মিথ্যে ?’

‘আনশ্মার্ট ছেলে হলে হাউন্ডের পিঠে হাত দিতে না । যু নো দ্য ট্রিক্স ।’

স্পষ্ট তাকাল সীতা, ‘এবং তুমি জানো আমি কে ?’

‘মানে !’ চমকে উঠল অর্জুন ।

‘ওই বইটা তুমি কোথায় পেলে ? হঠাৎ মুখ চোখ হিংস্র হয়ে উঠল মেয়েটার, ‘এই রকম বই কারও হাতে দেখলে সানফ্র্যানসিস্কোতে আমার বন্ধুরা তাকে খুন করে ফেলত । সমস্তটাই ইচ্ছাকৃত স্ক্যান্ডাল । তোমাদের ভিলেজে ‘পাক্স’ বই পাওয়া যায় ?’

অর্জুনের চোয়াল শক্ত হল । সে বলল, ‘তুমিই তা হলে ওটা চুরি করেছ ?’

‘দ্যাটস নট ইওর বিজনেস । হু ইজ অমল সোম ?’

অর্জুন চমকে উঠল । অমলদার নাম এই মেয়ে জানল কী করে ? তারপরেই খেয়াল হল বই-এর পিছনে মলাটে অমলদার নাম সই করা ছিল । সে বলল, ‘আমার বন্ধু ।’

হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে সীতা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল, ‘ড্যাডি বলেছিল তুমি নাকি এত ভাল, স্মোক পর্যন্ত কর না । কিন্তু সেটা ঠিক নয় । এই বাড়িতে আমি চেষ্টা করেও সিগারেট পাইনি । থ্যাক্স ।’ ফস করে সীতা দেশলাই ঠুকে সিগারেট জ্বালালো । তারপর এক মুখ ধোঁয়া গিলে বলল, ‘থ্যাক্স ।’ খুব মৃদুভাবে টেনে নেওয়া ধোঁয়া তার নাক দিয়ে বেরুচ্ছিল । সীতার চোখ এখন সুখে বন্ধ । অর্জুন অসহায় । ওই সিগারেটের প্যাকেটটাও ব্যাগে ছিল । বই-এর সঙ্গে বেহাত হয়ে গিয়েছে । অর্জুন আড়চোখে দরজার দিকে তাকাল । সীতা তার ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছে এই খবরটা রায়সাহেবের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না । এবং সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়বে তার ওপরে । কিন্তু এখন কিছুই করার নেই । সীতার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন অভুক্ত থাকার পর কোনও পশু যেন খাবার পেয়েছে । খুব সামান্য সময়ে সিগারেটটা শেষ করে বাইরে ছুঁড়ে দিল সীতা ফিল্টারটাকে । তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার কাছে আর আছে ?’

মাথা নেড়ে না বলল অর্জুন ।

এবার এগিয়ে এসে সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সীতা বলল, ‘ওই রকম পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না । কাম হিয়ার । ওখানে বসো ।’

অর্জুন উন্টোদিকের সোফায় বসতে সীতা বলল, ‘আমি একজন পাক্স । এবং তুমি সেটা জানো ।’

এত সহজ গলায় বলল যে অর্জুন সামান্য নড়া ছাড়া কিছুই করতে পারল না ।

সীতা বলল, ‘কিন্তু তুমি জানো না পাক্সরা কী রকম ফেরোসাস হয় । আই

মাস্ট গো ব্যাক টু সানফ্রানসিস্কো । ওটা একটা জীবন ।’

‘তুমি কেন পাঙ্ক হয়েছ ?’

‘কারণ আমি তোমাদের ঘেরা করি । জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে যা ইচ্ছে করে । পুতু পুতু করে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না । তোমার মতো বোকারা সেটা বুঝবে না । কিন্তু তুমি আমার ভাই নও । ইউ আর অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ ।’

হি হি করে হেসে উঠল সীতা, ‘কি ? খুব অবাক হচ্ছ, না ? আই নো । পিটার আমাকে সব জানিয়েছে । ড্যাডি ওই অমল সোমের কাছে গিয়েছিল । কারেক্ট ?’

অর্জুন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না । এতখানি সত্যি সীতা কী করে বলছে ? এই বাড়ির দোতলা থেকে সে কখনওই নামেনি এর মধ্যে । এই বাড়িতে অর্জুনের চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি । অথচ সীতা সব জেনে গেল কী করে । পিটার কে ?

সীতা বলল, ‘আমি যদি পিটারকে বলি তোমার ব্যাগে ‘পাঙ্ক’ পাওয়া গেছে, হি উইল সিম্পলি কিল ইউ । পিটার এর আগে সাতটা খুন করেছে । বাট ইউ টেল মি, এসব কথা সত্যি কিনা ?’

‘তুমি তোমার ড্যাডিকে জিজ্ঞাসা করছ না কেন ?’

‘ফুল ! ড্যাডি জানতে পারলে এই মুহুর্তে তোমাকে চলে যেতে বলবে । কিন্তু আমার কোনও লাভ হবে না । পিটারের সঙ্গে আমার যোগাযোগের পথটাও বন্ধ হয়ে যাবে । তা হলে তুমি স্বীকার করছ ইনফরমেশনগুলো সত্যি ! ওয়েল । লিভ দিস প্লেস ইমিডিয়েটলি ।’

‘কিন্তু কেন ? আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি ।’

‘আই হেট স্পাইস ।’

‘কিন্তু আমি তোমার উপকার করতে চাই ।’

‘ইজ ইট ? দেন ব্রিং মি সাম স্মোক্‌স । কালিম্পিং-এর বাজারে কি ড্রাগ পাওয়া যায় ?’

‘জানি না ।’

‘তুমি খোঁজ করে নিয়ে এস । আজই ।’

‘এই বৃষ্টিতে ?’

‘সো হোয়াট ?’

‘রায়সাহেব বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন ।’

ঠিক তখনই বৃদ্ধাকে দেখা গেল, ‘সীতা, তোমার ড্যাডি খোঁজ করছেন ।’

‘হোয়াই ?’

‘আই ডোন্ট নো ।’

মুখ বিকৃত করল সীতা । তারপর ছট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল । বৃদ্ধা

দরজা অবধি পৌঁছে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, ‘সীতা কী বলছিল ?’

‘এই এমনি, গল্প করছিল ।’ অর্জুন হাস্তা হবার চেষ্টা করল ।

‘তুমি কী করে জানলে ওই শিষটাকে ? টেল মি ?’

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাল । এই মুহূর্তে বৃদ্ধাকে সাপের মতো দেখাচ্ছে ।

‘আমি বই-এ পড়েছি ।’

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র বৃদ্ধা আর দাঁড়ালেন না । তারপর শুধু বৃষ্টির শব্দ, মাঝে মাঝে হাওয়ার বেগ এবং ঘর অন্ধকার করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই নেই । অর্জুন বুঝল তার আর কিছু করার উপায় নেই । সীতার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে । পিটার নামের লোকটাই সীতাকে জানিয়েছে । কী করে জানাল ? কাল রাতে যে এসেছিল সে কি পিটার ! সেই কি খবরটা দিয়ে গিয়েছে । যদি খবর দিতে পারে তো সীতাকেও নিয়ে যেতে পারত । মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না সে । কিন্তু আর এই বাড়িতে থাকার কোনও মানে হয় না । নিজের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সে তো কোনও কাজই করতে পারবে না । কিন্তু সেই সঙ্গে তার খুব খারাপ লাগছিল । অমল সোমের কাছে মুখ দেখাবে কী করে ? নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা যার নেই সে বড় গোয়েন্দা হবে কী করে ? অমল সোম নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হবেন । কিন্তু তা হলেও এইভাবে আরও চার দিন বসে থাকার কোনও মানে হয় না । আর ঠিক তখনই দরজায় রায়সাহেবকে দেখা গেল ।

‘শোন, আমি এই একটু আগে মেসেজ পেলাম । তোমাকে এক্ষুনি মিঃ পত্নবীশের বাড়িতে চলে যেতে বলা হয়েছে । আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না ।’

‘কে পাঠিয়েছেন মেসেজ ?’

‘মিঃ পত্নবীশ ।’

অর্জুন অবাক চোখে তাকাল । এটাকে কি টেলিপ্যাথি বলে । সে এইমাত্র এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল আর অমনি সেই একই খবর এসে গেল ? যাক, এতে তার ভালই হল, অন্তত নিজের ব্যর্থতার কথা অমল সোমকে বলার লজ্জার থেকে আপাতত বাঁচা গেল । সে বলল, ‘ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি । বিটুসাহেবের বাড়িটা কতদূর ?’

রায়সাহেব বললেন, ‘বেশি দূরে নয়, পাশেই । তবে এই বৃষ্টিতে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি । ইজ দেয়ার এনিথিং রং ?’

অর্জুনের মনে হল সমস্ত ঘটনা রায়সাহেবকে জানানো দরকার । মেয়েকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে কুকুরগুলো, বৃদ্ধা মহিলাকে সরিয়ে ফেলা উচিত । কিন্তু অমল সোম তাকে এইরকম কোনও নির্দেশ দেননি । যা বলার একমাত্র অমলদাকেই বলবে সে ।

দু’ মিনিটও লাগল না । অর্জুন জিনিসপত্র গুছিয়ে রায়সাহেবের সঙ্গে নীচে

নেমে এল। সীতা কিংবা সেই বৃদ্ধাকে কোথাও দেখতে পেল না। দরজার বাইরে পোর্টিকোতে সেই নীল অ্যাসাসাডার দাঁড়িয়ে। সে যেতেই ড্রাইভার দরজা খুলে দিয়ে নিজের আসনে বসল। রায়সাহেব বললেন, ‘আমি বৃষ্টি থামলে যেতে পারি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে ড্রাইভার জানে।’ গेटের কাছে পৌঁছে অর্জুন সেই প্রহরীটাকে দেখতে পেল। একটা শেডের নীচে সজাগ চোখে তাকিয়ে আছে।

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে গাড়িটা ওপরে উঠে এল। বিটুসাহেবের ম্যাসেজ না রায়সাহেবের সিদ্ধান্ত সেটা না গেলে বোঝা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে একটা ভ্যালি অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। বৃষ্টির জন্য তার অনেকটা অস্পষ্ট। রাস্তা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে জল নামছে। অর্জুন বুঝতে পারল সে কালিম্পং বাজারের দিকে ফিরে যাচ্ছে। অথচ বিটুসাহেব লিখেছিলেন যে রায়সাহেব তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর বাড়িতে যেতে হলে বাজারের দিকে চলতে হবে কেন? সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

‘মার্কেটমে সাব।’

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল না সে। অপেক্ষা করাই ভাল। খামোকা কৌতূহলী হলে উত্তেজনা আসে। কথাটা একটা বইতে পড়েছিল অর্জুন। সে কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকায়। অনেক নীচে দুটো ফিতের মতো ঝাপসা নদী। তিস্তা আর রঙ্গিত। বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের রাস্তায় চললে একটা আলাদা রূপ চোখে পড়ে। পৃথিবীটা রহস্যময় হয়ে যায়।

কালিম্পং-এর বাজার এলাকা খুব বড় নয় আবার একেবারে হেলাফেলা করাও যায় না। একটাই বড় রাস্তার দু’ধারে দোকানপাট, পিছনেও কিছু দোকান রয়েছে। গাড়িটা যেখানে দাঁড়াল, তার পাশের দোকানটার নাম এ. ডি. ওয়াং এন্ড সন্স।

ড্রাইভার বলল, ‘ওয়াং সাহাবকা দোকান আ গিয়া সাব।’

ওয়াং সাহেবের দোকানে তার কী দরকার? প্রশ্নটা করতে গিয়েও সামলে নিল সে। দেখাই যাক। দরজা খুলে দোকানে ঢুকতে ঢুকতে খানিকটা বৃষ্টির জল গায়ে লাগল। কি কনকনে ঠাণ্ডা রে বাবা। দোকানে একটাও লোক নেই। আর তখনই মনে পড়ল বর্ষাতিটাকে ফেলে এসেছে রায়সাহেবের বাড়িতে। চিন্তা এবং তাড়াহুড়োয় ওটার কথা খেয়ালেই ছিল না। অথচ এই বৃষ্টি দেখলে তো প্রথমেই বর্ষাতিকে মনে পড়া উচিত! নীল অ্যাসাসাডারটা চলতে শুরু করেছিল। অর্জুন চিৎকার করে তাকে থামিয়ে বর্ষাতির কথা মনে করিয়ে দিল। লোকটা মাথা নেড়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল বৃষ্টির ভেতরে। অর্জুন এবার দোকানটার চেহারা দেখল। বেশ সাজানো গোছানো দোকান। কিউরিও শপ। পাহাড়ি অঞ্চলের মূল্যবান এবং বিরল জিনিসপত্র সুন্দর করে ডিসপ্লে করা হয়েছে। হঠাৎ ভেতরের দরজা খুলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাউন্টারে

এলেন ।

চিনা, নেপালি, টিবেটিয়ান কিংবা সিকিমিজ যা হোক একটা কিছু হবে । চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না । মাথার চুল এবং দাড়ির রঙ সাদা । আলখাল্লা জাতীয় পোশাক । একটা আঙুল তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়েস স্যার । নেম প্লিজ !'

'অর্জুন ।'

সঙ্গে সঙ্গে শব্দহীন হাসিতে ওঁর মুখ ভরে গেল । সেই সঙ্গে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত দু'-চার ঝাঁকুনি খেল । আর সেই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল উন্টো ফুটপাতে । উইন্ডচিটারের ওপর টুপিপরা যে লোকটা লাফিয়ে রাস্তায় নেমে দোকানে ঢুকল তাকে এক বলক দেখতে পেল সে । টকটকে লাল রঙ । সঙ্গে সঙ্গে তার মনে লেবেল ক্রসিং-এর স্মৃতি চমকে উঠল । লোকটার মুখ দেখা দরকার । সে দেখল লোকটা যে দোকানে ঢুকল সেটা একটা বড় টোবাকো শপ । দোকানে ঢুকে লোকটা একটানে টুপি খুলে জল ঝেড়ে ফেলতে চাইল হাত নাচিয়ে । এবং তখনই তার ন্যাড়া মাথা দেখতে পেল অর্জুন । লাল মাথা । লোকটা যে বিদেশি তা বোঝা যায় । বয়স বেশি নয় । এই কি সেই পিটার ? অর্জুন শিহরিত হল । দু' মিনিটের মধ্যে লোকটা আবার জিপে ফিরে গিয়ে মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল । একটু সচকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই বৃদ্ধ বললেন, 'দ্যাট হোটেল । রুম নম্বার ফিফটিন ।' অর্জুন দেখল একটা বিশাল ছাতা নিয়ে বৃদ্ধ কাউন্টার ছেড়ে এগিয়ে আসছেন, 'কাম, কাম ।' ছাতাটা খুললে মনে হল চারজন মানুষ স্বচ্ছন্দে ওই ছাতার তলায় হেঁটে যেতে পারে । বৃদ্ধের সঙ্গে রাস্তাটা পার হয়ে এল অর্জুন । হোটেলের দরজায় তাকে পৌঁছে দিয়ে সরল হেসে বৃদ্ধ আবার দোকানে গেলেন । অর্জুন বুঝতে পারছিল না এই হোটеле তাকে আসতে হবে কেন ? বৃদ্ধ যেভাবে নাম শুনে তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন তাতে বোঝাই যাচ্ছে আগে থেকে নির্দেশ ছিল । কিন্তু ড্রাইভারটা তাকে হোটেলের না নামিয়ে দোকানের সামনে নামাল কেন । বিষ্টুসাহেব কি এখন এই হোটেলের আছেন !

হোটেলটা পরিষ্কার । খুব উচুদরের নয় আবার হেজিপেজিও নয় । সে এগিয়ে যেতেই রিসেপশনে দাঁড়ানো সুবেশ পুরুষ জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়েস স্যার !'

'রুম নম্বার ফিফটিন ।' অর্জুন বলেই বুঝল এর বেশি সে জানে না ।

'ফার্স্ট ফ্লোর লেফট সাইড !'

দোতলায় উঠে এল অর্জুন । সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, করিডোরেও । পনেরো নম্বর ঘরের দরজা বন্ধ । সামান্য ইতস্তত করে নক করল অর্জুন । সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল আর বিষ্টুসাহেব একগাল হেসে বললেন, 'কাম ইন ।'

'আপনি এখানে ?'

‘কালিম্পং তো আমারই জায়গা। বসো বসো, যা বৃষ্টি। কিছু খাবে? চা বা কফি?’

বিটুসাহেব দু’ হাত ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেও সেদিকে মন ছিল না অর্জুনের। ঘরে দুটো বিছানা। ব্যবহৃত হয়নি আদৌ। টেবিল বা অন্য কোথাও মানুষের বসবাসের কোনও চিহ্ন ছড়িয়ে নেই। সে মাথা নাড়ল, ‘না, কিছু খাব না। আপনি এখানে কেন?’

‘মাঝে মাঝে তো হোটেলে থাকতে ইচ্ছে হয়। এরা আমাকে খুব ভালবাসে। নাও, হাত পা ছড়িয়ে বসো। জানলাটা খুলে দিলে বৃষ্টি দেখতে পাবে। রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং-এর বৃষ্টি দেখতে খুব ভালবাসতেন।’ চেয়ারে বসে পা দোললেন বিটুসাহেব।

অর্জুন বলল, ‘আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। ওখানে আমার পাঁচদিন থাকার কথা ছিল কিন্তু আপনি আজকেই ডেকে পাঠালেন। কী ব্যাপার?’

‘তুমি কিছু টের পাওনি? ওরা মানে আমাদের প্রতিপক্ষ সব জেনে গেছে। তুমি কে, কোথেকে এসেছ এ সব ওরা জেনে ফেলেছে, তুমি কী জানো?’ বিটুসাহেব তখনও হাসছিলেন।

‘কী করে জানল?’ অর্জুন হতভম্ব। এ খবর বিটুসাহেবের কাছে এল কী করে?

‘সেটা আমিও জানি না। বসো, আরাম করো। যা হবার তা হয়েছে।’

অর্জুন বসল। বাইরে বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে। বিটুসাহেব বললেন, ‘তোমরা এবার এমন সময়ে কালিম্পং-এ এলে যে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার উপায় নেই।’ কথাটা শেষ হতে জিভে একটা শব্দ করলেন তিনি, তাতে আফশোষ বোঝাল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা, এই ওরা কারা?’

‘জানি না ভাই। তবে শুনেছি খুব ডেঞ্জারাস।’

‘আপনি এই জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠালেন?’

‘হ্যাঁ, বেঘোরে তোমার প্রাণ গেলে কি ভাল লাগবে?’

‘আপনি কি অমলদার কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘তা হলে আমি কী করব? জলপাইগুড়িতে ফিরে যাব?’

‘যাবে কী করে? তিস্তাবাজারের আগেই বিরাট ধস নেমেছে, রাস্তা বন্ধ। মনে হচ্ছে পরশুর আগে নীচে গাড়ি নামবে না। যা বৃষ্টি।’

অর্জুন হতাশ হল। ঠিক সেই সময় দরজায় শব্দ হতে বিটুসাহেব তড়াক করে উঠে সেটাকে খুলতেই একটা হোটেল বয়কে দেখা গেল অর্জুনের বর্ষাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। একগাল হেসে নেপালি ছেলেটি বলল, ‘ওয়াং সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।’

হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিতে ছেলেটি চলে গেল। বিটুসাহেব বললেন, 'দোকানে ফেলে এসেছিলে বুঝি। গোয়েন্দাদের কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু ওয়াং খুব ভাল লোক, আমার বন্ধু। আমি ওর কাছ থেকে মাঝে মাঝে বিরল জিনিস কিনি।'

অর্জুনের কিছুই ভাল লাগছিল না। সে উঠে দাঁড়াল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ ? বাইরে ভীমবেগে জল ঝরছে।'

বষাতিটা দেখিয়ে অর্জুন বলল, 'এটা আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব।'

বিটুসাহেব বোধহয় আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল অর্জুন। কোথাও যাওয়ার নির্দিষ্ট ভাবনা মাথায় নেই, আসলে ওই ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন বিগড়ে যাচ্ছে। বিটুসাহেব এত উৎসাহী হয়ে তাকে হোটেলের ডেকে আনলেন কেন ? এটা সম্ভব, রায়সাহেব ওঁকে জানিয়েছেন অর্জুনের পরিচয় আর গোপন নেই। হয়তো সীতা তার বাবাকে বলেছে সেকথা। তাই তিনি বিটুসাহেবকে বলেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অর্জুনকে। কিন্তু তা হলে আসবার সময় রায়সাহেবকে ওরকম চিন্তিত দেখাচ্ছিল কেন ? সেটা কি ওর অনুমান ?

বষাতিতে মাথা এবং শরীর ঢেকে অর্জুন রাস্তায় নেমে এল। ওপর থেকে নীচে চলে গিয়েছে চওড়া রাস্তা। দু'পাশে দোকান। বৃষ্টির জল ঝরনার মতো ধেয়ে যাচ্ছে নীচে। বষাতি পরে বৃষ্টিতে হাঁটতে দারুণ লাগে। সূর্য নেই, বেলাও পড়ে এল, এখনই বেশ সঙ্কে সঙ্কে, রাস্তায় লোকজন নেই। অর্জুন হাঁটতে হাঁটতে টোবাকোর দোকানে চলে এল। একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে কাউন্টারে বই পড়ছিল। সিগারেট ছাড়াও তামাক, চুরুট এবং পাইপ বিক্রি হয় এখানে, প্রচুর স্টক।

মেয়েটি ওকে দেখে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে মতলব এসে গেল মাথায়। অর্জুন বলল, 'আমাকে মিস্টার পিটার পাঠিয়েছেন। উনি কি দোকানে কিছু ফেলে গেছেন ?'

'পিটার ? কে পিটার ?' মেয়েটি বিস্মিত।

'আপনার দোকানে এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। জিপ চালিয়ে।'

'ওহো, সেই আমেরিকান ভদ্রলোক ? ন্যাড়া মাথা ? ওর নাম পিটার নাকি ?'

অর্জুন মাথা নাড়ল। ওর ভয় ভয় হল মেয়েটা লোকটাকে কতটা চেনে। বেশি চিনলেই মুশকিলে পড়বে সে। মেয়েটিকে কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল, 'আমাকে তো বলেছিল ওর নাম জন। পাশপোর্ট-এ যেন তাই লেখা আছে।'

'আপনি পাশপোর্ট দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। মানে উনি কিছু ডলার ভাঙিয়েছিলেন আমার ভাই-এর কাছে। ওর লাইসেন্স আছে। আমার ভুলও হতে পারে। হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন, ওহো,

না, উনি তো কিছু ফেলে যাননি । ’ মেয়েটি চারপাশে তাকাল ।

অর্জুন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ‘ঠিক আছে, আমি ওকে সে কথাই বলছি । ’
দোকান ছেড়ে বৃষ্টিতে নামতেই পিছন থেকে ডাকল মেয়েটি, ‘আপনি এখনই উডল্যান্ডে যাচ্ছেন ?’

উডল্যান্ডটা কী বুঝতে না পারলেও মাথা নাড়ল অর্জুন । মেয়েটি বলল,
‘উনি আমাদের একটা বিশেষ তামাকের জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলেন । তখন
সেটা খুঁজে পাইনি । আজ বৃষ্টির জন্য আমি এখনই দোকান বন্ধ করব ।
আপনি কি দয়া করে প্যাকেটটা পৌঁছে দেবেন ?’

অর্জুন মাথা নাড়ল । মেয়েটি একটা ছোট্ট তামাকের কৌটো প্যাক করে
তার হাতে তুলে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘দাম কত ?’

‘উনি অ্যাডভান্স দিয়ে গেছেন । ’

প্যাকেটটা নিয়ে রাস্তায় নেমে এল অর্জুন । ভেতরে ভেতরে সে খুব
উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল । পিটার কিংবা জন যাই হোক না কেন, লোকটার
একটা জিনিস সে হাতিয়ে নিতে পেরেছে । বর্ষাতির পকেটে সেটাকে ঢুকিয়ে
অর্জুন বাজারের দিকে এগিয়ে যেতেই চমকে উঠল ! পিটার । সেই জিপটা
চালিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল । ভাগ্যিস একটু আগে লোকটা তামাকের জন্য
দোকানে আসেনি, তা হলে যে কী হত কে জানে !

ঘণ্টাখানেকের আগেই হোটেলে ফিরে এল অর্জুন ।

বৃষ্টিতে প্রথম কিছুক্ষণ ঘুরতে মন্দ লাগে না । তারপরই কেমন একখোঁয়েমি
এসে যায় ।

ঘরের দরজায় নক করতেই বিটুসাহেবের গলা কানে এল, ‘কাম ইন । ’

ভেতরে পা দিতেই চমকে উঠল অর্জুন । বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন
অমল সোম । চোখ বোজা । শুধু পায়ের পাতা নড়ছে । সেই অবস্থায় তিনি
বললেন, ‘খামোকা বৃষ্টিতে ভেজার কী দরকার ছিল । পাহাড়ের বৃষ্টির জল খুব
খারাপ । ’

অর্জুনের চমক ভাঙতে কয়েক মুহূর্ত লাগল । তারপর খুব দ্রুত স্মার্ট হবার
চেষ্টা করল সে, ‘খামোকা নয়, এই তামাকটা নিয়ে এসেছি । ’

‘কী তামাক ?’ অমল সোমের চোখ তখনও বন্ধ ।

‘পিটার কিংবা জন অর্ডার দিয়েছিল, টোবাকোর দোকানে । ’

‘জন স্নো । ’ নির্লিপ্ত গলায় বললেন অমল সোম ।

‘বোধহয় ডাকনাম পিটার । ’

‘না । আমেরিকানদের লিমিটেড ডাকনাম থাকে । যেমন রবার্ট হল বব,
উইলসন উইলি, এডওয়ার্ড হবে টেড, এইরকম আট-ন’টা । ’

‘কিন্তু সীতা বলল, ওর নাম পিটার । ’

এবার অমল সোম উঠে বসলেন, ‘আজকের খবর কী ?’

অর্জুন সকাল থেকে যা যা ঘটেছিল সব খুলে বলল। অমল সোম একটু সময় নিলেন, ‘রায়সাহেবের সামনে কুকুরগুলোর পিঠে হাত দেবার কী দরকার ছিল?’

অর্জুন মুখ নিচু করল, ‘আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।’

‘ভুল, একটা ভুলই প্রচুর ক্ষতি করে দেয়। ওরা সন্দেহ করেছিল, নিশ্চিত হল। পিটার বা জনের সঙ্গে কার কার সম্পর্ক আছে ও-বাড়িতে? মানে, তোমার কী মনে হয়?’

‘সীতার আছে, হয়তো ওর সেই বুড়ি আন্টিরও আছে।’ কথাগুলো বলার সময় অর্জুনের বিষ্ময় বাড়ছিল। এত কথা অমল সোম জানলেন কী করে?

এইসময় চা নিয়ে এল বেয়ারা। সে চলে যাওয়ার পর বিটুসাহেব একটা প্লাস্টিকের কৌটো থেকে চানাচুর বের করে বললেন, ‘বুষ্টির দিনে জমে ভাল। ক্লাস জিনিস। এর পরের বার একটু বেশি করে আনবেন তো?’

অর্জুনের কাছে স্পষ্ট হল। ওটা দাদুর চানাচুর। আজ সকালে বিটুসাহেব তাকে যখন খাইয়েছিলো তখনই বোঝা উচিত ছিল। তার মানে চানাচুর অমলদা এনেছিলেন। অত ভোরে নিশ্চয়ই আসেননি। তা হলে কি অমলদা গতকাল ওদের পিছন পিছন রওনা হয়েছিলেন? আর আজ তাকে চলে আসতে বলাও নিশ্চয়ই অমলদার নির্দেশে।

চা খেতে খেতে অমলদা টোবাকোর প্যাকেটটা খুললেন। তারপর নাকের কাছে নিয়ে এসে নিঃশ্বাস টেনে বললেন, ‘চমৎকার।’

বিটুসাহেব উল্লসিত গলায় বললেন, ‘এককালে আমি খুব পছন্দ করতাম পাইপ। মেড ইন কী দেখুন তো?’

‘কিউবা। এত বদ গন্ধ আমি জীবনে পাইনি।’ বলে হাতে সামান্য তামাক ফেলে চটকে নিয়ে জিভে ফেলতেই উঠে চলে গেলেন টয়লেটে। বেসিনে জল পড়ার আওয়াজ হল। ফিরে এসে টোবাকোর বাস্কটটা বন্ধ করে বললেন, ‘কলজের জোর আছে।’

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ‘কখন এসেছেন অমলদা?’

‘সন্ধেবেলায়। তোমরা চলে যাবার পর খবর পেলাম হরিমাধবের যাঁড়গুলোকে মেরেছে একটা সাদা ন্যাড়া মাথা সাহেব। সে নাকি হরেকৃষ্ণ পার্টির লোক ধরে মন্দিরে এসেছিল। তারপর কৃষ্ণের জীবদেহ প্রসাদ খাইয়ে চলে গিয়েছে। একটা বুড়ি তখন গদগদ হয়ে দৃশ্যটা দেখেছিল, সেই পরে পুলিশকে বলে। আমার বাড়ির সামনেও নাকি ন্যাড়ামাথা সাহেব জিপ থামিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাবুর বন্ধু অশ্বিনীকালী সে কথা বলল। তখনই বুঝলাম, যে এসেছিল সে রায়সাহেবকে ভালভাবে অনুসরণ করে গিয়েছে আর তোমার পরিচয় তার অজানা নয়। কারণ রায়সাহেবের ভাইকে টেলিফোন করে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি চলে গিয়েছেন কি না এবং গেলে সঙ্গে কে গেছেন?’

ভদ্রলোক জানিয়ে দিয়েছিল উনি একাই গেছেন। অতএব ওঁর ভাইপো হয়ে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং পত্রপাঠ তোমাকে ফিরিয়ে আনা দরকার।’

‘ওর নাম জন ম্রো জানলেন কী করে?’

‘হোটেলে ওই নামে ঘর নিয়েছে। যাব। এখন একটু রেস্ট নাও সবাই। আমার মনে হয় বিষ্টুসাহেব, আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল। রাত হয়ে গেলে বৃষ্টির মধ্যে চলতে খুব অসুবিধায় পড়বেন।’ অমল সোম আবার শুয়ে পড়লেন।

‘কোনও অসুবিধে নেই। আমি তো পাশের ঘরটা বলে রেখেছি। শিবহীন চক্ষু হয়? এই কালিম্পং-এ এত বড় ঘটনা আজ রাত্রে ঘটবে আর আমি আরাম করে ঘুমাবো? ক্ষেপেছেন!’

অমল সোম বোধহয় একটা রুঢ় কথা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পাশ্টালেন। কিন্তু অর্জুনের খুব কৌতূহল হচ্ছিল। কোন ঘটনা ঘটবে আজ রাত্রে? অমলদাকে জিজ্ঞাসা করা বোকামি হবে। তেমন বুঝলে অমলদা নিজেই বলতেন। কিন্তু তার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। অমলদা বিষ্টুসাহেবকে জানাতে পারেন আর সে হঠাৎ খুব দূরের লোক হয়ে গেল।

মাঝখানে বৃষ্টি থেমেছিল। আজ কালিম্পং-এ লোডশেডিং। ঘুটঘুটে অন্ধকার শহরটায় নেমেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অমলদা সেই যে টেনে ঘুম দিয়েছিল রাতের খাবারের আগে আর ওঠেনি। অর্জুনের চোখে সন্ধ্যাবেলায় ঘুম আসেনি। যদিও কাল রাত্রে খুব কম সময় ঘুমিয়েছিল সে কিন্তু আজ বিছানায় শুয়ে খানিক বাদে উঠে পড়েছে। বিষ্টুসাহেব পাশের ঘরে ছিলেন। হোটেল থেকে বড় বড় কেরোসিনের বাতি দিয়ে গেছে। সে উঠে বাইরে বেরিয়ে বিষ্টুসাহেবের দরজায় নক্ করল। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। তিনবার শব্দ করার পর অন্ধকার হাতড়ে অর্জুন বুঝল ঘরের বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তার মানে বিষ্টুসাহেব এখানে নেই।

রাত্রের খাবার ঘরেই সেরেছিল ওরা। অমলদা বললেন, ‘অর্জুন, বিষ্টুসাহেবকে একটু ডাকো। কথাবার্তা বলা যাক।’

এতক্ষণ চুপচাপ খাবার খেয়েছে ওরা। অর্জুন ভেবেছিল আজ রাত্রে কী ঘটতে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে অমলদা নিশ্চয়ই কথা বলবেন। কিন্তু মানুষটা এমনই যে সে-আশা ছেড়ে দিলো অর্জুন। এখন জবাবে বলল, ‘উনি তো ঘরে ছিলেন না।’

‘সেকি! বাড়ি ফিরে গেলেন নাকি?’

অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। এবার দরজায় তালা নেই। শব্দ করতে ভেতর থেকে সাড়া এল, ‘হু ইজ দেয়ার।’ গলাটা কেমন সরু সরু।

‘বিষ্টুসাহেব ?’

তারপরেই দরজা খুলে গেল। অর্জুন দেখল একটি টিবেটিয়ান ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। শরীরে পা ঢাকা ছুশ্বা, মাথায় টিবেটিয়ান টুপি, চিবুকে সাদা সাদা দাড়ি আর চোখে স্টেনলেসের চশমা। ডান হাতে মোটা মালা নিয়ে লোকটা হাসতে অর্জুন বলতে যাচ্ছিল, স্যরি। সেই সময়েই লোকটা বলল, ‘খাওয়া হয়েছে ? চিকেন ?’

চমক কাটিতেই অর্জুন হেসে বলল, ‘আরে আপনি ? একদম চিনতে পারিনি।’

‘চৈঁচিও না। হোটেলের অন্য লোকও আছে। হঠাৎ মাথায় মতলব খেলে গেল। ওয়াং-এর কাছে গিয়ে এগুলো ধার করে নিয়ে এলাম। আর ফলস্ দাড়িটা আমার কালেকশন। তোমরা তো কিছুতেই এখানে চেম্বার খুলবে না ? চেনা যাচ্ছে ?’

‘বিন্দুমাত্র না। আপনাকে অমলদা ডাকছেন।’

অমলদা পর্যন্ত বিষ্টুসাহেবকে দেখে অবাক। তারপর বললেন, ‘চমৎকার। এখন ন’টা বাজে। বৃষ্টিও নেই। আপনি তামাকের কৌটোটা নিয়ে সোজা উডল্যান্ড হোটেলে চলে যান। গিয়ে জন কিংবা পিটারকে বলুন আপনার মেয়ে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর চেষ্টা করবেন গল্প জুড়তে, অন্তত দশটা পর্যন্ত। পারবেন না ?’

বিষ্টুসাহেব ঢোক গিললেন, ‘একাই যেতে হবে ?’

‘হ্যাঁ। সঙ্গে আমরা গেলে ও বিশ্বাস করবে ?’

‘তা করবে না। তবে ওরা তো খুব সাংঘাতিক।’

‘হোক না। আপনাকে তো কিছু করবে না। ওখান থেকে ফেরার সময় যা বলেছি তাই করবেন।’

‘অর্জুন আমার সঙ্গে চলুক। বাইরে অপেক্ষা করবে। বিপদ দেখলে—।’

‘না, না, অর্জুনের অন্য কাজ আছে। আপনি যে মেক-আপ নিয়েছেন তাতে শিবের বাবাও টের পাবে না আপনি কে।’

‘শিবের তো বাবা ছিল না কোনও কালে।’

ব্যাপারটা যে বিষ্টুসাহেবের একটুও মনঃপূত হয়নি বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। মিনিট পাঁচেক বাদেই অমল সোম বললেন, ‘এবার আমাদের তৈরি হতে হবে অর্জুন। এখান থেকে উডল্যান্ড হোটেল যেতে আসতে কম করে চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। আমি চাই না বিষ্টুসাহেবের কোনও ক্ষতি হোক।’

লোডশেডিংটা খুব বড় কারণেই হয়েছে আজ। ওরা যখন হোটেল ছেড়ে বের হল তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। রিসেপশনেও কোনও লোক ছিল না। এখন এই মুহুর্তে যদিও অন্ধকার কিন্তু অমল সোমকে চিনতে পারবে এমন মানুষ

পৃথিবীতে নেই। ন্যাড়া মাথা, শরীরে কালো বর্ষাতি। চুল সমেত একটি মানুষের মাথা মাত্র তিরিশ মিনিটে ন্যাড়া হয়ে গেল অর্জুনের সামনে। যতক্ষণ অমলদা মেক-আপ নিচ্ছিলেন ততক্ষণ তার কাজ ছিল শিশ দিয়ে যাওয়া, ঠোঁট সুরু করে সেই সুরটি আধঘণ্টা ধরে বাজাতে হয়েছিল তাকে। মাঝে মাঝে জিভে ব্যথা হয়েছে, দম ফুরিয়েছে কিন্তু থামেনি। মেকআপ শেষ করে অমলদা বলেছিলেন, ‘গুড।’

হোটেল ছেড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে রাস্তার বাঁকে একটা কাঠের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে অমল সোম চাপাগলায় বললেন, ‘এটা ওয়াং-এর বাড়ি। ভারী ভাল মানুষ। জিপে উঠে পড়।’

‘কার জিপ?’

‘ওয়াং-এর। আমি চাবিটি নিয়ে রেখেছি।’

হেডলাইট জ্বলতেই ঘুমন্ত শহরটা দেখা গেল। জনমানবশূন্য পথ খাঁ খাঁ করছে। অমলদার কিটস্ ব্যাগ ঠিক মাঝখানে। ওর মধ্যে যে কী নেই তাই বলতে পারা মুশকিল। পাহাড়ি রাস্তায় পাক খেতে খেতে জিপ উঠছিল। এবং তখনই বৃষ্টি নামল।

রায়সাহেবের বাড়ির অন্তত দুশো গজ দূরে গাড়িটাকে রাখলেন অমল সোম। এখানে রাস্তা সামান্য চওড়া, ডান দিকে একটু ঢুকে গেছে। গাড়িটাকে সেখানে রাখায় বড় রাস্তা থেকে নজর করা যাবে না। এখন জলের ফোঁটা আরও মোটা হয়েছে।

আলো নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে অমল সোম বললেন, ‘আমাদের আজ মিথ্যাচরণ করতে হবে। কাল রাতে জন এসেছিল একটা নাগাদ। ও ভেতরে ঢুকেছে তারও অনেক পরে। আমার মনে হয় আজ ভোরের আগেই আসবে। কারণ মাঝ রাতে জিপ চালিয়ে ওর পক্ষে নীচে যাওয়ায় খুব ঝুঁকি থাকবে।’

অর্জুন বলল, ‘নীচে যাবে কী করে? রাস্তাতে ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।’

অমল সোম চট করে মুখ ফেরালেন, ‘কথাটা একদম মনে ছিল না আমার। ইস, তা হলে তো আজ জন এদিকে নাও আসতে পারে।’

‘কাল তো এদিকে এসেছিল।’

‘কাল এসেছিল খবর দিতে। আজ আসবে ভেবেছিলাম নিয়ে যেতে।’ অমল সোম বললেন, ‘ভালই হল, নিশ্চিন্তে কাজ করা যাবে।’

বৃষ্টির মধ্যেই ওরা নীচে নামল। ওয়াটারপ্রুফের তলায় সোয়েটার থাকা সত্ত্বেও অর্জুন কেঁপে উঠল। তারপর অমল সোমের সঙ্গে পা ফেলে বড় রাস্তায় চলে এল। চারপাশে কোনও প্রাণীর শব্দ নেই। কোনও গাড়ি আসছে না এই রাস্তায়। এক পাশে পাহাড় আর জঙ্গল। দূরে কিছু বাংলা প্যাটার্নের বাড়ি। অমল সোম বললেন, ‘কেমন লাগছে?’

অর্জুন বলল, ‘এবার পুলিশে খবর দেননি, না?’

‘না। ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে যাক রায়সাহেব চান না। যদি আমরা ব্যর্থ হই তা হলে বিটুসাহেব তো রইলেনই পুলিশকে সব জানানোর জন্য।’

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটা মোড়ে এসে দাঁড়ালে অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সোজা নেমে গেলে বাংলোর গেট, তাই না?’

অর্জুন মাথা নাড়ল।

অমলদা হঠাৎ ডান দিকে নেমে পড়লেন। নেমে বললেন, ‘সাবধানে এসো, জোঁক আছে।’

‘জোঁক’ বস্তুটার সঙ্গে খুঁটিমারি রেঞ্জ গিয়েই পরিচিত হয়েছিল অর্জুন। একবার ধরলে ছাড়ান মুশকিল। কিন্তু অমলদা এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? পথ নেই, জঙ্গল সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে। গাছের গায়ে জমে থাকা জল ছিটিয়ে পড়ছে সর্বাস্থে, তার ওপর সাপের ভয় আছে।

একসময় ওরা সেই পাঁচিলটার কাছে পৌঁছে গেল। আকাশে আজ এক ফোঁটাও আলো নেই। কিন্তু ঝাপসা বাংলা বাড়ি কিংবা প্রাসাদটাকে দেখা যাচ্ছে। কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। পাঁচিলটা এখানে বুক অবধি, তার ওপর কাঁটাতার লাগানো। চাপাগলায় অমল সোম বললেন, ‘আমরা এখানে অপেক্ষা করব। ওই ঝাঁকড়া গাছটার নীচে চল।’

ঠিক সেই সময় চাপা গর্জন কানে এল। চারটে জন্তু ভেতরে পাক খাচ্ছে, গন্ধ পেয়েছে ওরা কিন্তু বৃষ্টির জন্যই সঠিক হদিশ পাচ্ছে না। সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কি ভেতরে ঢুকবেন?’

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন অমলদা। আর সঙ্গে সঙ্গে শরীর হিম হয়ে গেল অর্জুনের। আজ সকালবেলায় খাঁচার বাইরে নিরপেক্ষ থেকে সে যা করেছিল তাতে অনেকটাই মজা ছিল। এখন খোলা আকাশের তলায় চারটে রাক্ষসের সামনে দাঁড়িয়ে সেই কাজটা যদি উল্টে যায়! ওরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে! জলে দাঁড়িয়ে শরীর অবশ হয়ে আসছিল। ওয়াটারপ্রুফের বর্ম ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকছে ভেতরে।

হঠাৎ অমলদা বললেন, ‘শিষটা দাও।’

অর্জুন শিষ দিল। প্রথমে ভাল করে স্বর বের হল না! পরে সঠিক হতেই একটু শব্দ হল ওপাশের বাগানে। এবং তারপরেই জানোয়ার চারটে উদয় হল সামনে। উৎকীর্ণ হয়ে ওরা শিষ শুনছিল। অমলদা ব্যাগ খুলে চটপট কিছু বের করে ওটাকে অর্জুনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাঁ করে অন্ধকারে মিশে গেলেন। অর্জুন সমানে সুরটা বাজাচ্ছিল। কুকুরগুলো নড়ছে না। এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই আর একটা শিষ শুনতে পেয়ে অর্জুন থেমে গেল। কুকুরগুলো ছুটে গেল ওপাশে। অর্জুন দেখল একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে ওপরে উঠে শিষ দিচ্ছে। সুরটা তার চেয়ে অনেক ভাল। কুকুরগুলো এবার চারপাশে

চাকরের মতো দাঁড়িয়ে। সুর দিতে দিতে লোকটা এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে।

কুকুরগুলো এবং মানুষটাকে আর দেখা গেল না। গাড়িটার আড়ালে ওরা মিলিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই গাছের ডালগুলো নড়ে উঠল। অর্জুন বুঝল কেউ আসছে। যে আসছে সে বেশ নিশ্চিত, কারণ শব্দ করতে তার দ্বিধা হচ্ছিল না। অর্জুন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তবে বেশ ভারী পা এগিয়ে গেল পাঁচিলটার দিকে, যাওয়ার সময় তার শিষ বাজল। সেই সুর এবং স্পষ্ট। তারপরেই অর্জুন লোকটাকে দেখতে পেল। মাটি ফুঁড়ে সে বাগানে যেন উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শিষ দিচ্ছে। বোধহয় কুকুরগুলোকে দেখতে না পেয়ে সে কিছুটা হতভম্ব। তারপর এক পা এগিয়ে আবার দাঁড়াল, পিটার কিংবা জন। অর্জুন এবার চিনতে পারল। ও আর একটু এগোলেই অমলদার দেখা পাবে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও অমলদার ফেরার সময় মুখোমুখি হবে। অতএব যেমন করেই হোক ওকে ওখান থেকে সরানো দরকার। অর্জুন কিছু না ভেবে পেয়ে শিষ দিল। একই সুরে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। ভীষণ চমকে উঠেছে সে। শিষটা কোথেকে আসছে ঠাণ্ড করতে চাইল। তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল অর্জুন। পকেট থেকে কিছু একটা দ্রুত বের করে লোকটা এগিয়ে এল পাঁচিলের দিকে। অর্জুন গাছের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল নিজেকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লোকটা বাংলোর দিকে ফিরে আবার শিষ দিতেই অর্জুনও শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আবার ঘুরে দাঁড়াল। এবং তারপরেই একলাফে চলে গেল যেখান থেকে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। বোঝা যাচ্ছে খুব ঘাবড়ে গেছে লোকটা। এবং সেই সময় একটা মূর্তিকে ছুটে আসতে দেখা গেল এদিকে।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াল, ‘সীতা!’

‘নো।’ মেয়েটি থমকে দাঁড়াল।

‘সীতা, আমি পিটার।’

‘নো! পিটার ওখানে। কুকুরগুলোকে সামলাচ্ছে।’ মুখে হাত চাপা দিয়ে মেয়েটা দু’পা পিছিয়ে গেল। লোকটা এক পা এগোল, ‘কী যা-তা বলছ। আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? আমি ভেতরে যাব কী করে?’

মেয়েটি এতক্ষণে বোধহয় ধাতস্থ হল, ‘কিন্তু ওই লোকটা কে? কুকুরগুলোর সঙ্গে আমার জানলার নীচে গিয়ে ডাকল যেমন তুমি ডাকো।’ সীতা এবার এগিয়ে এসে পিটারের পাশে দাঁড়াতেই অর্জুন শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিটার মুখ ফিরিয়ে বাইরের জঙ্গলটাকে দেখল। তারপর বলল, ‘আমরা ফাঁদে পড়েছি। লেটস রান।’ সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল পিটার এবং তারপর সীতা। অর্জুন বুঝতে পারছিল না যে এবার কী করবে। কারণ অমলদাকে দেখা যাচ্ছে না। এবং তখনই অমল সোম বেরিয়ে এলেন বাংলোর আড়াল থেকে। অর্জুন

অনুমান করল পাঁচিলের নীচে নিশ্চয়ই গর্ত আছে। তৎক্ষণাৎ অমলদা চলে এলেন গাছের তলায়, ‘চল, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে!’

অর্জুন উত্তেজিত গলায় বলল, ‘কিন্তু ওরা পালিয়েছে এদিক দিয়েই।’

‘জানি। কুকুরগুলোকে লক-আপে ঢোকাতে দেরি হয়ে গেল। চল।’

একদম ব্যস্ত না হয়ে অমলদা বড় রাস্তায় চলে এলেন। ওরা যখন সামনে তাকাল তখন একটা গাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছে। বৃষ্টিতেও তার আলো দেখা যাচ্ছিল। অর্জুন উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘অমলদা!’

‘তুমি তো বললে ধস নেমে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই না?’

নিরুদ্বেগ পায়ে ওরা গিয়ে জিপে উঠল। অমলদা বলল, ‘পিটারের বিরুদ্ধে এতদিন কোনও অভিযোগ করলে আইনে টিকতো না। যে কোনও বিদেশি এখানে আসতে পারে অনুমতি নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র রাখতে পারবে না।’

‘ওর কাছে অস্ত্র ছিল।’

‘সেটা এইমাত্র জানতে পারলাম। রায়সাহেবের মেয়েকে ও ইলোপ না করা পর্যন্ত কোনও চার্জ আনা যেত না। আর আজ সে এসেছিল সীতাকে জানাতে, দু’দিন অপেক্ষা করতে হবে পালানোর জন্য। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ওকে আজ সীতাকে নিয়ে যেতে হল। চল থানায় যাই।’ অমলদা জিপটাকে চালু করলেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন?’

‘ওখানে বিষ্ণুসাহেব আছেন। ওকে বলেছিলাম সেইখানেই থাকতে।’

থানার গায়ে বিরাট হ্যাঁজাক জ্বলছে। এবং গোটা তিনেক গাড়ি। অর্জুন অমলদার সঙ্গে ভেতরে ঢুকতেই বিষ্ণুসাহেব এগিয়ে এলেন। ‘মেয়েটা যে কী কুৎসিত দেখতে কি বলব।’ অমলদা বললেন, ‘ও সি কোথায়?’

‘ভেতরে। ঠিক বাজারের মুখেতেই ওদের ধরে ফেলা হয়েছে। দু’বার গুলি চালিয়েছিল। একটা আমার ঠিক কান ঘেঁষে।’ মাথায় হাত বোলালেন বিষ্ণুসাহেব! ‘গুলি করে উন্ডেড করতে ধরা দিল।’

এই সময় ও সি বাইরে বেরিয়ে আসতেই বিষ্ণুসাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক বললেন, ‘আপনার নাম শুনেছি। সেই দূরবীন দাঁড়ার কেসটা তো। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই স্বীকার করছে না ওকে ইলোপ করা হয়েছিল। কেস তো টিকবে না।’

অমলদা বললেন, ‘নিশ্চয়ই, পিটার গুলি চালিয়েছে, হত্যা করতে চেয়েছিল, বে-আইনি আর্ম রেখেছিল এটাই যথেষ্ট। মেয়েটিকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। আপনার কেস পিটারের বিরুদ্ধে, মেয়েটির উল্লেখ না করলেই হল।’

ও সি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। হেসে বললেন, ‘ঠিক আছে। রায়সাহেবকে বলবেন আমাদের কথা মনে রাখতে।’

ওঁর নির্দেশে একজন সেপাই সীতাকে নিয়ে আসতেই চমকে উঠল অর্জুন।

মাথায় চুল নেই। সকালে যে লম্বা চুল দেখেছে সেটা কি পরচুল? এখন কানের ওপর থেকে অনেকখানি দু'পাশে কামানো। শুধু মাঝখানে সরু ছাঁটা চুল কুণ্ঠসিত করেছে মুখটাকে। অর্জুনকে দেখামাত্র তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। থুক করে থুথু ফেলল। সেপাইটা যখন তাকে জোর করে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্জুনের চোখের সামনে সেই ছবিটা ভেসে উঠল। পাস্‌কু বইটার রঙিন প্রচ্ছদের মেয়েটিই যেন এইমাত্র হেঁটে গেল তার সামনে দিয়ে!

চণ্ডীগড়ে গণ্ডগোল

ঘন নীল জিন্সের প্যান্ট আর কমলা রঙের পুলওভার পরে নতুন-কেনা সাইকেলটা নিয়ে যখন অর্জুন বাড়ি থেকে বের হল, তখনও সূর্যের অবস্থা জিরো পাওয়ারের বাল্বের মতো। রোদ আছে কি নেই সেটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কনকনে বাতাস নেমে আসছে সরাসরি হিমালয় থেকে।

এবার জলপাইগুড়িতে জব্বর শীত পড়েছে। বৃদ্ধরা বলছেন, এরকম শীত নাকি গত পঞ্চাশ বছরেও পড়েনি। সকাল হয় দেরিতে, আর বিকেল শেষ হবার আগেই সন্ধ্যা নামে ঝুপ করে। আর দিনরাত চলছে এই দাঁতকপাটি-লাগা হাওয়ার শ্রোত।

গলির মুখেই বুড়িদিদের বাড়ি। বুড়িদির বাবা তুষের চাদরে মাথা ঢেকে রোদ পাবার চেষ্টা করছেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অর্জুন সাইকেল থামাল, “জ্যাঠামশাই, বুড়িদির চিঠি পেয়েছেন?”

মুখের সামান্য অংশ চাদরের আড়াল থেকে সরিয়ে বুড়িদির বাবা যেভাবে মাথা নাড়লেন তাতে পরশুরামের বইয়ের দেখা সেই পেত্নির ছবিটা মনে এল। একটু খোনা গলা ওঁর। “না বাবা, দিন কুড়ি হল কোনও চিঠি নেই। যে মেয়ে প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিত, সে যে কেন চুপ করে বসে আছে তা বুঝতে পারছি না।”

অর্জুন মাথা নেড়ে আবার প্যাডেলে চাপ দিল। বুড়িদির বর চণ্ডীগড়ের ইঞ্জিনিয়ার। খুঁটিমারির জঙ্গলের কোথায় যে শিকড়টা আছে, তা কে জানে। নেপালিরা পায়ের কালো দাগ ওটা দিয়ে ঘষে ওঠাচ্ছে দেখে বুড়িদির জন্য চেয়ে এনেছিল সে। তার নিজের কোনও দিদি নেই। প্রতিবছর ভাইফোঁটায় বুড়িদির আঙুলের ফোঁটা কপালে নিতে নিতে ওর বুক টনটন করত। মেঘে ঢাকা আকাশের মতো বুড়িদির মুখ কালো দাগে কুৎসিত হয়ে যাচ্ছিল। ওই শেকড় ঘষতে ঘষতে একটু একটু করে মেঘ কাটল। বুড়িদির মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঢলঢলে হওয়ামাত্র বিয়ে হয়ে গেল চণ্ডীগড়ে। সেখানে গিয়ে একটা চিঠি লিখেছিল তাকে বুড়িদি। বিশাল বাগান, অটেল জায়গা, সুন্দর শহর।

সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলেই গতি বাড়াতে ইচ্ছে করে। অর্জুন মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কদমতলার মোড়ে চলে এল। জায়গাটা রিকশা আর ট্যাক্সির টার্মিনাস। দূরপাল্লার মিনিবাস বাস এখান দিয়েই যায়। অর্জুন দেখল কালিম্পাংয়ের একটা মিনিবাস সবে ছেড়ে গেল। ডুয়ার্সে যাওয়ার জন্য কন্ডাক্টররা হাঁকছে। ওপাশে রূপমায়া সিনেমার সামনে চোখ পড়তেই জগদাকে দেখতে পেল। মালবাজারের মিনিবাস ধরবেন বলে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু হাতে চায়ের কাপ। সারাদিনে কত কাপ চা খান কেউ জানে না। রোগা খাটো মানুষটা পরের উপকার করতে না পেলে যেন ঘুমুতে পারেন না। কাপটা দোকানের ছেলেটিকে দিয়ে চিৎকার করলেন, “এই অর্জুন, একটা চাকরির খবর আছে। কাল সন্ধ্যাবেলায় একবার দেখা করিস। আজ সময় নেই।” বলতে-বলতে মালবাজারের মিনিবাস এসে দাঁড়তেই তাতে উঠে জগদা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, “আসিস কিন্তু, মনে হয় হয়ে যাবে।”

সাইকেল থেকে না নেমেই উঁচু গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী চাকরি?”

উত্তরটা পাবার আগেই বাস ছেড়ে দিল। কালিম্পাংয়ের খুন-খারাপি দেখার পর চাকরি করবে না বলে ঠিক করেছিল অর্জুন। চাকরির জন্য সে অনেক ঘুরেছে। এই সামান্য বিদ্যে নিয়ে কারও অনুগ্রহ ছাড়া কাজ পাওয়া যায় না। এখন সে রাতের কলেজে পড়ছে। সারাদিন দেশ-বিদেশের অপরাধীদের নিয়ে লেখা বইতে বঁদু হয়ে থাকে। পৃথিবীর সভ্য-দেশগুলোয় যদি স্বাধীন অনুসন্ধানীদের ভাল রোজগার হয়ে থাকে, তা হলে তারই বা হবে না কেন? অমলদা, অমল সোমও আর চাকরি-বাকরি করেন না। অবশ্য একটা সম্পত্তি থেকে ওঁর আয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ওকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা চেষ্টা করছেন চাকরির জন্য। এই যেমন জগদা। ছোটখাটো রোগা মানুষ। জমিয়ে রাখেন। সব সময় অন্যের উপকার করে যাচ্ছেন। এ কথা ঠিক, জলপাইগুড়ির মতো শহরে ঘন-ঘন অনুসন্ধানের কাজ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, খুঁটিমারি এবং কালিম্পাংয়ের ঘটনাটার পর যতই নাম হোক তার, বয়সটা যে কুড়ির এদিকে। মানুষের ঠিক ভরসা হয় না বোধহয়। তাই যদি না পরিচিতি আরও বাড়ছে, তদ্দিন অমল সোমের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে অর্জুনের। অমল সোমেরও তাই অভিমত। সে ঠিক করল, কাল সন্ধ্যায় জগদার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবে কী ধরনের চাকরি!

রূপমায়া সিনেমার সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা বাজারের দিকে চলে গিয়েছে সেইটেই এই শহরের একমাত্র রাজপথ। শীত হলেও রাস্তায় এখন সাইকেল-রিকশার ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বাবুরা সব অফিসে বের হচ্ছেন। রূপমায়ার সামনে জটলা করা বেকার ছেলেরা ওকে দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করল। সাইকেল চালাতে চালাতে সেইটে লক্ষ করল অর্জুন আড়চোখে। নিজের পরিচিতি বাড়লে বেশ ভাল লাগে। সে প্যাডেলে আরও

জোরে চাপ দিল।

করলা নদী পেরিয়ে হাকিমপাড়ায় ঢুকতেই মনে হল একটা নির্জনতা চারধারে থম মেরে আছে। এককালে এখানে রায়বাহাদুর রায়সাহেবরা থাকতেন। শীতের সকালে তাদের বিশাল বাগানওয়ালা বাড়িগুলো চুপ মেরে আছে।

তিস্তা নদীর শরীর এখন বাঁধে মোড়া। তার গায়ে ছোট্ট বাগান-ঘেরা কাঠের বাংলোটা অমল সোমের। অমলদা একাই থাকেন ওখানে। তিন ডুবনে ওঁর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। বাড়িটার দেখাশোনা এবং রান্নার ভার একটা চাকরের ওপর। লোকটা কথা বলতে পারে না। কিন্তু গায়ে ভীষণ শক্তি। নাম হাবু।

বাগানের গেটের কাছে সাইকেল থেকে নামতে নামতে হাবুকে দেখতে পেল অর্জুন। এই শীতে একটা ফতুয়া পরে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। ওকে দেখে একগাল হেসে ইশারায় দোতলাটা দেখিয়ে দিল হাবু। অর্থাৎ অমলদা এখন তাঁর সাধনার ঘরে। সেখানে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ ডাকাডাকি করা চলবে না। এই বাড়িতে প্রায় রোজই আসে অর্জুন, কিন্তু কখনও দোতলায় ওঠেনি, অমলদাও যেতে বলেননি।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কখন ঢুকেছেন?”

ঘাড় নাড়ল হাবু। একটু বেশি করে। তার মানে অনেকক্ষণ। এই শীতেও হাবুর স্বাস্থ্যবান শরীরে ঘাম জমেছে। ফতুয়াটায় ভেজা দাগ। কাঠের বারান্দায় সাইকেলটা ঠেকিয়ে রেখে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় বসার ঘরে ঢুকল অর্জুন। একটা গোল টেবিলকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার ছাড়া এই ঘরে কোনও আসবাব নেই। দেওয়ালে কোনও ছবি নেই। অর্জুন একটা চেয়ারে বসে দু'বার টেবিলে তবলার বোল তোলার চেষ্টা করল। সে কখনও তবলা বাজায়নি। কিন্তু অভ্যেসে সে একটা শব্দ ঠিকঠাক তালে বাজাতে পারে। ঠিক তখনই একটা সাইকেল-রিকশা বাগানের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। বসার এই ঘর থেকে গেটটা পরিষ্কার দেখা যায়। বাজনা থামিয়ে অর্জুন দেখল কমপ্লিট স্যুট পরা বেঁটেখাটো রোগা মানুষটি রিকশা থেকে নামছেন। মাথায় একটা ফেণ্ট টুপি। বাড়ির দিকে পিছন ফেরা বলে মুখ দেখতে পাচ্ছে না অর্জুন। কিন্তু রিকশাওয়ালা সমানে প্রতিবাদে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বেচারী বাধ্য হয়ে রাজি হল। জলপাইগুড়ির রিকশাওয়ালারা কখনও বেশি পয়সা চায় না। অথচ সাহেব দরাদরি করছেন। লোকটা তো অদ্ভুত। রিকশার পাদানি থেকে একটা মাঝারি স্যুটকেস তুলে নিয়ে গেটের দিকে ফিরতেই লোকটির মুখ দেখতে পেল অর্জুন। আর দেখামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

হাবু ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছে। গেট খুলে একগাল হেসে স্যুটকেসটা হাতবদল করিয়েছে। তারপর গেট বন্ধ করে পিছন পিছন হাসিমুখে এগিয়ে

আসছে। মানুষটির তুলনায় ওকে প্রায় দৈত্য বলে মনে হচ্ছিল। অর্জুন একলাফে বারান্দায় চলে আসতেই লোকটি দাঁড়িয়ে গেলেন, “অ্যাঁ ? বাঃ, খুব সুন্দর। তোমাকেও পেয়ে গেলাম।”

অর্জুন হেসে বলল, “আসুন, আসুন। আপনি আসবেন জানতাম না তো।”

“আমিও কি ছাই জানতাম!” বলতে বলতে দোতলায় উঠে এলেন কালিম্পংয়ের বিষ্টুসাহেব। “আচ্ছা অর্জুন, আমার প্রায়ই একটা কথা মনে হয়। পৃথিবীতে যা-যা ঘটবে, অর্থাৎ ঘটতে চলেছে তা যদি মানুষের আগে থেকেই জানা থাকত, তা হলে কেমন হত ? তুমি বলবে মানুষ ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলত। আমি বলব, না, মানুষ বোকামি কম করত। যেমন ধরো দাবা খেলা। খানিকটা খেলার পর বোঝা যায় আমি হারছি না জিতছি। সেটা বুঝে খেলার কায়দা পাণ্টানোতে মেজাজ আছে। ঠিক আছে?”

অর্জুন এইসব ভারী কথা শুনে মাথা নাড়ল, “বুঝলাম না।”

“বুঝলে না ? এই সামান্য কথাটা ! আচ্ছা ধরো, জন্মাবার পর থেকে যত মানুষের সংস্পর্শে এসেছ তাদের প্রত্যেকের নাম আর মুখ তোমার মনে আছে। কাউকেই ভুলে যাওনি। তা হলে তোমার কী অবস্থা হবে ? তুমি বলবে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু আমি বলব, না।”

অর্জুন এবার বিষ্টুসাহেবকে বাধা না দিয়ে পারল না, “আপনার কী হয়েছে বলুন তো ?”

“কেন ?”

“এসব জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন যে ?”

“মাথা যে আছে সেটা প্রমাণ করছিলুম। কালকেই একটা বইতে পড়েছি, যত ভাববে তত মাথার ভেতরটা সাফ হবে। তিনি কোথায় ?” বিষ্টুসাহেব এদিক ওদিক তাকালেন।

“তিনি সাধনা গৃহে।”

“কোনও জটিল প্রবলেম ?”

“আমি জানি না।”

“অ।” ঘরে ঢুকে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন বিষ্টুসাহেব। পাখির মতো পলকা শরীর। কালিম্পংয়ে সেই খুন-খারাপির সময় যখন এই মানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখন থেকেই ওর ঔঁকে খুব পছন্দ হয়েছিল। রিটার্ডার্ড মানুষ। বছর বাষট্টি বয়স। কিন্তু এখনও বার্ধক্য ঔঁকে স্পর্শ করেনি। অমলদার চেয়ে বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও উনি বেশ সম্মান করেন কনিষ্ঠকে। বিয়ে-থা করেননি, কোনও দায় নেই।

বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “কোনও চাকরিবাকরি হল ?”

অর্জুন ঘাড় নাড়ল, “নাঃ, রাত্রে পড়ছি আর দিনে...।”

“দূর দূর, চাকরি করে কী হবে ? তোমাদের এতবার বললাম চলে এস কালিম্পংয়ে। সেখানে ক্রিমিন্যাল থিকথিক করছে। যাবে আর ধরবে। কদিনেই বড়লোক। তা তোমার দাদা তো আমার কথায় কানই দেন না। কখন নামবেন তিনি ?”

“জানি না।”

“আমার চেহারা কেমন দেখছ ? ঠিক আছে ?”

“ভালই।”

“বড্ড গরম এখানে। কোটটা খুলি, তা হলে আর ভাল বলবে না।” বিষ্টুসাহেব টানাটানি করে কোট খুলে ফেলতেই অর্জুন দেখল তার তলায় দুটো সোয়েটার দু’রকম রঙে উঁকি মারছে। অত মোটা গরমকাপড় শরীরে থাকায় ওঁর শরীর ভারী দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু জলপাইগুড়ির এই ঠাণ্ডাকে গরম বলাটা বাড়াবাড়ি না ? হয়তো বিষ্টুসাহেব যেখান থেকে এসেছেন সেই কালিম্পংয়ে এখন বেশি শীত। তাই বলে জলপাইগুড়িতে কম কি।

কোট খুলে বিষ্টুসাহেব করুণ গলায় বললেন, “শেষ বাঁধনটাও খুলে গেল ভাই। গত সপ্তাহে লিলিকে কবর দিলাম গ্লাভিল্লেরা গাছের তলায়।” কথাটা বলে ফোঁত করে নিশ্বাস ফেললেন বিষ্টুসাহেব। পলকেই তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। লিলির চেহারাটা মনে পড়ল অর্জুনের। গতবারে বিষ্টুসাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছিল। ধবধবে ফর্সা ছোট ল্যাপডগ। ওকে কুকুর বলে মোটেই ভাবতেন না উনি। একদম বুকুর পাঁজর ছিল যেন। লিলিকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে কালিম্পং থেকে কোথাও যেতে চাইতেন না।

ঝুমালে চোখ মুখে বিষ্টুসাহেব বললেন, “মৃত্যুসংবাদটা মিসেস গান্ধীকে জানিয়ে দিয়েছি টেলিগ্রাম করে। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই কষ্ট পাবেন, দেখো।”

অনেক কষ্টে নিজেকে গম্ভীর দেখাতে পারল অর্জুন। অথচ পেটের ভেতরে হাসি গুড়গুড় করছে। অমলদাই কাহিনীটা শুনিয়েছিলেন। বিষ্টুসাহেবের কুকুরপ্রীতি অসাধারণ। বিয়ে-থা করেননি বলেই তাঁর সব স্নেহ ওই কুকুরের ওপর। লিলিকে তিনি অন্ধের মতো ভালবাসেন। বছর দেড়েক আগে মিসেস গান্ধী এসেছিলেন কালিম্পংয়ে। তাঁকে দেখতে এবং তাঁর কথা শুনতে শহরের মানুষ উপচে পড়েছিল। বিষ্টুসাহেব কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারেননি। ভিড়ের মধ্যে লিলির অসুবিধে হবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন বাড়ির কাছাকাছি নির্জন রাস্তায় তিনি লিলিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী যখন ওই পথে সার্কিট হাউসে ফিরবেন তখন তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবেন। জায়গাটা নির্জন। দু’ধারে ইউক্যালিপটাস আর দেওদারের সারি। এদিকে জনবসতি নেই। মিটিং সেরে মিসেস গান্ধী যখন গাড়ির পাহারা নিয়ে ফিরে আসছেন সার্কিট হাউসে, তখন উদ্বেজিত বিষ্টুসাহেব একটা গ্লাভিল্লেরা ফুল মাথার উপর তুলে ওঁর উদ্দেশে নাড়তে লাগলেন। পাহাড়ের গায়ে একটি মানুষ কুকুর

কোলে নিয়ে ফুল নাড়ছে দেখে প্রধানমন্ত্রীর কৌতূহল বা মায়া হল। তিনি গাড়টাকে থামাতে বলেই হাত বাড়িয়ে ফুলটাকে নিয়ে বললেন, “বিউটিফুল। থ্যাঙ্কস।”

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ঘোর কাটেনি বিষ্টুসাহেবের। তাঁর ধারণা প্রধানমন্ত্রী লিলির দিকে তাকিয়ে বিউটিফুল বলেছেন। ঘটনাটা যারা জানে, তারা ঠুকে নিয়ে রসিকতা করলেও অমলদা করেননি। বলেছিলেন, “জানো অর্জুন, ভালবাসা মানুষকে খুব সরল করে দেয়।” কিন্তু দৃশ্যটা কল্পনা করলেই হাসি পায় অর্জুনের। এইসময় বিষ্টুসাহেব বললেন, “ভালই হল। সংসারের সব বাঁধন ঘুচে গেল। ঠিক আছে।”

হাবু দু'কাপ গরম কফি দিয়ে গেল। বিষ্টুসাহেব বললেন, “চমৎকার।” তারপর ঠোট বাঁকিয়ে চুমুক দিয়ে হাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তা হ্যাঁ বাবা হাবু, তোমার বাবুর সাধনা কখন শেষ হবে?”

হাবু হাসল। তারপর উৎকর্ষ হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল। এবং নিঃশব্দে প্রস্থান করল। মাথা নাড়লেন বিষ্টুসাহেব, “বেচারি! ঈশ্বরের বিচার ঠিক হয় না। উচিত ছিল আমার জিভ অসাড় করে দিয়ে হাবুর মুখে কথা ফোটানো। সারা জীবন তো অনেক বকবক করলাম। কী বলো?”

কথাটা এমন গলায় উনি বললেন যে, অর্জুনের মনে হল বিষ্টুসাহেব আলাদা জাতের মানুষ। খুব দুঃখিত না হলে এইভাবে কথা বলা অসম্ভব।

কফি খেতে খেতে বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের হাতে এখন কেস আছে?”

মাথা নাড়ল অর্জুন। মাস দুয়েক কোনও নতুন কেস আসেনি। জলপাইগুড়িতে অপরাধের সংখ্যা কম, যা ঘটে তা খুব সাধারণ শ্রেণীর। বিষ্টুসাহেব হাসলেন, “প্রতিভার অপচয় বড় বেদনাদায়ক। জুতোর শব্দ পাচ্ছি, তিনি আসছেন। ঠিক আছে?”

দোতলা থেকে নামছিলেন অমলদা। অর্জুন ঘাড় নাড়ল।

শেষ চুমুক দিয়ে বিষ্টুসাহেব আঁতকে উঠলেন, “এই যাঃ। কফিতে চিনি ছিল? আমি যে চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি তা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম।”

“একবারে চিনি বর্জন করাটা উচিত কর্ম নয়। তা ছাড়া হাবুর আঙুলে মিষ্টি ওঠে না।” দরজায় দাঁড়িয়ে হাসলেন অমল সোম। লম্বা ছিপছিপে শরীর, পরনে পাজামা-পাজাবির ওপর সাদা শাল, মাথার চুল উশকোখুশকো।

বিষ্টুসাহেব শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ালেন, “নমস্কার, নমস্কার।”

একটা চেয়ার টেনে বসে অমলদা বললেন, “অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাইনি। তা হঠাৎ বিদেশ যাত্রা কেন? সেটা তো আপনার ধাতে নেই।”

“বিদেশ যাত্রা?” চমকে উঠলেন বিষ্টুসাহেব। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, “কালিম্পং থেকে জলপাইগুড়ি আসা কি বিদেশ যাত্রা? ডেইলি ১৪২

প্যাসেঞ্জারি করা যায় । ”

“যায় । কিন্তু আপনি এবার তা করছেন না । লিলি কবে গেল ?”

সঙ্গে-সঙ্গে মুখে ছায়া নামল বিষ্টুসাহেবের, “এক সপ্তাহ । ওফ্ । ” দু’ মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “আপনি জানলেন কী করে ?”

“লিলি থাকলে আপনি বড়জোর একবেলার জন্য জলপাইগুড়িতে আসতে পারেন, কিন্তু বিদেশ যাত্রা কখনওই নয় । কালিম্পিংয়ের বাইরে লিলির সুট করত না । ”

রুমালে মুখ মুছলেন বিষ্টুসাহেব, “গুড গড । কিন্তু আপনি জানলেন কী করে যে, আমি এবার অনেকদূর যাচ্ছি । আই টোস্ট নোবডি । ”

“আপনার সুটকেসের গায়ে আজ সকালে নাম-ঠিকানা লেখা লেবেল সঁটেছেন । জলপাইগুড়িতে আসতে নিশ্চয়ই সুটকেস হারাবার ভয় করতেন না । তাই না ?”

বিষ্টুসাহেব এবার হাত বাড়িয়ে অমলদার হাত খপ করে ধরলেন, “ওফ্ । আপনার চোখ এবং বুদ্ধি অতুলনীয় । আই অ্যাম ইওর ফ্রেন্ড, এটা যে কত বড় গর্বের বিষয়...”

“ওসব কথা থাক । কত দূর যাচ্ছেন ?”

বিষ্টুসাহেব একবার চারপাশে তাকিয়ে নিলেন । তারপর চেয়ারটাকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে বললেন, “সেই ব্যাপারেই তো আপনার কাছে আসা । আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতেই হবে । না বললে আমি শুনছি না । ” তারপর পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে অমল সোমের সামনে মেলে ধরলেন । অর্জুন এক বলকে অনেকগুলো ইংরেজি শব্দের মধ্যে একটি শব্দ আবিষ্কার করল, চণ্ডীগড় ।

॥ দুই ॥

টেলিগ্রামটা পড়তে-পড়তে অমল সোমের ঠোঁটে আত্মতৃপ্ত হাসি ফুটল । বিষ্টুসাহেব উদ্গীৰ্ব চোখে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন । কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে অমলদা বললেন, “মানালিতে এইসময় বেশ বরফ পড়ে । ”

“মানালি ?” বিষ্টুসাহেব হতচকিত হয়ে টেলিগ্রামে চোখ বোলান, “মানালির কথা তো এখানে লেখা নেই । টেলিগ্রামটা এসেছে চণ্ডীগড় থেকে । ঠিক আছে ?”

অমলদা বললেন, “চণ্ডীগড় থেকে মানালিতে যাওয়া যায় । কেউ-কেউ সিমলা হয়েও যান । আপনার কালিম্পিংয়ের শীতও হার মানবে ও জায়গায় পৌঁছলে । ”

বিষ্টুসাহেব এবার অবাক হয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন । যেন অমলদার

কথার কোনও সূত্রই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। শেষ পর্যন্ত গভীর গলায় বললেন, “শীতে আমার ভয় নেই। যা হোক, আমাকে চণ্ডীগড়ে যেতেই হচ্ছে। মানালির শীত মানালিতেই পড়ুক, ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আর কালিম্পং নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, মাঝে-মাঝে ওটা সাইবেরিয়া হয়ে যায়। ঠিক আছে?”

“আপনি কিসে যাচ্ছেন? বাগডোগরা থেকে কি প্লেন ধরতে পারবেন?”

“প্লেন? রিটার্ড মানুষ, প্লেনের পয়সা পাব কোথেকে! ট্রেনেই যাব, আজকে এখানে আসার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে তিনটে টিকিট কিনে এনেছি।” বিষ্ণুসাহেব তাঁর ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে সরল ভঙ্গিতে হাসলেন।

“জিঙ্গেস না করেই তিনটে টিকিট কাটলেন?” অমলদার কপালে ভাঁজ পড়ল।

“বাঃ, শি ইজ ইন ডেঞ্জার। আমরা থাকতে রায়সাহেবের...না, না, আমি ভাবতে পারি না। লোকটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সব কিছুই জিঙ্গেস করে করতে হবে? আপনাদের ওপর আমার কোনও রাইট নেই?” বিষ্ণুসাহেব একটু উত্তেজিত।

“নিশ্চয়ই আছে।” অমলদা হাসলেন, “তবে কি জানেন, আমরা ভারতীয়রা কখনওই চিন্তা করি না অন্যের সুবিধে বা অসুবিধে আছে কি না। আমরা বড্ড বেশি আবেগে পরিচালিত হই। তা ছাড়া এক্ষেত্রে আমরা গিয়ে কী করব। মনে হচ্ছে এটা বাপ আর মেয়ের ব্যাপার। তাই না?” অমলদা উঠলেন।

অর্জুন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। সে দেখল, বিষ্ণুসাহেব হতাশ মুখে বসে আছেন। তারপর রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। অর্জুন বুঝল, মানুষটি সত্যিই নার্ভাস হয়ে গিয়েছেন। সাইবেরিয়া কিংবা মানালি না হলেও জলপাইগুড়িতে যে শীত পড়েছে, তাতে কপালে ঘাম জমে না পরিশ্রম না করলে।

অমলদা ততক্ষণে কাঠের বারান্দা থেকে বাগানে নেমে গিয়েছেন। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল টেলিগ্রামের খবরটা পড়তে। ব্যাপারটা সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে। চট করে সে কালিম্পংয়ে সীতাহরণের ঘটনাটা ভেবে নিল। সেই ঘটনার মাস তিনেকের মধ্যে রায়সাহেব খামারবাড়ি বিক্রি করে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আবার নতুন কী বিপদ হল, অর্জুন তা বুঝতে পারছে না। কিন্তু বিষ্ণুসাহেব নিজে থেকে টেলিগ্রামটা দেখতে না-বললে কী করে দ্যাখে!

ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুন দেখল বাগানে ফিনফিনে রোদ ছড়িয়েছে। অমলদা ফলের গাছগুলোর মধ্যে পায়চারি করতে করতে একটা বিশেষ গাছের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর উঁবু হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেটাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। গাছটাকে কালিম্পং থেকে আনা হয়েছিল। পাহাড়ি ফুলের গাছ। বছরখানেক বয়স হয়ে গেল, কিন্তু বাড়ছে না, মরছেও না। মাঝে-মাঝে

পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে, আবার নতুন পাতা গজায়। কিন্তু বড় হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই, ফুল ফোটা তো দূরের কথা। পাহাড়ের গাছ সমতলের মাটির সঙ্গে যেন কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। আর তাই ওটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই অমলদার। নানা রকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন যাতে ওটা বড় হয়।

“অর্জুন।”

বিষ্টুসাহেবের গলা শুনে মুখ ফেরাল সে।

“কী করা যায় বলো তো!” ওর কাছেই পরামর্শ চাইলেন বিষ্টুসাহেব।

“আমি তো ব্যাপারটার কিছুই জানি না।”

“জানো না? কেন, এতক্ষণ তো শুনলে!” বিষ্টুসাহেবের হাঁ বড় হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় অমলদা ওই গাছের সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বললেন, “বিষ্টুসাহেব, দয়া করে একবার এখানে আসবেন? এই গাছটা আমাকে বড্ড জ্বালাচ্ছে।”

খানিকটা ইতস্তত করে এবং অনেকটাই অনিচ্ছায় বিষ্টুসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর বারান্দার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, “টেলিগ্রামটা পড়ো। আমার এখন নৌকোডুবির অবস্থা আর উনি গাছ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! ঠিক আছে।”

“ওটা আপনার দেওয়া গাছ। বাড়ছে না।” অর্জুন বিষ্টুসাহেবের মুখ দেখে হেসে ফেলল।

টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিয়ে বিষ্টুসাহেব গুটিগুটি চলে গেলেন। অর্জুন তাকাল অক্ষরগুলোর দিকে। অনেকটা লিখেছেন ভদ্রলোক। আর একটু বড় হলে পোস্টকার্ড হয়ে যেত। কোনও ভূমিকা নেই। টেলিগ্রামে অবশ্য ভূমিকা করার সুযোগও থাকে না। “আমি আবার বিপদগ্রস্ত। পাঁচদিন হল সীতাকে পাচ্ছি না। এখানে এসে বেশ ভালই ছিলাম। সীতাও পাণ্টে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে এবার অ্যাবডাক্ট করা হয়েছে। পুলিশ কোনও হদিস পাচ্ছে না। আপনি মিস্টার সোমকে নিয়ে অবিলম্বে চলে আসুন। সমস্ত খরচ আমার। আপনাদের অনুগ্রহ চাইছি। ইউ এন রায়।”

দু'বার বাতটি পড়ল অর্জুন। একটি লাইনের ওপর তার দৃষ্টি আটকাল। ‘মনে হচ্ছে এবার অ্যাবডাক্ট করা হয়েছে।’ তার মানে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গেছে। কারা, কী জন্যে এই অপকর্মটি করবে, তা টেলিগ্রামে লেখা নেই। আর তাই পুরো ব্যাপারটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল অর্জুনের কাছে। কালিম্পংয়ের ঘটনাটা তো অন্য কথা বলে।

ইউ এন রায় পুরোদস্তুর সাহেব। দীর্ঘকাল আগে জলপাইগুড়ি ছেড়ে তিনি আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে চলে যান পড়াশুনো করতে। তারপর

সেখানেই চাকরি, চাকরি থেকে ব্যবসা। মোটামুটি সাধারণ আমেরিকানদের তুলনায় বেশ সচ্ছল অবস্থা তাঁর, এমন কথা বলেছিলেন বিটুসাহেব। পুরো নাম উপেন্দ্রনারায়ণ রায়। মজবুত, সুদর্শন মানুষ গায়ের রঙ ধবধবে। বয়স পঞ্চাশের ওপাশেই, কিন্তু বোকা যায় না। সানফ্রানসিসকোতে মানুষ হলেও ওঁর স্ত্রী বাঙালি। তাঁকে দেখেনি অর্জুন। যে-সময় কালিম্পিংয়ে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেই সময় তিনি আমেরিকাতেই ছিলেন। ‘উপেন্দ্রনারায়ণ’ বলতে যে জমিদারি চেহারাটা মনে আসে, তার সঙ্গে মানুষটার কোনও মিল না থাকলেও মেজাজে একটা মিল আছে। সেটা হল কঠোর ব্যক্তিত্ব। ভদ্রলোক যেন হালকা কথা বলতে শেখেননি।

দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকার ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে উপেন্দ্রনারায়ণের যোগসূত্র স্ফীণ হয়ে গেলেও বাড়িতে বাংলা কথা বলার চলটা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আমেরিকায় বড় হওয়া একজন বাঙালিনির সঙ্গে। ফলে একমাত্র কন্যাসন্তানটি বাবার চাপে বাধ্য হয়ে বাংলা বলতে পারে, কিন্তু তার আচরণ এবং চেহারা মার্কিন ছাপ স্পষ্ট। এই মেয়ের বয়স যখন ষোলো বছর হয়নি, তখন উপেন্দ্রনারায়ণ বাধ্য হয়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে। তিনি কালিম্পিংয়ের অনেকখানি এলাকা নিয়ে একটি বাংলাবাড়ি আর খামার করেছিলেন। সেই সুবাদেই বিটুসাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মিসেস রায় ওই সময় এদেশে আসেননি।

বিপদ এড়াতে উপেন্দ্রনারায়ণ এদেশে চলে আসেন; কিন্তু বিপদ এড়ানো গেল না। বিটুসাহেবের কাছে খবর পেয়ে উপেন্দ্রনারায়ণ তখন সাহায্যের জন্য এসেছিলেন অমল সোমের কাছে। কালিম্পিংয়ে সীতাহরণ নিয়ে তারপর নানান কাণ্ড। অমলদা শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনারায়ণকে বিপন্নুক্ত করেছিলেন। তারপর আর কোনও খবর পায়নি অর্জুন। কিন্তু মাঝে-মাঝেই মেয়েটি, যার নাম সীতা, তার চেহারাটা মনে পড়ত। অত সুন্দর গায়ের রঙ, নাক-চোখের সুন্দর গড়ন, মুখে বাঙালি মেয়ের লাবণ্য সত্ত্বেও মেয়েটি মাথার দু’পাশের চুল কানের ওপর থেকে এমনভাবে কামিয়েছে, যাতে ঠিক সিঁথির জায়গায় ইঞ্চি দুয়েক খাটো চুল ছাঁটা টুপির মতো পড়ে থাকে। ওইটুকুতেই মেয়েটিকে কি বীভৎস দেখাচ্ছিল! এই মেয়ে নাকি পাঙ্ক!

পাঙ্ক শব্দটার সঙ্গে অর্জুন কখনও পরিচিত ছিল না। উপেন্দ্রনারায়ণ সেবার যখন সাহায্যের জন্য এসেছিলেন তখনই শব্দটা শোনে। আমেরিকার কিছু কিশোর এবং তরুণ সম্প্রদায় নাকি নিজেদের অখুশি ভাবতে পারলে খুশি হয়। পুরনো সংস্কার, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি এবং চলতি প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারলে একশ্রেণীর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে বেশ গর্ব বোধ করে। এদের জন্য তাদের বাপ-মায়ের চিন্তার শেষ নেই। এই কিছু দিন আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হিপি হবার প্রবণতা দেখা যেত। হিপিরা ছিল বাউণ্ডলে।

ঘরের বাঁধন ছেড়ে এরা পৃথিবীর চারপাশে বেরিয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন মাদক দ্রব্য এদের আসক্তি পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। কিন্তু হিপিরা উগ্র প্রকৃতির ছিল না। প্রাচুর্যের মধ্য থেকে ওরা হাঁপিয়ে উঠেছিল বলে বাউণ্ডুলে জীবনের সুখ খুঁজতে চেয়েছিল, এমন কেউ কেউ অনুমান করেন। ক্রমশ হিপি-কালচারের দিকে ঝুঁকবার আকাঙ্ক্ষা কমে যেতে লাগল। এখন তো হিপি শব্দটা প্রায় ইতিহাস হতে চলেছে।

হিপীদের পরে এখন আমেরিকার কিশোরদের মধ্যে পান্স্ হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পান্স্দের প্রধান বস্তু্য হিপীদের চেয়ে উগ্র। ওরা পুরনো সংস্কার এবং রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করে প্রকাশ্যে। কোনও আইন বা নিয়মের ধার ধারে না। পান্স্রা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু হিপীদের মতো পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় না। এক-একটা শহরের সবচেয়ে কুখ্যাত রাস্তায় ওরা দল বেঁধে পড়ে থাকে। সাধারণত সানফ্রানসিসকো এবং ন্যুইয়র্ক শহরের মতো ঘনবসতি এলাকায় এদের সংখ্যা বাড়ছে। এদের দলে পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়ে রয়েছে। যে এলাকায় ওরা থাকে, সেই এলাকাটাকে বীভৎস করে তুলতে এদের জুড়ি নেই। তবে সব সময় ওরা সতর্ক থাকে, যাতে পুলিশের মুখোমুখি না পড়তে হয়। খুবই নির্দয় এবং পাষণ্ড টাইপের এইসব ছেলেমেয়ে পুলিশকে এড়িয়ে চলে। ফুটপাথে পা ছড়িয়ে বসে এরা পথচারীকে ব্যঙ্গ করে। বিশেষ করে সে যদি বিদেশি কিংবা অন্য শহরের মানুষ হয়। এরা চামড়ার জ্যাকেট পরতে ভালবাসে, মেয়েরা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত চামড়ার জুতো। মাথার চুল দু' পাশ থেকে কামিয়ে শুধু মাঝখানে ইঞ্চি দুয়েক রেখে তাতে নানান উজ্জ্বল রঙ মাখিয়ে রাখে। খিদে পেলে ছিনতাই করতে এদের বাধে না। সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য এরা ওইরকম বীভৎস সাজে নিজেদের সাজায়। এটা এদের প্রতিবাদ।

এই দলে যে-সব ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছে তাদের অনেকের পরিবার বেশ ধনী। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে স্বেচ্ছায় এই জীবনে এরা পা বাড়িয়েছে। তবে সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু এখনই এরা সরকারের দৃষ্টিস্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবরকম শুকনো মাদক এরা নেশা হিসেবে ব্যবহার করে। পান্স্রা ইচ্ছে করেই ভাল কথা বলে না, কারণ তাতে পুরনো সংস্কারকে মর্যাদা জানানো হয়।

উপেন্দ্রনারায়ণের মেয়ে সীতা এই পান্স্দের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে প্রায় জোর করে এবং গোপনে তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন উপেন্দ্রনারায়ণ এই দেশে। মেয়েটির ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয়, ভারতবর্ষের সামাজিক সম্পর্ক দেখে যদি ওর চৈতন্য জাগে, এই আশায় তিনি এদেশেই থেকে যাবেন ঠিক করেছিলেন। তাঁর আসাটা খুব আকস্মিক ছিল। তাই সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর স্ত্রী সে-দেশে থেকে গিয়েছিলেন।

কিন্তু কালিম্পাংয়ে আসার পর উপেন্দ্রনারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন পাঙ্কদের সম্পর্কে তিনি নির্ভুল ধারণা করতে পারেননি। সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও পাঙ্ককে ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। ফলে কালিম্পাংয়ের পাহাড়ে তিনি বিশাল বাড়ি নিয়ে বাস করেও যখন বুঝলেন, পাঙ্কদের এড়িয়ে যেতে পারেননি, তখন বিষ্টুবাবুর পরামর্শে অমলদার সাহায্য নিয়েছিলেন। সেই যাত্রা খুব জোর বেঁচে গিয়েছিল মেয়েটি। অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল বলাটা ঠিক হবে না, কারণ মেয়েটি স্বেচ্ছায় পাঙ্কদের সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিল। অনেক কাণ্ড করে সেবার এই যাওয়া বন্ধ করেন অমলদা। সে ব্যাপারে অর্জুনেরও বড় ভূমিকা ছিল। পাঙ্ক ছেলেটিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আদালতে পেশ করা যায় না। কারণ মেয়েটি বেঁকে দাঁড়াত। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে যেতে গেলে বিদেশিদের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। ছেলেটির সেটা না নেওয়া থাকায় তিন মাস জেলে থাকতে হয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত সে ভারতবর্ষের বাইরে চলে যায়।

এরপরে বিষ্টুসাহেবের চিঠিতে অর্জুন জেনেছিল, উপেন্দ্রনারায়ণ কালিম্পাংয়ের বাস তুলে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছেন। কালিম্পাংকে তাঁর নিরাপদ এলাকা বলে মনে হয়নি। পাঞ্জাবে তিনি বিশাল ডেয়ারি খুলেছেন। যতটা ব্যবসার জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটানোর জন্য। বিষ্টুসাহেব আরও জানিয়েছিলেন, মেয়েটির মধ্যে নাকি দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। খুব শান্ত হয়ে গিয়েছে সে।

অর্জুন তাকিয়ে দেখল বাগানে দাঁড়িয়ে বিষ্টুসাহেব উত্তেজিত গলায় কিছু বলছেন আর অমলদা নিঃশব্দে মাথা নাড়ছেন। শেষ পর্যন্ত বিষ্টুসাহেব রাগত ভঙ্গিতে বারান্দায় উঠে এলেন। “নাঃ, কেউ যখন বুঝবে না, তখন আমাকে একাই যেতে হবে। ঠিক আছে।”

কথাগুলো বলতে-বলতে ধপ করে চেয়ারে বসে রোগা খাটো মানুষটি অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর ছোঁ মেরে টেলিগ্রামটা নিয়ে বললেন, “গাছ বড় করবেন ! ও গাছ বড় হবে না। ওই মাটির জিনিস কি এই মাটিতে প্রাণ পায় ? নো !”

আচমকা কথা শেষ করে বিষ্টুসাহেব অর্জুনের দিকে সরু চোখে তাকালেন, “ভাই অর্জুন ! তুমি কি তোমার নামকরণ সার্থক করবে ?”

“মানে ?” অর্জুন হতভম্ব হয়ে তাকাল।

“সহজ ব্যাপার। তুমি কি আমার সঙ্গে চণ্ডীগড়ে যাবে ?”

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল। কখনও সে উত্তরবাংলার বাইরে যায়নি। তা ছাড়া সেখানে যে রহস্য রয়েছে, সে তো রায়সাহেবের চিঠিতেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু অমলদা না বললে সে যায় কী করে। সত্যানুসন্ধানীর সহকারীর কি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ? সে বিষ্টুসাহেবকে সরাসরি না-ও বলতে

পারল না। বলল, “অমলদা কী বলেন দেখি!”

“না না, তোমার অমলদাকে আমি বুঝতে পারি না। এত দক্ষ মানুষ শুধু আলসেমি করে জলপাইগুড়িতে রয়ে গেল। তোমাদের ব্যাপার জানার পর আমি প্রতিদিন একটা করে থ্রিলার উপন্যাস পড়ে যাচ্ছি। ওফ্! সেখানে গোয়েন্দারা কতরকম কাণ্ড করে। জেমস বন্ড তো সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। আজ হংকং তো কাল বার্লিন। তোমার অমলদার তো জলপাইগুড়ি থেকে নড়তেই হচ্ছে করে না। বড়জোর ওই কালিম্পং। না না, অর্জুন, আমি হতাশ, কমপ্লিটলি হতাশ। ঠিক আছে।”

এই সময় অমল সোম আবার ঘরে ফিরে এলেন। এসে বললেন, “যাই বলুন, এবার ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।”

কথাটা বিষ্টুসাহেবের মোটেই পছন্দ হল না। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ওঁর ভাবসাব দেখে অর্জুনের মজাও লাগছিল, আবার কষ্টও হচ্ছিল। এই রোগা বেটেখাঁটো বৃদ্ধের মধ্যে অদ্ভুত সারল্য আছে।

অমলদা বললেন, “বিষ্টুসাহেব, হয়তো আপনার কথাই ঠিক। প্রত্যেক গাছের নিজস্ব মাটি থাকে, পরিচিত আবহাওয়া থাকে। সেখানেই সে স্বাভাবিকভাবে বড় হয়। অপরিচিত মাটি এবং পরিবেশ তাকে পঙ্গু করে দেয়। তাই আমার গাছটা বড় হচ্ছে না। কিন্তু ওটা তো মরেও যাচ্ছে না। কেন? সেটাই আমার প্রশ্ন।”

বিষ্টুসাহেব মুখ অন্য দিকে ফিরিয়েই বললেন, “এ বিষয়ে আমি আপনাকে এক ঘণ্টা ধরে বোঝাতে পারি। কিন্তু এখন সেই মেজাজ নেই। ঠিক আছে?”

কথাটা যেন কানেই তুললেন না অমলদা। বললেন, “একটা কথা বোঝা যাচ্ছে, গাছটা মরতে চাইছে না। প্রতিকূল পরিবেশেও সে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আপনার টিকিট কোন ট্রেনের?”

“টিকিট?” হতভম্ব হয়ে মুখ ফেরালেন বিষ্টুসাহেব, “টিকিট মানে?”

“একটু আগে যে বললেন তিনটে টিকিট কিনে এনেছেন?”

“ও, হ্যাঁ। তা তাতে আর কী প্রয়োজন আপনার?”

“প্রয়োজন কিছু ছিল না। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে যে লড়াই করে, তাকে অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। এই যেমন আমি আমার গাছটাকে সার দিয়ে যাচ্ছি।”

বিষ্টুসাহেবের দুটো চোখ পিটপিটিয়ে উঠল, “ঠিক বোধগম্য হল না।”

হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা তুলে নিলেন অমল সোম, “এই লাইনটার কথা ভাবছিলাম। ‘মনে হচ্ছে এবার অ্যাবডাস্টি করা হয়েছে।’ যে মেয়ে আমেরিকায় জন্মাল, বড় হল, তার তো ভারতবর্ষে মন টিকবে না। সে পাঙ্ক কিংবা যাই হোক না কেন, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। কিন্তু এখানে আসার পর

দেশের হাওয়ায় যদি না ওর মন পাণ্টায়, তা হলে অ্যাভাঙ্ক করা হবে কেন ? অ্যাভাঙ্ক মানে তো জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া । তার মানে মেয়েটির মন এই ধরে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে । আমার গাছটা ধরুন এই মাটি আর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বড় হতে চায়, কিন্তু কিছু পোকা যদি তার সেই ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলতে আসে, তা হলে আমি অবশ্যই প্রতিরোধ করব । এই অ্যাভাঙ্ক শব্দটা আমাকে...” এই অবধি একটানা বলে হঠাৎ চোখ বন্ধ করলেন অমল সোম । কথাগুলো যতটা না বিটুসাহেবকে বলা, তার অনেক বেশি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা ।

বিটুসাহেব উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিলেন । তারপর নিজেকে প্রাণপণে নিরাসক্ত রাখার চেষ্টা করতে-করতে বললেন, “অর্জুন, প্রচুর পরিমাণে গরম জামাকাপড় নিও । শুনলে তো খুব শীত পড়ে ওখানে । ঠিক আছে ?”

অমল সোম বললেন, “চলো অর্জুন, ভারতবর্ষের ও পাশটা ঘুরে আসা যাক । পাঞ্জাবে এখনও টাটকা দুধ আর মিল্ক-কেক পাওয়া যায় ।”

॥ তিন ॥

অর্জুন ভেবেছিল বিটুসাহেব নিশ্চয়ই সরাসরি চণ্ডীগড়ের টিকিট কেটেছেন । যদিও চণ্ডীগড়ে যাওয়ার কোনও ট্রেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ছাড়ে না, কিন্তু দিল্লিতে যাওয়া যায় । ভারতবর্ষের ম্যাপটা ওর মুখস্থ, দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় তো বেশি দূরে নয় । কিন্তু বিটুসাহেব বললেন, “ও ট্রেনের টিকিট পাওয়া কি চ্যাপ্টিখানি কথা । তিন মাস আগেই রিজার্ভড হয়ে থাকে । আমরা কলকাতা হয়ে চণ্ডীগড়ে যাব । ঠিক আছে ?”

ব্যবস্থাটা অমলদার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু অর্জুনের ভাল লাগল । আজ অবধি সে কখনও কলকাতায় যায়নি । যায়নি, কারণ যাওয়ার দরকার পড়েনি । কিন্তু কলকাতা তাকে সব সময় টানে । ওই শহরে ব্যোমকেশ, কিরীটি রায় এবং ফেলুদার বাড়ি । কলকাতা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের শহর । কলকাতা শব্দটা উচ্চারণ করলেই নানান ছবি মনে ভেসে আসে । কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় দার্জিলিং মেলের একটি থ্রি-টিয়ার কামরায় বসে অমলদা বললেন, “সময় নষ্ট করার কোনও দরকার ছিল না । তা ছাড়া এই ট্রেনটার খুব দুর্নাম শুনেছি । আপনি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট পাননি ?”

“উহু ! ফার্স্ট ক্লাসে বেশি ভিড় । আমার এক পরিচিত ছোঁড়াকে বলতে সে এই তিনটে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিল । হাই তুললেন বিটুসাহেব, “একটা রাতের তো ব্যাপার, ঘুমিয়ে পড়লেই ভোর হয়ে যাবে । ঠিক আছে ?”

অমলদা ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই জানলার কাচ নামিয়ে সেখানে হেলান

দিয়ে বই নিয়ে বসে ছিলেন, কথাটা শুনে হেসে বললেন, “ভাল হয়ে গেলে সেরে যাবে গোছের ব্যাপার ! অর্জুন, চোখ-কান খোলা রেখো ।”

একপাশের তিনটে বার্থ ওদের । মাঝখানে বিটুসাহেব বসে । অর্জুন বিটুসাহেবের দিকে তাকাল । তারা যাচ্ছে চণ্ডীগড়ে । আশা করা যায়, সেখানেই রহস্য-টহস্য রয়েছে । দার্জিলিং মেলে বসে খামোকা চোখ-কান খোলা রেখে কী হবে ? ও দেখল বিটুসাহেবও কথাটাকে আমল দিচ্ছেন না । কারণ তিনি নিঃশব্দে ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়াই ঢের ভাল ।

অন্ধকার দিয়ে ট্রেনটা এখন হু হু করে ছুটে যাচ্ছে । কামরার প্রতিটি জানলা বন্ধ রাখা হয়েছে । তা সত্ত্বেও কনকনে শীত টুইয়ে-টুইয়ে ঢুকছে ভিতরে । ট্রেনে ওঠার আগে ওরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে রাতের খাবার খেয়ে উঠেছিল । অর্জুনের মনে হচ্ছিল এই বেলা বিছানা করে শুয়ে পড়লেই ভাল হয় । যদিও রাত বেশি হয়নি, কিন্তু দারুণ শীতে কামরায় বেশ ঘুম-ঘুম ভাব এসে গিয়েছে । এই সময় বিটুসাহেব ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “চণ্ডীগড় কী জন্য ফেমাস হে ?”

আচমক্কা এরকম প্রশ্নে অর্জুনের বেশ গুলিয়ে গেল । সে প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করতে লাগল কী কারণে চণ্ডীগড় বিখ্যাত হতে পারে । ঠিক সেই সময় ট্রেনটা আচমকা স্পিড কমিয়ে থেমে গেল । জানলার কাচের আড়াল ভেদ করে কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না । ট্রেনটা থেমে যাওয়ামাত্র দরজায় ঘন-ঘন শব্দ হচ্ছিল । বিটুসাহেব চমকে উঠলেন, “হোয়াটস্ দ্যাট ? মাস্ট বি ডাকাত ।”

“কী করে মনে হল ?” বইয়ের পাতা থেকে চোখ না-সরিয়ে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন ।

“বাইরে থেকে কীরকম অসভ্যের মতো ধাক্কা দিচ্ছে ।” বিটুসাহেব কথাটা শেষ করেননি, এমন সময় দরজার কাছে বসা যাত্রীরা চিৎকার করে উঠলেন, “আরে, করছ কী ! খুলো না, খুলো না !”

অর্জুন মুখ বাড়িয়ে দেখল একটি অন্ধবয়সী ছেলে দরজার লক খুলে দিতেই হুড়মুড় করে জনা ছয়েক উঠে এল কামরায় । প্রত্যেকের বয়স তিরিশের নীচে । ওরা বড়-বড় কয়েকটা গাঁটরি তুলে নিল নীচ থেকে । তারপর দরজা বন্ধ করে চারপাশে চোখ বোলাল । যে ছেলোটার একটা হাত কাটা, সরু প্যান্ট আর লাল সোয়েটারের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে উলের টুপি মাথায়, সে-ই যে নেতা, তা বুঝতে সময় লাগল না । কারণ হাতকাটা জিজ্ঞেস করল, “কোনও দু’ নম্বর মাল আছে গাড়িতে ?”

যে ছেলোট দরজা খুলেছিল, সে মাথা নাড়ল, “মনে হয় না ।”

গাড়ি তখন আবার চলতে শুরু করেছে । গতি বাড়ছে চাকার । ছেলোট খুব

দেমাঁকি চালে কামরার মাঝখানে চলে এল, “শুনুন সবাই, আমরা আপনাদের একটু বিরক্ত করছি। ব্যবসার খাতিরে দুটো টয়লেট আমাদের দরকার হবে। আপনারা যে যেমন আছেন, তেমনি থাকুন এক ঘণ্টা। আমরা লোক খরাপ নই, কোনও ক্ষতি করব না আপনাদের। কিন্তু যিনি উন্টো কথা বলবেন, তাকে সিঁধে করে দেব। অলরাইট, ঘুমিয়ে পড়ুন।”

ছেলেটি আবার দরজার কাছে ফিরে গিয়ে নির্দেশ দিল, “নে, হাত চালা, কুইক।”

থ্রি-টিয়ার কামরা হলেও টয়লেটের সামনে কিছু মানুষ শুয়ে-বসে রয়েছে। হাতকাটা তাদের সামান্য সরিয়ে দলটাকে মালসমেত দুটো টয়লেটে ঢুকিয়ে দিল। তারপর পেটের কাছে ভাল হাতটা সজাগ রেখে কামরার ওপর সতর্ক চোখ রাখল।

হঠাৎ যেন যাত্রীদের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল। কেউ কোনও কথা বলছেন না। যেন অবশ্যাস্তাবী একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, কিছুই করার নেই, এই রকম ভঙ্গিতে যে যার জায়গায় শুয়ে বসে রইল। অর্জুন ছেলেগুলোকে দেখছিল। চেহারা দেখে কাউকে বদলোক বলে মনে হচ্ছে না। বয়সও বেশি নয়। কিন্তু এরা খুব অন্যায় কিছু করছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্যায়টা এরা জোরগলায় করছে।

এই সময় বিটুসাহেব কথা বললেন। যদিও তাঁর গলার সুর শুকনো এবং ফ্যাঁসফেঁসে হয়েছে এই মুহূর্তে, তবু শোনা গেল, “টি. টি. কোথায়?”

অমলদা বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বললেন, “তাকৈ দরকার পড়ল কেন?”

“এটা অন্যায়। রিজার্ভড কামরায় উঠে ধমক দিচ্ছে। টি. টি. দেখবে না? দেশটার কী হল? ওরা তো এখন ছুরি দেখিয়ে সব কেড়ে নিতে পারে। মাই গড!” বলতে বলতে বিটুসাহেবের গলার স্বর ওঁর অজান্তেই চড়া হয়ে গেল। আশেপাশের যাত্রীরা কিঞ্চিৎ ভয় এবং সমীহের চোখে এ দিকে তাকালেন।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার কি প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে?”

“নিশ্চয়ই। আমি চিরকাল পাহাড়ে কাটিয়েছি। অন্যায়ের সঙ্গে কোনও আপোস করিনি।” এই কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজনায বিটুসাহেব একটা হাত মুঠো করে শূন্যে ছুঁড়লেন।

অমলদা বললেন, “তা হলেও আইন নিজের হাতে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চেকারসাহেব ওপাশে বসে আছেন। তাকৈ গিয়ে বলুন।”

শোনামাত্র বিটুসাহেব উঠে দাঁড়ালেন স্প্রিংয়ের মতো। অর্জুনের মনে হল এই মুহূর্তে ওই ছোটখাটো মানুষটা বিশাল শক্তির অধিকারী হয়ে গেছেন। ছেলেগুলো যেখানে কাজ করছিল, তার বিপরীত দিকে সদর্পে এগিয়ে গেলেন বিটুসাহেব চেকারের সন্ধানে। অর্জুনের উন্টো দিকে বসা একটা লোক বলল, খুব চাপা গলায়, “এরা খুব ডেঞ্জারাস। সঙ্গে আর্মস আছে। ওঁকে শান্ত হতে ১৫২

বলুন ।”

অর্জুন কথাটা শুনে অমলদার দিকে তাকাল । অমলদা এখন বই বন্ধ করেছেন । চোখাচোখি হতে বললেন, “বয়স্ক মানুষরা অল্পতেই উত্তেজিত হন । তা ছাড়া বিষ্টুসাহেব খুব সং মানুষ । তুমি কি তিন তলায় শোবে ?”

অর্জুন বলল, “যেখানে খুশি । কিন্তু এই ছেলেগুলো কী করছে ?”

ঠিক তখনই বিষ্টুসাহেব হড়বড়িয়ে ফিরে এলেন । এসে ওদের বার্থের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, “লোকটা কী বলল জানেন ? বলল, ‘ওসব দিকে নজর না দিয়ে নিজের বার্থে শুয়ে পড়ুন । ওরা তো আপনাকে ডিস্টার্ব করছে না ।’ বুঝুন, সরকারি চাকরিতে দায়িত্ব পালনের কী নমুনা ! ঠিক আছে !”

এই সময় হাতকাটা ছেলেটি দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে এল এদিকে । অর্জুন লক্ষ করল, সে তার হাতটা পেটের কাছ থেকে সরাস্ত্বে না । বিষ্টুসাহেবের সামনে এসে ছেলেটি বলল, “খুব কিচিরমিচির করছেন তখন থেকে । কেসটা কী ?”

অর্জুন সতর্ক হল । অস্ত্র থাকুক কিংবা নাই থাকুক, ও যদি বিষ্টুসাহেবকে আঘাত করে, তা হলে সে ছেড়ে দেবে না । কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, বিষ্টুসাহেবের বিশাল হয়ে যাওয়া শরীরটা কুঁকড়ে যেন আরও ছোট হয়ে গেল । দু’বার কথা বলতে চেষ্টা করলেন । এই সময় অমলদা স্বাভাবিক গলায় বললেন, “ওঁর টয়লেটে যাওয়া দরকার ।”

চকিতে মুখ ফিরিয়ে ছেলেটা অমলদাকে দেখে নিল, “ওপাশে দুটো আছে ।”

বিষ্টুসাহেব বললেন, “দুটোতেই লোক আছে । থাক, থাক, ঠিক আছে ।”

যেন ছেলেটিকে বিদায় করতে পারলেই বেঁচে যান এই ভঙ্গিতে নিজের বার্থের দিকে এগোচ্ছিলেন বিষ্টুসাহেব, কিন্তু বাধা পেলেন । “থাকবে কেন ? আপনি বুড়োমানুষ, আসুন আমার সঙ্গে । আসুন !” প্রায় ধমকেই বিষ্টুসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গেল ছেলেটি ।

বিষ্টুসাহেবের যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না । পিছন ফিরে কাতর দৃষ্টিতে দু’বার তাকিয়ে তিনি ছেলেটিকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন । অর্জুনের মনে হচ্ছিল, ওঁর সঙ্গে যাওয়া উচিত । কিন্তু অমলদা নির্বিকার হয়ে বসে আছেন । এতগুলো মানুষের সামনে নিশ্চয়ই ওরা ক্ষতি করবে না বিষ্টুসাহেবের ।

ছেলেটি টয়লেটের সামনে গিয়ে হুকুম করতেই দুটি ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল । ছেলেটি এবার বিষ্টুসাহেবকে বলল, “মাল সামলে যাবেন ।”

বিষ্টুসাহেব প্রায় উর্ধ্ববাহু হয়ে কাঁপতে-কাঁপতে চোখের বাইরে চলে গেলে অর্জুন অমলদাকে জিজ্ঞাসা করল, “কী হল বলুন তো ?”

অমলদা এবার শোবার তোড়জোড় করছিলেন । বললেন, “যা স্বাভাবিক, তাই । শেষ মুহূর্তে বিষ্টুসাহেবের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল । ‘ঠিক আছে’ না-বললে

উনি নর্মাল হন না ।”

মিনিটখানেকও লাগল না, বিষ্টুসাহেব দ্রুত চলে এলেন। এসে বললেন, “অর্জুন, মাঝখানের বার্থটা তোলো, আমি শুয়ে পড়ব। ঠিক আছে।”

এবার হেসে ফেলল অর্জুন, “না, ঠিক নেই। আপনার মুখ-চোখ অমন দেখাচ্ছে কেন?”

“যেমনই দেখাক তবু ঠিক আছে। হাতকাটা ছোকরা বলে দিয়েছে, যা দেখবেন তা কাউকে বলবেন না। খারাপ হয়ে যাবে। দু-দুটো গোয়েন্দা থাকতেও আমার নিরাপত্তা নেই। ঠিক আছে।”

অমলদা হাসলেন, “আবার ভুল করলেন। আমরা দেহরক্ষী কিংবা পুলিশ নই। সত্য সন্ধান করাই আমাদের কাজ। আপনি যা দেখে এলেন, তার মধ্যে অসত্য কিছু নেই। তাই সত্য সন্ধানের প্রয়োজন হচ্ছে না। তবে আপনার শুয়ে পড়া উচিত। বড্ড ঘামছেন।”

কমালে মুখ মুছতে মুছতে বিষ্টুসাহেব ধপ করে অর্জুনের পাশে বসে পড়লেন। তারপর বিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর ফিসফিস করে বললেন, “ছাতা! লটস অব ছাতা! অল জাপানিস, চাইনিস। টয়লেটের পাটাতন সরিয়ে তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে। সব কটা স্মাগলার। নো টক। ব্যাটা এদিকে আসছে। আমি তোমাকে কিছু বলিনি। ঠিক আছে!” ফিসফিসিয়ে কথাটা বলে চোখ বন্ধ করলেন বিষ্টুসাহেব ভাঁজ করা বাস্কে মাথা হেলিয়ে দিয়ে। অর্জুন দেখল সতর্ক ভঙ্গিতে ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়াল, “আপনি ফালতু-ফালতু টয়লেটে গেলেন। আপনার যাওয়ার দরকার ছিল না।”

অর্জুন অবাক হয়ে বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল, তিনি চোখ বন্ধ করেই আছেন। কথাটা শোনার পর গুঁর মুখের পেশী সামান্য কাঁপল, “ঠিক আছে।”

এবার ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে কামরার যাত্রীদের উদ্দেশে চোঁচিয়ে বলল, “আমাদের কাজ হয়ে গিয়েছে। এবার আপনারা টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন।”

হঠাৎ অমলদা বললেন, “তোমরা তো খুব দ্রুত কাজ সারতে পারো।”

ছেলেটি হাসল, “তা না হলে বিজনেসের বারোটা বেজে যাবে। আমরা কোনও প্যাসেঞ্জারকে ট্রাবল দিতে চাই না। আপনি দেখবেন চব্বিশ ঘণ্টা টয়লেট খোলা থাকলে কারও সেটা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দরজা বন্ধ হলেই প্রত্যেকের প্রয়োজনটা বেড়ে যায়। আমরা তাই চেষ্টা করি তাড়াতাড়ি কাজ সারতে।”

“এটা অন্যায়, খুব অন্যায়।” বিষ্টুসাহেব আচমকা নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটি। “এই যে দাদু, কী বললেন? অন্যায়? একদম জ্ঞান দেবেন না। ওসব দিতে এলে ফাঁসিয়ে দেব।” তার হাতটা ১৫৪

পেটের ওপর গুঁজে রাখা একটা কিছুর হাতল ধরল যেন ।

হঠাৎ বিটুসাহেব মরিয়া হয়ে গেলেন, “জোরজবরদস্তির যুগ পড়েছে, ফাঁসাবে তো ফাঁসাও । চোখের সামনে স্মাগলিং করছ আর ভয়ে থরথর করে কাঁপছি ।”

অর্জুন স্মাগলিং শব্দটা শোনা মাত্র আশঙ্কা করছিল—এবার কিছু একটা ঘটবে । কিন্তু ছেলেটা কিছুই করল না । সে বিটুসাহেবের উষ্টোদিকের লোকটাকে ইঙ্গিতে সরিয়ে মুখোমুখি বসল, “আমরা স্মাগলিং করছি কেন দাদু ?”

“কেন করছ তোমরা জানো । কিন্তু এতে দেশের সর্বনাশ হচ্ছে ।” বিটুসাহেব এতক্ষণে ভয়-দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন ।

“শুনুন । দিনের পর দিন আমি চাকরি পাইনি । পকেটে পয়সা নেই যে, ব্যবসা করব । আমরা যখন না খেয়ে ছিলাম, তখন তো আপনি এসে বলেননি এটা অন্যায্য ! আমরা ভিক্ষে চাইলে কেউ একটা পয়সা দেবে না । তা হলে আমরা কী করতে পারি ? এই কামরায় উঠে একটা চাকু দেখালে আপনারা সুড়সুড় করে সব মাল আমাদের হাতে তুলে দিতেন । সেটা ভাল হত ?” ছেলেটা ছোট চোখে তাকাল ।

বিটুসাহেব চাপা গলায় বললেন, “ঠিক আছে !”

“না, ঠিক নেই । লটকে লট ছাতা আমরা নিয়ে যাচ্ছি কলকাতায় । কালই এসপ্লানেডে সেগুলো বিক্রি হবে ডাবল দামে । আর আপনারাই ফরেন গুডস্ বলে হাসিমুখে কিনে নিয়ে যাবেন বাড়িতে । আপনারা অন্যায্য করছেন না ?”

“নিশ্চয়ই ।” বিটুসাহেব মাথা নাড়লেন ।

“সেই কেনার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করছেন ?”

“না ।”

“যে কোনও মধ্যবিত্ত বাঙালির বাড়িতে গিয়ে দেখুন, একটা না একটা ফরেন জিনিস পাবেন । যার অনেক কিছুই বেআইনি । তাতে দোষ নেই ?”

“নিশ্চয়ই ।” বিটুসাহেব মাথা নাড়লেন ।

“আমরা কমিশনে মালটা নিয়ে যাচ্ছি । জিনিস অন্য লোকের, ডেলিভারি নেবে অন্য লোক । আমরা সামান্য টাকা পাব । এই টাকা না পেলে...” হাতকাটা ছেলেটি এক মুহূর্তের জন্য যেন অন্যরকম হয়ে গেল ।

অর্জুনের মনে হল ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে না । এরা নিশ্চয়ই অন্যায্য করছে । কিন্তু সেই অন্যায্যের সঙ্গে না জেনে হাত মিলিয়েছেন অনেক সাধারণ মানুষ । তাঁরা লোভে পড়ে বিদেশি জিনিস কিনছেন । আর এরা পেটের দায়ে এই সহজ পথ বেছেছে । আসল অন্যায্য করছে সেই সব ব্যবসায়ী, যারা এদের দিয়ে এই কাজ कराচ্ছে । আজ যদি দেশের মানুষ চোরাই বিদেশি জিনিস কেনা বন্ধ করে দিত, তা হলে ওই ব্যবসায়ীরা জন্ম হত ।

হঠাৎ অমলদার গলা শুনতে পেল অর্জুন । নির্লিপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

“তোমার হাতটার ওই অবস্থা হল কী করে?”

“গুলি লেগেছিল। বাদ দিয়ে দিল ডাক্তাররা।” ছেলেটা এবার উঠে দাঁড়াল। “নি, শুয়ে পড়ুন আপনারা। ফালতু বকালেন।”

বিটুসাহেব বললেন, “ঠিক আছে।”

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কলকাতায় যাচ্ছ?”

ছেলেটা হাসল, “না। আমার দল মাল নিয়ে কলকাতার আগেই নেমে যাবে। আমি নামব উপেন্দ্রাশ্রয়।”

“ক’দিন থাকবে ওখানে?”

“দেখি। এখন তো আর অডার হাতে নেই। চলি।”

ছেলেটি চলে গেলে বিটুসাহেব বললেন, “যাই বলো, এ মানা যায় না। পুলিশের উচিত ওদের অ্যারেস্ট করা। এই কামরায় পুলিশ থাকলে আমরা কমপ্লেন করতাম।”

রাতের দার্জিলিং মেল অদ্ভুত একটা শব্দ তুলছিল। কামরায় এখন গভীর ঘুম। অর্জুনের মনে পড়ল সেই কবিতাটা, এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি, দিল পাড়ি...। এই নিস্তব্ধ চরাচরে অন্ধকার কেটে কেটে একটি দূরন্ত ট্রেন কয়েক শো মানুষকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে একা-একা। তার চলার ছন্দে নানান কথা তৈরি হচ্ছে। তৃতীয় বাক্সের ওপর শুয়ে ঘুম আসছিল না অর্জুনের। বারংবার তার ছেলেটার কথা মনে পড়ছিল। ওদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় না? সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, কামরায় এখন নীল আলো জ্বলছে। প্রতিটি বার্থের মানুষ এখন ঘুমিয়ে কাদা। কোনও মানবিক শব্দ নেই। নীচে শুধু বিটুসাহেবের নাক ডাকছে। হঠাৎ সে দেখল, টয়লেটের সামনে হাতকাটা ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। তার চোখ বন্ধ। সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় পাহারার দায়িত্ব ওর।

এই সময় নীচে সামান্য শব্দ হল। তারপর অর্জুন বিস্মিত হয়ে দেখল, অমলদা একটা চাদর জড়িয়ে বার্থ থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন টয়লেটের দিকে। সে দেখল অমলদা ছেলেটির মুখোমুখি। অমলদা চাপা গলায় কিছু বলছেন, আর ছেলেটি তা মন দিয়ে শুনছে।

॥ চার ॥

অর্জুনের কলকাতায় ভাল করে ঘুরে দেখা হল না বলে একটুও আফসোস হচ্ছিল না। সে ট্যাক্সিতে বসে জিজ্ঞাসা করল, “এখানকার মানুষদের অসুবিধে হয় না?”

“হয়। কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।” বিটুসাহেবের মুখ গভীর।

সকালে শিয়ালদায় পৌঁছে ওরা কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠেছিল। সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে বিকেলে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। হোটেলে উঠে পরিষ্কার হয়ে বিটুসাহেবকে টিকিটের ব্যবস্থা করতে বলে অমলদা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, দুপুরে খাবেন না, বিকেলের আগেই ফিরে আসবেন। আর তারপর থেকে বিটুসাহেবের মুখ গম্ভীর। কলকাতায় তাঁর অনেক দিন আসা-যাওয়া নেই। বদলে-যাওয়া শহরটার সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে পারছেন না। সকালে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে শুনেছেন, মাসখানেক আগে না কাটলে কলকাতায় কোনও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায় না। দিল্লির ট্রেনে তো আরও ভিড়। বিটুসাহেব আশা করেছিলেন অমলদা এই টিকিট কাটার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন। তা না করে তিনি ‘কাজ আছে’ বলে বেরিয়ে গেলেন হোটেল ছেড়ে। এইটে অর্জুনেরও ভাল লাগেনি। কলকাতায় তো আসার কথাই ছিল না। তা হলে হঠাৎ অমলদার এত জরুরি কাজ পড়ে গেল কী করে?

এগারোটা নাগাদ বিটুসাহেব ওকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কোথায় বিক্রি হয় জেনে নিয়ে হোটেলের বাইরে আসতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিলেন। গন্তব্যস্থান বলতে বাঙালি ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, “দুটো টাকা লাগবে।”

বিটুসাহেব অবাক হলেন, “সে কী। এখানে দু’ টাকায় ট্যাক্সি পাওয়া যায়? দ্যাখো হে অর্জুন, কলকাতা এখনও মধ্যবিত্তের স্বর্গ।”

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মুচকি হেসে বলল, “দাদু কি শহরে নতুন? মিটারে যা উঠবে, তার ওপর দু’ টাকা এক্সট্রা দিতে হবে। উঠুন।”

ট্যাক্সিতে ওঠার পর অর্জুনের মনে হল, এই যে দু’ টাকা বাড়তি নিচ্ছে লোকটা, তা বেআইনি, এবং বিটুসাহেব যে রাজি হয়ে গেলেন, সেটাও অন্যায়। সেই হাতকাটা ছেলেটা যে অন্যায় করেছে, এটা তারই রকমফের মাত্র। এই সময় ট্যাক্সিটা একটা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গেল। অর্জুন মুখ বাড়িয়ে দেখল তাদের সামনে একটা ট্রাম দাঁড়িয়ে। ওপাশে সার-সার গাড়ি। মুহূর্তেই পিছনেও গাড়ি জমে গেল। দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল। ড্রাইভার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে বিড়ি ধরাতে বিটুসাহেব ব্যস্ত গলায় বললেন, “কী হল ভাই, আমাদের হাতে সময় নেই। দিল্লির ট্রেন ধরতে হবে যে।”

“উপায় নেই।” ফুক করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ড্রাইভার জানাল, “মিছিল যাচ্ছে।”

“মিছিল? কিসের মিছিল? মিছিল বলে গাড়ি যাবে না?”

“দাদু, আপনি তো নতুন, এই শহরটার হালচাল দু’ দিনেই জেনে যাবেন।”

বিটুসাহেব হতাশ হয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছেন। অর্জুন দেখল, রাস্তাটায় ক্রমশ গাড়ির জট পাকাচ্ছে। ফুটপাথ দিয়ে অজস্র মানুষ হাঁটছে। কলকাতায়

মানুষ খুব কষ্ট করে থাকে, প্রথম দেখায় অর্জুনের এই রকম মনে হল।

এখানে শীত মোটেই নেই। গরম জামাকাপড় কিছু না চাপিয়ে বের হয়েছিল সে। বিটুসাহেব কিন্তু কোট ছাড়েননি। এখন ট্যাক্সির বন্ধ হওয়ায় রীতিমত গরম লাগছে। চুপচাপ গাড়ির মধ্যে বসে রাস্তা দেখা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

গত রাত থেকে অমল সোমের ওপর একটা চাপা অভিমান জন্মেছে অর্জুনের। মধ্যরাতের ঘুমন্ত ট্রেনে অমলদা হাতকাটা ছেলেটির সঙ্গে কী কথা বললেন তা সে জানে না। প্রায় মিনিট পাঁচেক ওঁদের কথা হয়েছিল। অর্জুন নিজের বার্থে শুয়ে দেখেছিল ছেলেটি শেষপর্যন্ত ঘাড় নেড়ে সম্মতির ভঙ্গিতে কিছু বলতেই অমলদা নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন নীচের বার্থে। তখন হয়তো তাঁর মনে হয়ে থাকতে পারে যে, অর্জুন ঘুমচ্ছে, কিন্তু আজ সকালে তো একপাশে ডেকে বলতে পারতেন ঘটনাটা। তা ছাড়া একজন ভাল সত্যসন্ধানী ট্রেনে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকবে এটা অমলদা ভাবলেন কী করে? সকালে এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। কলকাতায় ঢোকার কিছু আগে একটা বেজায়গায় ট্রেনটা থেমেছিল সিগন্যাল না পাওয়ায়, আর সেই সুযোগে ছেলেগুলো নেমে গিয়েছিল। এমনকী, সেই হাতকাটা ছেলেটাও। অথচ সে বলেছিল দলের সঙ্গে নামবে না। দ্বিতীয় ঘটনাটা হল আজ। অমলদা হোটেল থেকে ‘কাজ আছে’ বলে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, তা গোপনেও তাকে বলতে পারতেন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল সহকারী হিসেবে অমলদা তাকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই মানুষটা কেন যে হঠাৎ-হঠাৎ অন্যরকম হয়ে যান!

প্রায় দেড়-ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থেকে ওরা ডালহৌসিতে পৌঁছল। প্রথম শ্রেণীর টিকিট যেখানে বিক্রি হয় সেখানে ভিড় কম। বেশ ঝকঝকে বাড়ি। কাউন্টারগুলোও সুন্দর। বিটুসাহেব বললেন, “চলো, চটপট টিকিটটা কেটে ফেলি।”

দিল্লি-কালকার টিকিট যে কাউন্টারে দেওয়া হয়, তার সামনে জনাচারেক লোক দাঁড়িয়ে। বিটুসাহেব তাদের পেছনে দাঁড়ালে অর্জুন চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল। ভারতবর্ষের সর্বত্র যাওয়ার জন্যে এক-একটা কাউন্টার খোলা আছে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলে অন্যরকম অনুভূতি হয়। এই সময় দুজন শিষ্যসমেত একজন সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর বয়স হয়েছে। পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, কাঁধে গেরুয়া ঝোলা, গলায় মোটা-মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। শিষ্য দুটি এবার ছুটেছুটি করতে লাগল টিকিটের জন্যে। অর্জুন লক্ষ করল, সন্ন্যাসীর গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো। মাথায় যে জটা, তা আদৌ নোংরা নয়। আর মুখখানা বেশ হাসি-হাসি। এরকম সন্ন্যাসীকে দেখলে ভয় লাগে না, বরং কথা বলতে ইচ্ছে করে পাশে গিয়ে।

১৫৮

সন্ধ্যাসী চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠোঁটের মৃদু হাসিটা স্থির হয়ে আছে। এই সময় বিটুসাহেব হতাশ ভঙ্গিতে ফিরে এলেন, “হয়ে গেল, এখন কী হবে?”

অর্জুন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, “কী হয়েছে?”

“টিকিট নেই। বলল ওয়েটিং লিস্টে থাকতে পারি। আটান্ন নম্বর। তার মানে যারা টিকিট পেয়েছে, তাদের ষাটজন না এলে আমাদের জায়গা হতে পারে। ঠিক আছে?” বিটুসাহেব দু’পকেটে হাত ঢুকিয়ে কোটটাকে ডানার মতো দোলাতে লাগলেন।

“তাহলে আমরা যাব কী করে?”

“আগামী সাতদিনের মধ্যে কোনও টিকিট নেই।”

“সেকেন্ড ক্লাসে পাওয়া যাবে না?” অর্জুন উপায় বাতলাল।

“ফার্স্ট ক্লাসই পাওয়া যাচ্ছে না দেখছ, অথচ রায়সাহেব আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন। না গেলেই নয়। শেষপর্যন্ত বেশি খরচ করে প্লেনেই যেতে হবে দেখছি।”

বিটুসাহেবের সরব চিন্তা শুনে অর্জুনের ভাল লাগল। কখনও প্লেনে চাপেনি সে। এই সুযোগে প্লেনে চড়া যদি হয়ে যায়! কিন্তু আজ সকালে বিটুসাহেব বলেছেন যে, যাতায়াতের টিকিটের টাকা তিনি নিজেই দেবেন। রায়সাহেবকে যখন বন্ধু হিসেবে নিয়েছেন তখন তাঁর কাছ থেকে এই বাবদে টাকা নিতে পারবেন না। তাহলে প্লেনের টিকিট কাটতে বিটুসাহেবের খুবই অসুবিধে হবে।

“কোথায় যাবেন স্যার?”

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল একটা সিডিস্কে-মতো লোক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। বিটুসাহেব বললেন, “আর যাওয়া! টিকিটই নেই তো যাব কী করে!”

“কোই পরোয়া নেই। আমি এসে গেছি। কোন ট্রেন বলুন।”

“দিল্লি-কালকা মেল।” অর্জুন জানাল।

“আজকে হলে পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা, কাল হলে পঁয়তাল্লিশ, পরশু হলে চল্লিশ। ফিল্ড রেট।” লোকটা গম্ভীর মুখে জানাল।

“এক্সট্রা? এক্সট্রা কেন?” বিটুসাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন।

“আমাদের মজুরি। দিয়ে-থুয়ে বেশি থাকে না।”

“তুমি টিকিট ব্ল্যাক করছ? ব্ল্যাকার? গেট আউট। আমি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব।” হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন বিটুসাহেব।

লোকটা মোটেই ভয় পেল না, “কী যা-তা বলছেন। আমি আপনাদের উপকার করছি, আপনি আমাদের উপকার করবেন।”

বিটুসাহেব উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে সম্ভবত পুলিশের খোঁজে চারপাশে

তাকাচ্ছিলেন, এমন সময় শিষ্যদুটি ছুটে এল লোকটির কাছে। “দিল্লি-কালকার টিকিট আছে তাই?”

“আছে। ক’টা?” লোকটি চট করে ওদের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

“একটা কালকার টিকিট। আমাদের গুরুদেব যাবেন আজকে।”

“ষাট টাকা এক্সট্রা।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে।” এক শিষ্য পকেটে হাত দিল।

বিষ্ণুসাহেব দ্রুত পা চালিয়ে লোকগুলোর কাছ থেকে সরে এলেন। অর্জুন তাঁকে অনুসরণ করল। “কী করবেন তাহলে?”

“যাই করি, অন্যায়ের সঙ্গে আপস করব না। ঠিক আছে!” বিষ্ণুসাহেব বিরক্ত মুখে কথাটা বলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগলেন, যেন একটা উপায় তিনি এই মুহূর্তে বের করবেন। এবং তখনই সন্ন্যাসীর দিকে তাঁর নজর গেল। অর্জুন দেখল সন্ন্যাসী ইশারায় তাদের কাছে ডাকছেন। কিছু বলার আগেই বিষ্ণুসাহেব গুটি-গুটি সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর ঠোঁটে হাসি, সেই ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হল, “উত্তেজনা অতি বদ জিনিস, ওটি পরিহার করো বৎস।”

বিষ্ণুসাহেব কেমন মিইয়ে গেলেন সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে। বিড়বিড় করে বললেন, “আমি অন্যায় সহ্য করতে পারি না বাবা।”

“ঠিক ঠিক, তবে তারও তো একটা পথ আছে। তাঁকে ডাকো, দেখবে তিনিই তোমার সব বোঝা বইবেন। যাচ্ছ কোথায়?”

“চণ্ডীগড়। আমার এক বন্ধু খুব বিপদে পড়েছেন, তাকে বাঁচাতে।”

“বিপদ থেকে বাঁচাবার তুমি কে হে? বড় অহঙ্কারী মানুষ তুমি! যিনি পাঠিয়েছেন, তিনিই বাঁচাবেন। বিপদটা কী?”

“আমার ওই বন্ধুর মেয়েকে অ্যাবডাস্ট মানে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে কেউ, তাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি আমরা। ওই যে, ওর নাম অর্জুন। খুব ভাল গোয়েন্দা, বয়স অল্প হলে কী হবে। আর আছে ওর সিনিয়র। তিনি সব সমাধান করতে পারেন। মানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে ওর ওপরে তাই।” গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন বিষ্ণুসাহেব।

অর্জুন দেখল সন্ন্যাসী তার দিকে তাকাচ্ছেন। সে অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই অমলদাকে দেখতে পেল। সেইমুহূর্তে অমল সোম ভেতরে ঢুকলেন। সে বলল, “বিষ্ণুসাহেব, অমলদা!”

বিষ্ণুসাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, “সোমবাবু, ও সোমবাবু।” তারপর সেদিকেই ছুটে গেলেন অপেক্ষা না করে।

সন্ন্যাসীকে অর্জুনের ভাল লাগেনি। উত্তেজিত হতে নিষেধ করছেন, অথচ ব্রাহ্মণদের কাছে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছেন শিষ্যদের। সে অমলদার কাছে গিয়ে শুনল বিষ্ণুসাহেব ঠুকে সমস্যাটার কথা বলছেন। ব্রাহ্মণকে তিনি টিকিট

কাটবেন না, অথচ আজই যাওয়া দরকার। “সেকেন্ড ক্লাসের কাউন্টারে একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়। যদিও কোনও চাপ নেউ, তবু—”

অমলদা বললেন, “আপনি কাউন্টার থেকে তিনটে টিকিট কেটে ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে এখানে এসে দাঁড়ান, আমি ঘুরে আসছি।” কথাটা শেষ করেই অমলদা গম্ভীর মুখে কাউন্টারগুলোর সামনে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেলেন।

অর্জুন এই মুহূর্তে অমলদাকে বুঝতে পারছিল না। উনি একবারও বলেননি যে, কাজ সেরে রেলওয়ে টিকিট-কাউন্টারে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করবেন। তা ছাড়া ট্যাক্সিটা যদি রাস্তায় না আটকে যেত, তা হলে তো টিকিট না পেয়ে এতক্ষণে ওদের হোটেলের ফিরে যাওয়ার কথা। একটা অভিমানবোধ জন্ম নিচ্ছিল অর্জুনের মনে। অমলদা এবার কোনও বিষয়েই ওর সঙ্গে আলোচনা তো দূরের কথা, ওকে কিছু জানানোরও প্রয়োজন মনে করছেন না।

তিনটে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিল্লি-কালকায় হয়ে গেল। ভি. আই. পি-দের জন্যে কিছু টিকিট শেষমুহূর্তের জন্যে রাখা থাকে, অমলদার কোনও পরিচিত অফিসার তাতেই ব্যবস্থা করে দিলেন। বিটুসাহেব বেজায় খুশি। বারবার তিনি অমলদাকেই ‘থ্যাঙ্ক য়ু’ ‘থ্যাঙ্ক য়ু’ বললেন। টিকিট কেটে ফেরার সময় অমলদা লালবাজারের সামনে নেমে গেলেন। বললেন, কিছু বন্ধুবান্ধব আছেন পুরনো আমলের, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে বললেন, “অর্জুন, খুব যদি দেরি হয়ে যায়, তাহলে আমি সোজা স্টেশনে চলে যাব। তুমি আমার স্যুটকেসটা হোটেল থেকে নিয়ে যেও।” বিটুসাহেব জবাবে বললেন, “ঠিক আছে।”

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল লালবাজারের ভেতরে ঢুকতে। কলকাতা পুলিশের প্রধান কার্যালয় সম্পর্কে সে নানান গল্প শুনেছে। ঠিক তার সামনে থেকে না দেখে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ততক্ষণে ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে এবং বিটুসাহেব জিজ্ঞেস করছেন, “সোমবাবু, আই মিন তোমার দাদাটির কী হয়েছে বলো তো? সবসময় আমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকছেন।”

অর্জুন মুখ ফেরাল। বিটুসাহেবের কাছে সে নিজের অভিমানের কথা জানাতে চায় না। হেসে বলল, “কাজটাজ আছে বোধহয়। আজ রাত থেকে তো একসঙ্গেই থাকব।”

“তাই ভেবেছ? মোটেই নয়।”

“তার মানে?”

“তিনটে টিকিট। তোমার আমার একই কুপেতে, ওঁরটা অন্য একটায়।”

“সে কী?” অর্জুন অবাক হল। টিকিট আছে বিটুসাহেবের কাছে। ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে টিকিট কিনে এনে উনি অমলদার হাতে দিয়েছিলেন।

অমলদার পরিচিত অফিসার সেগুলো কনফার্মড করে দিয়েছেন। অতএব অর্জুন জানার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বিটুসাহেব টিকিট ফেরত নেবার সময় খুঁটিয়ে দেখেছিলেন।

“হয়তো এক ঘরে তিনটে বার্থ পাওয়া যায়নি। কিন্তু উনি এমন ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন যে, সীতার ব্যাপারটা নিয়ে যে একটু আলোচনা করব তার সময় পাচ্ছি না। ঠিক আছে। তুমি কিছু ভেবেছ?” বিটুসাহেব ট্যাক্সির মধ্যেই সরে এলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল। না। তারপর মুখে বলল, “ওখানে গিয়ে রায়সাহেবের মুখে সমস্ত ঘটনাটা না শুনে কিছু ভাবটা ঠিক হবে কি?”

“ঠিক হবে না, না? আসলে গোয়েন্দাদের খুব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। উত্তেজিত হওয়া নিষেধ।”

“গোয়েন্দা বলবেন না, সত্যসন্ধানী বলুন।”

“ওহো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যসন্ধানী।”

কলকাতার কিছুই দেখা হল না। এক টিকিটের ব্যবস্থা করতেই দিনের অনেকটা সময় গেল। তা ছাড়া রাস্তায় এত ভিড়, কোথাও গেলে ঠিক সময়ে ফেরা যাবে কি না তাতে সংশয় ছিল। সন্ধ্যা হওয়ামাত্র হোটেলের বিল চুকিয়ে বিটুসাহেবের সঙ্গে অর্জুন হাওড়া স্টেশনে চলে এল। অমলদা টেলিফোনে ম্যানেজারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি সরাসরি স্টেশনে চলে যাবেন। অর্জুনরা যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা না করে।

হাওড়া স্টেশনের সামনে ট্যাক্সির ভিড়, প্রচুর আলো, প্লাটফর্মের বাইরে বিশাল জায়গা দেখে অর্জুন চমৎকৃত হল। তার দেখা বড় স্টেশনের মধ্যে আজ সকালের শিয়ালদা ছিল, হাওড়া স্টেশন শিয়ালদাকেও হার মানাচ্ছে।

ওরা কুলি নেয়নি। অর্জুন দুহাতে নিজের এবং অমলদার ব্যাগ বইছে। দিল্লি-কালকার পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বিটুসাহেব প্রথম শ্রেণীর কামরা খুঁজে চলেছেন। বিশাল ট্রেনের মাঝামাঝি একটা প্রথম শ্রেণীর কামরার দরজায় গায়ে সাঁটা লিস্টে নিজেদের নাম দেখে তিনি উজ্জ্বল চোখে বললেন, “ঠিক আছে।”

আর সেই সময় অর্জুনের নজরে পড়ল একটি জানলার ধারে সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর চোখ দুটি বন্ধ। চোঁটে হাসি। আলো পড়ায় তাঁর মুখের চামড়া প্রচণ্ড ফরসা লাগছে। জানলার নীচে সেই শিষ্য দুটি। মুখ তুলে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে তারা গুরুদেবের কাছে যেন খুব জরুরি কথা নিবেদন করে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিটুসাহেব কামরার মধ্যে ঢুকে গেছেন। জিনিসপত্র রেখে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, “এসো হে তৃতীয় পাণ্ডব। ফাস্ট ক্লাস কুপে। তুমি নীচে নেবে, না ওপরে?”

ঠিক তখনই শিষ্য দুটি তাকে দেখতে পেল। দেখামাত্র ওদের চোখ

অন্যরকম হয়ে গেল। একজন তক্ষুনি গুরুদেবকে চাপা গলায় কিছু বলল। অর্জুন লক্ষ করল, ওদের মুখে পরিবর্তন এলেও গুরুদেবের কিছুই হল না। তিনি তেমনি প্রসন্ন মুখে চোখ বন্ধ করে হাসতে লাগলেন। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে অর্জুন কুপেতে চলে এল। লোক দুটোর মুখের চেহারা পাণ্টে গেল। কেন? ওরাও কি এই ট্রেনে গুরুদেবের সঙ্গে কালকায় যাচ্ছে? গেলে নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলবে কেন? সে জিনিসপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চণ্ডীগড়ের কথা ভাবতেই ভীষণ নাড়া খেল। নিজেকে ভীষণ নির্বোধ মনে হচ্ছিল তার। জলপাইগুড়ি থেকে বেরুবার সময় বুড়িদির ঠিকানাটাই নিয়ে আসা হয়নি। কত নম্বর সেক্টর যেন? কেমন ভজকট সব নম্বর! এই সময় কানে এল বিটুসাহেবের গলা, “ঠিক আছে!”

॥ পাঁচ ॥

অমলদা এলেন ট্রেন ছাড়বার দু’মিনিট আগে। বিটুসাহেবকে কুপেতে পাঠিয়ে দিয়ে অর্জুন তখনও কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। শিষ্যদুটিকে দেখা যাচ্ছে না আর। যাত্রীদের ব্যস্ততা হাঁকাহাঁকি বেড়ে গেছে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যাওয়ায় অর্জুনের অস্বস্তি বাড়ছিল। অমলদা যদি না এসে পৌঁছান! সে দেখল প্রচুর মানুষ তাদের প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছে। ওর খুব মন খারাপ লাগছিল। বুড়িদির ঠিকানা না জানা থাকায় চণ্ডীগড়ে গিয়েও ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না। চণ্ডীগড় যখন একটা রাজধানী, তখন নিশ্চয়ই ঠিকানা না জানা থাকলে কাউকে খুঁজে বের করা যাবে না।

অবিরত যাত্রীরা কামরায় ঢুকছিল বলে অর্জুনের সরে সরে দাঁড়াতে হচ্ছিল। অমলদা এসে বললেন, “হাওড়ার ব্রিজে কোনও গাড়ি চলছে না, এত জ্যাম।”

অর্জুনের মনে হল এটা একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা, কিন্তু সে কিছু বলল না। অর্জুনের দু-বার্থের কুপে। তার দরজায় অমলদা দাঁড়ালে বিটুসাহেব চৈতন্যে উঠলেন, “এই যে এসে গেছেন? ভারী চিন্তা হচ্ছিল। কলকাতায় পা দেবার পর আপনার পান্ডাই পাচ্ছি না। বসুন বসুন।” হাত বাড়িয়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

অমলদা আয়েস করে বসতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। অর্জুন কুপেতে ঢুকে একপাশে চুপচাপ দাঁড়াল। এবং তখনই তার চোখে পড়ল, অমলদার কাঁধে একটা বেশ ভারী ঝোলা ব্যাগ। সেটাকে সন্তর্পণে আসনের ওপর নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, “তারপর অর্জুনবাবু, আমরা তা হলে পশ্চিমবাংলা ছাড়ছি। ওং, আজ সারাদিন খুব খাটুনি গেল।”

অর্জুন ঠোট কামড়াল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি জানতেন আমরা টিকিট পাব না?”

“অনুমান করেছিলাম। এই ট্রেনটায় খুব ভিড় হয়। আমার ওই পরিচিত বন্ধুকে ফোন করে এই তিনটি টিকিটের জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। গিয়ে দেখলাম তোমরা তখনও আছ।” তারপর ঈষৎ থেমে বললেন, “সব ব্যাপারে রহস্য খুঁজতে যাও কেন?”

অর্জুন কোনও উত্তর দিল না। সে রহস্য খুঁজছে না। শুধু অমলদা তার সঙ্গে কেন খোলামেলা হতে চাইছেন না, সেইটেই অনুযোগ। বিটুসাহেব বললেন, “ঠিক আছে। এখন একটু সময় পাওয়া গেল। সীতার ব্যাপারটা নিয়ে কী চিন্তা করলেন?”

“সীতা?” অমলদা খানিকটা অবাক হয়ে তাকালেন।

“ওঃ গড! সীতা, মানে ইউ. এন. রায়ের মেয়ে। যার জন্য আমরা যাচ্ছি।”

“ও হো! ওকে নিয়ে কিছু চিন্তা করার দরকার আছে কি? টেলিগ্রামের খবর থেকে চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমার টিকিটটা দিন।”

বিটুসাহেব তড়িঘড়ি তিনটে টিকিট বের করে একটিকে বেছে নিয়ে অমলদার হাতে দিতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, “বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কাল সকালে দেখা হবে।”

বিটুসাহেব তড়িঘড়ি বললেন, “চললেন? এত তাড়াতাড়ি! রাত্রের খাওয়া দাওয়া...”

“সেরে এসেছি।” চলন্ত গাড়িতে ব্যালেন্স রেখে স্যুটকেসটা নিয়ে অমলদা করিডরে বেরিয়ে গেলেন। কুপের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্জুন দেখল, ঠিক পরের কুপেটায় অমলদা ঢুকে গেলেন। এবং তারপরই নজরে পড়ল আসনের ওপর ঝোলাটা পড়ে আছে।

বিটুসাহেব বললেন, “তোমার দাদার কী ব্যাপার বলো তো?”

“কেন?”

“এবার যেন বড্ড ছাড়-ছাড় ভাব।”

“গভীর টাইপের লোক তো।” অর্জুন যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইল। তারপর কুপের দরজাটা বন্ধ করে আসনে বসে বলল, “এই ট্রেনে একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছে। ওই যে যাকে আপনি খুব নমস্কার করলেন তখন।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ,” বিটুসাহেব উজ্জ্বল হলেন, “উনি কি এই কম্পার্টমেন্টে আছেন?”

“বোধহয়। লোকটাকে আপনার ভাল লেগেছে?”

“ও ইয়েস। আসলে জানো, আমার সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর কোনওকালেই টান ছিল না। কালিস্পংগে আমি যে-জীবন যাপন করতাম সেখানে এইসব মানুষের সঙ্গে মিট করার কোনও সুযোগ ছিল না। কিন্তু ওই লোকটার হাসিতে একটা সাবলাইম ব্যাপার আছে। শিশুর মতো সরল। ঠিক আছে?”

“সাবলাইম” শব্দটার অর্থ অর্জুন বুঝতে পারল না। শব্দটা দু’বার উচ্চারণ

করে মনে রেখে দিল সে। পরে ডিক্শনারিতে দেখে নিতে হবে। বলল,
“সত্যিকারের সন্ন্যাসীরা ব্ল্যাকে টিকিট কাটে না।”

সঙ্গে-সঙ্গে বিষ্ণুসাহেব একটা আঙুল গালে রাখলেন, “সেটা একটা পয়েন্ট।”

“তা ছাড়া ওঁর শিষ্যরা সুবিধেজনক নয়। আমার দিকে খুব খারাপ চোখে তাকাচ্ছিল। কোনও ভাল সাধু খারাপ শিষ্য নিয়ে ঘোরে না।”

“লোকটা কোথায় যাচ্ছ বলল?”

“কালকায়।”

“কালকা? চণ্ডীগড়ের পরের স্টেশন। ওখান থেকেই সবাই সিমলে যায়।
ট্রেনেও যাওয়া যায়, আবার বাসও আছে। কালিম্পাংয়ে বাস করি বলে ভেবো
না আমি ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিটা ভাল জানি না। ঠিক আছে?”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। বিষ্ণুসাহেবের সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে
বেশিক্ষণ আলোচনা করা শক্ত। ব্যাপারটা অমলদাকে বলবে নাকি? ওই শিষ্য
দুটোকে দেখা অবধি তার কেমন খটকা লেগেছে। ঠিক এইসময় বন্ধ দরজায়
আওয়াজ হল। ট্রেনটা এখন ঝড়ের শব্দ তুলে ছুটে চলেছে।

অর্জুন চট করে উঠে দরজা খুলতেই দেখল খাবারের অর্ডার নিতে আসা
রেলের লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে নোটবই এবং পেনসিল। মিনিট তিনেক
নানান জেরা চালিয়ে বিষ্ণুসাহেব চিকেন আর রুটির ছকুম দিলেন দুজনের
জন্যে। অর্জুন দরজা বন্ধ করে দিলে বললেন, “ডাক্তার আমাকে মাছ-মাংস
একদম নিষেধ করেছিল একসময়। শুধু চিকেন, যত পারো চিকেন খাও। ঠিক
আছে?”

তাই যদি হয় তাহলে খামোখা লোকটার সঙ্গে অত কথা বলার কী দরকার
ছিল? প্রশ্নটা করতে গিয়ে করল না অর্জুন। বিষ্ণুসাহেবকে প্রশ্ন করে কোনও
লাভ নেই। এখনই চিকেনের সঙ্গে মাটনের প্রভেদ নিয়ে নানান তত্ত্বমূলক
আলোচনা শুনতে হবে।

পোশাক পাল্টাবার জন্যে বিষ্ণুসাহেব টয়লেটে গেলে অর্জুন সিগারেট
ধরাল। সিগারেটে তার মোটেই নেশা নেই। উনিশ-কুড়ি বছরে কে আর বেশি
সিগারেট খায়? কিন্তু সেবার কালিম্পাংয়ে যাওয়ার পর থেকে দিনে দু’তিনটে
খেয়ে ফেলে। অমলদা কিংবা বিষ্ণুসাহেবের সামনে সিগারেট খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে
না। অর্জুন জোরে-জোরে কয়েকটা টান দিয়ে জানলা তুলে প্রায় অর্ধেক
সিগারেট বাইরে ফেলে দিল। তারপর অমলদার ফেলে যাওয়া ঝোলাটা
খুলল। একটা ছোট্ট কিন্তু ভারী টেপ রেকর্ডার ছাড়া ঝোলায় অন্য কিছু নেই।
এই যন্ত্রটি অমলদা জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ে আসেননি। অর্জুন দেখল ভেতরে
একটা ক্যাসেট রয়েছে। ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছিল না। হঠাৎ অমলদা
এটিকে সঙ্গে নিলেন কেন? আজ কলকাতায় ঘোরাঘুরির নিশ্চয়ই এটাই
কারণ। অর্জুন টেপরেকর্ডারটাকে দেওয়া টেবিলের ওপর রাখা মাত্র বিষ্ণুসাহেব

ফিরে এলেন। পোশাক পান্টানো হয়েছে। অঙ্গে নৈশবস্ত্র, কাঁধে ছাড়া স্যুট আর হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট, মুখে হাসি, “এটা কী বলো তো?”

অর্জুন না বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল।

“হুঁ। বিনিপয়সায় পাওয়া গেল। নো দক্ষিণা! ঠিক আছে? কিন্তু এটাকে কোথায় রাখি?”

প্যাকেটটা নিয়ে হঠাৎ গভীর হয়ে ইতিউতি তাকাতে লাগলেন তিনি।

“কী আছে ওতে?”

“প্রসাদ।”

“প্রসাদ?” অর্জুন হাঁ হয়ে গেল, “ট্রেনের কামরায় আপনাকে প্রসাদ দিল কে?”

“সন্মাসী। যে-সে জায়গায় রাখতে পারি না, প্রসাদ বলে কথা।”

“সন্মাসী আপনাকে প্রসাদ দিল?” অর্জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

“হ্যাঁ। আমি টয়লেট থেকে বেরুচ্ছি আর উনি ঢুকছেন। মুখোমুখি দেখা। কী সুন্দর ধূপের গন্ধ শরীরে। মিষ্টি হেসে কাঁধের ঝোলা থেকে এই প্যাকেটটা বের করে আমায় দিলেন। সন্দেহ আছে, খুলে দেখেছি। খাবে নাকি?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “ওটা আপনিও খাবেন না। উনি কী ভাষায় কথা বললেন?”

“কথা? না না, নো টক। সম্ভবত মৌনীর না কী বলে যেন তা-ই?”

“আপনার দেখছি সাধুদের ওপর ভক্তি বেড়ে গেল।”

“মোটেই না। ঠিক আছে? গায়ে পড়ে কেউ সন্দেহ দিলে খাব না কেন? কালিম্পংয়ে এই জিনিসটা মোটেই ভাল পাওয়া যায় না। কিন্তু তুনি নিষেধ করছ কেন?”

“ওই গায়ে পড়ে দেওয়া বলেই। এত লোক থাকতে আপনাকেই বা দিতে যাবে কেন? তা ছাড়া কেউ কি ঝোলা কাঁধে টয়লেটে যায়?”

বিটুসাহেব মাথা নাড়লেন, “ঠিক আছে। থাক।” ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বিটুসাহেব বললেন, “তোমরা গোয়েন্দারা বড্ড সন্দেহবাগীশ।”

“গোয়েন্দা বলবেন না, আমরা সত্যসন্ধানী।”

প্রসাদের প্যাকেটের দিকে একটু কাতর চাহনি দিয়ে বিটুসাহেব আরাম করে আসনে বসে টেপেরেকর্ডারটাকে দেখতে পেলেন, “আরে, এটি কোথেকে এল?”

“অমলদার ঝোলায় ছিল।”

“ব্যাটারি, ক্যাসেট, এসব ওর ভেতরে আছে?”

“মনে হচ্ছে।”

“ঠিক আছে, শোনা যাক, কী বলো?”

অর্জুনেরও ইচ্ছে করছিল ক্যাসেটটা শুনতে। দিল্লি-কালকা মেল এখন

ঝড়ের বেগে ছুটছে। যদিও ঠাণ্ডা বাতাসের ঢোকান কোনও পথ নেই, তবু একটা কনকনানি পায়ে জমছে। এইসময় রেকর্ডারটা চালিয়ে চাদরের তলায় পা ঢেকে বসতে বেস আরামই লাগবে। ‘অর্জুন স্টার্ট বোতামটায় চাপ দিতেই খুব মৃদু একটা শব্দ বাজল। টুং টাং। তারপর এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার শব্দ হল, টুং টাং। দ্বিতীয়বার সামান্য জোরে। অর্জুন ফিরে এসে আসনে বসে উৎসুক চোখে তাকাল যন্ত্রটির দিকে। তখনই আচমকা কালকা মেলের চাকার শব্দকে ছাপিয়ে একটা আর্তনাদ এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, বিষ্টুসাহেব চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। আর্তনাদটা চড়ায় উঠে অদ্ভুত সুরেলা হয়ে গিয়ে সামান্য খেলা করে আচমকা থেমে গেল। এবং আবার চাকার শব্দটা ছাড়া কোনও আওয়াজই নেই। বিষ্টুসাহেব ফিসফিসিয়ে বললেন, “এ কী হচ্ছে? কোন দেশের মিউজিক? পিলে চমকে দিচ্ছে।”

ঠিক তখনই একগাদা যন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠল। কিন্তু কোনওটাই কারও সঙ্গে তাল বা হন্দ মিলিয়ে বাজছে না। যেন দশটা বুনো মোষকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যে যার খুশিমতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এই সুরের সমষ্টির আওয়াজ এত তীব্র যে কালকা মেলের চাকা হার মেনে গেল। এই পাগলামি চলল কয়েক সেকেন্ড, তার পরেই একটি মেয়েলি গলা ভেসে এল। সুর আছে কি নেই, ঠাণ্ডা করার আগেই একটা বেসুরো হাসির দমক ছিটকে আসছে ওই গলা থেকে। বিষ্টুসাহেব চমকে উঠে মুখে হাত দিলেন। তাঁর চোখ গোল হয়ে উঠল। “শুনছ, মেয়েটা কী বলছে? ডেঞ্জারাস!”

সব কথা ঠিক ঠাণ্ডা করতে পারছিল না অর্জুন। উচ্চারণ বড্ড জড়ানো। কিন্তু একটু একটু করে সে কথাগুলো ধরতে পারল, “মেকি কথা শুনতে মোটেই চাই না। যেমন, কেমন আছ? যেন আমি খারাপ থাকলে উনি ভাল করে দেবেন। ন্যাকামি দেখলে পিঙ্কি জ্বলে যায়। আমি চেষ্টা করে বলতে চাই, কেউ ভাল নেই!” শেষ কথাগুলো বলার সময় আবার আর্ত চিৎকার। চিৎকারের শেষ-উঁচুতে যে সুরের খেলা, তা শুনলে বোঝা যায়, সঙ্গীতে গায়িকার দখল আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই সেটা ভেঙে চুরমার করে বেসুরোতে শেষ করা হল। আর তারপরেই নানারকম শব্দ এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল যে, সেটাকে সুর বলা অসম্ভব।

অর্জুন বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকাল। এখন তিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে বসে আছেন। অর্জুন উঠে রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিতেই তিনি প্রসন্ন মুখে বললেন, “সুন্দর। ঠিক আছে!”

“কোনটা সুন্দর?”

“ওই যে, ন্যাকামি দেখলে পিঙ্কি জ্বলে যায়, এই কথাটা। খাঁটি কথা। কিন্তু এ কী ভাষা? এ-ভাষায় গান গাওয়া হয়? কালিম্পিংয়ে থেকে এসবের কোনও খবর আমি পেতাম না। ভাই অর্জুন, নিজেকে ভীষণ ব্যাকডেটেড মনে

হচ্ছে।”

হঠাৎ অর্জুনের চোখের সামনে অমলদার কাছ থেকে নিয়ে পড়া পাক্স নামক বইটার মলাট ভেসে উঠল। কী মারাত্মক দৃষ্টি ছিল মেয়েটার। যেন পৃথিবীর সব কিছুকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। রায়সাহেবের মেয়ে সীতাকে প্রথম যখন সে কালিম্পিংয়ে দেখেছিল, তখন ওই ছবির চেহারার সঙ্গে তেমন মিল খুঁজে না পেলেও শেষদিন তো অবিকল এক রকম দেখিয়েছিল। পাক্সরা আলাদা থাকতে চায়। আমেরিকায় বিভিন্ন ফুটপাথে তারা নিজেদের আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায়। পুরনো সংস্কার বা সংস্কৃতিকে তারা তোয়াক্কা করে না। এই গান সেই পাক্সদের নয় তো? অর্জুন মাথা নাড়ল, অবশ্যই। নাহলে অমলদা সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে এই ক্যাসেট নিয়ে ফিরবেন কেন? তা হলে কলকাতায় পাক্সদের ক্যাসেট এসে গিয়েছে? অর্জুন এবার বুঝতে পারল, তাদের শুনতে দেবার জন্যেই অমলদা এই বোলাটা এখানে ফেলে গিয়েছেন।

অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, “রায়সাহেব যখন মেয়েকে নিয়ে চণ্ডীগড়ে চলে গেলেন, তখন আপনি মেয়েটিকে দেখেছিলেন?”

“হ্যাঁ। আমি তো ওদের সি-অফ করেছিলাম।”

“কেমন বিহেভ করেছিল মেয়েটি?”

“খুব ভাল, খুব শান্ত। তোমাদের সেই কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পর মেয়েটি একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছিল। সাহেবটাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ক’দিন অবশ্য খুব পাগলামি করেছিল, কিন্তু তারপর বেশ চুপচাপ হয়ে যায়। পাক্সদের মতো বিকট পোশাক পরত না, চুলও রঙ করত না। চুপচাপ লনে বসে থাকত। শেষদিকে আমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে?”

“কথা বলত আপনার সঙ্গে?”

“হ্যাঁ। আমাকে ইন্ডিয়ান গান শোনাতে বলল।”

“আপনি গান গাইতেন?” অবাক হয়ে তাকাল অর্জুন।

এই মুহূর্তে খুব লাজুক দেখাল বিষ্টুসাহেবকে, “ছেলেবেলায় শিখেছিলাম কিছু কিছু। তাই মনে করে-করে। সবই দেশাত্মবোধক গান আর কি।”

“এমন কী পরিস্থিতি হল যাতে রায়সাহেব বাধ্য হলেন কালিম্পিং ছাড়তে?”

বিষ্টুসাহেব অর্জুনের প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়লেন, “কী জানি! সম্ভবত মানুষটা ভয় পাচ্ছিলেন। পাহাড়ি জায়গায় নিরাপত্তা বজায় রাখা শক্ত। তা ছাড়া ওঁরা ছিলেন সানফ্রানসিস্কোতে। সেখানে গরমকালে প্রচুর গরম পড়ে। মিসেস রায় কালিম্পিংকে ঠিক নিতে পারছিলেন না। ঠিক আছে?”

“মিসেস রায় কবে এসেছিলেন?”

“এই তো, ওদের চণ্ডীগড়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে। যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে রায়সাহেব আমাকে জানালেন। আমার একটু অভিমান হয়েছিল তখন। গিয়ে অবধি তেমন যোগাযোগ ছিল না। আর তারপর এই টেলিগ্রাম।”

রাত্রে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে বিষ্টুসাহেব শুয়ে পড়লেন অর্জুনের ঘুম আসছিল না। ওর কেবলই সাধুর মুখ মনে পড়ছিল। অমলদাকে সচেতন করা দরকার। সাধুটা কী উদ্দেশ্যে প্রসাদ পাঠাল? সে বাস্ক থেকে নেমে দরজাটা ভেজিয়ে করিডরে দাঁড়াল। বেশ জোরে ছুটছে গাড়ি। ব্যালেন্স রেখে হেঁটে সে পরের কিউবিকলের দরজায় টোকা দিল। তারপর চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

অর্জুন ডাকল, ‘অমলদা!’

বড় আলোটা নেভানো। নীল আলোয় দেখা যাচ্ছে যাত্রীরা ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে আবার ফিরে এল নিজেদের কুপেতে। তারপর নিজের বাস্কে শুতে গিয়ে টেপারেকডারটাকে দেখতে পেল। গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছে। চট করে সেটাকে তুলতেই দেখতে পেল ক্যাসেটা নেই।

হতবাক অর্জুন তাকাল বিষ্টুসাহেবের দিকে। মাথা মুড়ে তিনি ঘুমোচ্ছেন, আর তাঁর নাক থেকে বিকট শব্দ বের হচ্ছে।

॥ ছয় ॥

সমস্ত শরীরে তীব্র কনকনানি, যেন হাড়ের গায়ে কেউ টোকা মারছে, অর্জুন লাফিয়ে উঠে বসল। দিল্লি ছাড়ার পর যে ঘুমটা এসেছিল, তা এখন উধাও। কামরার মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা জমাট হয়ে রয়েছে। এত শীতে কেউ ঘুমোতে পারে না। কন্সলটাকে এখন ভীষণ পাতলা বলে মনে হচ্ছে। নীল আলোয় অর্জুন দেখল বিষ্টুসাহেব শরীরটাকে ছোট্ট করে শুয়ে আছেন। আর তখনই খেয়াল হল, ট্রেনটা চলছে না। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

একটু হাঁটাচলা করলে আরাম হতে পারে। অর্জুন বার্থ থেকে নামতেই বিষ্টুসাহেবের গলা পেল। কন্সলের তলায় মুখ রেখে কথা বললেন, কিন্তু দাঁতে দাঁত ঠুকে যাওয়ার শব্দ হল, “এমন শীত কালিম্পংয়েও পড়ে না। অতি অভদ্র। উঃ। চললে কোথায়?”

“হাঁটব।” কথাটা বলে অর্জুন দরজা খুলে করিডরে এল। জোরে হাঁটলে শীত কমতে বাধ্য। গত সন্ধ্যায় দিল্লিতে ঠাণ্ডাটা এমন ছিল না। প্লাটফর্মে পা দেওয়া মাত্র সমস্ত ইতিহাস বইটা চোখের সামনে চলে এসেছিল। কিন্তু অত অল্প সময়ে প্লাটফর্মের বাইরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া সেই ক্যাসেট হারানো নিয়ে মনটা খারাপ হয়ে ছিল। কেউ যে ওটাকে রেকডার থেকে বের করে নিয়ে যাবে, ভারতেই পারেনি সে। খবরটা শুনে অমলদা হেসেছিলেন। তারপর বিষ্টুসাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “গান কেমন লাগল?”

“গান?”

১৬৯

“ক্যাসেটে যে গানটা ছিল শোনেমনি ?”

“হ্যাঁ। আমার এক বাউণ্ডলে বন্ধু আছেন কলকাতায়। ওঁর কাছে পৃথিবীর প্রায় সবরকম গানের কালেকশন আছে। মজার ব্যাপার, ওর বাড়িতেও গত পরশু চোর এসেছিল। পাঙ্কদের গানের ক্যাসেটটা তেমন শ্রাব্য নয় বলে র্যাকে রেখে দিয়েছিল। শ্রীমান তস্কর ক্যাসেট-অ্যালবাম হাতড়ে কিছু না পেয়ে ওগুলোকে মেঝেতে ছড়িয়ে কেটে পড়েছিলেন। বন্ধুটি অবাক, তার বাড়িতে ওই প্রথম চোর ঢুকল।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওঁর কাছে যে পাঙ্কদের গানের ক্যাসেট আছে তা চোর জানল কী করে? মানে কলকাতা শহরে এত মানুষ...”

“কলকাতায় কিছু মানুষ আছেন যাঁরা উদ্ভট নেশার জন্যে বিখ্যাত। কয়েক কালেক্টার হিসেবে যাঁদের নাম প্রথমে আসবে, তাঁদের মধ্যে একজন বিখ্যাত অভিনেতা আছেন। কিউরিও ভ্যালু আছে, এমন জিনিস জমান ঠাকুর পরিবারের একজন। তেমনি যে-কোনও সঙ্গীতপ্রেমিক জানেন আমার বন্ধুটির খেয়ালের কথা। যারা খুঁজতে চায়, তাদের খোঁজ পেতে কোনও অসুবিধে হয় না।” অমলদা হাসলেন, “আমি নতুন দুটো ক্যাসেটে গানগুলো রি-রেকর্ড করি। একটা কাল হারিয়েছ, অন্যটা আমার পকেটে আছে। আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটা সত্যি হল।”

অর্জুন হতাশ গলায় বলেছিল, “আমরা বন্ধ কুপেতে বসে গান শুনছিলাম, ভেবে পাচ্ছি না ওরা টের পেল কী করে?”

অমলদা সরল গলায় বললেন, “নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল। তবে এটা খুবই আনন্দের কথা ওঁদের কেউ-কেউ এই ট্রেনে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।”

কথাটা মনে পড়তেই করিডরে দাঁড়িয়ে গেল অর্জুন। শুধু এই ট্রেন নয়, এই কামরায় চোর থাকবেই। কারণ রানিং ট্রেনে অন্য কামরা থেকে এসে চুরি করা সম্ভব নয়। সে কুপেগুলোর দিকে তাকাল। এর কোনটায় তিনি আছেন কে জানে! এমন ঠাণ্ডায় লোকটি কি ঘুমুচ্ছে? নাকি সেই সন্ন্যাসী আর তার শিষ্যরা? এমন সময় ঠুক করে একটা আওয়াজ হতেই অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল। ওপাশের একটা কুপের দরজা খুলে যাচ্ছে। সে এখন করিডরের মাঝখানে, লুকোবার কোনও জায়গা নেই।

ডান হাতে সুটকেস, শরীরে হাটু-ঢাকা উচু কলারের মোটা কোট, মাথায় বারান্দা-টুপি পরে যে-লোকটা বের হল, তাকে চিনতে পারা শিবের অসাধ্য। লোকটা অর্জুনকে ভূক্ষেপই করল না। সোজা দরজার দিকে চলে গেল। এবং দক্ষ হাতে দরজা খুলে বাইরে পা বাড়াল।

অর্জুন দ্রুত দরজার কাছে যেতে ঠাণ্ডাটা তিনগুণ বেড়ে গেল যেন। কুয়াশা ঢাকা একটা প্লাটফর্ম নজরে এল। কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই। শুধু ইলেকট্রিক বাল্বগুলো ভূতের চোখের মত জ্বলছে। কুয়াশা তাদের আরও রহস্যময় করে

তুলেছে। অর্জুন মাথা বাড়িয়ে সেই লোকটাকে দেখতে পেল না। বস্তুত প্লাটফর্মের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে না। এটা কোন্ স্টেশন?

দরজাটা বন্ধ করে নিজেদের কুপের সামনে ফিরে আসতেই বিষ্টুসাহেবের গলা পেল সে, “এখানে তো আমাদের নামার কথা নয়। ঠিক আছে?”

অমলদা বললেন, “না, ঠিক নেই। মিছিমিছি এই ঠাণ্ডায় বসে থাকার কোনও মানে হয় না। এই কুয়াশায় ট্রেন ছাড়তে হয়তো বেলাও হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চণ্ডীগড়ে পৌঁছতে নটা-দশটা বেজে যাবে। বুদ্ধিমান যাত্রীরা এখানে নেমে বাসে ওঠেন।”

“কিন্তু এ কী ঠাণ্ডা, বাপ! রে বাপ! এর মধ্যে যদি নামতে হয় নির্যাত মারা যাব আমি। উঃ।” বিষ্টুসাহেবের গলার স্বরে কাঁপুনি এসেছে।

অমলদা হাসলেন, “আপনি তো ঠাণ্ডার পরোয়া করেন না।”

এইসময় অর্জুনকে দেখতে পেলেন অমলদা, “চটপট তৈরি হয়ে নাও, আমরা এখানে নামব ভোর হয়ে এল।”

“বাইরে খুব ঠাণ্ডা। তাছাড়া...”

“তাছাড়া কী?”

“ক্যাসেট যে চুরি করেছে, সে এই ট্রেনে যাচ্ছে।”

“একটা ক্যাসেটের জন্যে এত কষ্ট সহ্য করার কোনও মানে হয় না।”

ইংরেজি ভৌতিক ছবির এক-একটা দৃশ্য ঠিক এইরকম হয়। নীলচে কুয়াশা পাক খাচ্ছে সর্বত্র। প্লাটফর্মে পা দেওয়ামাত্র মনে হল শরীরে রক্ত নেই। বিষ্টু সাহেবকে এই পোশাকে অন্য সময় দেখলে হাসি পেত। ভদ্রলোকের চোখ দুটি ছাড়া কিছুই অঢাকা নেই। সঙ্গে যা ছিল, সবই চাপিয়েছেন, এমন কী কম্বলও। অমলদা ওভার কোটের তলায় কী পরেছেন টের পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু মাথায় ম্যাক্সিক্যাপ চড়িয়েছেন। অর্জুন দুটো সোয়েটার পরেছিল, তার ওপরে একটা শাল। তাইতেই মাথা ঢেকে নিয়েছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা আসছে প্যান্টের নীচে। হাঁটু দুটো কনকন করছে।

স্টেশনটার নাম আস্থলা। এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় জংশন। অথচ এখন একটা হকার পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বিষ্টুসাহেব কিছু কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। শুধু দাঁতের বাজনা শোনা গেল। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল, দিল্লি-কালকা মেল একটা মৃত অজগরের মতো প্লাটফর্মের ধারে পড়ে আছে। তার প্রায় প্রতিটি দরজা জানলা বন্ধ। মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না।

গেটে হাত বাড়িয়ে টিকিট নেওয়ার মতো কেউ নেই। বিষ্টুসাহেবের গলায় আক্ষেপ শোনা গেল, “এঃ!”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী হল?”

“টিকিট ফেরত না দিতে পারলে খুব খারাপ লাগে। তোমার দাদার মতলবটা কী বলো তো? মেরে ফেলবে নাকি?”

হাঁটতে শুরু করার পর থেকেই অর্জুনের ঠাণ্ডা সামান্য কমেছিল। অমলদাকে দেখে কী হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। বেশিক্ষণ ব্যাগ ডান হাতে রাখায় ওটা যখন অসাড় হচ্ছে, তখন অমলদার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ নেই। স্টেশনের বাইরে খোলা আকাশের নীচে আসতেই ধোঁয়াটে আকাশ দেখা গেল। টুপটাপ শিশির বরছে। আস্থালী পাঞ্জাবে। অর্জুনের মনে বেশ আনন্দ হল। ছেলেবেলা থেকে এই পাঁচ নদীর দেশের কত গল্প শুনেছে, পাঞ্জাবের কত বীর, কত আত্মত্যাগ ইতিহাসের কথায় পড়েছে সে। আর আজ সেই পাঞ্জাবের মাটিতে পা দিয়েছে ভোর রাত্রে। কিন্তু ঘন কুয়াশায় বেশি দূর দৃষ্টি যায় না, তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট যে, কলকাতা জলপাইগুড়ি আর আস্থালার মাটি এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। মনে হচ্ছে না অচেনা একটা দেশে এলাম।

এবার কিছু আলো দেখা গেল। এবং অনেকগুলো জানলাবন্ধ বাস। ওই ঠাণ্ডায় কয়েকটা গলা যেন ওদের দেখেই চিৎকার করে উঠল বিভিন্ন জায়গার নাম ধরে। জলপাইগুড়ির বাস টার্মিনাসে ঠিক এমনটা হয়। তবে এখানকার নামগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। লুধিয়ানা, জলন্ধর, চণ্ডীগড়, অমৃতসর।

চণ্ডীগড়ের বাসে তিনটে জায়গা নেওয়ার পর দেখা গেল যাত্রী আছে জনা-দশেক। গাড়ি ছাড়বে মিনিট কুড়ি বাদে। যাত্রীরা সবাই এমন ঢেকেঢুকে বসে আছে যে, কারও চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ির ভেতরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। প্রথম কথা বললেন বিষ্ণুসাহেব “যন্ত অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড!”

“অদ্ভুতুড়ে!”

“নয়? বেশ ট্রেনে শুয়ে চলে যেতাম। তা না, এই বরফের মধ্যে টেনে-হিঁচড়ে নামানো হল। তিন ঘণ্টা আগে গিয়ে কি রাজ্যলাভ হবে? ঠিক আছে?” বাসের সিটে গুটিয়ে বসে একটু উত্তাপ সন্ধান করছিলেন বিষ্ণুসাহেব।”

অমলদা দাঁড়িয়ে ছিলেন। “ট্রেনে তো শুয়ে থাকতেন। নতুন জায়গায় এসেছেন বাসের জানলা খুলে প্রকৃতি না-দেখলে চলে? চা খাবেন?”

“নো।”

“অর্জুন?”

মাথা নেড়ে অর্জুন অমলদার অনুগামী হল। চায়ের দোকান এই রকম বাস স্ট্যান্ডে যেমন হয়। অর্জুন ভেবেছিল পাঞ্জাব যখন, তখন মাথায় পাগড়ি বাঁধা মানুষই হবেন সব। কিন্তু চায়ের দোকানে শুধু একজন বৃদ্ধের মাথাতেই পাগড়ি। চমৎকার হিন্দিতে কথা বলছে সবাই। কিছু লোক আগুন জ্বালিয়ে কান কাপড়ে ঢেকে বসে গল্পগুজব করছে। দুটো চায়ের নির্দেশ দেওয়ামাত্র অর্জুন সতর্ক হল। সেই লোকটা। খানিক আগে একেই সে দেখেছে তাদের কামরা থেকে নেমে যেতে মুখ টুপিতে আড়াল করে। এখনও লোকটার মুখ

দেখা যাচ্ছে না। ওর হাতে চায়ের গ্লাস। স্টেশনের দিকে মুখ করে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে।

অমলদা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এপাশ-ওপাশ তাকালেন। তারপর স্থির পায়ে এগিয়ে গেলেন লোকটির দিকে। অর্জুন শুনল অমলদা বললেন, “হা-ই!”

লোকটি চট করে ফিরল। তবু ওর চিবুক এবং ঠোঁটের অংশ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, “হাই।”

“দেশলাই আছে?”

লোকটি উত্তরে কাঁধ নাচাল। যার অর্থ, না।

অমলদা উদাস গলায় বললেন, “এবার শীতটা জব্বর পড়েছে। তাই না?”

লোকটি আবার কাঁধ নাচাল। তারপর শূন্য গ্লাস দোকানের টেবিলে রেখে যখন বেরিয়ে গেল তখন দেখা গেল একটা এক টাকার নোট তার পাশে পড়ে রয়েছে।

চা এসে গিয়েছিল। অমলদা গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, “আমেরিকানরা সচরাচর মিশুকে হয়। লোকটার বোধহয় মন খুব খারাপ।”

“আমেরিকান?” গরম গ্লাসভর্তি চা হাতে নিয়ে চমকাল অর্জুন।

“বুঝতে পারোনি?”

“না।”

“পোশাকের আদল, দাঁড়বার ধরন আর চা খাওয়ার ভঙ্গিতে তো স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটা ভারতীয় নয়। আমি যখন হা-ই বললাম, টেনে টেনে, ও চটপট জবাব দিল হাই বলে। এই সম্ভাষণ মার্কিনরাই করে। ইংরেজ কিংবা অন্য জাত যারা ইংরেজি শিখেছে ইংরেজদের কাছ থেকে, তারা হ্যালো বলবে। আমেরিকানদের একটা সচেতন চেষ্টা থাকে ইংরেজদের থেকে আলাদা হবার।” চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথাগুলো বললেন অমলদা।

“লোকটা কাছে সত্যি কি দেশলাই ছিল না।”

“হতে পারে। শুনেছি আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ সিগারেট বর্জন করেছেন। হয়তো এও সেইরকম।”

“তবে এত যে মাদকদ্রব্য খায় ওরা?”

“ওরা মানে কারা? কিছু বৈয়াদপ ছেলেমেয়ে। পুরো জাতটা যদি তাই খেত, তাহলে পৃথিবীর এক নম্বর শক্তি হত না।”

“লোকটাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে অমলদা।”

“কী মনে হচ্ছে?”

“আমরা যাদের জন্যে এসেছি, ও তাদের একজন নয় তো?”

“সন্দেহ করার কী কী কারণ আছে?”

“ও আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছে। ট্রেন ছেড়ে আস্থালায় নেমেছে।

ভাল করে কথার জবাব দিচ্ছে না। তার ওপর আমেরিকান।” অর্জুন ভেবে ভেবে বলল, “হয়তো ওর ব্যাগে ক্যাসেটটা পাওয়া যেতে পারে।”

অমলদা চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বললেন, “তোমার সন্দেহভজনের লিস্টে সেই সন্ধ্যাসী এবং তার দুই শিষ্যও আছে বলে জানতাম। তাই না?”

অর্জুন অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। এই আমেরিকানটির সঙ্গে ওই সাধুটিকে জড়াবার মতো কোনও ঘটনার কথা তার জানা নেই। তা ছাড়া ওই সাধুবাবা আশ্বালায় নামেননি। হয়তো এখনও ট্রেনের কামরায় ঘুমুচ্ছেন। তা ছাড়া অমলদার তো ভুলও হতে পারে। লোকটার অস্ট্রেলিয়ান হওয়া অসম্ভব নয়। কোথায় যেন সে পড়েছিল, অস্ট্রেলিয়ানদেরও ইংল্যান্ডকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা আছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। সম্ভবত আনন্দমেলার পাতায় সে পড়েছিল, আমেরিকানরা কখনওই ইংরেজি জেড শব্দ উচ্চারণ করে না। এরা জেড লেখে, কিন্তু সেটা উচ্চারণ করে জি। লোকটা যদি আমেরিকান হয় তাহলে নিশ্চয়ই জেড বলবে না।

ড্রাইভার হর্ন পর্যন্ত দিল না। ওরা বাসে ফিরে আসামাত্র গাড়ি ছেড়ে দিল। তিনটে সিট পাশাপাশি। বিষ্টুসাহেব বাসের ভেতরে বোধহয় আরাম পেয়েছেন, কারণ তাঁর চোখ বোঁজা, মুখ সামান্য হাঁ।

অমল সোম নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “লক্ষ করেছ?”

অর্জুন চটপট চারপাশে তাকিয়ে নিল। এখন যাত্রীর সংখ্যা জনা-পনেরো। পেছন দিকটা একদম ফাঁকা। কিন্তু এবার নজরে পড়ল টুপিটা। একদম শেষ সিটে জানলার ধারে একা বসে আছে সেই লোকটা। আর আশ্চর্য ব্যাপার, এই ঠাণ্ডাতেও লোকটা জানলা খুলে রেখেছে। একটু ঝুঁকে থাকায় ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। হুহু করে হাওয়া ঢুকছে পেছনে।

অমলদা বললেন, “চণ্ডীগড়েই যাচ্ছে মনে হচ্ছে।”

অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। লোকটাকে যাচাই করার এটা সুযোগ। কিন্তু আজ অবধি কখনওই সে কোনও বিদেশির সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেনি। কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট লাগছে। তা ছাড়া জেড অক্ষরটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করাটা কী রকম বোকা-বোকা ব্যাপার।

বাইরে এবার আলো ফুটছে। বাস ছুটছে বেশ জোরে। পাঞ্জাবের পথঘাট বেশ ভাল। সূর্য নিশ্চয়ই উঠেছে, কিন্তু কুয়াশা থাকায় এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অমলদা হাত বাড়িয়ে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিতেই ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল বটে, কিন্তু চোখের আরাম হল। বিষ্টুসাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি একবার বিরক্তিতে ‘উঃ’ বলেই চোখ খুলে মাথা নাড়লেন, “বিউটিফুল, ঠিক আছে।”

পাঞ্জাবের গ্রামের মধ্যে দিয়ে বাস ছুটছে। সদ্য-ঘুমভাঙা মানুষরা একটু রোদের আশায় পথের ধারে গল্পগুজব করতে বসেছে। সাধারণ চাষি সম্প্রদায়। মাঠঘাট এখন শস্যহীন। এদের কাজকর্মে তাই সাময়িক বিরতি।

হালকা রোদ টর্চের আলোর মতো পৃথিবীতে ছড়াল। বিটুসাহেব বললেন, “চা খেয়েছেন?”

অমলদা বললেন, “হ্যাঁ।”

“আমি খেলাম না।”

“কেন?”

“চায়ের চেয়ে ঘুমটাকে বেটার বলে মনে করলাম।”

“তাহলে জিগ্গেস করছেন কেন?”

“এবার চা খেতে ইচ্ছে করছে।”

কথা বলার ভঙ্গিতে অর্জুন হেসে ফেলল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বিটুসাহেব বললেন, “ভারতবর্ষ সত্যি সুন্দর জায়গা। এখানে ক্রিমিন্যাল থাকতে পারে বলে মনে হয়? আই মিন এই পাঞ্জাবে?”

“পাঞ্জাবটা ভারতবর্ষের বাইরে নয়।”

অমলদার কথা শেষ হওয়ামাত্র পেছন থেকে চিংকার উঠল। ওরা চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই কন্ডাক্টরের ভীত মুখ দেখতে পেল। অমলদার পিছু-পিছু অর্জুন দু'পাশের আসনগুলোর মধ্যে দিয়ে কন্ডাক্টরের পাশে পৌঁছতে দৃশ্যটা দেখতে পেল। লোকটা হেলান দিয়ে রয়েছে জানলায়। তার কানের নীচ থেকে একটা রক্তের ধারা বেরিয়ে বুকোর ওপর নেমে এসেছে। চোখ বন্ধ। শরীর স্থির।

॥ সাত ॥

চণ্ডীগড়ের পুলিশ-স্টেশন থেকে যখন ওরা ছাড়া পেল তখন প্রায় এগারোটো বাজে। বাসের ড্রাইভার কোনও যাত্রীকেই নামতে দেয়নি। মৃতদেহসমেত সোজা থানায় হাজির করেছিল। অমলদা অবশ্য পরিচয়পত্র দেখিয়ে অনেক আগেই ছাড়া পেতে পারত, কিন্তু স্বেচ্ছায় সেটা করেননি। থানায় বসে বিটুসাহেব চাপা গলায় কয়েকবার অর্জুনকে শুনিয়েছেন, “আস্থালায় ট্রেন থেকে না নামলে এই ঝামেলায় জড়াতে হত না, ঠিক আছে?”

নিহত মানুষটির যে পরিচয় জানা গিয়েছে তাতে প্রমাণ হল, অমলদার ধারণা ঠিক। লোকটার নাম বিল গারটুড। বাড়ি আমেরিকার বাফেলো শহরে এবং যে খবরটা অমলদাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে তা হল : বিল একজন শৌখিন গোয়েন্দা। বিলের ডায়েরি এবং আইডি থেকে এইসব তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। ওর পাসপোর্ট ঠিকানাটাকে সমর্থন করলেও বিল কার হয়ে বা কী উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে আসছিল, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ওর ব্যাগে কিছু জামাকাপড় আর ডায়েরিটা ছাড়া ছিল একটা কোন্স্ট রিভলভার। সেটি সঙ্গে রাখার কোনও কাগজপত্র পুলিশ পায়নি। এ ছাড়া দুটো ছবি পুলিশ পেয়েছে

বিলের ডায়েরির মধ্যে । এরা কারা সেটা বোঝা যাচ্ছে না । কুড়ি-একুশ বছরের যমজ ছেলেমেয়ের ছবি, পোশাক ছাড়া সামান্য পার্থক্য নেই ।

বাসের যাত্রীদের অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনও সূত্র পুলিশ খুঁজে পেল না । কয়েকজন যাত্রী বলেছেন, বাস ছাড়বার মিনিট দুয়েক আগে বিল বাসে ওঠে । তারপর বেছে নিয়ে পেছনের আসনে জানলার পাশে গিয়ে বসে । তখন এত ঠাণ্ডা যে, যাত্রীরা অন্য কাউকে ভাল করে নজর করেনি । কিন্তু আসনে বসেই বিল জানলা খুলে দেওয়ায় ঠাণ্ডা বাড়ে, ফলে অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে বিলকে দেখেছিলেন । বিলের টুপি, পোশাক দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি । শুধু দু’-একজন যারা ওই জানলার কাছাকাছি ছিল, তারা বাসের সামনের দিকে খালি আসনে উঠে এসেছিল । কেউ কোনও গুলির শব্দ পায়নি ।

বিল গারট্রুড দিল্লিতে নেমেছে মাত্র একদিন আগে । দিল্লি থেকে চণ্ডীগড়ে পৌঁছবার নানান ধরনের দ্রুতগামী বাস থাকা সত্ত্বেও কেন সে দিল্লি-কালকা ট্রেন ধরতে গেল সেটাই রহস্য । এ ছাড়া বিল কোথায় কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেটাও বোঝা যাচ্ছে না ।

অমলদা অর্জুনদের জানিয়েছিলেন, বিল সম্পর্কে ওঁর আগ্রহ হচ্ছে । তা ছাড়া একজন শৌখিন গোয়েন্দা কার হাতে নিহত হল, সেটা জানা দরকার । অমলদা চণ্ডীগড়ের পুলিশকে বিল সম্পর্কে যতটুকু তাঁর জানা ছিল তা জানিয়েছিলেন । কিন্তু তাঁদের কী উদ্দেশ্যে চণ্ডীগড়ে আসা, সেটা ব্যক্ত করেননি । তাঁরা টুরিস্ট, চণ্ডীগড় মানালিতে বেড়াতে এসেছেন, এটাই বলা হল ।

থানা থেকে বেরিয়ে রোদ গায়ে পড়তেই বেশ আরাম লাগল অর্জুনের । কিন্তু সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি । মুখে জল না দেওয়ায় বিস্ত্রী লাগছে । তাই ছিমছাম সুন্দর এই শহরটাকে উপভোগ করার মতো মন ছিল না । বিষ্টুসাহেব বললেন, “আর দেরি নয়, রায়সাহেবের ওখানে যাওয়া যাক ।”

অমলদা মাথা নাড়লেন । “তিনজন সরাসরি ওঁর কাছে না উঠে আপনি বরং একাই যান । আমরা এদিকে কোনও হোটেল খুঁজে নিচ্ছি !”

“আমি একা যাব কেন ?” চোখ বড়-বড় হয়ে গেল বিষ্টুসাহেবের ।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অমলদা হেসে ফেললেন, “একা যাবেন কেন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি ।”

“খেপেছেন ? আমি সেখানে একা থাকব ? শহরে পা দিতে-না-দিতেই একটা সাহেবের লাশ পড়ে গেল, আর আমি দলছাড়া হব ! অসম্ভব ! ঠিক আছে ?” বিষ্টুসাহেব সজোরে মাথা নাড়লেন, “তার চেয়ে তিনজনেই প্রথমে ওখানে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে ।”

চণ্ডীগড় শহরটা যে কতখানি সুন্দর, তা বাসে বসে বোঝা যায়নি । তা ছাড়া

সঙ্গে একটি মৃতদেহ থাকলে সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। রাস্তায় ভিড় নেই, মানুষজন বোধহয় বাজার-এলাকা ছাড়া পথে হাঁটে না। এক-একটা রাস্তা এমন চওড়া এবং বকবক যে, জলপাইগুড়ির জন্যে কষ্ট হচ্ছিল অর্জুনের। দু'পাশের বাড়িগুলির গড়ন খুবই আধুনিক। এবং এইসব বাড়ি বেশ কিছুটা জমি নিয়ে, ছাড়া-ছাড়া। পথে আধুনিক গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটছে অজস্র সাইকেল। এবং সাইকেলের আরোহীদের অধিকাংশই রংবেরঙের পোশাক পরা সুন্দরী মেয়ে।

ঠাণ্ডাটা এখন সয়ে গেলেও স্কুটারে বেশ হাওয়া লাগছে। একটা স্কুটার-ট্যাক্সিতে তিনজন বেশ ঠাসাঠাসি বসেছে। শীতকাল বলেই এটা সম্ভব হল। চণ্ডীগড়ের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল, এ ভারতবর্ষ নয়। ভারতবর্ষের যে-কোনও শহরের যে ছবি সে দেখেছে, তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। অমলদাকে কথাটা বলতেই তিনি সমর্থনে মাথা নাড়লেন, মুখে কিছুই বললেন না। থানা থেকে বের হবার পর থেকেই অমলদাকে বেশ অনামনন্দ দেখাচ্ছিল। এই অবস্থাটাকে ভাল করে চেনে অর্জুন। নিশ্চয়ই বিলের ব্যাপারটা ঠাঁর মাথায় পাক খাচ্ছে। সে আর অমলদাকে বিরক্ত করল না।

স্কুটারের মাঝখানে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন বিষ্ণুসাহেব। বোধহয় ঠাণ্ডা বাতাসে কথা বলার মতো ইচ্ছেও নেই। এই বৃদ্ধ মানুষটির পক্ষে পরিশ্রম একটু বেশি হয়ে গেলেও সেটা প্রকাশ করেননি। বিলের কথা আর-একবার মনে হল অর্জুনের। কে খুন করল লোকটাকে? অর্জুন ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। বিলকে প্রথম দ্যাখে সে ট্রেনের করিডরে। কুপের দরজা খুলে প্লাটফর্মে নেমে গেল। ওর মাথার টুপি এমন কায়দায় ছিল যে, মুখ দেখা যায়নি। দ্বিতীয়বার নজরে এল চায়ের দোকানে। অমলদা কথা বলতে চাইলে বিল বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে ওটা পছন্দ করছে না। তৃতীয়বার নজরে আসে বাসে উঠে। তখন বিলের টুপি ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। তা হলে বিল খুন হল কখন? চায়ের দোকান থেকে সরাসরি নিশ্চয়ই বাসে উঠেছিল। উঠে জানলা খুলেছিল। গুলিটা এসেছিল জানলা দিয়েই। বাসের ভেতর থেকে গুলি করলে ডান দিকের কানে লাগত না। তা ছাড়া সেটা করার সময় কারও না কারও নজরে পড়ত। অতএব বাইরে থেকেই গুলি করা হয়েছে। তখন এত কুয়াশা ছিল আশালায় যে, খুনি সুবিধে পেয়েছিল। কিন্তু খুনি জানল কী করে যে, বিল বাসের পেছনে এসে বসেছে। নিশ্চয়ই সে অনুসরণ করেছিল। আর সেটা শুরু করেছিল দিল্লি থেকেই। তার মানে খুনি দিল্লি-কালকায় উঠে বিলের উপর নজর রেখেছিল। কিন্তু অর্জুনের স্পষ্ট মনে আছে বিল ছাড়া অন্য কাউকে সে কামরা থেকে নামতে দ্যাখেনি। যদিও বিল নেমে যাওয়ার খানিক বাদেই সে কুপেতে ফিরে এসেছিল। বিল মাত্র একদিন হল আমেরিকা থেকে

এ-দেশে এসেছে। খুনি তার কথা জানত। কে জানে হয়তো সে-ও বিলের পিছু পিছু এ-দেশে এসেছে। বিলকে ওরা কোনও বিশেষ কাজ করা থেকে থামিয়ে দিল। সেই কাজটা কী? অর্জুনের মনে পড়ল সেই যমজ ভাইবোনের ফোটোগ্রাফটির কথা। বিলের সঙ্গে ওই ছবিটার কী সম্পর্ক? ছবি দেখে কে ছেলে কে মেয়ে বোঝা মুশকিল! অর্জুনের খুব খারাপ লাগছিল। এই মুহুর্তে আমেরিকার বাফেলো শহরে বসে বিলের মা-বাবা কিংবা স্ত্রী জানতেও পারছেন না বিল নেই। সত্যি, গোয়েন্দাদের জীবনে বিপদের থাবা কখন পড়বে কেউ বলতে পারে না। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে নিল অর্জুন। না, গোয়েন্দা নয়, সত্যসন্ধানী। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মৃত্যু তো গৌরবের ব্যাপার। অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই।

অর্জুন তাকিয়ে দেখল ওরা শহরের প্রায় প্রান্তে চলে এসেছে।

রাস্তাঘাট একই প্ল্যানমারফিক, কিন্তু বাড়িঘর এদিকে তেমন তৈরি হয়নি। স্কুটারওয়ালা ঠিকানা মিলিয়ে যে বাড়িটার সামনে দাঁড় করাল, সেটার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিদেশি এবং আধুনিক কায়দায় বাড়িটা করা। শুধু ছ'ফুট পাঁচিলের ওপর এক-মানুষ পর্যন্ত কাঁটাতারের ফেন্সিং। লোহার গেট বন্ধ। প্রায় দুর্গের মতো এই বাড়িতে অনুমতি ছাড়া ঢোকা অসম্ভব।

অমল সোম মাটিতে পা দেওয়ার পর বিষ্টুসাহেব যে ভঙ্গিতে লাফিয়ে নামলেন, তা দেখার মতো। অমলদা বললেন, “সাবধান, বুড়ো বয়সে...”।

বিষ্টুসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, “এককালে হাই জাম্প করতাম। ঠিক আছে? উঃ, কী দীর্ঘপথ জার্নি করলাম। তা গেট বন্ধ, লোকজন কোথায়? এখন একটু ফ্রেশ-ট্রেশ...”। “বিষ্টুসাহেব খানিক হেঁটে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চিংকার করলেন, “কোই হ্যায়? ইজ এনিবডি দেয়ার?”

স্কুটার চলে গেলে অমলদা বললেন, “রায়সাহেব দেখি এখানেও লোহার দুর্গ বানিয়েছিলেন। অথচ সাপের ঢোকা আটকাতে পারেননি।”

অর্জুন বলল, “সাপ?”

অমলদা হাসলেন, “চাঁদসওদাগরের গল্পটা পড়েনি? লোহার বাসর আর একটি সাপ। বিষ্টুসাহেব, দেখুন, কেউ একজন আসছে।”

একজন নয়, দুজন। গেটের দিকে যে এগিয়ে আসছিল সেই প্রৌঢ়টি এই বাড়ির ভৃত্য সম্প্রদায়ের, তা চেহারাতেই মালুম হয়, কিন্তু পেছনে লনের যে চিলতে অংশটি দেখা যাচ্ছে, সেখানে এসে দাঁড়ালেন যিনি, তাঁর পরদে সাদা প্যান্ট, ওপরে কমলারঙের পুলওভার।

ভৃত্যটি সামনে আসতে বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “রায়সাহেব হ্যায়?”

লোকটি মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

“গেট খোলো, হামলোক কলকাতাসে, নেহি, কালিম্পংসে আয়া।”

লোকটি সন্দিগ্ধ চোখে এদের দিকে যখন তাকিয়ে আছে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি

এগিয়ে এলেন। অর্জুন তাঁর বয়স আন্দাজ করতে পারল না। তবে তিনি যুবতীও নন, আবার শ্রীচাঁও বলা যায় না। হাঁটার ভঙ্গি এবং তাকানো দেখে বোঝা যায়, ইনি বেশ ব্যক্তিত্ববতী মহিলা।

“আপনারা ?”

বিটুসাহেব বললেন, “আমার নাম বিষ্ণুচরণ পত্নবিশ, কালিম্পংয়ে থাকি। এঁরা আমার বন্ধু। রায়সাহেবের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি। ঠিক আছে ?”

ভদ্রমহিলা নীরবে ঘাড় নাড়লেন। তাতেই বোঝা গেল, তিনি ব্যাপারটা জানেন। তারপর ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন গেট খুলতে।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই ভদ্রমহিলা বললেন, “আমি মিসেস রায়। আপনি অমল সোম ?”

অমলদা সুটকেস নামিয়ে রেখে নমস্কার করলেন, “কবে এলেন ?”

নমস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার সময় ভদ্রমহিলার কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল, “কয়েকমাস হয়ে গেল। আপনিই তো কালিম্পংয়ে ওঁকে সাহায্য করেছিলেন। থ্যাক্স। বাট নাউ উই আর ইন গ্রেট ট্রাবল। আপনার নাম অর্জুন ?”

অর্জুন নমস্কার করল। অতবড় একজন মহিলা তাকে আপনি বলছেন বলে বেশ গর্ব হল তার। হাত বাড়িয়ে কার্পেটের মতো লনে রাখা চেয়ারগুলো দেখিয়ে মিসেস রায় বললেন, “বসুন। আই নো যু আর টায়ার্ড।”

আরাম করে বসে বিটুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “রায়সাহেব কোথায় ?”

“আছেন,” মিসেস রায় এক হাতে নিজের চুলের প্রান্ত ঝুলেন, “কিন্তু অসুস্থ। দিন সাতেক আগে ওঁর হঠাৎ একটা মাইন্ড অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন কম্প্লিট রেস্ট নিতে। উনি আপনাদের খুব এক্সপেক্ট করছিলেন। কিন্তু আপনার ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তবে ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। ব্যায়রা...” শেষ শব্দটা যে ভৃত্যের উদ্দেশ্যে তা বোঝার আগেই লোকটি এগিয়ে এল চটপট। অর্জুন বুঝল বেয়ারাকে ‘ব্যায়রা’ বলে ডাকা হয়।

নির্দেশ নিয়ে বেয়ারা চলে গেলে মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা কিসে এলেন ? এখন কি কোনও ফ্লাইট আছে ?”

“বিটুসাহেব মাথা নাড়লেন, “ট্রেনে। ট্রেন কাম বাস।”

“আই সি !” ভদ্রমহিলার মুখ দেখে মনে হল উনি বিশ্বাস করতে পারছেন না এতদূর পথ কেউ ট্রেনে যাওয়া-আসা করতে পারে।

অমলদা চেয়ারে বসার পর থেকে মিসেস রায়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নেননি। আচমকা প্রশ্ন করলেন, “আপনারা মেয়ের নাম সীতা রাখলেন কেন ?”

কাঁধ নাচালেন মহিলা, “ওয়েল ! ইউ নো, রামায়ণ আমার খুব প্রিয়। সানফ্রানসিস্কো শহরে ওই একটাই বাংলা বই ছিল আমার কাছে। মেয়ের বাঙালি নাম রাখব আর আমেরিকানরা সেটা স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারবে, এই

সমস্যার সমাধান হল সীতা নামটাতে । নাথিং সিরিয়াস । ”

“কিন্তু এবারও তো সীতাহরণ হল । ”

মিসেস রায় গভীর হলেন, কথাটার জবাব দিলেন না । অমলদা এবার বললেন, “ঠিক আছে, আমরা এবার উঠি, বিটুসাহেব এখানে থাকলে কি আপনাদের অসুবিধে হবে ? ”

কথাটা শুনে বিটুসাহেব এমন ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন যেন বিদ্যুৎ ছুঁয়েছেন । মিসেস রায় অবাক গলায় বললেন, “তার মানে ? আপনার কি এখানে থাকছেন না ? মিস্টার রায় তো আপনাদের এখানে আসতে বলেছেন । ”

“বলেছেন । কিন্তু হোটেল থাকলে আমার কাজকর্মের সুবিধে হবে । তার আগে আমি রায়সাহেবের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই । ”

“বেশ । আপনি যা ভাল মনে করেন, করুন । অন্তত এখানে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ সেরে বিকেলে সিদ্ধান্তটা নিন । তার আগেই গুঁর সঙ্গে কথা হয়ে যাবে । ”

এইসময় বেয়ারা কাছে এসে সসব্রমে মাথা নাড়তেই মিসেস রায় উঠে দাঁড়ালেন, “আসুন । আপনাদের ঘর প্রস্তুত । ”

তিনজনে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “মিসেস রায়, আমরা কারা সেটা আমাদের মুখ থেকে শুনে বিশ্বাস করলেন কী করে ? এই দুর্গে ঢোকার জন্যে বাহানা করেও তো কেউ আসতে পারত । ”

অদ্ভুত একটি হাসি খেলে গেল মিসেস রায়ের ঠোঁটে । “সীতা চলে যাওয়ার পর আমরা যদি খোলা মাঠেও থাকতাম, তাহলেও কেউ বিরক্ত করতে আসত না । যাদের এসব করার ইন্টারেস্ট ছিল, সীতা এখানে না থাকায় তা শেষ হয়ে গিয়েছে । তা ছাড়া আপনাদের কথা এত শুনেছি যে, চিনতে অসুবিধে হয়নি । ”

গরমজল-টবে শুয়ে স্নান অর্জুনের জীবনে এই প্রথম । পৃথিবীতে এত আরাম আছে, সেটা আগে জানা ছিল না । বাথরুমটা কত রকমের কায়দায় সাজানো । আট রকমের সাবান, পাঁচ রকমের স্প্রে, ছ’ রকমের শ্যাম্পু আর নানান সাইজের এক ডজন তোয়ালে । ফিটফাট হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে খুব তাজা লাগছিল ওর । আর তখনই বুড়িদির কথা মনে পড়ল ।

বুড়িদি এই চণ্ডীগড়েই আছে । অথচ কোথায় আছে তা সে জানে না । ঠিকানাটা না নিয়ে আসার জন্যে খুব আশ্চর্য হচ্ছিল ।

দুপুরে এ-বাড়িতে ভাত হয় না । লাঞ্চ নামক পর্বটা হেভি ব্রেকফাস্ট দিয়েই সারা হয় । ডাবল ডিমের অমলেট, টোস্ট, সঙ্গে বাটার ও জ্যাম, রোস্টেড চিকেনের ওপর সপ্টেড পেঁয়াজ ছড়ানো, কর্নফ্লেক্স এবং এক গ্লাস দুধ অথবা কফি । খাওয়ার সময় মিসেস রায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন । টুকটাকি কথা সেরে

চলে যান ।

বিটুসাহেব বললেন, “ফাইন । এই ধরনের খাবার আমার পছন্দ । বাঙালিরা কেন যে একগাদা ভাত খায় !”

কথাটা খুব খারাপ লাগল অর্জুনের । দুপুরে ভাত না হলে কি জমে ? অমলদা হেসে বলেছিলেন, “আমেরিকায় আপনি ভাল থাকবেন । শুনেছি কাজের দিনে ওরা দুপুরে খুব সামান্য খায় । ডিনার সারে সঙ্গেবেলায়, বেশ হেভি ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, “সারাদিন না খেয়ে থাকে ?”

“তা কেন ? ওখানকার খাবারে ক্যালরি এত বেশি পরিমাণে থাকে যে, বেশি খাওয়ার দরকার হয় না । এতে মানুষের কাজ করার সুবিধে হয় ।”

বিটুসাহেব নিচু গলায় অর্জুনকে বললেন, “এবার কালিম্পাংয়ে ফিরে এই ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করব । ভাল জিনিস শেখা উচিত । ঠিক আছে ?”

রায়সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন । ওরা তার সামনে বসে । এই বারান্দায় বসে দুপুরের মিঠে রোদ গায়ে মাখা যায় । অর্জুনের মনে হচ্ছিল এই ক’মাসে লোকটার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে । প্রথম যখন সানফ্রানসিস্কো থেকে কালিম্পাংয়ে উনি এসেছিলেন, তখন যে জৌলুস ছিল, সেটা হারিয়েছে । তা ছাড়া মেয়ের অন্তর্ধানের পর প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন । অমলদাকে দেখে খুব খুশি হলেও সেটা বোঝাতে শুধু হাত চেপে ধরলেন, “আপনারা এসেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ । ডাক্তার আমাকে শুয়ে থাকতে বলেছে । এ যে কী যন্ত্রণা !”

বিটুসাহেব বললেন, “আপনি শান্ত হোন । অমলবাবু যখন এসে গেছেন তখন কোনও চিন্তা নেই । সীতাকে আমরা খুঁজে বের করবই ।”

রায়সাহেব মাথা নাড়লেন, “কালিম্পাংয়ে আপনি যা করেছেন, তার তুলনা নেই । কিন্তু এবার অন্য ব্যাপার । তা ছাড়া মেয়ের যদি ইচ্ছে না থাকত, তা হলে ওরা ওকে নিয়ে যেতে পারত না । পান্থদের সঙ্গে থাকলে আমার মেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে । আমি এটা সহ্য করতে পারব না ।”

অমলদা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, “আমরা চেষ্টা করব । কী করে সীতা গেল তা শুনব আপনার কাছে । তার আগে বলুন তো ওর কোনও ছবি আছে কি না আপনাদের কাছে ?”

“আছে । ওর একটা অ্যালবাম আছে । ওই যে ওই টেবিলের ওপর রেখেছি ।”

অমলদার নির্দেশে অর্জুন উঠে অ্যালবামটি এনে দিতে তিনি পাতা ওপ্টাতে লাগলেন । মিষ্টি মেয়ে সীতা নানা পোশাকে । এসবই তার পান্থ হওয়ার আগের জীবনের ছবি । সীতা এবং তার বন্ধুদের ছবি দেখতে-দেখতে হঠাৎ

অমলদা সোজা হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, “এদের আপনি চেনেন?”

অর্জুন মুখ বাড়িয়ে দেখল দুটো যমজ ছেলেমেয়ের মাঝখানে সীতার ছবি। এই যমজ ছেলেমেয়ের ছবি বিল গারট্টুডের ডায়েরিতে ছিল।

॥ আট ॥

ছবিটা রায়সাহেবের সামনে রেখে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “এদের চেনেন?”

ক্রান্ত ভঙ্গিতে রায়সাহেব একবার তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, “ইয়েস, আমার প্রতিবেশী মিস্টার মুরহেডের ছেলেমেয়ে। সীতার সঙ্গে পড়ত। দুজনেই খুব ভাল স্টুডেন্ট ছিল। বাট...।”

“এরাও পাঙ্ক হয়ে গিয়েছে।” অমলদা যেন কথাটা সম্পূর্ণ করলেন।

“হাউ ডু যু নো?” বিস্মিত চোখে তাকালেন রায়সাহেব।

ঠিক তখনই মিসেস রায় পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। এখন ওঁর পরনে সুন্দর জামরঙের শাড়ি। ওপরে শাল। রায়সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বললেন, “তুমি কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলেছ।”

একথায় সামান্য গুরুত্ব না দিয়ে রায়সাহেব হাত নেড়ে স্ত্রীকে বললেন, “অমলবাবু জানানেন জন আর জিনার কথা। স্ট্রেঞ্জ!”

মিসেস রায় এমন ভাবে তাকালেন যে, তিনিও যে অবাক হয়েছেন, তা বোঝা গেল।

অমলদা হাসলেন, “মিস্টার মুরহেড নিশ্চয়ই ছেলেমেয়ের জন্যে বিব্রত!”

“অবশ্যই।”

“তাই ওঁরা বিলকে এ-দেশে পাঠিয়েছিলেন ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?”

“এ-দেশে? জিনারা এদেশে আছে?”

অমলদা নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

“আপনি জানলেন কী করে?” দ্বিতীয়বার এই প্রশ্নটা করলেন মিসেস রায়।

“সেটা অন্য কথা। আপনি শুধু মিস্টার মুরহেডকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কথাটা যাচাই করে নিন। এটা জানা আমারও দরকার।” অমলদা পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন, “সীতার ব্যাপারটা বলুন।”

রায়সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকাতে তিনি এবার চেয়ার টেনে বসলেন। “আমিই বলছি। আমার মেয়ে পাঙ্কদের সঙ্গে মিশে যখন স্পয়েলড হয়ে যাচ্ছিল, তখন পুলিশের হেফাজত নিয়ে রায় ওকে এ-দেশে নিয়ে আসে। শি ওয়াজ আন্ডার-এজ অ্যাট দ্যাট টাইম। ওরা কালিম্পাংয়ে স্বেটল করে। আমি আমেরিকায় থেকে

গিয়েছিলাম সম্পত্তি ব্যবসাপত্র ক্লোজ করার জন্যে। কিন্তু তখন চিন্তা করিনি সীতার জন্যে ওরা কালিম্পিংয়েও হানা দেবে। তখন মেয়ে আমাদের ওপর বিরূপ ছিল। কোনও কথা শুনত না। পাঙ্কদের দলে ফিরে যাওয়ার জন্যে ছুটফট করত। সেই সময়ের কথা আপনি জানেন। আমি শুনেছি অর্জুন আপনাকে খুব সাহায্য করেছিল। তারপর রায় মন চেঞ্জ করে। ও মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আসে। চণ্ডীগড় নির্বাঙ্কটি জায়গা। কালিম্পিংয়ে চারপাশে পাহাড় থাকায় ঝুঁকি ছিল থাকার। এখানে ফাঁকা বলে আক্রমণের আশঙ্কা কম। তা ছাড়া এখানকার প্রশাসনে ওঁর পরিচিত মানুষ আছেন। এইসময় আমি আমেরিকার পাট চুকিয়ে এখানে চলে এলাম। এসে দেখলাম মেয়ে বেশ শাস্ত। ও আমেরিকায় জন্মেছে, বড় হয়েছে। ইন্ডিয়ান হ্যাবিট এবং কালচার ওখানে জানা সম্ভব নয়। স্বীকার করছি, আমরাও ওকে তেমন সাহায্য করিনি। কিন্তু চণ্ডীগড়ে আসার পর ওর খুব পরিবর্তন দেখলাম। অনেক শাস্ত, ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহলী এবং বেশ কো-অপারেটিভ। ভাবলাম, মেয়ে পাণ্টে গেছে, সুমতি হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন ও উধাও হয়ে গেল।

“কী ভাবে?”

“ও নর্মাল দেখে মাঝে-মাঝেই ওকে নিয়ে বের হতাম। সেভেনটিন্থ সেন্টরে যে মার্কেট আছে, সেখানে গিয়েছিলাম আমরা। ভিড়ে লক্ষ রাখিনি। হঠাৎ দেখি, নেই। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পেলাম না। পুলিশের কাছে জানালাম, বাট নো ট্রেস।”

মিসেস রায় শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালেন।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “ঘটনাটা কতদিন আগে ঘটেছে?”

রায়সাহেব সময়টা জানালে অমলদা বললেন, “বিল খুন হওয়ায় বুঝতে পারছি ওরা এখানেই আছে। হয়তো ঠিক চণ্ডীগড় শহরে নয়, তবে আশপাশেই দেখা যাক।”

রায়সাহেব অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, “মিঃ সোম, আমি আমার মেয়েকে ফেরত চাই। আপনি টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না?”

কিন্তু সেইসময় মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, “বিল কে?”

অমলদা হাসলেন, “বিল একজন সত্যসন্ধানী। আমেরিকা থেকে এসেছিল। আজ সকালে সে আমাদের বাসের মধ্যেই খুন হয়ে যায়। মিসেস রায়, আপনার মেয়ে যাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তারা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। সামান্য বাধা সহ্য করবে না। অতএব আমার এখানে থাকা উচিত হবে না। নিজেকে শত্রুর সহজ টার্গেট করে তুলতে চাই না।”

রায়সাহেব বললেন, “আপনারা আমার এখানে থাকবেন না?”

অমলদা বললেন, “বিশ্বসাহেব আর অর্জুন থাকছে। আপনার বাড়িতে ফোন আছে বুঝতে পারছি। নাস্তারটা কত?”

মিসেস রায় জবাব দিলেন, “থ্রি নাইন ডাব্ল ও ফাইভ ।”

অর্জুন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমলদা তাকে একটিবারও জানাননি যে, তারা চণ্ডীগড়ে আলাদা থাকবে। তার মনের কথা বিটুসাহেবের মুখে বেরিয়ে এল, “এটা কেমন হল?”

অমলদা হেসে বললেন, “ঠিক আছে।”

ভঙ্গিটা নিজের মত বলে বিটুসাহেব ঢোঁক গিললেন। অমলদা বললেন, “আমরা তিনজনেই এই বাড়িতে থাকলে ওদের সুবিধে হবে। কারণ আমার নিশ্চিত ধারণা রায়সাহেবের বাড়ির ওপর ওদের নজর আছে।”

“ফর হোয়াট?” উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন রায়সাহেব, “আমার মেয়েকে ওরা নিয়ে গেছে। আর কী দরকার আমার এখানে নজর রাখার?”

“ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দিন। তা ছাড়া এখনই কিছু বলা উচিত হবে না।” অমলদা খুব শীতল গলায় জবাব দিয়েছিলেন।

চণ্ডীগড়ে শীতকালের বিকেল মোটেই ভাল নয়। দুপুর শেষ হতে না-হতেই বিকেল মুখ খুবড়ে রাতের কোলে ঢলে পড়ে। অর্জুন দোতলার ব্যালকনিতে এসে দেখল চারধারে কেমন বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে। এই রকম সময়ে অকারণেই মন খারাপ হয়ে যায়।

ঘরে বসে থাকতে অর্জুনের ভাল লাগছিল না। দুপুরে খাওয়ার পর বিটুসাহেব কবল মুড়ি দিয়ে সেই যে শুয়েছেন, আর ওঠার নাম নেই। এমন কী, শুয়ে-শুয়েই বিকেলের চা খেয়েছেন। ডাকলেই বলছেন, “বড্ড ধকল গেছে। তা ছাড়া হোটেলে এর চাইতে বেশি আরাম পাওয়া যেত! ঠিক আছে?”

কথাটা যে অমলদাকে ঠেস দিয়ে বলা সেটা পরিষ্কার। অমলদার অমন করে চলে যাওয়াটা মোটেই পছন্দ হয়নি অর্জুনের। উনি একটু পরামর্শ করতে পারতেন তার সঙ্গে। হাজার হোক, সে তো সহকারী। অর্জুন ঠিক করল, বাড়িতে বসে না থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে ঘুরে আসবে। বিটুসাহেবকে বলেছিল সে, তিনি বিছানায় স্টেটে গিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে জানিয়েছিলেন, “উরে বাবা, বড্ড শীত!”

মিসেস রায় লনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রমহিলাকে সত্যি সুন্দর দেখতে। সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বময়ী। ওকে দেখা মাত্র সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, “হা-ই।” এটা দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকার অভ্যেস। অর্জুন খুব স্মার্ট গলায় বলল, “হা-ই।”

মিসেস রায় জিজ্ঞেস করলেন, “কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?”

“না। ভাল আছি। আমি এখন একটু বেরুব।”

“কোথায়?”

“জাস্ট...” বলে কাঁধ নাচাল অর্জুন।

“ওই ঘটনার পর আমরা খুব শেকি হয়ে আছি। আমি অবশ্য সেভেনটিনে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আসতে পারো।” এইসময় একটা ফিয়াট বেরিয়ে এল ওপাশের গ্যারাজ থেকে। অর্জুন বেঁচে গেল। অচেনা জায়গায় একা-একা কতক্ষণ ঘোরা যেত? গাড়িতে গেলে অনেকটা দেখা যাবে। ওর মনে পড়ল সেভেনটিন সেক্টরের বাজার থেকেই সীতা উধাও হয়েছিল। অতএব জায়গাটাও দেখা যাবে।

ড্রাইভার একজন প্রৌঢ় পাঞ্জাবি। মিসেস রায় সামনের সিটে জানালায় মুখ রেখে বসেছেন। ওই বসার ভঙ্গিতে একটা নিয়মিত অভ্যাস এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্র যে-দোকানটা প্রথমে নজরে এল, সেটা একটা মিস্ক-বার। এ ছাড়া কাছাকাছি দোকান বা ঘিঞ্জি এলাকা বলতে কিছু নেই। পরিষ্কার মসৃণ রাস্তা দিয়ে ফিয়াট ছুটছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মিসেস রায় জিজ্ঞেস করলেন, “বিল নামের লোকটা যে খুন হয়েছে, তা তোমরা জানলে কী করে?”

“আমরা একসঙ্গে আসছিলাম।” অর্জুন উত্তরটা দিয়ে দেখল মিসেস রায়ের চোঁটের কোণে সামান্য ভাঁজ দেখা দিল। তিনি মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “বিল এখন কোথায়?”

“আমরা থানায় দেখে এসেছিলাম।”

“জন আর জিনার ফোটোগ্রাফ ওর কাছে ছিল?”

“হ্যাঁ।”

মিসেস রায় মুখ ফিরিয়ে বসলেন। তাঁকে খুব দৃষ্টিস্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে গাড়িটা চলে এল একটা জমজমাট এলাকায়। প্ল্যানমাফিক দোকানপাটে প্রচুর মানুষ কেনাবেচা করছে। দিনের আলো নিভে এসেছিল। কিন্তু সতেরো সেক্টরের আলো তার অভাব মিটিয়ে দিল। পার্কিং লটে গাড়িটা দাঁড় করালে মিসেস রায় বললেন, “আমার মিনিট-পঁচিশেক লাগবে। তুমি এর মধ্যে ফিরে এসো গাড়িতে। ও. কে-এ।” কথাটা শেষ করে একটা শৌখিন ব্যাগ নিয়ে তিনি নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, ভদ্রমহিলা যেন হঠাৎ তাকে অপছন্দ করছেন। কিন্তু এর কী কারণ আছে, তা সে ঠাहर করতে পারল না।

আলোকিত দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছিল অর্জুন। বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু এতে যেন চণ্ডীগড়ের মানুষেরা কাবু নয়। এই শীতের সম্ভবেলাতেও আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে। একটা হিপি মেয়ে উদাস চোখে চলে গেল। অর্জুন সতর্ক চোখে তাকাল। নাঃ, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই পাঙ্কদের কোনও সম্পর্ক নেই। অর্জুন লক্ষ্য করছিল, ফ্রেতাদের চেহারা এবং পোশাকে বেশ সচ্ছলতার পরিচয় আছে। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানের সামনে এসে অর্জুনের বুক ধক করে উঠল। সেই ট্রেনের শিষ্য দুটো। ব্যাগ বোঝাই করে জিনিসপত্র কিনে

দাম দিচ্ছে। অর্জুন চট করে চারপাশে তাকিয়ে নিল। না, ওদের গুরুদেব সেই সন্ন্যাসী কোথাও নেই। এদের তো আজ কালকায় যাওয়ার কথা। তাহলে চণ্ডীগড়ে বাজার করছে কেন? অর্জুন একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, শিষ্য দুটো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অর্জুন বেরিয়ে এল দ্রুত। এই লোকদুটোর ভাবভঙ্গি ভাল নয়। ওরা একটা কালো অ্যাম্বাসাডারের পেছনে জিনিসপত্র রেখে আবার ফিরে আসছিল দোকানের দিকে। তার মানে বেশ ক'দিনের রসদ নিচ্ছে ওরা।

ঠিক সেই সময় পেছন থেকে কেউ ডাকল, “অর্জুন না?”

পেছন ফিরে তাকাতেই হতবাক হয়ে গেল সে। এমন একটা চমক যে, কথা বলতেই অসুবিধে হচ্ছিল। ততক্ষণে বুড়িদি এগিয়ে এসেছে। “ও মা, তুই এখানে! কী ব্যাপার? কবে এলি?” অর্জুনের দুটো হাত জড়িয়ে ধরল বুড়িদি।

“তোমার ঠিকানা আনতে ভুলে গিয়েছিলাম।” কথাগুলো বলতে-বলতে বুড়িদির মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। প্যান্ট, পুলওভার এবং তার ওপর ওভারকোট পরেছে বুড়িদি। কনুই থেকে একটা সুদৃশ্য ব্যাগ বুলছে। এই বুড়িদির সঙ্গে জলপাইগুড়ির বুড়িদির পোশাকের কোনও মিল না থাকলেও হাসি ও কথায় যে উত্তাপ, তা একই আছে।

বুড়িদি উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করল, “কবে এসেছিস, কোথায় উঠেছিস?”

“আজই। আমাদের পরিচিত একটা বাড়িতে।” তারপর হেসে বলল, “এই পোশাকে তোমাকে চেনা খুব শক্ত হত। ভাবা যায় না।”

বুড়িদি যেন একটু লজ্জা পেল। “যা ঠাণ্ডা এখানে, শাড়ি পরলে খুব অসুবিধে হয়।”

“তুমি বাড়িতে চিঠিপত্র দাওনি কেন? খুব চিন্তা করছে সবাই।”

“যাঃ, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি দিচ্ছি। ডাকের যা গোলমাল হচ্ছে এখানে!”

বুড়িদির কথা শেষ হওয়ামাত্র এক সুদর্শন ভদ্রলোক পাশে এসে দাঁড়ালেন। বুড়িদি বলল, “চিনতে পারছিস?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ। আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়ি...।”

“বাস্, বাস্, চিনে গেছি ভাই। তোমার দিদির মুখের অন্ধকার তুমি দূর করেছ, তাই না? তুমি বললাম বলে কিছু মনে কোরো না।” ভদ্রলোকের গলা বেশ ভারী। ওঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে মার্কেটিংয়ে এসেছেন। অর্জুন চট করে বুড়িদির মুখ দেখে নিল। নির্মোহ। সেই মেচেতার দাগগুলো আর নেই।

বুড়িদি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, “আঃ, এখানে দাঁড়িয়ে কেন! চল, আমার বাড়িতে যাবি।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না বুড়িদি। আমি যাঁর সঙ্গে এসেছি, তিনি এখনই

ফিরে যাবেন । তোমাদের ঠিকানাটা বলো, আমি পরে দেখা করব । ”

“কার সঙ্গে এসেছিস ?”

“মিসেস রায় । ওঁরা আগে আমেরিকায় ছিলেন । এখন এখানে সেটেলড । ”

“মিসেস রায় ? যাঁর মেয়ে মিসিং ?” বুড়িদির বর প্রশ্ন করলেন ।

খানিকটা অবাক হয়েই মাথা নাড়ল, অর্জুন, “আপনি জানলেন কী করে ?”

“আমার বন্ধুর মুখে শুনেছি । ও এখানকার পুলিশের বড়কর্তা । ওরও নাম অর্জুন, অর্জুন ভার্মা । মেয়েটিকে তো এখনও পাওয়া যায়নি । ”

অর্জুন কিছু বলার আগেই বুড়িদি বললেন, “বুঝেছি, তাই তোরা এখানে এসেছিস, অমলবাবু এসেছেন নিশ্চয়ই । ”

“হ্যাঁ । ” অর্জুন মাথা নাড়ল ।

“আর তোদের সেই বিটুসাহেব ?”

“হ্যাঁ । তিনি ঠাণ্ডায় ঘর থেকে বের হননি । ”

অনেক কাষ্ট বুড়িদির কাছ থেকে ছাড়া পেল অর্জুন । এতদিন পরে দেখা, এত কাছের সম্পর্ক, চলে যেতেও খারাপ লাগছিল । বুড়িদির স্বামী বেশ ভাল মানুষ । ওদের ঠিকানা নিয়ে পা বাড়াতেই খেয়াল হল শিষ্য দুটোর কথা । যে দোকানটায় ওদের দেখা গিয়েছিল সেখানে ওরা নেই । ব্যস্ত হয়ে অর্জুন মার্কেট ঘুরে দেখতে লাগল । এখন ভিড় আর-একটু বেড়েছে । এখানকার মানুষরা সন্দের পর বেশ সেজেগুজে বাজার করতে ভালবাসেন ।

অর্জুনের খুব মন খারাপ হয়ে গেল । বুড়িদির সঙ্গে এমন সময়ে দেখা হল যে, সে লোকদুটোকে চোখে রাখতে পারল না । হঠাৎ পার্কিং লটটার কথা মনে পড়তেই সে দ্রুত পা চালাল । গাড়িটা নেই ।

ঠোট কামড়ে পেছন ফিরতেই সে মিসেস রায়কে দেখতে পেল । মার্কেটিং সেরে মহিলা ফিরে আসছেন । অর্জুন এগিয়ে যেতে তিনি বললেন, “আমার আর-একটু দেরি হবে । একটা জিনিস সারাতে দিয়েছিলাম, লোকগুলো এমন অলস... । ”

ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল । জিনিসপত্র সেখানে রেখে তিনি বললেন, “কফি খাবে ?”

এই ঠাণ্ডায় কফি মন্দ হয় না । মিসেস রায়ের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন ঠিক করল আজ যেমন করেই হোক অমলদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে । উনি যে-হোটেল উঠেছেন, তার হদিস নিশ্চয়ই দেবেন । এই শিষ্য দুটোর সঙ্গে পাক্সদের নিয়তি যোগাযোগ আছে ।

কফি কন্নারে কফি খেতে খেতে মিসেস রায় জিজ্ঞেস করলেন, “মিস্টার সোম কোন হোটেল উঠেছেন তুমি জানো ?”

মাথা নাড়ল অর্জুন। সেটা দেখে খুশি হলেন না মহিলা। বললেন, “আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। উনি একা কী করে এই প্রবেশমটা সলু করবেন? যাদের নিয়ে এলেন, আই মিন ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো শীতেই কাবু হয়ে থাকবেন। কিছু মনে কোরো না, তোমার বয়সও তো খুব অল্প। দিজ গাইজ আর ভেরি টাফ।”

অর্জুন কথাগুলো শুনতে শুনতে চটে যাচ্ছিল। তবু কোনও রকমে শান্ত গলায় উত্তর দিল, “অমলদা আজ পর্যন্ত বিফল হননি কোনও কেসে। তা ছাড়া রায়সাহেব না চাইলে আমরা আসতাম না। আপনি ভরসা রাখুন।”

কফির কাপটা নামিয়ে রাখতেই অর্জুনের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। সেই শিষ্য দুটোর একটা। হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গী ধারেকাছে নেই। অর্জুন মিসেস রায়কে দ্রুত গলায় বলল, “আমি আসছি।”

হাত-পনেরো পেছন-পেছন লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটছিল অর্জুন। শিষ্যটার কোনও দিকে নজর নেই। কিন্তু চলার ভঙ্গিতে বেশ গতি আছে। এবং তখনই অর্জুন আর-একবার চমকে উঠল। তার ঠিক সামনে, শিষ্য এবং তার মাঝখানে আর-একজন নিষ্পৃহ ভঙ্গিতে হাঁটছে। লোকটার পরনে সোয়েটার প্যান্ট এবং ওপরে চাদর। কিন্তু চাদরটা টেনে ঠিক করতে যেতেই কাটা হাতটাকে বোঝা গেল। অর্জুনের কোনও সন্দেহ রইল না, একেই কলকাতায় আসবার সময় ট্রেনে স্মাগলিং করতে দেখেছে।

॥ নয় ॥

হাতকাটা লোকটি হঠাৎ গতি কমাতেই অর্জুনের পাশাপাশি হয়ে গেল। এবং তখনই অর্জুন চাপা গলা শুনতে পেল, “এই লোকটা বহুত বদমাস। দুজনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না ভাই।”

এবং তখনই শিষ্যটাকে একটা গ্যারাজের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখা গেল। গ্যারাজের ভেতর কড়া আলো জ্বলছে। বাইরে গোটা তিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। অর্জুন হাতকাটা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি আমাকে চেনেন?”

ঘাড় কাত করে হাসল লোকটি, “বা, ট্রেনে দেখা হয়েছিল তো। একসঙ্গে দিল্লি-কার্লকায় এলাম। তোমরা ফাস্ট ক্লাসে, আমি সেকেন্ডে।”

“আপনি কেন এসেছেন এখানে?”

“তুমি জানো না?”

“না।”

“তাহলে আমার বলা ঠিক হবে না। তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি আসছি।” মুহূর্তেই লোকটা উধাও হয়ে গেল। ওর যাওয়ার ভঙ্গিটা চিতাবাঘের মতো দ্রুত। কথা বলতে-বলতে যে গ্যারাজের পেছনটা লক্ষ করেছে, তা অর্জুন টের ১৮৮

পায়নি। লোকটি যদিও গেল, সেদিকটায় আলো নেই। বাজারের শেষপ্রান্ত বলে তেমন লোক চলাচল নেই এপাশটায়। অর্জুন একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই খেয়াল করল এটা ঠিক নয়। যে-কোনও মানুষের নজরে পড়বে এই রকম ভঙ্গিতে দাঁড়ালে। সে আর-একটু সরে গ্যারাজের দিকে তাকাল। হাতকাটা লোকটিকে দেখা যাচ্ছে না। গ্যারাজের আলোকিত অংশে কোনও আলোড়ন নেই। হাতকাটা লোকটিকে এখানে দেখবে, অর্জুন তা ভাবতেই পারেনি। চোখের সামনে দার্জিলিং মেলের কামরাটা ভেসে উঠল। চোরাই জিনিসপত্র টয়লেটে কী নিপুণ ভঙ্গিতে ওরা লুকিয়ে রাখছিল। এই হাতকাটা ছেলোটা ওদের পরিচালনা করছিল। সে-সময় ওর ভয়ে কামরায় কোনও প্রতিবাদ ওঠেনি। অর্জুনের মনে পড়ল, নিরিবিলা হয়ে পড়লে অমলদা উঠে গিয়ে হাতকাটার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাহলে কি সেইসময়...? অর্জুন মাথা নাড়ল। এটা ভাবতে খুব অদ্ভুত লাগছে যে, এই হাতকাটা লোকটিকে অমলদা চণ্ডীগড়ে আসতে বলবে। কিন্তু এটা মিথ্যে ভাবারও তো কোনও কারণ নেই। উত্তরবঙ্গের একটা স্মাগলার ছেলের সঙ্গে পাঙ্কদের কোনও সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

একটু-একটু করে অর্জুনের মনে ভার জমছিল। 'অমলদা আজকাল তার সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেন না। ওই বাজে লোকটাকে দলে টানার পরেও তো তাকে জানাতে পারতেন। ঠিক এইসময় অন্ধকার ফুঁড়ে হাতকাটা লোকটা ফির এল, "তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো এখান থেকে। ওরা বোধহয় সন্দেহ করছে।"

দ্রুত পা চালিয়ে ওরা বাজারে ফিরে এল। হাতকাটা লোকটা নিশ্বাস ফেলে একটা বিড়ি ধরানো মাত্র অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি জানেন অমলদা কোথায় উঠেছেন?"

"হুঁ! আচ্ছা, আবার দেখা হবে।" বলতে বলতে লোকটা উধাও হয়ে গেল।

স্মাগলাররাই এই রকম অভদ্র হয়। আর এই লোকটাকে কাজে লাগাতে অমলদা এতদূরে টেনে নিয়ে এলেন। অর্জুন ধীরে ধীরে পার্কিং লটে ফিরে আসতেই দেখতে পেল মিসেস রায় গাড়িতে বসে আছেন। মুখ গম্ভীর। নির্যাতন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। সে পেছনে উঠে বসামাত্র ড্রাইভার স্টার্ট নিল। আর মিসেস রায় গম্ভীর গলায় বললেন, "কেরানির চাকরিই করো কিংবা গোয়েন্দাগিরিই করো, সময়ের মূল্য যদি না বুঝতে পারো, তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।"

থতমত অর্জুন বলল, "সরি।"

মিসেস রায় কাঁধ নাচালেন। যার সঠিক মানে অর্জুন বুঝল না।

কাল সারা রাত বিটুসাহেবের নাক ডেকেছে। সারা রাত বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হল যদিও, কারণ অর্জুন সারা রাত জেগে থাকেনি। কিন্তু যখনই ঘুম ভেঙেছে, তখনই মনে হয়েছে একটা ছোটখাটো বাঘ ঘরে পায়চারি করছে। অর্জুন কোথাও পড়েছিল যে, দুর্বল মানুষের নাক বেশি ডাকে। সকালে ঘুম ভাঙা মাত্র আর-একটা শব্দ কানে এল। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে বিটুসাহেব টেপ রেকর্ডার চালিয়েছেন। যন্ত্রটি লেপের ভেতরেই। এবং সেখান থেকে পাঙ্কদের সঙ্গীত ভেসে আসছে। একেই পাঙ্কদের গান, তার ওপর লেপ চাপা থাকায় সেটি কোনও চেহারাই পাচ্ছিল না। বিছানায় উঠে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, “ও কী করছেন?”

বিটুসাহেব ধীরে-ধীরে মুখ থেকে লেপের আড়াল সরিয়ে নিলেন, “ভেতরটা ধুয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গানের সুরে হৃদয় ধুয়ে যায়। তোমার ক্যাসেটে তো এ ছাড়া কোনও গান নেই। ঠিক আছে?”

“কাল রাতে আপনার খুব নাক ডেকেছে।”

“অসম্ভব।” অর্জুন হেসে ফেলল। যাদের নাক ডাকে, তারা নাকি টের পায় না। ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এই ঘরে একটা এক্সটেন্ডেড লাইন আছে। ‘জ্বালাল’ বলে বিটুসাহেব হাত বাড়িয়ে শুয়ে-শুয়েই রিসিভার তুলে হাঁকলেন, “হ্যালো! কে...অ্যাঁ? ...ওহো! কী খবর?...ঠিক আছে! খুব ঠাণ্ডা। ...তাই নাকি! না না, আমার বরফ ভাল লাগে।...হ্যাঁ। ঘুমুচ্ছিল, উঠেছে। কথা বলুন।” ইঙ্গিতে ডাকলেন বিটুসাহেব অর্জুনকে।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে ‘হ্যালো’ বলতেই অমলদার গলা শুনতে পেল। “অর্জুন, আজ সকালেই চণ্ডীগড় থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ন’টার বাস। মানালিতে নেমে পালবাবুর হোটেল খুঁজবে। বিটুসাহেব যদি ঠাণ্ডার জন্যে না যেতে চান তাহলে ওঁকে এখানেই থেকে যেতে বলো। বাস টার্মিনাসে এলেই টিকিট পেয়ে যাবে। বেশি সময় নেই।” কট করে লাইনটা কেটে গেল। অর্জুন ঘড়ির দিকে তাকাল। ন’টা বাজতে বেশি দেরি নেই। বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অর্জুন, “ন’টায় মানালির বাস ছাড়বে। অমলদা বললেন, ইচ্ছে হলে এখানেই আপনি থাকতে পারেন।”

“হোয়াই? তোমরা কী ভাবো আমাকে? আমার কোনও দায়িত্ববোধ নেই?” ঝটপট লেপ সরিয়ে ফেলতে বিকট গলার গান সোচ্চার হল।

বিটুসাহেব এক আঙুলে স্টপ বোতামটা টিপতেই অর্জুন বলল, “কিন্তু ওখানে শুনেছি বেদম ঠাণ্ডা।”

“হুঁ! ঠাণ্ডার ভয় দেখিও না আমাকে। আই অ্যাম ফ্রম কালিম্পং! ঠিক আছে।”

চণ্ডীগড়ের বাস টার্মিনাসটা খুব বড়। ওদিকে দিল্লি, এদিকে সিমলা, মানালি, ১৯০

ওপাশে হরিদ্বার-দেবদুন পর্যন্ত বাস ছুটছে। টার্মিনাস বিল্ডিংটা রেলওয়ে স্টেশনের মতন। স্কুটারে আসতে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছিল। বিটুসাহেব দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিলেন, “যাই বলো, ইন্ডিয়ান শাল না জড়ালে কোনও সুখ হয় না।”

অর্জুন কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল। তারা যে মানালি যাচ্ছে সে-খবর রায়সাহেবরা জানেন। মূল টেলিফোনটা তো মিসেস রায় ধরেছিলেন। অতএব অমলদার কথাবার্তা ওঁরা শুনতেই পারেন। অতএব তাদের মানালিতে যাওয়া নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই। এইটে কেন অমলদা করলেন? মানালিতে সে কী কারণে যাচ্ছে তা অবশ্য জানে না, কিন্তু নিছক বেড়াতে যে যাচ্ছে না, তা তো বোঝাই যায়। রায়সাহেব নিশ্চয়ই কাউকে বলবেন না, কিন্তু মিসেস রায়কে বোঝা মুশকিল। তারা আসার পর থেকেই ভদ্রমহিলা যেন বেশ বিরক্ত।

চণ্ডীগড়ের বাস যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে গিয়ে চমকে উঠল অর্জুন। একজন পাঞ্জাবি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা লাঠির ডগায় পিনবোর্ড বুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই পিনবোর্ডে লেখা আছে, ‘থার্ড পাণ্ডব অ্যান্ড বি.সি. পি।’ আশেপাশে যারা যাওয়া আসা করছে, তারা বেশ কৌতূহলী চোখে দেখছে ভদ্রলোককে। অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে দেখল, অমলদার কোনও চিহ্ন নেই। বিটুসাহেব ব্যাপারটা লক্ষ করে বললেন, “কোড ল্যান্ড্রুয়েজ? ইন্টারেস্টিং। তোমার দাদা কোথায়?”

বাস ছাড়তে আর দেরি নেই। যাত্রীরা সবাই প্রায় বাসে উঠে পড়েছে। তবে বাসের ছাতে এখনও মালপত্র বাঁধা শেষ হয়নি। অর্জুন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, “আপনি কাউকে খুঁজছেন?” ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ। আপনাদের নাম?”

অর্জুন নিজের এবং বিটুসাহেবের পরিচয় দিল। ভদ্রলোক ওদের ভাল করে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “কেথায় যাবেন?”

“মানালি।”

“কোথায় উঠবেন?”

“পালবাবুর হোটেল।”

কথাটা শোনামাত্র লোকটি সহজ ভঙ্গিতে পকেট থেকে দুটো টিকিট বের করে বললেন, “এই বাসটার টিকিট আগে থেকে রিজার্ভ না করলে পাওয়া যায় না। যান, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। এখনই ছেড়ে দেবে।”

হর্ন বাজছিল। কোনও প্রশ্ন করার সময় নেই। ওরা কোনওরকমে ছুটে এসে বাসের ভেতরে ঢুকে পড়তেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সিট দুটো জানলার পাশে। বিটুসাহেব বললেন, “তুমি ধারেরটায় বোসো। পাহাড়-টাহাড় দেখতে পাবে। আমি সারা জীবন অনেক দেখেছি।”

খুব ভাল লাগল অর্জুনের। ঠিক জানলার গায়ে বসায় আনন্দ আছে। সে দেখল সমস্ত চণ্ডীগড় শহরটা পেরিয়ে বাসটা চমৎকার পিচের রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে পঞ্জাবের গ্রামের ওপর দিয়ে। চারধারে কেমন একটা রুখু-রুখু ভাব। হঠাৎ কোমরে একটা খোঁচা খেতেই সে চমকে বিষ্টসাহেবের দিকে তাকাল। বিষ্টসাহেব চেষ্টা করছেন নির্বিকার হয়ে বসে থাকতে। কিন্তু তাঁর চিবুক কাঁপছে। অর্জুন যে তাকিয়েছে, সেটাও লক্ষ না করে আর-একবার খোঁচালেন তিনি।

অর্জুন বিরক্ত হল, “কী হচ্ছে?”

নির্বিকার ভাব বজায় রেখে বিষ্টসাহেব বললেন, “আস্তে কথা বলো। আমাদের বোধহয় ফলো করা হচ্ছে। সামনের যে কোনও স্টপে নেমে পড়তে হবে কায়দা করে।”

অর্জুন অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, “কে ফলো করছে?”

“পাক্স!”

“পাক্স?”

“একজন নয়, দুজন। সামনের সিটে, ডান দিকে।”

অর্জুন এবার বাসের ভেতরে তাকাল। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ রয়েছেন। ঠিক তাদের পাশেই এক বাঙালি পরিবার যাচ্ছে। দ্রুতগামী বাসে সবাই যে যার মতো বসে। অর্জুন সামনের ডানদিকে তাকাল। দুটো টুপি-পর্যায় লোক বসে আছে। বিষ্টসাহেব বললেন, “একটু আগে দু’জনই টুপি খুলে ছিল। আমি দেখেছি। সেন্ট পার্সেন্ট ন্যাড়া সাহেব। ঠিক আছে?”

“ন্যাড়া সাহেব?”

“ইয়েস? সাহেবরা কখন ন্যাড়া হয়? বৈষ্ণব না হলে। বাট তখনও টিকি থাকবে। এই দু’জন উইদাউট টিকিস।”

“টিকিস?”

“হ্যাঁ। দুটো টিকি দুজনের। একমাত্র পাক্সরাই ভারতবর্ষে এসে মাথা কামায়। তা ছাড়া চোখমুখের চাহনি খুব বিশ্রী। এরপরেই নেমে পড়তে হবে। ঠিক আছে?”

“কেন?”

“বাঃ। বোকার মতো কথা বোলো না। পাক্সরা খুব হিংস্র হয়। বিল কীভাবে মরল দ্যাখোনি? তার ওপর তুমি জানলার ধারে বসেছ। ডেঞ্জারাস।”

হাসি চাপার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিল অর্জুন। বিষ্টসাহেব কেন তাকে জানলার ধারের সিট ছেড়ে দিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে। বিল এই জানলার পাশেই খুন হয়। কিন্তু এই লোকদুটো যে পাক্স, সেটা স্পষ্ট নয়। ন্যাড়া-মাথার সাহেব মানেই যে পাক্স ভাবতে হবে, এমন কোনও কারণ নেই।

অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে কিছু বলল না। তিনি তখনও উত্তেজনা কমাতে পারেন নি। তবে নিজেকে আড়াল করতেই খানিকটা নীচে নেমে বসেছেন, যাতে চট করে তাঁকে না দেখা যায়। অর্জুন টুপি দুটোকে লক্ষ্য করল। সামনের কোনও আসন খালি নেই যে, এগিয়ে গিয়ে ওদের পাশে বসা যায়।

অর্জুনের মনে হল মানালিতে খুব চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটবে। মানালির নামই সে শুনে এসেছে এতকাল। হিমালয়ের সবচেয়ে সুন্দর শহর। কিন্তু অমলদা যে-গলায় তাদের মানালিতে যেতে বললেন, যেভাবে বাস টার্মিনাসে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে, মানালিতেই রহস্যের জট খুলতে পারে।

একটু পরেই বাস যে-জায়গায় থামল, তার নাম রোপার। কেউ নামল না, বরং কাউকে উঠতেও দেওয়া হল না। ড্রাইভারের বোধহয় কোনও কাজ ছিল, চটপট সেরে এল। অর্জুন দেখল, রোপারেও কিছু বাঙালি আছেন। এরপর বাস ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের রাস্তার এবং পাহাড়ের চেহারা আলাদা। অত কাছাকাছি বলতে গেলে গায়ে-গায়ে থাকা সত্ত্বেও দুটো শহরে দু'রকম আবহাওয়া। আর এত দূরে, এই হিমালয়ের চেহারা যে অন্যরকম হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তবু, বাসের জানলা দিয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অর্জুনের মনে হচ্ছিল কালিম্পংয়ের পাহাড় অনেক বেশি সুন্দর। একথা বিষ্টুসাহেবকে জানাতে তিনি যেন টেনশন-মুক্ত হয়ে বললেন, “ঠিক আছে।”

বিলাসপুরের বাসস্ট্যান্ড বেশ বড়। ছোটখাটো এই পাহাড়ি শহরটায় বাসটা আধ ঘণ্টার জন্যে থামল, যাতে যাত্রীরা একঘেয়েমি কাটাতে পারে। স্ট্যান্ডে ঢুকতেই দেখা গেল, দূরপাল্লার কিছু বাস তখনও বিশ্রাম নিচ্ছে সেখানে। যাত্রীরা যখন নামছে তখন দেখা গেল, জোড়াটুপি উঠছে না। ওদের মুখ দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অর্জুনের, কিন্তু ড্রাইভারের পেছনে যাওয়ার কোনও ছুতো পাচ্ছিল না। সে বিষ্টুসাহেবকে জিজ্ঞেস করল, “নামবেন না?”

অলস ভঙ্গিতে প্রথমে ‘না’ বলতে গিয়েই মত পাল্টে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, “চলো।”

অবাক হয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী হল?”

“নাঃ, স্টেট বাসে একা বসে থাকা সেফ নয়।”

বাইরে হাঙ্কা ঠাণ্ডা। চায়ের দোকানে বেজায় ভিড়। বাস এত উঁচু যে, নীচে নামার পর টুপি জোড়াকে দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে। কোনও সন্দেহজনক চরিত্র নেই।

মাণ্ডিতেও লোকদুটো নামল না। দুজন মানুষ সকাল থেকে ঠায় বসে আছে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনও তো হওয়া উচিত। মাণ্ডি ছাড়বার পরই দম বন্ধ হয়ে আসছিল অর্জুনের। পাহাড় পেরিয়ে ওঠা রাস্তা এত সরু যে, প্রতি মুহূর্তেই

মনে হচ্ছে, বাসটা হড়কে পড়ল খাদে। আর সেই খাদের দিকে ঢললে বিধাতাও প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। ইঞ্জিনের টানা গোঙানি ছাড়া আর যে আওয়াজটা কানে আসছে, সেটা হল বিটুসাহেবের নাসিকাগর্জন। মাণ্ডিতে পেট ভরে খাওয়ার পর সেই যে চোখ বন্ধ করেছেন, সম্ভবত কুলুর আগে খুলবেন না। অর্জুন বাসের অন্য যাত্রীদের দিকে তাকাল। কেউ কোনও কথা বলছে না। এখনও সন্ধে হতে দেরি, কিন্তু বেশ গাঢ় ছায়া নেমে গেছে ইতিমধ্যে। ঠাণ্ডা বাড়ছে। জানলা বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজল অর্জুন। যা হবার তা হোক।

কুলুতে যখন পৌঁছল ওরা, তখন হাঙ্কা সন্ধে। যদিও কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠাণ্ডাটা মালুম হল। কুলু ভারতবর্ষের সবচেয়ে সুন্দর উপত্যকা। কিন্তু এখন দাঁতালো হাওয়া বইছে এখানে। বাসটা যেখানে থামল সেটা বাজার এলাকা। কিছু যাত্রী নেমে যাচ্ছে এখানে। অর্জুন হাত-পায়ের জড়তা ছাড়বার জন্যে নীচে নামল। বিটুসাহেব আর সে কষ্ট করতে রাজি নন। তাঁর চোখ তখনও বন্ধ। অর্জুনের মনে পড়ল, মাণ্ডিতে বিটুসাহেব দুটো বমি-নিরোধক বাড়ি খেয়েছিলেন। ওতে বোধহয় ঘুম বেড়ে যায়। ভাগ্যিস সে খায়নি।

উন্টোদিকের একটা দোকান থেকে এক গ্লাস গরম চা নিয়ে অর্জুন দেখল রাস্তাঘাটে লোকজন কম। দোকানগুলোতে আলো জ্বলছে, কিন্তু খন্দের নেই। কয়েকটা দালাল-টাইপের লোক বাস থেকে নামা যাত্রীদের হোটেলের খবর দিচ্ছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে অর্জুনের চোখে পড়ল একজন নান্ এগিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে দুটো ছইল-চেয়ার নিয়ে দুজন মানুষ। কণ্ডাক্টরকে কিছু জিজ্ঞাস করার পর নান্ লোক দুটির দিকে মাথা নাড়তেই তারা বাসের ভেতরে ঢুকে গেল। তারপরই অর্জুন চমকে উঠল। দুজন মানুষ প্রথমে যাকে বয়ে নিয়ে সাবধানে বাস থেকে নামল, তার দুটো পা নেই, খুবই শীর্ণ চেহারা। নামবার সময় টুপিটা পড়ে যেতে লোকটার ন্যাড়া মাথা দেখা গেল। ওকে ছইল-চেয়ারে চাপিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় জনকে নিয়ে এল লোক দুটো। এরও হাঁটা চলার শক্তি নেই। মুখের ভঙ্গিও স্বাভাবিক নয়। দুজনেই বিদেশি। কেউ হয়তো চণ্ডীগড়ে বাসে তুলে দিয়েছিল, এঁরা নামিয়ে নিচ্ছেন।

ছইল-চেয়ারে চড়ে জোড়া-টুপি চলে যেতে অর্জুনের মন খারাপ হয়ে গেল। অকারণে সে সবাইকে সন্দেহ করে। সত্যসন্ধান করতে গিয়ে অসত্যকে আঁকড়ে ধরার কোনও যুক্তি নেই। এই দুটি অসহায় মানুষের কাছে মনে-মনে ক্ষমা চাইল সে।

আসনে গিয়ে বসতেই বাস ছাড়ল। বিটুসাহেব অর্ধেক চোখ খুলে বললেন, “ঠিক আছে।” তারপর উদাস চোখে সামনের দিকে তাকালেন, যেখানে জোড়া-টুপি বসেছিল। আসন দুটো ফাঁকা। সঙ্গে-সঙ্গে তড়াক করে চলন্ত বাসে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে উচ্চারণ করলেন, “যাঃ।”

“কী হল?” অর্জুন প্রথমটা ঠাওর করতে পারেনি।

“নেই। পাখি উড়ে গেছে। উড়ল কখন? আমি তো সারাক্ষণ তাকে তাকে ছিলাম। এখন তোমার দাদাকে কী কৈফিয়ত দেব। আঃ, বুঝতে পারছ না? আমি জোড়াটুপির কথা বলছি। আই অ্যাম শিওর দে আর পাক্স। ঠিক আছে?”

অর্জুন এবার হেসে ফেলল, “আপনি তাহলে ভাল সন্ধানী হতে পারবেন না।”

“নো। নেভার। কক্ষনো হতে চাই না। কিন্তু তুমি হাসছ কেন?”

এবার ওই অসুস্থ মানুষ দুটির নেমে যাওয়ার ঘটনাটা জানাল অর্জুন। সন্দেহ করতে-করতে এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিটুসাহেব বললেন, “তুমি কোনওদিন গোয়েন্দা হতে পারবে কি না সন্দেহ হচ্ছে!”

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাতে তিনি মাথা নাড়লেন, “হয়তো ওরা পঙ্গু নয়, ভান করেছে। আর ওই নান্ নিশ্চয় ওদেরই লোক। তুমি নানের চুল লক্ষ্য করেছ?”

অর্জুন ভেবে পেল না। নানদের মাথায় একটা সাদা কাপড় থাকে, চুল দেখার সুযোগ কোথায়? বিটুসাহেব নিশ্বাস ছাড়লেন, “কে জানে! হয়তো তোমাকে বোকা বানিয়ে গেল অভিনয় করে। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলাম, উঠলেই ধরব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টের পাইনি।”

খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল বিটুসাহেবকে। অর্জুন এবার হাসি চাপল।

বাস মোটামুটি জোরেই ছুটছে। বাইরে এখন অন্ধকার। কুলু থেকে মানালি বেশি সময় লাগে না। পথও মাগুর মতো বিপজ্জনক নয়। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে মোটেই ভাল লাগে না। তা ছাড়া এখন পায়ে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। এইসময় কণ্ঠস্বর তার আসন ছেড়ে পেছনের দিকে এগিয়ে এল। তারপর একজন যাত্রীর দিকে হাত বাড়াল, “আপ-কা টিকিট?”

“নো মানি।”

জড়ানো গলায় উচ্চারণ শুনে অর্জুন চমকে পেছনে তাকাল। আর তাকাতেই তার চক্ষুস্থির। একটি বছর পঁচিশের যুবক দুটো কাঁধ ঝাঁকিয়ে

হাসল। তার গায়ে একটা পাতলা পুলওভার, আর মুখভর্তি দাড়ি। অগোছালো রুখু চুল আর শরীরে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। এবং লোকটির কাঁধে একটা ঝোলা। লালচে দাঁত বের করে লোকটি বলল, “নো মানি।”

“রুপিয়া নিকালো।” কণ্ডাক্টর খিঁচিয়ে উঠল। তার চড়া ভাষায় বোঝা গেল, এইসব বুট-ঝামেলা এই লাইনে লেগেই আছে। টিকিট চাইলেই বলবে পয়সা নেই। অথচ মানালিতে গেলেই দেখা যাবে চুটিয়ে নেশা করছে। সে এই লোকটির কোনও কথা শুনতে রাজি হচ্ছিল না। বাসে যে ক’জন যাত্রী আছেন, তাদের বেশ মজা লাগছে ঘটনাটা দেখতে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার ক্লান্তি যেন এই রঙ্গে সামান্য দূর হচ্ছে।

কণ্ডাক্টরের কথায় জানা গেল, লোকটি উঠেছে কুলু থেকে। তার উচিত ছিল ওঠার সময়েই বাধা দেওয়া। সে কঠোর গলায় জানাল, টিকিট না কাটলে এই বরফের মধ্যে সে সাহেবকে নামিয়ে দিয়ে যাবে। আট টাকা তার চাই।

বরফ শুনে চমকে উঠল অর্জুন। সে জানলা দিয়ে বাইরে চট করে দেখার চেষ্টা করেও বিফল হল। তারা কি বরফের রাজত্বে চলে এসেছে! তার খেয়াল হল বাস এখন আদৌ দ্রুত চলছে না। সেটাও কি বরফের জন্যে?

কণ্ডাক্টরের শাসনি শুনে লোকটা উঠে দাঁড়াল। তারপর বাসের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেউ আমাকে আট টাকা দিতে পারো?”

কোনও যাত্রী এর উত্তর দিল না। লোকটা খানিক চেয়ে থেকে কাঁধ নাচাল। এটা বোধহয় ওর মুদ্রাদোষ। তারপর ঝোলা থেকে বাঁশির সাইজের একটা লাঠি বের করে চিৎকার করল, “লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমার সঙ্গে বিক্রি করার মতো কিছুই নেই। এই ছোট্ট লাঠিটা কেউ আট টাকায় কিনবে?”

অর্জুন দেখল। লোকটা বোকাসোকা গোছের নাকি। ওই ছোট্ট লাঠি কেউ আট টাকায় কিনবে কেন? বিষ্টুসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, “ঘুরে-ঘুরে ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আহা।”

কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে হতাশ ভঙ্গিতে লোকটা কণ্ডাক্টরকে বলল, “বেশ, এই লাঠিটা নিয়ে তুমি আমাকে টিকিট দাও।”

কণ্ডাক্টর খুব রেগে গিয়ে বলল, “যার দাম চার আনাও হবে না, তাই দিয়ে তুমি আট টাকার টিকিট চাও? সাপের পাঁচ পা দেখেছ?”

লোকটা লাঠিটা নাচাল, “এটা তুমি নেবে না?”

কণ্ডাক্টর মাথা বাঁকাতেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। লাঠির যে প্রান্ত লোকটার হাতে ধরা ছিল, সেখানে কিছু কায়দা করতেই একটা সরু এবং ধারালো ইস্পাতের ফলা বেরিয়ে এল। সেটি লম্বায় অন্তত ইঞ্চি-দশেক হবেই। বাসের আলোয় সেটিকে চকচকে এবং হিংস্র দেখাচ্ছিল। লোকটির মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটল, “নাউ, হোয়াট ডু যু ওয়ান্ট? এটাকে নিতে ইচ্ছে করছে?”

কণ্ডাক্টর তো বটেই, বাসের সমস্ত যাত্রী এই ম্যাজিক দেখে হাঁ হয়ে গেল।

লোকটা এমন ভঙ্গিতে তার অস্ত্র ধরে আছে যেন সে কাউকে পরোয়া করে না ।

বিটুসাহেব বলে উঠলেন, “ডেঞ্জারাস ।”

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বলল, “নট অ্যাট অল ।” আর চকিতেই ইম্পাতের ফলাটা সুড়ত করে লাঠির মধ্যে মিলিয়ে যেতেই লোকটি নিজের আসনে শান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল । কণ্ঠস্বর এবার হাসল, “দিজিয়ে ।” সে একটা টিকিট ছিড়ে লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিল । সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা ঘাড় নাড়ল, “নো ! এখন এর দাম একশো টাকা । তার এক পয়সা কম নয় । তখন নিলে আট টাকায় হয়ে যেত । আট টাকা কেটে নিয়ে বিরানব্বুই দিয়ে এটা নিতে পারো । ও. কে. !”

কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করল । কিন্তু লোকটি কিছুতেই রাজি হল না । অর্জুন লক্ষ করছিল এখন কণ্ঠস্বর সেই দাপটের গলায় কথা বলছে না, লোকটিকে নেমে যেতে বলছে না । লোকটি নির্বিকার ভঙ্গিতে লাঠি ঝোলায় রেখে বসে আছে । কণ্ঠস্বর বেচারা মন খারাপ করে ফিরে যেতে যেতে অর্জুনকে বলল, “নসিব ! এই হিপীদের কে বুঝবে বলো ? আগে যদি জানতাম তাহলে কি দাঁওটা ছাড়তাম ।”

অর্জুন লোকটিকে দেখল । এক ফোঁটা মেদ নেই । এই আমেরিকান যুবকটি সত্যিকারের হিপি তো ! পাক্‌দের বর্ণনার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই । একমাত্র নোংরা এবং অগোছালো চেহারা ছাড়া একে হিপি ভাববারও কোনও কারণ নেই ।

মানালিতে যখন বাসটা থামল, তখন ঘড়িতে রাত আটটা । দরজা খুলতেই তাতার-দস্যুর মতো ঠাণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসের ভেতরে । বিটুসাহেব একটা বাঁদুরে-টুপি মাথায় গলিয়ে নিয়ে বললেন, “এ যে দেখছি উত্তর মেরু ।”

লাইনে দাঁড়িয়ে বাস থেকে নামতে হল ! এবং মাটিতে পা দিয়েই অন্যরকম অনুভূতি হল । পায়ের তলায় কাঁচের মতো চকচকে কিছু ! সামনে পেছনে সর্বত্র একটা সাদাটে ভাব । আর ঠাণ্ডাও তেমনি । সন্ধ্যাবেলায় এখানে বরফ পড়েছে নতুন করে, এরকম কথাবার্তা শোনা গেল ! সেই হিপিটি নামতেই বিটুসাহেব এগিয়ে গেলেন, ‘হেলো মাই বয় । আই ওয়ান্ট দ্যাট ।’

এর মধ্যে কখন যে তিনি একশো টাকার নোট বের করেছেন দ্যাখনি অর্জুন । এখন সেটা লোকটির নাকের ডগায় নাচালেন বিটুসাহেব । সাহেবেরও বোধহয় ঠাণ্ডাটা সহ্য হচ্ছিল না । তবু উৎসুক চোখে একবার তাকিয়ে ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে লাঠিটা বের করে বিটুসাহেবের হাতে ধরিয়ে দিতে তিনি নোটটা হাতছাড়া করলেন । এবার বেশ বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরে এলেন অর্জুনের কাছে । “দারুণ দাঁও মারলাম, ঠিক আছে ? খুব প্রয়োজনীয় জিনিস । নাউ আই ফিল রিয়েল স্ট্রং । পাক্-ফাক্‌দের কেয়ার করি না, এলেই গুপ্তি চালাব ।”

“শুষ্টি ?”

“ইয়েস । গুপ্ত অস্ত্র ।”

এই সব কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন ঠকাঠক শব্দ কানে আসছিল । অর্জুন নিজের দাঁতের ওপর দখল রাখতে পারছিল না । যাত্রীরা দ্রুত যে যার নিজের জায়গায় চলে যাচ্ছে । এর মধ্যে কিছু দালাল লেগে গিয়েছিল বিভিন্ন হোটেলের বার্তা শোনাতে । এদের মধ্যে একজন বঙ্গসন্তানও আছে । অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, “পালবাবুর হোটেলের রাস্তাটা কোনদিকে ?” নাম শুনে বঙ্গসন্তান মাথা নাড়ল, “খবরদার যাবেন না স্যার, অত্যন্ত ঝুঁচা হোটেল । খাবারদাবার খুব খারাপ । তারপর শোয়ার ব্যবস্থাও মোটেই ভাল নয় । তার চেয়ে চলুন হোটেল শান্তিনিকেতনে । মন ভরে যাবে ।”

“শান্তিনিকেতন ? আপনার হোটেল ?” বিষ্টুসাহেব নাম শুনে পুলকিত হলেন ।

হ্যাঁ স্যার । আমিই পার্টনার । দু’পাও হাঁটতে হবে না । এই বাস স্ট্যান্ডের ওপরেই ।”

অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল । তাদের পালবাবুর হোটেলের ওঠার কথা, অন্য হোটেল যত ভালই হোক, শুনে কী হবে ? পালবাবুর হোটেলের হৃদিস জেনে নিয়ে ওরা ওপরে উঠছিল । পায়ের তলায় যে বরফের আস্তরণ, এই রাত্রেও যে চারধারে সাদাটে দেখাচ্ছে বরফ পড়ার কারণে, তা বুঝে রোমাঞ্চিত হল অর্জুন । এতকাল শুধু বরফ পড়ার গল্প শুনে এসেছে, বিদেশি ছবিতে দেখেছে, এখন চোখের সামনে সেই একই দৃশ্য । সে বলল, “কী সুন্দর, না ?”

ঠকঠকে আওয়াজ দাঁতে নিয়ে বিষ্টুসাহেব বললেন, “ঠিক আছে ।”

চওড়া রাস্তাটার ওপরে ওঠার সময় অর্জুন দেখতে পেল, বিশাল একটা গাছের তলায় আলো জ্বলছে । আলোটা বাঁধানো গোল বেদীর ওপরে । সেই আলোকে ঘিরে জোর বাজনা চলছে । দুরন্ত নাচ নাচছে কিছু মানুষ । তারা ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না । লাল আলো তাদের শরীরে পিছলে পিছলে যাচ্ছে । এই দারুণ ঠাণ্ডার তোয়াক্কা করছে না তারা । বিষ্টুসাহেব হাঁ হয়ে গেলেন দেখে । সংখ্যায় জনা আটেক হবে । ওদের দাঁড়াতে দেখে একজন চিৎকার করে উঠল নাচতে নাচতে, “হা-ই !”

বিষ্টুসাহেব সসঙ্কোচে বললেন, “ঠিক আছে ।”

পালবাবুর হোটেল মাঝারি মানের, কিন্তু মোটেই ঝুঁচা নয় । খোঁজ করতেই শোনা গেল, ওদের জন্যে একটা ডাবল-বেড ঘর রাখা আছে, যার জানলা খুললেই বরফের চূড়াগুলো ঘরে ডুকে পড়ে । পালবাবুর বয়স চল্লিশের আশেপাশে, কিন্তু প্রথমত দর্শনেই মনে হল, চমৎকার ফুর্তিবাজ মানুষ ।

বললেন, “এই ঠাণ্ডায় যারা আসেন তাঁরা পাগল। আর পাগল ছাড়া ভগবানকে কে দেখতে পায়!”

বিষ্টুসাহেব ঘরের আরামে একটু ধাতস্থ হয়ে শুধোলেন, “ভগবান?”

পালসাহেব হাসলেন, “জানলা খুলে তাকান, দেখতে পাবেন।”

খাওয়াদাওয়া শেষ করে লেপের তলায় ঢুকে অর্জুনের মনে হল, পৃথিবীতে এর চেয়ে আরামদায়ক আর কিছুই নেই। আর ঠিক সেই সময়েই জানলায় শব্দ হল। খুব সন্তর্পণে কেউ আঙুলের ডগায় স্কেত করছে। বিষ্টুসাহেব তখনও বিছানাতে বসে বোধহয় কোনও প্রার্থনা করছিলেন, চোখ খুলে বললেন, “কে কোথায়?”

অর্জুন লেপটা মুখের ওপর থেকে নামিয়ে জানলার দিকে তাকাল। চকিতে বিষ্টুসাহেব ব্যাগটা টেনে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লাঠিটা বের করে আনলেন। শব্দটা তখন থেমেছে। বিষ্টুসাহেব লাঠিটা অর্জুনকে দেখিয়ে বললেন, “আর কোনও ভয় নেই। পাক্স কিংবা রঘুডাকাত, আই ডেন্ট কেয়ার! ঠিক আছে?”

এই সময় আবার জানলায় শব্দ হল। এবার একটু ব্যস্ততা ফুটল আওয়াজে। জানলার এপাশে পর্দা থাকায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লাঠিটা বাগিয়ে বিষ্টুসাহেব উঠলেন। অর্জুন উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘাড় নেড়ে বললেন, “আমি একাই দেখছি। হুঁ!”

পর্দা সরাবার পর দেখা গেল কাঁচের গায়ে জল জমে থাকায় বাইরেটা অস্পষ্ট। বিষ্টুসাহেব সন্তর্পণে ছিটকিনি সরাতে সরাতে লাঠিটার মুখ টিপলেন কিন্তু কোনও পরিবর্তন হল না সেটার। এবার জানলা ছেড়ে বারংবার সেটা নিয়ে বাঁকাতে লাগলেন তিনি। অর্জুন দেখল জানলাটা খুলে গেল। এবং ঘরের মধ্যে একজন মানুষ সন্তর্পণে ঢুকে জানলা বন্ধ করতে-করতে বললেন, “এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?”

বিষ্টুসাহেব একটা হেঁচকি তুললেন। তারপর ধপ করে বিছানায় বসে বললেন, “মাই গড! এ কী হল!”

“কী ব্যাপার? হঠাৎ ভগবানকে ডাকাডাকি কেন?” মাথা এবং শরীর থেকে ভারী পোশাকগুলো খুলতে খুলতে অমলদা বললেন।

ততক্ষণে আবিষ্কার শেষ হয়েছে বিষ্টুসাহেবের। তারস্বরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “চিট, চিট। ব্যাটাকে আমি পুলিশে দেব।” রাগের চোটে লাঠিটাকে ছুঁড়ে দিলেন দেওয়ালে। ধাক্কা খেয়ে সেটা মাটিতে পড়ার সময় দুটুকরো হল। অর্জুন সেই খণ্ডদুটোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। একটা নিরীহ ফাঁপা লাঠি, তার মধ্যে কোনও অস্ত্র নেই।

অমলদা সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার?”

বিষ্টুসাহেবের কথা বলার অবস্থা ছিল না। টাকার শোকে যতটা, তার চেয়ে

অনেক বেশি নিজেকে নির্বোধ মনে হওয়ায় তিনি বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিলেন। অর্জুন ঘটনাটার কথা বলল। বাসে আসবার সময় হিঁসাহেব যে গুপ্তি দেখিয়েছিল, বিক্রি করার সময় সেটির বদলে মামুলি একটা লাঠি গছিয়ে দিয়েছে। নেওয়ার সময় তড়িঘড়িতে বিটুসাহেব আর পরখ করে দ্যাখেননি, কারণ জিনিস দুটো একই রকম দেখতে।

অমলদা হাসলেন, “যাক, সাহেবরাও তাহলে এদেশের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে?”

অর্জুন ঘাড় নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “আপনি কোথেকে এলেন?”

“জানলা দিয়ে, দেখতেই তো পেলো। হোটেলের সামনে একজন এখনও ঘোরাফেরা করছে। তাই আপেলবাগান ডিঙিয়ে এদিকে আসতে হল।”

“আপনার জিনিসপত্র?”

“শাস্তিনিকেতন হোটেল। এখন ক’টা বাজে?”

রাত বেশি হয়নি। ঘড়ির কাঁটা সবে দশটা পেরিয়েছে। কিন্তু এই তুষারম্নাত পার্বতশহরের কোথাও কোনও শব্দ নেই। সময়টা শোনামাত্র অমলদা বললেন, “তৈরি হয়ে নাও অর্জুন। বাইরে এখন খুব ঠাণ্ডা। অনেকটা পথ হাঁটাহাঁটি করতে হতে পারে।”

কথাটা শোনামাত্র অর্জুন উত্তেজিত হল। এবার জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অমলদা তাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কোনও দায়িত্ব সে পাচ্ছে না। এরকম ভাল লাগে? তা ছাড়া অমলদার সঙ্গে কিছু কথা আছে যা বিটুসাহেবের সামনে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। যেমন হাতকাটা লোকটার কথা।

শীত খুব, কিন্তু কাজ করার সুযোগ পেলো ওসব মনে রাখা বোকামি। অর্জুন চটপট পোশাক পরে নিতে লাগল। বিটুসাহেব তখনও চুপচাপ খাটের ওপর বসে আছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, খুব আঘাত পেয়েছেন। মানুষ কেন এত অবিশ্বাসের কাজ করে? দু’বার এমন-কিছু বিড়বিড় করলেন।

অমলদা বললেন, “বিটুসাহেব, আপনি আরাম করে শুয়ে পড়ুন। ভোরের মধ্যে যদি না ফিরি, তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ট্যুরিস্ট লজ রেখে সোজা নীচে নেমে যাবেন। ডান দিকে বাস-স্ট্যাণ্ড, আপনি বাঁ দিকের বাস্তাটা নেবেন। কিছুদূর যেতেই আপনি বিয়াসের স্বর শুনবেন।”

“বিয়াস?”

“বিপাশা। পঞ্চনদীর একটি। শব্দ শুনলেই টের পাবেন। দেখবেন বিয়াসের ওপর একটা ব্রিজ রয়েছে। সেইটে পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর বাঁ দিকে কিছু দোকানপাট দেখতে পাবেন। সেখানে কেউনা-কেউ আপনাকে আমাদের খবর দিয়ে যাবে। মনে থাকবে পুরো ব্যাপারটা?”

অমলদা বাঁদুরে টুপি মাথায় পরে নিচ্ছিলেন।

“আমি এখন কী করব ?” শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন বিটুসাহেব ।

“ঘুমুবেন ।”

“আমি কি ঘুমুতে এসেছি ?”

“বিটুসাহেব, যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হত, তাহলে নিশ্চয়ই নিয়ে যেতাম । তা ছাড়া একজনকে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হয় । সেই কাজটা আপনি করুন ।”

আপেলবাগান দিয়ে পেছনের রাস্তায় নামতে নামতে অর্জুনের মনে হল, তার শরীরের সমস্ত রক্ত যে-কোনও মুহূর্তে বরফ হয়ে যাবে । পৃথিবীতে এত ঠাণ্ডা পড়তে পারে ভাবা যায় না । সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করার চেষ্টা করল এই মুহূর্তে মেরু-অভিযাত্রীরা কীভাবে কাজ করছেন ? এক্সিমোরা কেমন করে বেঁচে থাকেন ? অতএব সে কেন পারবে না ? নিজের মনের জ্বরে বাইরের শীত তাড়াতে চাইল সে ।

দাঁতে দাঁত চেপে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আমরা কোথায় যাচ্ছি ?”

“বিয়াসের কাছে । নদীর নাম বিয়াস, সত্যিই চমৎকার । তোমার ঠাণ্ডা লাগছে ?”

“সামান্য ।”

“তুমি ইচ্ছে করলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে পারো । ওতে গরম হবে ।”

অর্জুন চমকে গেল । অমলদা যে তাকে সিগারেট খাওয়ার কথা বলবেন, তা সে ভাবতেই পারেনি । সেটা অনুমান করে তিনি বললেন, “এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই । তুমি মাঝেমধ্যে যে খাও, তা আমি জানি ।”

অর্জুন বলল, “না, মানে, আমার সেরকম দরকার নেই ।”

ওরা ঢালু জমি দিয়ে নেমে আসছিল । এটা ঠিক রাস্তা নয় । পায়ের তলায় চকচকে বরফ ।

গাছের আড়াল সরে যেতে অর্জুন চমকে উঠল । চারপাশের পাহাড় বরফ মেখে যেন হাতের কাছে নেমে এসেছে । তার সাদায় চোখ স্থির হয়ে যায় ।

অমলদা ফিসফিস করে বললেন, “সুন্দর !”

কিন্তু অর্জুনের মনে হল আরও কিছু বলা দরকার । অন্য একটা শব্দ, যা ‘সুন্দর’কেও ভ্রান করে দেয় । এইসময় অমলদা বললেন, “আমরা এবার পিচের পথটা ধরছি । যদিও ওখানে বরফ পড়েছে, তবু সহজে হাঁটা যাবে ।”

মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই বাজনাটা শুরু হল । তীব্র বাজনা । যে সুব জানে না, সেও বুঝবে উন্টোপাল্টা বাজছে । সেই সঙ্গে উল্লসিত চিৎকার । কিছুটা এগিয়ে ওরা সেই দৃশ্যটা দেখতে পেল । বাস থেকে নেমে হোটেলে যাওয়ার পথে ওরা এই জায়গা দিয়ে যখন গিয়েছিল, তখন আগুনের লাল

আভায় যাদের দেখেছিল, তারা এখন আরও উদ্দাম হয়েছে। অর্জুন লক্ষ করল, তিনটি মেয়ে আছে ওদের মধ্যে। দুজনকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে তারা ভারতীয়। এবং এই দু'জন বাজনার তালে তালে বেশি লাফালাফি করছে।

অমলদা বললেন, নিচু গলায়, “বাজনাটা চিনতে পারছ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল। না।

“এটাকে পাঙ্ক মিউজিক বলে।”

“কিন্তু ওদের তো পাঙ্কদের মতো দেখতে নয়।”

“না। কারণ, এখানে সেটা সম্ভব নয়। এরা হিপীদের মতো থাকতে চাইছে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। ইন ফ্যাক্ট, মানালি হিপীদের জন্যেও বেশ নাম করেছে। কিন্তু আজ অনেক খোঁজ করেও আমি যমজ ভাইবোনের হদিস করতে পারিনি। বিল তাহলে চণ্ডীগড়ে কেন আসছিল?”

চকিতে অর্জুনের মনে জোড়া-টুপি ভেসে উঠল। তারা সেই যমজ ভাইবোন নয় তো? জিনা আর জিন। কিন্তু জিনা আর জিন তো পসু নয়। জোড়া-টুপি পসু ছিল। সেটা যদি অভিনয় হয়, তাহলে আলাদা কথা। সে ঘটনাটা নিচু গলায় অমলদাকে জানাল। অমল সোম উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “ওরা কুলুতে সন্কেবেলায় নেমেছে? তুমি ওদের মুখ দেখেছ?”

“ভাল করে দেখিনি। একজনের টুপি পড়ে গিয়েছিল। ন্যাড়া মাথা। মুখের ভঙ্গিও স্বাভাবিক নয়! আসলে পসু বলে আমি ঠিক...”

অমলদা বললেন, “ইনভ্যালিড জোড়া-সাহেব কখনও ন্যাড়া হয়? তবে কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে জিন আর জিনা এখানে এসে পৌঁছে যাবে আজ রাত্রেই। অবশ্য আর তাদের ভেক্ ধরতে হবে না।”

অনেকক্ষণ ধরে যে কথাটা পাক খাচ্ছিল, সেটাই জানতে চাইল অর্জুন। “অমলদা, সীতার খবর পেয়েছেন? ও কি এখানে আছে?”

অমলদা মাথা নাড়লেন, “সেইটে জানার জন্যে আজ রাত্রে বেরিয়েছি।”

অর্জুন আগুনের সামনে নৃত্যরত দলটাকে দেখল। এত রাত্রে এরা কী আনন্দে এমন ঠাণ্ডায় নেচে যাচ্ছে, তার তা মাথায় ঢুকছিল না। ভারতবর্ষের যে-কোনও জায়গার থেকে মানালি কেন এত প্রিয় হল ওদের, তাও বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন একটা উত্তর তৈরি করে নিল, মানালির আবহাওয়ার সঙ্গে বোধহয় ওদের দেশীয় আবহাওয়ার মিল আছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “পুলিশ ওদের নাচতে দিচ্ছে?”

“নাচা কি অপরাধ?”

অর্জুন বাসের সেই হিপিটিকে খুঁজল। লোকটা যা করেছে, তাতে পুলিশ ধরতে পারে অনায়াসে। কিন্তু লোকটা এখানে নেই। ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে সরে এল দলের ভেতর থেকে। চুপিসারে। মনে হল, ও যে বেরিয়ে এল তা কাউকে লক্ষ করতে দিল না। অমলদা ফিসফিস করে বললেন, “ওকে ২০২

অনুসরণ করো। যদি কোনও বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, সেখানে আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে, তারপর হোটেল ফিরে যাবে।”

অর্জুন আর দাঁড়াল না। এই প্রথম সে একটা কাজের মতো কাজ পেল। মেয়েটি ততক্ষণে তরতর করে হেঁটে গেছে অনেকটা দূর। বোঝা যাচ্ছে, এখানকার পথঘাট ওর ভাল করে চেনা। অর্জুন দ্রুত পা চালাতে গিয়ে আছাড় খেতে-খেতে সামলে নিল। পায়ের তলায় বরফ জমছে। পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়ছে এখন। নিজের শরীরের দিকে এক পলক নজর যেতেই মজা লাগল। মোটা শীতবস্ত্রের ওপরটা সাদাটে হয়ে গেছে এতক্ষণে। কিন্তু বেশি জোরে হাঁটা যাবে না। সামনের মানুষটা যেন টের না পায় যে, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে এই রকম ব্যবধান রেখে এগোতে হবে।

॥ এগারো ॥

মেয়েটি এবার বাঁ দিকে বাঁক নিতেই অর্জুন বুঝল, ডানদিকেই বাস স্ট্যান্ড। কিন্তু এই রাতে মানালির পথে একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে মাথা ঝুঁকিয়ে। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না তা মোটেই ভাবছে না।

খানিকটা যাওয়ার পর একটা গর্জন কানে এল। চাপা কিন্তু গভীর। এবং তারপরেই সে দেখতে পেল নদীটাকে। এই শীত এবং বরফ-জমানো ঠাণ্ডাতেও জল পড়ছে পাথরের ওপর আছড়ে। শব্দ হচ্ছে তাই। নদী মোটেই চওড়া নয়, কিন্তু তার জলের গতি খুব। বোধহয় সেই কারণেই নদী বরফ হয়ে যাচ্ছে না।

মেয়েটি বাঁক নেবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর সন্তর্পণে পেছন ফিরে তাকাল। অর্জুন তৈরি ছিল। মেয়েটি দাঁড়ানো মাত্র সে একটা গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারল, মেয়েটি সন্দেহ করেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, শুধু সতর্কতার জন্যে পেছন ফিরে তাকিয়েছে।

অর্জুন দেখল মেয়েটি আবার হাঁটা শুরু করেছে। নদীর ওপর সেতু, মেয়েটি সেতুর ওপর দাঁড়াল। যেন মুগ্ধ হয়ে নির্জন নিসর্গ দেখল। তারপর দ্রুত হাঁটতে লাগল ওপাশের পাহাড়ের রাস্তায়। এই পথটুকুতে কোনও আড়াল নেই। নদীর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অথচ মেয়েটি বেশি দূরে চলে গেলে অনুসরণ করা বিফলে যাবে।

অর্জুন ঝুঁকি নিল। মাথা নিচু করে সে দ্রুত চলে এল সেতুর ওপরে। কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখানে। অর্জুনের মনে হল ওর মুখ অসাড়। তারপর সামনের পথে পা দেওয়ামাত্র মেয়েটিকে দেখতে পেল। বাঁ দিকের একটা বিশাল কাঠের বাড়ির মধ্যে যেন মুহূর্তেই উবে গেল সে। বাড়িটার গায়ে কয়েকটা ভাঙাচোরা

কাঠের দোকান আছে। দোকানগুলোকে এখন ভুতুড়ে বলে ঠেকছে। এখানে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এবং তারপর অমলদার নির্দেশমতো ফিরে যাওয়ার কথা। পাহাড়ের একটা খাঁজ দেখে অর্জুন যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াল।

পেঁজা বরফ খুব নিঃশব্দে পড়ে না। কান পেতে শুনে তারও একটা মৃদু শব্দ পাওয়া যায়। যতক্ষণ হাঁটাইটি ছিল, ততক্ষণ এরকম, দাঁড়ানোর পর ঠাণ্ডা দ্বিগুণ হল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাঁপছিল অর্জুন। এমন সময় সেতুর ওপর দুজন মানুষ দেখা গেল। সেই দুজনের পেছনে আরও দুজন। চারটে চলন্ত কালো দাঁড়ি যেন। ক্রমশ ওরা সামনে এগিয়ে এল। প্রথম দু'জন যে পুরুষ, তা বোঝা যায়। পেছনের একজন মহিলা এবং ... অর্জুন ঢৌক গিলল। এরাই তাহলে জন আর জিনা। হুবহু এক মুখ, যেরকমটা ফোটোগ্রাফে দেখেছিল। যমজ ভাইবোন। লোকদুটোর সঙ্গে হেঁটে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল।

অর্জুনের এবার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। এই ঠাণ্ডা, এবং ঘটনা যেভাবে বাঁক নিচ্ছে, তাতে, ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। চারধারে একটা পানসে আলো, যাতে সব কিছু রহস্যময় মনে হচ্ছে। ঠিক তখনই একটা আর্ত চিৎকার বাড়িটা থেকে ভেসে আসতে গিয়েই যেন থমকে গেল। চিৎকারটা এমন যে, বুকের মধ্যে কিছু ছটফটিয়ে উঠল। তারপরেই অর্জুনের খেয়াল হল চিৎকারটা কোনও মেয়ের গলা থেকে বেরিয়েছে।

অর্জুন বাড়িটার দিকে তাকাল। প্যাগোডা ধরনের কাঠের বাড়ি। ছাদও কাঠের। এবং সমস্ত বাড়ির গায়ে তুষারের আস্তরণ। বাড়িটার গায়েই একটা কাঠের দোকান। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, দোকান এবং বাড়িটার মাঝখানে কিছু একটা নড়ল। যেন কেউ ঢুকে খুব দ্রুত ছায়ার মধ্যে মিশে গেল। আর্তনাদটাকে স্তব্ধ করার পর আর কোনও আওয়াজ বাড়ি থেকে বের হয়নি। রাস্তার এপাশ থেকে ওটাকে নিরীহ এবং ঘুমন্ত বলে ঠেকছে।

ছায়া থেকে একটা দড়ি ছিটকে বেরিয়ে ওপারের কাঠে লেগে গেল হকের কল্যাণে। অর্জুন শব্দ হয়ে দাঁড়াল। কাঠের ওপর তুষার ছিল, কিন্তু তবু অর্জুনের মনে হল সে একটা শব্দ শুনেছে। দড়িটা যে ছুঁড়ল, ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন বৃকল প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে লোকটা অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় প্যাগোডা-বাড়ির ছাদে দড়ি ছুঁড়তে যাচ্ছে কেন লোকটা? তাহলে কি ওই বাড়ির বাসিন্দাদের বিরোধী কেউ?

অর্জুন আরও একটু অপেক্ষা করার পর একটা লোককে এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। লোকটির আপাদমস্তক মোড়া। দড়িটা পরখ করছে। তারপাশে আর-একজন এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। খানিকটা তাকানোর পর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে অর্জুন চমকে উঠে সামলে নিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়তে লাগল রাস্তাটা পেরোবার জন্যে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অমল সোমের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল সে। ঘন তুষারের ওপর দিয়ে দৌড়নো যে কী মারাত্মক, এর মধ্যেই টের পাওয়া গেছে। একটা রিভলভার এবং একটা চুরি ওর দিকে উঠিয়ে আছে। সে কোনরকমে বলল, “আমি অর্জুন।”

অস্ত্রগুলো নামল। অমলদা চাপা গলায় বললেন, “এভাবে দৌড়ে এলে কেন?”

“কেউ নেই।” অর্জুন চাপা গলায় বলল।

“ইউ ডোস্ট নো।” অমলদা যে বিরক্ত হয়েছেন, তা স্পষ্ট বোঝা গেল। “কেউ হয়তো ঘাপটি মেরে রয়েছে। কিছুক্ষণ দেখা যাক।”

অর্জুন নিশ্বাস চেপে অন্য লোকটির দিকে তাকাতে সে হাসল। হাতকাটা স্মাগলার। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে আপাদমস্তক মুড়েছে। শুধু তুষারপাতের শব্দ চলছে। অর্জুন অমল সোমকে বলল, “জন আর জিনা এই বাড়িতে ঢুকছে।”

“স্বাভাবিক।” অমল সোমের ঠোঁট দুটো নড়ল, “তুমি পারবে?”

“কী?”

“বেড়ালের মতো ওই দড়িটা বেয়ে ছাদে উঠে যেতে হবে। সামান্য শব্দ যেন না হয়।

ছাদের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট জানলা...” অমলদা চাপা গলায় কী করতে হবে জানিয়ে দিলেন। আর অর্জুনের মনে হল, এই প্রথম সে ঠিক কাজের মতো কাজ পেল। সে ওই মুহূর্তে ভুলে গেল, এসব কাজের জন্যে তার কোনও ট্রেনিং নেওয়া নেই। অমলদার ইতস্তত ভাবটাকে সে জেদের বশে উড়িয়ে দিল। সেই মুহূর্তে অমলদাদের সমস্যা ছিল ওপরে ওঠা নিয়ে। হাতকাটা ছেলের পক্ষে ব্যালাস রাখা মুশকিল বলে অমলদা নিজেই উঠবেন ঠিক করেছিলেন। অর্জুন আসায় সমস্যা সরল হল।

ছাদের প্রথম পাটে পা রাখার পর অর্জুনের মনে হল, কলজে ফেটে যাবে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, শীত উধাও। দড়ি বেয়ে খাড়া ওঠা যে কঠিন কর্ম, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধু উঠলেই চলবে না, নিঃশব্দে থাকতে হবে। অর্জুন ঝুঁকে দেখল, অমলদারা নেই। সে এবার ওপরের দিকে তাকাল। কাঠের ওপর বরফ, খাঁজে খাঁজে পরিষ্কার। এই খাড়াই ছাদে হাঁটা যাবে না। দড়িটাকে গুটিয়ে নিয়ে ছাদ থেকে খুলতেই সে হুকটাকে দেখতে পেল। স্টিলের ছোট হকের গায়ে রবার মোড়া।

ফ্রল করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে থমকে গেল অর্জুন। একটা ঘষটানির শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ বেশি হলে বাড়ির ভেতরের মানুষ সন্দেহ করবে। সোজাসুজি পা ফেলা শক্ত। বরফের পিছলে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি, এবং তা হলে শুধু যে হাড়গোড় ভেঙে সে পড়ে যাবে, তা নয়, সমস্ত

পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া তো উপায় নেই।

অর্জুন সামান্য দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ওপরের কার্নিস স্পর্শ করল। তারপর শরীরটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে ওপরে উঠে এসে সতর্ক চোখে তাকাল। চারিদিকের জমাট সাদার ফাঁকে ফাঁকে তুষার জমেনি এমন সব জায়গা উচিয়ে আছে। সেগুলোকেই কালো দেখাচ্ছে। বিদেশি ছবির মতো ছায়া এবং আঁধার মাথা দৃশ্য সামনে। হঠাৎ নীচে শব্দ হল। অর্জুন বুঝল দরজা খুলল। একটা আলো বাইরে এসেই মিলিয়ে যেতে অর্জুন কার্নিসের ভাঁজে শুয়ে পড়ল। এবং এই প্রথম সর্বাস্থে তুষার মাখল তার। শরীরের তলায় এবং ওপরে।

তারপরেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। লম্বা ঢ্যাঙা লোকটা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মিনিটখানেক দাঁড়াবার পর সে বাড়িটার দিকে তাকাল। অর্জুনের বুকে দূরমুশ পিটছিল কেউ। নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে ছিল। লোকটা যদি খেয়াল করে, তাহলে ধরা না পড়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু বাড়ির যেদিকটায় অমলদারা ছিল, লোকটা সেদিকে এগিয়ে গেল পকেটে হাত রেখে। অর্জুন জানে, অমলদা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। লোকটা কাউকেই খুঁজে পাবে না।

মিনিটখানেক কেটে যাওয়ার পর আবার লোকটাকে দেখা গেল। এবার সে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে গেল। অর্জুন ওপরে যাওয়ার জন্যে শরীর তুলতেই বুঝতে পারল হাত পা জমে গেছে সাড় নেই।

প্রায় মিনিট দশেকের চেষ্টায় সে যখন ধোঁয়া অথবা আলোর জন্যে তৈরি কাচের জানলাটার পাশে এসে দাঁড়াল, তখন তার চেহারা চেনা শক্ত হত। সমস্ত শরীরে সাদা স্ট্যাম্প পড়ে গেছে। অর্জুন জানলার কাছে চোখ রেখে কিছুই দেখতে পেল না। বাপসা কাচটা ধরে একটু জোরে চাপ দিতেই সেটা নড়তে লাগল। কিছু তুষার বুপবুপ করে গড়িয়ে পড়ল ছাদে। অর্জুন কিছুক্ষণ সিঁটিয়ে বসে থাকল। তারপর আবার কাচটা ধরে টানতে লাগল। হয়তো পুরনো বাড়ি বলে কিংবা ফ্রেমটা কমজোরি হয়ে আসায় হঠাৎ কাচ খুলে এল হাতে। সন্তুর্ণণে একটা খাঁজে কাচটাকে শুইয়ে রেখে অর্জুন মুখ ঢোকাল গর্তে।

অর্জুন চারপাশে আবার নজর বোলাল। সাদা লেপ মুড়ি দিয়ে রয়েছে মানালি। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে ধীরে-ধীরে গর্তের খাঁজে পা রাখল। জায়গাটা ঘূটঘূটি, অন্ধকার। তবু খাঁজে-খাঁজে পা রেখে সে অনেকটা নেমে আসতে পারল। আর তারপরই টের পেল পায়ের তলায় কিছু নেই। অর্থাৎ সে ঘরের ছাদের সীমায় চলে এসেছে। কোনওরকমে চেষ্টা দিয়ে না-দাঁড়ানো না-বসা অবস্থায় অর্জুন নীচের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না।

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল। কেউ দ্রুত হাতে দরজা খোলা মাত্র একটা

আলো ঘরে এল ! টাকমাথা কিংবা ন্যাড়া একটা শরীর সেই আলো নিয়ে দু'পা এগিয়ে জিপ্তেস করল, “হাই ! হোয়াটস্ রং ?”

নিশ্বাস বন্ধ করে শূন্যে বুলন্ত অবস্থায় অর্জুন দেখল, ঘরে একজন শুয়ে আছে । প্রশ্ন করা সত্ত্বেও সে কোনও উত্তর দিল না । গলা শুনে ততক্ষণে অর্জুন বুঝে গেছে, প্রশ্ন যে করেছে, সে মেয়ে । মেয়েটি আর একটু আলো তুলে এগিয়ে এল, “আমি আর জন আজ এখানে পৌঁছে গেছি । তুমি কেন পাগলামি করছ ? জীনটাকে উপভোগ করো । একটু পরেই একজন গুরু আমাদের হোলি লেকচার দেবেন, তুমি শুনবে ?”

উত্তর না পেয়ে মেয়েটি রাগত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে । ও যদি একবারও ওপরের দিকে তাকাত তাহলে আর রক্ষে থাকত না । অর্জুন এবার প্রচণ্ড হাততালির শব্দ শুনতে পেল । আশপাশের কোনও ঘর থেকেই ওই শব্দটা এল । জন এবং জিনা । এই মেয়েটি তাহলে জিনা । এরাই পসু সেজে এল ? মাথা আগেই কামানো ছিল ? নিজেকে খুব বোকা মনে হল ।

মিনিট তিনেক যাওয়ার পর অর্জুন কোমর থেকে দড়িটা খুলে হুকটা জড়িয়ে রাখল গর্তে খাঁজে । তারপর দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল নীচে । স্বচ্ছন্দে তার পা ঠেকে গেল নীচের কাঠের মেঝেতে । দড়িটা ওপর থেকে ঝুলছে, লুকোবার কোনও জায়গা নেই ।

ঠিক তখনই ইংরেজিতে প্রশ্ন হল, “কে ?” খুব ক্ষীণ গলার স্বর । অর্জুন আবছা শরীরটার কাছে পৌঁছে চাপা গলায় বলল, “সীতা ! আমি অর্জুন ।”

“হু দ্য হেল আর যু ?” এবার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ।

“সীতা ! তুমি সীতা নও ?”

“হ্যাঁ ।”

“আমি অর্জুন । কালিম্পাংয়ে তোমাদের বাড়িতে ছিলাম ক’দিন । তোমার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন । তোমার কিছু মনে নেই ?” অর্জুন যেন দিশেহারা ।

“আই সি ! সেই অর্জুন ! তুমি মহাভারত, আমি রামায়ণ, এক জায়গায় এলাম কী করে ? দে উইল কিল যু । পালাও ।”

“তোমার বাবা আমাদের ডেকেছেন তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ।” কথা বলতে বলতে অর্জুন এবার বাঁধনগুলো দেখতে পেল । সীতার দুটো পা এবং হাত বাঁধা । আবছা আঁধারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু শরীরের আদল স্পষ্ট ।

“তুমি এখানে কী করে এলে ?” সীতার কণ্ঠস্বর এবার অন্যরকম ।

অর্জুন আর কথা না-বাড়িয়ে দ্রুত বাঁধন খুলে দিল, “তোমার এই অবস্থা কেন ?”

“আজ শেষ দিন ছিল ।”

“কিসের ?”

“আমি যদি ওদের সঙ্গে ফিরতে না চাইতাম, তাহলে আজ রাগেই...”

সীতার গলা কেঁপে উঠল। অর্জুন ওকে ধরে দাঁড় করাল। দীর্ঘদিন শুয়ে থাকায় বেচারার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। ওকে বসতে বলে অর্জুন নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল। সামনেই লম্বা করিডর। একটা বড় মোমবাতি জ্বলছে। তারই কাঁপা আলোয় অর্জুন খানিকটা এগোতেই একটা দরজার পাশে দাঁড়াতে চমকে উঠল। বেশ বড় হলঘর। পাক্সরা ঘরের মেঝেতে শুয়ে-বসে রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে মাদকদ্রব্য। এবং ঘরের এক প্রান্তে বেদীর ওপর যিনি বসে আছেন দুই শিষ্যসমেত, তাঁকে চিনতে অসুবিধে হল না। সাধুবাবা বেশ নেশাগ্রস্ত। শিষ্যরাও তুলতুলু। হঠাৎ একটা লম্বা ঢ্যাঙা ন্যাড়া মাথার পাক্স উঠে দাঁড়াল, “বয়েস অ্যান্ড গার্লস! আজ আমাদের শেষ দিন। এই তিনটে লোককে আমরা বেশ মোটা টাকা দিয়েছি। এদের সাধু বলে। আমাদের শেণ্টারের জন্যে এদের দরকার ছিল। কিন্তু আমরা এখন বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়ব। করাচি এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের প্লেন ধরতে হবে। নাউ, সাধুবাবা, তুমি কিছু বলবে ?”

সাধুবাবা নড়েচড়ে বসলেন, “খাও-পিও-আউর জিও!” একজন শিষ্য বাক্যটার ইংরেজি অনুবাদ করে দেওয়ামাত্র হুল্লোড় উঠল ঘরে। ঢ্যাঙা লোকটা তীব্র শিষ্য দিয়ে উল্লাস থামাল, “নো শাউট! আজ দুপুর থেকে আমরা অস্বস্তিতে আছি। আমাদের বন্ধুদের কালিম্পিংয়ে যার জন্যে ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছিল, সেই লোকটা আজ এখানে এসেছে। সে এসেছে একটা বালক আর এক বৃদ্ধকে সঙ্গী করে। বালকটিকে পাওয়া যাচ্ছে না, বৃদ্ধটিকে আমরা হোটেল থেকে তুলে এনেছি। ব্রিং হিম!”

অর্জুন হতভম্ব। একটি পাক্স যাঁকে সামনে নিয়ে এল, তাঁকে দেখে ওর জিভ শুকিয়ে গেল। বিষ্ণুসাহেবের অবস্থা বলির পাঁঠার মতো। গায়ে তেমন গরমজামাকাপড় নেই। খরখর করে কাঁপছেন। কপালের ওপর রক্তের দাগ।

ঢ্যাঙা লোকটা ইশারায় ওঁকে দাঁড় করানোর জন্যে নির্দেশ দিতে ঘরে চিৎকার উঠল, “কিল হিম, কিল হিম।”

একটি পাক্স মেয়ে উঠে তীব্র গতিতে ন্যাড়া মাথায় টুস দিতে বিষ্ণু সাহেব কাঠের মেঝেয় পড়ে গেলেন ‘মাগো’ বলে। অর্জুনের খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই ভালমানুষ লোকটাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু আট ন’জন পাক্সের সঙ্গে সে একা পারবে কী করে?

ঢ্যাঙা লোকটা বলল, “অ্যান্ড নাও দ্য মেইন প্রব্লেম। আমরা যাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে পাক্স-জীবনের রীতিনীতি মানতে চাইছে না। তাকে সঙ্গে নিয়ে বর্ডার পার হওয়া অসম্ভব। আর, কোনও অবস্থায় আমরা তাকে এখানে ছেড়ে যেতে পারি না। তাহলে কী করা

যেতে পারে ?”

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার উঠল, “কিল হার, কিল হার ।”

ঢাঙা লোকটা হাসল, “গুড । দেন, একটার পর একটা ।”

অর্জুন দ্রুত ঘরে ফিরে এসে দেখল সীতা নেই । আবছা অন্ধকারে কোথাও সীতাকে দেখতে পেল না সে । তারপর নজরে এল ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা দড়িটাকেও দেখা যাচ্ছে না । সে চাপা গলায় ডাকল, “সীতা !” কিন্তু কোনও সাড়া এল না ।

অর্জুন ওপর দিকে তাকাতে আবছা শরীরটাকে দেখতে পেল । খাঁজে খাঁজে পা রেখে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে । অর্জুন আবার ডাকল, “সী-তা... !” ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হতে সে দ্রুত দেওয়ালের পাশে চলে গেল । একটি ন্যাড়ামাথা বেঁটে ছেলে ঘরে ঢুকল । তারপর খাটের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কতদিন তোমাকে প্রপোজ করেছি, তুমি শোনোনি, আজ তার হিসেব চুকিয়ে দেব ।” কথাগুলো জড়ানো ইংরেজিতে হলেও মানেটা ধরতে পারল অর্জুন । আর সময় নষ্ট না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর । দু’হাত জড়ো করে ঘাড়ের ওপর আঘাত করতেই কাটা কলাগাছের মতো লোকটা মাটিতে লুকিয়ে পড়ল । এই আঘাত করার ধরনটা অমলদা শিখিয়েছিলেন তাকে । এতে অন্তত আট ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফেরার কথা নয় । লোকটাকে টেনে এক কোণে সরিয়ে রেখে সে আবার মাঝখানে চলে এসে ডাকল, “সীতা, দড়িটা ফেলে দাও ।”

“হাই রিক্, হোয়াট হ্যাপেন্ড ?”

আর-একটি শরীর দরজায় এসে দাঁড়াতে অর্জুন বুঝল আর পরিত্রাণ নেই । লোকটা কি তাকে দেখতে পাচ্ছে ? নবাগত পাঙ্ক চট্টল পায়ে ঘরে ঢুকে খাটের দিকে এগিয়ে যেতে অর্জুন ঝাঁপিয়ে পড়ল । আচম্বিতে লোকটা এমন অবাক হয়ে গেল যে, কোনও প্রতিরোধ করার কথা ভাবতেই পারল না । দ্বিতীয় লোকটিকে শুইয়ে দিয়ে অর্জুন অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস পেল । এই প্রথম সে দুটো মানুষকে পরাজিত করল । দুজনই আমেরিকান । কিন্তু আর সময় নেই । ওঘরে এখনও সাতজন আছে । সে গলা তুলল, “সীতা, দড়িটা ফেলে দাও !”

“নো ।” সীতার চাপা গলা শুনতে পেল, “আমি কাউকে বিশ্বাস করি না ।” তারপর আর তাকে দেখা গেল না ।

এই সময় বাইরে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল । এবং তারপরেই গুলির শব্দ । অর্জুন দ্রুত দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখল ঢাঙা লোকটা চিৎকার করছে, “পেছনের দিকে চলে যাও ! পুলিশ ঘিরে ফেলেছে । পেছনের দরজা দিয়ে যে যেখানে পারো পালাও ।”

হুড়মুড় করে পাঙ্করা ছুটে গেল পেছন দিকে । এবং তখনই দরজা ভাঙার শব্দ হল । অর্জুন এই সময় কাঠের লম্বা টুলটাকে দেখতে পেল । টানতে

২০৯

টানতে সেটাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল সে। কথা ছিল এখানে আসার পনেরো মিনিটের মধ্যে সে যদি দরজা না খুলে দিতে পারে, তাহলে অমলদা আর অপেক্ষা করবেন না। এখন সামনে দিয়ে যাওয়া বিপদ। পুলিশ আর পাঙ্কদের লড়াইয়ের মাঝখানে পড়তে হবে। লম্বা কাঠের টুলটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকবার চেষ্টার পর সে সিলিংটা ধরতে পারল। তারপর শরীর ঝুলিয়ে অনেক কষ্টে ওপরের খাঁজে পা রাখতে পারা মাত্র নীচে আতর্নাদ শুরু হয়ে গেল।

ছাদের ঠাণ্ডায় শরীর বের করে অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পুলিশ এবং অমলদা এতক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছেন। সে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে তাকাতে দেখতে পেল, তুষারের ওপর একটা কালো বিন্দুর মতো কিছু ছুটে যাচ্ছে। সে দ্রুত নামতে গিয়ে অনেকটা পিছলে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে সামলে নিতে একটা ছুরি হাওয়া কেটে তার পাশে বিঁধল। ব্যালাস না থাকায় শরীরটা সরে যাওয়ায় সে বিদ্ধ হয়নি। অর্জুন হতভম্ব হয়ে তাকাতে হাতকাটা লোকটাকে দেখতে পেল, “আমাকে মারলে কেন?”

“তুমি? যাবাবা। তুমি ওপর থেকে নেমে আসবে বুঝব কী করে?” ছুরিটা তুলে সে নীচে ছুঁড়ে দিতে অর্জুন লাফিয়ে নামল, “কতক্ষণ এখানে আছ?”

“এইমাত্র। এসেই দেখলাম ওপর থেকে একজন নামছে। ভাগ্যিস লাগেনি! আমি এই প্রথম ট্যাগেট মিস করলাম।” খুব আফসোস যেন গলায়।

অর্জুন কথা বাড়াল না। সে সাদা তুষারের ওপর দৌড়তে লাগল। বিন্দুটা মিলিয়ে যাচ্ছিল, আবার স্পষ্ট হল।

কাছাকাছি হওয়া গেল। কারণ এতদিনের দুর্বলতা এবং পায়ের তলার তুষার সীতাকে চলতে দিচ্ছিল না। অর্জুন চিৎকার করে ডাকল, “সী-তা।”

সঙ্গে সঙ্গে সীতা ঘুরে দাঁড়াল, “খবরদার, এসো না।”

“কেন?” অর্জুন তবু এগিয়ে যাচ্ছিল।

“আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।”

“কেন?”

“আমি বাঁচতে চাই বলে।”

“আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি মরবে না।”

“নো! আমি বিশ্বাস করি না।”

সীতা আবার দৌড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অর্জুন তাকে ধরে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে সীতা প্রাণপণে অর্জুনকে কামড়াতে যেতেই ওর রাগ হয়ে গেল। যতটা জোরে সম্ভব সে সীতার গালে চড় মারল। “তুমি কি পাগল? ড্রাগ খেয়ে কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, আর তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?”

সীতা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল। অর্জুন বলল, “তুমি ভারতীয়, বাঙালি।

সীতা, তুমি ভুলে যেও না, আমার কোনও স্বার্থ নেই। আমি তোমার বন্ধু।”

হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে দুই হাঁটু ভেঙে তুষারের ওপর বসে পড়ল সীতা। “আমি খারাপ হয়ে গেছি, খুব খারাপ।”

দু’হাতে সীতার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, “না। সীতারা কখনও খারাপ হয় না।”



লাইটার

লাইটার

‘রূপমায়া’তে চমৎকার একটা ছবি দেখাচ্ছে। ক্রাইম অ্যাট মিডনাইট।

দুপুরবেলায় আজ অর্জুনের কিছু করার ছিল না। গতকাল সে শেষ ইন্টারভিউ দিয়েছে। প্রতিবার মনে হয়েছে চাকরিটা হয়ে যাবে কিন্তু কখনওই হয়নি। বি.এ. পাশ করে সে এখন সত্যিকারের বেকার। অমল সোম জলপাইগুড়ি শহরে না থাকায় নতুন কোনও কেসও আসছে না। তা ছাড়া অমলদা বেশি কেস নেওয়া পছন্দ করেন না। দিন কুড়ি আগে কালিম্পং থেকে বিষ্ণুসাহেব লিখেছিলেন তাঁর শরীর খুব অসুস্থ। রাত্রে ঘুম হয় না, হাটলে মাথা ঘোরে। ডাক্তাররা পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। চিঠির শেষে বিষ্ণুসাহেব লিখেছিলেন, ‘ঈশ্বরের তৈরি এই পৃথিবীতে আমি শুধু শুয়ে থাকব অর্জুন? বাইরে কত কী ঘটছে, কিছুই দেখতে পাব না? আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, তা মাদার টেরেসাকে উইল করে দিয়ে যাব স্থির করেছি। ঈশ্বরের কাজে লাগুক।’ এই চিঠি পেয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করেছিল বিষ্ণুসাহেবকে কালিম্পংয়ে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু কালিম্পংয়ে যাওয়া-আসায় তো অন্তত তিরিশটা টাকা খরচ। মায়ের কাছে আজকাল টাকা চাইতে লজ্জা করে।

‘রূপমায়া’র সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে হাউসফুল বোর্ডটাকে বুলতে দেখল। কিন্তু তখনই কাটা-গদাইয়ের চোখে পড়ে গেল সে। অর্জুনকে দেখে চিংকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে। জোর করে তাকে সিনেমা দেখাবেই কাটা-গদাই। এই শহরে তার একটা বিশেষ খাতির আছে। শহরের যাঁরা মাথা, তাঁরা স্বীকার করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষ তাকে খুব সমীহ করে। কাটা-গদাই এই সিনেমা হলের চত্বরেই থাকে। বোধহয় টিকিট ব্ল্যাকের ব্যাপারেও তার হাত আছে। কিন্তু সে বলল, “তুমি সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যাবে এটা জলপাইগুড়ির লজ্জা।”

পয়সা দিয়ে টিকিট নিল অর্জুন। কাটা-গদাই রাজি হচ্ছিল না। সিনেমা হলে বসে অর্জুনের মনে হল, এই একটি কারণেই তার চাকরি হচ্ছে না। সবাই

ভাবে ছেলোটো গোয়েন্দাগিরি করে, একে কাজ দিলে কোথা থেকে কী হয়ে যায় ! ছবিটা সত্যি ভাল । মুগ্ধ হয়ে দেখল অর্জুন । অপরাধীকে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না শেষ দৃশ্য পর্যন্ত । ছবি দেখে বেরিয়ে আসছে ভিড়ের সঙ্গে, হঠাৎ কানের পাশে ফিসফিসানি শুনল, “তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে ।”

মুখ ফিরিয়ে সে কাটা-গদাইকে দেখল । কাটা-গদাই বলল, “এখন নয়, পরে বলব ।”

এই শহরে দু’জন গদাই খুব পরিচিত । পোড়া-গদাই আর কাটা-গদাই । সে ছেলেবেলা থেকে ওই নাম দুটো শুনে আসছে । কেন তাদের ওই নামে ডাকা হয়, তা কখনও জানতে চায়নি । কাটা-গদাই তার কাজে চলে গেলে অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল । ঠিক কী বলতে চায় কাটা-গদাই । ওর সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে ? একটু আগে দেখা ছবির ডিটেকটিভকে একটা লোক ওইভাবে এসে বলেছিল, কথা আছে । অর্জুন হেসে ফেলল । নিশ্চয়ই কাটা-গদাই ছবিটা দেখেছে ।

“এই অর্জুন । একবার এসো ।”

ডাকটা শুনে সে বাঁ দিকে তাকাল । চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোরের রামদা তাকে ডাকছেন । অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মানুষ । চেহারা দেখলে কিছুদিন আগে সিনেমার নায়ক বলে মনে হত । কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানোমাত্র রামদা বললেন, “একটু আগে এক ভদ্রলোক অমল সোমের খোঁজ করছিলেন । আমি বললাম, উনি শহরে নেই । তবু হৃদিসটা জেনে নিয়ে চলে গেলেন । খুব জরুরি ব্যাপার বলে মনে হল ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি ভদ্রলোককে চেনেন ?”

“না, না । উনি এই শহরের মানুষ নন । সঙ্গে গাড়ি ছিল ।”

অর্জুন আর দাঁড়াল না । একটা রিকশা নিয়ে সে হাকিমপাড়ায় যেতে বলল । এখন ভরা বিকেল । রোদ নেই । জলপাইগুড়ি শহরে বৃষ্টিটা সবে শেষ হয়েছে । শীত আসতে কয়েক সপ্তাহ দেরি । এই সময় হাঁটতে ভাল লাগে । কিন্তু শহরে অমল সোম নেই জেনেও ভদ্রলোক বাড়িতে গেলেন কেন ? অবশ্যই কিছু লিখে যেতে চাইছেন । অথবা এমনও হতে পারে, অমলদার কোনও বন্ধুবান্ধব । অবশ্য এতকাল সেরকম কেউ আসেননি ।

দূর থেকেই গাড়িটাকে দেখতে পেল সে । ওর গায়ে যে পরিমাণ ধুলো তাতে বোঝা যাচ্ছে সফরটা কম হয়নি । গেট খুলতেই হাবুকে দেখতে পেল । বাগান পরিষ্কার করছে সে । মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে দেখে মুখে হাসি ফুটল তার । ইঙ্গিতে বাইরের ঘরটা দেখিয়ে দিল । অর্জুন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতেই চুরুটের গন্ধ পেল । গন্ধটা মোটেই ভাল নয় । আর তারপরেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি হল ।

বেতের চেয়ারে বসে চুপচাপ চুরুট খাচ্ছেন পঞ্চাশ পার হওয়া মানুষটি ।

বেশ মোটাসোটা, মাথায় টাক, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়া, পরনে ছাইরঙা স্যুট। অর্জুন ঘরে ঢুকে বলল, “নমস্কার। আপনি অমল সোমকে চাইছেন?”

ভদ্রলোক কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন অর্জুনকে পড়ে নিচ্ছিল।

“অমলদা বাইরে গেছেন।”

“খবরটা আমি শহরেই শুনেছি। এখানে এসে ওই নোটিসটা পড়েছি। আমাকে অশিক্ষিত ভাবার কি খুব কারণ আছে?” মুখের অভিব্যক্তি না পালটে চুরুট খেতে খেতে কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক। এবং অর্জুন বুঝতে পারল ইনি সাধারণ নন।

সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, “বলুন, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি। আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী।”

“প্রথমে আমি দুটো প্রশ্ন করব। কোনও গোয়েন্দা তার খবরাখবর দেবার জন্য একটা বোবা লোককে বাড়িতে রাখে কেন?” ভদ্রলোককে খুব উত্তেজিত দেখাল।

অর্জুন হেসে ফেলল, “আমি কিন্তু আপনার নাম জানি না।”

“কোনও দরকার নেই। আমি শুধু একজন কথা বলতে পারে এমন লোকের জন্যে বসেছিলাম। বোবা চাকর রেখে আর যাই হোক গোয়েন্দাগিরি চলে না।”

“প্রথমেই বলে রাখি গোয়েন্দাগিরি আমরা করি না। আমরা সত্যসন্ধানী। হাবু কথা না বলতে পারলেও অমলদা ওকে অতিপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?”

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “মিস্টার সোম কবে ফিরছেন?”

“জানি না। ওঁর ইচ্ছে হয়েছে সারা দেশটা ঘুরে আসবেন।”

“মোস্ট আনপ্রফেশনাল! এই জন্যই দেশটার কিছু হল না। তাহলে আমি চলি!”

“আমি বুঝতে পারছি না এত দূর থেকে এসে আপনি চলে যাবেন কেন?”

“কারণ, যাঁর কাছে এসেছিলাম তিনি নেই বলে।” উঠতে চাইলেন ভদ্রলোক।

“কিন্তু রায়গঞ্জ অথবা মালদা থেকে আসতে অনেক সময় লেগেছে আপনার।”

“কী করে বোঝা গেল আমি কোথেকে আসছি?” ভদ্রলোক উঠলেন না।

“আপনি ডুয়ার্স থেকে আসছেন না। কারণ ডুয়ার্সের রাস্তাগুলো সুন্দর

পিচের, তাতে ধুলো ওড়ে না। দাজিংলিং বা কালিম্পং থেকে নামছেন না। পাহাড়ে ধুলো নেই। কিন্তু আপনার গাড়ির যা অবস্থা তাতে ওই দিক থেকে আসছেন বলে মনে হয়।”

“অনুমান মিলল না। অমল সোমও এইরকম অনুমান করেন নাকি। তাহলে আসাটা বৃথাই হল।” ভদ্রলোক আর বসলেন না। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, “এই শহরে কোনও ভাল হোটেল আছে? আমি টায়ার্ড।”

“ভাল হোটেল নেই। তিস্তা বাংলাতে ট্রাই করতে পারেন।”

অর্জুন ঠুঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কোনও কথা না বলে গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চলে গেলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল। উত্তেজনা নিশ্চয়ই আছে, বোধহয় প্রেশারও ওপরের দিকে। কিন্তু পরিচয়টা দেবার প্রয়োজন মনে করলেন না ভদ্রলোক। হঠাৎ নিজের ওপর তার রাগ হল। আগ বাড়িয়ে বলার কী দরকার ছিল কোথেকে আসছেন ভদ্রলোক। অমলদা যেমন ঠিকঠাক বলে দেন তেমন যদি সে বলতে পারত! তা ছাড়া সে নিজে কেস করতে চাইছে অথচ মুখ ফুটে ভদ্রলোককে সে-কথা বলতেও পারল না।

ঝুপঝাপ অন্ধকার নেমে গেল। দূরে শঙ্খ বাজছে। এ-বাড়িতে অবশ্য সে-বালাই নেই। অর্জুন বারান্দায় উঠে এসে দেখল হাবু আলো জ্বলে দিল। তাকে দেখতে পেয়ে হাবু ওপাশের টেবিল থেকে দুটো খাম এনে সামনে ধরল। ওপরে অমল সোমের নাম লেখা, কোনায় ফ্রম বিট্টুসাহেব। দ্বিতীয়টার ওপরে তার নাম লেখা। এই বাড়ির ঠিকানায় তার কোনও চিঠি আসে না। খানিকটা অবাক হয়ে সে খামটা খুলতেই অমলদার নামটা দেখতে পেল।

‘স্নেহের অর্জুন, তোমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে নিজেরটা ব্যবহার করলাম। কারণ, যখনই কাউকে চিঠি লিখি, তখন তার ঠিকানা লিখতে হয়, নিজের ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর সুযোগ আজ অবধি পাইনি। অবাক হোয়ো না।’

গতকাল বোম্বাইতে এসেছি। একা-একা এই ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগছে। চেনা মানুষ যে একেবারেই সামনে আসেনি তা নয়, কিন্তু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলছি। কবে ফিরব জানি না। হাবুকে টাকা-পয়সা দিয়ে এসেছি। মাঝে-মাঝে নিশ্চয়ই খোঁজ নিচ্ছ। নতুন কোনও কেস পেলে পারো তো কোরো। শুধু দুটো জিনিস মনে রাখবে। কখনও বেশি উৎসাহ দেখাবে না। আর সত্যের সন্ধানে যদি হনলুলুতেও যেতে হয় যাবে।

বিট্টুসাহেবের জন্য মনটা কিছুদিন থেকেই খারাপ। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে গেলেন। উনি কি কোনও চিঠিপত্র দিয়েছেন তোমাকে? আমার নামে দিলেও তুমি পড়তে পারো। বিট্টুবাবু আমাকে একটা আমেরিকান লাইটার উপহার দেবেন বলেছিলেন। জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানির। এ-দেশে

পাওয়া যায় না। ওঁর এক বোন থাকেন নিউইয়র্কে। তাঁকে লিখেছিলেন পাঠাতে। মানুষটি সত্যি ভাল। ওঁকে হারালে পরমাশ্রীকে হারাব। শুভেচ্ছা জেনো। অমলদা।’

চিঠির তারিখ পাঁচ দিন আগের। অমলদা কোথায় যাবেন এরপরে, তার কোনও ইঙ্গিত দেননি। মানুষটি হঠাৎ কেন এমন ভবঘুরে হয়ে গেলেন, ভেবে পায় না অর্জুন।

এবার বিটুসাহেবের চিঠিটার দিকে তাকালো। অমলদা যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন স্বচ্ছন্দে খোলা যেতে পারে।

“মাননীয়েষু, আশা করি ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রেখেছেন। আমি ভাল নেই। হাঁটতে বড় কষ্ট হয়। কালিম্পিংয়ে একা খুব খারাপ লাগছে। তা ছাড়া আপনাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল পাইনি। মনে পড়ে, সেই খুনখারাপি থেকে শুরু করে চণ্ডীগড় পর্যন্ত আমরা কত না রোমাঞ্চিত হয়েছি। ভাল বাংলা লিখতে পারি না বলে মার্জনা করবেন। একটি জরুরি ব্যাপার ঘটেছে। আমার যে বোন নিউইয়র্কে থাকে, সে বায়না ধরেছে যে, আমি যেন তার কাছে চলে যাই। সেখানে সে আমার চিকিৎসা করাবে। আমি জানি এই রোগ বার্ষিকের। কোথাও গেলে সারবে না! কিন্তু বাঁচতে বড় লোভ হয়। এখানকার বাড়িঘর বিক্রি করে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে সেখানেই চলে যাই। একা যেতে সাহস হচ্ছে না। আপনি যাবেন? জানি খুব ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু এই বৃদ্ধ বন্ধুকে সাহায্য করা কি অসম্ভব? আমাদের পাশপোর্ট-ভিসা-টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আপনার সম্মতি পেলেই। ইতি, গুণমুগ্ধ বিটুসাহেব।’

মনটা কেমন হয়ে গেল অর্জুনের। ওইরকম হাসিখুশি মানুষটির এই পরিণতি তার একটুও ভাল লাগছিল না। কিন্তু এখন কী হবে? অমলদা কবে ফিরবেন জানা নেই। এই চিঠির খবরটাও তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার উপায় নেই। সে ঠিক করল বিটুসাহেবকে বিস্তারিত জানাবে।

রাত হচ্ছিল। হাবুকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলবে বলে অর্জুন এগোতেই চোখে পড়ল, চেয়ারের নীচে কী একটা পড়েছে। নীল চকচকে জিনিসটা আলো পড়ায় আকর্ষক মনে হচ্ছে। ঝুঁকে সে হাতে নিতে শীতল স্পর্শ এবং গঠনে বুঝল ওটা একটা লাইটার। এই বাড়িতে লাইটার তো এভাবে পড়ে থাকার কথা নয়। মনে পড়ল, এই চেয়ারে বিকেলের আগন্তুক বসে চুরুট খাচ্ছিলেন। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই, লাইটারটা তাঁর। মানুষটাকে দেখলে মনে হয় না তিনি এত অসতর্ক। সে টেবিলের ওপর লাইটারটা রাখতে গিয়ে পেছনে কয়েকটা অক্ষর দেখতে পেল। একটু কৌতূহলী হয়ে লাইটারটাকে চোখের সামনে ধরতেই স্পষ্ট পড়তে পারল, ‘জোস অ্যান্ড জোস।’

সাইকেল-রিকশা জলপাইগুড়িতে সন্ধ্যা সাতটার পর পাওয়া যায় না। তাছাড়া তিস্তা নদীর ধারে এই হাকিমপাড়াটা শহরের একধারে বলে এদিকে আসতেই চায় না। পথে বেরিয়ে অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে হাঁটছিল। ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় হতে পারে। আজই অমলদার চিঠিতে সে জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানির কথা জানতে পারল। আবার ওই আগন্তুক যে লাইটার ফেলে গেছেন তাও জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানির। অথচ অমলদা লিখেছেন, এটা এদেশে পাওয়া যায় না! পি. ডব্লু. ডি. অফিসের সামনে দিয়ে বাঁক নিয়ে করলা ব্রিজ পেরিয়ে সে বাবুপাড়ায় চলে এল। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না বোঝা দায়।

ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে তিন নম্বর বাড়ির দরজায় শব্দ করল সে। ভেতর থেকে শুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন ভেসে এল, “পরিচয়?”

“আমি অর্জুন।”

দরজা খুললেন বৃদ্ধ। আশির কাছে বয়স। মাথায় শণের মতো চুল। খুব রোগা। শীত-গ্রীষ্ম একটা গলাবন্ধ গেঞ্জি পরে থাকেন। হাসলেন তিনি, “কী সংবাদ তৃতীয় পাণ্ডব? তিনি কি ফিরেছেন?”

অর্জুন ভেতরে ঢুকল, “না। চিঠি দিয়েছেন, কবে ফিরবেন জানাননি।” এই বাড়িতে মোট পাঁচটি ঘর। যার সাড়ে চারটিতে বইপত্র ঠাসা। সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়, এই তথ্য অর্ধেক বিশ্বাস করেন সুধাময় সান্যাল। অর্ধেক কেন, প্রশ্ন করলে বলেন, “বইপত্র কাগজ দেখে অর্ধেক মনে হয়। বেশি স্মোক করলে গলায় লাগে, বাঁ দিকটা চিনচিন করে। কিন্তু যতক্ষণ ডাক্তার না বলছে, ততক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাব। আমার ক্যানসার হলে জলপাইগুড়ির কোনও মানুষ আর সিগারেট খাবে না।”

সুধাময় সান্যালের কাছে পৃথিবীর সব দেশের সিগারেট, পাইপ, তামাক এবং লাইটার আছে। দেশলাইয়ের বাস্ক যে কত রকমের হয় না দেখলে ভাবাই যাবে না। ইদানীং উনি হাতে-পাকানো নেপালি সিগারেট খেতে ভালবাসছেন।

বেতের চেয়ারে বসে সুধাময় সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, “চাকরি পেলে না?”

মাথা নেড়ে হাসল অর্জুন, “পাব-পাব করছি। আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।”

“দরকার হাড়া কেউ আসে না। আমি নাকি ক্যাটকেটে কথা বলি। বলে ফেলো!”

“জোস অ্যান্ড জোস বলে কোনও লাইটার কোম্পানির নাম আপনি শুনেছেন?”

সুধাময় সান্যাল অবাক হয়ে তাকালেন, “এ নাম তুমি জানলে কী করে হে?”

“অমলদার চিঠিতে প্রথম জানি।”

“ও। অমলদাকে তো আমিই বলেছিলাম। অদ্ভুত লাইটার বটে। আমেরিকানদের লেটেস্ট আবিষ্কার। ‘টোব্যাকো’ বলে একটা জার্নালে পড়েছিলাম। এমনিতে লাইটারটা লক্ করা থাকে। লক্ খুলে বোতাম টিপলে আগুন দেখতে পাবে না। কাছাকাছি সিগারেট নিয়ে গেলে ওটা ধরে যাবে। রাত্রে লাইটার জ্বাললে আলো দেখে কেউ যাতে বিরক্ত না হয় তাই এই ব্যবস্থা। অদৃশ্য আগুন বলতে পারো। এক নম্বর বোতাম অফ করে দু’ নম্বরটা টিপলে লাইটারটা হয়ে যায় অস্ত্র। দশ ফুট যেতে পারে এমন একটা রে বের হয়, যা একটা হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখতে পারে। এই রে চোখে দেখা যায় না। আমেরিকান গভর্নমেন্ট লাইটারটাকে বাজারে ছাড়তে চায়নি। এখন শুনছি পরিচয়পত্র দেখিয়ে কিনতে হচ্ছে। আমার সংগ্রহে ওই বস্তুটি নেই। তোমার দাদাকে বলেছিলাম, যদি সম্ভব হয় ব্যবস্থা করতে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর এক বন্ধু কথা দিয়েছেন আমেরিকা থেকে আনিয়ে দেবেন। দেখা যাক। এদেশের মানুষ ওটা চোখেই দ্যাখেনি।” নেপালি সিগারেট ধরালেন তেকোনা দেশলাই কাঠি জ্বেলে। ধরিয়ে বললেন, “এটা সিঙ্গাপুর থেকে আনানো।”

কথাগুলো শুনতে শুনতে অর্জুন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। তার হঠাৎ মনে হল, সুধাময় সান্যালকে বললে তিনি লাইটারটি নিয়ে নেবেন। অবশ্য তার পকেটে যে লাইটার রয়েছে সেটি এইরকম কাজ করবে কি না তা সে জানে না। কিন্তু দুর্লভ জিনিস যাঁরা সংগ্রহ করেন তাঁর একটু পাগলাটে মানুষ হন। এমন গল্পও সে পড়েছে, একটা দুর্লভ বই সংগ্রহের জন্যে মানুষ খুন করতে বাধেনি সংগ্রাহকের। জোন্স অ্যান্ড জোন্সের লাইটারটা তার কাছে, জানলে সুধাময় সান্যাল কিছুতেই ছাড়বেন না। অথচ বিকেলের আগন্তুক নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন খেয়াল হলেই। তখন কী জবাবদিহি দেবে সে? উত্তেজনা চেপে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “জলপাইগুড়িতে ওই লাইটারের কথা আর কেউ জানে বলে মনে হয়?”

চোখে চোখ রাখলেন সুধাময় সান্যাল, “কী ব্যাপার বল তো?”

“কোনও ব্যাপার নয়। যা বর্ণনা শুনলাম তাতে কৌতূহল হচ্ছে।”

“অ,” একটু সহজ হলেন সুধাময় সান্যাল, “তোমাকে স্নেহ করি। তাই বলা যেতে পারে। তুমি রায়দের নাম জানো? ওই যাদের পরিবারের মানুষরা আমেরিকায় থাকত। শিল্পসমিতিপাডায় বাড়ি। ওই বাড়ির ছোট ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নাম আমি জানি কি না। তোমার মুখেও একই কথা শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম।”

“ভদ্রলোকের নাম কী ?”

“হরিপ্রসাদ রায় । সে আমাকে ওই লাইটার দেখাল । আমি লক্ খুলে বোতাম টিপলাম । কোনও ফ্লেম বের হল না কিন্তু সিগারেট ধরল । দ্বিতীয় বোতাম টিপতে রে বের হল না । বদলে অদৃশ্য আগুন দৃশ্যমান হল । ব্যাপারটা পরিষ্কার হল । লাইটারটা জাল । দ্বিতীয় বোতাম টেপার পর যের বের হয় বলে ওটা আজ মূল্যবান । টোব্যাকোতে পড়েছি, হংকং থেকে জোঙ্গ অ্যান্ড জোঙ্গ-এর নকল মাল বের হচ্ছে । কথাটা বলায় হরিপ্রসাদ খুব দুঃখিত হল । সে ওটা আমাকে দিতে চেয়েছিল, নিইনি । আসল ছেড়ে কে নকলে হাত দেয় !”

মিনিট-পাঁচেক এটা-সেটা বলে অর্জুন উঠে পড়ল । দ্রুত হেঁটে চলে এল করলা নদীর ধারে । এই জায়গাটা সন্দের পরই অত্যন্ত নির্জন হয়ে যায় । পকেট থেকে লাইটারটা বের করে সে চোখের সামনে ধরল । ওপরটা সমান, কোনও গর্ত নেই । পাশে দুটো মসৃণ বোতাম আছে । ইংরেজিতে তাদের ওপর এক এবং দুই লেখা । ঠিক উলটো দিকে একটা চৌকো পাতের ওপর লক্ শব্দটা খোদাই করা । সন্তুর্ণণে সেটায় চাপ দিতে কুট করে শব্দ হল ।

অর্জুন ইদানীং সিগারেট খাচ্ছে । দিনে চারটে । তার বেশি খাওয়ার ইচ্ছে হয় না, পয়সাও নেই । সে এখনও দাড়ি কামায়নি । গালে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের মতো সুন্দর দাড়ি বেরিয়েছে । পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সে এক নম্বর বোতামটা টিপল । তারপর ধীরে সিগারেটের ডগাটা লক্ টেপার ফলে বের হওয়া একটা পেরেকের মাপে সরু গর্তের কাছে নিয়ে এসে টানতেই ধোঁয়া বের হল । সঙ্গে-সঙ্গে এক নম্বর বোতামটা দ্বিতীয়বার টিপে ওটাকে নিষ্ক্রিয় করল সে । সিগারেটে তার মন ছিল না । হাত কাঁপছিল । বুকের মধ্যে যেন ড্রাম বাজছে । এই আপাত-নিরীহ কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্রটি হয়তো ভারতবর্ষে কারও কাছে নেই ।

দ্বিতীয় বোতামটি পরীক্ষা করার জন্যে চারপাশে তাকাল । কোনও মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যাবে না । সে চুপচাপ হাঁটতে লাগল । থানার একটু আগে সে রাস্তার পাশে ঘাসে বসে জাবর কাটতে দেখল একটা যাঁড়কে । সেই সময় দু'জন লোক গল্প করতে করতে এদিকে আসছিল । অর্জুন উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের যেতে দিল । তারপর যাঁড়টার পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে এল । একটু বিরক্ত হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে যাঁড়টা উঠে দাঁড়াল । সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ও মারা যাবে না । খানিকক্ষণ শরীরটা অবশ হয়ে যাবে মাত্র । কিন্তু যদি মরে যায় ? অন্য কোনও প্রাণী, ইঁদুর, কাকের ওপর পরীক্ষা করলে হত না ! কিন্তু আজ রাত্রে তাদের কোথায় পাওয়া যাবে ! আর দ্বিধা না করে অর্জুন দ্বিতীয় বোতামটা টিপল সঠিক লক্ষ করে । যাঁড়টা দাঁড়িয়ে পড়ল । তারপর স্বচ্ছন্দে হাঁটতে লাগল । বিব্রত অর্জুন দ্বিতীয়বার দ্বিতীয়

বোতাম টিপতেই ছোট্ট আগুনটা দৃশ্যমান হল। যে-কোনও সাধারণ লাইটার জ্বালালে যেসকল আগুন বের হয়। লক্ষ্য করে লাইটার হাতে নিয়ে ঠোঁট কামড়াল অর্জুন। তার শরীর আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিকেলের অতিথির ফেলে যাওয়া লাইটারটাও জাল? তার কষ্ট হচ্ছিল।

॥ তিন ॥

শিল্পসমিতিপাড়ায় হেঁটে আসতে বেশ সময় লাগল। রায়দের বাড়ি এই শহরের সবাই চেনে। এখন রাস্তাঘাটে তেমন মানুষ নেই। দোকানপাটও এই শহরে সাততাতাড়াতি বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া সিকদারবাড়ি ছাড়া দোকানও বেশি নেই। হরিপ্রসাদ রায়কে সে চেনে না। কিন্তু ভদ্রলোক থাকেন আমেরিকা। এই গল্প সে জানে। মেমসাহেব বিয়ে করেছেন বলে বাড়িতে খুব ঝামেলাও হয়েছে। ওঁর বাবা খুব কনজারভেটিভ। অর্জুন ঠিক করেছিল হরিপ্রসাদ রায়কে অনুরোধ করবে তাঁর লাইটারটি দেখাতে। দুটো জাল জিনিসে কতটা তফাৎ দেখতে হচ্ছে করছিল।

হরিপ্রসাদ রায় বাড়িতে নেই। দরোয়ান বলল, ‘সাহেব কখন ফিরবেন বলে যাননি।’ অর্জুন হতাশ হল। সিনেমা দেখবে বলে সাইকেল না নিয়ে বেরিয়ে এখন পা টনটন করছে। তবু ওর মনে হল যার লাইটার তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল। জাল জিনিস বয়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু সেই লোকটা এখন কোথায়?

জলপাইগুড়ি শহরে হোটেল বলতে একটাই। হোটেল না বলে একটা ভাল মেস বলাই সম্ভব। আর আছে কয়েকটা বাংলো এবং জলপাইগুড়ি ক্লাব। শেষেরটার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলেও কোনও মেসবারের সুপারিশ দরকার হয়। তিস্তা বাংলোটার অবস্থা খুব ভাল। যদিও খাবার আগে থেকে না বললে পাওয়া যায় না। যে মানুষ বিকেলে এসেছিলেন তাঁর পক্ষে এই শহরে থাকতে গেলে ওখানেই থাকতে হবে।

তিস্তা বাংলোটা শহর ছাড়িয়ে রেসকোর্সের ওপারে। অর্জুন দ্রুত হাঁটছিল। লোকটা খুব সাধারণ নয়। কথাবার্তায় ঔদ্ধত্য আছে। ওইভাবে বলাই সম্ভবত অভ্যাস। কিন্তু উনি নকল লাইটার নিয়ে এই শহরে আসবেন কেন বুঝতে পারছেন না সে। পথে সেই হোটেলটা পড়েছিল। ম্যানেজারকে চেনে অর্জুন। তিনি বললেন, ওই বর্ণনার একটি লোক গাড়ি নিয়ে এখানে এসে খুব বাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, ‘এটাকে হোটেল বলে? আপনাদের ব্যবসা চালাতে কী করে লাইসেন্স দেয় কে জানে!’

ম্যানেজার এ-কথায় খুব আঘাত পেয়েছেন। না-হয় একটু নরদমার গল্প ঢোকে, বেডকভার রোজ পালটানো হয় না, তাই বলে এমন কথা! লোকটা

গাড়ি নিয়ে এখান থেকে তিস্তা বাংলোর দিকে গিয়েছে।

অর্জুন যখন সেখানে পৌঁছল তখন রাত নটা। এখন এলাকায় নিশুভি রাত। গেট পেরিয়ে বিরাট বাংলোটাকে দেখল সে। আলো জ্বলছে। ঝকঝকে ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলোর সামনে কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। হতাশ হল সে। ভদ্রলোক হয়তো এখানে এসে কোনও ঘর খালি না পেয়ে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। অনেক ভাল হোটেল আছে সেখানে। ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। হাতে একটা জ্যাস্ত মুরগি নিয়ে ঢুকছে। কাছাকাছি এসে সে লোকটাকে চিনতে পারল। এই বাংলোর বাবুর্চি। তাকে ওখানে দাঁড়াতে দেখে বাবুর্চিও একটু অবাক হয়েছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তোমাদের বাংলোর সব ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছে?”

লোকটা মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ সাব।” মুরগিটা হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এত রাতে মুরগি আনলে কেন?”

লোকটা বলল, “সাবলোককো মর্জি আইসাই হোতা হয়। ছে বাজে ইহা রুম লিয়া আউর এক ঘণ্টা পহেলে অর্ডার দিয়া মুরগি চাহিয়ে। আভি কাঁহা মিলেগা চিকেন? এক দোস্তসে লিয়া হয়, দাম জাদা দেনে পড়িগা।”

অর্জুন সচেতন হল, “আচ্ছা। যে সাহেব বিকেলে এসেছে তার গাড়ি ছিল না?”

“হ্যাঁ, থা।”

“তোমাদের এখানে গ্যারেজ আছে?”

“নেহি।”

“কত নম্বর রুমে সেই সাহেব আছেন?”

“তিন।” লোকটা আর দাঁড়াল না। মুরগি নিয়ে কিচেনের দিকে ছুটল। রত্রের নির্জনতায় মুরগির প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

অর্জুন বাংলোটার দিকে তাকাল। বিকেলের আগন্তকের যদি এখানে থাকেন তাহলে তাঁর গাড়ি কোথায় গেল? সে ধীরে-ধীরে বারান্দায় উঠে এল। কোলাপসিবল্ গেটটা টেনে দেওয়া কিন্তু এখনও তালা পড়েনি। চৌকিদারটা ধারেকাছে নেই। সোজা দোতলায় উঠে এল সে। লাউঞ্জের সোফায় বসে দু'জন ভদ্রমহিলা গল্প করছেন। অর্জুন উঠতেই তাঁরা একবার তাকিয়ে আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আগামীকাল তাঁরা জলদাপাড়ায় যাচ্ছেন গণ্ডার দেখতে।

অর্জুন তিন নম্বর ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, সেটা বন্ধ। লাউঞ্জ থেকে সরে আসায় কাউকে চোখে পড়ছে না। সে দরজায় নক্ করল। ভদ্রলোকের যখন রাতের খাওয়া হয়নি তখন নিশ্চয়ই এখনই ঘুমিয়ে পড়েননি। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। অর্জুন আর-একটু জোরে শব্দ করল।

একটু অপেক্ষা সত্ত্বেও দরজাটা বন্ধই রইল। ভদ্রলোক যখন পরিশ্রান্ত তখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অর্জুন একটু অসহিষ্ণু হয়ে জোর চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

একটু ইতস্তত করে অর্জুন ঘুরে ঢুকল। মোটামুটি সুন্দর সাজানো ঘর। শহরের হোটেলের চেয়ে ঢের আধুনিক। কিন্তু কেউ নেই এখানে। যদিও একটা স্যুটকেস আর ব্রিফকেস রয়েছে। কিছু কাগজপত্র এবং রুমাল রয়েছে টেবিলের ওপর। বিছানা দেখে মনে হয় কেউ শুয়ে ছিল। জুতো-জোড়া বিছানার নীচে খোলা। ভদ্রলোক গেলেন কোথায়?

অর্জুন অবস্থিতিতে পড়ল। মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢোকা অবশ্যই অন্যায়। সে বাইরে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই কাছাকাছি। সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন? হয়তো অমলদার বাড়িতে গিয়েছেন লাইটারের খোঁজে। লোকটাকে দেখে অবশ্য মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই যে, উনি জানেন না লাইটার জাল। কিন্তু কেউ কি ঘরের দরজা খোলা রেখে বাংলোর বাইরে যাবে? তা ছাড়া জুতো পর্যন্ত রয়েছে ঘরে। চিন্তাটাকে বাতিল করল অর্জুন। তারপর আবার ঘরে ঢুকল। সে ঠিক করল, চেয়ারে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না ভদ্রলোক ফেরেন।

মিনিট দশেক পার হয়ে গেল। রাত হচ্ছে। বাড়িতে আরও দেরি করে ফিরলে মা চিন্তা করবেন। অর্জুন উঠল। এবং তখনই তার বাথরুমের কথাটা খেয়াল হল। ভদ্রলোক হয়তো পরিষ্কার হবার জন্য ওখানে গেছেন। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সে। এতক্ষণ তো কারও বাথরুমে থাকার কথা নয়। অর্জুন ধীরে-ধীরে উঠে বাথরুমের দরজায় হাত রাখল। একবার শব্দ করল। তারপর একটু জোরে ঠেলতে গিয়ে নজরে পড়ল এপাশ থেকে ছিটকিনি বন্ধ রাখা হয়েছে। বিস্মিত হয়ে সেটাকে খুলে দরজা ঠেলতে অবাধ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে আছেন পাশ ফিরে। তাঁর পরনে পাজামা। ঠিক তাঁর ওপরে খোলা কল থেকে জল এসে পড়ছে শরীরের ওপরে। ফলে জলের শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু বাথরুমটা ভেসে যাচ্ছে। অর্জুন ধীরে-ধীরে শরীরটার পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো চোখ খোলা। হাতের শিরা দুটো কাটা। তা থেকে অনর্গল রক্ত বেরিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেছে। এখনও কালচে হয়ে আছে কিছু জায়গা। হাতের পাশে একটা ধারালো বিদেশি ক্লোড। দেখলেই বোঝা যায় উনি আত্মহত্যা করেছেন। অন্তত এক ঘণ্টা আগে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

সহদেব বকসি বয়সে নবীন। স্মার্ট চেহারা। চালচলনে মনে হয় পুলিশ অফিসার না হয়ে যদি সিনেমার নায়ক হতেন, তবে আরও বেশি মানাত। পরের দিন বিকেলবেলায় থানায় তাঁর ঘরে বসে সহদেব কাঁধ নাচিয়ে বললেন, “ইটস এ সিম্পল কেস অব সুইসাইড। ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে জলের কল খুলে নিজের হাতের শিরা কেটেছেন।”

অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল সামনে। সহদেবকে তার ভাল লাগে। অমল সোমকে সহদেব ঠিক পছন্দ না করলেও অর্জুনের সঙ্গে ভাল ভাব আছে। সে জিজ্ঞেস করল, “এটা তাহলে হত্যা নয়?”

“নট অ্যাট অল। কোনও মানুষের হাতের শিরা জোর করে কাটা যায় না। জোর করে ধরেবেঁধে তা করলেও ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত। ওর শরীরে কোনও দাগ নেই।”

“তা হলে উনি অমলদার কাছে গিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয়ই কোনও বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল!”

“এইটেই তো এরা ভুল করে। হয়তো নিজে কোনও অন্যায় করেছিল, ভেবেছিল অমলবাবু বাঁচিয়ে দেবেন, কিন্তু তিনি না থাকায় ভয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আমাদের কাছে এলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। কাঠমাণ্ডু থেকে এসে জলপাইগুড়িতে মরতে হত না।”

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কাঠমাণ্ডু?”

“ও হ্যাঁ। তোমাদের বলা হয়নি! ভদ্রলোক এ-দেশের নাগরিকই নন। ওঁর কাছে আমেরিকান পাশপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এইটে উটকো ঝামেলা। বিদেশি নাগরিক মারা গেলে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় আমাকে বিপাকে ফেলেছেন।” জলপাইগুড়ি থানার দারোগা সহদেব বকসিকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

“সত্যেন্দ্রনাথ রায়! ভদ্রলোকের সম্পর্কে আর কিছু জানা গিয়েছে?”

“এখনও জিনিসপত্র ভাল করে পরীক্ষা করিনি। পাশপোর্ট পেয়ে অথরিটিকে জানিয়ে এখন আদেশের অপেক্ষায় বসে আছি।” এই সময় আর একটা কেস এসে যেতে সহদেব তৎপর হলেন।

অর্জুন একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করল, “সহদেবদা, আমি ওঁর জিনিসপত্র দেখতে পারি?”

“কোনও লাভ হবে না। তুমি ভাবছ মার্জার কেস। মোটেই না। হাত না বেঁধে শিরা কাটা যায় না। দ্যাখো যদিও অফিসিয়ালি আমি তোমাকে দেখাচ্ছি না,” সহদেব একজন সেপাইকে ডেকে হুকুম জানালে সে অর্জুনকে নিয়ে গেল মালখানায়।

সুটকেসটা দেখলেই বোঝা যায় বিদেশি। জামা-প্যান্টও তাই। ভদ্রলোকের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভাল। পাশপোর্টটাকে পেল না সে। কোনও টাকা-পয়সাও নেই। অথচ বিদেশি মানুষ নিশ্চয়ই খালি হাতে এখানে আসবেন না। একটা ডায়েরি দেখল, ভদ্রলোক তাতে বিশদ লেখেননি। ঠিক দশ দিন আগে তিনি প্যান অ্যাম এয়ারকোম্পানির মাধ্যমে দিল্লিতে নেমেছিলেন। দিল্লি থেকে কাঠমাণ্ডুতে এসেছিলেন চার দিন আগে। অমল সোমের ঠিকানা লেখা পাশে ব্র্যাকেটে বিষ্ণুচরণ পত্রনবীশ লেখা। এইটে পড়ে সোজা হয়ে বসল অর্জুন। বিষ্ণুসাহেবের কথা জানবেন কী করে সত্যেন্দ্রনাথ? উনি কি এখানে আসার আগে কালিম্পং-এ গিয়েছিলেন? অমলদার ঠিকানায় নিচে লেখা আছে, ভারতীয় গোয়েন্দাদের সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, এই লোকটির সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। ডায়েরির শেষ পাতায় কয়েকটা নম্বর লেখা। ঠী মনে হতে অর্জুন একটা কাগজে নম্বরগুলো লিখে নিল। A2501/C/Q/B, A8972/C/Q/B, A11121/C/M.1 এগুলো কিসের নম্বর বুঝতে পারল না সে। ডায়েরিটা রেখে দিয়ে অন্য জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে দেখে যখন হতাশ হচ্ছিল, তখন সুটের ভেতরের পকেটে একটা কার্ড পেল সে। কার্ডে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের নাম-ঠিকানা লেখা। নিউইয়র্কের কুইন্সে থাকতেন ভদ্রলোক। কার্ডের পেছন দিকটায় চোখ বোলাতে গিয়ে সে শক্ত হল। পরিষ্কার ইংরেজিতে লিখে রেখেছেন ভদ্রলোক, ‘ভারতবর্ষে যাচ্ছি। যে কোনওদিন আমি খুন হতে পারি। জোস অ্যান্ড জোস যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করবই। যদি আমার মৃত্যু হয় তা হলে এই কার্ড যিনি পাবেন তিনি অবিলম্বে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাধিত হব।’ কার্ডটা রাখতে গিয়েও মন পালটাল সে। এই ঘরে এখন কেউ নেই। হয়তো অন্যায়, কিন্তু সে নিজের পকেটে ওটাকে চালান করে দিল।

তখনই তার বিশ্বাস হল সত্যেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করেননি। জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানির হয়ে কোনও কাজ করতে তিনি এসেছিলেন এখানে। তিনি নিজের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে জানতেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন কেন? তা ছাড়া সে যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন দরজা ভেজানো ছিল। এমনকী বাথরুমের দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। এইভাবে সব খুলে রেখেই কেউ আত্মহত্যা করে নাকি। সত্যেন্দ্রনাথ যখন অমলদার বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন **তাকে মোটেই** নাভার্স দেখাচ্ছিল না। বরং লোকটাকে মেজাজি দান্তিক বলে মনে হয়েছিল। আত্মহত্যা করতে চাইবার আগে কেউ মুরগির অর্ডার দেয় কি? অর্জুন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কিন্তু একথাও ঠিক, দুটো হাত বেঁধে তবেই শিরা কাটা যায়। যার হাত বাঁধা হবে, সে বাধা দেবে না? প্রাণের জন্য লড়াই করবে না? তাহলে তো তার চিহ্ন সত্যেন্দ্রনাথের শরীরে থাকত।

ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। এই সময় তার সিগারেট

খাওয়ার ইচ্ছে হল। যদিও সে বাইরে ব্রয়স্ক মানুষের সামনে কখনও সিগারেট খায় না। সহদেবদা মনে হয় এঘরে এখনই ঢুকবেন না। সে সিগারেট বের করে দেশলাই বের করতে গিয়ে লাইটারটার স্পর্শ পেল। জোস অ্যান্ড জোস, এই কোম্পানির দায়িত্ব নিয়ে, এখানে এসে সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। সে প্রথম বোতামটা টিপে অদৃশ্য আগুনে সিগারেট ধরাতে গিয়েই চমকে উঠল। যদি এর দ্বিতীয় বোতামটা সুধাময় সান্যালের জ্ঞান অনুযায়ী সক্রিয় হত তাহলে অদৃশ্য রে দশ ফুট পর্যন্ত ছুটে গিয়ে হাতিকেও অবশ করে দিতে পারত। মানুষ তো অজ্ঞান হতই। আর একটা জ্ঞানহীন মানুষের হাতের শিরা কেটে দেওয়া শিশুর পক্ষেও সহজ।

তার মানে জলপাইগুড়ি শহরে জোস অ্যান্ড জোস-এর আসল লাইটার এসেছে। খুনি সেটাই ব্যবহার করেছে? সত্যেন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই সে ভদ্রভাবে দেখাতে গিয়েছিল লাইটারটা। সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ওটা জাল। তাই কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবেননি। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আততায়ী সরাসরি দ্বিতীয় বোতাম টিপে সত্যেন্দ্রনাথকে অজ্ঞান করে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে হাতের শিরা কেটেছেন। ওই ব্লেন্ড সত্যেন্দ্রনাথই ব্যবহার করেন। তাঁর দাড়ি কামাবার কিটসে ওই ব্লেন্ড আরও আছে।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল অর্জুন। এই মৃত্যু-রহস্য সে এত দ্রুত সমাধান করবে ভাবতে পারেনি। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছিল। অমলদা শহরে থাকলে শাবাশ দিতে বাধ্য হতেন। এখন তো সব ব্যাপার জলের মতো পরিষ্কার। কে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে লাইটার দেখাতে যেতে পারে? কাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়ে সে পরিচয় জেনে এসেছে। সহদেবদাকে এখনও লাইটারের কথা বলা হয়নি। ওকে অ্যারেস্ট করানোর পর সে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবে। সে আরও চমকিত হল। হরিপ্রসাদ কি সত্যেন্দ্রনাথের আত্মীয়? দু'জনের উপাধি তো এক। হরিপ্রসাদ গতকাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়েছিল লাইটার পরীক্ষা করাতে। জাল জিনিসটা সরিয়ে রেখে সে আসল জিনিস নিয়ে গিয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। পরিচিত মানুষ দেখে তিনি ঘরে বসাতে আপত্তি করেননি। আর সেই সুযোগে কাজ হাসিল করেছে হরিপ্রসাদ। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। হরিপ্রসাদ কেন সুধাময় সান্যালের কাছে যাবে লাইটার দেখাতে? একজন সাক্ষী কেউ রেখে দেয়? তা ছাড়া লাইটারটার বিশেষত্ব তার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যখন খুন হয়েছেন তখন হরিপ্রসাদ তার বাড়িতে ছিল না। এটা তো সে নিজের চোখেই দেখে এসেছে।

গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন সহদেবদা। অর্জুন কারণ জিজ্ঞেস করল। সহদেবদা বললেন, “একটু আগে এস. পি. সাহেব ফোনে জানিয়েছেন যে, ২২৮

সত্যেন্দ্রনাথের বডি যেন ডিফর্মড না হয় তার ব্যবস্থা করতে । কলকাতায় আমেরিকান দূতাবাসে পাঠাতে হবে বরফের বাক্সে ভরে । এ-শহরে ওসব জিনিস যে পাওয়া যায় না তা কি এস. পি. জানেন না ?”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনিকে ধরতে চান ?”

“খুনি ! কী আজোবাজে বকছ ? ওই ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ যাওয়ার পর তুমি ছাড়া কেউ ঢোকেনি,” সহদেবদা হাসলেন, “কাউকে অ্যারেস্ট করতে হলে তোমাকেই তো করতে হয় । মাথা থেকে ভূত তাড়াও । সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে কেউ খুন করেনি । অমলবাবুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তুমি সব ব্যাপারেই রহস্যের গন্ধ পাও ।” ওঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র টেলিফোন বাজল ।

রিসিভারটা কানে লাগিয়ে কথা বলতে-বলতে একটু উত্তেজিত হলেন সহদেব বকসি । তারপর “ঠিক আছে, আসছি,” বলে ওটাকে রেখে দিয়ে বললেন, “একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না । লোকটা আর অ্যাকসিডেন্ট করার সময় পেল না ।”

“অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ?” অর্জুন কৌতূহলী হল ।

“হ্যাঁ । ঠিক কদমতলার মোড়ে । গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন ভদ্রলোক । বোধহয় ব্রেক ফেল করায় রাস্তায় পাশে একটা দেওয়ালে সরাসরি ধাক্কা মারেন । বলছে তো স্পট ডেড ।” সহদেব বকসি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন । অর্জুনের মন-খারাপ হল । কেন যে ড্রাইভাররা একটু ধীরেসুস্থে গাড়ি চালায় না ! কোন গরিব মানুষের সংসার গেল কে জানে ! সে জিজ্ঞেস করল, “সত্যেন্দ্রনাথের খবর নিতে আর কেউ আসেনি, না ?”

“না”, সহদেব বকসি বেরিয়ে এসে জিপ আনতে ছকুম দিলেন, “মিস্টার রায় হয়তো এতক্ষণে স্পটে আমাকে না দেখে এস. পি.-কে কমপ্লেন করে ফেলেছেন । এই একটা শহর, যা বড়লোকদের শাসনে চলে । তুমি কোন্ দিকে যাবে ?”

“মিস্টার রায় মানে ?”

“শিল্পসমিতিপাড়ার রায়বাড়ির কর্তা । তাঁরই ছোট ছেলে তো ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন ।”

“ছোট ছেলে ?” অর্জুন উত্তেজিত হয়ে উঠল, “হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?”

জিপ এসে গিয়েছিল । সহদেব বকসি তাতে উঠে বসতেই অর্জুন ছুটে গেল, “আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?”

একটু বিস্মিত সহদেব বকসি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন । অর্জুন জিপে উঠে পড়ল । গোটাচারেক সেপাই রয়েছে পেছনে । অর্জুন তখনও বুঝতে পারছিল না, “আপনি ঠিক শুনেছেন ? হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?”

“নামটা শুনিনি । রায়বাড়ির ছোট ছেলে বলল । সিরিয়াস

হেড-ইনজুরি।”

অর্জুন মাথা নাড়ল। রায়বাড়ির অনেক মানুষ। হরিপ্রসাদ জলপাইগুড়ি শহরে কেন দুর্ঘটনা ঘটাতে যাবে। সত্যেন্দ্রনাথের খুনি এত সহজে... বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। যেতে যেতে অনেকবার সহদেব বকসিকে লাইটারটার কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল সে। দেখা যাক, আর একটু অপেক্ষা করলে ক্ষতি কী!

থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা সোজা। যদিও দু'পাশে প্রচুর দোকানপাট, সিনেমা হলের ভিড়, কিন্তু পুলিশের ড্রাইভার জানে কী করে গাড়ি চালাতে হয়। কদমতলার কাছে পৌঁছে দেখল বেশ ভিড় সেখানে। পুলিশ লেগে গেল কাজে। সহদেব বকসির সঙ্গে অর্জুনও পৌঁছে গেল গাড়িটার কাছে। যে গাড়িকে দেখবে বলে অর্জুন তৈরি ছিল এটা সেটা নয়। গত বিকেলে দেখা সত্যেন্দ্রনাথের ধুলোয় মাথা গাড়ির বদলে একটা সাদা ফিয়াট দুমড়ে পড়ে আছে। ড্রাইভারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সহদেব বকসি প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ নিচ্ছিলেন। গাড়িটা আসছিল একটু বেশি গতিতেই। পাশের মিষ্টির দোকানের মালিক বললেন, “ভদ্রলোক ঠিকই চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম ওঁর হাত স্টিয়ারিং থেকে পড়ে গেল। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ল। বাস, দড়াম করে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে আছড়ে পড়ল ওখানে।”

এক ডাক্তারবাবু সাইকেলে যাচ্ছিলেন সেই সময়। তিনি বললেন, “স্পষ্ট দেখলাম, হার্ট অ্যাটাক কেস। অ্যাকসিডেন্ট হবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মাথাটা স্ম্যাশড হয়েছে। স্পট ডেড।” কথাবর্তা বলে বোঝা গেল ভদ্রলোকের হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার কারণেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর কেউ আহত হয়নি।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। তার মাথাটা এখন খালি। কিছুই চিন্তা করতে পারছিল না সে। রায়বাড়ির ছোট ছেলে হরিপ্রসাদ রায় মারা গিয়েছেন একথা জানার পর সে কোনও নতুন কিছু ভাবতে পারছিল না।

সহদেব বকসি থানায় না ফিরে হাসপাতালে ছুটলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গে নিল। সেখানে তখন হৃদযবিদারক দৃশ্য। রায়বাড়ির কত অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁকে ঘিরে সেবা করছে কয়েকজন আত্মীয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকেই। খবর পেয়ে আসছেন শহরের গণ্যমান্যরা। সহদেব বকসির কাছ থেকে সরে এল সে। হরিপ্রসাদ রায় সত্যিই জীবিত নেই। ঠিক সেই সময় তার পাশে এক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে। ফর্সা, লম্বা, মধ্যবয়স্ক মানুষটি গম্ভীর, উদ্ভ্রান্ত কিন্তু শোকের উগ্র প্রকাশ নেই। চেহারা বোঝা যাচ্ছে ইনি রায়বাড়ির একজন। অর্জুনের মনে হল, এঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। সে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, “এটা কি হার্ট অ্যাটাক থেকে হল?”

ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। ওঁর চোখে যেন পরিচিত ভঙ্গি ফুটল। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন, “ডাক্তাররা বলতে পারবেন কখন কার হার্ট অ্যাটাক হয়, আমি কখনও ওর বুকের দোষ আছে বলে জানতাম না। কী করে যে এমন হল! ওর হার্ট তো ভালই ছিল।”

“উনি কি ড্রিঙ্ক করতেন?”

“না, না। নেভার। আমেরিকায় থেকেও মদ ছোঁয়নি। আমি মাঝে-মাঝে খাই বলে রাগ করত। মদ সিগারেট কিছুই খেত না।” ভদ্রলোক চোখের জল মুছলেন।

“উনি আপনার কে হন?”

“হরি আমার ছোট ভাই।”

“ও। আমার নাম অর্জুন। সত্যসন্ধানী অমল সোমের সহকারী।”

“আপনাকে চিনতে পেরেছি ভাই।”

“কিন্তু আপনি বোধহয় সত্যি খবর জানেন না। হরিপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল। তখন ওর কাছে আমি একটা লাইটার দেখেছিলাম। সিগারেট না খেলে কেউ লাইটার রাখে?”

“ও হো। সেটা একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। এবার যখন ও কলকাতা থেকে এখানে আসে তখন এক প্যাসেঞ্জারের লাগেজ নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ওকে অনুরোধ করেন একটা তিন কেজির প্যাকেট যদি হরি ক্যারি করে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের নিয়ম ভাঙতে চায়নি হরি। কিন্তু কখনও কখনও অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হয় না। বাগডোগরায় গেলে সেই ভদ্রলোক প্যাকেট ফিরিয়ে নিয়ে খুব ধন্যবাদ দিয়ে ওই লাইটারটা উপহার দিয়েছিলেন ওকে। বলেছিলেন, ‘এ জিনিস ভারতবর্ষে আসেনি।’ একই ট্রান্সপোর্টে ওরা শিলিগুড়িতে আসে। কিন্তু দুঃখের কথা, সেই ভদ্রলোকের কিছু মালপত্র ওর মধ্যেই থোয়া যায়। হরি লাইটারটা আমাকে দেখায়। আমরা কিছুতেই খুলতে বা জ্বালাতে পারছিলাম না। আজ মনে পড়ল সুধাময় স্যানালের কথা। হরি ওঁর কাছে গিয়ে সব জেনে এল। তারপর অবশ্য ওর সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। কিন্তু লাইটার ছিল বলেই প্রমাণ হয় না সে সিগারেট খেত।”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু সে হাসপাতাল ছেড়ে গেল না। এই শহরে দুটো জাল লাইটার এসেছে। প্রথমটি তার পকেটে, দ্বিতীয়টি হরিপ্রসাদ রায়ের কাছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না জানলে অবশ্য কিছুই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে হরিপ্রসাদের হার্ট অ্যাটাকই হয়নি। সে সহদেব বকসির কাছে পৌঁছে দেখল তিনি রায়-পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। এর মধ্যে ডাক্তার এসে রায়কর্তার চিকিৎসা শুরু করেছেন। একটু সুযোগ পেয়ে সে সহদেব বকসিকে জানাল, “পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ

পাওয়া যাবে ?”

“কেন ?” স্পষ্টত বিরক্ত হলেন তিনি ।

“আমি একটু আগ্রহী ।”

“দ্যাখো অর্জুন, তোমাকে আমি স্নেহ করি । কিন্তু সব কিছুর একটা লিমিট আছে । দেখছ এটা দুর্ঘটনা, দিনের আলোয় সকলের সামনে ঘটেছে, আর তুমি তার মধ্যে রহস্য খুঁজছ ।”

“আমি দুঃখিত সহদেবদা, তবু আপনি ওটা পেলে আমাকে বলবেন । ওঁর কাছে কী কী পাওয়া গেছে জানতে পেরেছেন ?” অর্জুন শান্ত গলায় প্রশ্ন করল ।

“একজন সাধারণ মানুষের কাছে যা পাওয়া যায় । আলমারির চাবি, মানিব্যাগ, চিরুনি । কোনও রহস্যজনক কাগজপত্র পাইনি । স্যাটিসফাইড ?”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “লাইটার ?”

“লাইটার ! এত জিনিস থাকতে লাইটারের কথা বললে কেন ?”

“না, মানে উনি সিগারেট খান কি না জানতে চাইছি ।”

“ও, সিগারেট খেলে হার্ট অ্যাটাক হবে, তাই ! সত্যি, কল্পনার দৌড় বটে ! না, কোনও লাইটার সিগারেট পাওয়া যায়নি ওর কাছে ।”

ধীরে-ধীরে অর্জুন বেরিয়ে আসছিল হাসপাতাল থেকে । হরিপ্রসাদ লাইটারটা কি বাড়িতে রেখে বেরিয়েছিল ! সেটাই স্বাভাবিক । যে সিগারেট খায় না, সে ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন ? এখনই যদি সে রায়বাড়িতে যায় তা হলে একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে ।

এই সময় কাটা-গদাইকে দেখতে পেল অর্জুন । হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে আছে । সে জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার, এখানে কী উদ্দেশ্যে ?”

“তোমাকে ফলো করে এখানে এলাম ।”

“সে কী ? কী ব্যাপার ?” অর্জুনের মনে পড়ল গতকাল সিনেমা দেখে বেরোবার সময় কাটা-গদাই তাকে বলেছিল একটা জরুরি কথা আছে । কাটা-গদাই এপাশ-ওপাশ তাকাল । তারপর জিজ্ঞেস করল, “রায়বাবুর ছেলে ছবি হয়ে গেছে, না ?”

হেসে ফেলল অর্জুন । তারপর গম্ভীর হল আবার, “হ্যাঁ, উনি মারা গিয়েছেন ।”

“এইটে ওর পকেটে ছিল ।” কাটা-গদাই নিজের পকেট থেকে একটা নীল লাইটার বের করে অর্জুনের হাতে দিল । অর্জুন দ্রুত সেটার পেছনে তাকাল, জোশ অ্যান্ড জোশ । খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, “তুমি পেলে কোথেকে ?”

মাথা নাড়ল কাটা-গদাই, “পুলিশকে যদি না বল তা হলে বলতে পারি ।”

“ঠিক আছে, বল ।”

“আমার এক শিষ্য বডিটা গাড়ি থেকে টেনে বের করার সময় নিয়েছে। আমি জানতে পেরে বললাম, খুব অন্যায় করেছিস। ফেরত দিতে এসেছিলাম। এখন কী হবে?”

অর্জুন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেটাকে দেখে লুকনো নব্ টিপে আনলক করল। তারপর প্রথম বোতামটা টিপতেই অদৃশ্য ফ্রেম বের হল। সিগারেট ছিল না। একটা কাগজ গর্তর মুখটায় ধরতেই সেটা জ্বলে উঠল। এবার দ্বিতীয় বোতামটা? যদিও সে সুধাময় সান্যালের কাছে দেখেছে হরিপ্রসাদের এই লাইটারটা জাল, তবু ঝুঁকি নিল না। হাতের কাছে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে ছিল, সেটার দিকে লক্ষ করে দ্বিতীয় বোতামটা টিপতেই সে ছুটে পালাল।

হতাশ হয়ে অর্জুন বলল, “এটা আমি নিচ্ছি। রায়বাবুদের ফিরিয়ে দেব। এসব আমেরিকান জিনিস। এদেশে কারও কাছে দেখতে পাবে না।”

হাসল কাটা-গদাই, “না অর্জুনভাই, আজকাল তামাম দুনিয়া নেপাল হয়ে এখানে চলে আসে। সেদিন, হ্যাঁ কালকেই, সন্ধ্যাবেলায় রূপমায়ার সামনে একজন কায়দা করে সিগারেট ধরাল। লাইটার টিপল, আলো জ্বলল না, কিন্তু সিগারেট ধরে গেল।”

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অর্জুন, “লোকটি কে? হরিপ্রসাদ রায়?”

“না, না। বাঙালি নয় লোকটা। লাল দাড়ি আছে।”

অর্জুনের সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। লাল দাড়িওয়ালা লোক—যার কাছে এইরকম একটা লাইটার আছে। কে বলতে পারে সেই লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপলে বে বের হয় কি না। তার মানে এই শহরে তিনটে লাইটার এখন। যার দুটো জাল, একটা ঠিক।

সে কাটা-গদাইকে জিজ্ঞেস করল, “লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?”

একটু ভাবল কাটা-গদাই। তারপর বলল, “হ্যাঁ। চিনে নেব। কিন্তু তোমাকে অন্য কথা বলছিলাম। কেসটা খারাপ।”

“কী কেস?” অন্য কিছু শুনতে এখন মোটেই ইচ্ছে করছিল না অর্জুনের।

“পোড়ার পাখা উঠেছে। ও এবার মরবে, তুমি বাঁচাও ওকে।”

“কেন? ও কী করছে?”

“পাজিটা এবার স্মাগলিং-এ নেমেছে। আমার সঙ্গে দুশমনি থাকলেও ছেলেবেলার বন্ধু তো! তাই খারাপ লাগে। এতদিন রূপশ্রী হলে ব্ল্যাক করছিল, সে ঠিক আছে। কিন্তু এখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যায়। টানা মাল নিয়ে বাজারে বিক্রি করে।”

“কিন্তু পোড়া-গদাই আমার কথা শুনবে কেন?”

“শুনবে। তোমার দাদাকে আমরা ভয় পাই। তুমি তো তারই শিষ্য।”

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল,

“পোড়া-গদাইকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?”

“ওর বাড়িতে। সেনপাড়ায়। যাবে তুমি?”

“যাব। আমাকে দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেও।”

“হ্যাঁ। আমি পোড়ার বাড়িতে যাই না। পাজিটা বহুত বদমাস। নেহাত ছেলেবেলার বন্ধু, তাই!”

॥ পাঁচ ॥

দূর থেকে পোড়া-গদাইয়ের বাড়িটা দেখিয়ে নেমে পড়ল কাটা-গদাই রিকশা থেকে। যাওয়ার সময় বলল, “পোড়া যদি তোমায় বেইজ্জত করে তা হলে আমায় বলবে। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।”

অর্জুন আপত্তি করল, “না, না, তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। আমারটা আমি বুঝব।”

টিনের চালা আর কাঠের দেওয়ালে তোলা দু'খানা ঘর হল পোড়া-গদাইয়ের বাড়ি। একটা বাচ্চা ছেলে সামনে বসেছিল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, “গদাইবাবু বাড়িতে আছে?”

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। এবং, তখনই ভেতর থেকে ফ্যাসফেসে গলায় চিৎকার ভেসে এল, “কে, কে ডাকে?”

গলা তুলে অর্জুন নিজের পরিচয় জানাতেই একটা খালি গায়ে লুঙ্গি পরা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মুখের একটা দিক বীভৎসভাবে পুড়ে গেছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। পোড়া-গদাই অর্জুনকে দেখে অবাক হল। বোঝা যাচ্ছে সে ওকে চিনতে পেরেছে। অর্জুন হাসল, “তোমার সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা আছে গদাই।”

পোড়া-গদাই চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি একা?”

“হ্যাঁ।” অর্জুন মাথা নাড়ল।

“কী ব্যাপার বলুন তো?”

অর্জুন বলল, “ব্যাপারটা তোমার জন্যই। কিন্তু এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলার সুযোগ হবে না। আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।”

“আপনি কী বলবেন আমি বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসুন। ঘরে বসে কথা বলতে পারি।” পোড়া-গদাই ওকে রাস্তা দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ঘরে একটি বউ বসে কাজ করছিল। নতুন লোককে দেখে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল বাইরে। অর্জুন দেখল একটা তক্তাপোশের ওপর ময়লা বিছানা। পাশের নড়বড়ে চেয়ারে বসল সে।

পোড়া-গদাই খাটে বসে বলল, “গরিবের বাড়িতে এলেন, কী ব্যাপার?”

অর্জুন বলল, “আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তুমি আমাকে তুমি

বলতে পার। যদি অবশ্য তুমি চাও তা হলে আমি আপনি বলতে পারি। আমার আপনিই বলা উচিত।”

“না, না, যা আছে তাই থাক। ‘তুমি’ শুনতেই ভাল লাগবে।”

“দ্যাখো গদাই, আমি তোমার সম্পর্কে কিছু-কিছু কথা জানি। তোমাকে যা বলব তা কেউ জানে না, তুমি যা বলবে তাও কেউ জানবে না। পুলিশ তো নয়ই, যদি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর। এখন বল তো, গত দুদিনে তোমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেছিল?” অর্জুন সরাসরি চোখের দিকে তাকাল। মুহূর্তে পোড়া-গদাই চোখ নামাল, তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, “অনেক লোকই রোজ নানান ধান্দায় দেখা করে। আপনি কার কথা বলছেন যদি জানি না!”

অর্জুন বলল, “তোমার অচেনা লোক। জলপাইগুড়িতে থাকে না। কখনও দ্যাখেনি তাকে তুমি।”

পোড়া-গদাইয়ের চোয়াল শক্ত হল, “আপনি কী করে জানলেন?”

অর্জুন বুঝতে পারল সে ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছে। কিন্তু খুব সাবধানে জাল গোটাতে হবে। সে বলল, “দ্যাখো গদাই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি এমনিতেই আইনের চোখে অপরাধ করেছ। এখনও অবশ্য পথ খোলা আছে। ভেবে দ্যাখো।”

“ঠিক আছে। আপনি কতটা জানেন তা আরও বলুন। এসব তো ধোঁয়া-ধোঁয়া কথা।”

আচমকা টিল ছুঁড়ল অর্জুন, “সেদিন তুমি এয়ার লাইনসের গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ সরিয়েছ?”

হকচকিয়ে গেল পোড়া-গদাই, “কী যা-তা বলছ? আমি ওখানে যাব কেন?”

“তুমি শিলিগুড়িতে যাও না?”

এবার মাথা নিচু করল পোড়া-গদাই। কিন্তু কোনও জবাব দিল না। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, “কথা বলছ না কেন? সিনক্রেয়ার হোটেলে যখন গাড়িটা পৌঁছল তখন একটা ব্যাগ পাওয়া যায়নি। তাই তো?” পোড়া-গদাই এবারও কথা বলল না। অর্জুন ওঠবার ভঙ্গি করল, “তুমি যখন জবাব দিচ্ছ না, তখন আমার কিছু করার নেই। সহদেব বকসি এবার আসবে তোমার কাছে।”

“না”, প্রায় চিৎকার করে উঠল পোড়া-গদাই, “আপনি পুলিশকে কিছু বলবেন না, পায়ে পড়ি।”

“কেন?”

“ছেলে-বউ না খেয়ে মরবে।” প্রায় ককিয়ে উঠল পোড়া-গদাই।

“যখন অন্যায় করো তখন মনে থাকে না কথাটা?”

“বিশ্বাস করুন, লোভে পড়ে করেছি। বাজে ছবি এলে কে ব্ল্যাকে টিকিট

নেবে বলুন। এখন কাটাটার খুব বাজার যাচ্ছে, ফি সপ্তাহে হিট ছবি আসে রূপমায়াতে। রূপশ্রীতে যত রদ্দি সিনেমা। তাই একজন লোভ দেখিয়েছিল বলে দুদিন গিয়েছিলাম।”

“ব্যাগের ভেতর কী ছিল?”

“কোনও লাভ হয়নি ব্যাগ এনে। তিনটে বাস্ক ছিল। চল্লিশটা করে লাইটারের মতো দেখতে অথচ লাইটার নয় এমন জিনিস। কোনও মুখ নেই। বাজারে বিক্রি করতে চাইলে কেউ কিনবে না।”

এত দ্রুত সাফল্য আসবে অর্জুন ভাবতে পারেনি। তিন বাস্ক লাইটার। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর হতেই হবে ওগুলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আসল না জাল। যে লোকটা হরিপ্রসাদ রায়কে জাল লাইটার দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই অত অসতর্কভাবে আসল লাইটার তিনটে বাস্কে আনবে না। কিন্তু জলপাইগুড়ির রাস্তায় আর একটি লোককে সেই লাইটারে সিগারেট ধরাতে দেখা গিয়েছে। ওই লোকটিই কি হরিপ্রসাদের সঙ্গে এক ফ্লাইটে এসেছে এই বাস্কগুলো নিয়ে! অর্জুন বাস্কগুলো দেখতে চাইল। খানিকটা ইতস্তত করে পোড়া-গদাই একটা ব্যাগ নামিয়ে আনল মাথার ওপরের একটা আধা সিলিং থেকে। তিনটে বাস্ক ছিল ব্যাগটায়। তিনটেই খোলা হয়েছে। এবং কয়েক ডজন নীলাভ লাইটার পড়ে আছে তাতে। একটা তুলে নিয়ে সে পকেটে পুরল। পোড়া-গদাইয়ের সামনে খোলার কায়দাটা দেখিয়ে দিলে এগুলোকে আর পাওয়া অসম্ভব হবে। সে বলল, “তুমি এখনই এই বাস্কটা নিয়ে থানায় চলে যাও। সহদেব বকসি যদি ফিরে আসেন, তা হলে তাঁকে বলবে আমি পাঠিয়ে দিলাম, উনি যেন যত্ন করে রেখে দেন।”

পোড়া-গদাই দ্রুত মাথা নাড়ল, “না, না, আমাকে থানায় পাঠাবেন না। দারোগাবাবু বলেছেন যেন কখনও আমার মুখ দর্শন করতে না হয় ওঁকে। লোকটাকে আমার খুব ভয় লাগে।”

অর্জুন বুঝল কথাটা মিথ্যে নয়। সে পোড়া-গদাইকে বলল, “দ্যাখো, আমি এটা ঠিক করছি না। তোমাকে এক্ষুনি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, ব্যাগ চুরি করার অপরাধে। কিন্তু তোমার বন্ধু কাটা-গদাইয়ের অনুরোধে একটা সুযোগ দিতে চাই। তুমি আর জলপাইগুড়ি শহরের বাইরে গিয়ে এইসব কাজ করবে না। হয়তো কত নিরীহ মানুষ তোমাদের হাতে এইভাবে সর্বস্ব হারায়। তুমি শহরের মধ্যে খেটে রোজগার করতে পারো না ভাল পথে? ওই বাচ্চাটা বড় হয়ে তোমাকে চোর বলবে সেটা ভাল লাগবে? তোমরা সিনেমা হলের টিকিটের ব্যবসা ছেড়ে দাও। দেখছ তো, ওতে প্রত্যেক সপ্তাহে আয় হয় না। তার চেয়ে বাজারে আলু-বেগুন নিয়ে বসলে অনেক বেশি লাভ। যাক, এই বাস্কগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি থানায়, তুমি কাটা-গদাইয়ের জন্য এ-যাত্রায় রক্ষে পেলে, মনে থাকে যেন।” কথাগুলো একটানা বলে অর্জুন ব্যাগটা বন্ধ করে ২৩৬

বাইরে বেরিয়ে এল ।

পেছন-পেছন পোড়া-গদাই আসছিল । সে এবার কেমন গলায় জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, সত্যি কাটা-গদা-র জন্য আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন ? কাটা আমাকে ছাড়তে বলেছে ?”

“হ্যাঁ । ও তোমাকে এখনও ভালবাসে । ও চায় তোমার ভাল হোক ।”

“কিন্তু ব্ল্যাক নিয়ে ও হুজুতি করে কেন ?”

“টিকিটের ব্ল্যাক করা বন্ধ হলে আর ওটা করবে না ।” অর্জুন কথাগুলো বলে ভাবল ওকে সঙ্গে আসতে নিষেধ করবে । কাটা-গদাই নিশ্চয়ই এখনও অপেক্ষা করছে । কিন্তু তারপরেই ভাবল, দেখা যাক দু'জনে মুখোমুখি হয়ে কী করে !

কাটা-গদাই দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাছের নীচে । ওদের আসতে দেখে ওর চোখ যেন কপালে উঠেছিল । তাকে ওখানে দেখতে পাবে ভাবতেও পারেনি পোড়া-গদাই । সে যেন কেমন মিইয়ে গেল ।

অর্জুন কাটা-গদাইকে বলল, “তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই । এই ব্যাগটাকে থানায় দারোগাবাবুর কাছে আমার নাম করে পৌঁছে দিতে হবে ।”

পোড়া-গদাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাটা-গদাই বলল, “যেন এসব এনেছে তাকে বলছেন না কেন ? নিজের পাপের নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করুক ।”

হঠাৎ পোড়া-গদাইয়ের ভাবান্তর দেখা গেল, “ঠিক বলেছে ও । আমাকে দিন, আমিই পৌঁছে দিচ্ছি । দারোগাবাবু যদি মুখ দেখে গরাদে পোরে তো তাই হোক ।”

এবার কাটা-গদাই এগিয়ে এসে ব্যাগটা নিজের হাতে নিল, “থাক, যথেষ্ট হয়েছে । আমি চলি । আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?”

অর্জুন হাসল, “আমি জেলাস্কুলের পাশ দিয়ে অমলদার বাড়িতে যাব ।”

কাটা-গদাই ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে দেখা গেল পোড়া-গদাই তার সঙ্গী হল । দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছে, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না । রাস্তাটা অনেক লম্বা, অর্জুন বুঝতে পারল, সে একটা ভাল কাজ করেছে । দূরত্বটা শেষ হবার আগে নিশ্চয়ই ওরা আগের মতো কথা বলবে । দু'মাসের জেল নির্ঘাত পাওনা ছিল পোড়া-গদাইয়ের । কিন্তু সেটা ওকে এভাবে শোধরাতে পারত না ।

পোড়া-গদাই যে ব্যাগ চুরি করে এনেছিল, তাতে জাল-লাইটার রাখা আছে । পথে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হল অর্জুন । কিন্তু এই জাল লাইটার নিয়ে এত জায়গা থাকতে আমেরিকা থেকে ডুয়ার্স-এ আসছে কেন লোকগুলো ? ধরা যাক, জাল-লাইটারকে আসল বলে চালিয়ে ভাল ব্যবসা করতে চায় ওরা । কিন্তু আসল লাইটারের খবর যেখানকার মানুষ জানে না সেখানে জালের আর কী দাম উঠবে ? তা ছাড়া নেপালের দৌলতে এসব অঞ্চলে প্রচুর বিদেশি লাইটার

সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নকল জিনিস কী বাজার পেতে পারে !

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, একটি আসল লাইটার এই শহরে আছে। নকল তিনটে এখন তার কাছে, বাকিগুলি কাটা-গদাই থানায় পৌঁছে দিতে গিয়েছে। তিন-তিনটে লাইটার পকেটে রাখার কোনও যুক্তি নেই। সেই লোকটি এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্জুনের বিশেষ ধারণা, হরিপ্রসাদকে দুর্ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করা হয়েছিল। ওই কদমতলার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপে হরিপ্রসাদকে অবশ করে দেওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। অবশ হয়ে গেলে হাত সরে আসবে স্টিয়ারিং থেকে, পা অকেজো হবে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু উলটোটাও হতে পারত। হরিপ্রসাদের গাড়ি কোনও পথচারীকে চাপা দিতে পারত এবং সে নিজে সামান্য আহত হয়ে বেঁচে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে হত্যাকারী নিশ্চয়ই একটা ঝুঁকি নিয়েছে। কাউকে চাপা দেওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল এবং তা ঘটলে হয়তো গণ-ধোলাই-এ হরিপ্রসাদের প্রাণ বেরিয়ে যেত। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে রে স্পর্শ করার পাঁচ মিনিট পরে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়তো শরীরে থাকবে না। সত্যেন্দ্রনাথের পোস্টমর্টেমে কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু এসবই তার অনুমান। প্রশ্ন হল হরিপ্রসাদকে হত্যা করতে চাইবে কেন আততায়ী। আর সে ওখানে আসছে তাই-বা জানবে কী করে? এই একই হত্যাকারী কী করে সত্যেন্দ্রনাথের শহরে আসার সংবাদ পেল? মাথার ভেতরটায় জট পাকাছিল অর্জুনের।

অমলদার বাড়িতে পৌঁছে অর্জুন হাবুকে চা বানাতে বলল। ডাকে অর্জুনের কোনও চিঠি আসেনি। চিঠিপত্র এলে, সেটা যদি খুব ব্যক্তিগত না হয়, অমলদা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, উত্তর দিতে। আজ সে একটা প্যাকেট পেল। হংকং থেকে প্রকাশিত হয় কাগজটা। কাগজটার নাম ‘ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন’। বিখ্যাত রচনার নামে পত্রিকার নাম। অমলদার কাছে দেশ-বিদেশের অনেক অপরাধ-সংক্রান্ত কাগজ আসে। তাদের মধ্যে ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন আর ‘ব্রেনওয়েভ’ কাগজ দুটোয় তুলনা হয় না। প্যাকেট খুলে ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন নিয়ে বসে গেল সে। এবং তখনই মনে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের গাড়ি পাওয়া যায়নি। ভদ্রলোক যদি আমেরিকার নাগরিক হন তা হলে এখানে গাড়ি পেলেন কোথেকে। এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই গাড়িটা গেল কোথায়? অর্জুন ঠিক করল সমস্ত ব্যাপারটা সে পর পর কাগজে লিখবে। কোনও পয়েন্ট বাদ দেবে না। তারপর বারংবার সেটা পড়লে হয়তো মাথায় ভিন্ন চিন্তা উকি দিতে পারে। অমলদা বলেন, ‘সবসময় কোনও ঘটনাকে যেমন দেখছ, তেমন ভেবো না। সবরকম সম্ভাব্য পথে ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করো। প্রি-অকুপায়েড হওয়া মানে তুমি সত্য থেকে সরে যাচ্ছ।’

কাগজটার কভার স্টোরি, ব্যাঙ্কে তিনটে খুন হয়েছে। তিনটে মানুষকে পোস্টমর্টেম করে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু কোনও বিশেষ যন্ত্র দ্বারা তাদের হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হলে শরীরে যেসব লক্ষণ ফুটে ওঠে তার কোনও চিহ্ন নেই। এই তিনজন ব্যাঙ্কের বিখ্যাত স্মাগলার ছিল। তিনজনই বাড়ির বাইরে মারা গিয়েছে। দু'জন দুটো রেস্টোরাঁতে। একজন মারা গিয়েছে গাড়িতে উঠতে গিয়ে।

খবরটা পড়ে অর্জুনের হাতের তালুতে ঘাম জমল। শুধু হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দেবার মতো কোনও অস্ত্র বের হয়েছে নাকি? শরীরে কোনও আঁচড় থাকল না, সামান্য কালশিটে পর্যন্ত নেই, পোস্টমর্টেমে কিছুই ধরা পড়বে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ মনে করবে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। এই জিনিসটা যদি সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটত, তা হলে পুরো ব্যাপারটাই অজানা থেকে যেত তার কাছে। এবং তখনই তার মাথায় আর একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। যদি জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম সরাসরি কোনও মানুষের হৃদযন্ত্রের দিকে তাক করে টেপা যায় তা হলে... অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না তাতে শুধুই হৃদযন্ত্র অকেজো হয়ে যাবে কি না। পাঁচ মিনিট বাদে পরীক্ষা করলে সবল হবে কি না! তার সামনে পরীক্ষা করার কোনও রাস্তা খোলা নেই। সুধাময় সান্যালের একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'ওই রে একটা বড় হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখে।' তা হলে একটা মানুষের হৃদযন্ত্র বন্ধ হবে না কেন? কিন্তু একথা কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনি জানে না! সে তো স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় বোতামটা ওঁর হৃদযন্ত্র লক্ষ করে টিপতে পারত। নাকি সে আরও বুদ্ধিমান। ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে চেয়েছে হৃদযন্ত্র বন্ধ করে!

পত্রিকাটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে অর্জুনের চোখ একটা বিজ্ঞাপনে আটকে গেল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি থেকে বিজ্ঞাপনটা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা পড়ল সে।

'আমরা দুঃখিত। গত তিন বছর ধরে আমরা একটা বিশেষ ধরনের লাইটার তৈরি করছি। এই লাইটার মূলত ফেডারেল বুয়ো অব ইনভেস্টিগেশন বিভাগের জন্য হলেও সরকারের অনুমতি পাওয়া সার্টিফিকেট দেখালে অল্প কিছু সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। সরকারি আপত্তিতে আর ওই লাইটার বাজারে ছাড়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি কোনও অসং ব্যবসায়ীর দল হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভারতবর্ষে ওই লাইটারের নকল মডেল চালু করার চেষ্টা করেছে। যদিও তারা আমাদের নির্মিত লাইটারের কর্মক্ষমতার অর্ধেকটা আয়ত্ত করেছে, তবু ইতিমধ্যেই নানা বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে সব সাধারণ মানুষ বৈধ অনুমতিপত্র দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে ওই লাইটার কিনেছিলেন, সেগুলো ফেরত নেওয়া

হয়েছে। কিন্তু মাত্র দুটো লাইটারের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সেই দু'জন মানুষ এখন মৃত। আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি কোনও লাইটার এখন বাজারে নেই (শুধু ওই দুটি ছাড়া)। কেউ যদি এই কোম্পানির নামাঙ্কিত লাইটার কেনেন, কিংবা সংগ্রহ করেন, তা আইনত দণ্ডনীয় হবে।’

॥ ছয় ॥

ট্যাক্সিটা কখন এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি অর্জুন। বিজ্ঞাপন তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। মাত্র দুটো ভাল লাইটার বাজারে ছাড়া আছে। এফ. বি. আই. নিশ্চয়ই চাইছে না সেগুলো সাধারণ মানুষের হাতে থাক। কিন্তু যারা ওই দুটো রেখেছে তারা কি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে? এফ. বি. আই. খুঁজে পায়নি বলেই জোন্স অ্যান্ড জোন্স এই বিজ্ঞাপন ছেপেছে। কিন্তু হঠাৎ ডুরাসের এই অঞ্চলে লাইটারগুলো আসতে যাবে কেন? অর্জুনের মনে হল, অমলদা থাকলে ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়ে যেত সহজে। দুটো খুন হল, অথচ কে খুনি, তার উদ্দেশ্য কী, তা-ই ধরতে পারল না সে এখন পর্যন্ত।

এই সময় হাবু এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারায় উঠতে বলল। হাবু যা বলে অমলদা তা স্পষ্ট বুঝতে পারেন। অমলদা বলেন, হাবুর ইশারায় রহস্য নেই। যে মন দিয়ে বুঝতে চায় তার কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। অনেক চেষ্টা করেছে অর্জুন। হাবু বোধগ্রস্ত হলেও মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। এই মুহূর্তে কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল।

ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখতে পেল। জিনসের প্যান্ট, চেক জ্যাকেট পরে যে লোকটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার শুধু গায়ের চামড়াই নয়, ভাবভঙ্গিও বলে দিচ্ছে, বিদেশি। চোখাচোখি হতে লোকটা হাসল। বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। বেশ নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় চুল অল্প।

বারান্দা থেকে নেমে অর্জুন বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল কাছে। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা বলল, “হাই! আমল সোম ইজ দেয়ার?”

অমলদার নামটার এমন হাল দেখে অর্জুন অনেক কষ্টে হাসি চাপল। তারপর গভীর মুখে বলল, “নো। হি ইজ আউট অব দ্য টাউন।”

এখনও ইংরেজি বলতে গেলে তাকে ভাবতে হয়। আগে তো মনে-মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলতে চেষ্টা করত। এখন ঠিকঠাক শব্দ সময়মতো মাথায় আসতে চায় না কিছুতেই। লোকটার হতাশ প্রতিক্রিয়া সহজেই ধরা পড়ল। নিজের মনেই বলল, “মাই গড! হোয়াট শ্যাল আই ডু নাই। মে আই আস্ক ইওর গুড নেম প্লিজ?”

“আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী হিসেবে কাজ করছি। আপনার নাম জানতে পারি?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জেমস, জেমস ব্রাউন। রয় আমাকে বলেছিল, যদি তার কিছু হয় আমি যেন মিস্টার সোমের সঙ্গে দেখা করি।”

“কে রয়?” অর্জুন যাচাই করতে চাইল।

“এস. এন. রায়। উনি কি গতকাল এখানে আসেননি?”

অর্জুন বলল, “আপনি ভেতরে আসুন।” এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা বলল, “আমাকে এবার ছেড়ে দিন সাহেব। অনেকক্ষণ থেকে টাউনে এই ঠিকানা খুঁজতে ঘুরছি। পুরো নাম বলতে পারেন না ইনি। শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়ে সব জেনে এলেন। আমাকে এখনই শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে হবে।”

অর্জুন ইংরেজিতে জেমস ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি আবার শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে চাইছেন? এই ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াতে চাইছে না।”

জেমস বলল, “আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার আজকে এখানেই থাকা দরকার।” কথাটা শেষ করে জেমস পেছনের দরজা খুলে তার লাগেজ নামিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিল। লোকটার মানিব্যাগে প্রচুর টাকা দেখতে পেল অর্জুন। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলে সে জেমসকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। হাবুকে ডেকে দু’কাপ চা করতে বলে আরাম করে বসল সে, জেমসের মুখোমুখি। রহস্যটা বেশ জম্পেশ হচ্ছে। এই প্রথম নিজেকে বেশ স্বনির্ভর সত্যসন্ধানী বলে মনে হচ্ছে তার। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এস. এন. রায়ের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? আর আপনি এখানে আসছেনই বা কোথেকে?”

জেমস এতক্ষণ অর্জুনকে দেখছিল। এবার ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, “আমি কী করে বুঝব তুমি মিস্টার সোমের সহকারী?”

অর্জুন হেসে ফেলল। তারপরেই মনে হল, সত্যি তো, সমস্ত চেনা মানুষের কাছে তার যে পরিচয়টা জানা, তা অচেনা লোকের কাছে অস্পষ্টই তো হবে। কিন্তু কী দিয়ে প্রমাণ করা যায়? ওপাশের ঘরে একটা অ্যালবামে অমল সোম আর তার ছবি আছে। কিন্তু তা থেকে কী প্রমাণ হয়? তা ছাড়া এই লোকটা তো অমল সোমকেই চেনে না। সে বলল, “আমি আপনাকে এই মুহূর্তে কোনও প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু এই শহরের যে-কোনও মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।”

অর্জুনের উত্তর শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জেমস। তার চোখ মাটির দিকে। মনে হল সে কিছু ভাবছে। তারপরে সে মুখ তুলে ফের অর্জুনের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, “অমল সোম কবে ফিরবেন?”

“জানি না। উনি শেষ যে চিঠিটা দিয়েছেন তাতে কিছু জানাননি।” বলতে-বলতে অর্জুনের চিঠিটার কথা খেয়াল হল। সে উঠে টেবিল থেকে

চিঠিটা নিয়ে জেমসের হাতে দিল। যদিও বাংলায় লেখা কিন্তু ইংরেজিতে অর্জুনের নাম আর এই বাড়ির ঠিকানা এবং পেছনে শুধু অমল সোম লেখা রয়েছে। সেটা পড়ে যেন জেমসের একটু স্বস্তি হল। অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করল, “অমল সোমের খবর আপনি পেলেন কোথেকে?”

“বললাম তো, রয় আমাকে বলেছিল। রয়ের এক আত্মীয় নিউইয়র্কে থাকেন। তাঁর কাছে সে শুনেছিল মিঃ সোম নাকি খুব বুদ্ধিমান ডিটেকটিভ। নর্থবেঙ্গলে কোনও ব্যাপার ঘটলে তিনি সাহায্য করতে পারেন। আমাদের যখন কাঠমাণ্ডু থেকে দিল্লি হয়ে বাগডোগরায় আসা প্রয়োজন হল তখন রয় ঠিক করল ওঁর কাছে আসবে। আমি শিলিগুড়িতে থেকে গিয়েছিলাম। কথা ছিল, আজ সকাল সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কোনও খবর না পেয়ে এখানে এসে জানলাম হি ইজ ডেড।”

“আপনি কি জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানি থেকে আসছেন?”

প্রশ্নটা শোনামাত্র সোজা হয়ে বসল জেমস, ওর মুখে অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটল, “হাউ ডু যু নো?”

অর্জুন বলল, “শোনো জেমস। আমি গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছু জেনে গেছি। কিন্তু আমিও তো জানি না তুমি কে? সুতরাং তোমাকে কিছু বলার নেই।”

এই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল বাইরে। গেট খুলে সহদেব বকসি ভেতরে ঢুকলেন।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আসুন সহদেবদা!”

সহদেব বকসি জেমসের দিকে তাকালেন। জেমস তাঁকে বলল, “হা-ই।”

সহদেব বললেন, “যাক, তা হলে সাহেব এখানে পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা একটু গোলমালে মনে হচ্ছে এখন। সত্যেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করা মাত্র ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের লোক পৌঁছে গেল জলপাইগুড়িতে। ওকে বললাম, অমলবাবু শহরে নেই, তবু বিশ্বাস করল না। কী বলে এ?”

অর্জুন বলল, “এখনও কিছু বলেনি। আসলে আমি যে অমলদার সহকারী তা বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও।”

সহদেব বকসি এবার ইংরেজিতে জেমসকে বললেন, “অর্জুন খুব ব্রাইট ছেলে। অমল সোমকে ও সাহায্য করে। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে ওর কী করণীয় আছে বুঝতে পারছি না।”

তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ও হ্যাঁ, যে জন্য তোমার কাছে এলাম। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রায়বাবুর ছেলের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। কারণ তার কোনও নিদর্শন ডাক্তার পায়নি। তা হলে ভদ্রলোক অমন করলেন কেন, বোঝা যাচ্ছে না। আর তুমি কী পোড়া-গদাইকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে?”

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, “হাঁ। কেন, কী হয়েছে?”

“পোড়া-গদাই থানায় এসে বসে ছিল আমার জন্য। সে সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম। সে বলছে, তার সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, যা তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে বলেছিলে। হঠাৎ তার শরীর অবশ হয়ে যায়। যখন হুঁশ আসে, তখন ব্যাগটাকে খুঁজে পায় না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল বলে পড়ে যায়নি। পুরো ব্যাপারটাই বানানো মনে হচ্ছে। ওর শরীর অবশ হয়ে গেল আর ব্যাগটা কেউ নিয়ে গেল! ইয়ার্কি আর কি! আমি ওকে থানায় আটকে রেখেছি। ওর বন্ধু কাটা-গদাইকেও ছাড়িনি। কী ব্যাপার বল তো?”

অর্জুনের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। পোড়া-গদাইকে থানার মধ্যে কে অবশ করে রাখবে? একটা লোক কখনও নিঃশ্বাসে বসে থাকতে পারে? তা হলে কি জলপাইগুড়ির থানার মধ্যে সে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে, যার কাছে আসল লাইটার আছে! লোকটা কে? পোড়া-গদাইয়ের দিকে তাক করে দ্বিতীয় বোতাম টিপলে সে মরে গেল না, শুধু অবশ হয়ে বসে রইল! লোকটা জানলই বা কী করে পোড়া-গদাই জাল লাইটার-বোঝাই সুটকেসটা নিয়ে থানায় এসেছে! লোকটা যদি নাই চায় জাল লাইটারের কথা পাবলিক জানুক, তা হলে রায়বাবুর ছেলেকে কেন উপহার দিতে গেল। অবশ্য রায়বাবুর ছেলের সহযাত্রী আর এই লোকটি যদি আলাদা না হয়।

সহদেব বকসি জিজ্ঞেস করলেন, “কী হল? কী ভাবছ?”

অর্জুন চট করে সিদ্ধান্ত নিল না, এখনই সহদেব বকসিকে লাইটারের কথা বলা উচিত হবে না। ব্যাপারটা উনি বিশ্বাসই করবেন না। সে বলল, “ওই সুটকেসটা কার বোঝা যাচ্ছিল না বলে পোড়া-গদাইয়ের হাত দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।”

“কার বোঝা যাচ্ছিল না মানে? পেলো কোথায়?”

“পোড়া-গদাই এনেছিল। ওর কোনও বন্ধু বোধহয় চুরিচামারি করে।”

“চোরাই মাল। কিন্তু থানায় এসে কে নিয়ে যাবে সেটা?”

“যার মাল সে।”

“বুঝলাম। এটা আবার কাউকে বলে বোসো না, থানা থেকেও চুরি যায়। কিন্তু ওই অবশ হওয়ার গল্প। নিজেই সরিয়ে গল্প ফাঁদেনি তো?”

“না, না। তা হলে থানাতেই নিয়ে যেত না। হয়তো মাথা ঘুরে গেছে কোনও কারণে আর সেই ফাঁকে কেউ নিয়ে গেছে ওটা। আপনি বরং ওদের ছেড়ে দিন।”

“ছেড়ে দেব বলছ? ওরা সিনেমায় টিকিট ব্ল্যাক করে।”

“সেটা তো শহরের সবাই জানে।”

“আচ্ছা চলি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা জানার পর মেজাজ খিঁচড়ে আছে। ওটা যদি অন্য কিছু হয় তো আমার দফা রফা হয়ে যাবে।” সহদেব বকসি

জেমস ব্রাউনকে জানান, যদি তাঁর দ্বারা কোনও উপকার হয় তা হলে তিনি সবসময় করতে রাজি আছেন। আপাতত তাঁর থানায় জরুরি কাজ আছে বলে চলে যেতে হচ্ছে।

সহদেব বকসি চলে গেলে জেমস এবার নীরবতা ভাঙল, “জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নাম তুমি জানলে কী করে? ইন্ডিয়াতে তো কারোর জানার কথা নয়!”

এই সময় হাবু এসে দুই পেয়ালা চা দিয়ে গেল। জেমসের যেন তার খুব প্রয়োজন ছিল। অর্জুন পকেট থেকে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটারটা বের করে জেমসের হাতে দিল। তার পকেটে তখনও দ্বিতীয় লাইটারটা রয়েছে। সেটার কথা সে ইচ্ছে করেই জানাল না।

খুব অবাক হয়ে গেল জেমস, “মাই গড! তুমি এটাকে কোথেকে পেলে?”

সে দ্রুত লক্ষ্য খুলে প্রথম ও দ্বিতীয় বোতাম টিপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অর্জুন সেটা লক্ষ্য করে বলল, “তোমার পকেটেও নিশ্চয়ই একটা রয়েছে?”

জেমস নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। অর্জুন তখন উঠে সদ্য-আসা পত্রিকার পাতা খুলে বিজ্ঞাপনটা জেমসের সামনে ধরল। তৎপর চোখে বিজ্ঞাপনটা পড়ল জেমস। অর্জুন বলল, “এটা এস. এন. রায়ের লাইটার। উনি গতকাল এখানে এসেছিলেন। যাওয়ার সময় ভুল করে ফেলে গিয়েছিলেন।”

“আই, সি,” বলে জেমস ব্রাউন চোখ বন্ধ করল। তারপর বলল, “তুমি যদি কিছু মনে না করো, তা হলে আমাকে বলবে, ঠিক কী কী জানো এবং কেমন করে জানো?”

অর্জুন বলল, “আমি তোমাকে কী করে বিশ্বাস করব?”

জেমস চটপট ওর পরিচয়পত্র বের করে দেখাল। সেখানে তার ছবিও আছে। অর্জুন তবু বলল, “এটাও যে জাল নয় তা বুঝব কী করে?”

জেমস চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, “কী প্রমাণ চাও?”

অর্জুন এবার হাসল, “জেমস, আমি কিছুটা আন্দাজ করেছি, কিন্তু মিলিয়ে নিতে চাই। তুমি আর এস. এন. রায় কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা থেকে কাঠমণ্ডুতে এসেছিলেন?”

জেমস ব্রাউন অবাক হয়ে গেল। সে বলল, “তোমার বয়স দেখে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি বুঝতে পারছি তুমি কিছু তথ্য জেনে গেছ। গতকাল রয় এখানে না আসার ব্যাপারে তো তোমার কোনও জ্ঞান হওয়া সম্ভব ছিল না। রয় বলেছিল, অমল সোমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি নেই। তুমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু এই ঘরে কথা বলা কি নিরাপদ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “এই ঘরের ধারেকাছে কেউ এলে সে হাবুর চোখে

পড়বেই। ও কথা বলতে পারে না বলেই বোধহয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো খুব সজাগ। তুমি শুরু কর।”

জেমস ব্রাউন শুরু করল, “এস. এন. রায় জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি লাইটার সম্পর্কে তুমি কি...”

“আমি সব জানি। যারা জাল লাইটার তৈরি করেছে তারা সব পেয়েছে শুধু রে তৈরি করতে পারেনি।”

“মাই গড। ভারতীয় তরুণরা এত বুদ্ধিমান হয় আমার জানা ছিল না। হ্যাঁ, যারা ওই লাইটার জাল করেছে তারা সেকেন্ড বোতামটা টিপে রে বের করার কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারেনি। কিন্তু তাতেই কোম্পানির যা ক্ষতি হবার হয়ে যাচ্ছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স ফেডারেল ব্যুরোকে সাপ্লাই দিত। বাজারে যা ছেড়েছিল লাইসেন্সের বদলে তা তুলে নিয়েছিল সরকারের আপত্তিতে। শুধু দু'জন জানিয়েছিল তারা লাইটার হারিয়ে ফেলেছে। আমরা দেখেছি লোক দুটোর মিথ্যে বলার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ওই দুটো লাইটার বাজারে এমন লোকের হাতে গিয়েছে যা শুধু অপরাধীদের হাত শক্ত করবে না, এফ. বি. আই.-কে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করেছে। প্রতিটি লাইটার পরীক্ষা না করে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না, ওটা ঠিক না জাল।

“জোন্স অ্যান্ড জোন্স এবং এফ. বি. আই. যুক্তভাবে ওই লাইটার দুটো উদ্ধার করতে চায়। এই মুহূর্তে কয়েকটা দল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দুটো আসল লাইটার খুঁজে যাচ্ছে। মোটামুটি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। হংকং, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, থাইল্যান্ড অঞ্চলে জাল লাইটার তৈরি হচ্ছে। এবং আমাদের বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তি আছে যে জাল লাইটার যারা তৈরি করেছে তাদের কাছেই আসলটি রয়েছে। দিন বারো আগে আমাদের কাছে খবর এল, সন্দেহভাজনদের একজনকে কাঠমাণ্ডুতে দেখা গেছে। তারা চাইছে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে লাইটারগুলোর ব্যবসায়িক এলাকা বিস্তৃত করতে। আমরা ভারত সরকারকে ব্যাপারটা জানিয়েছি। কিন্তু আমাদের হাতে হঠাৎ একটি লাইটার এল। ওগুলো দেখতে অবিকল জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি লাইটারের মতো। প্রথম বোতাম টিপলে ফ্লেম দেখা যায় না কিন্তু সিগারেট ধরানো যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় চার্জ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে দ্বিতীয় বোতাম টিপে ছুঁড়ে দিলে একটা শক্তিশালী গ্রেনেডের চেয়ে বেশি কাজ করে। ওরা রে আবিষ্কার করেনি, কিন্তু লুকানো গ্রেনেড আবিষ্কার করে ফেলেছে। বুঝতেই পারছ, এই লাইটারগুলি তাদের কাছে কতখানি মূল্যবান, যারা ওটা ব্যবহার করতে চায়। হোয়াইট হাউসে বেড়াতে গিয়ে সিগারেট ধরাবার নাম করে কেউ যদি ওটা ব্যবহার করে, তা হলে যা হবে কল্পনা করতে চাই না আমরা। সিঙ্গাপুরে যে-লোকটি ধরা পড়েছে সে আমাদের জানিয়েছিল,

ওরা তরাই অঞ্চলটাকে ঘাঁটি করতে চায়। এখান থেকে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রভিন্স, বাংলাদেশ এবং নেপাল, ভুটানকে বাজার তৈরি করবে। লোকটার কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে, পরদিনই পুলিশের হেফাজতে লোকটি মারা যায়। তার হৃৎপিণ্ড শুধু অচল হয়ে গিয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি, ওটা জোস অ্যান্ড জোস-এর আসল লাইটার ব্যবহার করে করা হয়েছিল। এনি ওয়ে, উই ওয়ান্ট টু স্টপ দিস! আমরা যখন এই অঞ্চলের ম্যাপটা স্টাডি করছিলাম, তখন লক্ষ করলাম, ইন্ডিয়ান পুলিশ দীর্ঘ এলাকাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই সময় রয় অমল সোমের কথা বলল। পাঙ্কদের সঙ্গে ওঁর নাকি একটা এনকাউন্টার হয়ছিল, এবং তাদের কাছ থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই রিপোর্ট নিউইয়র্ক টাইমসে ছাপা হয়েছিল এবং রয় ওর এক আত্মীয়্যার মাধ্যমে জেনেছিল। সেই আত্মীয়্যার দাদা বোধহয় অমল সোমের পরিচিত। সুতরাং এই ঠিকানা পেতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আমরা ঠিক করেছিলাম পাঙ্কদের ব্যাপারটা যিনি ট্যাকল করতে পেরেছেন, প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য নেব। লোকটির সম্বন্ধে কাঠমাণ্ডুতে আসবার পর আমরা হতাশ হলাম। ওখানে সঠিক সোর্স না থাকলে কাউকে খুঁজে বের করা মুশকিল। রয় জানতে পারল কাঠমাণ্ডু থেকে বাই রোড শিলিগুড়িতে যাওয়া যায়। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যাচ্ছে এমন লোক কম নয়। সেই সময় আমরা জানতে পারলাম দ্যাট ম্যান ইজ নাউ ইন ডুয়ার্স। রয় এল প্লেনে। আমি বাসে। কথা ছিল শিলিগুড়িতে আজ আমরা মিট করব। দ্যাটস অল।”

কথা শেষ করে জেমস তার চুলে হাত বোলাল। ব্যাপারটা বোধহয় ওর মূঢ়াদোষ।

অর্জুন জিপ্সেস করল, “তুমি থানায় গেলে কেন? এস. এন. রায় ঠিকমতো না পৌঁছনোতেই তোমার কেন মনে হল থানায় যাওয়া উচিত?”

জেমস বলল, “আমাদের মধ্যে তাই কথা ছিল। নাউ টেল মি, তুমি কী করে এত জানলে?” অর্জুনের মনে হচ্ছিল জেমস ঠিকঠাক বলেছে। সে যখন বলতে আরম্ভ করল তখন আর কোনও আড়াল রাখল না। পোড়া-গদাইকে দিয়ে সে লাইটারগুলো থানায় পাঠিয়েছিল এটাও জানাল। এইমাত্র সহদেব বকসি জানিয়ে গেলেন যা উধাও হয়ে গেছে থানার চত্বর থেকেই।

জেমস সব শুনে চুপচাপ বসে রইল খানিক, “তুমি কি মনে করো রায়বাড়ির ছোট ছেলে ওই দলটার সঙ্গে যুক্ত। কেন সে গাড়ি নিয়ে ওইসময় বেরিয়েছিল?”

“আমি বুঝতে পারছি না। তবে সে এখন থাকে তোমাদের দেশে। সেই সূত্রের যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। কোথায় গিয়েছিল সেটা জানতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হত অবশ্য।”

জেমস বলল, “ওর ভাইয়ের কথামতো যে লাইটারটা ওর কাছে ছিল, সেটা

এখন কোথায় ?”

এবার অর্জন পকেট থেকে দ্বিতীয় লাইটারটা বের করে দিল, “অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর উদ্ধার করার সময় কাটা-গদাইয়ের এক শাগরেদ এটাকে পকেট থেকে সরিয়েছিল।”

সন্তর্পণে লাইটারটাকে ধরে জেমস জিঞ্জের করল, “এটাকে পরীক্ষা করেছ ?”

“হ্যাঁ, জাল।” অর্জন নিশ্চিত গলায় বলল।

জেমস মাথা নাড়ল, “আমার মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোক লোভের শিকার হয়েছে। শুধু একটা জাল লাইটার থাকার কারণে কেউ ওকে হত্যা করবে না। রয়কে হত্যা করার অবশ্যই একটা কারণ আছে। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্বড। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দিস চ্যাপ ?” এবং তখনই অর্জনের মাথায় একটা চিন্তা চলকে উঠল। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রায়বাবুর ছোট ছেলের পদবি এক। এবং এঁরা দু’জনেই এসেছেন আমেরিকা থেকে। দু’জন আগে থেকেই দু’জনকে চিনতেন কি ?

জেমস বলল, “তুমি একটা কাজ করতে পারো। আমার অনুমান, খুব অল্পের জন্যে তুমি বেঁচে গেছ। ওই ব্যাগে যে ক’টা লাইটার দেখেছ তার সবগুলোই যে নিরীহ হবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আর নেই বলেই ওরা ব্যাগটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ওই জাল লাইটার এখানে একশো-দুটো টাকার বেশি দামে বিক্রি হবে না। ওরা অত অল্পের জন্যে অত কষ্ট করবে না। লাইটারগুলো মেশানো ছিল। তুমি সৌভাগ্যক্রমে নিরীহ লাইটারটায় হাত দিয়েছিলে। কিন্তু এ সবই আমার অনুমান। তুমি নিহত ছেলোটর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে পারো, গতকাল কেউ তার সঙ্গে দেখা করেছিল কি না। কিংবা কোথায় যাচ্ছিল সে ? অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট কার যা এস. এন. রয় ভাড়া করে এনেছিল !”

অর্জন মাথা নাড়ল। তারপর জিঞ্জের করল, “তুমি আজ রাতে কি এই শহরে থাকবে ?”

“অফ কোর্স।” জেমস বলল, “আমাদের প্রতিপক্ষ এখানে আছে। কিন্তু তোমার সাহায্য চাই। একজন বিদেশি হিসেবে আমি একা কিছু করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। রয় যেখানে ছিল সেখানে জায়গা পেতে অসুবিধে হবে ?”

অর্জন চিন্তিত গলায় বলল, “সেখানে থাকাটা ঝুঁকি হয়ে যাবে না ?”

জেমস উঠে দাঁড়াল, “প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু নিয়ে আমরা হাঁটাচলা করি। আমার যদি কিছু হয় তা হলে কলকাতার আমেরিকান কনস্যুলেটে জানিয়ে দিও। লেটস্ গো টু দ্যাট জেন্টলম্যান যিনি টোব্যাকো পত্রিকা পড়েন।”

“সুধাময় সান্যাল ? কেন ?”

“আমার ভয় হচ্ছে তিনি খুব বেশি জেনে গেছেন, এটাই তাঁর অপরাধ হতে

পারে । ”

বিশাল ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটছিল জেমস । কয়েক পা এগিয়েই ওরা রিকশা পেয়ে গেল । অর্জুন দেখল শহরের রাস্তায় তাকে একজন বিদেশির সঙ্গে রিকশায় বসে থাকতে দেখে অনেকেই ঘুরে-ঘুরে তাকাচ্ছে । এখন ঘন বিকেল । অর্জুনের খিদে পাচ্ছিল । সুধাময় সান্যালের বাড়িতে গেলে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম । অমলদা থাকলে এক কাপ কফি আসে দুধ-চিনি ছাড়া । সে জেমসকে বলল, “আমরা যদি পাঁচ মিনিট রিকশাটা দাঁড় করাই তা হলে তোমার কি খুব আপত্তি হবে ? আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে । ”

জেমস হেসে বলল, “তুমি আমার মনের কথা বলেছ । কিন্তু এখানে কী খাবার পাওয়া যায় ! ইন্ডিয়াতে ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির অবিলম্বে ব্যবসা শুরু করা উচিত । ”

অর্জুন ওই কোম্পানির নাম শুনেছে । কম পরসায় সুন্দর খাবারের দোকান করেছে তারা আমেরিকা এবং ইউরোপে । সে বলল, “ওই দোকানে দারুণ রাধাবল্লভি ভাজে । সঙ্গে জিলিপি । ”

“রাধাবল্লভি । হোয়াটস দ্যাট ? ” জেমসের চোখমুখে বিস্ময় ফুটল ।

ইংরেজিতে রাধাবল্লভি শব্দটাকে কিছুতেই অনুবাদ করতে পারল না অর্জুন । সে জেমসকে বলল, “তুমি রিকশা থেকে নেমে দোকানে এসে খাবারটা দ্যাখো । ”

জলপাইগুড়ি শহরের এই অঞ্চলের দোকানগুলো যেমন হয় এটি তেমন । শোকেসে মিস্টি, সামনের বেঞ্চিতে বসে খদ্দেররা খাচ্ছে । পাশের নর্দমার গন্ধটাকে কেউ আমল দিচ্ছে না । সেদিকে তাকিয়ে জেমস মাথা নাড়ল, “তুমি খাও । আমি পারব না । ”

অর্জুন জোর করল না । বিদেশিদের এই ব্যাপারে অনেক মানসিক বিধিনিষেধ আছে বলে সে শুনেছিল । সেটা হাতেনাতে প্রমাণিত হল । দ্বিতীয় রাধাবল্লভি মুখে দেওয়া মাত্র কাণ্ডটা হল । জেমস বসে ছিল রাস্তার পাশে দাঁড় করানো রিকশায় । রিকশাওয়ালা বিশ্রাম পেয়ে নেমে দাঁড়িয়ে খৈনি খাচ্ছিল । বেশ শান্ত চারদিক । ঠিক তখনই গাড়িটাকে যেতে দেখল সে । সেই একই রকম ধুলো-ভর্তি গাড়ি । নান্দারপ্লেটটা পড়ল সে । পশ্চিমবঙ্গের নান্দার । বাঁক নিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা যেন গতি কমাল । ড্রাইভারকে দেখতে পেল না অর্জুন, কিন্তু সে নিশ্চিত যে লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে জেমসকে দেখেছে । অর্জুন তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল । এবং সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা বেরিয়ে গেল । তাকে ওই অবস্থায় দেখে জেমস জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার ? ”

গাড়িটাকে আর দেখতে না পেয়ে অর্জুন ফিরে গেল দোকানে । দাম মিটিয়ে সে ধীরেসুস্থে রাস্তায় উঠে জেমসকে বলল, “আমাদের উচিত রিকশাটাকে ছেড়ে দেওয়া । ”

“কেন?” জেমস অবাক হল।

“এস. এন. রয় যে গাড়িতে আমাদের ওখানে এসেছিলেন, সেই গাড়টাকে আমি এখনই দেখতে পেলাম। নান্দারপ্লেটটা আমি লক্ষ করিনি কিন্তু মনে হচ্ছে সেইটেই।”

জেমস পেছন দিকে একবার তাকাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি নিশ্চিত?”

“মনে হচ্ছে, বললাম।”

“তা হলে ভালই হল। ওরা আমাদের খুঁজে বের করবে। নিশ্চয়ই ওরা জানে রয় তোমার সঙ্গে গতকাল কথা বলেছিল। ওরা এ-কথাও জানে, আমি রয়ের সঙ্গে দেশে এসেছি। অতএব আশা করছি আমরা মুখোমুখি হতে পারব। কিন্তু রিকশা ছাড়তে বলছ কেন?”

“ওরা আক্রমণ করতে পারে।”

“সাক্ষী রেখে কেউ আক্রমণ করে না। উঠে পড়ো।”

অর্জুন যদিও জেমসের পাশে বসল, তবু তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে এখন যাচ্ছে রিকশাটা। জেমসের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে একটা লাইটার চার্জ করে ছুঁড়ে দিলেই কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। করলা সেতু পেরিয়ে আর একটু এগোতেই সে দেখতে পেল, পোড়া-গদাই আর কাটা-গদাই আসছে। পোড়া-গদাইয়ের কাঁধে হাত রেখেছে কাটা-গদাই। ওরা দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে লাগল। জেমস জিজ্ঞেস করল, “এরা কারা?”

অর্জুন দ্রুত পরিচয় দিয়ে রিকশাটা দাঁড় করাতে বলল। সামনাসামনি পৌঁছে সে রিকশা থেকে নেমে পোড়া-গদাইয়ের সামনে গিয়ে বলল, “কিছু মনে করো না, আমি ভাবতে পারিনি সহদেবদা তোমাদের ধরে রাখবেন। ছেড়ে দিয়েছেন দেখে খুশি হলাম।”

সঙ্গে-সঙ্গে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পোড়া-গদাই, “আমি কথা রাখতে পারিনি। আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন তা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই আমার।”

কাটা-গদাই মুখ নিচু করল। তাকেও খুব দুঃখিত দেখাচ্ছিল। অর্জুন বলল, “কী করে ব্যাপারটা হল, তা সহদেবদার মুখে আমি শুনেছি। কিন্তু তোমাদের কি নতুন কিছু বলার আছে?”

পোড়া-গদাই প্রথমে মাথা নাড়ল, “আগে বলুন কী করলে ক্ষমা পাব?”

অর্জুন বলল, “তোমাদের যখন কোনও দোষ নেই, তখন কেন ক্ষমা চাইছ। ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি। তোমরা দু'জনে কি সোজা থানায় চলে গিয়েছিলে?”

এবার কাটা-গদাই মাথা নাড়ল, “না। হাটতে-হাটতে হাসপাতালের সামনে

গিয়ে পোড়াকে আমি বলেছিলাম, জিনিসগুলো দেখাতে। ও বলল, খুব দামি-দামি লাইটার আছে ব্যাগে। আমি বললাম যে, আমিও আজ একটা লাইটার পেয়েছিলাম। তখন পোড়া ব্যাগটা খুলে আমাকে লাইটারগুলো দেখাল। আমরা হাসপাতালের সামনের রকে বসে লাইটারগুলো দেখছিলাম। এইসময় একটা লোক আমাদের জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কোথেকে পেয়েছি? আমি তাকে ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু মনে কুমতলবএল। পোড়াকে ধাপ্পা দিয়ে একটা লাইটার সরিয়ে নিলাম। থানায় গিয়ে দেখলাম বড়বাবু নেই। পোড়া একটা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে ব্যাগটাকে পাশে রেখেছিল। আমি সিগারেট খাব বলে বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা নেপালি গাড়ি নিয়ে থানায় এল। সে খুব বড়বাবুর খোঁজ করল। তার কোনও চেনা মানুষ কাল মারা গেছে। মর্গে নাকি ডেডবডি আছে। সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতে চায়। একটু পরে লোকটা বেরিয়ে গেল ব্যাগ হাতে নিয়ে। আমার মনে হল ওটা পোড়ার ব্যাগ। সত্যি কি না দেখবার জন্য ভেতরে ছুটে এসে পোড়াকে হেলান দিয়ে একইভাবে বসে থাকতে দেখলাম, কিন্তু ব্যাগটা নেই। পোড়াকে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিতেই ও বেঞ্চিতে টলে পড়ল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন বড়বাবু কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না আমাদের কথা।”

কাটা-গদাই থামতে পোড়া-গদাই বলল, “আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সে সিগারেট ধরাল, কিন্তু আগুন না জ্বলেই। আমি তাকে বললাম, ওই লাইটার আমি চিনি। তারপরেই আর কোনও খেয়াল নেই। বড়বাবু আমাকে সেপাই দিয়ে পিটিয়েছেন।”

অর্জুন কাটা-গদাইকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি যখন দেখলে একটা লোক পোড়া-গদাইয়ের ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন তাকে ধরলে না কেন?”

কাটা-গদাই বলল, “আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পোড়ার কাছ থেকে কেউ কিছু ছিনতাই করবে ভাবতে পারা যায় না।”

অর্জুন হাত বাড়াল, “লাইটারটা দাও।”

কাটা-গদাই পকেট থেকে সেটা বের করে জিজ্ঞেস করল, “পোড়াকে কী ভাবে অজ্ঞান করেছিল? কোনও গন্ধটুকু শুনিয়ে, তাই না? ও সেটা বলছে না?”

পোড়া-গদাই সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল, “না, না, সত্যি বলছি, কেউ কিছু শোঁকায়নি আমাকে।”

অর্জুন ওদের কিছু বলল না। এরকম একটা অস্ত্রের অস্তিত্ব জানলে ওদের লোভ বেড়ে যাবে।

সে লাইটারটাকে ভাল করে দেখল। আগেরগুলোর সঙ্গে কোনও তফাত নেই। কাটা-গদাইকে সে বলল, “একটা খুব বড় ঝামেলা শুরু হয়েছে।

তোমরা বাড়ি চলে যাও । ”

কাটা-গদাই বলল, “ঝামেলা ? জান লড়িয়ে দেব । কী করতে হবে ?”

“এখন কিছু করতে হবে না । লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবে ?”

“হ্যাঁ । নিশ্চয়ই । তবে হাসপাতালে যে আমাদের প্রশ্ন করেছিল, তাকে মনে হয় চিনি । ”

“আগে নাথুয়া-জলপাইগুড়ি রুটে বাস চালাত,” পোড়া-গদাই জানাল ।

“এখন কী করে ?”

“জানি না । অনেক বছর দেখিনি । খোঁজ নিতে পারি । তবে সেই লোক আর থানার লোক এক নয় । ” কাটা-গদাই নিশ্চিত হয়ে বলল ।

অর্জুন বলল, “তা হোক, তবু তোমরা ওর খবর নিয়ে যদি পারো একবার রাত্রে আমার বাড়িতে এসো । ”

আবার রিকশায় উঠে বসে জেমসকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল অর্জুন । এতক্ষণ জেমস চুপচাপ ওদের দেখেছে । এবার জিজ্ঞেস করল, “এরা কি লোকাল ক্রিমিন্যাল ?”

অর্জুন একটু সময় দিল, “না, ঠিক ক্রিমিন্যাল বলা যায় না, আবার বলতেও পারো । এরা দুটো সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাক করে । এতদিন শত্রু ছিল, আজ বন্ধু হয়েছে । ”

জেমস হেসে জিজ্ঞেস করল, “কী রকম ?”

অর্জুন তখন ব্যাপারটা বলল । তারপর হাতের লাইটারটার লক খুলল । সঙ্গে-সঙ্গে জেমস চাপা গলায় বলল, “সাবধানে বোতাম পুশ করবে । ”

“এটা তো জাল । ”

“জাল তো নিশ্চয়ই । কিন্তু কী ধরনের জাল তা তো জানি না । ”

সুধাময় সান্যালের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল রিকশাটা । অর্জুন ওকে দাঁড়াতে বলল ।

সঙ্গে হয়ে আসছে । তিস্তা বাংলোতে যাওয়ার রিকশা এটাকে ছেড়ে দিলে পাওয়া যাবে না ।

হাতের লাইটারটার লক তখনও খোলা । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এটাকে কী ভাবে পরীক্ষা করব ?”

জেমস একটা সত্যিকারের জাল লাইটার আর এইটের ওজন এক কি না অর্জুনকে হাতের তালুতে রেখে যাচাই করতে বলল । সেটা করামাত্র অর্জুন কাটা-গদাইয়ের সরানো লাইটারটার ওজন বেশি টের পেল । সে জেমসকে বলল, “এটা এত ভারী ভাবিনি । ”

জেমস ওর হাত থেকে লাইটারটা তুলে নিল । তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল । শেষ পর্যন্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল, “দ্যাখো, নতুন লাইটারটার পেছনে লেখা রয়েছে জোন্স অ্যান্ড জোন্স । এ. এন. রয়েছে, ডি.

নেই। অবশ্যই এটা সংকেত, যারা ব্যবহার করে তারা জানে! তোমার লোক যদি লোভ সামলে হাতসাক্ষাই না করত তা হলে এইটের অস্তিত্ব আমরা টের পেতাম না। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বোতাম টিপলেই বিস্ফোরণ হবে। অবশ্য তার আগে আমাদের এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা উচিত।” খুব সাবধানে ওটা নিজের পকেটে রেখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল জেমস।

অর্জুন বলল, “এখানেই সুধাময় সান্যাল থাকেন। বৃদ্ধ মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। এককালে কলেজে পড়াতেন। কিন্তু লাইটারটার সম্পর্কে জানা গেল না।”

জেমস বল, “কী জানতে চাও? এটা ছুঁড়লে বিস্ফোরণ হয় কি না? যদি হয় তা হলে এটা আর কাজে লাগবে না। তাই না?”

“বিস্ফোরণ হলে কী রকম হবে?”

“একটা হাতি মরে যাবে, এইমাত্র।”

অর্জুন কথা না বলে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিল। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তিটা থেকেই গেল। ওই লাইটার সত্যি বিস্ফোরক কি না তা না ছুঁড়লে জানা যাবে না। কিন্তু সেটা না হলে জেমসের ধারণা সঠিক বলে প্রমাণ হবে না। সেক্ষেত্রে নানারকম সন্দেহ উঠতে পারে।

সুধাময় সান্যালের ভৃত্য দরজা খুলল। অর্জুনকে দেখে বলল, “বাবুর শরীর খারাপ, আজ কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।”

অর্জুন অবাক হল। এরকম তো কখনও হয়নি। একবার সুধাময় সান্যালের ম্যালেরিয়া হয়েছে শুনে সে অমলদার সঙ্গে দেখতে এসেছিল। তখন তো কোনও বাধা পায়নি। সে ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল, “বাবুর কী হয়েছে?”

“আমি ঠিক জানি না, তবে দেখা হবে না।”

“ডাক্তার এসেছিল?”

“সেটাও জানি না।”

অর্জুন জেমসকে সংবাদটা অনুবাদ করে জানাল। জেমস জিজ্ঞেস করল, “এই লোকটা যে বিশ্বাসযোগ্য তাতে তুমি নিশ্চিত?”

অনেকদিন ধরে ভৃত্যটাকে দেখছে অর্জুন। অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কথাটা জানালে জেমস বলল, “জিজ্ঞেস কর তো, একটু আগে কেউ এসেছিল কি না।”

ভৃত্যটা বলল, “দু’জন লোক এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা এই সাহেবের মতন। তারা কথা বলে চলে যাওয়ার পর থেকেই বাবুর শরীর খারাপ করেছে।” অর্জুনকে সে চেনে বলেই এত কথা বলল, নইলে বলত, “বাবু বলেছেন কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলতে।” চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল।

“দু’জন লোক এসেছিল। তার মধ্যে একজনকে তোমার মতো দেখতে।”

“প্রত্যেকটা রাউন্ডে হারছি আমরা।” বিড়বিড় করল জেমস, “প্রার্থনা করছি, এই ভদ্রলোক বেঁচে থাকুন। চল, আমরা আস্তানার খোঁজে যাই।”

অর্জুন রিকশার কাছে চলে এল। সুধাময় সান্যালের ব্যবহারে সে খুব দুঃখিত হয়েছিল। লোক দুটো কী কথা বলল যার জন্য ভদ্রলোক জনসংযোগ ত্যাগ করতে চাইছেন! জেমসের মতো দেখতে, বলল ভৃত্যটা। তা হলে কি আর একজন আমেরিকান এই শহরে এসেছে? তা হলে গদাইরা তো সে কথা বলত! জেমস যাই বলুক, সুধাময় সান্যাল মারা যাননি। ভৃত্যটি এতবড় কথা চেপে যেত না। সুধাময় সান্যাল থাকেন দোতলায়। অর্জুনের মনে হল, কেউ যেন ব্যালকনি থেকে চট করে সরে গেল। সে জেমসকে রিকশায় অপেক্ষা করতে বলে বাড়িটার একপাশে চলে এল। বৃষ্টির জলের পাইপ ছাদ থেকে ব্যালকনির পাশ দিয়ে নীচে নেমে এসেছে। অর্জুন পাইপটা ধরল। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যালকনিতে পৌঁছে গেল সে। এখন সন্ধে হয়ে গেছে। মশার কারণে আশেপাশের বাড়িগুলোর জানালা বন্ধ। ফলে অর্জুনের মনে হল, সে কারও চোখে পড়েনি। রেলিঙ টপকে ব্যালকনিতে ঢুকতেই সে সুধাময় সান্যালকে দেখতে পেল। পেছনে হাত রেখে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছেন।

“আপনার শরীর খারাপ?” অর্জুন স্পষ্ট জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফেরালেন সুধাময় সান্যাল আর সেখানে আতঙ্ক ফুটে উঠল। এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি, “তুমি? তুমি কী করে উপরে উঠে এলে? নো, নো, ইটস নট গুড। এইভাবে বাড়িতে ঢুকতে পারো না তুমি!”

অর্জুন ঘরে ঢুকল, “আপনার কী হয়েছে? এরকম ব্যবহার করছেন কেন আপনি?”

দ্রুত ভেতরের দরজার দিকে ছুটে গেলেন সুধাময়। তারপর চলে এলেন ব্যালকনিতে। মুখ ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকালেন। তারপর ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “সাহেবটা কে?”

“আমেরিকান। অমলদার কাছে এসেছে।”

“অমল! অমল ফিরেছে?” সুধাময় ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন।

“না।”

উত্তরটা শোনামাত্র সুধাময়ের মুখে কালো ছায়া নামল। তিনি বললেন, “অর্জুন, তুমি এখনই চলে যাও। কিছুদিন আমি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না।”

অর্জুন শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, “কেন?”

“জোস অ্যান্ড জোস, অর্জুন জোস অ্যান্ড জোস আমার সর্বনাশ করেছে। এখন আমি আমার কাজের লোককেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ওই লোকগুলো সত্যিকারের খুনি।” কথাগুলো বলার সময় ওঁর মুখের ভঙ্গি

বোঝাল তিনি যথার্থই ভীত ।

“ওরা কী বলেছে আপনাকে ?”

“ওরা ! কাদের কথা বলছি তুমি জানো ?”

“না । তবে অনুমান করতে পারি । জোস অ্যান্ড জোস-এর লাইটার জাল করে এদেশে যারা ব্যবসা করতে চায়, তারাই এসেছিল আপনার কাছে । আপনি কি জানেন গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওরা দু’জন মানুষকে খুন করেছে, যাদের কাছে জাল লাইটার ছিল ? ওরা কী করে জানল যে, আপনি লাইটারটার ব্যাপারে সব খবর রাখেন ?”

“রায়বাবুর ছোট ছেলে ওদের বলেছে, আমি এই লাইটারটার সম্পর্কে সমস্ত লিটারেচার পড়ে জেনেছি । আমিই বলেছি তার সঙ্গে আনা লাইটার জাল । ওরা আমাকে শাসিয়ে গিয়েছে আমি যেন কারও সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা না বলি । বললে কী হবে, তা আমার বেড়ালটার ওপর পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছে ।” সুধাময় সান্যাল হাত বাড়ালেন টেবিলটা দেখাতে । সেখানে বেড়ালটা পাশ ফিরে শুয়ে ছিল । কিন্তু সচেতন চোখে অর্জুন বুঝল ও বেঁচে নেই । জীবিত বেড়াল অতক্ষণ পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে পারে না !

হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওরা আপনাকে দয়া দেখাবে কেন ? শুধু ভয় দেখিয়ে চলে যাওয়ার পাত্র তো ওরা নয় ।”

“আমি জানি না, বিশ্বাস কর, আমি জানি না । হরিপ্রসাদের কাছে টেলিফোনে ওরা আমার কথা জেনেছিল । ওদের খুব তাড়া ছিল । একজন চেয়েছিল আমায়... ।” ঢোক গিললেন সুধাময়, “কিন্তু দ্বিতীয়জন বলল, চাকরটা ওদের ঢুকতে দেখেছে । আজ রাত্রে ওরা যখন সামচিতে পৌঁছেছে না, তখন আর ঝুঁকি বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই । সেটা শুনে প্রথমজন সাবধান করে চলে গেল । আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না । ওরা কী চাইছে তাও বলল না । শুধু টোব্যাকো পত্রিকাটি নিয়ে চলে গেল ।”

“সামচি ? আপনি কি ভুটানের সামচির কথা বলছেন ?”

“আমি বলিনি । ওরাই বলল । ভুটান ছাড়া আর কোথাও সামচি নামে কোনও জায়গা আছে বলে জানি না । ওরা কারা অর্জুন ?”

অর্জুন বলল, “অমলদা ফিরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করব । তার আগে আপনি কারও সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন না ।”

যে-পথে ওপরে উঠে এসেছিল সেই পথেই সন্তর্পণে নেমে এল সে । যদিও এর ফলে জামা-প্যাণ্টে নোংরা লেগে গেছে । রিকশায় উঠে সে তাড়াতড়ি তিস্তা বাংলোর দিকে যেতে বলল ।

জেমস জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার ? কী হল ?”

অর্জুন জেমসের দিকে তাকাল । তারপর বলল, “ওরা এসে গুঁকে এমন শাসিয়ে গিয়েছে যে, উনি খুব ভেঙে পড়েছেন । এখন কথা বলার অবস্থায়
২৫৪

নেই।”

“দে আর রিয়েলি ডেঞ্জারাস,” জেমস মন্তব্য করল।

তিস্তা বাংলায় পৌঁছানো পর্যন্ত কোনও বিপদ হল না। ঘর পেতে ওদের কোনও অসুবিধে হল না। এবং সেই ঘরটিই পাওয়া গেল, যেখানে গতকাল সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন। বাবুটিকে খাবার অর্ডার দেওয়ার পর জেমস বলল, “খুব টায়ার্ড লাগছে আজ। কাল সকালে একবার ট্রান্সকল করার চেষ্টা করতে হবে। তার মধ্যে তোমার ওই লোক দুটো যদি কোনও খবর আনে তো সৌভাগ্য বলতে হবে।”

অর্জুন দেখল জেমস তার লাগেজ না খুলেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। সে যাওয়ার জন্য উঠল, “সাবধানে থেকো। যদি কেউ দরজা নক করে তা হলে তৈরি হয়ে খুলবে।”

সেই অবস্থায় জেমস বলল, “থ্যাক্স্। আমি আত্মরক্ষায় অভ্যস্ত।”

॥ সাত ॥

আকাশে বেশ মেঘ। কখন মেঘ জমল তা টের পায়নি অর্জুন। হাটতে হাটতে সে পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করছিল। যারা শহরে এসেছে তারা নিশ্চয়ই স্থানীয় কাউকে সঙ্গী করেছে। না হলে এত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারত না। এই লোক্যাল লোকটি কি সেই ড্রাইভার? তাকেই কি আজ তারা গাড়িটা চালিয়ে যেতে দেখল? সামচিতে যাচ্ছে ওরা। সামচি হল জলপাইগুড়ি থেকে মাইল চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ দূরের ভুটান বর্ডার। নাম শুনেছে, কিন্তু কখনও যাওয়া হয়নি। গাড়িতে দূরের ভুটান বর্ডার। নাম শুনেছে, কিন্তু কখনও যাওয়া হয়নি। গাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে ওরা আজ রাত্রেও এই শহরে থাকছে। এখন ওদের অস্তিত্ব একমাত্র অর্জুন ছাড়া এই শহরের কেউ জানে না। অতএব নিশ্চিত ওরা। কিন্তু আজ রাত্রে কী কাজ ওদের? আবার তার লাইটারটার কথা মনে পড়ল। দু' নম্বর বোতামটা টিপলেই চার্জ হবে এবং তখন হুঁড়ে দিলে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই যে বিস্ফোরণ ঘটবে তাতে একটা হাতি মরে যাবেই। কিন্তু ওই লাইটারটাই যে সেই কর্মটি করবে তা প্রমাণিত হল কই; জেমসের কাছ থেকে চেয়ে আনলে ভাল হত। কথায়-কথায় ওটার কথা আসবার সময় একটুও খেয়াল ছিল না।

জলপাইগুড়ির একমাত্র হোটেলটির সামনে পৌঁছে অর্জুনের মনে হল ভেতরে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবরটা দিয়ে আসে। গতকাল ভদ্রলোক খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবহারে। তাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, “কী খবর। সব ভাল? কালকের লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শুনলাম

তিনি নাকি মারা গিয়েছেন ? আত্মহত্যা ? যা রাগী লোক । আরে ভাই, এই হোটেলের কেউ কোনও বদনাম কখনও করেনি । এই তো এক সাহেব আজ বিকেলে চলে গেলেন, তিনি তো কোনও বদনাম করেননি ।”

কোনও মানুষ মারা গেলেও যারা তার সম্পর্কে রাগ পুষে রাখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না অর্জুনের । তবু সে বলল, “আপনার হোটеле আজকাল খুব সাহেব-মেম আসছে বুঝি ?”

“মেম না শুধু সাহেব । কাল একজন আমেরিকান ছিলেন, আজ চলে গেছেন । আর একজন চাইনিজ এসেছেন । খাওয়াদাওয়ার হেভি ঝামেলা ওদের ।”

“আমেরিকান ভদ্রলোক ? কী নাম বলুন তো ?”

“খাতা দেখে বলতে হবে । হ্যাঁ, রবার্ট মিচেল । চা-বাগানের ব্যবসায় এখানে এসেছেন । খুব ভদ্রমানুষ ।”

চা-বাগানের ব্যবসা এখানে আমেরিকানরা কখনও করেছে কি না অর্জুন জানে না । তবে রাস্তায় চলতে চলতে অর্জুনের মনে হল, রবার্ট মিচেল কেন ওই হোটেল থেকে গেলেন ? তিনি তো টি প্ল্যান্টার্স ক্লাবেই স্বচ্ছন্দে জায়গা পেতে পারতেন ।

বাড়ির সামনে এসে সে অবাক হল । তাদের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে । তার মানে কেউ দেখা করতে এসেছে । ইলেকট্রিকের বিল বেশি ওঠে বলে মা অকারণে বাইরের ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখেন না । সে নক করতেই যিনি দরজা খুললেন তাঁকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল অর্জুন । দরজা খুলে নির্বিকার ভঙ্গিতে চেয়ারে ফিরে গিয়ে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট পত্রিকা ওলটাতে ওলটাতে অমল সোম বললেন, “মাসিমা একা থাকেন । এত রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরার কী দরকার তা বুঝি না !”

অর্জুনের সময় লাগল স্থির হতে, “আপনি ! আপনি কখন এসেছেন ?”

“এই তো । হাবু বলল তুমি গিয়েছিল । তাই চলে এলাম । মাসিমা বললেন গতরাতেও তুমি বাড়ি ফিরতে দেরি করেছে ।”

অর্জুন উলটো দিকের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, “আপনি বোম্বে থেকে লিখেছিলেন কবে ফিরবেন জানেন না, আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে ।”

অমল সোম কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, “অর্জুন, তোমার বুদ্ধি আগের থেকে অনেক ধারালো, কিন্তু এখনও পুরো হয়নি । আমার চিঠির ওপরে পোস্টাল স্ট্যাম্প দেখেছ ? ওগুলো বোম্বের নয় । যা হোক, হাবু বেচারী এখন হাসপাতালে । খুব সামান্য চোট লেগেছে যদিও । কিন্তু আমাদের বাইরের ঘরটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তুমি আসার আধঘণ্টা বাদেই ব্যাপারটা ঘটে ।”

অর্জুন চমকে উঠল আবার, “কী হয়েছে বাইরের ঘরে ?”

“একজন নেপালি এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে । হাবু তাকে

বোঝাবার চেষ্টা করেছে আমি নেই। তখন সে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। হাবু যা বলে তা সে বোঝেনি। দরজা বন্ধ করার পর হাবু দেখেছে সে সিগারেট ধরাচ্ছে কিন্তু চলে যাচ্ছে না। মনে হয় লোকটা সন্দেহ করেছিল তুমি বাড়িতে আছ। ও বাইরের ঘরে পায়ের শব্দ পেয়েছিল, কিন্তু হাবু তখন পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার ওই ঘরে শব্দ করা সম্ভব না। ঠিক তাই সে কিছু একটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরণটা ঘটে। কী ছুঁড়েছে তা দেখবার জন্য এগিয়ে যেতে হাবু সামান্য আঘাত পায়। আর সেই সুযোগে লোকটা সরে পড়ে।”

অমলদা চুপ করলে অর্জুন উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “ঘরের ভেতরে কে শব্দ করেছিল?”

“আমি। তোমরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র আমি ফিরেছিলাম। হাবুকে আমি নিষেধ করি কাউকে আমার ফিরে আসবার খবর জানাতে। তার কিছুক্ষণ বাদেই ওই গাড়িটা নিয়ে নেপালি লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এই নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।”

“লোকটা কেন এমন করল আপনি অনুমান করতে পারেন?”

“হয়তো কোনওদিন ওকে কোনও অপরাধের জন্য ধরিয়ে দিয়েছিলাম, তার বদলা নিল। লোকটা লাইটার ছুঁড়তে যাচ্ছে দেখেই আমি দ্রুত পাশের ঘরে ছুটে যাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যখন আমি বাড়ির পেছনে, তখনই বিস্ফোরণ ঘটল। লোকটাকে আমি চেষ্টা করলে ধরতে পারতাম। কিন্তু ও অত দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠবে ভাবতে পারিনি। তা ছাড়া লাইটার থেকে বিস্ফোরণ তো কল্পনায় ছিল না।” কথা বলে কান খাড়া করলেন অমল সোম। চাপা গলায় বললেন, “দু’জন লোক বাইরে এসেছে। বাইরে গিয়েই কথা বল। আমি যে ভেতরে আছি তা জানানোর দরকার নেই।”

অমলদার এইভাবে ফিরে আসা এবং নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথা বলা অর্জুনকে এমন অবাক করে দিয়েছিল যে, লাইটার সম্পর্কে অমলদা কতটা জানেন সেটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল। এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন পরিচয় জানতে চাইলে ওপার থেকে উত্তর এল, “আমরা গদাই।”

সম্পূর্ণগে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। পোড়া এবং কাটা-গদাই সামনে দাঁড়িয়ে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “বল, কী খবর?”

কাটা-গদাই বলল, “লোকটার নাম মান সিং। নাথুয়া লাইনে বাস-ড্রাইভারি করত। কিন্তু বড় একটা চাকরি নিয়ে ও নাকি নেপালে চলে গিয়েছিল। অনেক বছর এখানে আসেনি। চার নম্বর গুমটির কাছে ওর বাসা ছিল। দু’দিনের জন্য নাকি বেড়াতে এসেছিল, আজ চলে গেছে ডুয়ার্সে। ওর এক ভাই এখনও আছে চার নম্বর গুমটিতে। সে বলল।”

পোড়া-গদাই বলল, “আমার খুব লজ্জা করছে। আমার দোষেই ব্যাগটা

হারলাম ।”

কাটা-গদাই বলল, “আমাদের দিয়ে যা সম্ভব, তাই করব । ব্যাগটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত শাস্তি পাচ্ছি না । চোরের ওপর বাটপাড়ি ।”

অর্জুন বলল, “মাথা গরম কোরো না তোমরা । যারা ওই ব্যাগ সরিয়েছে তাদের কাছে খুব জোরালো অস্ত্র আছে । তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও, তা হলে খুশি হব । তোমাদের মধ্যে একজন তিস্তা বাংলাতে চলে যাও । সেখানে দেখবে এক দুই তিন চার নম্বরের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে কি না । যদি থাকে তো চলে এসো । কাউকে কিছু বোলো না । আর একজন এখানে অপেক্ষা করো । সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেলে আমাদের জানিয়ে দিও ।”

‘আমাদের’ শব্দটা উচ্চারণ করে সচকিত হল সে । কিন্তু গদাইরা যে সেটা বুঝতে পারেনি তাতে সন্দেহ নেই । কাটা-গদাই বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে । অর্জুন আবার দরজা বন্ধ করে ভেতরে আসামাত্র অমলদা বললেন, “চমৎকার । তোমার উন্নতি দেখে আমার ভাল লাগছে । মনে হচ্ছে, এই কেসটা তুমি নিজেই ট্যাকল করতে পারবে অর্জুন ।”

অর্জুন অমলদার সামনে চেয়ার টেনে বসল, “আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী করে এই কেসটার কথা জানলেন ? কতটাই বা জানেন ?”

অমলদা চোখ বন্ধ করলেন । তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, “আমি চাই না ভারতবর্ষের মানুষের মন বিষাক্ত করতে বিদেশিরা সক্ষম হোক । একদল মতলববাজের হাতে ওই লাইটার তুলে দিতে আমি চাই না । জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি সম্পর্কে আমি যাবতীয় বৃত্তান্ত জানি । তোমাকে আমি বলেছিলাম, ভারতবর্ষে বেড়াতে যাচ্ছি । তাই হচ্ছে ছিল । এই সময় আমেরিকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি চিঠি আমি পাই । তিনি বিটুসাহেবের বোনের কাছ থেকে আমার খবর পেয়েছেন । নিউইয়র্ক টাইমসে পাক্‌দের ঘটনাটা পড়েছেন । ব্যাপারটা জানিয়ে উনি আমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন । ওঁদের কাছে খবর ছিল এই গ্যাংটা কাঠমাণ্ডু হয়ে ডুয়ার্সে আসবে । আমি সুধাময় সান্যালকে লাইটারটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি । তিনি খুব উৎসাহিত হন সংগ্রহ করতে । ফলে আমার অজানা থাকল না ওই বস্তুটির বৈশিষ্ট্য । ভারতবর্ষের বদলে আমি চলে গেলাম কাঠমাণ্ডুতে ।”

“আপনার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল ?”

“হ্যাঁ । আমিই তাঁকে বলেছিলাম জলপাইগুড়িতে গিয়ে আমার খোঁজ নিতে । ওই লাইটার আমার বাড়িতে ফেলে আসতে আমি অনুরোধ করেছিলাম । আমার চিঠি পেলে তুমি লাইটার সম্পর্কে আগ্রহী হবে বলে আমার ধারণা ছিল ।”

“চিঠিটা আপনি কোথায় পোস্ট করেছিলেন ?”

“নিজের নামে আসা পুরনো খামের ভেতরে চিঠিটা ভরে দিয়েছিলাম। ওটা সত্যেন্দ্রনাথ নিজের হাতে নিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখেন। আসলে আমি চেয়েছিলাম আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ওদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নাও।” অমল সোম উঠলেন।

“কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন সেটা আপনি এখানে থাকলে হয়তো হত না। তা-ছাড়া হরিপ্রসাদ রায় মারা গিয়েছেন ওদের হাতেই বলে আমার ধারণা।”

“এগুলো আমি ঠেকাতেও পারতাম না। আমাকে শিলিগুড়িতে থেকে যেতে হয়েছিল তোমার জেমসের জন্য। থেকে অবশ্য লাভই হয়েছে। আমি চলি।” অমলদা পা বাড়ালেন।

“আপনার সঙ্গে জেমসের পরিচয় হয়েছে?”

“বাং,কাঠমাণ্ডুতে একসঙ্গে একটি বেলা কাটিয়েছি আমরা, পরিচয় হবে না?”

“অমলদা, এরা খুব ডেঞ্জারাস। জেমস বলেছে, ওরা লাইটারে মিনি গ্রেনেড রাখতে পেরেছে। বোধহয় সেইটেই ছুঁড়েছিল বাড়ির ভেতরে। একটা লোক গাড়ি চালাতে চালাতে জেমসকে রিকশায় বসে থাকতে দেখেছিল। হয়তো ভেবেছিল আমি তখনও ওই বাড়িতেই আছি। ওরা আজকালের মধ্যে সামচিতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এখনও, এরা কারা? শুধু একটা নাম পেয়েছি মান সিং। আগে ড্রাইভারি করত, এখন নেপালের বাসিন্দা। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও কোনও প্রমাণ নেই। থানায় গিয়ে যে ব্যাগ তুলে নিয়ে এসেছে পোড়া-গদাইকে অবশ্য করে, সে অন্য লোক।”

“তুমি জেমসকে নিয়ে সামচি রওনা হয়ে যাও। আর ও যদি একা যেতে চায় তো যেতে দাও। মনে হয় ভোরের আগেই তোমার ওখানে পৌঁছানো দরকার।”

“আপনি কোথায় যাচ্ছেন?”

“সহদেব বকসির কাছে।” অমলদা নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। অর্জুনের খুব রাগ হচ্ছিল। মাঝে-মাঝে অমলদা এমন ব্যবহার করেন যেন তিনি অর্জুনের কাছের মানুষ নন। এই যে এখন সমস্যার চূড়ায় তাকে রেখে কী নির্গিপ্তভাবে সরে দাঁড়ালেন!

॥ আট ॥

তিস্তা ব্রিজে টোল না দিয়ে যখন অর্জুনরা ছুটে যাচ্ছিল সামচির দিকে, পেছনের সিটে তার পাশে তখন অমলদা বসে। অমলদা চলে যাওয়ার পরে কাটা-গদাই ফিরে এসে জানিয়েছিল, এক দুই তিন চার নম্বর গাড়িটা তিস্তা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

২৫৯

জেমসের জীবনের জন্য সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। দুই গদাইকে সঙ্গে নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল তিস্তা বাংলাতে। গিয়ে দ্যাখে, গাড়িটা নেই। কিন্তু কাটা-গদাই শপথ করে বলে সে গাড়িটাকে বাংলার পাশে দাঁড়াতে দেখেছে। সেই লোকটা গাড়ি থেকে নামে, যে থানায় গিয়েছিল। গাড়িতে আরও একটা লোক বসেছিল স্টিয়ারিং-এর পেছনে। কাটা-গদাইয়ের ধারণা ওই দ্বিতীয়টা লোকটাই মান সিং। অর্জুন নিষেধ করেছিল বলে সে কিছু করেনি, না হলে তার ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে।

অর্জুন সঙ্গীদের নিয়ে ওপরে ছুটে গিয়েছিল। তখন মধ্যরাত। তিস্তা বাংলার প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ। জেমসের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সেখানে ঢুকে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল অর্জুন। কোনও চিহ্ন নেই জেমসের। বাথরুমের দরজা খোলা। তার লাগেজও নেই। অর্জুনের মনে হয়েছিল, আততায়ীরা আরও সাবধানী হয়েছে। তারা জেমসের মৃতদেহ এখানে রেখে যেতে চায়নি। একমাত্র অর্জুন ছাড়া কেউ জানে না জেমস এই বাংলাতে আশ্রয় নিয়েছে। অর্জুন যদি লাইটার-বিশ্লেষণে নিহত হয় তা হলে জেমসের হদিস কেউ পাবে না।

ওরা যখন নীচে নেমে ভাবছে কী করা যায়, তখন আর-একটা জিপ এসে দাঁড়াল সামনে। জিপের পেছন থেকে অমলদা মুখ বাড়ালেন, “উঠে এসো অর্জুন।”

“আপনি?” অর্জুন কাছে এগিয়ে গেল।

“সহদেব বকসির সঙ্গে কথা বলে মনে হল আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত। তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম তুমি নেই। এত রাতে এখানে ছাড়া আর কোথাও যেতে পারো না তুমি। তাই চলে এলাম। উঠে এসো।” অমল সোম সোজা হয়ে বসলেন।

কোনও প্রতিবাদ না করে জিপে উঠল অর্জুন। উঠে বলল, “ওরা জেমসকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমরা যদি আর-একটু আগে পৌঁছতাম তা হলে...” খুব আফসোস হচ্ছিল ওর। অমলদা কোনও জবাব দিলেন না। সামনের সিটে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তাকে দেখে খুব অবাক হল ও। জলপাইগুড়ির এস. পি.-কে সে এই গাড়িতে আশা করেনি। ভদ্রলোক কোনও কথা বলছেন না। সরকারি জিপ বলে তিস্তা ব্রিজ টোল দেবার জন্য দাঁড়াতে হল না।

ময়নাগুড়ি শহরকে বাঁ দিকে রেখে বাড়ের মতো জিপটা ছুটে গেল ধুপগুড়ি, গয়েরকাটা পেরিয়ে। ‘খুঁটিমারি রেঞ্জ’ রহস্যটা সে ওই গয়েরকাটায় উদ্ঘাটন করেছিল। বানারহাটের চৌমাথায় দেখল একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। এস. পি. গাড়িটাকে থামাতে বললেন। বানারহাটের ও.সি. এসে ওঁকে স্যালুট করলেন। বোঝাই যাচ্ছে এখানে অপেক্ষা করতে ওঁদের খবর পাঠানো হয়েছিল। ও.সি.-কে এস. পি. জিজ্ঞেস করলেন, “ওয়ান টু থ্রি ফোরকে ২৬০

দেখেছেন ?”

ও.সি. দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, “হ্যাঁ স্যার। আপনার খবর পাওয়ামাত্র বাইরে বেরিয়ে দেখি, গাড়িটা চলে গেল। ধরতে পারিনি। ধরার অবশ্য অর্ডার ছিল না।”

পেছন থেকে অমলদা মন্তব্য করলেন, “ভালই করেছেন। লেটস্ মুভ। ওঁদের আঘঘণ্টা বাদে স্টার্ট করতে বলুন মিস্টার কাপুর।”

হুকুম দেওয়া হলে জিপ আবার দৌড়তে শুরু করল। পলাশবাড়ি চা-বাগান পেরিয়ে রিয়াবাড়ির পাশ দিয়ে ওরা ছুটে যাচ্ছিল। ভুটানের বর্ডারটা দেখতে পাওয়ামাত্র অমলদা গাড়ি থামাতে বললেন। এস. পি. মাথা ঘুরিয়ে বললেন, “মিস্টার সোম, ওই বর্ডার পেরিয়ে গেলে আমার কিছুই করার থাকবে না।”

অমলদা বললেন, “আমি জানি। আপনি জিপটাকে নিয়ে সামচির ভুটান পুলিশের কাছে চলে যান। ওদের সাহায্য চান। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। অর্জুনকে ইশারা করে নেমে পড়লেন অমল সোম। অর্জুন নামতেই জিপটা সীমান্ত পেরিয়ে বর্ডার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পড়ল। অর্জুন দেখল ওদের ছাড়া পেতে সময় লাগল না। তারপরেই জিপটা ওপরে উঠে যেতে চারপাশে অন্ধকার নামল। শুধু ভুটান পুলিশের চেকপোস্টে হাজাক জ্বলছে। দুজন সাদ্ধী বন্দুক হাতে তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

অমলদা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “ওরা কোথায় যেতে পারে বলে তোমার ধারণা অর্জুন? সোজা সামচি বাজারে পৌঁছাবে চেকপোস্ট ডিঙিয়ে?”

অর্জুন বলল, “আমি বুঝতে পারছি না। যদি না যায় তা হলে ওদের গাড়িটাকে দেখতে পেতাম।”

“শুড। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমাদের মতন ওদের দু'জন নেমে গেছে মাঝরাস্তায়। মান সিং নামের এদেশি লোকটা গাড়ি নিয়ে পুলিশের কাছে কিছু জবাবদিহি দিয়ে চলে গেছে বাজারে। সেখানে কারও গ্যারাজে গাড়ি রেখে আবার ফিরে আসবে। এই চেকপোস্টগুলোতে কোনওরকম কড়াকড়ি হয় না। কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে এইটুকু জানালেই চলে। তাই না?”

অর্জুনেরও তাই মনে হল। এদিকটা এখন গভীর অন্ধকারে ঢাকা। ওপাশে পাহাড়ের শরীর সোজা ওপরে উঠে গেছে। সামচি পাহাড় হিসেবে কোনও কৌলীন্য দাবি করতে পারে না। কিন্তু রাত্রে তাই কত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

অমলদা বললেন, “অদ্ভুত ব্যাপার তো? এই পাহাড়ে কি কিংবিও শব্দ করে না? অর্জুন, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসছি।”

অমলদা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে অর্জুন চারপাশে একবার তাকাল। এইভাবে কোনও সূত্র ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকার কী অর্থ, তা তার মাথায় আসছিল না। সামচিতে যদি ওরা যায়, তা হলে জেমসকে জোর করে ধরে নিয়ে

গেছে। আর তারই বা কী দরকার। জলপাইগুড়ি থেকে আসবার পথে অন্ধকারে যে-কোনও জঙ্গলের ধারেই ওকে মৃত অবস্থায় ফেলে দিলে কে দেখবে। একজন এফ. বি. আই. অফিসার এত সহজে মারা গেল, ডাবলেই অবাক হতে হয়। অবশ্য মারা যে গিয়েছে, তারও তো কোনও প্রমাণ নেই।

ঠিক সেই সময় দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা বাড়ির সামনে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা জ্বলছে নিভছে। অর্জুন সতর্ক হল। এত রাতে কেউ আলোর খেলা খেলবে কেন? শেষবার নিভে যাওয়ার পর আর জ্বলল না আলোটা। অর্জুনের মনে হল, কেউ নিশ্চয়ই জেগে আছে ওদিকে। তাকে আলোটা টানছিল। রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে গেলে সামনেই পড়বে চেকপোস্টটা। অর্জুন ডান দিকে এগোল। অন্ধকারে বেশিক্ষণ থাকলে আকাশ এক ধরনের আলো দেয়। যাদের চোখ থাকে, তারা ঠিক পৃথিবীটাকে চিনে নিতে পারে। অর্জুন চেষ্টা করল।

পাহাড় কখনওই পায়ে চলার জন্য সুন্দর রাস্তা তৈরি করে রাখে না। আগাছা, এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে অর্জুন সন্তর্পণে উঠছিল। তার একবার মনে হয়েছিল অমল সোমকে খবরটা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে কি না! কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করলে আলোর উৎসটা দেখেই ফিরে আসবে। কিছুদূর যাওয়ার পর অর্জুন বুঝল আর এগোন সম্ভব নয়। এখান থেকে পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। ওপাশে অনেক নীচে একটা চওড়া নদীর খাত। আলোটা যেখানে জ্বলেছিল সেখানে এদিক দিয়ে পৌঁছানো যাবে না। সে সমান্তরালভাবে হাঁটতে লাগল। এবং এক সময় আগাছা ভাঙতে-ভাঙতে বড় রাস্তায় চলে এল। এই রাস্তাটাই চেকপোস্টের সামনে দিয়ে চলে এসেছে। অর্জুন আবার ওপরের দিকে তাকাল। সেখানে পৌঁছতে গেলে রাস্তাটা ধরে চলাই সুবিধে।

ক্রমশ সে সামচির বাজারে এসে পড়ল। বাড়িঘরগুলো ঘুমিয়ে আছে। কোথাও কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। বাজারটা চৌকো, মাঝখানে চত্বর খোলা পড়ে আছে। আরও একটু এগোতেই সে মানুষের গলা শুনতে পেল। একাধিক মানুষ জড়ানো গলায় কথা বলছে। সন্তর্পণে এগিয়ে সে বুঝতে পারল ওটা দিশি মদের দোকান। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। কথাবার্তা আসছে ওখান থেকেই। একটু অপেক্ষা করল সে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে আসছে। হঠাৎ তিনটে লোক বেরিয়ে এল বাইরে। তিনজনেই স্থানীয় মানুষ। পা টলছে। তারা বের হওয়ামাত্র আলো নিভে গেল। শেষবার জড়ানো কথা বলে তিনটে লোক তিনদিক চলে গেল। অর্জুন মুশকিলে পড়ল। প্রথমত এদের সন্দেহ করার কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, যদি অনুসরণ করতে হয়, কাকে করবে। যারা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে তাদের একজন আমেরিকান, একজন চাইনিজ আর একজন নেপালি। এই তিনটে মানুষের

মধ্যে নেপালিটাই থাকতে পারে। তিনজনের চেহারাই এক। আর এইসব ভাবতে-ভাবতে ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অর্জুন ঠিক করল যেখানে অমলদা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন সেখানেই ফিরে যাবে। ঠিক তখনই বন্ধ পানশালার বাঁপ সরিয়ে চতুর্থ লোকটি বেরিয়ে এল। বেরিয়ে একটু অপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নেপালি ভাষায় কিছু বলল কাউকে। ভেতর থেকে তার জবাব এল। লোকটা একটু অপেক্ষা করে পা ফেলতে লাগল। মধ্যবয়সী লোকটা বেশ স্মার্ট, প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা, মাথায় একটা চাপা টুপি। সে হঠাৎ পকেট থেকে টর্চ বের করে কয়েকবার জ্বালল আর নেভাল। অর্জুন ঘাড় ফিরিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে সেখানেও একই আলোর সঙ্কেত শুরু হল। এবার লোকটা সন্তুষ্ট হয়ে সেদিকে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে। একটা সোজা ওপরের দিকে চলে গেছে, আর একটা বেঁকে ওই পাহাড়ে। মুখ-চোখ এখন ভাল করে দেখা অসম্ভব ব্যাপার, তবু অর্জুনের মনে হল, এই হল মান সিং। লোকটা, এতক্ষণ পানশালায় ছিল কিন্তু একফোঁটাও মদ খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ও গাড়িটাকে কোথায় পার্ক করল ?

কিন্তু পাহাড়ের রাস্তায় যেখানে পায়ের তলায় অসমান নুড়ি সেখানে কাউকে শব্দহীন হয়ে অনুসরণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এই লোকটা বোধহয় ফুর্তিতে আছে। অর্জুন চেষ্টা করছিল যতটা নিঃশব্দে যাওয়া যায়। লোকটা যেভাবে পা ফেলছে সে তাই করছে। কিন্তু লোকটা একটিবারও পেছন ফিরে তাকিয়েছে বলে মনে হল না। মিনিট দশেক হাঁটল লোকটা। এখনও ওরা পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। পরপর অনেকটা জায়গা নিয়ে এক-একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বাড়ি কাঠের এবং দেখলেই বোঝা যায় মানুষগুলো অর্থবান। লোকটি যে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়াল সেখানেই রাস্তার শেষ। তারপরেই পাহাড় নেমে গেছে সোজা নীচে নদীর বুকে।

বারান্দায় যে দাঁড়িয়ে ছিল সে শিশু দিতেই আগন্তুক একই সঙ্গে শিশু দিল, একই রকম ছন্দে। তারপর সে ভেতরে ঢুকে গেল। অর্জুনের নিশ্চিত ধারণা হল, মান সিং গাড়ি পার্ক করে তার কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এই মাটি ভুটানের। যদিও পাশপোর্ট-ভিসার দরকার হয় না কিন্তু এখানকার পুলিশ তাকে যে-কোনও মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। ওই মানুষগুলো যদি এখানে থাকে তা হলে বিপদ যে-কোনও মুহূর্তেই আসতে পারে। ওই গ্রেনেড-লাইটার ছুঁড়ে দিলেই হল। আর যদি জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটারের মালিক এখানে থাকে তা হলে তো আর দেখতে হবে না। অর্জুনের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। যদি এস. পি. এখানকার পুলিশদের সঙ্গে এনে বাড়ি ঘেরাও করেন, তা হলে সদলবলে ধরা যায়। কিন্তু ওদের তো জানাতে হবে। অমলদা যেখানে থাকতে বলেছিলেন, সেখানে

ফিরে যেতেও তো সময় লাগবে !

এই সময় বাংলোর একটা দরজা খুলে গেল। অর্জুন দ্রুত একটা গাছের আড়ালে সরে গেল। যে লোকটা বেরিয়েছিল, সে বারান্দার রেলিং ধরে হিন্দিতে জিঙেস করল, “কী ব্যাপার, এত দেরি হল কেন ? কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি ?”

“সামচি আমার হাতের মুঠোয়। গোলমাল এখানে হবে কেন ?”

“কোনও গাড়ি এসেছে ?”

“হ্যাঁ। জলপাইগুড়ির এস. পি. একা গাড়ি নিয়ে ঢুকেছে।”

“এস. পি. ! ওই ছোকরা সঙ্গে নেই তো ?”

“না।”

“কেটকে বললাম শেষ করে দিতে ছোকরাটাকে কিন্তু ও খেলতে চাইল। কাম অন, আমরা এখনই রওনা হব।” লোকটা এবার বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেল। মান সিং সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তাকে অনুসরণ করল। যে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল। তারপর সিঁড়ির মধ্যে বসে পড়ল। ওই লোকটা হয়তো নিরীহ। জাল লাইটার হাতে পায়নি।

কিন্তু ওরা এখন কোথাও যাচ্ছে ! কোথায় ? অর্জুন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। এবার ওই লোকটি হেঁটে আসছে দেখতে পেল গেটের কাছে। গেটে হাত রেখে চারপাশে তাকাল। তারপর মুখের শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটের প্রান্তটুকু ছুঁড়ে দিল রাস্তায়। একবার পেছন ফিরে তাকাল। বাংলায় কোনও আলো জ্বলছে না। লোকটা গেট খুলে চলে এল এপাশে। তারপর কী জন্য যেন পথের পাশে বসে পড়ল। মুহূর্তেই অর্জুনের শরীর টান-টান হল। বাংলোর কাছে পৌঁছনোর এই একটাই সুযোগ ! লোকটা বসেছে তার দিকে পেছনে ফিরে। সে নিঃশব্দে চিতাবাঘের মতো দূরত্বটা অতিক্রম করল। শেষ মুহূর্তে বোধহয় লোকটা অনুমান করল কেউ আসছে। কিন্তু ততক্ষণে অর্জুনের হাত নেমে এসেছে ওর ঘাড়ের। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ককানির মতো শব্দ হল। আর লোকটা এলিয়ে পড়ল মাটিতে। অর্জুন ওকে টেনে নিয়ে এল গাছটার পেছনে। লোকটা নেপালি। কোমরে একটা ভোজালি গোঁজা। সেটা খুলে নিয়ে বাংলোর দিকে তাকাল সে। দরজাটা এখন বন্ধ। কেউ নেই সামনে। দ্রুত ঢুকে পড়ল অর্জুন ভেতরে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর ওপরে না উঠে বাংলোর পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। বাংলোর ঠিক পেছনেই পাহাড়টা নেমে গেছে নদীর বুকে। সেখানে পৌঁছে সে মানুষের গলা পেল। দুটো ভারী সুটকেস নিয়ে কারা কথা বলতে বলতে বাংলা থেকে নামছে। মান সিংয়ের গলা পেল সে, “ওকে কিছু বলে যাওয়া হল না। ও জানবে আমরা বাংলাতেই আছি।”

“তাই জানা উচিত। বেশি লোককে জানাবার দরকার নেই।”

“এর মধ্যে সব একই ধরনের মূল আছে ?”

“কেন ?”

“হাত থেকে পড়ে গেলে তো শেষ হয়ে যাব ।”

“শেষ যাতে না হও তার ব্যবস্থা করা আছে ।”

অর্জুন এবার লোকটিকে চিনতে পারল । পাতলা, কিন্তু মজবুত শরীর । একটা হিলহিলে ভাব আছে । চেহারা দেখলে চাইনিজ বলে মনে হয় । থাই কিংবা সিঙ্গাপুরিও হতে পারে । ওরা নদীর ধার দিয়ে নেমে যাচ্ছিল । অর্জুনকে অনেকখানি ব্যবধান রাখতে হচ্ছিল । জেমস নিশ্চয়ই একটি মৃতদেহ হয়ে পড়ে আছে কোথাও । লোকটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তার । মিনিট পনেরো হাঁটার পর ওরা একটা প্যাগোডা টাইপের বাড়ির সামনে এসে পড়ল । এদিকে মানুষের বসতি কম । এত রাতেও পাশের মনাস্থিতে অদ্ভুত বাজনা বাজছে । প্যাগোডা টাইপের বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল ওরা । অর্জুন দেখল দু’জন লামা কথা বলতে বলতে মনাস্থি থেকে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে গেলেন । এবং তখনই বাজনা থেমে গেল ।

“ডোন্ট মুভ,” চাপা গলায় ধমকানিটা শুনে চমকে পেছনে ফিরে তাকাতেই অর্জুন অমল সোমকে দেখতে পেল । অমলদা বললেন, “তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম । খুব রেগে যেতাম যদি না ঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে । এস. পি. মিনিট পাঁচকের মধ্যে এসে পড়বেন ! কিন্তু তার আগে আমি ভেতরে যাচ্ছি । তুমি এবার এখান থেকে নোড়ো না ।” কথা শেষ করে অমলদা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন । সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল । কেউ চ্যালেঞ্জ করছে । অমলদা কিছু জবাব দিতেই আলো দেখা দিল । একটা লোক বেরিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল ওঁকে । নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে যেন খাতির ছিল ।

ঠিক তখনই মনাস্থি থেকে আর-একটি লোক বেরিয়ে চাতালের ওপর দাঁড়াল । লোকটা কোমরে হাত রেখে আকাশ দেখল । তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে প্যাগোডা-বাড়ির দিকে আসছিল । এই আকাশ-চুঁয়ানো তারার আলোয় কাছাকাছি লোকটাকে দেখে অর্জুনের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল । জেমস ব্রাউন বাড়িটায় ঢুকছে ।

এই সময় চাইনিজ লোকটি ওপর থেকে ডাকল, “কেন্ট, সামওয়ান ওয়ান্টস টু মিট ইউ ।”

“হু ইজ হি ?”

“এ বায়ার । গট ইনফরমেশন ফ্রম কাঠমাণ্ডু । হিজ আইডি ইজ জনিস ফ্রেন্ড ।”

“ডিড ইউ টেল জনি দ্যাট উই উড বি হেয়ার ?”

“ইয়া ।”

“ও. কে. আই অ্যাম কামিং ।” তরতর করে উঠে গেল জেমস ওপরে ।

মাথায় কিছু ঢুকছিল না। জেমস আর কেন্ট এক লোক? জেমস তো এফ. বি. আই-এর অফিসার। কেন্ট স্পষ্টতই স্মাগলার। অর্জুন এও বুঝতে পারছিল না অমল সোম কী করে জনি নামক লোকটির বন্ধু হন!

তখনই পায়ের শব্দ পেল অর্জুন। দশ-বারোজন পুলিশ আড়ালে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এস. পি. ওর পাশে এসে নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন, “অমলবাবু ভেতরে?”

খুব রাগ হয়ে গেল অর্জুনের। অমলদা একে সব প্ল্যান বলে এসেছেন, কিন্তু তাকে কিছু জানাননি। সে গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। এস. পি. বললেন, “উনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন যতক্ষণ না বাইরে বেরিয়ে আসেন।”

মিনিট-দশেক কেটে গেল। তারপর আলো জ্বলল। অমল সোম ইংরেজিতে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসছেন, “তোমরা কী করে আশা কর জিনিসগুলো ঠিক কাজ করবে কি-না না জেনে আমি টাকা দেব। অন্তত একটা আমাদের সামনে পরীক্ষা কর। তা ছাড়া আমি শুনেছিলাম লাইটার থেকে রে বের হয়। সেটাই তো দিচ্ছ না।”

জেমস বলল, “লুক ম্যান, এই রাত্রে গ্রেনেড চার্জ করলে সবাই শুনতে পাবে। তা ছাড়া রে-লাইটার যে বিক্রির জন্য নয়, তা জনি জানে। তুমি সত্যি একজন খন্দের কি না আমার সন্দেহ আছে।”

“সন্দেহ? জনি কখনও তোমাদের বলেনি সে ইন্ডিয়ান খন্দেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে?”

“বলেছিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে টাকা কোথায়?”

“আগে মাল দেখব, পরে টাকা। তুমি তো মালই দেখাতে পারলে না।”

“তুমি এখানে এসেছ কী করে?”

“বাই রোড। আমার গাড়ি বাজারে রেখে এসেছি।”

হঠাৎ জেমস ঘুরে ডাকল, “লি, এই লোকটাকে পরীক্ষা করতে বল মান সিংকে।”

চাইনিজ লোকটার নাম লি। সে মান সিংকে হিন্দিতে কিছু বলল। মান সিং মাথা নেড়ে নীচে নেমে এল। অমল সোম পা বাড়ানোর জন্যে, জেমস বাধা দিল, “নো ম্যান, তোমার গাড়ির নাম্বারটা বল। মান সিং বাজারে গিয়ে দেখে আসবে তুমি ঠিক বলছ কি না। মাল কিনতে তুমি একা এসেছ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।”

“গাড়ি দেখে কী করে বিশ্বাস করবে?”

“সেটা আমি বুঝব। আগে দেখি গাড়িটা আছে কি না।”

এই সময় একজন তিব্বতি ঘর থেকে বেরিয়ে লি’র পাশে দাঁড়াল। তারপর পরিষ্কার হিন্দিতে বলল, “লোকটাকে ছেড়ো না। অনেকক্ষণ থেকে আমি মনে করতে চেষ্টা করছি একে কোথায় দেখেছি। কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিন্তু ২৬৬

লোকটাকে দেখে আমার ভাল লাগছে না।” ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র লি সিগারেট বের করল এবং পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে ধরাল। তার লাইটার থেকে কোনও আগুন বের হল না। এইবার সে সোজা অমল সোমের দিকে সেটা তাক করতেই তিনি লাফিয়ে নীচে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে মান সিং ছুটে ধরতে গেল তাঁকে। অমল সোম মাটিতে পড়েই একেবেঁকে দৌড়ছিলেন। এবং তখনই দৃশ্যটা দেখা গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মান সিং। তারপর কাটা গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জেমস পকেট থেকে আর একটা লাইটার বের করে মাথার ওপর তুলতেই অর্জুন চিৎকার করে উঠল, “জেমস!” সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ চমকে গেল জেমস। অর্জুন ছুটে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। অন্য লাইটারটি হাতে লি নামতে যাচ্ছিল। তার রে অবশ্যই দশ ফুটের বেশি যায় না। সে বোধহয় অমল সোমের কাছাকাছি যেতে চাইছিল। অর্জুনকে দেখে দ্রুত ফিরে গেল। তৎক্ষণাৎ একটা গালাগাল দিল জেমস। তারপর হাতের লাইটারটা ছুঁড়ে মারল গেটের ওপর। বিস্ফোরণের আগে অর্জুন যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে পেরেছিল। এবং তখনই পেছনে থেকে গুলি ছুটে গেল ওপরে। প্রথমে আহত হল লি। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে চিৎকার করতে লাগল। ততক্ষণে এস. পি. ঢুকে গেছেন ভেতরে। সামচির পুলিশবাহিনী তাঁর সঙ্গে। অমল সোম চিৎকার করুলেন, “কেন্ট, আত্মসমর্পণ কর, নইলে তুমি মরবে।”

জেমস ছুটে গেল লি’র কাছে। ওর পাশে পড়ে থাকা লাইটারটার ওপরে দ্বিতীয় গ্রেনেড লাইটার ছুঁড়ে মারতেই বারান্দার কিছু অংশ এবং লি’র শরীরটা নীচে গড়িয়ে পড়ল। তারপর তিন নম্বর বিস্ফোরণ ঘটল। তৃতীয় গ্রেনেড-লাইটারটা ফাটল জেমসের শরীরেই।

খুব ভোরে ফিরে আসছিল ওরা। তিনটে মৃতদেহ এখন ভুটান সরকারের হাতে। মান সিংকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার জ্ঞান ফিরেছিল দেরিতে। সে স্বীকার করেছে কাঠমাণ্ডুতে জনির ক্যাসিনোতে চাকরি করতে করতে সে এদের দলে ভিড়ে যায়। সে স্বীকার করেছিল, রায়বাবুর ছোট ছেলেকে সে মারেনি, কিন্তু অমল সোমের বাড়িতে লাইটার-গ্রেনেড চার্জ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রায়বাবুর ছেলে মারা গিয়েছে লি’র হাতে।

অমল সোম মুখ খুললেন, “সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে কাঠমাণ্ডুতে গিয়েছিলাম। জনি’র ক্যাসিনোতে সত্যেন্দ্রনাথ খবর পান সামচির মনাস্বিত্তেই ওরা ঘাঁটি করছে। সেই উদ্দেশ্যেই ওরা এসেছিলেন ডুয়ার্সে। জেমস নামের এফ. বি. আই. অফিসারটির সর্বস্ব চুরি যায় শিলিগুড়ির হোটেলে। আমি তাকে সেখানেই রেখে এসেছি। জলপাইগুড়িতে কেন্ট এসে জেমসের নাম ব্যবহার করে তার পাশপোর্ট এবং আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে। দুটো ভালমানুষ আর

তিনটে বদলোক খুন হল, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু সুখের ঘটনা সত্যসন্ধানী হিসেবে অর্জুন এখন দক্ষ হয়েছে। জোশ অ্যান্ড জোশ নিশ্চয়ই ওকে পুরস্কৃত করবে।”

অর্জুন ঠোট কামড়াল। তার খুব আফসোস হচ্ছিল। আসল লাইটারটা যদি পাওয়া যেত! একটাকে চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখল। দ্বিতীয় হারানো আসল লাইটার এখন কোথায়?...

দ্বিতীয় লাইটার

ইদানীং অমল সোম সারাদিন চুপচাপ থাকেন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাও করেন না, কাজের প্রসঙ্গ এলে এড়িয়ে চলেন। অর্জুন দেখেছে অমলদার সঙ্গী যে বইগুলো তার সবই ঈশ্বর সম্পর্কিত। ওরকম সচল মানুষ এত চুপচাপ হয়ে যাবেন ভাবা যায় না। সেই জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটার-রহস্যের পর থেকেই এই ব্যাপার। একটি লাইটারের অস্তিত্ব জানা গিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়টি কোথায়, কার কাছে, তা কেউ জানে না। অবশ্য যার কাছে আছে সে ছাড়া। এমন লাইটার, যার বোতাম টিপলে অদৃশ্য আশুন বেরিয়ে আসে, যাতে সিগারেট ধরানো যায়, দ্বিতীয়টি টিপলে এমন একটা অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে যা দশফুটের মধ্যে যে-কোনও জীবন্ত প্রাণীকে অসাড়া করে দিতে পারে। প্রথম লাইটারটি পাওয়া এবং হারানোর গল্প যারা ‘আনন্দমেলা’য় পড়েছ তারা জানে ওই লাইটার যারা তৈরি করেছিল, সেই আমেরিকার জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি কতটা উদগ্রীব হারানো লাইটার ফিরে পেতে। তারা ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনের সাহায্য নিয়েছে কিন্তু দুটো হারানো লাইটার, যা নিয়ে একদল কুচক্রী মানুষ পৃথিবীব্যাপী জাল পাততে চলেছিল তার হদিস করা সম্ভব হয়নি। অর্জুনরা একটি লাইটার পেতে গিয়েও পেল না। সেটি ধ্বংস হয়েছে, কারও কোনও স্মৃতি করতে পারবে না। এই তথ্যটি অমল সোম ঘটনাটির পর জোন্স অ্যান্ড জোন্সকে জানিয়েছিলেন। তারা তার উত্তরে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। অধিকন্তু দ্বিতীয় লাইটারটি উদ্ধার করতে সাহায্য চেয়েছিল। এ-বাবদ যা খরচ হবে, তা জোন্স অ্যান্ড জোন্স বহন করবে এবং সেইসঙ্গে ভাল পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকছে। স্বভাবতই অর্জুন উত্তেজিত। কিন্তু তারপর থেকেই অমল যেন হঠাৎ বৈরাগী হয়ে গেলেন। একদিন অর্জুনকে বললেন, “এসব আর আমার ভাল লাগে না। তুমি তো এখন বেশ ম্যাচিওর। যা কেস আসবে এখন থেকে তুমিই ডিল করবে।”

দ্বিতীয় লাইটারটি কোথায় আছে অর্জুন জানে না। কিন্তু জোন্স অ্যান্ড
২৬৯

জোন্স নিউইয়র্ক থেকে প্রায়ই তাগাদা দিচ্ছে। অমলদা চিঠিপত্র লিখেছিলেন অর্জুনের নামে। ওরা তো জানে না অর্জুনের বয়স কত! চিঠিপত্র আসছে অর্জুনের নামেই। ওরা প্রয়োজনে আমেরিকায় যাওয়ার কথা লিখেছে। কারণ এফ. বি. আই. যে দুটো লাইটারের একটাকেও খুঁজে বের করতে পারেনি, অর্জুন তার একটাকে বের করে নিশ্চিত করেছে। সেই কৃতিত্ব তারা স্বীকার করেছে। অর্জুন পাশপোর্টের দরখাস্তে করেছিল কিছুদিন আগে বাংলাদেশ বেড়াতে যাবে বলে। সেখানে ন'মাসির দেওর থাকেন এখনও। সেটা হাতে এসেছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স নিউইয়র্ক থেকে জানিয়েছে ভিসা কোনও সমস্যা হবে না।

আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছে না অর্জুন। তোমরা যারা অর্জুনকে জানো, তারা আর-একজনকে তো জানোই, তিনি কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব। খুব ভাল মানুষ। বয়স হয়েছে, বিয়ে-থা করেননি, কালিম্পংয়ে কুকুর নিয়ে থাকতেন, অর্জুনকে খুব স্নেহ করেন। অমল সোম বয়সে ছোট হলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। সেই বিষ্টুসাহেব কিছুদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছেন। তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্থানীয় ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারছে না। বিষ্টুসাহেবের এক বোন থাকেন নিউইয়র্কে। তিনি বারংবার লিখছেন, ওঁকে সেখানে যাওয়ার জন্যে। চিকিৎসা ভাল তো হবেই, জায়গারও পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু বিষ্টুসাহেব একা সেখানে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। ছোটখাটো বৃদ্ধ মানুষটি জানিয়েছিলেন, যদি অমল সোম তাঁর সঙ্গী হন, তা হলে তিনি বিদেশে যেতে রাজি আছেন। অমল সোম আর তাঁর দোতলার কাঠের ঘর ছেড়ে নড়বেন এ আশা নেই। জোন্স অ্যান্ড জোন্সের আমন্ত্রণ আর বিষ্টুসাহেবের শরীরের কারণে বিদেশে যাওয়া, গন্তব্যটা যখন এক তখন অর্জুন এক দুপুরে গিয়ে হাজির হল কালিম্পংয়ে।

বাজার ছাড়িয়ে বাঁ দিকে তিব্বতি কারুশিল্পের শো-রুম রেখে অর্জুন হাঁটছিল। এখন তার শরীর পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। ছিপাছিপে, সামান্য মেদ নেই। ফর্সা গালে তরুণ রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়ি যা কিনা এখনও কালচে ভাব ধরেনি। অর্জুন হাঁটছিল খুশি মনে। কালিম্পংয়ের পাহাড়টাকে তার ভাল লাগে। কী শান্ত, আর নীল চাদর মুড়ে চুপচাপ বসে থাকে চারপাশে। রাস্তাটা যাচ্ছে সার্কিট হাউসের দিকে। আরও ছাড়াতে দূরবিন-দাঁড়া। এই পথেই ডান দিকে বিষ্টুসাহেবের কটেজ। কিছু নেপালি মেয়ে বোধহয় স্কুল ফেরত ভর দুপুরেই বাড়ি যাচ্ছে। দু-একজন তিব্বতি গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। রাস্তাটা যেখানে গুলতির মতো দুটুকরো হয়েছে সেখানে এসে দাঁড়াতেই সে মানুষটিকে দেখতে পেল। পাহাড়ের শরীরে প্রায় নাক লাগিয়ে কিছু দেখছেন। লম্বায় অন্তত ছয়-দুই, বিশাল চেহারা, নীল জিন্সের ওপর সামার জ্যাকেট, মুখে একজঙ্গল কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় বারান্দা-দেওয়া নেপালি টুপি, হাতে ছড়ি আর চুরুট। এই লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছে ২৭০

বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের। খুব চেনা অথচ ঠাহর করতে পারছিল না। এত মগ্ন হয়ে আছেন যে, বিশ্বচরাচর গুঁর কাছে মুছে গেছে যেন। অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ ভদ্রলোকের হাতের চুরট তাঁর জ্যাকেটের গায়ে, যে-কোনও মুহূর্তে আগুন ধরতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ পড়ল অর্জুনের ওপর, “অদ্ভুত! ভাবতে পারিনি এখানে এসে একে দেখতে পাব।” ঘন-ঘন দাড়ি-মুখ নাড়ছিলেন ভদ্রলোক। তারপর “উঃ” বলে চুরটটাকে ছুঁড়ে দিলেন রাস্তায়। তাঁর হাতে অবশ্যই ছাঁকা লেগেছিল। দাড়িওয়ালা মানুষটাকে মুহূর্তেই ভাল লাগল অর্জুনের। শিশুর সারল্য আচরণে। বড্ড চেনা।

সে হেসে জিজ্ঞেস করল, “কিছু যদি মনে না করেন, কী দেখতে পেলেন জানাবেন?”

“অফকোর্স,” ভদ্রলোক নিজের ছাঁকা-লাগা দুটো আঙুল ঠোঁটের ওপর থেকে সরিয়ে বললেন, “রেয়ার টাইপ অব পপি। সুইজারল্যান্ডেও দেখতে পাইনি। আমার বন্ধু হেনরি ডিমককে বললে এশ্ফুনি ছুটে আসবে। কিন্তু বলব না, সারপ্রাইজ দেব। সেবার আইসল্যান্ড থেকে ফিরে ওকে একটা ফসিল দিয়েছিলাম, এবার পপি।”

অর্জুন ফুলটাকে দেখল। এই ধরনের জংলি ফুল পাহাড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে কোনওদিন নজর করেনি সে। এখনও মনে হল না অসাধারণ কিছু। ভদ্রলোক আর কথা বললেন না। গম্ভীর হয়ে পাহাড় দেখতে লাগলেন। যেন কোনও এগজিভিশনে গিয়ে ছবি দেখছেন মন দিয়ে।

বিষ্টুসাহেবকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখবে আশা করেনি সে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেই সুন্দর বাগানটার পাশে বারান্দায় নজর যেতেই বিষ্টুসাহেব যেন লাফিয়ে উঠলেন, “আরে অর্জুন! কী আশ্চর্য! তুমি? ভাবাই যায় না। এসো, এসো।”

অসুস্থ মানুষটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আন্তরিক হাসিতে। দুটো হাত বাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করার আগেই অর্জুন সেখানে পৌঁছে গেল, “ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন। কেমন আছেন?”

“আর আছি। হঠাৎ যে কী হল! এখন তো বারান্দায় বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, মাসখানেক আগেও বিছানা ছাড়তে পারতাম না। কেমন দেখছ, ঠিক আছে?” শেষ শব্দ দুটো শুনে হাসি পেলেও মাথা নাড়ল অর্জুন। ওটা বিষ্টুসাহেবের মুদ্রাদোষ। দোষ কেন বলে কে জানে! বলল, “একটু রোগা হয়ে গেছেন। ডাক্তাররা কী বলছে?”

“ফালতু! মানুষের শরীরের রোগ ধরতে পারে না যে, সে কিসের ডাক্তার! তিনি কোথায়?”

“কে, অমলদা!” অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে অমলদার বৈরাগ্যের কথা জানাল।

শুনে আফসোসের শব্দ উচ্চারিত হল বিষ্টুসাহেবের মুখে, “ছি ছি। অমন প্রতিভা, যাকে বলে পর্বতপ্রমাণ, তাকিয়ে দেখছ কী, শুয়ে-শুয়ে অনেক বাংলা পড়ে ফেলেছি হে, হ্যাঁ, পর্বতপ্রমাণ প্রতিভার কী অপচয় ! ছি ছি ! আমি তো আজই চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। অতবড় লাইটার-অভিযান আমাকে বাদ দিয়ে হল ? তোমাদের খুঁটিমারি রেঞ্জ ছাড়া সবক’টাতেই তো আমি আছি ! শরীরটা—দেহপট সনে নট সকলি হারায়।”

অবাক থেকে কৌতুকে পৌঁছে গেল অর্জুন, “ওই লাইনটা অভিনেতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি লাইটারের কথা জানলেন কী করে ? অমলদা কী লিখেছিলেন ?”

“তিনি লিখলে কোনও আফসোস থাকত না। আমাকে পড়তে হল কিনা বিদেশি কাগজে !”

“বিদেশি কাগজ ?” অর্জুন আরও অবাক।

“ও ঘরে যাও। ওঠো, হ্যাঁ, বাঁ দিকের টেবিলে ভাঁজ করা আছে। কী কাগজ ওটা ? নিউইয়র্ক টাইমস ! তার দ্বিতীয় পাতা খোলো। ওপরে কী লেখা ?” চেয়ারে বসে বলে যাচ্ছেন তিনি। অর্জুন কাগজটার সামনে দাঁড়িয়ে পুলকিত। বড়-বড় হরফে ছাপা, “ওয়ান মিসিং লাইটার ট্রেসড্ বাই অ্যান ইয়ং ইন্ডিয়ান ইনভেস্টিগেটর।” তার নীচে বিস্তারিত বিবরণ। এমনকী অর্জুনের কৃতিত্বে যে এটা সম্ভব হয়েছে তাও লেখা। সমস্ত শরীরে যেন কদম ফুটল অর্জুনের। সাগরপারের একটা কাগজে তার কথা এমনভাবে লেখা হবে তা কল্পনাতেও ছিল না। কাগজটাকে রেখে দিয়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বিষ্টুসাহেব তৃপ্তির হাসি হাসলেন, “আই অ্যাম হ্যাপি। আমি তোমাকে কতবার বলেছি, জলপাইগুড়িতে বসে থেকো না, তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে ?”

“আপনি নিউইয়র্ক টাইমস রাখেন ?”

“কালিম্পিংয়ে ওসব পাওয়া যায় ? পাগল ! আমার বোনের দেওর এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। এক নম্বরের পাগল। এর মধ্যে কালিম্পিংয়ের সবাই চিনে গেছে। এত জোরে হাসে যে, এই বাগানে পাখিগুলো আর বসতে চায় না। মেজর ছিল। মেজাজেও মিলিটারি। আমারই মতো ব্যাচেলর। একটু আগে ফুল দেখতে বেরিয়ে গেল। কেন, রাস্তায় দ্যাখোনি ?” বিষ্টুসাহেব বোধহয় অনেকদিন বাদে অনর্গল কথা বলছেন। কারণ তাঁর মুখে এবার একটু ক্লান্তির ছাপ।

অর্জুন মাথা নাড়ল, “মুখে দাড়ি, হাতে চুরুট।”

“ঠিক আছে।”

বলতে-না-বলতে পায়ের শব্দ হল। অর্জুন দেখল, মেজর ফিরছেন। তাঁর কোলে একটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা। মুখে স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে। বিষ্টুসাহেব

সোজা হয়ে বসলেন, “নো, নো, নেভার। এ-বাড়িতে কুকুর ঢুকবে না। লিলি নেই, ওর পর এ-বাড়িতে আর কুকুর দেখতে চাই না। ঠিক আছে?”

বিশাল চেহারার ভদ্রলোক হঠাৎ জবুথবু হয়ে গেলেন, “অসহায় জীব, রাস্তায় কুঁকড়ে পড়ে ছিল। মনে হচ্ছে এর শরীরে মেক্সিকান ব্লাড আছে। মেক্সিকান উলফের ব্লাড!”

বিষ্টুসাহেব হাঁ হয়ে গেলেন। অর্জুন দেখল, নেড়ি কুকুরটাকে বকের মধ্যে সম্ভরণে চেপে ভদ্রলোক কাতর চোখে তাকিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে ওঁকে কিছুতেই মেজর বলে মনে হচ্ছে না। বিষ্টুসাহেব বিড়বিড় করলেন, “নেড়ি কুকুরে মেক্সিকান ব্লাড! আমাকে কুকুর চেনাচ্ছে। নামানো হোক ওটাকে! হ্যাঁ, অ্যাই, তুতু, এস্তা আও, তু তু তু।”

নেড়ি-বাচ্চাটা সুড়সুড় করে এসে বিষ্টুসাহেবের পা চাটতে লাগল। ভদ্রলোক হাত ঝাড়লেন। তাঁর সবকটা দাঁত ঝিলিক দিল দাড়ির ফাঁকে, “ঠিক এক রকম, বুঝলেন! সেবার মেক্সিকোতে গিয়েছি মরুভূমিতে এক ধরনের নেকড়ে দেখতে। হেনরি ছিল সঙ্গে। দেখি, নেকড়ের বাচ্চা। ঠিক এইরকম গায়ের লোম, তাকানোর ভঙ্গি, হেনরির পা চাটল ওই এক ভঙ্গিতে। বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারিনি। মেক্সিকান ফক্স কী করে এদেশে এল তা বুঝতে পারছি না।”

কুকুরেরা বোধহয় ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। না হলে এই নেড়ি কুকুরটি গুটগুট করে কেন ঘরের ভেতর ঢুকে যাবে? সেইদিকে তাকিয়ে বিষ্টুসাহেব একটি প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, “ওঃ লিলি, লিলি রে—!”

সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক নাক কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, “লিলি কে?”

বিষ্টুসাহেব বুক হাত দিলেন, “আমার পাঁজর! ওই যে ওইখানে ওকে শুইয়ে রেখেছি।”

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূমিকম্প হল। ভূমিকম্প শব্দটি মনে করা ছাড়া কোনও উপায় রইল না। কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে হাসির আওয়াজে। একটা পাহাড়ি কাক বসে ছিল গ্রান্ডফ্লোরার ডালে, ভয় পেয়ে ডানায় শব্দ করে উড়ে গেল। পেটে হাত দিয়ে হাসি থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, “ওঃ, ভাবতেই পারিনি আপনি আর-একটা কুকুরের শোক করছেন। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি? ওহো, একটু আগেই, তাই না?” শেষ দুটি প্রশ্ন অর্জুনকে। সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। বিষ্টুসাহেব বেজার মুখে বললেন, “এই রকম বিতাকিচ্ছিরি হাসিটা একটু নীচের স্কেলে ধরা যায় না? তৃতীয় পাণ্ডব, ইনি হলেন মেজর, মেজর আমার বোনের দেওর। আর মেজর, এ হল তৃতীয় পাণ্ডব। বুঝতে পারা গেল না? নিউইয়র্ক টাইমসে যে তরুণ বঙ্গ-সন্তানটির কথা লেখা হয়েছে, এই হল সেই অর্জুন।”

মেজরের মুখের অভিব্যক্তি দাড়ির কারণে দেখা যায় না বটে, কিন্তু চোখ

দুটো যে বিস্মিত এবং পুলকিত হয়ে উঠল, তাতে সন্দেহ নেই। অত্যন্ত গাঢ় গলায় তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, “আই অ্যাম প্লাড টু মিট ইউ। এত অল্প বয়সে এত বড় কাজ করেছেন, আহা, বড় সুন্দর।”

অর্জুন লজ্জা পাচ্ছিল। প্রসঙ্গ এড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি বিটুসাহেবকে ওদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন? বাঃ, খুব ভাল। ওঁর চিকিৎসার পরিবর্তন হলে উপকার হবে।”

“শুনুন তা হলে। উনি যাবেন কি না মনস্থির করতে পারছিলেন না। অথচ আপনার স্নেহধন্য এই তরুণ গোয়েন্দাটি বলছে, গেলে আপনার উপকার হবে।” মেজর চুরুট ধরালেন।

অর্জুন প্রতিবাদ করল, “আমি গোয়েন্দা নই সত্যসন্ধানী।”

“কী সন্ধানী? সত্য? মানে ফ্যাক্ট? সন্ধানী মানে যে খোঁজে? তা হলে, তা হলে আমার সঙ্গে তো কোনও প্রভেদ নেই। আমিও সত্য খুঁজি। তবে প্রকৃতির মধ্যে, আর আপনি মানুষের লুকিয়ে রাখা সত্যটাকে খুঁজে বের করতে চান, দ্যাটস দি ডিফারেন্স। ওকে একটু এনকারেজ করুন তো।” মেজর বিটুসাহেবকে দেখালেন।

“আপনি প্রকৃতিতে সত্য খোঁজেন?” অর্জুন কৌতূহলী হচ্ছিল।

“হ্যাঁ। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি, দিন রাত। কত রহস্য চারধারে। জলের নীচে, জলের ওপরে। মিলিটারি থেকে বিশ্রাম নিয়ে এই করে কাটাচ্ছি। কালিম্পংয়ে এসে আমার হিলারির কথা খুব মনে পড়ছে। লোকটা ইয়েতি খুঁজতে অত ওপরে উঠেও জন্তুটাকে না ধরে ফিরে এল।” খুব বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মেজর।

বিটুসাহেব প্রতিবাদ করলেন, “জন্তুটার পায়ের ছাপ ইয়েতির কি না তা প্রমাণিত হয়নি।”

হাত তুললেন মেজর। এখন তাঁর চুরুট জ্বলছে, “ঠিক কথা। প্রমাণিত হয়নি বলেই ওটা যে ইয়েতির নয় তাও বলা যাচ্ছে না। আই মাস্ট কাম হিয়ার। নেস্টট সামারেই আসব।”

“আপনি অনেক অভিযান করেছেন?” অর্জুন মুগ্ধ হচ্ছিল।

“তেমন কিছু না। আমাজনে তিরিশ দিন ডিঙি নৌকায় ছিলাম, আঙ্গুসের তুষারঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম পুরো সাতদিন, ওজন কমেছিল বারো কেজি। আইসল্যান্ডে এক ধরনের শ্যাওলা খুঁজতে গিয়ে গ্লেসিয়ারের ওপর তাঁবু করে আছি টের পেতে দু’দিন লেগেছিল। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল হার্লেমের একটা নিগ্রো ফ্যামিলির কাছে আফ্রিকায় যাওয়ার নেমস্তম্ভ জানাতে গিয়ে। দু’জন নিগ্রোর সঙ্গে অলওয়েট বক্সিং-এ তিনটে পাঁজর ভেঙেছিল। আমি কোনও অন্যায় সহ্য করতে পারি না। নো, নেভার। আপনার শরীর কেমন আছে?” ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

“আছি আর কি,” বিটুসাহেব বিরস গলায় বললেন ।

“ওয়েল । দেন উই উইল স্টার্ট টুমরো ।” ঘোষণা করলেন মেজর ।

“না । মনে হচ্ছে শরীর এখানেই সেরে উঠছে ।” প্রতিবাদ জানালেন বিটুসাহেব ।

“নো ! NAWH, NINE. NOH, NAY, NAI !” চিৎকার করে উঠলেন মেজর ।

“মানে ?” বিটুসাহেব ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন ।

“এগুলো সবই ‘না’ । ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ডাচ ইত্যাদি ভাষায় । আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রতিবাদ করলাম । অন্যায় করছেন এখানে পড়ে থেকে । অন্যায় আমি সহ্য করতে পারি না । আপনাকে যেতেই হবে । আপনি কী বলেন ?” মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন ।

অর্জুন মাথা নাড়ল, “বিটুসাহেব, আপনি চলুন । আমাকে জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানি আমন্ত্রণ করেছে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য । আপনি গেলে আমি যাব ।”

সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হলেন বিটুসাহেব, “তুমি যাবে ? বাঃ । তা হলে আমি রাজি । ঠিক আছে ?”

অর্জুন দেখল মেজরের মুখ তখনও গম্ভীর । সে বলল, “আপনি আমাকে ‘আপনি’ বলবেন না । কত ছোট আপনার চেয়ে আমি ।”

মেজর ঘরের দিকে পা চালাতে চালাতে বললেন, “ঠিক আছে । TANK BRAH.”

বিটুসাহেব তড়িঘড়ি জিজ্ঞেস করলেন, “এটা আবার কোন্ দেশের ভাষা ?”

ঘরে ঢোকার আগে মেজর বললেন, “এটা সুইডিশ ভাষা । মানে ভেরি ওয়েল ।”

দিল্লির হোটেলে ওরা পৌঁছেছিল মধ্যরাত্রে । এগারোটাকে তো মধ্যরাতই বলা যায় । অথচ ভোর চারটের সময় এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে । উত্তেজনায় অর্জুনের ঘুমের প্রস্নই ছিল না । এই প্রথম সে বিদেশে যাচ্ছে । এর আগে ঙলপাইগুড়ির বাইরে বলতে গিয়েছিল চণ্ডীগড়ে । সেবার সঙ্গে ছিলেন অমলদা । এবার একদম অজানা বিদেশে পা বাড়ানো । আসবার পথে গণকাতায় কয়েকটা দিন কাটাতে হয়েছিল । বিটুসাহেবের ভিসা টিকিট মেজর পাঠা করেছিলেন । প্যান-অ্যাম এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানি অর্জুনের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিল । দিল্লিতে আসার পর তার কেবলই মনে হচ্ছিল একটাও ভাল জামা-কাপড় নেই । সুট তো দূরের কথা, বুড়িদির বনে দেওয়া সোয়েটারটাই সম্বল । তার কাছে টাকাপয়সা নেই যে কিছু কিনবে । তা ছাড়া বিদেশে টাকার মূল্য নেই, সেখানে চাই ডলার । একটা

ডলারের বিনিময়-মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় বারো টাকা সাতাশ পয়সা। শোনার পর থেকেই অর্জুনের মনে হচ্ছিল ভাতবর্ষের চেয়ে বারো গুণ বেশি ধনী দেশে সে যাচ্ছে পকেট শূন্য রেখে। অবশ্য বিটুসাহেব ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন। জোন্স অ্যান্ড জোন্স যদি আমন্ত্রণ না জানাত তাতে কিছু যেত না, তাঁর ইচ্ছে ছিল অমল সোম সঙ্গে যাবে। তা অমল সোমের বদলে না হয় অর্জুন যাচ্ছে। অতএব কেউ কিছু দায়িত্ব না নিলে বিটুসাহেবের বোন তো আছে। ভারী আদরের বোন তাঁর। মেজর কিন্তু খুব মেজাজে আছেন। তিনি বলেছেন আমেরিকায় পোশাক নিয়ে কেউ মাথাই থামায় না। টাই-পরা লোক রাস্তাঘাটে চোখেই পড়বে না। শীত এড়াবার জন্য জ্যাকেট থাকলেই হল। প্রয়োজনে সেসব ব্যবস্থা হবে। মেজরকে খুব ভাল লাগছে অর্জুনের। যতই হস্তিত্ব করুন, মনটা খুব সরল। ঊর দিকে তাকালেই চেনা মনে হয়। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না বলে একটা অস্বস্তি আছে। মেজরের কাছে পৃথিবীটা যেন হাতের চোটো।

ভোরবেলায় দিম্বিতে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। পকেটে যা ছিল মেজরের পরামর্শে কিছু খুচরো ডলার কিনল অর্জুন কাস্টমস এনক্লোজারে ঢোকার আগে। ডলার দেখতে টাকার মতনই। তবে বেশ বড়সড়। সে কত ডলার নিয়ে যাচ্ছে তা আবার পাসপোর্টে লিখে দেওয়া হল। খবরের কাগজে পড়েছিল যখন কেউ এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশে যাওয়া-আসা করে তখন তাকে সার্চ করা হয়। কিন্তু তাদের কিছুই করা হল না। বিপদে পড়লেন মেজর। তাঁর ব্যাগের মধ্যে সেলোফেন প্যাকেটে একগাদা ফুল পেলেন অফিসাররা। এই ফুল থেকে কোনও মাদক তৈরি হয় কি না তাই নিয়ে যখন বিস্তার আলোচনা চলছে এবং মেজর ফুলগুলো বিরল ধরনের পপি বলেও বোঝাতে পারছেন না তাঁদের, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হলেন। অনর্গল তাঁর মুখ থেকে অচেনা শব্দ বেরোতে লাগল। কাস্টমসের লোকেরা এত তাজ্জব যে, তাঁরা যেন ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পেলেন। প্লেনে বসেও মেজরের রাগ পড়ছিল না। এয়ারহোস্টেস যখন তাঁকে ‘যাত্রা শুভ হোক’ বলে নমস্কার জানালেন, তখন তিনি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, ‘ট্যাক।’

অর্জুন বসেছিল জানলার ধারে, মাঝখানে মেজর, প্যাসেজের ধারে বিটুসাহেব। খুব বিনীত ভঙ্গিতে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, “কথাটার মানে কী? জ-ফলা না থাকলে বাংলা শোনাত।”

মেজর চুরুট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। ওপরে ‘নো স্মোকিং’ লেখা আছে তখনও। বললেন, “শব্দটা ড্যানিশ। মানে হল ধন্যবাদ। চুরুট ধরাবার আগে আমার সঙ্গে কথা বোলো না।”

প্লেনের ভেতরটা বিশাল। সামনের দিকটায় বোধহয় বেশি দামের টিকিট। সুন্দরী এয়ারহোস্টেসরা সবাই বোধহয় আমেরিকান। প্লেনটা তো ওই ২৭৬

দেশের। কেনও আসল খালি নেই। এত লোক প্রতিদিন বিদেশে যায় ? ভোর হচ্ছিল বাইরে। জানলা দিয়ে অন্ধকার মুছতে দেখল অর্জুন। নীচে, অনেক নীচে ভারতবর্ষ পড়ে রয়েছে। আকাশের কি কোনও নাম আছে ? কিন্তু কী আশ্চর্য ! প্লেটো ঘণ্টাখানেক বাদে যখন করাচিতে থামল, তখন অন্ধকার যায়-যায়। এতক্ষণে তো রোদ ওঠার কথা। মাইকে স্থানীয় সময় যা বলল, তা ভারতীয় ঘড়ির সঙ্গে মিলছে না। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। তারা বোধহয় সূর্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গেলে কখনওই কি ভোর হবে। জানলা দিয়ে এয়ারপোর্টটাকে দেখল অর্জুন। এই হল পাকিস্তান। মানুষজন যারা উঠল, ঘরবাড়ি যা দেখা গেল, ভারতবর্ষের সঙ্গে তো কোনও পার্থক্যই ধরা পড়ছে না।

মেজরের রাগ যে তখনও কমেনি টের পাওয়া গেল, যখন এয়ারহোস্টেস এসে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে গেলেন। মেজর চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, NOH HUEVOS FRITOS।' এয়ারহোস্টেস চোখ বড় করে হাসলেন। তারপর ট্রলির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "MWEE BYEN, TORTA ?" মেজর ঘাড় নাড়তে তাঁর প্লেটে একটি কেক পড়ল। আরও কিছুক্ষণ সেই অবোধ্য বাকবিনিময় করে এয়ারহোস্টেস এগিয়ে গেলেন। অর্জুন লক্ষ করল মেজরের মুখে প্রশান্তি ফিরে এসেছে। বিটুসাহেব খাবার মুখে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, "ইতালিয়ান ! কেকের ইতালিয়ান কী বলব ?"

"কে বলেছে ওটা ইতালিয়ান ?" শব্দটা এত জোরে মুখ থেকে বের হল যে, বেশ কয়েকটা খাবারের টুকরো তার সঙ্গী হল। কাগজের রুমালে নিজের শরীর যে পরিষ্কার করছেন বিটুসাহেব, তা অর্জুন দেখল, কিন্তু লক্ষ্যই করলেন না মেজর। এক নিশ্বাসে বলে যাচ্ছেন, "না জেনে মন্তব্য করা আমি দু'চক্ষে পছন্দ করি না। এই মেয়েটাকে দেখে মনে হল ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বাড়ি। আমি স্প্যানিশে বললাম ডিমভাজা খাব না। ওখানকার মানুষ স্প্যানিশ একটু-আধটু জানে। তা আমায় বলল, কেক খাও। আর আপনি বলছেন ওটা ইতালিয়ান ?"

বিটুসাহেব নীরবে প্লেট পরিষ্কার করলেন। দিল্লিতে আসার পর থেকেই ওঁর শরীর যেন চনমনে হয়ে উঠছিল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কেক শব্দটির স্প্যানিশ কী ?"

মেজর বললেন, "TORTA।"

পাশ দিয়ে একজন এয়ারহোস্টেস ফিরছিলেন, বিটুসাহেব তাঁর দিকে একটা আঙুল তুলে বললেন, "TORTA !,,"

লাইটার-রহস্যের অর্ধেক সমাধানের পর থেকে অস্বস্তিটা রয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর কোনও এক কোনায় এখন একটি লাইটার রয়ে গেছে, যা নিয়ে শুধু জাল অথবা চোরাকারবারিরা তৎপর নয়, ওই মারাত্মক ক্ষমতাবান লাইটারটির

গঠন-কৌশল জেনে গেলে সারা পৃথিবীর পক্ষে বিপদ হতে পারে। একটা নিরীহ দেখতে লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপলে অদৃশ্য রশ্মি দশ ফুট বেরিয়ে এসে যে-কোনও মানুষকে অবশ করে ফেলতে পারে। আশেপাশে দাঁড়িয়েও কেউ সেটা বুঝতে পারবে না। ওই বস্তুটির নকল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু অদৃশ্য রশ্মির ব্যবস্থা না করতে পেরে ওরা মিনি গ্রেনেড ঢোকাতে পেরেছে ওই ছোট লাইটারের খোলে।

প্রস্তুতকারক জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি খুব বিরত। আমেরিকান সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। কেন দুটো লাইটার সতর্কতা সত্ত্বেও হারিয়ে গেল! একটি বিনষ্ট হয়েছে খবর পেয়েও তাদের স্বস্তি নেই। অর্জুন এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেও কোনও কূল পায়নি। তবে জালিয়াতরা হংকং, থাইল্যান্ড থেকে নেপাল হয়ে তরাই-ভূটান অঞ্চলে যে কাজকর্ম চালাতে চেয়েছিল, তা ওই ঘটনার পর ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর আর কোনও অঞ্চলে যে এই মুহূর্তে কাজ শুরু হয়নি, তা কে বলতে পারে!

প্যান-আম-এর এই প্লেন এবার থামবে ফ্রাঙ্কফুর্টে। এর মধ্যে দু-দুটো সিনেমা দেখতে পেয়েছে ওরা। দুটোই জেমস বন্ডের ছবি। বিষ্ণুসাহেব আর অর্জুনই ছবি দেখল। মেজর নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। খুব সুখী মানুষই ওভাবে চটপট নাক ডেকে ঘুমোতে পারে। ফ্রাঙ্কফুর্ট যখন এল তখন স্থানীয় সময় আর ওদের ঘড়ির সময়ে অনেক তফাত। মালপত্র সব প্লেনেই থাকবে, ওদের শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে থাকতে হবে। কারণ এই সময়ে প্লেনের ঝাড়পোঁছ, তেল ভরার কাজ সেরে নেওয়া হবে।

প্লেনের দরজা দিয়েই এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর দোতলায় চলে এল ওরা লাইন করে। এরকম ব্যবস্থা দমদম কিংবা দিল্লিতে দ্যাখেনি অর্জুন। মাটিতে পা পর্যন্ত দিতে হল না। ওর মনে হল, বৈধ ভিসা ছাড়া যাতে বিদেশিরা ওদের দেশের মাটিতে পা রাখতে না পারে তাই জার্মানরা এই ব্যবস্থা করেছে। যাই হোক, তবু তো সে জার্মানিতে এল। বিষ্ণুসাহেব প্রথমেই উচ্চারণ করলেন, “হিটলারের দেশ হে!”

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে চটে গেলেন, “NINE, BIT-TUH জার্মানি মানেই হিটলার? আশ্চর্য!”

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বোধহয় সংযত করলেন তিনি নিজেকে। তারপর গড়গড় করে অন্তত দশ-বারো জন জার্মানের নাম আওড়ে গেলেন। যাঁরা প্রত্যেকেই স্মরণীয় মানুষ। বিষ্ণুসাহেব বললেন, “লোকটার কথাই মনে পড়ল আগে, কেন? আশ্চর্য!”

কিন্তু এই জায়গাটা তো পৃথিবীর যে-কোনও দেশের হতে পারে। অন্তত তিন ফার্লং লম্বা ঝকঝকে প্যাসেজের দু’পাশে আলো-ঝলমল দোকান এবং

অফিসঘর। প্রতিটি দোকানের জিনিসপত্র শুষ্কবিহীন। অর্জুন বিস্মিত হয়ে শেষ প্রান্তে চলে এল হাঁটতে-হাঁটতে। বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ট্রানজিট প্যাসেঞ্জাররা প্যাসেজের মাঝে-মাঝে-রাখা চেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মেজর বললেন, “এখানে আমার এক বন্ধু আছে। আপনারা কেউ যাবেন আমার সঙ্গে?”

বিষ্টসাহেব মাথা নাড়লেন, “উহু। আমি এই চেয়ারে বসে মানুষ দেখব। জামানিতে এসে একটাও জার্মান দেখতে পাচ্ছি না! তোমরা বরং ঘুরে এসো।”

অর্জুন মেজরের সঙ্গী হল। মেজর বললেন, “ওরা এই এয়ারপোর্টের বাইরে যেতে দেবে না আমাদের। ভিসা থাকলে দিত। ফ্রাঙ্কফোর্টের বিখ্যাত জিনিস হল এর অপেরা। আমি SACHESENHAUSEN-এ অপেরা দেখেছি। দ্বিতীয় বিখ্যাত বস্তু হল আপেলের তৈরি মদ। ওদের জাতীয় মদ। আহা, অমৃত।” একটি দোকানে ঢুকে মেজর একটা হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বললেন, “GOO-TEN-TAHK!”

টাকমাথা লোকটার মুখ উজ্জ্বল হল। তিনিও হাত তুললেন, “GOO-TEN-TAHK! VEE GAYTESS EE-NEN! বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। মেজর হাতটা ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, “ZAYRGOOT!”

শব্দগুলোর একবর্ণ বুঝতে পারছিল না অর্জুন। মেজর আরও কিছুটা শব্দ খরচ করার পর লোকটি অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, “ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। এত অল্প বয়সে আপনি এত প্রতিভাবান, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্বিত হচ্ছি।”

এই সময় আর-একজন খন্দের দোকানে ঢুকে কাউন্টারে দাঁড়াতে টাকমাথা ভদ্রলোক, “EN-SHOOL-DIGEN-ZEE,, বলে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। লোকটার পরনে চমৎকার সুট, চোখে চশমা, বয়স তিরিশের সামান্য ওপরে। যা নেবেন সেটা জানিয়ে ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অলস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট নিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। অর্জুন চোখ ফিরিয়ে নিল। টাকমাথা ফিরে এলে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন সিগারেট না ধরিয়ে। এমন হতে পারে তিনি লাইটার কিনতে এসে না পেয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু পাশের টেবিলের ওপর স্থূপ করা দেশলাই রয়েছে। জলপাইগুড়িতে যেসব দেশলাই দেখেছে সেরকম নয়। বাস্তব বদলে পাতার মধ্যে আটকানো কাঠি। লোকটা তো এই একটাতে সিগারেট ধরাতে পারত। মেজর ততক্ষণে বন্ধুর সঙ্গে গল্প শুরু করেছিলেন। অর্জুন চটপট বাইরে বেরিয়ে এল। অন্তত আট-দশটি প্লেনের যাত্রীরা ট্রানজিট লাউঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি মানুষই যথেষ্ট ধনী, অর্জুনের মনে হল, এখানে কোনও

গরিব নেই। অন্তত পোশাক এবং আচরণে। লোকটি হাঁটছিল অত্যন্ত অলস ভঙ্গিতে। তার ডান হাতে সিগারেটটি ধরা, তাতে এখনও আগুন পড়েনি। প্যাসেজের পাশে রাখা চেয়ারগুলিতে অনেকে বসে। তাদের একজন লোকটিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। ওর বয়স বেশি। দু'জনেই বিদেশি। দেখে কোন্ দেশের তা অর্জুনের পক্ষে ঠাওর করা সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটিকে বোঝা যায়। ওর তাকানো, শরীর বলে দেয় সহজ পথের মানুষ নয়। তা ছাড়া লোকটার কাঁধে বেশ ভারী ব্যাগ ঝুলছে। টুকিটাকি ছাড়া সবাই জিনিসপত্র প্লেনেই রেখে এসেছে। অত বড় ভারী ব্যাগ লোকটি বইছে কেন?

ওরা কী কথা বলছে তা বোঝা এতদূর থেকে অসম্ভব। দু'তিনজনের ইংরেজি এর মধ্যে কানে এসেছিল, যার উচ্চারণ এমন যে, চেনা শব্দও অচেনা হয়ে যায়। লোক দুটো এখন পাশাপাশি হাঁটছে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে। দু'পাশের দোকান বা জনতার দিকে আর মন দিচ্ছে না। অর্জুনের মনে হল, যদি ও লাইটার কিনতে যেত তা হলে না পেয়ে অন্য দোকানে খোঁজ করত। লাইটার ছাড়া অন্য কিছু হলেও তো এইটে সম্ভব ছিল। কিন্তু সে কেন ওই লোক দুটোকে অনুসরণ করছে?

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মেজরের জন্য পিছন ফিরল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সব দোকান যে এক রকম দেখাচ্ছে! দোকানের গায়ে যে নাম লেখা, তা ইংরেজিতে নয়। প্রতিটি দোকান তন্নতন্ন করে খুঁজে সে সেই দোকান বা মেজরকে দেখতে পেল না। এমনকী বিটুসাহেব যে চেয়ারটায় বসেছিলেন সেটাও নজরে আসছে না। মাইকে কিন্তু অনবরত ঘোষণা করছে, কখন কোন্ প্লেন ছাড়বে। যাত্রীদের সেইভাবে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের কাউন্টারের দিকে এগোতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আচমকা অর্জুনের শরীরে যেন বরফের স্পর্শ লাগল। তার পাসপোর্ট-টিকিট বিটুসাহেবের কাছে রাখা। যদি ওরা তাকে না পেয়ে প্লেনে উঠে পড়ে তা হলে সে কী করবে? ঠিক তখনই নজরে পড়ল বিটুসাহেব টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছেন।

প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতো আনন্দে ছুটে গেল কাছে, “মেজর কোথায়?”

“তোমরা তো একসঙ্গে গেলে। কেন, সে হারিয়ে গেছে নাকি?”

“না, আমরা একটু আলাদা হয়ে পড়েছিলাম, তারপর আর খুঁজে পাচ্ছি না।”

“অ। কোথায় আর যাবে! যে মরুভূমিতে খ্যাকশেয়াল খোঁজে, সে ঠিক আমাদের খুঁজে বের করবে। ঠিক আছে? এদের টয়লেটে গেছ? মাথা ঘুরে যায়। কী আধুনিক কায়দা। এসো, এখানে বসি। আমি তখন থেকে বিখ্যাত জার্মানদের নাম ভেবে যাচ্ছি। কিন্তু হিটলার এমন জায়গা দখল করে বসে আছেন যে, হিমলার-টিমলার ছাড়া আর কারও নাম মনে পড়ছে না। তুমি দু-একটা নাম মনে করিয়ে দাও তো!” বিটুসাহেব চোখ বন্ধ করলেন।

অর্জুন হাসল, “বেকেনবাওয়ার, বিখ্যাত ফুটবলার ! ম্যাঙ্গমুলার ।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ !” ঘনঘন মাথা নাড়লেন বিটুসাহেব । “ঠিক আছে হিটলার মরে গেছেন, এখন আমার মাথায় সব বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীরা এসে গেছেন ! সোপেনহাওয়ারের নাম শুনেছ ? দার্শনিক !” যেন হতরাজ্য ফিরে পেয়েছেন এমন ভঙ্গি করলেন বিটুসাহেব ।

ঠিক তখনই মেজরকে দেখা গেল হস্তদন্ত হয়ে, “GEN-RAH-DEH-OUS ! প্যান-অ্যাম থেকে প্যাসেঞ্জারদের ডাকছে আর আপনারা এখানে গল্পো করছেন ! প্লেন চলে যাবে আপনাদের ফেলে । চলুন, চলুন । আর তুমি ! আমাকে না বলে তুমি চলে এলে ?”

প্রায় তাড়িয়ে মেজর নিয়ে এলেন প্যান-অ্যাম এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে । সেখানে তখন লাইন পড়ে গেছে । হঠাৎ বিটুসাহেব চোঁচিয়ে উঠলেন, “আমার ওষুধের কৌটো !”

মেজর হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ওষুধ ?”

“হার্টের । ডাক্তার বলেছিল সব সময় সঙ্গে রাখতে । আমি কৌটোয় রেখেছিলাম ।”

“আর নেই সঙ্গে ? কী ওষুধ নাম বলুন, পাশেই মেডিসিন শপ । চটপট ।”

“কিন্তু, কিন্তু... । ওই কৌটোর তলায় হিরের আংটি রেখেছি ।”

“হিরের আংটি ?” মেজরের দাড়িগুলো যেন বুলে পড়ল ।

“শুনেছিলাম কাস্টমস খুব চেক করে । যদি আঙুলে থাকলে না নিতে দেয় তাই ওষুধের কৌটোয় রেখে দিয়েছিলাম । প্রথম আমেরিকায় যাচ্ছি । ভাবিকে দেব বলে !” প্রায় কঁদে ফেললেন ভদ্রলোক, “অনেক দাম, অনেক । কোথায় ফেলেছি !”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি এখানে আসার সময় পকেটে রেখেছিলেন ?”

“ইয়েস । আমি চেয়ারে বসে দেখেছি কৌটোটা । রিয়েল ডায়মন্ড । ঠিক আছে !”

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর ছুটলেন বিটুসাহেব যেখানে চেয়ারে বসে ছিলেন সেখানে । অর্জুন যে রাস্তায় ওরা হেঁটে এসেছিল সেটা দেখতে লাগল । আর বিটুসাহেব কাঁদো-কাঁদো ভঙ্গিতে একটি জার্মান পুলিশকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন । অনেক স্মৃতি-বিজড়িত আংটি । খুঁজতে খুঁজতে অর্জুন অনেকটা চলে এল । এত মানুষ হাঁটাচলা করছে, পায়ে তলায় ছোট ওষুধের কৌটো দেখলে নিশ্চয় কেউ পকেটে পুরবে না । কিন্তু যাবে কোথায় ? বিটুসাহেব পুলিশকে কী বলছেন তিনি জানেন, কিন্তু পুলিশ যদি জিজ্ঞেস করে হিরের আংটি কেন তিনে ওভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা হলে উত্তরটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে ?

মিনিট দশেক কেটে গেল, তবু কৌটোর হদিস পেল না অর্জুন। শেষে হতাশ হয়ে যখন ফিরছে, তখন টয়লেট-সাইনটা নজরে পড়ল। মুখ ধুতে গিয়ে ওখানে ফেলে আসেননি তো। অর্জুন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দারুণ ঝকঝকে আধুনিক টয়লেট। অর্জুন মেঝেতে নজর বুলিয়ে কিছু পেল না। শেষ লোকটি বেরিয়ে গেলে সে ফিরতেই ব্যাগটাকে দেখতে পেল। একটা ভারী ব্যাগ টুপি রাখার স্ট্যান্ডে ঝুলছে। নিশ্চয়ই কেউ ভুল করে এটাকে ফেলে গিয়েছে। কাছাকাছি হতেই সে চমকে উঠল। এটাকে সে সিগারেট না জ্বালানো লোকটার নিষ্ঠুর দেখতে সঙ্গীটির সঙ্গে দেখেছিল। হ্যাঁ, অবিকল এই ব্যাগ। কিন্তু সেই লোকটা তো ভুলে ফেলে যাওয়ার পাত্র নয়। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে পাশের খোলা ল্যাট্রিনের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দ্রুত হাতে ব্যাগটা খুলে তেমন কিছু সন্দেহজনক জিনিস দেখতে পেল না অর্জুন। কয়েকটা ছেঁড়া মোজা, ভারী মোটা-মোটা অঙ্কের বই, তোয়ালে, এইসব। অর্জুন হতাশ হয়ে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রোগামতন একটা জার্মানি, যার নাকের ওপর সরু ফ্রেমের স্টেনলেশ স্টিলের চশমা। অর্জুন বেরিয়ে আসা মাত্র লোকটি বলল, “GOO-TEN-TAHK.”

অর্জুনের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে কাঁপা গলাতেই ইংরেজিতে বলল, “আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।” লোকটি হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে দরজাটা ধরে ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেটাকে বন্ধ করল। প্রচণ্ড দুর্বল মনে হচ্ছিল শরীরটা। লোকটার প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছিল এবং সবক’টা ল্যাট্রিনে লোক থাকায় সে বিব্রত ছিল এটা বুঝতে সময় লাগল। তারপর ঝটপট ব্যাগটাকে হ্যাট-ব্যাগে বুলিয়ে দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

মেজর অর্জুনকে দেখে বললেন, “পাওয়া গিয়েছে। চল, আমাদের ডাক এসে গিয়েছে।”

“পাওয়া গিয়েছে? কী করে পাওয়া গেল?” অর্জুন অনেকক্ষণ পরে খুশি হল।

“ওঁর কোটের ভেতরের পকেটেই ছিল।”

“যা বাব্বা!” অর্জুন বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকাল। তিনি তখন অত্যন্ত মন দিয়ে একটি কাগজ পড়ছেন। এইসব কথাবার্তা যেন ওঁর কানেই যাচ্ছে না।

প্লেনে বসে এবার অর্জুন ঘড়ির দিকে তাকাল। যত তারা এগোচ্ছে, তত পাল্লা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা পালটাতে হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে যে, ভারতবর্ষ ছাড়ার তারিখটা বাইশ ঘণ্টা পরেও আমেরিকায় পৌঁছে একই থেকে যাবে। বিষ্টুসাহেব এখনও কাগজ পড়ছেন। বোধহয় কৌটোটা ভুল পকেটে রেখে হইচই বাধাবার জন্য বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ কোমরে একটা খোঁচা ২৮২

খেল অর্জুন। পাশে তাকাতেই দেখল বিটুসাহেব খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে খবরের কাগজের একটা অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ইংরেজি কাগজটার শেষ পাতায় বক্স করে ছাপা হয়েছে, ‘জোস্‌ অ্যান্ড জোস্‌ কোম্পানি জানাচ্ছে যে, তাদের চুরি যাওয়া একটি লাইটার যে খুঁজে দেবে বা হদিস কিংবা সূত্র জানাবে তাকে দশ হাজার আমেরিকান ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। আমেরিকান এই কোম্পানিটির হারানো লাইটারটি মানবসভ্যতার ক্ষতি করতে পারে। সম্প্রতি হামবুর্গ শহরের গ্রোসে ফ্রেইহিট স্ট্রিটের ‘দি ট্যাবু’ ক্লাবে, জোস্‌ অ্যান্ড জোস্‌ কোম্পানির হারানো লাইটারটির একটি নকল পাওয়া গিয়েছে। প্রথম বোতামটি সক্রিয় ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বোতাম কার্যকর ছিল না। অনুমান করা হচ্ছে, এই অঞ্চলে ওই জাল-কারবারিদের আনাগোনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, একজন তরুণ ভারতীয় গোয়েন্দা হারানো লাইটারের জুড়িটিকে ধ্বংস করেছেন।’

মেজর বিরক্ত হচ্ছিলেন খবরের কাগজ নিয়ে এই ধরনের উত্তেজনায়। বিটুসাহেব বললেন, “ওদের তোমার নাম দেওয়া উচিত ছিল। আমি প্রতিবাদপত্র লিখব। ঠিক আছে?”

সেই সময় চোখ তুলতেই অর্জুন অবাক হল। সেই লোক দুটো ঢুকছে। বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে সিট নাম্বার খুঁজতে-খুঁজতে ওদের পেরিয়ে চলে গেল। সেই গুণ্ডামতন লোকটার হাতে এখন ব্যাগ নেই। আর সুবেশ মানুষটির হাতে সিগারেট একইভাবে না ধরিয়ে রাখা আছে।

কোনও প্রত্যক্ষ অবলম্বন নেই, কিন্তু অর্জুনের উত্তেজনা বাড়ছিল। একটা লোক অযথা কেন ঘন্টাখানেক সিগারেট না ধরিয়ে আঙুলের ফাঁকে রেখে দেবে? সঙ্গী লোকটার ব্যাগে কেন শুধু ছেঁড়া মোজা, অস্কের বই থাকবে এবং সেগুলোকে টয়লেটে ফেলে আসবে? নিশ্চয়ই আরও কিছু ছিল ব্যাগটায়। কী ছিল? ব্যাগটাকে ওভাবে ফেলে এল কেন? যে জিনিস সঙ্গে ছিল তা কি ব্যাগে রাখা আর নিরাপদ ছিল না?

এইসময় ঘোষণাটা করে প্লেন ছেড়ে দিল। সিটবেন্ট বেঁধে অর্জুন পেছন ফিরে তাকাল। সুবেশ ভদ্রলোকের শরীর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীর একটা হাত নজরে এল। কোটের বাইরে আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ। ভঙ্গিটাই বলে দেয় প্রচণ্ড শক্তি ধরে লোকটা। এবার ওরা বসেছে সেই এলাকায় যেখানে সিগারেট খাওয়া চলে না। ব্যাপারটা বিটুসাহেব করেছেন, বোর্ডিং কার্ড নেবার সময় বলেছেন, ‘নো স্মোকিং।’ আর সেইটাই খেপিয়ে দিয়েছে মেজরকে। তিনি এখন সারাটা পথ চেয়ারে বসে চুরুট খেতে পারবেন না।

আকাশে প্লেন স্বাভাবিক হয়ে এল। মেজর উঠলেন। তার বিরাট শরীরটা বিটুসাহেব এবং অর্জুনকে অতিক্রম করে পেছনের দিকে চলে গেল। উড়ন্ত প্লেন এবং রানিং ট্রেনে হাঁটার সময় একই অনুভূতি। অর্জুন কিছুক্ষণ অপেক্ষা

করল। তারপর সে-ও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এয়ার হোস্টেসরা খাবারদাবারের ব্যবস্থা করছে। সুবেশ ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। ওঁর পাশের লোকটি অর্জুনের দিকে চলে গেল। একবার তাকাল, তারপর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল। শেষ প্রান্তে চলে এসে মেজরকে দেখতে পেল অর্জুন। এক হাতে একটা পানীয়ের গ্লাস নিয়ে চুরুট খাচ্ছেন। অর্জুনকে দেখে বললেন, “অদ্ভুত! আগবাড়িয়ে নো স্মোকিং বলার কী দরকার ছিল। এখন খাও এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমি নিউইয়র্কে পৌঁছেই কেটে পড়ছি।”

“কোথায় যাবেন?”

“আমার ফ্ল্যাটে। ম্যানহাটনে আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে। উনি থাকবেন ওঁর বোনের বাড়িতে। এরকম লোক আমি দেখিনি, সবকিছু জেনে বসে আছেন। অসুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে থাকলেই তো চলত। সারা এয়ারপোর্ট চষেছি ওঁর কৌটোর জন্য, জানো?” মেজর এক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে চুরুটে টান দিলেন।

অর্জুন বলল, “বিটুসাহেব কিন্তু ভালমানুষ। বয়স হয়েছে বলে ভুল হয়।”

মেজর বললেন, “সেটা আমাকে বলতে হবে না। ভাল মানুষ না হলে আমি সঙ্গী হতাম? তুমি তো সিগারেট খেতে এসেছ, ধরাও, আরে, আমি কিছু মনে করব না।”

অর্জুন দ্রুত মাথা নাড়ল, “না, না। আমি আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।”

মেজর খুব খুশি হলেন, “গুড। তুমি ছেলেটা ভাল। আমার কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে বলবে।”

অর্জুন বলল, “আপনি তো বলেছেন আমরা দু’জনেই সত্য খুঁজছি। তবে দু’রকমের মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় লাইটারটা খোঁজার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।”

“গ্র্যান্টেড। লাইটারটা এখন কার কাছে আছে?” মেজর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন।

হেসে ফেলল অর্জুন, “সেটাই তো সবাই জানতে চাইছে। আমিও জানি না।”

ওপর থেকে মনে হচ্ছিল একেই বোধহয় বলে হিরের মালা। কেনেডি এয়ারপোর্টের আলো নিউইয়র্ক শহরকে রহস্যময়ী করে তুলেছিল। বিটুসাহেব আপ্ত হয়ে বললেন, “অনবদ্য। দারুণ দৃশ্য, তাই না?”

প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই অর্জুনের মনে হল সে আমেরিকায়। ঠাণ্ডা তো তেমন নেই। তারপরে খেয়াল হল তারা প্লেনের পেট থেকে সোজা চলে এসেছে এয়ারকন্ডিশন্ড বিল্ডিং-এর ভেতরে। বাইরের ঠাণ্ডা এখানে ঢুকবে

কেন ? কিন্তু এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের ভেতরে এসে মনে হচ্ছে যেন খুব বড় কোনও শহরে ঢুকে পড়েছে। এত ব্যস্ততা, কিন্তু তাড়াহুড়ো নেই, চিৎকার নেই। অর্জুন লক্ষ করছিল সেই দুটো লোককে। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমসের বাধা ডিঙিয়ে ওরা তাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন সুবেশ লোকটির হাতে সিগারেট নেই। প্লেনের ক্যারিয়ারে রাখা মালপত্রের জন্য সবাই যখন অপেক্ষা করছিল, তখনই ওদের দুটো সুটকেস এসেছিল। সুবেশ লোকটা যে সুটকেসটি ধরেছিল তার ওপর লেখা আছে, ১৫-৩২, রাস্তা তিরিশ, ম্যানহাটন।

বিষ্টুসাহেবের বোন এবং ভগ্নীপতি এসেছিলেন এয়ারপোর্টে। দাদাকে পেয়ে স্বভাবতই খুব খুশি। তাঁরা এবং বিষ্টুসাহেব চাইছিলেন অর্জুন ওঁদের ওখানে উঠুক। কিন্তু প্রত্যেকের অনুরোধ নস্যাৎ করে দিলেন মেজর, “না, না। এখন থেকে আমাদের একসঙ্গে অনেক কাজ করতে হবে। তোমাদের ওখানে মাঝে-মাঝে দেখা করতে যাব।”

আলাদা গাড়িতে ওঠার আগে বিষ্টুসাহেব বললেন, “শরীরটা একটু সারিয়ে তুলি। তারপর তোমার সঙ্গে যাব। অভিযান-টভিযান হলে আমাকে বাদ দিও না। ঠিক আছে?”

মেজর ট্যাক্সি নিলেন না। বললেন, “ট্যাক্সিতে ওঠা মানে গলা বাড়িয়ে দেওয়া। ডলার যাবে একগাদা। তার চেয়ে বাসে উঠি এসো।”

বাইরে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। অর্জুনের খুব শীত করছিল। একটা পুরো-হাতা সোয়েটারে শীত আটকাচ্ছে না। সঙ্গে মালপত্র বেশি না থাকায় বাসে আপত্তি করল না কেউ। ঢোকার সময় নব্বুই সেন্ট জমা দিয়ে ঢুকতে হয়। মেজরই দু’জনেরটা দিয়ে দিলেন। সন্ধে হয়েছে, রাত্রের নিউইয়র্ক দেখতে জানলার বাইরে তাকাচ্ছিল সে। মেজর বললেন, “নো, নো, এটা নিউইয়র্ক নয়। কেনেডি শহর থেকে অনেক দূরে।”

বাসে সাদা-কালো দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল শীতবস্ত্র। হঠাৎ নিজেকে খুব গরিব-গরিব বলে মনে হচ্ছিল। বাইরে তাকিয়ে অর্জুন শুধু বুঝতে পারল তারা দারুণ ঝকমকে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বাস যেখানে শেষ করল সেই জায়গাটার নাম টাইম স্কোয়ার। অর্জুনের মনে হল যেন দেওয়ালির উৎসব হচ্ছে চারধারে। এত আলো, এত সাজগোজ যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মেজরের সঙ্গে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল ঠাণ্ডা সত্ত্বেও। ম্যানহাটনে ওঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছতে সময় লাগল বেশ, তবু।

নিয়মটা অদ্ভুত। মোটা কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যে ফ্ল্যাটে যেতে চাও, সেই ফ্ল্যাটের নম্বরে টেলিফোন করলে তারা যাচাই করবে তুমি কে। পছন্দ হলে সেখান থেকে বোতাম টিপলে ও-পাশের দরজাটা খুলে যাবে। সেইটে দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর লিফট পাবে। চাবি ছাড়া এবং অনুমতি না পেলে দ্বিতীয় দরজা খুলবে না। নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মেজর ঘোষণা

করলেন, “এখন থেকে এটাকে নিজের বলেই ভাববে। ও-পাশের দুটো বিছানার যে-কোনও একটায় তুমি শুতে পারো। ওখানে কিচেন আছে। কিছু খাবার আমি যাওয়ার সময় রেখে গিয়েছিলাম, নষ্ট হবার কথা নয়। কাল বাজার করব। আর এই নাও নিউইয়র্কের ম্যাপ। আমি এখানে আছি। এই স্পটটায়। বাড়ির নম্বর, টেলিফোনের নম্বর লিখে নেবে। ও. কে.।”

বলতে বলতেই টেলিফোন বাজল। অর্জুন একটা সোফায় আরাম করে বসল। প্লেনে যা খাইয়েছে, আর খিদের প্রশ্ন নেই। ঘরটায় বেশ গরম আছে। মেজর তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন, ‘GOO DAH, HOOR STORE DET TILL ? TAHK BRAH ?’ এটা কোন ভাষা বুঝতে পারল না অর্জুন। কিছুক্ষণ পরে মেজর ফিরে এসে বললেন, “আমার এক সুইডিশ বন্ধু ফোন করেছিল। রাশিয়ান রকেটের বিশ্লেষণ সুইডেনে খুব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জলের তলায় একটা নীল রঙের শ্যাওলা হচ্ছে। ও সেই শ্যাওলা দেখতে যাচ্ছে। আমার চুরুট!” মেজর আচমকা পকেটে হাত দিলেন। এ-পকেট সে-পকেট খোঁজার পর নিজের ব্যাগ হাতড়ালেন, “যাঃ, আমার চুরুটের প্যাকেটটা কোথায় ফেলে এসেছি। তুমি বোসো, আমি চুরুট কিনে আনি।”

এই ভরসন্ধেবেলায় অর্জুনের একা এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। সে সঙ্গ নিতে চাইলে মেজর আপত্তি করলেন না। কিন্তু একটা চোখ ছোট করে অর্জুনকে দেখে সোজা ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন একটা অপেক্ষাকৃত ছোট জ্যাকেট হাতে নিয়ে। কিন্তু সেটা অর্জুনের কাছে আলখাল্লার মতো লাগছিল। ওই বেচপ জিনিসটা বাধ্য হয়ে পরতে হল মেজরকে খুশি করার জন্য। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যে আশ্রম হল, তাতে মনে মনে মেজরকে ধন্যবাদ জানাল অর্জুন।

জায়গাটার নাম ম্যানহাটন। দু’পাশে উঁচু-উঁচু বাড়ি, দোকানপাট কম, সন্দেশ পার হওয়ায় লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। অর্জুনের চট করে সুটকেসের ওপরে দেখা ঠিকানাটার কথা মনে পড়ল। সে মেজরকে জিজ্ঞেস করতে মেজর বললেন, “মিনিট দশেকের হাঁটা। কে থাকে সেখানে?”

“একবার সেই বাড়িটার সামনে যেতে পারি?”

“তুমি হাঁটতে পারলে আমার আপত্তি কী! আহা, এই দোকানটা বন্ধ কেন?”

মেজর চুরুটের দোকান খুঁজতে-খুঁজতে হাঁটছিলেন। এদিকের রাস্তায় মানুষজন কম কেন! ফুটপাথে কি বেশি লোক হাঁটে না! অথচ গাড়ি যাচ্ছে স্রোতের মতো।

অনেকগুলো ব্লক পেরিয়ে মেজর বললেন, “এটাই থার্ডিয়েথ স্ট্রিট। কত নম্বর বললে?”

২৮৬

“ফিফটিন—থার্টীটু ।”

আর একটু হাঁটার পর মেজর একটা পাঁচতলা বাড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী নাম ?”

অর্জুন বলল, “নাম জানি না ।”

“মানে ?” অবাক হলেন মেজর ।

“নামটাই তো খুঁজে বের করতে হবে ।”

সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠলেন মেজর, “আই সি, আই সি । এক্সপিডিশন !”

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটার উলটো ফুটপাথে । বিভিন্ন ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে । লোকটা নিশ্চয়ই এখন ওখানে পৌঁছে গিয়েছে । তার সঙ্গী কোথায় কে জানে ! কিন্তু কোন্ ফ্ল্যাটটায় লোকটা থাকে, সেটাই বের করতে হবে । এইসময় মেজর একটা চুরুটের দোকান আবিষ্কার করে ফেললেন । তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল । চুরুট কেনার পর মেজর বললেন, “আমি বড্ড লোভী হয়ে গেছি । নিজেকে শাস্তি দিতে অন্তত আধঘণ্টা চুরুট ধরাব না । চলো না, ওই বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিই !”

“কী খোঁজ দেবেন ?”

“তাও তো বটে । বাড়ির নাম্বার জানো, কিন্তু লোকের নাম জান না । অথচ দশটা ফ্ল্যাট হবে এখানে । লোকটাকে চেনো তো ?”

“চিনি ।”

“তা হলে দাঁড়িয়ে থাক । একসময় না একসময় বের হবেই ।” মেজর ওপাশে তাকালেন, সেখানে একটা দোকানের ওপর দাবার বোর্ডের সাইনবোর্ড, “আঃ, দারুণ । তুমি এখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে যাও, আমি ততক্ষণ একহাত খেলে আসি ।”

“কী খেলবেন ?” অর্জুন অবাক ।

“দাবা । একটা গেম জিতলে দশ ডলার, হারলেও তাই দিতে হবে । তবে এ-শর্মা কখনও রিস্ক নেয় না, অভিযান ছাড়া ।” মেজর আর দাঁড়ালেন না । ঠাণ্ডা এড়াতে অর্জুন একটা ছাউনির তলায় এসে দাঁড়াল । এত রাতে অতটা পথ উড়ে এসে লোকটা নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে বের হবে না । এখনও কোনও সন্দেহজনক কাজ লোকটা করেনি, কিন্তু ওর সঙ্গী করেছে । ব্যাগটাকে ফ্রান্সফুর্টের টয়লেটে ফেলে এল কেন ? হয়তো পুরোটাই অন্ধকারে হাতড়ানো, তবু অর্জুনের মন মানছিল না । মিনিট পনেরো যাওয়ার পর অর্জুন রাস্তাটা পেরিয়ে বাড়িটার সামনে এল । সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই প্যাসেজ পেরিয়ে লিফট । তার গায়েই একটা বোর্ডে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের নাম লেখা । তা দেখে তো কিছু বোঝা মুশকিল । অর্জুন রাস্তায় বেরিয়ে দাবা খেলার দোকানে চলে এল । মেজর ততক্ষণে বিশ ডলার হেরেছেন ।

জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানিতে অর্জুনের যে অভ্যর্থনা হল, তা কল্পনার

বাইরে। স্বয়ং কোম্পানির চেয়ারম্যানের পি. এ. এসেছিল মেজরের ফোন পেয়ে গাড়ি নিয়ে। মোটামুটি ভদ্র পোশাকে মেজরকে সঙ্গে নিয়ে সেই গাড়িতে চেপে অর্জুন গিয়েছিল পরের দিন সকালে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এ। কোম্পানির চেয়ারম্যান বৃদ্ধ মানুষ। তিনি পরের দিন বারংবার ওকে ধন্যবাদ দিলেন প্রথম লাইটারটি খুঁজে বের করার জন্য। তিনি অনুযোগ করলেন কেন অর্জুন তাঁদের জানাল না, কোন ফ্লাইটে সে আসছে। অর্জুনের আমেরিকায় থাকা-খাওয়া এবং সমস্ত রকম খরচ ছাড়া কিছু পুরস্কারের প্রস্তাব দিলেন তিনি।

মেজর জানালেন, অর্জুন তাঁর অতিথি। এখন দ্বিতীয় লাইটারটা খুঁজতে তাঁরা ব্যস্ত। আমেরিকাতে অর্জুন তাই তাঁর কাছেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল এইরকম, যখনই যা দরকার হবে, তা অর্জুন মিস্টার স্মিথ বলে এক ভদ্রলোককে জানাবে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যবস্থা করবেন। চেয়ারম্যান আরও জানালেন, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন তাঁকে জানিয়েছেন যে, নকল লাইটারের কারবারিরা আপাতত তাদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছে। কিন্তু যতক্ষণ না দ্বিতীয় লাইটারটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কোম্পানি নিশ্চিত হতে পারছে না।

জোন্স অ্যান্ড জোন্স থেকে বের হতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। মেজর ওকে নিয়ে ঢুকলেন ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির রেস্টোরাঁয়। অল্প দামে ভাল খাবার দেওয়ার জন্য এই কোম্পানি প্রতিটি শহরে এইরকম অনেক দোকান করেছে। মেজর কাউন্টার থেকে খাবার আনতে গেলে অর্জুন রাস্তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। কাল থেকে একটা ব্যাপার সে এখানে তেমন দেখতেই পাচ্ছে না। আমেরিকার লোকেরা কি সিগারেট খায় না? একটা মানুষও চোখে পড়ছে না, যার হাতে সিগারেট আছে। একমাত্র মেজর ছাড়া চুরুট খাচ্ছেন এমন কেউ সামনে আসেনি। তা ছাড়া মেজর চুরুট কিনেছিলেন একটা পেট্রল পাম্প থেকে। তারাই সিগারেট চুরুট বিক্রি করে।

অর্জুন রাস্তাটা দেখল। কারও মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে না। অথচ এদেশের কোম্পানি লাইটার তৈরি করেছিল বাজারে চালু করতে। চেয়ারম্যান বললেন, সেটা বিক্রি হয়েছিল যারা আত্মরক্ষা করতে অস্ত্র চায় তাদের উদ্দেশে। রিভলভারের বদলে লাইটার। কিন্তু লাইটারটার প্রথম কাজ তো সিগারেট ধরানো। প্লেনে একটা বুলেটিনে সে পড়েছে, আমেরিকায় অন্যান্য চাষের মাত্র শতকরা ছ'ভাগ তামাক চাষ হয়।

খাবার নিয়ে উলটো দিকের টেবিলে এসে বসলেন মেজর, “এদের মিস্কশেকটা দারুণ। হ্যাঁ, নিউইয়র্ক নিশ্চয়ই ঘুরে দেখতে চাও। স্ট্যাচু অভ লিবার্টি? অ্যাঁ! এখনই না? বেশ, বেশ, যখন ইচ্ছে হবে, বলবে। আচ্ছা আমরা এখন কী করব? অ্যাডভেন্স নিয়ে তো কোনও লাভ হবে না। ফ্ল্যাট নাম্বার জানি না, মানুষটার নাম জানি না। মুশকিল। তোমাদের বিটুসাহেবের

সঙ্গে দেখা করতে যাবে নাকি ?” কথাগুলো বলতে বলতেই মেজর তাঁর নিজের প্লেট শেষ করে ফেলেছেন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল, মেজর ওরকম শ’খানেক প্লেট অবলীলায় শেষ করতে পারেন। অথচ খাবারগুলো এত ভারী অথচ সুস্বাদু যে, অর্জুনের মনে হচ্ছিল বিকেল পর্যন্ত খেতে হবে না। সে জবাব দিল, “বিষ্টসাহেবের বাড়িতে না হয় বিকেলে যাব। কিন্তু আমি আর একবার ওই বাড়িটার সামনে যেতে চাই।”

মেজর কাঁধ নাচালেন। তারপর মুখ ফিরিয়েই চিৎকার করে উঠলেন, “হা-ই ! চার্লি !”

ওপাশ থেকে একটি রোগা নিরীহ দেখতে নিগ্রো এগিয়ে এল সাদা দাঁত বের করে, “হা-ই ! মেজর !” অর্জুন অবাক হয়ে গেল। কোনও নিগ্রো এত রোগা হতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। লোকটা কথা বলছে খুব শান্ত ভঙ্গিতে। বোধহয় মেজরের অনেকদিনের পুরনো বন্ধু। কিন্তু পোশাক দেখে মোটেই মনে হয় না খুব আরামে আছে লোকটা। মেজর নিগ্রোটটির কোমরে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন, “এই হচ্ছে চার্লস। আমার সঙ্গে মেক্সিকো-এক্সপিডিশনে গিয়েছিল। দারুণ চোর।”

শেষ শব্দটাকে হকচকিয়ে গেল অর্জুন। মেজর কিন্তু একই গলায় অর্জুনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন চার্লিকে। সেটা শেষ হলে চার্লি অর্জুনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একগাল হেসে বলল, “প্লাদ টু মিট ইউ।” অর্জুন মেজরকে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, “উনি কী করেন বলছিলেন ?”

“এখন কিছু করে না বলল। তবে ওর চুরির খুব নাম-যশ আছে। এগারোবার জেল খেটেছে। হ্যাঁ, সিরিয়াসলি ! তারপরে হেনরি ডিমক ওকে আমাদের অভিযাত্রী সঙ্ঘে ঢেকায়। ওহো, হেনরি এখন শহরে নেই, নইলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম।”

আমেরিকায় এসে অর্জুন এই প্রথম একজন চোর দেখল, যে দাঁত বের করে সরল হাসে, কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে মেজরের যা ভাব দেখা যাচ্ছে সেটা শুধুই চোর হলে হত না। চার্লি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি আমেরিকায় বেড়াতে এসেছ, খুব ভাল কথা, এখানকার মানুষের সঙ্গে আলাপ কর। স্ট্যাচুর চেয়ে মানুষ অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।”

খুব ভাল লাগল কথাটা। অর্জুন সরাসরি এবার জিজ্ঞেস করল, “তুমি চুরি কর ?”

“করতাম। হোয়াইট হাউস থেকে বাজি রেখে অ্যাশট্রে চুরি করেছিলাম একসময়। এই নিয়ে জ্ঞান দিতে এসো না। আমার ভাল লাগেনা।” উদাসীন গলায় বলল চার্লি।

থার্টিয়েথ স্ট্রিটে পৌঁছে মেজর যথারীতি দাবা খেলতে গেলেন। বিভিন্ন

টেবিলে দাবার বোর্ড নিয়ে লোক বসে আছে। এর আগের দিন হেরে যাওয়ার বদলা নিতে বসে গেলেন মেজর। তিনি চলে গেলে একটা চুরুটের প্যাকেট বের করল চার্লি। বলল, “স্মোকিং খুব খারাপ অভ্যেস। মেজরকে পরে ফেরত দিয়ে দিও। ওরকম নাইস জেন্টলম্যান, শুধু-শুধু শরীর খারাপ করবে কেন?”

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। মেজরের পকেট থেকে কখন হাতসাফাই করল চার্লি। দাবা খেলতে-খেলতে চুরুট ধরাতে গিয়ে ফাঁপরে পড়বেন মেজর। ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা না বলে অর্জুন সেই বাড়িটা দেখাল চার্লিকে। এর মধ্যে সে চার্লিকে প্লেনের ঘটনা বলেছে। সে ইচ্ছে করেই লাইটার-প্রসঙ্গ চেপে গেছে। লোকটি রহস্যজনক, ওর সম্পর্কে সে জানতে চায়। চেহারার বর্ণনা শুনেছে চার্লি। তারপর হেসে বলেছে, “তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইতালিয়ান। ইতালিয়ানরা রেস্টুরেন্টে খেতে খুব ভালবাসে। ওই ব্লকে একটা ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। এখন তো লাঞ্চ খাওয়ার সময়। চল, ওখানে যাওয়া যাক। ওদের POLLO BOLLITO খেতে আমার খুব ভাল লাগে।”

ব্যাপারটায় মন সায় না দিলেও অর্জুন রাজি হল। তার পকেটে কয়েকটা ডলার একই অবস্থায় রয়েছে। চার্লির অভিজ্ঞতা যদি ঠিক হয় তা হলে ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টের মালিক নিশ্চয়ই এই লোকটার বর্ণনা শুনে চিনতে পারবে।

রেস্টুরেন্টটা বড়। শুধু ইতালিয়ান নয়, অন্যান্য জাতের লোকেরা যেভাবে খাচ্ছে টেবিলে-টেবিলে, তাতে এই দোকানের রান্না সম্পর্কে সন্দেহ থাকছে না। চার্লি আর অর্জুন এটা টেবিলে বসতেই বয় এসে মেনু-এগিয়ে দিল। প্রথমে লেখা আছে, PASTINA IN BRODO, TORTELLINI IN BRODO, CON CARNE, COTOLETTE, BISTECCA, MANZO, POLLO, RISOTTO, CASSATA.”

অর্জুন এর মাথামুণ্ড বুঝতে পারছে না দেখে চার্লি জিজ্ঞেস করল, “তোমার কি এখনও খিদে আছে?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না, মেনুটা দেখছিলাম শুধু।”

চার্লি বলল, “তুমি তা হলে একটা GELATO খাও।” নিজের খাবারটাও দিতে বলল সে।

GELATO মানে যে আইসক্রিম, তা দেওয়ার পর বুঝতে পারল অর্জুন। সে তাই খেতে-খেতে চারপাশে মুখ ফিরিয়ে দেখছিল। না, কোথাও সেই সুবেশ ভদ্রলোক নেই। খাওয়া হয়ে গেলে অর্জুন দাম মেটাল। মোট ছাঁটা ডলার খরচ হল তার। এবং তখনই নজরে পড়ল সেই গুণ্ডা টাইপের লোকটাকে। কাউন্টার থেকে খাবার প্যাকেট নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন ইশারা করল চার্লিকে। চার্লি চোখ ছোট করে দেখল

লোকটাকে । ওরা খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করছিল । ইঠাৎ চার্লি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে লোকটার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল । লোকটা আড়চোখে চার্লিকে একবার দেখল । ওরা দু'জনে একসঙ্গে লিফটে উঠে যেতে অর্জুন থমকে দাঁড়াল । লিফটে আরও দু'জন মহিলা উঠলেন ।

মিনিট-পাঁচেক বাদে চার্লি নেমে এল শিস দিতে দিতে । অর্জুন খুব উত্তেজিত ছিল । সে জিজ্ঞেস করল, “কী হল, তুমি সোজা ওপরে চলে গেলে ?”

“সোজা ওপরে । ও নামল তিনতলায়, বাঁ হাতের প্রথম ফ্ল্যাটে । আমি পাঁচতলায় উঠে একটু সময় নিয়ে ফিরে এলাম । চল, একটু ওপাশে যাই ।” দ্রুত পা চালিয়ে একটু আড়ালে চলে এসে পকেট থেকে একটা ব্যাগ বের করল চার্লি । মানিব্যাগ ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার ?”

“এটা ওই লোকটার পকেটে ছিল । কী আছে দেখি এর মধ্যে । বাঃ, প্রচুর ডলার আছে, দশ বিশ তিরিশ । উঃ একশো ষাট । লোকটার ছবি । আরম্যান্ডো ডি কোরো ।” চার্লি হাসল, “লোকটা সত্যিই ইতালিয়ান ।”

“তুমি, তুমি ওর ব্যাগ চুরি করেছ ?” অর্জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না ।

“কিন্তু ও জানবে পকেট থেকে পড়ে গেছে ।”

এবার অর্জুন হাসল । চার্লি চমৎকার একটা রাস্তা বের করেছে ওই ফ্ল্যাটে যাওয়ার । চার্লি ওকে ব্যাগটা দিয়ে বলল, “ও আমাকে দেখেছে । আমি গেলে সন্দেহ করতে পারে । যদি দরকার মনে কর, তা হলে তুমি যাও ।”

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল । দোকানে না খেয়ে প্যাকেটে করে যখন খাবার নিয়ে এসেছে বোঝাই যাচ্ছে আর-একজন ঘরে আছে । দুটো লোককে একসঙ্গে কীভাবে ম্যানেজ করা যাবে ? ঠিক তখনই দেখা গেল গুণাগুণের লোকটা উদ্ভ্রান্তের মতো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে হেঁট হয়ে খুঁজতে-খুঁজতে এগিয়ে যাচ্ছে । অর্জুন চটপট এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে । লোকটিকে এড়িয়ে সোজা তিনতলায় উঠে বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের বোতাম টিপতেই সেই সুবেশ ইতালিয়ানটি দরজা খুলে কিঞ্চিৎ অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়েস ?”

ব্যাগ থেকে ছবিটা বের করে অর্জুন হাতে রেখেছিল । সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার আরম্যান্ডো এখানে থাকেন কি ?”

“হ্যাঁ । কী চাই ?”

“আমার কিছু নাই না, উনি কি কিছু হারিয়েছেন ?”

“হ্যাঁ । কিন্তু কেন ?”

“ব্যাগটা আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি ।”

সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটল । বললেন, “ভেতরে আসুন । আরম্যান্ডো ওই ব্যাগটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে । কী নাম আপনার ? আমি

পাওলো । ”

“আমি অর্জুন । প্রাচ্যদেশ থেকে এসেছি । ” ইচ্ছে করেই ভারত শব্দটা উচ্চারণ করল না সে ।

“আই সি । কিন্তু আপনাকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে । কোথায় দেখেছি বলুন তো ? ”

“আমি এদেশে নতুন । ” অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল ।

এইসময় দরজায় আরমাত্তো এসে দাঁড়াল । তার মুখে-চোখে বিব্রাতি । পাওলো বললেন, “এই ভদ্রলোকে ধন্যবাদ দাও হে । তোমার ব্যাগ রাস্তায় পেয়ে ফেরত দিতে এসেছেন । ”

অর্জুন ব্যাগটা ফেরত দিতেই আরমাত্তো সেটাকে খুলে ডলারগুলো গুনে বলল, “ধন্যবাদ । কিন্তু আমার পকেট থেকে কখনওই ব্যাগ পড়ে না । তবু ধন্যবাদ । ”

অর্জুন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, “আমি একটু আগুন পেতে পারি ? ”

পাওলো বললেন, “নিশ্চয়ই । ” তারপর উঠে একটা দেশলাই-এর পাতা এগিয়ে দিল, “আপনাকে আমি ফ্রান্সফুটে দেখেছি । ইয়েস । আপনি কাল এদেশে এসেছেন । তার মানে আমরা একই প্লেনে ছিলাম । তাই না ? ”

অর্জুন বিপদের গন্ধ পেল । পাওলোর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে সে ভুল ভেবেছিল । অমল সোম হলে নিশ্চয়ই এই ভুলটা করতেন না । সে নীরবে মাথা নাড়ল ।

পাওলো বললেন, “তা হলে কি ধরে নেব আরমাত্তোর পকেট থেকে ওই ব্যাগটা পড়েনি ? ”

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “কী বলতে চান ? ”

“কিছুই না । দাঁড়ান । আপনি সিগারেট না-ধরিয়ে চলে যাচ্ছেন । আমিই ওটা ধরিয়ে দিচ্ছি । ” পকেট থেকে লাইটার বের করলেন পাওলো । অর্জুন চমকে উঠল । জোস অ্যান্ড জোস কোম্পানির এই লাইটার, তার কোনও দিন ভুল হবার কথা নয় । আরমাত্তো তখন দরজাটা বন্ধ করছে ।

প্রথম বোতাম টিপলেন পাওলো, “নি, সিগারেটের ডগাটা এখানে আনুন, ধরে যাবে । ” হাসলেন তিনি, “বাঃ, আপনি জানেন দেখছি । আমার মনে হচ্ছে আপনি সেই মানুষ যার কথা নিউইয়র্ক টাইমস ছেপেছে । আপনার অভিযানের গল্প আমি পড়েছি । আজ জোস অ্যান্ড জোসের চেয়ারম্যান তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে । তাই না ? ” পাওলো কথা শেষ করে আরমাত্তোর দিকে ইঙ্গিত করামাত্র অর্জুন ঝাঁপিয়ে পড়ল । এবং কিছু বোঝার আগেই লাইটারটা মুঠোয় নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল । সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথায় আঘাত এবং চোখে অন্ধকার নেমে এল ।

জ্ঞান ফিরলে অর্জুন প্রথমে ভাল করে তাকাতে পারছিল না। মাথাটা খুব ভারী এবং যন্ত্রণা পাক খাচ্ছে। ক্রমশ সে বুঝতে পারল হাসপাতাল বা ওরকম কোথাও শুয়ে আছে। একটি মহিলা-কণ্ঠ বলল, “ধন্যবাদ, ওর সেঙ্গ ফিরেছে। ক্রাইসিস ইজ ওভার।”

দ্বিতীয়বার জ্ঞান এল যখন, তখন স্পষ্ট তাকাতে পারল। মেজর, বিটুসাহেব সামনে দাঁড়িয়ে। মেজর বললেন, “কেমন আছ এখন?”

“কী হয়েছিল আমার?” দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

“ওরা তোমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। তারপর ফ্ল্যাট খালি করে চম্পট দেয়। চার্লি আমাকে দাবার দোকান থেকে তুলে নিতে দেরি করলে বাঁচানো যেত না। আমরা গিয়ে দেখলাম তুমি মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছ। ডাক্তার বলছে, দিন-দশেক লাগবে ছুটি পেতে।” মেজর বললেন।

“ওরা ধরা পড়েনি?”

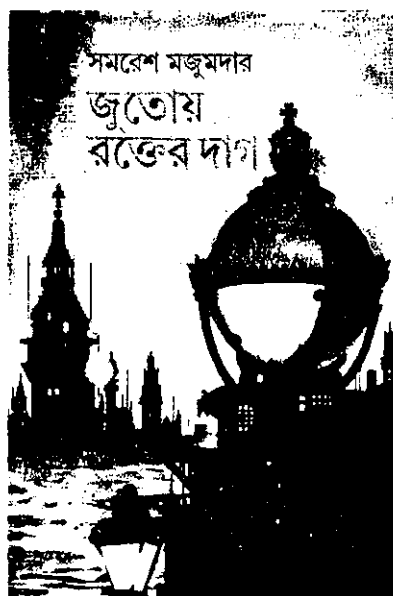
“না,” বিটুসাহেব বললেন, “জোশ অ্যান্ড জোলের চেয়ারম্যান দেখতে এসেছিলেন। ঠিক আছে?”

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। তারপরেই তার লাইটারটার কথা মনে পড়ল। জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া লাইটারটা এখন কোথায়?

ঠিক তখনই চার্লির গলা শুনতে পেল, “হাই ইয়ংম্যান। হিয়ার ইজ ইওর টেন থাউজেন্ড ডলার্স! হঠাৎ দেখি আকাশ থেকে নেমে আসছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লুফে নিলাম। এটা কী করে খোলে তাই বুঝতে পারছি না।”

চার্লি সরল হেসে বস্তুটি অর্জুনের দিকে এগিয়ে ধরল। এক ঝলক দেখে অর্জুন চিনতে পারল। জোশ অ্যান্ড জোশ।

অর্জুন হাসতে চেষ্টা করল, “টাকাটা তোমার আমার আধাআধি চার্লি। তুমি খুব ভাল, খুব।”



জুতোয় রক্তের দাগ

হিথরো এয়ারপোর্টে প্লেনটা থামতেই মেজর সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন প্লেন থেকে নামার সিঁড়ি দরজায় লাগেনি। ওপরে লাগেজ-বক্স থেকে নিজের অল-পারপাস ব্যাগটা টেনে নামিয়ে দু'পা এগোতেই তাঁর সঙ্গে বেজায় ধাক্কা লাগল সামনের প্যাসেজের পাশের সিটে বসা একজন মহিলার। তিনি জড়ানো ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠলেন, “চোখের মাথা খেয়েছেন! একজন ভদ্রমহিলাকে ব্যাগ দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছেন? এত তাড়া কিসের, অ্যাঁ?”

“চোখের মাথা আপনি খেয়েছেন না আমি খেয়েছি? চোখ দেখাচ্ছেন আমাকে, চোখ?” মেজর চোখ বন্ধ করে সমানে গলা চড়ালেন।

ওপাশ থেকে একজন সৌম্য চেহারার আমেরিকান বলে উঠল, “লুক জেন্টলম্যান, ইউ মাস্ট নট বিহেভ লাইক দিস উইথ আ লেডি!”

মেজর তাঁর দিকে এমন চোখে তাকালেন যেন ভস্ম করে দেবেন। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। এইসময় মহিলা বলে উঠলেন, “এইসব উজবুকদের জন্যে কোথাও যাওয়াই মুশকিল।”

“কী, আমি উজবুক? তা হলে...” এইবার প্রথম মেজর ভদ্রমহিলার দিকে ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে তাকালেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গলা থেকে একটা সুরুস্বর ছিটকে উঠল, “আরে, ডোরা, ডোরা গ্রান্ট! আমাদের সেই মিষ্টি মেয়েটার এই চেহারা হয়েছে?”

আচমকা ভদ্রমহিলার গলায় বিস্ময় মেশানো উচ্ছ্বাস ছিটকে উঠল, “ওঃ মেজর! ইট'স ইউ!”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি। আমি ছাড়া কোন্ উজবুক কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে হিথরো পর্যন্ত এক প্লেনে এসেও তোমাকে না-দেখে থাকবে। এত মুটিয়েছ না, ইশ্ ইশ্। কী ছিলে, কী হলে!” মেজর দু'হাতে ভদ্রমহিলার হাত ধরে নাচাতে লাগলেন।

যাত্রীরা প্যাসেজে সারবন্দী দাঁড়িয়ে। এখন অনেকেই দৃশ্যটা দেখে হাসছেন, শুধু সেই সৌম্য ভদ্রলোক ছাড়া। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। ডোরা গ্রান্টের

বয়স অন্তত পঞ্চাশ। বিশাল বপু। কিন্তু সাজগোজের বাহার আছে খুব। সিট ছেড়ে উঠে মেজরের পেটে এক আঙুলের খোঁচা মারলেন তিনি, “চোখের মাথা তা হলে খেয়েছে কে! বলো, বলো এবার?”

মেজর হোহো করে হাসলেন। তাঁর ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল এই প্লেনে যেন আর-কোনও যাত্রী নেই। এইসব এয়ারপোর্টের বিল্ডিং-এ সরাসরি ঢোকানো জন্যে টানেল থাকে, যার একটা মুখ প্লেনের দরজায় লাগালে আর মাটিতে পা ফেলতে হয় না। কোনও কারণে সেটা না পাওয়া যাওয়ায় এই পুরনো ব্যবস্থা। নীচে নামতেই বেশ ঠাণ্ডা লাগল অর্জুনের। আমেরিকায় এই ক’দিন সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। লন্ডনে নেমে মনে হল বেশ সাঁতারসেঁতে ভাব। মেজর মহিলাকে হাত ধরে থামালেন। “লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু দিস ইয়ংম্যান।”

অর্জুন মুখ তুলে তাকাতেই তিনি হেসে ইংরেজিতে পরিচয় করিয়ে দিলেন, “এ হচ্ছে অর্জুন। ট্যালেন্টেড প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আমেরিকায় জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটার এ-ই খুঁজে বের করেছে।”

ভদ্রমহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর হাত ধরলেন, “ইজ ইট? তুমি? এত অল্প বয়সে?”

মেজর বললেন, “আর ইনি হচ্ছেন মিসেস ডোরা গ্রান্ট। ফেমাস ম্যাজিশিয়ান। আমার অনেক দিনের বন্ধু।”

ম্যাজিশিয়ান। অর্জুন অবাক হয়ে গেল। এই ভদ্রমহিলাকে দেখলে তো ম্যাজিশিয়ান বলে মনেই হয় না। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, “অবাক হয়ে দেখছ কী! একদম বাজে কথা। কান দিও না। আমি তোমার কথা কাগজে পড়েছি। ওয়েল ডান।”

ওরা কথা বলতে বলতে টার্মিনাল বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ল। কয়েক ধাপ ওপরে ওঠার পর টানা সুড়ঙ্গের মতো চলার রাস্তা। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এয়ারপোর্ট যে এত বড় হয়, তা অর্জুনের জানা ছিল না। কেনেডি এয়ারপোর্টও অনেক বড়, কিন্তু এতটা হাটতে হয়নি। বিভিন্ন এয়ারলাইনস যাত্রী নিয়ে হরদম নামছে হিথরোতে। যাত্রীদের ব্যস্ততার শেষ নেই। ব্যস্ত মেজরও, দু’বার ধাক্কা মেরে বসলেন এর মধ্যে। প্রথমজন কিছু বলেননি। দ্বিতীয়বার মিসেস ডোরা গ্রান্টের সঙ্গে কথা বলে পিছিয়ে চলা অর্জুনের দিকে বাংলায় কথা ছুঁড়ে দিলেন, “এই ব্যাটারদের আমরা দুশো বছর আমাদের দেশে রাজত্ব করতে দিয়েছিলাম, বুঝলে?”

অর্জুন হেসে জবাব দিল, “এরা নয়, এদের পূর্বপুরুষরা।”

“দ্যাটস রাইট।” বলে পেছন ফিরতেই দড়াম করে শব্দ। মেজরের ব্যাগ ঘুরে গিয়ে পাশ কাটিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যাওয়া আধবয়সী একটি লোকের হাঁটুতে ধাক্কা মারল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি যেন হাওয়ায় সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে কয়েক

সেকেন্ড ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা করে নড়বড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একটা থাম ধরে নিজেকে সামলালেন। পরমুহূর্তেই তীরের মতো ছুটে এলেন তিনি। যেভাবে হাত উচিয়ে এলেন, তাতে অর্জুনের আশঙ্কা হচ্ছিল, হয়ে গেল একটা কিছু। ভদ্রলোক যে অনর্গল গালাগাল দিচ্ছেন, তা মুখের অভিব্যক্তিতে বুঝতে পারছে সে। মেজর কান পেতে যেন বুঝতে চাইছেন, ভদ্রলোক কী বলছেন। কারণ, যে-ভাষায় শব্দগুলো ছোঁড়া হচ্ছে তা অর্জুনের জ্ঞানের বাইরে। তবে মেজর তো দুনিয়াসুদ্ধ ভাষা জানেন। হঠাৎ মেজরের গলায় বাজ ডাকল, “অ্যাই ছুঁচো, বদমাশ, তোর ভাষা আমি বুঝতে পারছি না। তুই কোন্ দেশের ভূত? কিন্তু আমি একা খাব কেন? তুইও খা। পাজি, ছুঁচো, খবরদার হাত চালাবি না।”

লোকটা এবার থমকে গেল। অর্জুন লক্ষ করল, অন্যান্য যাত্রীরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে একবার আড়চোখে তাকিয়ে, কিন্তু কেউ ভিড় বাড়াচ্ছে না। মিসেস গ্রান্ট এবার দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মেজরকে বললেন, “মেজর এটা তোমার দোষ। তুমি সতর্ক হয়ে চললে উনি ধাক্কা খেতেন না।” তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, “সরি।”

ভদ্রলোক আবার উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতেই মিসেস গ্রান্ট তড়িঘড়ি মাথার ওপরে তাকিয়ে সরে এলেন মুখে হাত চাপা দিয়ে। ওরা মুখ তুলে তাকাতেই দেখল, মাথার ওপরে দেওয়ালের গায়ে একটা কুচকুচে কালো সাপ ফণা তুলছে। সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক, সাপটা যাঁর ঠিক মাথার ওপরে, একটা আর্ত চিৎকার করে ছুটলেন সামনে। মেজর মুগ্ধ হয়ে সাপটার দিকে তাকিয়ে বললেন, “রৈয়ার টাইপ অব কোব্রা। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে ওদের বাড়ি। কামড়ালে এক সেকেন্ড। কিন্তু এ-ব্যাটা দলছুট হয়ে হিথরো এয়ারপোর্টে এল কী করে?” এই সময় সেই ভদ্রলোক দু'জন পুলিশ নিয়ে ছুটে এলেন। ওঁদের দৃষ্টি পুলিশের ওপর পড়েছিল। ভদ্রলোক আঙুল তুলে পুলিশদের ওপরের দিকে তাকাতে বলতেই ওরা হোহো করে হেসে উঠল। অর্জুন মাথা তুলে দেখল, একটা কালো তার সেখানে ঝুলছে সামান্য মুখ উচিয়ে। অর্জুন খুব অবাক হয়ে মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকাল। তিনি হেসে বললেন, “এভরিথিং অলরাইট? চলো, আমরা বের হই।”

পুলিশ দু'জন তখন ভদ্রলোককে ঠাট্টা করছে। মেজর তাঁকে বললেন, “সরি। আপনাকে ধাক্কা দিইনি, লেগে গিয়েছিল।” তারপর হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে বিভ্রিড় করলেন, “আমি একটা গাধা। নইলে ম্যাজিক দেখে বুঝতে পারি না।”

লন্ডনে ঢুকতে গেলে তখন হিথরো এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট ভিসা কিংবা এনট্রি-পারমিট দেখতে চাইত না। তারা শুধু প্রশ্ন করত, যে ঢুকছে

তার থাকা-খাওয়ার মতো পয়সা বা আশ্রয় আছে কি না। সেটা পরিকার হতে ওরা পাশাপোর্টের গায়ে ছাপ মেরে লিখে দিত, আগন্তুক ক'দিন ইংল্যান্ডে থাকতে পারে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির দৌলতে অর্জুনের পকেটে পয়সার অভাব ছিল না। আসলে সেই কারণেই মেজর তাকে বলেছিলেন, “সোজা দেশে ফিরে যাবে কেন হে? বিমান কোম্পানির কাছে চাইলে তো তুমি লন্ডনে স্টপ ওভার পেতে পারো। একই ভাড়া ক'দিন ও-দেশটাও দেখে যাও। আমাকেও তো ব্ল্যাকপুলে যেতে হচ্ছে।”

বেড়ানোর নামে কার না জিভে জল আসে! লাইটার-রহস্য ভেদ করতে আমেরিকায় এসে অবশ্য অর্জুন হাঁপিয়ে পড়েছিল এর মধ্যে। দেশের জন্যে মন খারাপ করছিল খুব। তবু ব্রিটিশদের দেশ দেখার লোভটার জন্যে সে জিজ্ঞেস করেছিল, “ব্ল্যাকপুলটা কোথায়?”

“ইংল্যান্ডের একটা সমুদ্রের ধারে। লেক ডিস্ট্রিক্ট জানো?”

“আমি ইংল্যান্ডের কিছুই জানি না।”

“জানা উচিত। গোয়েন্দাদের সব ইনফরমেশন রাখা দরকার।”

“আমি গোয়েন্দা নই। সত্যসন্ধানী।” অর্জুন প্রতিবাদ করেছিল।

“অ। ব্ল্যাকপুলে আমার পুরনো বন্ধু জেমস মার্শাল একটা দারুণ এক্সপেরিমেন্ট করছে সমুদ্রের জলে। ঘুরেই যাও না হে।” মেজর বলেছিলেন।

হিথরো এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখল, বেজায় ভিড়। সবাই যে-যার আত্মীয়দের নিতে এসেছে। এয়ারপোর্টের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় অর্জুন লক্ষ করেছে, সর্দারনিরা লম্বা ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দিচ্ছেন এয়ারপোর্ট। সালায়ার-পাঞ্জাবি পরা মহিলা কাজ করছেন! আর বাইরে এসে যাদের দেখল, তাদের অর্ধেকই ভারতীয়। শুধু ভারতীয়দেরই আত্মীয়-বন্ধু এ-দেশে বেশি আসে নাকি!

লন্ডনের আকাশে এখন মেঘ। অবশ্য হিথরো এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়ালে লন্ডন সম্পর্কে কোনও আঁচ করা যায় না। এখন ভর-সকাল। কিন্তু চারধারে এমন আলো, যেন দিনটা রাতের তারে ঝুলছে। অর্জুন দেখল, মিসেস গ্রান্ট এবং মেজর খুব তর্ক করছেন। বিষয়টা সে বোঝার চেষ্টা করল না। তার চোখ যাত্রী, গাড়ি এবং রাস্তার ওপর ঘুরছিল। হঠাৎ মেজর তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। “যাওয়ার সময় আমাদের লন্ডনে থাকা হচ্ছে না হে। এই ভদ্রমহিলা বায়না করছেন আমাদের ওঁর ওখানে দু'দিন থাকতেই হবে। ব্রিটিশ হলে ছুট করে বলত না। তা তুমি কী বলো, থাকবে? আমার মনে হয়, থাকাই উচিত। কারণ ওঁর বাড়ি থেকে ব্ল্যাকপুল মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ।” বলতে বলতে মেজর অর্জুনের মতামত না জেনেই হাত তুলে মিসেস গ্রান্টকে সম্মতি জানালেন।

কেউ যদি এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশে, কিংবা স্বদেশেরই অন্য কোথাও যায় তো তার গাড়ি স্বচ্ছন্দে এয়ারপোর্টের পার্কিং লটে পার্ক করে যেতে পারে। মাসখানেক পরে এলেও দেখা যাবে, গাড়িটিতে কেউ হাত দেয়নি। তার জন্যে পয়সা দিতে হয় বটে, কিন্তু ভয় থাকে না এক ফোঁটা! মিসেস গ্রান্টের গাড়িতে বসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা এয়ারপোর্ট-এলাকার বাইরে চলে এল। লন্ডন শহরের ধারকাছ দিয়ে ওরা যাচ্ছে না। কিন্তু নিপাট রাস্তা, ডেউ-খেলানো পরিষ্কার সবুজ মাঠ, আর রাস্তার ওপর জায়গার নাম লিখে দিক-নির্দেশ করা, সব মিলিয়ে চমৎকার লাগছিল। ঘেরা মাঠের মধ্যে যে গোরুগুলো চরছে, তাদের চেহারা দেখে আমাদের দেশের গোরুর জন্যে কষ্ট হল। অর্জুন দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছিল পাহাড়ের জন্যে। কিন্তু কোথাও পাহাড়ের চিহ্ন নেই। অথচ ঠাণ্ডা তো বেশ। কথাটা বলতেই হেহে করে হাসলেন মেজর, “মনে করো তুমি পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছ, তা হলে সামনে পাহাড় দেখবে কী করে?” এইবার অমল সোমের জন্যে অর্জুনের মন-খারাপ হয়ে গেল। উনি থাকলে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন নিশ্চয়ই, পাহাড় না-থাকা সত্ত্বেও কেন এত ঠাণ্ডা লাগে সারা বছর। অমলদা কি সত্যি সন্ধ্যাসী হয়ে গেলেন? আমেরিকায় পৌঁছবার পরও তিনটে চিঠি লিখেছে অমলদাকে জলপাইগুড়ির ঠিকানায়। একটি চিঠিরও জবাব আসেনি।

মিসেস গ্রান্ট গাড়ি চালাচ্ছেন খুব সহজ ভঙ্গিতে। ভদ্রমহিলা যে চমৎকার ম্যাজিক জানেন, তা বোঝা গেল। কিন্তু উনি যদি ব্রিটিশ না হন, তা হলে ব্রিটেনে ওঁর বাড়ি-গাড়ি কেমন করে থাকবে? তারপরেই ওর মনে পড়ল, ভারতীয়রা যদি এদেশে থাকতে পারে, তা হলে উনি কেন পারবেন না। এবার মিসেস গ্রান্ট বললেন, “তোমরা কী নিয়ে কথা বলছিলে?”

মেজর হাসলেন, “অর্জুন বলছে, এদেশে পাহাড় আছে কি না?”

“আছে। দেখবে? আচ্ছা, এই বাঁকটা পেরিয়ে আমরা পাহাড়ের পাশে থামব।” ভদ্রমহিলা হাসলেন ওর দিকে একবার তাকিয়ে। এঁর কথাবার্তা স্পষ্ট বুঝতে পারে অর্জুন। আমেরিকানদের মতো অত জড়ানো নয়। কিন্তু বাঁকটা তো দেখা যাচ্ছে; অথচ পাহাড়ের চিহ্ন দিগন্তে নেই। সে দেখল, বোর্ডে ল্যান্ডশায়ার লেখা। এই নামগুলো সে জানে। ইয়র্কশায়ার, ল্যান্ডশায়ার, ডার্বিশায়ার। যেন ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা। ব্রিটিশরা ওদের সমস্ত সাহিত্য দিয়ে দুশো বছরে ভারতীয়দের এ-সব চিনে নিতে বাধ্য করেছে।

বাঁক ঘুরতেই অর্জুনকে মিসেস গ্রান্ট বললেন, “ওই দ্যাখো পাহাড়।”

অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। সত্যি একটা বিশাল পাহাড় সামনে এগিয়ে আসছে। এত উঁচু এবং তুষারে ভরা যে, অর্জুন নড়তে পারছিল না বিস্ময়ে। কিন্তু গাড়িটা থামামাত্র পাহাড়টা মিলিয়ে গিয়ে একটা বড়সড় টিপি হয়ে গেল। টিপিটা পুরনো ভাঙা কিংবা বাতিল গাড়ির। অন্তত শতিনেক গাড়ি রাস্তার

পাশে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ম্যাজিকের কল্যাণে এটাকেই সে পাহাড় বলে ভুল করেছিল। অর্জুন সভয়ে মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকাল। জাদুকরী গ্রান্ট যদি ম্যানড্রেকের মতো ভালমানুষ হন, তা হলে খুব ভাল হয়।

গাড়িটা থেমেছিল। মিসেস গ্রান্ট পেট্রল নেবেন। পেট্রল পাম্পটা খুব সুন্দর। হলদে রঙটা চোখে বেশ লাগে। তার পাশেই একটা ডিপার্টমেন্টাল শপ। আর কিছু নেই আশেপাশে। দিগন্তবিস্তৃত শুধু মাঠ আর মাঠ। একটা গাড়ি পার্ক করা আছে ডিপার্টমেন্টাল শপের সামনে। অর্জুন গাড়িগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল বারংবার। মেজর নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, “বাতিল গাড়ি, বুঝলে? এগুলো এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলবে। আমি একটু দোকানটা ঘুরে আসি। বসে বসে হাতে-পায়ে জং ধরে গেল হে।”

অর্জুন নেমে দাঁড়াল। শিরশিরে ঠাণ্ডা আছে। মিসেস গ্রান্ট এগিয়ে এলেন। “তুমি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ? আসলে মজা করার লোভটা প্রায়ই পেয়ে বসে আমাকে।”

অর্জুন দ্রুত মাথা নাড়ল। “না, না, কিছু মনে করিনি।”

“গুড। তুমি কি প্রথম আসছ ইংল্যান্ডে?”

“হ্যাঁ।”

“সো নাইস। লেট’স গো ফর কফি!”

অর্জুন মাথা নাড়তেই ভদ্রমহিলা এগোলেন পেট্রল পাম্পের পাশের দোকানের দিকে। ভিতরে ঢুকে বেশ অবাক হয়ে গেল সে। আমেরিকাতে সে এরকম দোকান দেখেছে, যেখানে যাবতীয় জিনিসপত্র সুন্দর থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হয় ক্রেতাদের জন্যে। তাঁরা পছন্দমতো জিনিস নিয়ে বেরোবার সময় কাউন্টারে দাম মিটিয়ে দিয়ে যায়। আলু থেকে পারফিউম, সবই পাওয়া যায় ওখানে। কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এত বড় দোকান, খন্দের কোথায়? চট করে মেজরকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিভিন্ন গলিতে রাখা। তারই একটায় মেজর খুঁটিয়ে একজোড়া জুতো দেখছিলেন। মিসেস গ্রান্ট জিজ্ঞেস করলেন, “এই সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টারে তুমি কী করছ মেজর?”

“লুক,” মেজর জুতোটা দেখালেন, “এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বটে, কিন্তু মোটেই বেশি ব্যবহৃত হয়নি। এই জুতো দু’বছর হল তৈরি হয় না। কিন্তু অভিযানের পক্ষে এর চেয়ে ভাল কিছু নেই। অনেকদিন থেকে খুঁজছিলাম আমি। যেবার তুল্লা অঞ্চলে গিয়েছিলাম, তখন একজনকে পরতে দেখেছিলাম। আমি এই জুতোজোড়া নেব।” মেজর জুতোজোড়া হাতে ঝুলোলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “অন্যের পরা জুতো আপনি পরবেন?”

মেজর বললেন, “জুতোটা খুব দরকারি। জীবাণুমুক্ত করে নিলেই হবে।”

“এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস বিক্রি হয়?”

“হ্যাঁ। এই দিকটায়। যাদের কম পয়সা, তারা কেনে। এই আমার মতো।” বলে নিজে থেকেই হোহো করে হেসে উঠলেন মেজর। হঠাৎ মিসেস গ্রান্টের মুখ ভারী হয়ে গেল, “শোনো মেজর, আমি যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকব, ততক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলবে। তুমি যে জোক করলে, আমি তা বুঝতেই পারলাম না।”

মেজর হাত তুলে বললেন, “তথাস্তু।”

কফি খেয়ে গাড়িতে ফিরতেই আর-একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। মেজর আসনে বসলেন। মিসেস গ্রান্ট পেট্রলের দাম দিতে ভেতরে গেলেন। অর্জুনের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, শো-কেসে একটা গগলস্ দেখে এসেছে, সেটা এই ফাঁকে চটপট কিনে আনার। সে মেজরকে এক মিনিট দাঁড়াতে বলে ডিপার্টমেন্টাল শপে আবার ঢুকে পড়ল। নতুন-আসা গাড়ির লোক দুটোও তখন তার পাশ দিয়ে ঢুকছে। অর্জুন ঝুঁকে পড়ে গগলসের লকেটে লেখা দাম পড়তে গিয়ে শুনল একটা লোক বলছে, “ইট মাস্ট বি ইন দি সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টার। ফাইন্ড ইট, আই অ্যাম হিয়ার। জুতোটা চিনতে ভুল কোরো না।”

অর্জুন মুখ তুলে তাকাল। সেই লোক দুটো, যারা এইমাত্র ঢুকল। দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে যেতে যেতে বলল, “এক লক্ষ জুতোর মধ্যে থাকলেও জ্যাকের জুতো খুঁজে বের করতে পারব।”

দুটো লোকের চোখেই গগলস্। দ্বিতীয়জন উধাও হয়েছে। প্রথমজন তার চামড়ার জ্যাকেটে হাত গলিয়ে শিস দিচ্ছে। এদের ভঙ্গি মোটেই ভাল লাগল না অর্জুনের। সে একটু সময় নিতেই দ্বিতীয় লোকটা প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে ফিরে এল, “ইটস নট দেয়ার।”

“নিশ্চয়ই ওখানে আছে। মারা যাবার আগে লোকটা মিথ্যে বলবে না।” প্রথম লোকটা ছুটল।

অর্জুন আর দাঁড়াল না। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এরা কোন্ জুতোর খোঁজ করছে? খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে গাড়িতে উঠে বসল। মেজর জিঙ্কস করলেন, “কিছু কিনলে?”

সে ঘাড় নেড়ে ‘না’ বলল। কিন্তু সেইসঙ্গে চোখের কোণে দেখতে পেল দোকানের দরজায় ওরা এখনও এসে পৌঁছয়নি। কাউন্টারে যদি খোঁজ নিত এবং এই জুতোই যদি সেই জুতো হত, তা হলে যে-লোকটা জিনিস দেখে দাম নিচ্ছে, সে বলে দিত কতক্ষণ আগে বিক্রি হয়েছে। মিসেস গ্রান্টের গাড়ি তখন আবার হাইওয়েতে পড়েছে। সামনের সারিতে পা-রাখার জায়গায় জুতোজোড়া রাখলে অসুবিধে হবে বলে মেজর জুতোজোড়া পেছনের পা-রাখার জায়গায় রেখেছেন। জুতোজোড়া অর্জুন দেখতে পাচ্ছিল। মোটা, ভারী, এবং গোড়ালি থেকে অনেকটা উচুতে উঠে আসা জুতো। বানিয়েছে কায়দা করে, আর সেই কায়দাটা চোখে পড়ে। কালিম্পিং-এ এরকম জুতো পরতে অনেককে দেখেছে

সে। কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড জুতো কেউ পরছে ভাবা যায়? মেজর মানুষটি অদ্ভুত। অবশ্য এই জুতোজোড়ার তেমন কোনও ইতিহাস না-ও থাকতে পারে।

এখন গাড়ি চলছে হাইওয়ে দিয়ে। রাস্তা মোটেই নির্জন নয়। পাশাপাশি তিনটে ট্রাকে তিনরকম গতিতে একমুখী গাড়িগুলো ছুটছে। ও-পাশের তিনটে ট্রাকে বিপরীতমুখী গাড়িগুলো যাচ্ছে। রাস্তার খানিকটা দূরে দূরে বিভিন্ন রকমের নির্দেশিকা টাঙানো। এমনকী, কোথায় পেট্রল পাম্প, স্ন্যাকস, কিংবা মোটেল পাওয়া যাবে, তাও। কিন্তু একটা জিনিস দেখে সে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। হাইওয়ের দু'পাশে কোনও বসতবাড়ি বা জনবসতি নেই। শুধু মাঠ কিংবা খামার। যেদিকে তাকাও, শুধু চোখের আরাম।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর মিসেস গ্রান্ট হাইওয়ে ছেড়ে ডান দিকের রাস্তা ধরলেন। অর্জুন দেখল বোর্ডে তীর ঐঁকে লেখা আছে 'বোল্টন'। অর্থাৎ এই বোল্টনে মিসেস গ্রান্ট যদি থাকেন, তা হলে যাত্রার সমাপ্তি হয়ে এল। ক্রমশ বাড়ির চোখে পড়তে লাগল। ছিমছাম, সুন্দর। বেশির ভাগ একতলা বাগানওয়ালা বাড়ি। দোতলাগুলো বাংলা প্যাটার্নের। ফুটপাথে লোকজন বেশি নেই। মনে হচ্ছে শহরটা ছিমছাম, অল্প মানুষের। দোকান, বার, ক্লাব চোখে পড়ছিল। হঠাৎ অর্জুন মুখ ফিরিয়ে উদ্ভাসিত হল। একটা দোকানের সামনে লেখা আছে, 'মা, অ্যান ইন্ডিয়ান রেস্টোরান্ট'। এত দূরে এসে কোনও ভারতীয় দোকান করে বসে আছে!

মিসেস গ্রান্টের বাড়িটা চমৎকার। শহরের ও-প্রান্তে নির্জন রাস্তার গায়ে ওঁর গেট। তারপর তিনটে টেনিসকোর্টের মতো লন পেরিয়ে বাড়ির গাড়িবারান্দা। নীচে নেমে দাঁড়িয়ে মিসেস গ্রান্ট সামান্য ঝুঁকে হাসলেন, "ওয়েলকাম টু মাই লিটল নেস্ট।"

ততক্ষণে ভেতরের দরজা খুলে একটি নিগ্রো প্রৌঢ় বেরিয়ে এল। "গুড আফটারনুন, মিসেস গ্রান্ট।"

"গুড আফটারনুন, চার্লি। এঁরা আমার বন্ধু। মেজরকে তো তুমি এর আগে দেখেছ। আমি এঁদের অনুরোধ করেছি কয়েকটি দিন এখানে কাটিয়ে যেতে।" মিসেস গ্রান্ট হাসলেন।

"খুব ভাল করেছেন। আপনারা ভেতরে গিয়ে বসুন, আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছি।"

অগত্যা খালি হাতে ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেছিল। এইসময় চার্লি চিৎকার করে উঠল, "ইটস্ নট ডান, সেকেন্ড হ্যান্ড দোকান থেকে জুতো কেনা মোটেই উচিত নয়!"

মিসেস গ্রান্ট মাথা নাড়লেন, "চার্লিটা সবসময় আমাদের ওপর শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আসুন।"

পাশাপাশি দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে ওদের দু'জনকে। এত আরামের ঘরে অর্জুন কখনও থাকেনি। এমনকী, আমেরিকাতেও নয়। দুধের সরের মতো বিছানা। গালচে থেকে আসবাবপত্রে পুরনো ঐতিহ্য চমৎকার মেজাজি করে তোলে। কাচের জানলার এপাশে কাজ-করা পর্দা। আজ অনেক গল্প হয়েছে। সন্ধ্যের পর ডিনার খেয়ে যে-যার ঘরে শুতে চলে গেছেন ওঁরা। কিন্তু এখন রাত ন'টাই বাজেনি। অর্জুনের ঘুম পাচ্ছিল না। সে তার ঘরের গোল-সোফায় আরাম করে বসেছিল। জলপাইগুড়ির একটা বেকার ছেলে ইংল্যান্ডের এরকম বনেদি বাড়িতে একা ঘরে একা বসে পা নাচাবে, তা কি কেউ ভেবেছিল? সে ঝুঁকে সামনের বাস্‌কটের গায়ে উঁচিয়ে-থাকা বোতাম টিপতেই ঝপ করে সেটা খুলে এক ডজন বড় চুরুট বেরিয়ে এল, পাশে দেশলাইয়ের পাতা। অর্জুন মাঝে-মাঝে সিগারেট খায়, কিন্তু চুরুটের অভিজ্ঞতা ছিল না। এ-ঘরে যখন রাখা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই সে ব্যবহার করতে পারে। আরাম করে ধরিয়ে সে মৃদু ঘোঁষা ছাড়তেই বুঝতে পারল, পুরোটা খাওয়া অসম্ভব। চুরুট হাতে সে উঠে জানলার পাশে দাঁড়াল। এই ঘরে হাওয়া ঢুকছে না, তবু ঠাণ্ডা বেশ। বাইরের জ্যোৎস্নালোকিত বাগানটায় নিশ্চয়ই হাড়-কাঁপানো ব্যাপার চলছে। ফুলের গাছের পাশাপাশি কয়েকটা এ-দেশি লম্বাটে গাছ ছায়া ফেলছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। অর্জুন বাগানের সেই মায়াময় দৃশ্য দেখছিল চুরুট খেতে-খেতে। আচমকা বাড়িটা কেঁপে উঠল একটা চিংকারে। ডাকাত পড়লে কিংবা ভূত দেখলে এরকম চিংকার বেরোয় গলা থেকে।

চিংকারটা আসছে মেজরের ঘর থেকে। নিচের দরজা খুলে অর্জুন মেজরের দরজার দিকে যাওয়ার সময় দেখল, চার্লি এবং একজন মহিলা-কাজের-লোক ছুটে আসছে বিপরীত দিক থেকে। মিসেস গ্রান্টের গলা পাওয়া গেল, “কী হয়েছে চার্লি?”

চিংকারটা তখন থেমেছে, কিন্তু গোঙানি বন্ধ হয়নি। অর্জুন বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল, “মেজর, মেজর! আপনার কী হয়েছে? মেজর! দরজা খুলুন।”

চার্লি বলল, “ইট মাস্ট বি আ গোস্ট।”

“গোস্ট?” মিসেস গ্রান্ট এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে।

“ইয়েস মিসেস গ্রান্ট। গোস্ট অব দোজ শ্যুজ।” ভয়ানক স্বরে বলল চার্লি।

এখন গোঙানিটা থেমেছে। এবং তার কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললেন মেজর। খুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার! সবাই এখানে কেন? কিছু হয়েছে নাকি বাড়িতে?”

মিসেস গ্রান্ট উদ্বিগ্ন হয়ে এগিয়ে এলেন। “কী হয়েছে আপনার মেজর।”

“আমার? নাথিং! কিস্যু হয়নি। আমি আরাম করে ঘুমোচ্ছিলাম।”

মেজর হাসলেন ।

উত্তর শুনে মিসেস গ্রান্ট অর্জুনের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি কোনও কিছুর স্বপ্ন দেখছিলেন মেজর ?”

“স্বপ্ন ? ওঃ, হ্যাঁ । মনে পড়েছে ।” তারপরেই লাফিয়ে উঠলেন বিশাল শরীর নিয়ে, “ইউরেকা !” কিন্তু শরীরটা এসে পড়ল জুতোজোড়ার ওপরে । দরজার পাশে ও-দুটোকে রেখে গিয়েছিল চার্লি । আর ব্যালাস হারিয়ে কার্পেটের ওপর চিত হয়ে পড়লেন মেজর । মিসেস গ্রান্ট জিজ্ঞেস করলেন, “আর ইউ অলরাইট মেজর ?”

“অ্যাবসিলিউটলি ।” মেজর শুয়ে-শুয়েই একবার কাতর-চোখে জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে উঠে বসলেন । গায়ে লাগা কল্লিত ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, “পেয়ে গেছি । ক্যান্সারের ওষুধ পেয়ে গেছি ।”

অর্জুন চমকে উঠল, “ক্যান্সারের ওষুধ ?”

বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়লেন মেজর, “আমি স্বপ্ন দেখলাম ব্ল্যাকপুলে সমুদ্রের মধ্যে মার্শালের সঙ্গে বিনুক নিয়ে অভিযান করতে গিয়ে উডুকু মাছের ঝাঁকে পড়লাম । মার্শালের একজন কর্মচারীর গলায় ক্যান্সার ছিল । সে ওই উডুকু মাছ সেদ্ধ করে খেতেই গলার ব্যথা কমে গেল । আর তখনই হাঙরটা আমাদের আক্রমণ করল । তার মানে উডুকু মাছের তেলই ক্যান্সারের ওষুধ ।”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “আপনি স্বপ্নে হাঙর দেখে চিৎকার করেছিলেন ।”

মেজর বললেন, “আমি ? নেভার ! আমি কালই ব্ল্যাকপুলে যাচ্ছি ।”

হঠাৎ চার্লি মেঝেতে বসে পড়ে বুকে মাথায় ক্রস আঁকতে লাগল । “ও মিসেস গ্রান্ট । ইট্‌স দ্যাট গোস্ট অব দোজ শুজ । ওই জুতোয় নিশ্চয়ই ভূত আছে । সেই ভূত মিস্টার মেজরকে ভয় দেখিয়েছে । সে-ই একটু আগে মিস্টার মেজরকে মাটিতে ফেলে দিল । যার জুতো, সে নিশ্চয়ই মারা গিয়েছে । তার ভূত জুতোর মধ্যে বসে আছে ।”

মেজর থতমত হয়ে গেলেন । তাঁর চোখজোড়া জুতোর ওপরে । তিনি চার্লির দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, “কী, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে ? নো, নেভার । তুমি জানো, আমি হরেক মুল্লুকে এক্সপিডিশনে গিয়েছি ! একটা ভূত ভয় দেখাবে, আর আমি ভয় পেয়ে যাব ? তবে তোমরা যখন বলছ, তখন জুতোটা ঘরের বাইরে রাখা যেতে পারে ।”

কেউ কিছু বলার আগেই অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জুতোটা দরজার বাইরে একপাশে রেখে দিল । এবার মিসেস গ্রান্ট বললেন, “ওয়েল ! লেট্‌স গো ব্যাক টু আওয়ার রেসপেক্টিভ বেড্‌স্ ।”

সবাই চলে গেলে অর্জুনের মেজরের ঘরে ঢুকল । এসব ব্যাপার মেজরের মাথায় মোটেই নেই । তিনি তখন টেলিফোন নিয়ে বসে । “ইয়েস ! মেজর, টেল হিম আই ওয়ান্ট হিম রাইট নাইট ।” মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন, ৩০৬

“ব্যাটা মুন্ডে খুঁজছে ! তার চেয়ে যে কয়েক লক্ষ গুণ দামি কাজ...” বলেই চিৎকার করে উঠলেন, “ও, মার্শাল : ইউ লিটল ডেভিল, আমি এখন বোস্টনে ! কী বলছ, দারুণ কাজ হচ্ছে ? ছাই হচ্ছে । উডুকু মাছ কেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ওই উডুকু মাছ চাই । আমি কালই রওনা হচ্ছি ।”

অর্জুন বলল, “জিজ্ঞেস করুন তো ওঁর কোনও কর্মচারীর গলায় ক্যান্সার আছে কি না ?”

রিসিভারের হাত চাপা দিয়ে বিরক্ত হয়ে অর্জুনের দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন মেজর, “কী ? কারও ক্যান্সার নেই ? সে কী ? আহা, এমনও তো হতে পারে, তোমার কাছে চেপে গিয়েছে চাকরি হারাবার ভয়ে । আমি কালই তোমার কর্মচারীদের ডাক্তার নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাব । তুমি কিছু বুঝতে পারছ না ? হেহে । সবই যদি বুঝবে, তা হলে তুমি মার্শাল আর আমি মেজর হব কেন ? ঠিক হ্যাঁ, কাল দেখা হবে ।”

রিসিভার রেখেও মেজরের উত্তেজনা কমল না । চোখ বন্ধ করে হাসলেন, “মার্শালটা সত্যি পণ্ডিত । আচ্ছা, পণ্ডিতরা মাঝে-মাঝেই এরকম হাঁদা হয় কেন, বলো তো ? কিস্যু বুঝতে পারে না ।”

মেজরকে শুভরাত্রি জানিয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল । আবার বাড়িটা শব্দহীন হয়ে গেছে । প্যাসেজের আলোগুলোকে এখন বিবর্ণ বলে মনে হচ্ছে । চার্লি যেভাবে ভূতের কথা বলল, তারপর আজ রাতে কেউ সম্ভবত নিজের ঘরের বাইরে পা দেবে না । অর্জুন খানিকটা দূর চলে এসে আবার থমকে দাঁড়াল । ওই জুতোয় যদি ভূত থাকে চার্লির কথামতো, তা হলে এই তো সুযোগ । আজ অবধি সে কখনও ভূত দ্যাখেনি । চটপট ফিরে গিয়ে বাঁ হাতে ফিতে ধরে জুতোজুড়ো ঝুলিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল । ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় চুরুট রেখে গিয়েছিল ছাইদানিতে, ফিরে এসে আবার ধরাল ওটাকে । মেজর যে স্বপ্ন দেখে অমন কাণ্ড করবেন কে জানত ! মুশকিল হল স্বপ্নটাকে সত্যি ভাবতে ওঁর ভাল লাগছে ।

অর্জুনের মনে হল পৃথিবীটা আরও নিশ্চুপ হয়ে গেছে । এইবার শুয়ে পড়া উচিত । মিসেস গ্রান্ট সত্যি ভাল মহিলা । ম্যাজিক দেখাতেন আগে পেশাদারি ভাবে । এখন আর বাইরের লোকের সামনে দেখাতে চান না । এরকম মানুষের সঙ্গে কার না থাকতে ভাল লাগে । কিন্তু তিনিও কি জুতোর ভূতটাকে বিশ্বাস করলেন ! অর্জুন জুতোর দিকে তাকাল । আচ্ছা, সে ঘরে ঢুকে ও-দুটো রাখার সময় গায়ে-গায়ে রেখেছিল, না অতটা ছেড়ে রেখেছিল ? অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল । সে চুরুটটাকে রেখে উঠে জুতোজোড়ার কাছে এসে একটাকে তুলে ধরল । দেখতে যেমন মনে হয়, ততটা ভারী নয় মোটেই । কোথাও সামান্য নোংরা লেগে নেই । কিন্তু তারপরেই একটা জায়গা দেখে তার চোখ ছোট হয়ে এল । সে পলকে দ্বিতীয় জুতোটা তুলে নিল । ডানদিকেরটায় বাঁ দিকে আর বাঁ

দিকেরটায় ডান দিকে কালচে দাগ যেন সঁটে আছে। জুতোটা পালিশ হয়নি অনেক দিন। ফলে জুতোর ব্রাউন রঙের সঙ্গে এই কালচে রংটা মিশে গিয়েও থেকে গেছে। ও-দুটোকে টেবিলের ওপর রেখে সে নিজের সুটকেস খুলল। তারপর যে ম্যাগনিফায়িং কাচ সে টাইম স্কোয়ারের ফুটপাথ থেকে কিনেছিল, সেটা বের করে কালচে রংটার ওপর ধরল। হ্যাঁ, কোনও তরল পদার্থ জুতোয় পড়ে শুকিয়ে সঁটে গেছে। অর্জুন সোজা হয়ে বসল। একমাত্র রক্তই শুকিয়ে গেলে কালচে হয়ে যায়। কিন্তু এটা রক্তের দাগ কি না, তা পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না।

কিন্তু অর্জুনের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। আচ্ছা, ঠিক এই জুতোজোড়ার জন্য ডিপার্টমেন্টাল শপে কি লোক দুটো ঢুকেছিল? দাগটা, অর্থাৎ তরল পদার্থ পড়েছে ঠিক ওপর থেকে সরাসরি একই জায়গায়। ফলে জুতোর দু'পাটির মাঝখানে রং লেগেছে। এই তরল পদার্থ যদি রক্ত হয়, তা হলে নিশ্চয়ই জুতোর মালিককে খুন করা হয়েছে, কিংবা তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু লোকটা যদি খুন হয়েই থাকেন, তবে তাঁর জুতো সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টারে যাবে কী করে, অথবা সেই জুতোর খোঁজে লোক দুটো সেখানে পৌঁছবে কেন? হঠাৎ অমল সোমের একটা উপদেশ মনে পড়ল অর্জুনের। কোনও প্রমাণ ছাড়া শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া মূর্খতার সামিল। এটা যদি রক্ত না হয়, তা হলে কোনও মানুষ খুন হননি। রক্ত হলেও মানুষটি খুন হয়েছেন তা বলা যাবে না। অনেক কারণেই রক্তপাত হতে পারে। যার জুতো, তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করায় সেকেন্ড হ্যান্ড সেন্টারে দিয়ে যেতে পারেন। এবং ওই লোক দুটোর আসার সঙ্গে এই জুতোর কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। এই পর্যন্ত ভাবার পর অর্জুনের মাথাটা হাল্কা হয়ে গেল।

সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আঃ, কী আরাম। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই আবার জুতোর কথা মনে হল। অনেক চেষ্টা করেও সে জুতোটাকে ভুলতে পারছে না। অর্জুন উঠে বসল। চার্লির কথা সত্যি নাকি? সে যে এত ভাবছে, তা কি ওই জুতোর ভূতের জন্যে? আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়! ডিপার্টমেন্টাল শপে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা যায়, এই জুতোজোড়া তাঁরা কোথেকে কিনেছেন। মালিকের নাম পেলে ব্যাপারটার সূরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে টেলিফোনের দিকে এগোতে গিয়ে তার খেয়াল হল, ডাইরেক্টরি দেখে নাম্বার বের করেও কোনও লাভ হবে না। এত রাতে নিশ্চয়ই কোনও দোকান খোলা থাকবে না।

অথচ ঘুম আসছে না। অর্জুন আবার টেবিলে গিয়ে বসল। অভিযানের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই জুতো। সাধারণ মানুষ কখনও পথে পরে বের হবে না। সে কাচটা আবার তুলে নিল। তরল পদার্থটা পড়ে গড়িয়ে গেছে। ফলে জুতোয় দাগ বেশি লাগেনি। চট করে নজর করাও মুশকিল। কিন্তু

শুকনো দাগ বলছে, ওটা ওপর থেকে পড়েছে। অর্জুন ম্যাগনিফাইং কাচটা এবার জুতোর অন্য অংশে নিয়ে গেল। খুব বেশি দিন ব্যবহৃত হয়নি এগুলো। ডান পায়ের গোড়ালির তলা সামান্যও খয়ে যায়নি। বাঁ-পাটিটা সে তুলে ধরল। কাচের ভেতর দিয়ে জুতোটার শরীর অনেকগুণ বড় দেখাচ্ছিল। গোড়ালির হিলের কাছে কাচটা পৌছবার পর সে সামান্য চমকে গেল। খালি চোখে যেটাকে চামড়ার জোড়ের দাগ বলে মনে হচ্ছিল, সেটাকে যেন অন্যরকম লাগছে কাচের মধ্যে দিয়ে। সে ডান-পাটির গোড়ালির জোড়টা দেখল। একদম অটুট। কিন্তু বাঁ-পাটির জোড়টা যেন বেশিদিন লাগেনি। কারণ জোড়ের গায়ে দুটো ছোট্ট দাগ আছে। সম্ভবত কিছু দিয়ে ওখানে চাপ দেওয়া হয়েছিল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ সে জোড়টা দেখল। ঠিক সমানভাবে বসেনি, যেমনটি ডান পায়ে বসে গেছে। সে একটা আলপিন তুলে নিয়ে জোড়টায় চাপ দিল। কিন্তু তাতে আলপিনটাই বেঁকে গেল। একটা শক্ত কিছু চাই। অর্জুন উঠে ঘরের চারপাশে দেখতে দেখতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে চলে এল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা চুলের কাঁটা খুঁজে পেল। কালো কাঁটাটা পড়ে ছিল ড্রয়ারের এক কোণে।

কাঁটাটা নিয়ে অর্জুন ফিরে এল টেবিলে। তারপর ওর দুটো মুখ সামান্য চেপে জোড়ের ভেতর ঢোকাতে চেষ্টা করে বিফল হল। হঠাৎ খেয়াল হতে পাশাপাশি ছোট্ট দাগ দুটোয় চুলের কাঁটার প্রাস্ত রেখে সে চাপ দিতে লাগল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ধীরে-ধীরে কাঁটাটা ভেতরে ঢুকতে লাগল। ইঞ্চিখানেক ঢোকানোর পর আর-একটু চাপ দিতেই স্প্রিং-এর মতো তলাটা নেমে গেল খানিকটা। হতভম্ব অর্জুন দেখল, জুতোর গোড়ালির ভেতরে একটা বোতামে চাপ পড়তেই এই কাণ্ড ঘটেছে। এবং তখনই সে কাগজটাকে দেখতে পেল।

কাঁপা-কাঁপা হাতে সুন্দর ভাঁজ করা কাগজটাকে বাইরে বের করল সে। একটা সেলোফেন পেপারে ওটাকে এমন করে রাখা আছে, যাতে জলেও নষ্ট না হয়। বের করে ভাঁজ খুলে কাগজটা সামনে ধরল অর্জুন। কালো কালিতে পর পর কয়েকটা শব্দ লেখা রয়েছে। ‘বি. পি। এস. এফ.। শ্যাডো কিসড্ দ্য পপলার। ফোর এল. টু ইউ।’

বারংবার শব্দগুলো, অক্ষরগুলো পড়ল অর্জুন। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু এখন এটা দিনের মতো সত্যি যে, এই জুতোর মালিক খুব গোপন কিছু এই কাগজে লিখে রেখেছেন। তিনি চাননি, কাগজটা অন্য কারও হাতে পড়ুক। এবং এখন এটাও স্পষ্ট যে, ওই লোক দুটো জানতে পেরেছিল, জুতোর মধ্যে কোনও খবর পাওয়া যাবে। ওরা নিশ্চয়ই দেরিতে জেনেছে। হতে পারে লোকটা খুন হয়ে যাওয়ার পরে।

অর্জুন রোমাঞ্চিত হল। বি. পি. মানে ব্ল্যাকপুল নয় তো? মেজর তো আগামীকালই তাকে ব্ল্যাকপুলে নিয়ে যাচ্ছেন।

ইংল্যান্ডের একটি সমুদ্রতীরের শহরের নাম ব্ল্যাকপুল। সেখানে মেজরের পুরনো বন্ধু মার্শাল গবেষণা করছেন। সমুদ্রের জলে বিনুক এবং মুস্তো নিয়ে নানান পরীক্ষা। মেজর এসেছেন এবার বন্ধুর সঙ্গে যোগ দিতে। দেশে ফেরার পথে আমেরিকা থেকে উড়ে অর্জুন নেমেছে লন্ডনে কদিনের স্টপওভার নিয়ে। আবার কখনও ইংল্যান্ডে আসা হবে কি না সন্দেহ; বাড়তি ভাড়া যখন লাগছে না, তখন এত-নাম-জানা দেশটাকে কে দেখতে না চায়!

জুতোর মধ্যে থেকে কাগজটাকে আবিষ্কার করার পর অর্জুন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। লোক দুটো ডিপার্টমেন্টাল শপে যে এইজন্যেই এসেছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই। অনেক রাত ধরে চেষ্টা করেও সে কাগজের লেখাটার গোপন অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু বুঝতে পারছে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু এই লেখাতে ধরা আছে। তা না হলে কেউ জুতোর মধ্যে অমন কায়দা করে লুকিয়ে রাখে! শেষ পর্যন্ত সে জুতোটাকে আবার ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়েছিল।

সকালে ঘুম ভাঙল মেজরের ডাকে। দরজা খুলে সে দেখল, মেজর সেজেগুজে তৈরি। ঘরে ঢুকে মেজর বললেন, “ইয়াং ম্যান, এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছ! আমার মর্নিং ওয়াক শেষ হয়ে গেছে কখন। তৈরি হয়ে নাও, আমরা ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব।”

চেয়ারে বসে পা ছড়িয়ে মেজর সঙ্গে-আনা সকালের কাগজ খুলে বসলেন। অর্জুন অপ্রস্তুত অবস্থায় তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে এল। সে বুঝতে পারছিল না, মেজরকে কাগজটার কথা বলবে কি না! কারণ, কয়েকদিন বাদেই সে চলে যাবে জলপাইগুড়িতে। এই রহস্যটায় সে কোনও ভূমিকা নিতে পারছে না যখন, তখন বলতে কোনও অসুবিধা নেই। অমল সোম বললেন, ‘গোপন তথ্য কাউকে জানালে সে আগবাড়িয়ে নিজের মতামত চাপিয়ে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।’ তবে সে যখন তদন্ত করতে যাচ্ছেই না, তখন বলাই উচিত। হাজার হোক, জুতোটা মেজর কিনেছেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসামাত্র মেজর বললেন, “ওহে নবীন গোয়েন্দা, তোমার জন্যে একটা জব্বর খবর আছে।”

“আমি গোয়েন্দা নই, সত্যসন্ধানী! খবরটা কী?” অর্জুন হাসল।

“কাল যে ডিপার্টমেন্টাল শপে আমরা জুতো কিনেছিলাম, তার গার্ড খুন হয়েছে। দোকান বন্ধ হয়েছে সাতটায়। খুন হয়ে যায় ন’টায়। ডাকাতরা দোকানে ঢুকেছিল। গার্ড বাধা দিতে গিয়ে মারা পড়ে। বোচারা!” খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মেজর জানালেন।

অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। সে কাগজটা নিজের হাতে নিয়ে আবার খবরটা পড়ল। বিস্মৃত বিবরণ কিছু নেই। সে দোনোমনা করে জিজ্ঞেস করল, “আমাদের কি আজই ব্ল্যাকপুলে যেতে হবে?”

“অফ কোর্স ! আমি মার্শালকে টেলিফোনে তাই বলেছি ।”

“বেশ । যাওয়ার আগে একবার ওই ডিপার্টমেন্টাল শপে যাবেন ?”

“মাথা খারাপ ? সেটা কত পেছনে তা জানো ? কী দরকার সেখানে ?”

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে জুতোটা তুলে নিল, “কাল রাতে গার্ডটি খুন হয়েছে আপনার এই জুতোর জন্যে । আপনি যদি আগে না কিনতেন, তা হলে এই খুনটা হত না । আপনার পরে কারও প্রয়োজন হয়েছিল এই জুতো ।”

“কী বলছ যা-তা ?” মেজরের চোয়াল ঝুলে পড়ল যেন ।

“ঠিক বলছি । আপনার কেনার পর দু’জন লোক এসেছিল এটার খোঁজে । তারা জুতোজোড়া না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল । পরে নিশ্চয়ই কেউ তাদের বলেছিল, আবার ভাল করে খুঁজে দেখতে । সেটা করতে গিয়েই মনে হচ্ছে এই কাণ্ড ।”

অর্জুনের কথাটা শেষ হওয়ামাত্র মেজর দু’পা এগিয়ে এলেন, “কী আছে জুতোটায় ? চার্লি বলছিল, ওটা ভুতুড়ে জুতো । কিন্তু তুমি এসব জানলে কী করে ?”

অর্জুন আবার চুলের ক্লিপ দিয়ে জুতোর নীচটা খুলল । মেজর অবাক হয়ে গোপন চেম্বারটা দেখলেন, “মাই গড ! কী ছিল ওখানে ?”

অর্জুন এবার কাগজটা বের করল । সেটা পড়ে মেজর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “এইসব কথার মানে কী ?”

“মানোটা বুঝলেই সব সরল হয়ে যাবে । আপাতত বুঝতে পারছি, এই কাগজটার জন্যে একদল মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করছে না । আপনি যে এসব জানেন, তা কাউকে বলবেন না ।” অর্জুন জুতোটা আবার ঠিকঠাক করে রাখল ।

মেজর বললেন, “মাথা খারাপ ! মনে হচ্ছে ওই জুতোটাই ফেলে দেওয়া উচিত ।”

“জুতোটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে । আপাতত এটা কারও সামনে বের না করাই ভাল ।”

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র চার্লি দরজায় দাঁড়াল । তাকে এক রাতেই খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে । চার্লি বলল, “গুডমর্নিং ! ব্রেকফাস্ট ইজ রেডি !”

অর্জুন বলল, “আমরাও । চলো, যাচ্ছি । মিসেস গ্রান্ট উঠেছেন ?”

“মিসেস গ্রান্ট আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ।” কথাটা বলেও সে গেল না । সামান্য দ্বিধা কাটিয়ে সে বলল, “মেজর, আপনাকে একটা অনুরোধ করব ?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ।” মেজর মাথা নাড়লেন ।

“ওই জুতোটা আপনি পরবেন না । কাল সারারাত আমি আমার মৃত

আত্মীয়দের স্বপ্নে দেখেছি। ভোর রাতে ওই জুতোর ভূতটা আমার দিকে তেড়ে এসেছিল। ওটাকে আপনি ফেলে দিন,” বৃদ্ধ নিখোঁট খুব করুণ গলায় বলল।

“তুমি ফেলে দাও চার্লি। আই ডোন্ড মাইন্ড। লেটস গেট রিড অব ইট!”

মেজর কিছু বলার আগেই জুতোজোড়া চার্লিকে দিয়ে দিলেন। যেভাবে লোকে মরা নেংটি ইঁদুরের লেজ ঝুলিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি করে চার্লি ও’দুটো নিয়ে দ্রুত চলে গেল। অর্জুন বলল, “কাজটা ঠিক হল না। পুলিশকে আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন না।”

“পুলিশ? পুলিশের কাছে কে যাচ্ছে? ওসবে আমি নেই। আমি অভিযাত্রী, আসামি নই। চলো, মন খুলে ব্রেকফাস্ট খাই।” মেজর হাঁটতে লাগলেন। যেন জুতোর ভার কমিয়ে তিনি এখন খুব হাল্কা হয়ে গেছেন।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে দেখা হল। এবং যথারীতি কালকের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উঠল। তিনি বললেন, “অর্জুন, তুমি কি ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং বলে মনে করছ? আমি ভাবছিলাম, আমেরিকায় অত বড় কাণ্ড করে এলে, ইংল্যান্ডেও যদি কিছু করো, তা হলে মন্দ হয় না।”

অর্জুন বলল, “আমি তো ব্যাপারটার কিছুই জানি না। যেহেতু দোকানটা গতকাল দেখেছি, তাই আগ্রহ হচ্ছে।”

মেজর মাথা নাড়লেন, “না, না। আজ আমাদের ব্ল্যাকপুলে যেতে হবে।”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “তোমাকে না হয় আজই যেতে হবে, কিন্তু অর্জুন যদি দু’দিন বাদে যায়, তা হলে ক্ষতি কী?”

অর্জুন বলল, “কোনও ক্ষতি নেই। মেজরের চলে যাওয়াই ভাল।”

“ভাল কেন?” মেজর চোখ তুললেন।

“বলা যায় না, কী হতে কী হয়ে যায়!”

“কী? আমি কাওয়ার্ড? ডরপুক? কী ভাবো তুমি আমায়? জানো, আমি পিগমিদের তীর উপেক্ষা করে হেঁটে গেছি! আগামী বছর আমি ইয়েতি খুঁজতে হিমালয়ে যাব। বেশ, আমি থেকেই গেলাম। মার্শালকে ফোন করে দিচ্ছি।” মেজর কারও কোনও কথা না শুনে হনহন করে উঠে গেলেন টেলিফোনের দিকে।

মিসেস গ্রান্ট হাসলেন, “মেজর সত্যি মাঝে-মাঝে বাচ্চা ছেলে হয়ে যান। সত্যি বলো তো, অর্জুন, তুমি কি ইন্টারেস্টেড? এই গার্ডটিকে আমি চিনতাম।”

“ইন্টারেস্টেড। কিন্তু আপনি যদি সাহায্য করেন।”

“আমি? কীভাবে?”

“আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন। আপনার ম্যাজিকের সাহায্য যদি পাই, তা হলে এগিয়ে যেতে পারি,” অর্জুন খুব আন্তরিকভাবে বলল।

“আমি জানি না ম্যাজিক তোমার কী কাজে লাগবে। ম্যাজিক মানে তো

ভাওতা। এই এলাকার পুলিশের বড়কর্তা আমার খুব ফ্যান। এটুকু বলতে পারি, আমি গেলে তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন,” মিসেস গ্রান্ট বললেন।

ঘণ্টাখানেক পরে পুলিশের বড়কর্তার সামনে ওরা বসে ছিল। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, “মিসেস গ্রান্ট, ব্যাপারটা দুঃখজনক। দ্বিতীয় গার্ডটি আততায়ীদের দেখতে পায়নি, কারণ সে পেছনের দিকে ছিল। কিন্তু ব্যাপারটার সমাধান মনে হচ্ছে আমরাই করতে পারব। কোনও বড় রহস্য নেই এর পেছনে। তা ছাড়া এই ইয়াংম্যান বিদেশি। এদেশে এসব কাজ করতে লাইসেন্সের দরকার হয়।”

এখনও অর্জুনের ঝটপট ইংরেজি বলতে অস্বস্তি হয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল, “ওই লোকগুলোর কি চুরির উদ্দেশ্য ছিল বলে আপনার মনে হয়?”

পুলিশকর্তা কাঁধ নাচালেন। “একটা ডিপার্টমেন্টাল শপে প্রচুর দামি জিনিস থাকে।”

হতাশ হয়ে ওরা বেরিয়ে এল। পুলিশ যদি অনুমতি না দেয়, তা হলে এদেশে অপরাধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া মুশকিল। মিসেস গ্রান্ট জিজ্ঞেস করলেন, “এবার কী করতে চাও?”

অর্জুন শেষ চেষ্টা করল, “আমরা একবার ওই দোকানে যেতে পারি?”

দূরত্বটা অনেকখানি। তবু মিসেস গ্রান্ট রাজি হলেন। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটল। মেজর বললেন, “মিসেস গ্রান্ট, ছেলেবেলায় শার্লক হোমস্ খুব পড়তাম। কিন্তু কিরীটা রায়ের মতো কাউকে লাগত না।”

“হু ইজ হি?” মিসেস গ্রান্ট জানতে চাইলেন।

“এ ফেমাস ডিটেকটিভ অব ক্যালকাটা।”

অর্জুন হেসে ফেলল, “না। এখন সবচেয়ে ফেমাস ফেলুদা।”

“হু ইজ হি?” এবারের প্রশ্ন মেজরের।

অর্জুন বলল, “আপনাকে পড়তে দেব। শুরু করলে ছাড়তে পারবেন না।”

পেট্রল পাম্পটার সামনে গাড়ি রেখে ওরা দোকানে ঢুকল। একজন প্রহরী নিহত হয়েছে, কিন্তু সেই কারণে দোকান বন্ধ হয়নি। দু'জন পুলিশ দোকানের সামনে মোতায়েন হয়েছে, এইমাত্র। ওরা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিসেস গ্রান্টকে চিনতে পারলেন। অর্জুন আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, মিসেস গ্রান্ট সেইমতো প্রশ্ন করলেন, “গতকাল আমার এই বন্ধু আপনার দোকান থেকে একটি অভিযানে যাওয়ার মতো জুতো কিনেছেন। কিন্তু আমার এই তরুণ বন্ধুটিরও হচ্ছে হয়েছে ওইরকম জুতো কিনতে। সেকেণ্ডহ্যান্ড সেন্টারে গতকাল একটিমাত্র ছিল। আপনি কি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?”

ম্যানেজার বললেন, “অভিযানে যাওয়ার মতো চমৎকার নতুন জুতো আমাদের আছে। তার একটা পছন্দ করলেই তো হয়।”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “আমরা ওই একই ধরনের জুতো চাইছি।”

ম্যানেজার হাসলেন, “সাধারণত এই জুতোগুলো কারও অল্প ব্যবহার করা। যাঁর জুতো ছিল, তাঁর কাছে যদি আরও থাকে তবে তা তো এঁর কোনও কাজে লাগছে না। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দু’জনের পায়ের মাপ এক নয়।”

অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করল, “ওই সেকেন্ডহ্যান্ড জুতো কোথায় পান আপনি?”

ম্যানেজার বললেন, “আমাদের সাপ্লাই দেয় এ. কে. জন অ্যান্ড কোম্পানি।”

“ওদের অফিসটা কোথায়?” অর্জুন প্রায় হতাশ হয়ে গিয়েছিল।

“ব্ল্যাকপুলে।”

ওরা তিনজনে যখন গাড়িতে উঠল তখন অর্জুন বলল, “মিসেস গ্রান্ট, এখন রওনা হলে কি আমরা আজই ব্ল্যাকপুলে পৌঁছতে পারি?”

“নিশ্চয়ই। হঠাৎ...ও, ওই সাপ্লায়ারদের দোকানে যেতে চাইছ? কিন্তু এই গাড়িটির খুন হওয়ার সঙ্গে মেজরের কেনা সেকেন্ডহ্যান্ড জুতোর কী সম্পর্ক?”

“আমার ক্রমশ মনে হচ্ছে, ওরা ওই সেকেন্ডহ্যান্ড জুতোর খোঁজেই এসেছিল। গাড়িটি দেখে ফেলায় খুন করতে বাধ্য হয়। কারণ আমরা জুতোজোড়া কেনার পর দুটো লোককে ওটার সম্বন্ধে দোকানে ঢুকতে দেখেছিলাম,” অর্জুন বলল।

মিসেস গ্রান্ট মাথা নাড়লেন, “কিন্তু চার্লি বলছে, ওটা ভুতুড়ে জুতো।”

মেজর হোহো করে হাসলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে আপনার?”

খুব চাপা গলায় মেজর বললেন, “কেউ আমাদের ফলো করছে। পেছনের ওই গাড়িটাকে লক্ষ্য করো। কিছুতেই ওভারটেক করছে না।”

অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটাকে দেখল। চওড়া হাইওয়েতে অজস্র গাড়ি ছুটেছে। মিসেস গ্রান্ট যে ট্রাকে চালাচ্ছেন, তাতে গতি বেশি নেওয়ার কথা নয়। পেছনের গাড়িতে যিনি চালকের আসনে, তাঁকে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মেজর উত্তেজিত হয়ে বললেন, “মিসেস গ্রান্ট, আপনি ট্রাকটা চেঞ্জ করুন তো। স্পিড বাড়ান।”

মিসেস গ্রান্ট অনুরোধ রাখলে দেখা গেল গাড়িটা ধীরে-ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত আরও অনেক গাড়ির ভিড়ে সেটা হারিয়ে গেলে মেজর রুমালে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, “কী করে গোয়েন্দারা বুঝতে পারে কে অনুসরণকারী, কে নয়, তা কে জানে!”

মিসেস গ্রান্টকে খুব ভাল লেগে গেছে অর্জুনের। এককালে পেশাদার জাদুকরী ছিলেন। এখনও দেখান। তবে ইচ্ছে হলে। বারবার অর্জুনের কাছে পি. সি. সরকারের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। অর্জুনের খুব লজ্জা করছিল। পি. সি. সরকারের ম্যাজিক সে দ্যাখেনি। আসলে জলপাইগুড়িতে তো কেউ সচরাচর বড় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে না।

মিসেস গ্রান্ট ওদের নিয়ে ব্ল্যাকপুলে যাচ্ছিলেন। ওরা ডিপার্টমেন্টাল শপ থেকে ওঁর বাড়িতে ফেরার পর লাঞ্চ শেষ করে যখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন অর্জুনের মনে হল, চার্লি যে জুতোটা নিয়ে গেছে, সেটা ফেরত পাওয়া দরকার। চার্লিকে কথাটা বলতেই চার্লি চোখ বড় করল, “নো, নো মিস্টার। জুতোতে ভূত আছে। ওটা আর ফেরত চাইবেন না। আমি বাড়ির বাইরে গারবেজ-ব্যাগে ফেলে দিয়েছি।”

অর্জুন আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির বাইরে এল। গেটের পাশেই পলিথিনের ব্যাগ রয়েছে। সেখানে আবর্জনা জমিয়ে রাখলে প্রতিদিন গাড়ি এসে নিয়ে যায়। আমেরিকাতেও সে এই দৃশ্য দেখেছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে ব্যাগটার মুখ খুলতেই জুতোজোড়া দেখতে পেল। ভাগিস! ছোঁ মেরে ও-দুটোকে তুলে নিতেই সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে একজন পুলিশ মাটিতে নেমে চিৎকার করল, “হোয়াট’স দ্যাট?”

অর্জুন এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, প্রথমে কথা বলতে পারেনি। পুলিশটি কাছে এসে জুতোটা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী আশ্চর্য! এ দুটো তুমি নিচ্ছ কেন?”

অর্জুন কোনওমতে বলল, “ভুল করে চলে এসেছিল এখানে।”

লোকটা হোহো করে হেসে গাড়িতে বসা সঙ্গীকে বলল, “শুনেছ হে, জুতো একা-একা চলে আসে। থাকো কোথায় তুমি?”

অর্জুন মিসেস গ্রান্টের বাড়িটা দেখাল। পুলিশটা জুতো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল, “অলমোস্ট নিউ, বাট ইউজড। হে জন, আই লাইক দিস।”

অর্জুন চটপট বলল, “কিন্তু আপনি জুতোটা নিতে পারেন না। যার জুতো, তিনি অসম্ভব হবেন। মানে, তাকে জিজ্ঞেস না করে...”

পুলিশটি বলল, “লুক! আমার কাছে মিথ্যে কথা বলার একদম চেষ্টা করবে না। এত ভাল পাহাড়ে ওঠার জুতো কেউ ভুল করে গারবেজ-ব্যাগে পাঠায় না।”

অর্জুন বলল, “ওটা শুধু পাহাড়ে ওঠার জুতো নয়। যে-কোনও অভিযানেই পরা চলে।”

“সেটা আমি বুঝব। কিন্তু আমি যদি বলি এটাকে তুমি চুরি করছ?”

অতএব অর্জুন ওকে নিয়ে ভেতরে এল। মিসেস গ্রান্ট সব শুনে কেমন নিষ্পৃহ গলায় বললেন, “না না, ওঁর যখন এই লেডিস শু্য পছন্দ হয়েছে, তখন

ওকে দিয়ে দেওয়াই উচিত । ”

পুলিশটি হকচকিয়ে বলল, “লেডিস শ্যু ?”

“ওমা, তা হলে আপনি ভাল করে দ্যাখেননি,” মিসেস গ্রান্ট হাসলেন ।

অর্জুন দেখল, অফিসারের চোখ দুটো বড় হয়ে গেল । বিড়বিড় করে লোকটি বলল, “হোয়াট এ ফুল আই অ্যাম ! মেয়েদের জুতো নিতে যাচ্ছি ! আমি তো বিয়েই করিনি । সরি ! কিন্তু তখন যে দেখলাম... । যাক, মিসেস গ্রান্ট, এই ইয়াংম্যানটিকে দেখছি আপনি চেনেন ! বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত । ”

অফিসার চলে যাওয়ায় মেরজর বললেন, “লোকটা পাগল নাকি হে অর্জুন ?”

অর্জুন হাসল, “মিসেস গ্রান্ট, আপনার ম্যাজিক শুধু ও দেখল কী করে ?”

কথাটার জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, “এবার বলো তো, জুতোটার বিশেষত্ব কী ?”

অর্জুন তখন গোপন কুঠুরিটা খুলে দেখাল । সেটা দেখামাত্র মিসেস গ্রান্ট উত্তেজিত হয়ে উঠলেন । তিনি এখন হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন আর মেরজর এবার পেছনের আসনে শরীর এলিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন । মিসেস গ্রান্টের পাশের আসনে বসে অর্জুন মুখ চোখে দু’পাশে ছুটে যাওয়া ইংল্যান্ডের গ্রাম দেখছিল । এত সবুজ যে, চোখ জুড়িয়ে যায় । হঠাৎ মিসেস গ্রান্ট বললেন, “ব্ল্যাকপুলের পাল্পার কি তোমাকে জুতোর মালিকের সন্ধান দিতে পারবে ?”

অর্জুন বলল, “জানি না । চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী !”

“তোমরা ওখানে কোথায় থাকবে ?”

“মেরজর জানেন । ”

“আমি আমার এক বান্ধবীর কাছে উঠব । ওর খুব ইচ্ছে আমি কিছুদিন ব্ল্যাকপুলে থাকি । ঘুমোলে তো মেরজর বেশ নাক ডাকান । নাক কেন ডাকে অর্জুন ?”

অর্জুন বলল, “ঠিক জানি না । তবে নিশ্বাসের স্বাভাবিক পথে যদি কিছু বাধা তৈরি হয়, তা হলে ওই রকম শব্দ হয়ে থাকে । ”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “কেউ যদি নাক ডাকা সারানোর ওষুধ বের করত তা হলে কোটি-কোটি পাউন্ডের মালিক হয়ে যেত । আমরা এসে গেছি । বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ পাচ্ছ ?”

অর্জুন অবাক হল । কাছে-দূরে কোথাও বালিয়াড়ি নেই । সমুদ্র অত কাছে হবে কী করে ? দু’পাশে ছোট-ছোট সুন্দর কটেজ, বকবাকে রাস্তা, যদিও ফুটপাতে মানুষজন নেই বললেই চলে, এরকম এলাকা পার হতেই অর্জুন সমুদ্র দেখতে পেল । কী রকম সমুদ্র ! ঢেউ নেই, গর্জন নেই । শুধু আদিগন্ত প্রায়-সবুজ জল স্থির হয়ে আছে ।

গাড়িটা বাঁক নিতেই সে মুগ্ধ হল। সুন্দর বাঁধানো সমুদ্রসৈকতে বিশাল রাস্তাটা ঘোড়ার নালের মতো ঘুরে গেছে। রাস্তার একধারে সারি-সারি সুন্দর দোকান। দোকানগুলো অভিনব। রাস্তার মাঝখানে ট্রাম-লাইন, একটি ট্রাম চলে যাচ্ছে ওপাশে। রাস্তার এদিকে সমুদ্রের গায়ে নানান রকমের রেস্টুরেন্ট। রংবেরঙের সাইনবোর্ডে লোভনীয় খাবারের বিজ্ঞাপন।

অর্জুন বলল, “দারুণ জায়গা তো!”

মেজর মাথা নাড়লেন, “পকেটে টাকা থাকলে এখানে সময় কাটানো কোনও সমস্যা নয়।”

“টাকা থাকলে কেন?”

“ওই যে দোকানগুলো দেখছ, ওগুলো সব এক-একটা গ্যামব্লিং হাউস। ক্যাসিনো নয়, কিন্তু ঢুকলে লোভ সামলানো যায় না। আমরা আর-একটু এগিয়ে বাঁ দিকে নামব, মিসেস গ্রান্ট।” মেজর তাঁর বিশাল দেহটা নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন।

অর্জুন দেখছিল পুরো সমুদ্রের ধারে মেলা বসে গেছে। রংবেরঙের পোশাকে প্রচুর মানুষ এসেছে রোদ পোয়াতে ব্ল্যাকপুলে।

বাঁ দিকের হোটেলটার নাম অব্যবসন। ওরা গাড়ি থেকে নেমে এলে মিসেস গ্রান্ট বললেন, “তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি বান্ধবীর ওখানে পৌঁছে ফোন করব।”

জিনিসপত্র নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওঠার মুখেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। একটা বেঁটেমতো সাহেব তরতর করে নামছিল আর মেজর মাথা নিচু করে উঠছিলেন। ধাক্কাটা একটু বেশিরকমের হওয়ায় লোকটা ছিটকে পড়ল একপাশে আর মেজরের হাত থেকে সূটকেসটা গেল উড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। একনাগাড়ে গালাগাল দিতে দিতে তেড়ে গেলেন লোকটার দিকে। অর্জুন দেখল, লোকটা কিছু বলল না। চুপচাপ উঠে বসে জামাকাপড়ের ময়লা দু’হাতে ঝেড়ে নীচে নেমে রাস্তায় মিলিয়ে গেল। অর্জুন খুব অবাক হল। অন্যায় যদি কারও হয়ে থাকে তবে তা মেজরের। অথচ লোকটা একটাও কথা বলল না কেন? মেজরকে দু-একটা কথাও শোনাল না। সে চটপট বলল, “মেজর, আপনার পকেট ঠিক আছে কি না দেখুন তো!”

“অ্যা? পকেট? পকেট তো পকেটেই আছে।” মেজর ঘাবড়ে গেলেন।

“পকেটে ব্যাগ আছে তো?”

মেজরের এবার চেতনা ফিরল। কিন্তু না, তাঁর সব কিছু ঠিকই আছে। লোকটা মোটেই পকেটমার নয়। হলে অবশ্য অর্জুনের খারাপ লাগলেও একটা লাভ হত। বিলিতি পকেটমার দেখা যেত।

হোটেলের রিসেপশনে খবর পাওয়া গেল, মিস্টার মার্শাল আজই বিশেষ জরুরি তাগিদে সমুদ্রের নীচে নেমেছেন। মেজরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে

তিনি বলেছেন যে, সন্ধের মধ্যেই এখানে ফিরে এসে মুখোমুখি হবেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “মার্শাল কি এখানেই থাকে?”

রিসেপশনিস্ট বলল, “না। ঠুঁর নিজস্ব একটা ক্যাম্প আছে শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে। আপনারা আসবেন বলে তিনি এখানে তিনটে ঘর বুক করেছেন।”

মেজর অর্জুনের দিকে ঘুরে বললেন, “করাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করছেন। আমি হোটেল বসে পা নাচাব, আর তিনি ক্যাম্প বসে মজা লুটবেন।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ক্যাম্পে বুঝি খুব মজা?”

মেজরের দাড়িগোঁফ ছাপিয়ে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠল, “এই হোটেলজীবনের চেয়ে হাজার গুণ। সেবার আলসেসে ক্যাম্প খাটিয়েছি। বাইরের টেম্পারেচার মাইনাসে। হুহু করে হাওয়া বইছে। হাওয়া তো নয়, বরফের করাত। স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে পিটপিট করে মাথার ওপরে টেন্টটার দিকে তাকিয়ে সারারাত ভেবেছি, ওটা যেন উড়ে না যায়। সে যে কী আনন্দ, তা যে না থেকেছে, সে বুঝবে না। আফ্রিকায় টেন্ট করে আছি, একটা সিংহের বাচ্চা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আমার বিছানায় ঢুকে পড়ল।” বলতে বলতে সেই দৃশ্যটি কল্পনা করে মেজর হাসিতে ভেঙে পড়লেন। দ্বিতীয়টি অবশ্যই রোমাঞ্চকর, কিন্তু প্রথমটিতে মজা বা আনন্দ কোথায় তা অর্জুনের মাথায় ঢুকল না। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল লিফটের সামনে। দু'জনের পকেটে দুটো ঘরের চাবি। মেজরের হাসির মধ্যেই লিফটটা থামল। কয়েকজন মানুষ গম্ভীর মুখে মেজরের দিকে তাকিয়ে লিফট থেকে বেরিয়ে গেলেন। হঠাৎই মেজরকে আরও ভাল লেগে গেল অর্জুনের। বিদেশে এসে তাঁর মধ্যে কোনও আড়ষ্টতা নেই। সব পরিবেশে যে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারে, তার তো তুলনা নেই।

ইতিমধ্যে বড় হোটেলের থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে অর্জুনের। নিজের ঘরে ঢুকে তার মনে হল, এটি সে-তুলনায় কিছুই নয়। মোটামুটি ছিমছাম ঘরটা দেখে তার ভাল লাগল, কারণ এটা ঠিক রাস্তার ধারে। মেজর নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন। অর্জুন জানলা খুলে তাকাল। রাস্তার ওপাশেই সমুদ্র। সেখানে যতটুকু কাঁপন, তা শুধু বয়ে যাওয়া বাতাসের জন্যেই। সমুদ্র এত শান্ত হয়? সে রাস্তাটা দেখল। ভিড় বাড়ছে। ইংল্যান্ডে নিগ্রোদের ক্রীতদাস করে নিয়ে আসা হয়েছিল কি না তা সে জানে না, তবে প্রচুর নিগ্রো চোখে পড়ছে। অবশ্য আমেরিকার মতো মোটেই নয়। এদের দেখলে বোঝাই যায়, ইংল্যান্ডে এরা ভিনদেশি। মিসেস গ্রান্টকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়। ঠুঁর বাড়িতে চার্লিই রয়েছে। হঠাৎ একটি পঞ্জাবি পরিবারকে দেখতে পেয়ে অর্জুনের বেশ মজা লাগল। সত্যি বলতে কী, এখানে যদি কেউ হিসেব করতে বসে তা হলে

অন্তত চল্লিশ ভাগ অ-ইংরেজ দেখতে পাবে।

এই ছোট্ট দেশের মানুষরা দুশো বছর ভারতবর্ষকে শাসন করেছিল ! এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে, বাঘা যতীন প্রাণ হারিয়েছেন, সূর্য সেন নিজেকে বলি দিয়েছেন, নেতাজি আত্মোৎসর্গ করেছেন। মাত্র চল্লিশ বছর আগে একজন সৎ ভারতীয় শাসক ব্রিটিশদের বন্ধু বলে মনে করত না। ছেলেবেলায় সে যখন স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ত, তখন মনে হত ব্রিটিশরা থাকলে সে-ও আন্দোলনে যোগ দিত। আজ সেই মানুষদের দেশে দাঁড়িয়ে কিন্তু সেরকম অনুভূতিটা আসছেই না। এদের দেখে মোটেই রাগ হচ্ছে না। হঠাৎ তার মনে হল, দোষটা আমাদেরই। আমরাই বিভক্ত হয়ে ওদের সুযোগ দিয়েছিলাম আমাদের শোষণ করতে। তা ছাড়া চল্লিশ বছর আগের মানুষদের মানসিকতার সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের কোনও সাদৃশ্য থাকবে এমন তো নাও হতে পারে। এই যেমন, ওর নিজেরই রাগটা নেই। দরজায় শব্দ হতে সে বাস্তবে ফিরে এল।

মেজর দাঁড়িয়ে আছেন। এখন ওঁর পরনে পুরোদস্তুর অভিযাত্রীর পোশাক। কোমরে হাত রেখে মেজর বললেন, “সে কী ! তুমি এখনও এই অবস্থায় আছ ? বের হবে না ? আরে, নতুন জায়গায় এলে সেই জায়গাটা উলটেপালটে দেখতে হয়।”

“আমি তো রেডি।”

“অ। লেট’স গো ফর এ রাউন্ড। মিসেস গ্রান্ট ফোন করেছিলেন। উনি আসতে চেয়েছিলেন। আমি নিষেধ করেছি। বলেছি, এবেলা বিশ্রাম নিন।” কথা বলতে বলতে মেজর নিজের পায়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন। “জুতো দারুণ ফিট করেছে হে। সত্যি ভুতুড়ে নয় তো?”

অর্জুন দেখল, মেজর সেই জুতো পরেছেন। ওর খুব মজা লাগছিল। তারপরেই মাথায় একটা বুদ্ধি এল। দরজা বন্ধ করে নীচে নামতে নামতে সে বলল, “মেজর, গল্পের বইতে পড়েছি ইংল্যান্ডের পাব খুব বিখ্যাত। আমাকে নিয়ে যাবেন?”

“মদ খাবে নাকি হে ? কত বয়স হল তোমার?”

“একুশ হয়নি। মদ খাব না, শুধু দেখব।”

“তা হলে সেলস পাবে চলো। রিয়েল টাফ পিপ্লের ভিড় ওখানে। হাঁটতে হাঁটতে ডান পা’টা মাঝে-মাঝে হালকা হয়ে যাচ্ছে কেন হে?” মেজর দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অর্জুন বলল, “ওটা আপনার মনের ভুল। প্রথমবার পরছেন তো !”

ব্ল্যাকপুলে ঠাণ্ডা আছে চমৎকার। হাওয়া বইছে ছুঁ করে। যদিও এখন মিঠে রোদের মশারি টাঙানো চারদিকে। পাশাপাশি ওরা ফুটপাথ ধরে হাঁটছেন। সামনেই যে বিশাল হলঘর, সেখানে মানুষজন ঢুকছে, বের হচ্ছে।

মেজরকে বলতেই তিনি সেদিকে পা বাড়ালেন। ওটা যে গ্যামব্লিং হাউস, তা ভেতরে ঢুকে চিনতে পারল সে। ঢুকতেই বাঁ দিকে কয়েকটা কাউন্টার নজরে এল। সেখানে বোর্ডে ঝুলছে, ‘চেঞ্জ’। অর্থাৎ তুমি তোমার পকেটের নোট খুচরো করে নিতে পারো। এরপর দশ ফুট অন্তর অন্তর বিভিন্ন রকমের খেলা রয়েছে। পয়সা গর্তে ফেলে হাতল ধরে টানলে একটা রঙিন বাস্তবের চাকা ঘুরবে বনবন করে। সেই চাকার গায়ে নম্বর আঁটা। চাকাটা আবার তিনটে ভাগে ঘুরছে। ওটা যখন থামবে তখন তার তিনটে ভাগে একই নম্বর এসে পাশাপাশি স্থির হলে দ্বিতীয় গর্ত থেকে পাউন্ড পড়বে। অর্জুন দেখল একটি বাচ্চা ছেলে একের পর এক পয়সা ফেলে হাতল ঘুরিয়েই যাচ্ছে, বেচারার ভাগ্যে আর পাউন্ড ঝরছে না। পরের টেবিলটা আরও মজার। একটা কাচের বিরাট বাস্তবের ভেতরে দুটো তাক। ওপরের এবং নীচেরটায় ঠাসা হয়ে আছে পাউন্ডের কয়েন। দুটো তাককে কোনও মেশিন ডান দিক বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছে সামান্য। একদম নীচে একটা ট্রে রয়েছে বাস্তবের বাইরে আটকানো। খেলোয়াড়কে একদম ওপরের একটা গর্তে পাউন্ডের কয়েন ফেলতে হবে। সেটা গড়িয়ে প্রথম তাকে পড়ামাত্র তার চাপে উপচে পড়া জমে থাকা কয়েনগুলোয় যে আন্দোলন হবে, তাতে বেশ কিছু পড়বে নীচের তাকে। সেই চাপে দ্বিতীয় তাকের উপচে পড়া এবং প্রায় ঝুলে থাকা কয়েনগুলো নাড়া খেয়ে নীচে পড়লেই তা ট্রেতে জমা হবে। যে খেলছে, সে সেগুলো তুলে নিতে পারে। অর্জুন দেখল, একজন একটা কয়েন ওপরের তাকে ফেলল গর্ত দিয়ে। সেটা ওপরের তাকের কয়েনটাকে নিয়ে নীচের তাকে পড়ল। নীচের তাকে তখন কয়েনের পাহাড়। মনে হচ্ছিল ছোঁয়া লাগলেই তার চুড়োটা হুড়মুড়িয়ে ট্রেতে চলে আসবে। কিন্তু বাঁ দিক ডান দিকে সমানে ঘুরে চলা তাক দুটোয় এমন কিছু কায়দা আছে যে, ওগুলোই মিশে গেল জমে থাকা কয়েনে। লোকটার ভাগ্যে কিছুই এল না।

অর্জুন খেলাটা দেখতে দেখতে বলল, “কেউ যদি না পায় তো খেলে কেন?”

মেজর মাথা নাড়লেন, “কেউ কেউ নিশ্চয়ই পায়, নইলে এটা চলছে কী করে। ওদের একটা হিসেব আছে। হয়তো একশোজন এক পাউন্ড খেলার পর মেশিনটা একজনকে দশ পাউন্ড ফেলে দেবে। খেলবে নাকি?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না। জুয়ো খেলা ঠিক নয়।”

মেজর হকচকিয়ে গেলেন, “যাচ্চলে! আরে আমরা তো জুয়াড়ি নই, একদিন মজা করার জন্যে খেলছি। কয়েনটা ধরো। ওই গর্তে মন দিয়ে ফ্যালো।”

অর্জুন পাউন্ডটাকে দেখল। টাকার চেয়ে অনেক ভারী এবং দেখতে বেশ সুন্দর। এক পাউন্ড মানে উনিশ টাকার মতো। এটাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে

করছিল না। তবু মেজরের আগ্রহে সে গর্তে ফেলল। ওপরের তাকে পড়ে ওটা গড়িয়ে এল সামনে। এসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল অন্য কয়েনের ওপরে। সেই ধাক্কায় ওপরের তিনটে কয়েন নীচের তাকে এসে পড়ল। তাকটা তখন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরে এসেছে।

আর তখনই একটা ধুকুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ঝমঝম শব্দে চারদিক চমকিত হল। আশপাশের সমস্ত লোক নিজেদের খেলা ছেড়ে এদিকে চলে এলেন। অর্জুন দেখল, ভূমিকম্পে ধসে যাওয়া বাড়ির মতো দ্বিতীয় তাকের কয়েনের চুড়োটা তিনটে কয়েনের আঘাতে নেমে আসছে নীচের ট্রেতে। আর তার শব্দে কানে যেন তালা লাগছে। পড়া শেষ হলে দেখা গেল, কিছু কয়েন পড়তে-পড়তেও আটকে রয়েছে ট্রের প্রান্তে। মেজর মাথা নাড়লেন, “একেই বলে ইনটুইশান। তোমাকে দিয়ে খেলালে পাওয়া যাবেই, মন বলছিল। নাও, তুলে নাও।”

অর্জুন দু’হাতের আঁজলায় পাউন্ডগুলো তুলে নিয়ে মেজরের দিকে এগিয়ে ধরল। আশেপাশের দৃশ্যটি দেখতে-আসা মানুষেরা আজ নানান মন্তব্য করছে ওদের ভাগ্য নিয়ে। মেজর আঁজলা থেকে একটি পাউন্ড তুলে নিয়ে বললেন, “ওগুলো পকেটে ঢোকাও। তোমার সম্পত্তি।”

“সে কী? না না, আপনি তো খেলতে বললেন,” অর্জুন প্রতিবাদ করল।

“তা হোক। খেলেছ তুমি।” মেজর হনহন করে এগিয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে ওগুলোকে পকেটে ঢোকাল অর্জুন। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে সামান্য। বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখল, মেজর নিচু হয়ে বসে জুতোর ফিরে বাঁধছেন। “এটা বারেবারে আলগা হয়ে যাবে নাকি হে! চলো, তোমার জেতা পয়সায় পাবে গিয়ে বসি।”

অনেকটা হাঁটার পর ওরা একটা বাড়ির সামনে এল, যার ওপরে লেখা—সেলস পাব। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। পাব নিয়ে বেশ কয়েকটা গল্প পড়েছে সে। কবি, সাহিত্যিকরা পাবে বসে জমিয়ে আড্ডা মারেন। মেজরের পেছনে-পেছনে সে ভেতরে ঢুকে দেখল একটা বিশাল কাউন্টারের ওপাশে নানান ধরনের বোতলে মদ সাজানো। কাউন্টারে দু’জন মহিলা কাজ করছেন। কাউন্টারের ওপরে তিনটে মেশিন। তাতে চাপ দিতে মাপমতো মদ গেলাসে পড়ছে। কাউন্টারের এপাশে লম্বা-লম্বা টুলে তিনজন লোক বসে মদ খেতে খেতে গল্প করছে। এপাশের হলঘরে টেবিল-চেয়ার রয়েছে। আর দেওয়াল জুড়ে এবং ছাদে টাঙানো রয়েছে প্রাচীন যুগের জলদস্যুদের ব্যবহৃত নানা অস্ত্র, পোশাক।

অর্জুনের শরীর গুলিয়ে উঠল মদের গন্ধে। মেজর একটা টুলে বসে বিয়ার চাইলেন। চেয়ে অর্জুনের দিকে তাকাতে সে বলল, “কিছু খাব না।”

“কমলালেবুর রস খাও। খাঁটি জিনিস।”

জিনিসটা সত্যি খুব ভাল। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে অর্জুন খুব হতাশ হল। যদিও কেউ মাতলামি করছে না, তবু সেই জমাটি আড্ডার কোনও চেহারাও দেখা যাচ্ছে না। মেজর যেভাবে বিয়ার খাচ্ছেন, তাতে মাতাল না হয়ে যান! হঠাৎ মেজর বললেন, “এইসব দেখে আমার একটা পুরনো গানের কথা মনে পড়েছে। জাহাজ লুঠ করে নেওয়ার পর জলদস্যুদের একজন গানটা গেয়েছিল। গাইব?”

মেজর গান জানেন, তা অর্জুন জানত না। আগ্রহী হয়ে সে বলল, “কেউ যদি আপত্তি করে?”

মেজর উঠে দাঁড়ালেন বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে, “লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমি যদি একটি জলদস্যুর গান গাই, তা হলে আপনারা আপত্তি করতে পারেন বলে আমার এই তরুণ বন্ধুটি জানাচ্ছে। কথাটা কি সত্যি?”

সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত চিৎকার উঠল, “না না। জলদস্যুর গান? ফ্যান্টাস্টিক। শুরু করুন।”

এবার মেজর শরীর দুলিয়ে গাইতে লাগলেন। সে-গানের একটি শব্দও বুঝতে পারছিল না অর্জুন। বাংলা বা ইংরেজির ধারে-কাছে নয়। তবে কি মেজর মাতাল হয়ে গেলেন এর মধ্যে? মাতালদের সামলানো নাকি খুব শক্ত ব্যাপার। সে দু-একবার চাপা গলায় মেজরকে সতর্ক করে দিতে গিয়েও ব্যর্থ হল।

গান শেষ করে ঝুঁকে-ঝুঁকে অভিনন্দন গ্রহণ করে মেজর বললেন, “আর একটা গ্লাস।”

অর্জুন বলল, “না, মেজর, আর নয়।”

মেজর হোহো করে হাসলেন, “জ্যা! ভয় পাচ্ছ? বিয়ারে আমার নেশা হয়ে যাবে? আরে আমি হলাম অভিযাত্রী। তা হলে তোমাকে একটা গল্প বলি শোনো। একবার সাহারার মাঝখানে আমাদের কী দুর্দশা! যদিকে তাকাই, দুটো করে জিনিস দেখি। দলের সবাই মরীচিকা দেখতে লাগল। আমি পেটপুরে বিয়ার খেলাম। ব্যস। নেশার চোটে সব একটা হয়ে গেল। দৃষ্টি পরিষ্কার। কী করে হল বলো তো? মাতাল হলে যা স্বাভাবিক, তা-ই অস্বাভাবিক লাগে। খালি চোখে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, গরমে মরীচিকা দেখছি, যেটা ধরো স্বাভাবিক অবস্থা, লাল চোখে তার উলটোটা দেখলাম।” হেহে করে হেসে উঠলেন মেজর। এই সময় একটি লোক এগিয়ে এল, “চমৎকার গাইলেন দাদা। এটা কোন্ ভাষার গান?”

মেজর বললেন, “আগেকার দিনের জলদস্যুরা আসত পোর্তুগাল থেকে। ওদের গান।”

লোকটার চোখ, অর্জুন লক্ষ করল, মেজরের জুতোর দিকে, “আপনি অভিযাত্রী?”

“ইয়েস”, মাথা নাড়লেন মেজর।

“পাকিস্তানি?”

“নো। ইন্ডিয়ান-আমেরিকান।”

লোকটা হাসল। তারপর পাব থেকে বেরিয়ে গেল।

একঘণ্টা পরে ওরা যখন বাইরে এল তখন সন্কে হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় আর জনতা নেই। বাইরে আসামাত্র অর্জুন লক্ষ করল, উলটো দিকে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একটা লোক দাঁড়িয়ে। এই লোকটাই গায়ে পড়ে মেজরের সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিল। মেজর মাতাল হননি, কিন্তু মেজাজ ভাল হয়েছে। হোটেলে ফিরছিল ওরা। মেজর গুনগুন করে গাইছিলেন। অর্জুনের খুব ভাল লাগল। মেজরকে, মদ খাওয়া সত্ত্বেও, আরও ভালবেসে ফেলল সে। হোটেল আবাসনে ঢোকান মুখে সে অবাক হল ঘাড় ঘুরিয়ে। লোকটি তাদের পেছন পেছন ওই অবধি এসে চোখাচোখি হতেই উলটো দিকে চলে গেল।

রিসেপশনে একজন রোগা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্র মেজর দু’হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন, “মানুষ যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক হয়, তোমাকে না দেখলে আমি জানতাম না।” তারপর দু’হাতে জড়িয়ে ধরে বাঁকুনি দিতে লাগলেন এমন প্রবলভাবে যে, মানুষটির অবস্থা সঙ্গিন হল। মান-অভিমানের পালা চুকে যাওয়ার পর মেজর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিই হলেন মেজরের বন্ধু মার্শাল। ব্ল্যাকপুলের সমুদ্রে মুক্তো নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। মার্শাল বললেন, “মেজর, আমি একটু বামেলায় রয়েছি। তোমার সঙ্গে আড্ডা মারব তার উপায় নেই। তুমি আজকে বিশ্রাম নাও, কাল সোজা চলে এসো আমার ক্যাম্পে। ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ো।”

মেজর জিঙেস করলেন, “সমস্যাটা কী?”

“এদিকের সমুদ্রে বছর পাঁচেকের মধ্যে কোনও হাঙর আসেনি। কিন্তু দু’দিন হল একটা বিশাল হাঙরকে মাঝে-মাঝেই দেখা যাচ্ছে। আমার ডুবুরিরা এখন জলে নামতেই সাহস পাচ্ছে না। এরকম চললে তো কাজ বন্ধ রাখতে হবে,” মার্শাল বললেন।

মেজর বললেন, “ওটাকে আমার ওপরে ছেড়ে দাও। তুমি জানো, আমি ফ্লোরিডাতে তিনটে হাঙর মেরেছি। এটা কোনও সমস্যাই নয়।”

মার্শাল বললেন, “সমস্যা। কারণ আমি কখনও শুনিনি, হাঙর মাটি ঘেঁষে এগিয়ে আসে। মারার চেষ্টা করেও তাই পারছি না। আর হাঙরটা আসার পর থেকেই প্রচুর মুক্তো চুরি যাচ্ছে। কিন্নকগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না।”

ঠিক হল মার্শাল কাল সকালে গাড়ি পাঠিয়ে ওদের নিয়ে যাবেন।

ডিনার খাওয়া হবে হোটেলের রেস্টুরেন্টে। তার আগে মেজর একটু ঘুমিয়ে নিতে গেলেন। অর্জুন রিসেপশনের এক কোণায় একটি পত্রিকা নিয়ে বসে ছিল। এখন যদিও সন্কে, তবু আটটা বেজে গেছে ঘড়িতে। কারণ, সূর্য ডোবে

দেহিতে । ঘরের ভেতর বেশ আরাম । কিন্তু অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল সুন্দর শহরটায় ঘুরে বেড়াতে । মেজরের জুতো, মধ্যপথে ডিপার্টমেন্টাল শপের খুন, সব ওর মাথা থেকে সরে গিয়েছিল । শুধু সেই অনুসরণকারী লোকটা ছাড়া অস্বস্তির কিছু ঘটেনি । সে হাঙরের কথা ভাবল । হাঙররা কী ধরনের আচরণ করে, তা তার জানা নেই । শুধু জানে, একটা মাঝারি সাইজের নৌকো ডুবিয়ে দেওয়ার শক্তি ওরা রাখে ।

এই সময় দরজা খুলে দুটো লোক ঢুকল । একজনকে একটু আগেই অর্জুন অনুসরণ করতে দেখেছে । সঙ্গে লোকটিকে দেখে অর্জুনের বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে উঠল । ওই লোকটিকে সে ডিপার্টমেন্টাল শপে সঙ্গীকে লুকুম করতে দেখেছিল না ? অর্জুন নিঃসন্দেহ হল । ওরা এখানে কেন ? দূরত্ব তো কম নয় । সে আরও ঢুকে গেল সোফার ভেতরে । পত্রিকার আড়ালে নিজেকে রেখে যতটা সম্ভব কান খাড়া রাখল ।

লোক দুটো রিসেপশনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, “নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছি বলে মনে করলে উপকৃত হবে । একটা লম্বাচওড়া লোক, দাড়িওয়ালা, যে নিজেকে অভিযাত্রী বলে দাবি করে, ইন্ডিয়ান, সে কোথা থেকে আসছে ?”

রিসেপশনিস্ট খাতা দেখে বলল, “বোল্টন ।”

লোক দুটো পরস্পরের সঙ্গে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করল । তারপর প্রথমজন গলা নামাল, “কত নম্বর ?”

রিসেপশনিস্ট বলল, “লুক, আমরা হোটেলের মধ্যে কোনও ঝামেলা চাই না ।”

“জ্ঞান দেওয়া আমরা মোটেই পছন্দ করি না”, বলে লোক দুটো লিফটের দিকে এগিয়ে গেল । লিফট নামছে না দেখে ওরা এবার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল ।

অর্জুন লাফিয়ে উঠল । রিসেপশনিস্ট ওর দিকে তাকাতেই সে বলল, “মেজরকে ফোনে সাবধান করে দাও ।” তারপর দৌড়ে গেল সিঁড়ির দিকে । এই সময় লিফটটা নেমে আসতেই সে চটপট ঢুকে পড়ল । শোঁশোঁ করে লিফট উঠছে ওপরে । ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওঠার আগেই কি ও পৌঁছতে পারবে ? লোক দুটোর মতলব কী ? মেজরকে খুন করবে নাকি ওরা ? কী দোষে ? অর্জুনের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না । লিফট থামতেই সে দৌড়ে বেরিয়ে এল । নীচে সিঁড়িতে কেউ নেই । মেজরের ঘরের দরজা বন্ধ । অর্জুন কিছু স্থির করতে পারছিল না । লোক দুটো কি এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে ? দরজাটা নড়ে উঠতেই সে আবার লিফটে ঢুকে পড়ল । বোতাম টিপতেই সেটা উঠে গেল ওপরে । অর্জুন লিফটটা ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ি ধরে ধীরে-ধীরে নামতে লাগল ।

নিজেদের ফ্লোরের আসার মুখে সে দাঁড়াতেই দেখল, লোক দুটো বোতাম টিপে লিফটটা নামিয়েছে । এবার ওটার ভেতরে ঢুকে গেল । ওদের একজনের হাতে মেজরের তোয়ালেতে মোড়া জুতোজোড়া । স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । ওরা

নীচে চলে গেলে অর্জুন ছুটে মেজরের ঘরে ঢুকল। দরজা খোলাই ছিল। মেজর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। অর্জুনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। উনি কি মরে গেছেন ?

সে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার ডাকার পর মেজরের চোখ খুলল, “আঃ। ক’টা বাজে ? মা, মাগো।”

অর্জুন যেন প্রাণ ফিরে পেল, “মেজর, আপনি ঠিক আছেন ?”

“বেঠিক থাকব কেন ? খিদে পেয়েছে তোমার ?”

“আপনি তাড়াতাড়ি উঠুন। এই ঘরে দুটো লোক ঢুকেছিল। তারা আপনার ওই জুতোজোড়া নিয়ে গিয়েছে।” অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে নিল।

“জুতো ? জুতোচোর ?” মেজর লাফিয়ে উঠলেন।

অর্জুন তাঁকে ঘটনাটা বলল। মেজর চটপট তৈরি হয়ে নিলেন। তিনি নীচে নামলেন। রিসেপশনিস্ট লোকটি ওঁকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হল। মেজর দুম করে ঘুসি মারলেন কাউন্টারে, “আমি জানতে চাই, এই হোটেলটা চোর বদমাশ গুণ্ডাদের দখলে কি না ?”

“নো স্যার। এটা খুব রেসপেক্টেবল হোটেল !”

“হাই হোটেল। ওই লোকদুটোকে আপনি আমার রুমের নান্নার বলেছেন কেন ?”

লোকটা কোনও রকমে মাথা নাড়ল, “আমি ভেবেছিলাম ওরা আপনার বন্ধু।”

“বন্ধু ? জুতোচোর আমার বন্ধু ? আমি আপনার নামে পুলিশকে বলব। কোথায় ওরা ? বলুন, কোথায় গিয়েছে ওরা ?” মেজর বীভৎস রাগে চোঁচাচ্ছিলেন।

“আমি জানি না স্যার। ওদের আমি কখনও দেখিনি। এমনভাবে কথা বলছিল, যে ভয় পেয়ে... ! স্যার, আপনি আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন।”

অর্জুন কোনও রকমের বলতে পারল, “পুলিশকে বলার আগে মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে পরামর্শ করলে হত না ?”

“মিসেস গ্রান্ট ?” মেজর আগের গর্জনটা ধরে রেখেছিলেন, “ও, মিসেস গ্রান্ট।...এই যে শুনুন, ডায়াল করুন।” নান্নারটা বললেন মেজর। যোগাযোগ হতেই রিসিভার হাতে নিয়ে মেজর ইংল্যান্ডের হোটেলগুলো সম্পর্কে নালিশ করতে লাগলেন। তারপর বললেন, “না না, আপনাকে আসতে হবে না।...ডিনার ? না না, ডিনার খাইনি।...আসব ? কী দরকার ?...আচ্ছা ! সিটি ব্যাঙ্ক ? তারপর ?...ও। বাই।”

রিসিভার রেখে মেজর বললেন, “ওই লোক দুটোকে যদি আবার এই হোটেলে দেখি, তা হলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে, চাঁদ।”

একজন লালমুখো ইংরেজকে কথাগুলো যেভাবে শোনালেন মেজর, তাতে ওঁর ওপর আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল অর্জুনের।

হোটেলের বাইরে অর্জুনকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন মেজর। তখনও তাঁর রাগ কমেনি। একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে অকারণে ধমকে থামালেন। তারপর সোজা যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, “আমার ঘরে ঢুকে চুরি করে, কী সাহস বলো তো!”

“আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাই।”

“হোটেলের ওই রিসেপশনিষ্টটাকে ছাড়া ঠিক হবে না। ওহো, আমরা যাচ্ছি মিসেস গ্রান্টের বাড়িতে। উনি যেতে বললেন।”

“ওটা তো ওঁর বাসবীর বাড়ি। কিন্তু কেন যাচ্ছি?”

“উনি খেতে বললেন।”

“কেন?”

প্রশ্নটা শুনে এবার থতমত খেয়ে গেলেন মেজর, “উনি বলতেই আমি হ্যাঁ বলে ফেললাম।”

অর্জুন হেসে ফেলল। নির্জন রাস্তায় খুব সামান্য গাড়ি চলছে। সমুদ্রকে ডান দিকে রেখে ওরা এগোচ্ছে। খুব ভাল লাগছিল অর্জুনের। এখন আর কল্পনার কিছু নেই। ওই লোক দুটো জুতো পেয়ে গেছে। চোরা-কুঠুরিতে যখন কিছুই পাবে না, তখন নিশ্চয়ই খেপে যাবে ওরা। মনে হচ্ছে সেই কারণেই আবার দেখা হবে। দোকানের হত্যাকাণ্ডের জের ব্ল্যাকপুলে এসে পৌঁছবে। হঠাৎ অর্জুন দেখল, একটা বাগানওয়ালা বাড়ির সামনে দুটো লোক দাঁড়িয়ে। ওদের দেখামাত্র অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল। অর্জুন বাড়িটার নাম পড়ল, ‘সি-ফেস’। পুরনো বাড়ি। কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না। লোক দুটো অমন করল কেন? সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, লোক দুটো উলটো দিকে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে উঠে শহরের দিকে চলে গেল।

এই অঞ্চলটা শহরের বাইরে। দূরে-দূরে কিছু সেকলে বাড়ি। বাড়িটার নাম সি-ফেস। সমুদ্রমুখী। একদম ঠিকঠাক নাম। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অর্জুন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল তার। সে মেজরের একটা হাত উত্তেজনায় আঁকড়ে ধরল। মেজর চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন, বিড়বিড় করে বললেন, “ভয় পাওয়ার কিছু নেই।”

অর্জুন বলল, “মেজর। আমি পেয়ে গেছি।”

“কী?”

“এস. এফ. মানে সি-ফেস। মানে ওই বাড়িটা, আর বি. পি. মানে ব্ল্যাকপুল। ব্ল্যাকপুলের ‘সি-ফেস’ বাড়ি।” অর্জুনের গলায় উত্তেজিত আনন্দ।

“তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,” মেজর বললেন।

অর্জুন গাড়ির আসনে নিজেকে ছেড়ে দিল, “একটু ভাবতে দিন।”

আচমকা কাউকে নিমন্ত্রণ করেও যে ভাল খাওয়ানো যায়, তা মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী দেখালেন। ভদ্রমহিলা হাসিখুশি। মাসিমা-মাসিমা ভাব। খাওয়াদাওয়ার পর ওরা বসার ঘরে বসল। মেজর হোটেলের ঘটনাটা বললেন। মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বললেন, “এখানকার পুলিশ খুব কড়া। ঘটনাটা জানতে পারলে রিসেপশনিস্টটিকে ছাড়বে না।” যদি ওরা চায়, তিনি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “আর-একটা দিন অপেক্ষা করলে হয়।”

এইসময় অর্জুন জিজ্ঞেস করল মিসেস গ্রান্টের বান্ধবীকে, “আপনাদের এখানে আসবার সময় একটা বাড়ি দেখলাম। বাড়িটার নাম সি-ফেস। ওখানে কারা থাকেন?”

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বললেন, “ওঃ, ওটা এখন প্রায় পরিত্যক্ত। গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। বাড়িটার মালিক সেই রকম উইল করেছিলেন।”

“উনি কবে মারা গিয়েছেন?”

“ওঁর মৃত্যুটা রহস্যজনক। উনি আপনার মতোই অভিযান পছন্দ করতেন, মেজর। শুনেছি, বছর তিনেক আগে কোনও একটা অভিযানে গিয়ে তিনি হারিয়ে যান। অনেক চেষ্টার পর তাঁর খোঁজ না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।”

“ওঁর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?”

“না। কাউকে তো দেখিনি। বাড়িটা তালাবদ্ধ রয়েছে সেই থেকে।”

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল, “এখানে সূর্য ওঠে কখন?”

“তিনটে নাগাদ। কেন?”

“আমি তার আগে ওই বাড়িতে যেতে চাই।”

“কেন? ওখানে কী দরকার?” মেজর অবাক।

“আমার বিশ্বাস, ওখানে গেলেই জুতো রহস্য এবং জুতোচোরদের মতলব বোঝা যাবে। আমরা যদি আজ রাতে হোটেলে ফিরে না গিয়ে এখানেই বিশ্রাম করি, তা হলে আপনাদের আপত্তি আছে?” অর্জুনের গলার স্বর পালটে গেল।

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বললেন, “এখানে কেউ বসে থাকতে পারে? তা হলে শোবার ব্যবস্থা করতে হয়।”

“কোনও দরকার নেই”, অর্জুন বলল, “আপনারা শুয়ে পড়ুন।”

মিসেস গ্রান্ট জোর করে তাঁর বন্ধুকে শুতে পাঠালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার বলো তো? ওই বাড়িতে কী আছে?”

অর্জুন বলল, “জুতোটার মধ্যে চোরা-কুঠুরিতে যে চিরকুট ছিল, তাতে জুতোর মালিক লিখেছিলেন বি. পি., এস. এফ.। জুতোটা অভিযাত্রী, এবং

বাড়িটাও। ব্ল্যাকপুল, সি-ফেস। তাই আমার মনে হচ্ছে, ওখানে না গেলে বুঝতে পারব না আমি ঠিক ভাবছি কি না।”

তখনও অন্ধকার। মিসেস গ্রান্ট গাড়ি চালাচ্ছিলেন। নিস্তব্ধ চারদিক। ঠাণ্ডার তুলনা নেই। আগেই কথা ছিল, তিনি সি-ফেস বাড়িটার আগেই থামবেন। একটু আড়ালে গাড়িটা রেখে তিনি নজর রাখবেন, আর কেউ আসে কি না। যদি সন্দেহজনক কিছু ঘটে, তিনি তিনবার হর্ন বাজিয়ে সাবধান করে দেবেন। তিনি বারংবার সতর্ক করে দিলেন, যেন ওরা পুলিশের হাতে না পড়ে। মাঝরাতে অন্যের বাড়িতে ধরা পড়লে ওদের নির্ঘাত হাজতবাস করতে হবে।

মেজর এবং অর্জুন মেন গেটে এসে দেখল, ওটা সহজেই খোলা যায়। ভেতরে পা দিতেই পাখিরা চিৎকার করে উঠল গাছে-গাছে। আবছা অন্ধকার চারপাশে। ওদের ধাতস্থ হবার সময় দিতে অর্জুন জায়গাটা জরিপ করল। এককালে বাগানটা সুন্দর ছিল। এখন অযত্নে আগাছায় ভরেছে। মেজর বললেন, “মানুষ আছে বলে তো মনে হয় না। কী করতে চাও?”

অর্জুন বলল, “আরও একটু ভেতরে চলুন। কথা বলবেন না। ওই ঝোপটার আড়ালে দাঁড়াতে হবে।”

ওরা সেখানে পৌঁছলে অর্জুন ঘড়ি দেখল। সূর্য উঠতে এখনও দেরি আছে। মেজরের পক্ষে এক জায়গায় অপেক্ষা করা মুশকিল। তিনি উসখুশ করছিলেন। আর অর্জুন কেবলই তাঁকে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বলছিল। পাখিরা থেমে গেছে। পৃথিবীর কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঠাণ্ডা যেন হাড়ের ওপর দাঁত বসাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সূর্যদেব উঠলেন। যদিও ঘড়িতে এখন শেষরাত। একফালি রোদ এসে পড়ল ভুতুড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো বাড়িটার ওপর। চাপা গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি পপলার গাছ চেনেন?”

মেজর হাসলেন, “তা চিনব না! ওই তো ওখানে একটা, ওপাশে আর-একটা।”

অর্জুন গাছ দুটোকে দেখল। বাড়িটার পূর্ব দিকে কোনও পপলার গাছ নেই। এ দুটো উত্তর দিকে। শ্যাডো কিস্‌ড দ্য পপলার। পশ্চিমে সূর্য ঢললে পূর্ব দিকে ছায়া পড়ে। সেদিকে পপলার না থাকায় দেখতে হবে পশ্চিমে সেই গাছ আছে কি না। কারণ উত্তরে ছায়া আসবে না।

অর্জুন মেজরকে ইশারা করে এগিয়ে যেতে লাগল সতর্ক পায়ে। শিশির-ভেজা পাতাগুলোয় বেশি শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু পাখিরা জাগছে। পশ্চিম দিকের বাউন্ডারি ঘেঁষে একটা পপলার দাঁড়িয়ে। আর কী আশ্চর্য, সূর্য এখনও নীচে বলে বাড়িটার ছায়া তার গোড়ায় পড়েছে। শ্যাডো কিস্‌ড দ্য পপলার।

বুকের মধ্যে ড্রাম বাজছে। অর্জুন গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। মেজরকে বলে গেল, “আপনি এখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখুন। কাউকে দেখলে সতর্ক করে দেবেন।”

সে মনে করল পরের শব্দগুলো। ফোর এল, টু ইউ। এল মানে লেফট, বাঁ দিকে। চার ফুট না চার হাত? চার ফুটে তো শেকড় থাকবে। তা হলে চার হাত। ‘টু ইউ’ মানে? ইউ কি আন্ডার? দু’ হাত নীচে?

সে চারপাশে তাকাল। তারপর জায়গা মেপে মাটিতে উবু হয়ে বসল। খুব শক্ত মাটি নয়। সে পকেট থেকে ছুরিটা বের করল। কোদাল বা শাবল পেলে ভাল হত। কী করা যাবে! সে ছুরি দিয়ে খানিকটা গর্ত করে এবার মাটি তুলতে লাগল হাতে। কাদা-কাদা মাটি, সহজেই উঠে আসছে। প্রায় একঘণ্টা চেষ্টার পর মনে হল, হাত-দুয়েক গর্ত হয়েছে। কিন্তু কিছুই নেই তো! সে গর্তটাকে আরও একটু বাড়িয়েও কিছু পেল না। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল অর্জুন। সে কি পুরো ব্যাপারটাই ভুল বুঝেছে! অমলদা থাকলে...। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে এক বাটকায় সোজা করল। সে নিজে ভুল করবে আর অমলদা তাকে শুধরে দেবেন, এ কতদিন চলবে? অর্জুন পপলার গাছটার দিকে তাকাল। ছায়াটা নেমে এসেছে অনেকটা। গোড়া থেকে অন্তত হাত-চারেক ওপরে এসে ঠেকেছে। অর্জুনের চোখ ছোট হয়ে এল। চারটে বড় ডাল গাছটার শরীর থেকে বেরিয়েছে। ফোর এল মানে কি ফোর লার্জ? সে ডালগুলো দেখল। তারপর ধীরে-ধীরে তার মুখে হাসি ফুটল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেজরকে ইশারায় ডাকল। মেজর এলে সে বলল, “কিছু মনে করবেন না, উবু হয়ে বসুন তো!”

“কেন? কিছুই তো পেলেন না!”

মেজর বসতেই সে দু’পা তাঁর মাথার দু’পাশে গলিয়ে বলল, “কিছু না মনে করে গাছটা ধরে উঠে দাঁড়ান।”

মেজর সোজা হতে চারটে ডালের ঠিক দু’ ফুট নীচে সে গর্তটাকে দেখতে পেল। সম্ভবত গর্ত করে পাথর দিয়ে মুখটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে টাইট করে। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অর্জুন পাথরটাকে বের করতেই বাইরে তিনবার হর্ন বেজে উঠল। দ্রুত হাত চালাল সে। হাতের মুঠোয় একটা স্টেইনলেস স্টিলের কৌটো উঠে এল। লাফ দিয়ে মেজরের কাঁধ থেকে নেমে অর্জুন বলল, “দৌড়োন।”

হতভঙ্গ মেজর যখন তাঁর ভারী শরীর উত্তর দিকের ঝোপের আড়ালে নিয়ে আসতে পারলেন, তখন অর্জুন চারটে লোককে দেখতে পেল। গেট খুলে তারা ঢুকছে। দু’জনকে সে গতরাতে হোটеле দেখেছে, বাকি দু’জনকে দেখলেই বোঝা যায়, খুন করতে ওদের হাত কাঁপে না।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে বাড়িটার দক্ষিণ দিকে চলে গেল। একটু

পরেই বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে একটি মানুষের অবাধ-হওয়া চিৎকার ভেসে এল। মেজর বললেন, ‘চলো, পালাই।’

“পালাবেন, না লড়বেন?”

“লড়ব? বেশ, তা-ই হোক।”

কথা শেষ হবার আগেই চারজনকে দৌড়ে গেটের কাছে পৌঁছতে দেখা গেল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে গেট পরিষ্কার দেখা যায়। লোকগুলো খুব উত্তেজিত হয়ে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছে। এই সময় অর্জুন মিসেস গ্রান্টের গাড়িটাকে দেখতে পেল। গাড়িটা নজরে পড়তেই চারটে লোক একপাশে সরে দাঁড়াল। ওদের দু’জনের হাতে রিভলভার।

মেজরের কাঁপা গলা শুনল অর্জুন, “না। লড়াটা বোকামি হবে।”

গাড়ি থেকে নামলেন মিসেস গ্রান্ট। তারপর সোজা লোকগুলোর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কি সি-ফেস?”

একটা লোক কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, “কেন? এখানে কী দরকার?”

“আমি সাপের ব্যবসা করি। এখানে আমার দুটো সাপ ঢুকেছে। ওদের নেব।”

“সাপ?”

“হ্যাঁ। ওই তো। ওখানে।” মিসেস গ্রান্ট সরাসরি মেজরের দিকে আঙুল তুলতেই লোকগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপরে কোনওদিকে না চেয়ে ওরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

গাড়িতে বসে মেজর বললেন, “ওরা পালাল কেন বলুন তো?”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “ওরা আপনাদের সাপ বলে ভুল করেছিল।”

মেজর বললেন, “এটা ঠিক হল না। আপনি আমাদের সাপ বানালেন।”

“ওদের কাছে। কিছু হল?”

শেষ প্রশ্ন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে। সে হাতের মুখে খুলল। স্টেইনলেস স্টিলের কৌটোর মধ্যে একটা চাবি। চাবির গায়ে ব্যাক্সের চাকতি। সেখানে লেখা কোন্ ব্যাক্স, লকারের নম্বর কত!

অর্জুন বলল, “এটার জন্যে ওরা মরিয়া হয়ে খুঁজছে। নিশ্চয়ই ওই লকারে খুব মূল্যবান কিছু আছে।”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “আমাদের এটা নিয়ে থানায় যাওয়া উচিত।”

অর্জুন বলল, “তা হলে পুলিশকে বলতে হবে আমরা কীভাবে চাবি পেয়েছি। তার চেয়ে লকার খুলে যদি দামি জিনিস দেখি, তা হলে পরিচয় না দিয়ে পুলিশকে ফোন করলেই চলবে।”

“দামি জিনিস মানে?” মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

“সোনাদানা, টাকা।”

“যদি অন্যকিছু হয়। এই ধরো গুপ্তধনের ম্যাপ?”

অর্জুন হাসল। “তা হলে তো চমৎকার।”

মেজর উঠে বসলেন, “সোজা ব্যাক্সে চলো।”

অর্জুন আপত্তি করল, “না। মিস্টার মার্শাল আপনাকে আজ যেতে বলেছেন। আপনার তো হাণ্ডর মারার কথা। আমরা সেটা দেখি আগে।”

মেজর আবার এলিয়ে পড়লেন গাড়ির সিটে, “ও। হাণ্ডর! আমার কাছে কিছুই না। এখন আমি ইন্টারেস্টেড মানুষরূপী হাণ্ডরে। হে ভগবান, লকারে যেন গুপ্তধনের ম্যাপ থাকে।”

অর্জুন চারিটাকে পকেটে রেখে ভোরের সমুদ্রের দিকে তাকাল।

ইংল্যান্ডের সমুদ্রের ধারে এই ছোট্ট শহরটাকে খুব ভাল লেগে গেল অর্জুনের। সব সময়ই ঝোড়ো বাতাস বইছে এখানে। ঠাণ্ডা আছে, তবে সেটা ডিসেম্বরের জলপাইগুড়ির মতনই। মে-জুন মাসেই যদি এই অবস্থা, তা হলে সত্যিকারের শীত এলে কী হবে! ওদের হোটেলের জানালা দিয়ে সবুজ জলের স্থির সমুদ্র দেখছিল অর্জুন। সমুদ্র বলতে যে উত্তাল জলরাশি মনে আসে, ব্ল্যাকপুলে তা দেখা যাচ্ছে না। আর এই সমুদ্রের তলাতেই মেজরের বন্ধু মার্শালসাহেব মুক্তো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। অবশ্য জায়গাটা এই হোটেল থেকে কয়েক মাইল দূরে এবং সেখানে যাওয়ার জন্যেই ওর আর মেজরের ব্ল্যাকপুলে আসা।

মেজরের বিশেষ পরিচিত মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে হিথরোতে আসার সময় দেখা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা খুব ভাল। একসময় পেশাদার ম্যাজিশিয়ান ছিলেন। এখন মাঝে-মাঝে অনুষ্ঠান করেন। এই রসিকা ভদ্রমহিলার বাড়িতে ওরা এক রাত ছিল। সেখানেই পুরোন জুতোর মধ্যে একটা চিরকুটে সাক্ষেতিক শব্দ পেয়ে গিয়েছিল অর্জুন। অনেক ঝামেলার পর সেই শব্দের সূত্র ধরে একটি স্টিলের কৌটোয় লুকিয়ে-রাখা চাবি আবিষ্কার করে এখন ওরা হোটেলের জানালায় আরাম করে বসেছে। চারিটার গায়ে ব্ল্যাকপুলের কোনও একটা ব্যাক্সের চাকতি এবং তাতে লকার-নম্বর লেখা। হোটেলে ফিরে আসামাত্র মেজরকে রিসেপশনিস্ট বলেছেন, “মার্শালসাহেব খবর পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁদের জন্যে আজ দুপুরে অপেক্ষা করবেন।”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “মেজর, আপনারা তা হলে রওনা হন। অবশ্য যদি চান, আমি আপনাদের আমার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।”

গতরাতে ওই স্টেনলেস কৌটো খোঁজার জন্যে কেউ একফোঁটা ঘুমোতে পারেনি। অর্জুন প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। একটুও ক্লান্ত মনে হচ্ছে না ওঁকে। কিন্তু গাড়িতে আসার সময় মেজর তিনবার ঢুলেছিলেন। সে বলল, “আমার প্রস্তাব হল, স্নানটান করে এখন সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। তারপর মার্শালসাহেবের কাছে যাওয়ার সময় ওই ব্যাক্স হয়ে যাব।”

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র মেজর লুফে নিলেন, “কারেন্ট।” মার্শালের হুকুমমতো আমাদের চলতে হবে নাকি? শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।” বলতে-বলতে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুললেন তিনি।

মিসেস গ্রান্টকে এগিয়ে দিতে নীচে নামল অর্জুন। পার্কিং লটে পৌঁছে প্রৌঢ়া বললেন, “সাবধানে থাকা দরকার। আমার মনে হচ্ছে কোনও একটা বড় ঝামেলার সঙ্গে সবাই জড়িয়ে পড়ছি। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।”

অর্জুন মাথা নাড়ল। প্রৌঢ়াকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। নিজে ম্যাজিশিয়ান, কিন্তু তাই বলে কোনও অহঙ্কার নেই। পরিষ্কার বলেছেন, “আমি অতীত আবিষ্কার করতে পারি না, ভবিষ্যৎ পড়তে পারি না, শুধু বর্তমানের কিছু ব্যাপারে বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারি মাত্র।”

মিসেস গ্রান্ট চলে গেলে অর্জুন দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। ভাল মেঘলা দিন আজ। সেই সঙ্গে বাতাস দাপটে বইছে। শরীরে একটা কনকনে ভাব তৈরি হচ্ছে এই কারণে। হোটেলের সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে প্রায় জনশূন্য রাস্তা এবং দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অর্জুন আবিষ্কার করল, শরীরের ক্লাস্টিটি এখন আর অত প্রকট নয়। বোধহয় এই কারণেই ঠাণ্ডার দেশের মানুষেরা বেশি কাজ করতে পারে। অর্জুন ধীরে-ধীরে রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে এল। স্থির সমুদ্রে বাতাস ভাঙা ডেউ তুলছে। কিছু রঙিন বোট জেটিতে বাঁধা রয়েছে। সেগুলোতে চড়ার জন্যে কেউ নেই অবশ্য। সমুদ্রের ওপর ভাসমান রেস্টোরাঁগুলো রঙিন সাইনবোর্ড নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষায় রয়েছে। বড় চওড়া রাস্তার ওপাশে আধ মাইল জায়গা জুড়ে নানান দোকান এবং বেটিং হাউস। অল্প পয়সায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার নেশা যাদের, তারাই ওখানে ভিড় জমিয়েছে।

রাস্তাটার নাম গ্লেব রোড। সিঙ্গল লাইন দিয়ে একটা ট্রাম সশব্দে চলে গেল। এবং তখন অর্জুনের নজরে পড়ল মেয়েটাকে। দেখলে ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে। কোঁকড়া চুল অযত্নে ছাঁটা, জিন্সের প্যান্টের ওপর নীল সোয়েটার এবং সাদা কার্ডিগান। সমুদ্রের ধারের সাদা রেলিং-এ হেলান দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। কুড়ি-একুশের ওপরে মোটেই ওর বয়স নয়। অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। মেয়েটা যেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, তার পেছনে একটি সাইনবোর্ডে ‘দি গুড ওল্ডি ডেজ’ নামক একটি নাটকের বিজ্ঞাপন। একটু জেদ করেই অর্জুন মেয়েটির সামনে দিয়ে হেঁটে এল। সে আড়চোখে লক্ষ্য করল, বাতাসে লুটিয়ে-পড়া একগোছা চুলের ফাঁকে মেয়েটির ঠোঁটে এক চিলতে হাসি চলকে উঠল। আরও খানিকটা এগিয়ে অর্জুন বাঁ দিকে বাঁক নিল। রাস্তা থেকে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম সোজা সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ওপরের সাইনবোর্ডে লেখা ‘বেল আইল’। এখানে ছোট-ছোট ভিড়, কিন্তু মনুষ্যজন ৩৩২

চোখে পড়ছে না। এই সময় এই আবহাওয়ার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়ে কমলা রঙের রোদ উঠল। অর্জুন আড়চোখে দেখল, মেয়েটা এবার স্পষ্ট তাকেই অনুসরণ করছে। সে সমুদ্রের দিকে তাকাল প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে। ওদিকে ছোট একটা পাহাড়ের গায়ে সমুদ্র টাইটম্বুর, এপাশে অবশ্য দিগন্ত দেখা যায় না।

“এক্সকিউজ মি।” গলাটা যেন একেবারে কানের কাছে।

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল, মেয়েটি পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাওয়ায় তার চুল এবার বড্ড এলোমেলো। দু’পকেটে হাত পুরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, “তুমি বাংলাদেশি?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না। আমি ভারতীয়।”

“এই দেশে কতদিন আছ?”

“কয়েকদিন বলাটাও বেশি বলা হবে।”

“বাঃ। তুমি তো দেখছি বুদ্ধিমান। আমিও অবশ্য ভারতীয় ছিলাম কোনও একদিন।”

“মানে? তুমি কি এখন এখানকার নাগরিক?”

“হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি কোনও গোলমাল করেছ?”

“আমি? না তো?”

“সত্যি কথা বলছ না তুমি। নিজের ভাল চাও তো এখনই ব্ল্যাকপুল ছেড়ে যাও। আমি একটা প্লে হাউসে চাকরি করি। দুজন লোককে বলতে শুনলাম কিছু কথা তোমার সম্পর্কে। তুমি ভারতীয় বলেই, মনে হল, সাবধান করে দেওয়া উচিত।” কথা শেষ করেই মেয়েটি যেমন এসেছিল তেমন ফিরে গেল রাস্তার দিকে।

অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ঠিক কী শুনেছে। তাকে সাবধান করে দিতে এসে মেয়েটিও কি ঝুঁকি নিল? কিন্তু ততক্ষণ মেয়েটি রাস্তায় উঠে চোখের আড়ালে চলে গেছে। অর্জুন ফিরে এল প্ল্যাটফর্ম ডিঙিয়ে। আর তখনই আর-একটা ট্রাম সামনে এসে দাঁড়াতেই সে কোনও কিছু না ভেবেই উঠে বসল।

এক পাউন্ডের কয়েন দেখতে দারুণ। মোহর দ্যাখেনি সে কখনও। কিন্তু ওই কয়েনটাকে দেখলেই মোহরের কথা মনে আসে। অর্জুন মেয়েটির কথা ভাবছিল। নিশ্চয়ই অনেক কাল এ-দেশে আছে। কথা বলার ভঙ্গিটিও ব্রিটিশদের মতো। শুধু ভারতীয় বলে যেচে সচেতন করতে এল? কী জানি! কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি হলে তাকে নিয়ে এখানে কেউ-কেউ আলোচনা করছে। এরা কারা? এই সময়ে ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ডটা নজরে পড়তেই সে ঝটপট উঠে পড়ল। বেশ কিছু যাত্রী ট্রামস্টপে অপেক্ষায় ছিলেন এখানে। অর্জুন নামবার সময় লক্ষ করেনি আর-একটা জিপ ট্রামটার পাশাপাশি এসে আবার ট্রামটারই

সঙ্গী হয়ে চলে গেল। অনুসরণকারীরা মানুষের ভিড়ে তাকে লক্ষ্য করেনি নামতে। রাস্তা পেরিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে এসে সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। আজ অবধি সে কোনও ব্যাঙ্কের লকার খোলেনি। কী করে খুলতে হয়, তাও তার জানা নেই। ব্যাঙ্কের অফিসাররা যদি তাকে প্রশ্ন করে তা হলেই হয়ে গেল!

দোনামনা করে সে দরজার দিকে এগোতেই ওটা দু'পাশে সরে গেল তাকে পথ করে দিতে। বিভিন্ন এগারপোর্টে এই ধরনের দরজা দেখে সে এখন অভ্যস্ত। ব্যাঙ্কে তেমন লোকজন নেই। কিন্তু চারপাশে নজর বুলিয়েই তার মনে হল, সে যদি লকারের খোঁজ করে তা হলে ওই যে মহিলা রিসেপশনে বসে আছেন, তার সন্দেহ বাড়বেই। ভদ্রমহিলা যে-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, সেটা পছন্দসই নয়।

হোটেলে ফিরে মেজরের ঘুম ভাঙাতে ভাল পরিশ্রম করতে হল। চেন না খুলে সামান্য ফাঁক করে ওকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেজর বললেন, “ওঃ, তুমি! আমি ভাবলাম আবার কেউ ঘর ভুল করল বুঝি?”

ঘরে ঢোকার পর অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “কী ব্যাপার বলুন তো?”

“আর বোলো না। অন্তত তিনবার দরজায় ধাক্কা দিয়েছে কেউ-না-কেউ। ঘরের নম্বর জিজ্ঞাসা করেছে। আমি খুলিনি। শুয়েই ছিলাম।”

“খুব ঘুম পেয়েছিল বুঝি!”

“না, না। ওরা ভুল নম্বর বলছিল। ষোলো নম্বর ঘর চাইছিল।”

অর্জুন চমকে উঠল, “আমাদের এই ঘরটাই তো ষোলো নম্বর।”

“অ্যাঁ।” মেজর চোখ পিটপিট করলেন। তাঁর বিশাল শরীরটাকে জবুখবু দেখাল, “বড্ড ভুল হয়ে গেছে হে। আমি ভেবেছিলাম সতেরো। লোকগুলোকে কষ্ট দিলাম অনর্থক। ছি ছি ছি।”

বিছানায় ঢোকার সময় অর্জুন শান্ত গলায় বলল, “না জেনে হয়তো ঠিক কাজই করেছেন। জানার পর আবার দরজা খুলতে যাবেন না।”

“মানে?” মেজর ওর বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন।

“প্রতি মুহূর্তে কেউ-না-কেউ আমাদের অনুসরণ করে থাকে।”

দুপুর নয়, ওরা হোটেলে ছেড়ে মার্শালসাহেবের উদ্দেশে বের হল যখন, তখন ভর-বিকেল। অবশ্য সময়ের এই ভাগটা করতে হয় ঘড়ি দেখে। রোদ না থাকায় সকাল আর দুপুরকে বিকেলের থেকে আলাদা করা অসম্ভব।

ট্যাক্সি নয়, ব্ল্যাকপুলের বাস টার্মিনাস থেকে বাসে উঠেছিল ওরা। জলপাইগুড়ির বাস যদি এমন হত! ড্রাইভারের সিটের পাশ দিয়ে ওঠার সময় টিকিট নিয়ে ভেতরের আরামদায়ক আসনে গিয়ে বোসো। জিনিসপত্র রেখে দাও লাগেজ-বক্সে। কারও সঙ্গে কারও শরীর ঠেকছে না। একটুও বাঁকুনি না

দিয়ে মসৃণ গতিতে গাড়িটা চলেছে সমুদ্রের ধার-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে। এর মধ্যে মেজর ড্রাইভারকে বলে এসেছেন মার্শালসাহেবের কাছে পৌঁছতে, যেখানে ওদের বাস থেকে নামতে হবে সেখানে মনে করে নামিয়ে দিতে। অর্জুনের হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের আচরণ অনেকটাই একরকম। দেশ এবং জাতিভেদে ভাষা এবং জীবনযাত্রার তারতম্যে যে-প্রভেদটা প্রথমেই নজরে আসে, সেটাকে উপেক্ষা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকে একই গলায় সুখ-দুঃখ অথবা উদ্বেগের কথা বলে। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে অনেক মানুষ বারংবার কণ্ঠস্বরকে মনে করিয়ে দেয়, তাকে ফাটাপুকুরে অথবা বেলাকোবায় নামিয়ে দিতে।

মেজর একটু ঝুঁকে বললেন, “ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা মিটিয়ে গেলে হত হে। বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।”

অর্জুন বলল, “আমাদের লকার-রুমে ঢুকতে দিত না।”

“কেন? চাবি নিয়ে গেলে দেবে না কেন?”

“ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। দেখে সন্দেহ হল, ওই ব্যাঙ্কে কোনও ভারতীয়ের অ্যাকাউন্ট নেই। সবাই আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল। লকারের খোঁজ করলে ওরা নিশ্চয়ই গোপনে পুলিশকে খবর দিত।”

অর্জুন কাচের জানলায় চোখ রেখে সমুদ্র দেখতে-দেখতে কথাগুলো বলতেই মেজর মাথা নাড়লেন, “তা হলে তো মুশকিল হয়ে গেল।”

“মিসেস গ্রান্টকে দায়িত্বটা দিতে হবে। ওঁকে কেউ সন্দেহ করবে না।”

কথাটা মেজরের মনে ধরল, “ঠিক বলেছ। মিসেস গ্রান্টকে তোমার কেমন লাগছে?”

“খুব ভাল।”

“আমি যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব তারা ভাল না হয়ে যায় না।”

এই সময় বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে ড্রাইভার আচমকা ব্রেকে পা দিতেই বাস গতি হ্রাস করতেই মেজর সামনে ঝুঁকে পড়তে-পড়তে চিৎকার করলেন, “ননসেন্স। কী ধরনের গাড়ি চালানো হচ্ছে, অঁ্যা?”

প্রশ্নটির উত্তর দেবার সময় হল না কারণ প্রত্যেকের চোখ সামনের রাস্তায়। সেখানে পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে একটি প্রাইভেট গাড়িকে। গাড়িটির চারটে চাকাই পাশ থেকে ওঠা। বোঝাই যাচ্ছে দ্রুতগতিতে চালাতে গিয়ে কন্ট্রোল হারিয়ে চালক অ্যাকসিডেন্টটা করেছেন। যেভাবে গাড়িটি পাশ ফিরে আছে তাতে আরোহীদের মৃত্যু অস্বাভাবিক হবে না।

চোখ বন্ধ করে মেজর মাথা নাড়লেন, “এসব দেশে রাস্তায় এত স্পিড-রেস্ট্রিকশন থাকা সত্ত্বেও কেন যে অমন জোরে গাড়ি চালায়।”

পুলিশ ততক্ষণে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিচ্ছে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে। এদের বাস যখন ডান পাশ দিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন অর্জুন লাফিয়ে

উঠল, “রোক্কে, রোক্কে।” পরক্ষণেই দেশটা মনে পড়ায় চিৎকার করল,
“স্টপ, স্টপ।”

মেজর হতভম্ব হয়ে জিঞ্জেস করলেন, “কী হল তোমার?”

সিট ছেড়ে প্যাসেজে চলে এসেছিল ততক্ষণে অর্জুন। মুখ ফিরিয়ে
উত্তেজিত গলায় সে জবাব দিল, “ওটা মিসেস গ্রান্টের গাড়ি।”

ওদের নামিয়ে দিয়ে বাসটা চলে যাওয়ার পর মেজর জিঞ্জেস করলেন,
“দেখতে যদিও একরকম, তবু তুমি কী করে বুঝলে ওটাই মিসেস গ্রান্টের
গাড়ি?”

“নাম্বার প্লেট।” অর্জুন হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে
যাচ্ছিল। দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটার সামনে। পাশেই তাদের
মোটরবাইক। একজন অবাক গলায় প্রশ্ন করল, “কী চাই এখানে?”

বেশি উত্তেজিত হলে ইংরেজি বলতে এখনও অসুবিধে হয় অর্জুনের। সে
কিছু জবাব দেওয়ার আগেই মেজর তাঁর আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখালেন। তাতে
অভিযাত্রী হিসেবে আমেরিকান অভিযাত্রী সঙ্ঘের স্বীকৃতি রয়েছে ছবিসমেত।
পুলিশের একাংশ বোধহয় পৃথিবীর সব দেশেই অজ্ঞতায় ভোগে, নইলে যে
ভঙ্গিতে লোকটি কপালে হাত ছোঁয়াল তাতে মেজরই ঘাবড়ে গেলেন যেন।

“কী হয়েছে এখানে?” মেজরের গলার স্বর খুব ভারিক্কি শোনাল।

“অ্যাক্সিডেন্ট স্যার।” পুলিশটি জবাব দিল, “স্কিড করে এপাশে চলে
এসেছে।”

মেজর মাথা নাড়লেন। অর্জুন ততক্ষণে সটকেস নামিয়ে রেখে চলে গেছে
গাড়ির গায়ে। ভেতরে কেউ নেই। মিসেস গ্রান্টের ফ্লাস্কাটা দেখে তার বুক
কঁপে উঠল। এতক্ষণ বারংবার মনে হচ্ছিল নম্বরটা মনে রাখতে সে ভুল
করেছে কি না। ভুল হলে ভাল লাগত। এখন ওই ফ্লাস্ক সব গোলমাল করে
দিল।

এইসময় দ্বিতীয় পুলিশটি এগিয়ে এল, “এখানে আপনাদের প্রয়োজনটা
জানতে পারি?”

মেজর বললেন, “এই গাড়িটা আমার এক বান্ধবীর। বাসে যেতে-যেতে ওঁর
গাড়িটাকে দেখে আমরা নেমে পড়েছি। কখন হয়েছে ঘটনাটা?”

“কয়েক ঘণ্টা আগে। এতক্ষণে এটাকে ক্রিয়ার করা উচিত ছিল।” পুলিশ
জবাব দিল।

অর্জুন এবার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারল না, “মিসেস গ্রান্ট, মানে যিনি গাড়ি
চালাচ্ছিলেন, তিনি, তাঁর অবস্থা কীরকম?”

“ওঁকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা আমি জানি না, কারণ
দুর্ঘটনার সময় আমি এই স্পটে ছিলাম না।”

“হসপিটালটা কোথায়?”

৩৩৬

“এখান থেকে মাইল তিনেক গেলে সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন ।”

বোঝা গেল, এঁদের কাছে এরচেয়ে বেশি খবর পাওয়া যাবে না । জায়গাটা জনমানবশূন্য । কাছাকাছি একটা বাড়িও চোখে পড়ছে না । একপাশে সমুদ্র অনাদিকে সবুজ ঢেউ-খেলানো মাঠ । মেজর জিভে শব্দ করে বললেন, “ছট করে বাস থেকে নেমে বড় ভুল হয়ে গেল হে । আবার কখন বাস আসবে তার তো ঠিক নেই ।”

যেন নাগরাকাটা অথবা ওদলাবাড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মেজর, বলে মনে হল অর্জুনের । জায়গাটা যে খোদ সাহেবদের দেশ এবং সব-কিছু নিয়মে চলে এত বছর আমেরিকায় বাস করেও এই মুহূর্তে তিনি ভুলে গেছেন ।

অর্জুন সময় নষ্ট না করে রাস্তাটা দেখছিল । যদিও কয়েক ঘন্টা আগে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তবু চাকার দাগ রাস্তা ছাড়ার পর ঘাসের বুকে বসে আছে । মিসেস গ্রান্ট নিশ্চয়ই খুব জোরে ব্রেক কষেও সামলাতে পারেননি । গাড়ি যখন নীচে নামে অথবা সমান্তরাল পথে জল থাকলে চাকার গতি নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে । কিন্তু যেখান থেকে মিসেস গ্রান্ট ব্রেক কষেছেন সেখানে গাড়ি সামান্য ওপরের দিকে উঠছিল । রাস্তাটা বাঁক ঘোরার পরেই উর্ধ্বমুখী হয়েছে । এরকম জায়গায় লোকে সাবধানে গাড়ি চালাবে । মিসেস গ্রান্টের চালানো সে দেখেছে । তাঁর পক্ষে গতি হারানো বিস্ময়কর ।

সে ঝুঁকে গাড়ির চাকা দেখতে লাগল । কোথাও কোনও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে না । অবশ্য যন্ত্রের কথা বলা যায় না, ওপরে ওঠার সময় ব্রেক ফেল করতেও পারে । গাড়িটাকে সোজা করলে সেটা পরীক্ষা করা যেত । কিন্তু পুলিশ দুটো গাড়িটাকে ছুঁতে দেবে বলে মনে হচ্ছে না । অর্জুন আর-একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল ভারী দুটো চাকা ওপাশের ঘাস ছেড়ে পিচের রাস্তায় উঠে এসেছে । যেখান থেকে দাগটা শুরু হয়েছে সেখানে মাঠের ভেতরে যাওয়ার মেঠো রাস্তার মুখ । এই দুটো দাগের সঙ্গে মিসেস গ্রান্টের গাড়ির দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, তবে দাগটা যে বেশি পুরনো নয় তা পরিষ্কার ।

এই সময় দ্বিতীয় পুলিশটি হেঁকে উঠল, “ও কী করছে ওখানে ?”

মেজর গর্বিত গলায় জানালেন, “ওর নাম অর্জুন । বিখ্যাত ডিটেকটিভ । ও অবশ্য নিজেই সত্যাসন্ধানী বলে । আমেরিকায় পুরস্কৃত হয়েছে । সম্ভবত খুঁজে দেখছে এটা অ্যান্ড্রিডেন্ট কি না ।”

কথাটা শোনামাত্র পুলিশটি এগিয়ে এল অর্জুনের কাছে, “হেই মিস্টার ! তোমার লাইসেন্স দেখতে চাই ।” লোকটা হাত বাড়াল ।

“আমার তো কোনও লাইসেন্স নেই ।”

“মাই গড । লাইসেন্স ছাড়া তুমি কোনওরকম ইনভেস্টিগেশন করতে পারো না । গেট লস্ট ফ্রম হিয়ার ।” লোকটার ভঙ্গি দেখে অর্জুনের মনে হল, ও যেন

কোনও অপরাধীর সঙ্গে কথা বলছে।

অর্জুন কোনওমতে বলতে পারল, “আমার মনে হচ্ছে এটা ঠিক দুর্ঘটনা নয়।”

“তোমার কী মনে হচ্ছে, তা জানার কোনও প্রয়োজন আমার নেই। লাইসেন্স ছাড়া কোনও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এ-দেশে অ্যালাউ করা হয় না। তোমরা যদি এখনই এখান থেকে দূর না হয়ে যাও, তা হলে আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করতে পারি।”

মেজর তাঁর জিনিসপত্র তুলে নিয়েছিলেন। অতএব অর্জুনকেও তাই করতে হল। মেজর বললেন, “কী বুঝছ?”

অর্জুন বলল, “আগে হাসপাতালে গিয়ে মিসেস গ্রান্টের খবর নেওয়া দরকার।”

“সে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-জায়গাটা ছেড়ে গেলে পরের বাস কি আমাদের জন্যে দাঁড়াবে? নেক্সট বাস স্টপ কোথায় তা তো জানি না।” ওঁকে খুব কাহিল দেখাচ্ছিল।

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধ পুলিশটিকে দেখে হাঁটতে শুরু করল।

পাশাপাশি চলতে-চলতে মেজর বললেন, “ভুলেও নিচে পা রেখো না। গাড়ি চাপা পড়লে ড্রাইভারের দোষ হবে না।”

হেসে ফেলল অর্জুন। চাপা পড়ার পর কাউকে দোষী করে কী লাভ!

বাধ্য না হলে এরকম ফাঁকা জায়গায় কেউ রাস্তার পাশ ঘেঁষে হেঁটে যায় না। ফুটপাথের প্রয়োজন হয়নি সেই কারণেই। হুশাস গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? না-না, আমার কথা ছেড়ে দাও। অভিযাত্রী হিসেবে হেঁটে চলাই তো আমার নেশা। তবে সুটকেসের বদলে হ্যাভারস্যাক হলে ভাল হত।” মেজর ওটাকে হাতবদল করলেন। ওঁর কষ্টটা বুঝেও কোনও মন্তব্য করল না অর্জুন। তার মাথার ভেতরে যে চিন্তাটা পাক খাচ্ছে, তা হল ওটা কি সত্যিকারের দুর্ঘটনা? মিসেস গ্রান্ট কি বেঁচে আছেন? কিন্তু বিপরীত দিকের ঘাস চেপে বেরিয়ে আসা চাকার দাগগুলো মনের ভেতর বুজকুড়ি তুলছে।

ওরা যখন হাসপাতালের সামনে পৌঁছল তখন ঘড়ি অনুযায়ী দিন শেষ। যদিও আকাশের দিকে তাকালে সময় বোঝা যাবে না। বড় রাস্তা থেকে আর একটি ছোট রাস্তা ধরে ছবির মতো কয়েকটা কটেজ পেরিয়ে ওরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়াল। সুন্দর লন, ফুলের বাগান এবং রঙিন বাড়িটি দেখে কিছুতেই অবশ্য অর্জুনের দেখা অন্য হাসপাতালের কথা মনে পড়ছিল না। ভেতরে ঢুকে বারান্দা পার হতেই ওরা রিসেপশন কাউন্টারে পৌঁছে গেল। একজন অল্পবয়সী মহিলা সেখানে বসে ছিলেন। ওদের দেখে হেসে বললেন, “গুড ইভনিং, এনি প্রব্লেম?”

৩৩৮

মেজর সুটকেসটাকে মাটিতে রাখতে পেরে যেন বেঁচে গেলেন। হাতটাকে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললেন, “আমাদের বলা হয়েছে যে, আজ যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার ড্রাইভার মিসেস গ্রান্ট এখানে ভর্তি হয়েছেন। তিনি কেমন আছেন?”

রিসেপশনিস্ট চট করে একটা রেজিস্টারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইন্টারকমের বোতাম টিপে এমন নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন যে, অর্জুন কিছুই বুঝতে পারল না। তারপর দুঃখিত-দুঃখিত মুখ করে বললেন, “ওয়েল জেন্টলমেন, ওঁর অবস্থা ভাল নয়। ঠিক বলতে গেলে বলতে হয় খুবই খারাপ। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। আপনারা এসে আমাদের উপকার করেছেন। কারণ ওঁর বাড়িতে খবর পাঠানো হলেও এখনও সেখান থেকে কোনও রেসপন্স আমরা পাইনি। ওঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে...”

মেজর চটপট বললেন, “অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে? সর্বনাশ। কোথায় লেগেছে?”

“হেড ইনজুরি। ঘণ্টাখানেক পরে ওঁকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হবে। বাট ইউ নো, ডাক্তাররা শুধু চেষ্টাই করতে পারেন।” ভদ্রমহিলার গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছিল মিসেস গ্রান্টের বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্জুনের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মেজর চোখে রুমাল চাপলেন। তাই দেখে রিসেপশনিস্ট বললেন, “ইওর ক্লোজ রিলেশন?”

মেজর বললেন রুমাল সরাতে-সরাতে “মোর দ্যান দ্যাট। উনি আমার বন্ধু। ইন ফ্যাক্ট আমাদের জন্যেই ব্ল্যাকপুলে এসেছিলেন উনি। না এলে...”

মহিলা জানালেন যে, তিনি লোক্যাল থানায় খবর দিচ্ছেন। এসব ব্যাপারে পুলিশের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার থাকে।

মেজর যেন নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, আমরা ওঁকে একবার দেখতে পারি? জাস্ট চোখের দেখা।”

রিসেপশনিস্ট বললেন, “দেখে কী করবেন? অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে বললাম তো। তা ছাড়া ও.টি-তে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে হয়তো ইতিমধ্যে।”

মেজর বললেন, “ও.টি. থেকে যখন বের হবেন, তখন শরীরে প্রাণ থাকবে কি না কে জানে। জীবিত মানুষটাকে চোখে দেখার সুযোগ দিন অনুগ্রহ করে।”

রিসেপশনিস্ট আবার ইন্টারকমে কথা বললেন। তারপর ওঁদের জানালেন অপেক্ষা করতে হবে।

সামনের সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন মেজর। অর্জুনের খুব খারাপ লাগছিল। অল্প আলাপেই মিসেস গ্রান্টকে ওর বেশ ভাল লেগেছিল। এরকম একটা দুর্ঘটনায় উনি আহত হয়ে মারা যাবেন ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল। সে পকেট

থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতে গিয়েও থেমে গেল। এটা হাসপাতাল। এবং এই হাসপাতালের দিকে তাকালে এক চিলতে নোংরা ফেলতে ইচ্ছে করে না। জুতোর শব্দ কানে আসতেই সে দেখল, যুনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার এগিয়ে আসছেন। রিসেপশনিস্ট-মহিলা পুলিশ অফিসারদের প্রশ্নের উত্তরে মেজরকে দেখিয়ে দিতেই তাঁরা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পুলিশ অফিসারদের একজন প্রশ্ন করলেন, “এক্সকিউজ মি, আপনারা এদেশের নাগরিক?”

মেজর মাথা নাড়লেন, “না। আমরা বেড়াতে এসেছি।”

“অ্যাক্সিডেন্ট য়াঁর হয়েছে সেই মিসেস গ্রান্টকে আপনারা চেনেন?”

“হ্যাঁ। উনি আমার বন্ধু। অনেকদিনের আলাপ।”

“আপনাদের সঙ্গে ওঁর শেষ দেখা হয়েছিল কখন?”

“আজ সকালে, আমার হোটেলে। তারপর উনি ওঁর বান্ধবীর বাড়িতে যাবেন বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান।”

“বান্ধবীর বাড়িটি কোথায়?”

মেজর মোটামুটি জায়গাটা জানালেন। পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, “সকালে ঠিক কখন উনি আপনাদের কাছ থেকে চলে এসেছিলেন?”

“ঘড়ি দেখিনি। তবে দশটার এদিকে নয়।”

“অথচ ওঁর দুর্ঘটনা ঘটে বিকেলে। সরাসরি চলে এলে ওই স্পটে ওঁর আসতে এত দীর্ঘ সময় লাগে না। তা ছাড়া ওঁর বান্ধবীর বাড়ি যে দিকটায় বললেন, সেদিকে উনি যাননি। এই রাস্তা তার উলটো দিকে। ওঁর জ্ঞান না ফিরলে আমরা কিছু জানতে পারছি না। কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে আশা করি সহায়তা পাব।”

“নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার কথা শুনে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।” মেজর বললেন।

দ্বিতীয় অফিসার ওদের পাশপোর্ট দেখতে চাইলে সেগুলো বের করে দেওয়া হল। ভদ্রলোক ওই দুটো উলটে-পালটে দেখে নম্বর নোট করে নেওয়া মাত্র একজন নার্স দরজায় এসে দাঁড়ালেন। রিসেপশনিস্ট বললেন, “আপনারা ওঁর সঙ্গে গিয়ে ঠিক তিরিশ সেকেন্ডের জন্যে চোখের দেখা দেখতে পারেন।”

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, “ওঁর সেন্স কি ফিরেছে?”

নার্স মাথা নেড়ে নীরবে না বললেন। পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার হতাশায় কাঁধ ঝাঁকালেন। অর্জুন আর মেজর প্রায় নিঃশব্দে নার্সকে অনুসরণ করে অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে ইমার্জেন্সি লেখা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই নার্স তাদের কাচের জানলার কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

দুটো সাদা ধবধবে বিছানা। একটিতে একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে। অপরটিতে মিসেস গ্রান্ট। মাথায় ব্যান্ডেজ। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই

অর্জুনের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ ছিটকে উঠল। যদিও মাঝখানে জানলার পরিষ্কার কাচ, তবু দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। মেজর অশ্রুটে উচ্চারণ করলেন, “আরে এ কী !”

অর্জুন ঠাঁর হাত আঁকড়ে ধরল। তারপর নিচু গলায় বলল, “চুপচাপ বাইরে বেরিয়ে চলুন।”

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিছানায় যিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন সেই মহিলা কোনওকালেই মিসেস গ্রান্ট নন।

মার্শাল-সাহেবের ঠিকানা পুলিশ-অফিসারকে জানিয়ে ওরা যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, তখন আলো মরে গেছে কিন্তু অন্ধকার নামেনি। এর মধ্যে কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীটাকে আরও বাকঝাকে লাগছে। বাস-স্টপে এসে দাঁড়াতেই মেজর মুখ খুললেন। যেন এতক্ষণ কথা না বলতে পেরে দমবন্ধ হয়ে আসছিল ঠাঁর, “কী ব্যাপার বলো তো? আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।”

অর্জুন বলল, “আমিও পারছি না।”

“মিসেস গ্রান্ট গাড়ি চালিয়ে এদিকে এলেন, অ্যাক্সিডেন্ট করলেন, অথচ তাঁর জায়গায় অন্য মহিলা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রইল, তাজ্জব ব্যাপার। কিন্তু পুলিশকে আমাদের বলা উচিত ছিল যে, উনি মিসেস গ্রান্ট নন। তুমি চেপে যেতে বললে কেন?”

অর্জুন এই প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিল। জবাব দিল, “পুলিশ গাড়ির কাগজপত্র দেখে ধরে নিয়েছে, উনি মিসেস গ্রান্ট। যদি অন্য কারও সেই ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমরা পুলিশকে জানালেই সেটা তাদেরও জানতে অসুবিধে হবে না। এইটে আমি এখনই চাইছিলাম না। তা ছাড়া যে ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন, তাঁকে আপনি কি আগে কখনও দেখেছেন?”

মেজর মাথা নাড়লেন, “না। অবশ্য ব্যান্ডেজ থাকায়..., তবু, না! কিন্তু কেন বলো তো?”

“সেই জনেই আমি বলিনি। আমার পরিষ্কার মনে হল, উনি মিসেস গ্রান্টের ব্ল্যাকপুলের বান্ধবী। খুব মিল আছে ঠাঁদের চেহারায়! আপনি এবার মনে করে দেখুন তো!”

মেজরের চোখে-মুখে দাড়ি সত্ত্বেও চিন্তিত ভাবটা পরিষ্কার ফুটল। তারপর তিনি ঘড়ি দেখে পা বাড়াতেই অর্জুন বাধা দিল, “আরে, কোথায় যাচ্ছেন?”

“তোমার কথা মনে হচ্ছে অর্ধেক ঠিক। আর একবার নিজের চোখে দেখে আসি।”

“পাগল হয়েছেন! এবার দেখতে চাইলে ওরা কারণ জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেবেন? তার চেয়ে আমাদের এখনই ব্ল্যাকপুলে ফিরে যাওয়া উচিত,”

অর্জুন বলল।

“ব্ল্যাকপুলে!” মেজর আঁতকে উঠলেন, “পাগল! দুপুর থেকে মার্শাল আমার অপেক্ষায় বসে আছে। জীবনে এই প্রথমবার আমি সময় রাখতে পারলাম না। আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে।”

অর্জুন অনেক দূরে বাসের হেডলাইট দেখতে পেল, “আপনার বান্ধবীর ঠিক কী হয়েছে, তা না জেনেই চলে যাবেন? আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়?”

“কী কাজ?” মেজরও বাসটাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

“আপনি আজ চলে যান মার্শাল-সাহেবের কাছে। আমি ব্ল্যাকপুলে ফিরে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে কাল আপনার কাছে আসছি।”

“মাথা খারাপ! তুমি ইংল্যান্ডের কিস্‌সু চেনো না। তারপর যখন মনে হচ্ছে কেউ বা কারা আমাদের পেছনে লেগেছে, তখন একা যাওয়া উচিত হবে না।”

“আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন।”

“বলছ?” কথা বলতে-বলতে বাসটা এসে দাঁড়াল স্টপে। মেজর দু’পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন, “না হে। তোমাকে ছেড়ে আমি একা যেতে পারব না।”

ব্ল্যাকপুলে যখন ওরা ফিরে এল তখন ঘড়িতে রাত বেশি না হলেও শহরটার দিকে তাকিয়ে মনে হল মাঝ-রাত পেরিয়ে গেছে। একটিও মানুষ নেই রাস্তায়। দোকানপাট বন্ধ। এমনকী গাড়ির চলাচল খুব কমে এসেছে। বাস টার্মিনাল থেকে বের হওয়া মাত্র ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে ঠাণ্ডা নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। মেজর বললেন, “আগের হোটেলটা অনেক দূরে, কাছে-পিঠে কোথাও ওঠা যাক।”

কয়েক-পা এগিয়েও যখন কোনও সাইনবোর্ড চোখে পড়ল না, তখনই বৃষ্টির দাপট বাড়ল। কোনও রকমে একটা ছাউনির তলায় মাথা বাঁচাতে ঢুকে গেল ওরা দুজনে। মেজর বাইরের বৃষ্টি, অন্ধকার-নামা নির্জন রাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আইডিয়াল নাইট ফর ক্রাইম।”

এই সময় দুটো হেডলাইট বৃষ্টির ফোঁটা কাটাতে-কাটাতে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছিল ওপাশের রাস্তা ধরে। গাড়িটা ওদের পাশ কাটিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে স্থির হয়ে রইল। মেজর বললেন, “মনে হচ্ছে পুলিশের জিপ। রোঁদে বেরিয়েছে।”

পুলিশ শব্দটা শুনে অর্জুন ভাবল তা হলে ওদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়, কাছাকাছি ভাল হোটেল আছে কি না। তারপরেই মনে হল জিপটা আলো নিভিয়ে চূপচাপ জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আর তখনই জিপের হেডলাইট দু’বার জ্বলল এবং নিভল। অর্জুন ধন্দে পড়ল। সমুদ্রের জলের ওপর হেডলাইটের আলো সান্দ্রতাবাধে ফেলার কোনও মানে আছে কি? ৩৪২

পুলিশ হলে এমন কাজ করবে কেন ? কয়েক মিনিট বাদেই একটা মোটরবোটের আওয়াজ পাওয়া গেল । সমুদ্রের ওপর অন্ধকার এবং বৃষ্টি মেশামেশি হওয়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না । কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই মোটর-বোটের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই জিপ পাক খেয়ে শহরের দিকে ফিরে গেল দ্রুতগতিতে । মেজরও যেন ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন । অর্জুনের হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, “পুলিশ নয় । এরা কিছু পাচার করল বলে মনে হচ্ছে । দেখবে নাকি ?”

“এখন দেখে আর কী হবে ?” অর্জুন উৎসাহিত হচ্ছিল না ।

মিনিট-দশেক পরে ওরা একটা গেস্ট হাউসের নোটিস-বোর্ড দেখতে পেল । গেট খুলে বাঁধানো চাতাল ডিঙিয়ে কাঠের বাংলা টাইপ বাড়ির দরজায় মেজর আঘাত করলেন । অর্জুন বলল, “কলিং বেলের বোতামটা টিপুন ।”

কিন্তু বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ওপাশের একটা জানলা খুলে গেল । একজন বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, “হু ইজ দেয়ার ? ওঃ ! চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে দুটো শার্কের পেট ভরে যাবে, কিন্তু মাথায় ঈশ্বর পুঁটিমাছের খাবারও দেয়নি ? বোতামটা দেখতে পাচ্ছ না ?”

“কী ? আমি শার্ক ?” মেজর হুঙ্কার ছাড়লেন বাড়ি কাঁপিয়ে ।

অর্জুন খপ করে মেজরের হাত ধরল, “না, না, আপনাকে উনি শার্ক বলেননি ?”

বৃদ্ধা বললেন, “বলাই উচিত ছিল । না বলে ভুল করেছি । গলার স্বর দ্যাখো, জীবনে মিষ্টি কী জিনিস বোধহয় চেখেও দ্যাখিনি ।”

মেজর বললেন, “মিষ্টি ? মিষ্টি দেখাচ্ছেন আমাকে ? আপনার গলা কী ? পিলে চমকে যায় । চলো, অর্জুন ! এখানে থাকব না । অভদ্র, সভ্যতা শেখিনি ।”

অর্জুন তখনও হাত ছাড়েনি, বলল, “উনি একজন মহিলা, কী বলতে কী বলেছেন ।”

বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, “ঠিক বলেছি । তবে শার্ক বলিনি । শার্কের খাবার বলেছি ।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “শুনলেন তো । আপনাকে শার্ক বলেননি ।”

“অ ।” মেজর একটু বিচলিত হলেন, “শার্কের খাবার ! শার্কের খাবার আবার কী ? কী খায় শার্ক ?”

“আচ্ছা জ্বালা । এই ছমদো লোকটার সঙ্গে কে কথা বলতে চাইছে ! এই যে থোকা, তোমাকে বলছি, দয়া করে বলবে রাত দুপুরে দরজা ভাঙতে চাইছে কেন ?” বৃদ্ধার গলার স্বর নীচে নামল ।

অর্জুন বলল, “ওই সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলাম দিদিমা, আমাদের থাকার ঘর চাই ।”

“তাই বলো । এই ছোট্ট কথাটা ছোট্ট করে বললেই হয় । শরীর বড় হলেই যে বেশি কথা বলতে হবে এমন দাবি কে দিয়েছে । একটা ঘর হলেই চলবে ? সকালে ব্রেকফাস্ট পাবে রুটি ডিম জ্যাম কর্নফ্লেক্স আর দুধ । ব্যস । মাথা-পিছু আট পাউন্ড ।”

মেজর বোধহয় শরীর নিয়ে কথা বলায় আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন তার আগেই বলে উঠল, “খুব ভাল । আপনার মতো মানুষ হয় না দিদিমা ।”

“সে-কথা বলো ।” গজগজ করতে-করতে বৃদ্ধা দরজা খুলে একবার আড়চোখে মেজরকে দেখে বাঁ হাত তুলে ঘরটা দেখিয়ে দিলেন । বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না । কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওরা ঘরে ঢুকতেই মেজর বললেন, “অন্য সময় এবং পরিস্থিতি এরকম না হলে আমি কিছুতেই এখানে থাকতাম না । যাক, দুটো বিছানা আছে তা হলে ।”

ঘরটি চমৎকার । কাচের জানলায় দাঁড়ালে সমুদ্র দেখা যাবে, যদিও এই বৃষ্টির রাত্রে বাইরেটা ঘষা অন্ধকার । অর্জুন তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে ভেজা জামা পালটে নিয়ে মাথা মুছে নিল । এইসময় বাইরে বৃদ্ধার গলা বাজল, “সেই ভাল ছেলেটা কোথায় ?”

মেজর জবাব দেওয়ার আগেই অর্জুন বেরিয়ে এল । এসে হাঁফ ছাড়ল । মেজর ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন । বৃদ্ধা প্রশ্ন করা সত্ত্বেও চোখ খোলেননি । অর্জুনকে দেখে বৃদ্ধা বললেন, “ছুট করে ঢুকে গেলেই তো চলবে না । এই খাতায় লিখতে হবে কোথেকে এসেছ, নাম-ধাম । এত রাত্রে কোথেকে উদয় হলে ?”

মেজর বললেন, “জাহান্নাম থেকে ।”

“তা বুঝেছি । সেটাই তো উপযুক্ত জায়গা ।”

অর্জুন বলল, “আমাদের এক পরিচিতা মহিলার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে খবর পেয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি বোস্টন থেকে । আমি সই করলেই হবে তো ?”

“বোস্টন থেকে হঠাৎ এত লোকজন এখানে আসছে ?”

“আরও লোক এসেছে বুঝি ?”

“ওই তো প্রোফেসর হ্যাচ এবং তাঁর বন্ধু জিপ নিয়ে এসেছেন ।”

“জিপ নিয়ে ?”

“হ্যাঁ । কীসব রিসার্চের ব্যাপার ।”

সইটাই হয়ে গেলে বৃদ্ধা আর-একবার মেজরের দিকে তাকালেন । তারপর বললেন, “মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে দুজনের পেটে কিছুই পড়েনি ।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ । আমাদের কিছুই খাওয়া হয়নি ।”

“আমার কিছু করার নেই । কাল ব্রেকফাস্ট অবধি না খেয়ে থাকো ।” বৃদ্ধা

চলে গেলেন কাঠের পাটাতনে শব্দ করে ।

মেজর এবার উঠে বসলেন, “এ-ঘরে টেলিফোনও নেই । মিসেস গ্রান্টের খবর নেবার জন্যে আমরা ব্ল্যাকপুলে ফিরে এসেছি—ওই বুড়ির গালাগাল শুনতে নয় ।”

অর্জুন বলল, “কিন্তু এত রাত্রে যাবেন কী করে ? রাস্তায় তো কোনও গাড়ি নেই ।”

মেজর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কাঁধ নাচালেন । তারপর উঠে বাথরুমে চলে গেলেন । খাবারের কথা ওঠার পর অর্জুনের খিদেটা যেন চাগিয়ে উঠল । সিগারেট ধরাতে আরও বিশ্বাস লাগল সেটা । শীত বেড়েছে বেশ । সে এপাশের জানলায় এল । হলদে আলোয় পোর্টিকোটা দেখা যাচ্ছে । তার এক কোণে একটা জিপ । হঠাৎ অর্জুনের মনে হল অধ্যাপক হ্যাচ নামের লোকটা বোস্টন থেকে জিপে এসেছে এখানে বন্ধুকে নিয়ে । এই লোকটা কে ? অধ্যাপকরা কি এদেশে জিপ চালান ?

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার মিনিট-তিনেক বাদেই মেজরের নাক ডাকতে লাগল । পেটে খাবার না পড়া সত্ত্বেও একটি মানুষ এত তাড়াতাড়ি কী করে ঘুমোতে পারে ? অর্জুনের কিছুতেই ঘুম আসছিল না । মিসেস গ্রান্টের নিশ্চয়ই এমন কোনও বিপদ ঘটেছে যা জানাতেই ওঁর বন্ধু মার্শাল-সাহেবের কাছে যাচ্ছিলেন । তিনি নিশ্চয়ই জেনেছিলেন অর্জুনরা মার্শাল-সাহেবের কাছেই গিয়েছে । নইলে ওই রাস্তায় ভদ্রমহিলার যাওয়ার কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । কী ঘটেছে মিসেস গ্রান্টের ?

বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করল অর্জুন । আর এইসময় অমল সোমের কথা মনে পড়ল । অমলদা কি এখনও জলপাইগুড়িতে ? এই পরিস্থিতিতে পড়লে অমলদা কী করতেন ? অর্জুন চোখ খুলল । তারপর তড়াক করে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে । সমস্ত বাড়ি অন্ধকারে চূপচাপ । সে বাথরুমে ঢুকে পড়ল আলো না জ্বলে । এদিকে একটা দরজা দেখেছিল খানিক আগে । জমাদারের জন্যেই সম্ভবত করা হয়েছে । সেইটে খুলে ও নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল । ঠাণ্ডা যেন শরীরে করাত চালাচ্ছে । পোর্টিকো ডিঙিয়ে অর্জুন জিপের গায়ে পৌঁছে গেল । ওপরে শেড থাকা সত্ত্বেও জিপের শরীরে জল । তার মানে এটি বেশি আগে ফেরেনি । চাকাং হাত দিয়ে সমুদ্রের বালি পেল অর্জুন । জিপের ভেতরে উকি মারতে গিয়ে চমকে উঠল সে ।

গাড়ির সিটের ওপর রাখা একটা বেতের ঝাড়ি থেকে হিসহিস শব্দ বের হচ্ছে ।

অর্জুন চারপাশে তাকাল । বৃষ্টি থেমে গেছে । পৃথিবীতে ঘন কুয়াশা নেমে এসেছে । আর একমাত্র গাড়ির ভেতর থেকে ছটকে আসা ভ্রূদ্ধ শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই । অর্জুন কেঁপে উঠল । যতটা না ঠাণ্ডার

কারণে ঠিক ততটাই ওই শব্দের তীব্রতায়। সে বুঝতে পারছিল না বুড়িতে কী রয়েছে ? প্রোফেসর হ্যাচ কেন এইরকম বেতের বুড়ি সিটের ওপর রেখে যাবেন যার ভেতর একটি রাগী প্রাণী গর্জে যাচ্ছে ! নাকি অর্জুনের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই গর্জন বাড়ছে ?

টুক করে একটা আলো জ্বলে উঠল দোতলার জানলায়। কুয়াশা মাথা কাচে আলো ঝাপসা দেখাচ্ছে। অর্জুন চট করে সরে এল গাড়িটার কাছ থেকে। গ্যারাজের থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দ্বিতীয়বার জানলার দিকে তাকাতেই একটা অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পেল। সে সরে আসায় বুড়ির ভেতরের আওয়াজ কমে এসেছে। এখন পনেরো ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়েও সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। এর পরেই কাঠের দরজা খোলার শব্দ হল। অর্জুন আর ঝুঁকি নিল না। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব ততটা আওয়াজ বাঁচিয়ে সে ঘরে ফিরে এল। দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে আসতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। লম্বা ঝাপসা মূর্তি। আধা অন্ধকারে মুখ দেখার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু সে শিস শুনতে পেল। ছায়ামূর্তি যেন শিস দিয়ে প্রাণীটিকে শাস্ত করতে চাইছে। তারপর লোকটা কয়েক পা এগিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। সম্ভবত জরিপ করতে চাইল চারপাশ। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অর্জুন লোকটাকে যখন ফিরে যেতে দেখল, তখন ঘড়িতে অনেক রাত।

মেজর জানান দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বেশি খিদে পেলেও যে মাঝে-মাঝে গভীর ঘুম আসে তা এখন ঠুকে দেখলে বোঝা যাবে। এই মাঝরাতে মেজরকে জাগিয়ে ঘটনাটা বলা ঠুঁর খিদে-বোধটাকে আবার ফিরিয়ে আনা। অর্জুন নিজের বিছানায় ফিরে এল। কিন্তু ঘুমের কোনও চিহ্ন নেই। এখন মাথার ভেতরে প্রশ্নগুলো কিলবিল করছে। মিসেস গ্রান্টের গাড়ি নিয়ে তাঁর বন্ধু ওই হাইওয়ে ধরে কোথায় যাচ্ছিলেন ? ভদ্রমহিলা কি সত্যিই মিসেস গ্রান্টের বন্ধু ? কারণ ব্যান্ডেজের ফাঁকে খুব অল্পই সে দেখতে পেয়েছিল। কাল সকালেই মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সমুদ্রের ধারে ওইরকম রহস্যজনকভাবে প্রোফেসর হ্যাচ নামক ভদ্রলোকটি কেন তাঁর জিপ নিয়ে গিয়েছিলেন ? সেই জিপের মালিক যে প্রোফেসর হ্যাচ তার অবশ্য প্রমাণ নেই। জিপের চাকায় এ-অঞ্চলের বালি লাগতেই পারে। কিন্তু ভদ্রলোক গাড়ির সিটে একটি ক্রুদ্ধ প্রাণীকে বুড়িতে বন্দী করে রেখেছেন কেন ? সাপ কিংবা বেজি বুড়িতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি এদেশে বেআইনি নয় ? অধ্যাপকরা এসব পুষবেন কেন ? তা ছাড়া উনি এসেছেন বোস্টন থেকে। একই সঙ্গে ঠুঁর আসাটা কি কাকাতালীয় ? আর তারপরেই খেয়াল হল প্রাণীটি যে স্বরে গর্জন করছিল তাতে তো কারও ঘুম ভাঙেনি। ছায়ামূর্তি যদি প্রোফেসর হ্যাচ হন, তা হলে ঠুঁর ঘুম ভাঙল কী করে ? ঠুঁকে কেন এই শীতের মধ্যেও মাঝ রাত্রে যেতে হল খোঁজখবর করতে ? কী করে ভদ্রলোক বন্ধ ঘরে

বসেও এই শব্দ শুনতে পেলেন। এই মুহূর্তে অমল সোমের কথা মনে পড়ে গেল তার। অমলদা থাকলে যে কী ভাবে এগোতেন কে জানে! অর্জুন খুব অসহায় বোধ করছিল।

ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। কঞ্চল সরিয়ে অর্জুন দেখল মেজর বিছানায় নেই। বিদেশে এসে তাকে কতগুলো নিয়মে অভ্যস্ত হতে হয়েছে যা জলপাইগুড়িতে কোনওদিন চিন্তাও করেনি। যেমন বাথরুমের মেঝেতে জল ফেলা যাবে না, কারণ তাতে কার্পেট ভিজবে। স্নান করতে হলে পরদা টেনে বাথটাবে উঠে পড়ো। কিন্তু আরামে ঠাণ্ডা-গরম জল মিশিয়ে স্নান করার কথা সে কি কখনও ভেবেছিল! আর এদেশের বাথরুমের কায়দাকানুন মাথা খারাপ করে দেয়। আমেরিকায় একবার টয়লেটে ঢুকে ফ্ল্যাশের বোতাম খুঁজে পেতে তাকে কি কম নাজেহাল হতে হয়েছিল? অথচ জিনিসটা ছিল পায়ের তলায়, একটু চাপ দিতেই হুড়মুড়িয়ে জল নেমেছিল।

একবারে স্নান করে বাইরে বেরোতেই শরীর বেশ তাজা লাগল। এবং তখনই দরজায় শব্দ বাজল! চুল আঁচড়ানো নেই। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে সেটাকে ভদ্রস্থ করে দরজা খুলতেই বৃদ্ধাকে দেখতে পেল সে। এখন বৃদ্ধার স্কাটের ওপর একটা সাদা অ্যাপ্রন বাঁধা। হেসে বললেন, “গুড মর্নিং! বাঃ, তোমার স্নান হয়ে গেছে! বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে। আমার তো বেরিয়ে পড়তে খুব ইচ্ছে করছিল। তা কাল রাতে ঘুম হয়েছিল তো? হবে কী করে! তোমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি! দয়া করে ডাইনিং রুমে চলো এসো।”

কথাগুলো এমন তোড়ে বলে গেলেন যে, বোঝা গেল উত্তরের জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর নজর পড়েছে মেজরের বিছানার পাশে ছোট টেবিলের ওপর রাখা চুরুটের প্যাকেটের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি, “ইশ! কীভাবে বোকা লোকগুলো পয়সা আর শরীর নষ্ট করে। ওগুলো নিশ্চয়ই তুমি খাও না?”

অর্জুন মাথা নাড়ল। ভদ্রমহিলা বললেন, “কক্ষনো খেয়ো না। তোমাকে দেখলে বেশ ভাল ছেলে বলে মনে হয়। এবার তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো।”

অর্জুন কিন্তু-কিন্তু করে বলল, “দিদিমা...” সঙ্গে-সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়ে মহিলা চৈতন্যে উঠলেন, “কাল থেকে শুনছি তুমি দিদিমা-দিদিমা করছ! আমার নাম এলিজাবেথ, তুমি আমাকে লিজা বলে ডাকতে পারো। অবশ্য অনেকেই আমায় মিসেস ব্রাউন বলে ডাকে।”

ষাট বছরের একজন মহিলাকে সে নাম ধরে ডাকবে কী করে? বরং মিসেস ব্রাউন বলে ডাকা অনেক বেশি সুবিধেজনক। কাল রাতে যাকে অনেক বেশি বয়স্কা বলে মনে হচ্ছিল আজ সকালে ততটা মনে হচ্ছে না। তবে এদেশের বৃদ্ধারা নিজেদের যতটা শক্ত-সমর্থ রাখতে চান ততটা আমাদের দিদিমা-ঠাকুমারা

চান না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “মিসেস ব্রাউন! আমার সঙ্গী মেজরকে কি আপনি আজ সকালে দেখেছেন?”

“না দেখলেই ভাল হত। দিনটা যে কেমন যাবে তাই ভাবছি।” মিসেস ব্রাউন মুখ ঘোরালেন।

অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। সকালে উঠে কারও-কারও মুখ দেখা নাকি অযাত্রা, এমন বিশ্বাস ভারতবর্ষের মানুষের থাকে। কিন্তু সেটা ইংল্যান্ডের একজন বয়স্ক মহিলাও যে বলবেন তা কে জানত।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল আবার, “উনি কি কিছু বলে গিয়েছেন? আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম।”

“হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করল ব্রেকফাস্ট কখন পাওয়া যাবে! আমি বললাম, আটটা থেকে নটা পর্যন্ত এখানে ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায়। সঙ্গে-সঙ্গে উনি রওনা হয়ে গেলেন। যতই পেটে খিদে থাকুক অত সকালে কোনও ভদ্রলোক খেতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না।” মিসেস ব্রাউন কয়েকবার মাথা নাড়লেন।

অর্জুন বলল, “কিন্তু আমাকে তো ওঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, মানে ব্রেকফাস্টের জন্যে।”

মিসেস ব্রাউন এগিয়ে এলেন কয়েক পা, “আমি তোমার ভদ্রতাবোধের প্রশংসা করছি, কিন্তু এর দাম দিতে তুমি আজ সকালের ব্রেকফাস্টটা মিস করতে পারো।” কথা শেষ করে প্রায় ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

অর্জুন বুঝতে পারছিল না কী করবে। খিদে লেগেছে খুব। গায়ে জল পড়ার পর সেটা আরও চিড়বিড়ে হয়েছে। মেজর যে কোথায় চলে গেলেন না জানিয়ে! হঠাৎ মনে পড়তেই সে দৌড়ে জানলার কাছে ছুটে গেল। জিপটা নেই। বোকার মতো সে কিছুক্ষণ শূন্য পার্কিং প্লেসটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

মিনিট পাঁচেক পরে সেজেগুজে অর্জুন ঘরের বাইরে পা রাখল। সদর দরজার পাশেই যে খাওয়ার ঘর, তা কাল রাত্রে বুঝতে পারেনি। সেখানে এখন দুটো পরিবার খাবার খাচ্ছে। মাঝখানের টেবিলে অনেকগুলো প্লেটে পাউরুটি, জেলি, মাখন, মাংস সেক্স, দুধ, কর্নফ্লেক্স, হ্যামের ফালি এবং আপেল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেখামাত্র জিভে জল এল এবং সেইসঙ্গে মেজরের ওপর রাগ। ভদ্রলোক না জানিয়ে নিজে খিদে মেটাতে চলে গেলেন। এই নিজের খাবার নিজে নাও কায়দাটা খুব ভাল। যত ইচ্ছে খাওয়া যায়, চাইবার লজ্জাটা আসে না। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে দরজার দিকে পা বাড়াতেই খুশি হল অর্জুন। শিস দিতে-দিতে মেজর ফিরছেন। মাথায় টুপি, সমস্ত শরীর অলস্টার জাতীয় পোশাকে ঢাকা। ওকে দেখামাত্র হাত নেড়ে চিৎকার করলেন, “সুপ্রভাত।”

অর্জুন মাথা নেড়ে অভিযোগটা জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মেজর বললেন, “মিসেস গ্রান্টের কিছু হয়নি।”

থতমত হয়ে গেল অর্জুন, “আপনি গিয়েছিলেন ?”

মেজর দাড়িতে হাত বোলালেন, “নো। টেলিফোনে কথা বললাম। আমরা এখনও এখানে আছি শুনে উনি অবাক। ভদ্রমহিলা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। যাচ্ছ কোথায় ?”

“আপনাকে খুঁজতে। মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী... ?” অর্জুনের প্রশ্নটা শেষ করা হল না। তার আগেই মিসেস ব্রাউন উদিত হলেন, “এই যে, বয়সের সঙ্গে যে বোধবুদ্ধি চলে যাবে এটা কেমন কথা ? এই বাচ্চা ছেলেটা কাল থেকে না খেয়ে রয়েছে সেটা মনে নেই ? নিজের তো খেতে যাওয়া হয়েছিল, আর এ এত ভাল যে একা খেতে যাচ্ছে না। যাও বাচ্চা, তুমি বসে পড়ো।” শেষের কথাগুলো অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে।

কিন্তু ততক্ষণে মেজর তিড়বিড়িয়ে উঠেছেন, “কী ? আমি খেয়ে এলাম ? আপনি দেখেছেন আমাকে খেতে ? আমি গিয়েছিলাম মিসেস গ্রান্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে। এমন একটা জায়গা করেছেন যেখানে টেলিফোনও নেই। মিসেস গ্রান্ট তো আপনারই বয়সী অথচ কত নরম মনের মানুষ।”

“এখানে টেলিফোন নেই ? আমার অফিস-ঘরে টেলিফোন নেই ? কিন্তু সেটা আর আপনাকে ব্যবহার করতে দেব না। শুনুন, আপনি নিশ্চয়ই অবিবাহিত ?” চোখ ছোট করলেন মিসেস ব্রাউন।

“হ্যাঁ, তাতে কী হল ?” মেজর এবার স্তিমিত।

“ঠিক ধরেছি। অবিবাহিত বুড়োগুলো এই রকম হয়। আমাকে মিসেস গ্রান্ট দেখাচ্ছে ! মিসেস গ্রান্ট ? নামটা বেশ চেনা লাগছে। ও, প্রোফেসর হ্যাচ ওর বন্ধুকে বলছিল।” মিসেস ব্রাউন চোখ বন্ধ করে বললেন।

অর্জুন উৎসাহিত হল, “প্রোফেসর হ্যাচ কী বলছিলেন মিসেস ব্রাউন ?”

“বেশি কিছু শুনিনি। প্রোফেসর বলছিলেন, ভদ্রমহিলার খবর নিতে। আমাকে দেখে আর কথা বাড়াননি।”

“প্রোফেসর হ্যাচ কোথায় ?”

“খুব ভাল মানুষ। আজ অবধি সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। বলেছেন, ফিরলে আবার আমার এখানেই থাকবেন। কেউ একবার এখানে থাকলে তো আর অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না।”

মেজর খপ করে অর্জুনের হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে এলেন খাওয়ার ঘরে। ব্যাপারটা সরাসরি মিসেস ব্রাউনকে উপেক্ষা করা। অর্জুনের খারাপ লাগল। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কিছু করার নেই। সে শুধু মেজরকে বলল, “আপনি ঠুকে পছন্দ করছেন না কেন ?”

“পছন্দ ? আমি করছি না ? তুমি কি অন্ধ ? দেখলে না আমাকে দেখামাত্রই উনি কীভাবে বাঁকা-বাঁকা কথা বললেন ? কালরাত্রে দ্যাখানি ? নাও, খাওয়া শুরু করা যাক।”

একে ব্রেকফাস্ট না বলে লাঞ্চ বলাই ঠিক। যে পরিমাণ খাবার মেজর নিয়েছেন তা দুপুরেও খেতে পারত না অর্জুন। অবশ্য সে নিজেও কম নেয়নি। এবং বিকেলের আগে খাওয়ার প্রস্তুতি ওঠে না। এই খাবারটা ঘর-ভাড়ার মধ্যেই পড়ছে। কিন্তু অর্জুনের আর তর সইছিল না। মেজর মুখভর্তি খাবার নিয়ে চোখ বন্ধ করে চিবিয়ে যাচ্ছেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “মিসেস গ্রান্টের বাস্কবী খবরটা উনি জেনেছেন?”

দু'বারের চেষ্টায় মেজর কথা স্পষ্ট করলেন, “টেলিফোনটা তো সেই মহিলা প্রথমে ধরেছিলেন।”

অর্জুন হাঁ হয়ে গেল, “মিসেস গ্রান্টের বাস্কবী?”

মাথা নাড়লেন মেজর। খাবারটা গলা দিয়ে নামিয়ে বললেন, “উনিই তো মিসেস গ্রান্টকে ডেকে দিলেন।”

“তা হলে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যিনি শুয়ে আছেন তিনি কে?”

“নামটা জানি না। তবে তিনিই মিসেস গ্রান্টের গাড়িটা চুরি করেছেন।”

“গাড়ি চুরি? এদেশে হয়?”

এবার মেজর এমন জোরে হেসে উঠলেন ওপাশের টেবিলের মানুষেরা চমকে এদিকে তাকাল। মেজর বললেন, “পৃথিবীর সব দেশের চোর-ডাকাত-খুনির চেহারা একরকমের। যা হোক, মিসেস গ্রান্ট পুলিশের কাছে নালিশ করেছিলেন। কাল মাঝরাাত্রের পুলিশ খবরটা ওঁকে পৌঁছে দিয়েছে। উনি একটু বাদেই এখানে আসছেন। তোমার দেখছি স্নানটান হয়ে গিয়েছে। আমি খেয়েদেয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।”

“মিসেস গ্রান্ট এখানে কেন আসছেন?”

“বাঃ। উনি দেখতে চান কে চুরি করেছে। গাড়িটাও ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। আমরা ওই পথে যাব যখন, তখন উনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।” মেজর এবার খাওয়ায় মন দিলেন।

অর্জুন ঠিক করল মিসেস গ্রান্ট এলে ওঁকে নিয়ে প্রথমে ব্যাঞ্চে যাবে। লকারে কী আছে না জেনে স্ল্যাকপুল ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না।

খাওয়া শেষ করে মেজর নিজের ঘরে চলে গেলে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। মেয়ে গাড়ি-চোর কেন মিসেস গ্রান্টের গাড়ি চুরি করে ওই পথে যাবে এবং কে তাকে দুর্ঘটনার মধ্যে ফেলল এই রহস্য সেই মহিলার সঙ্গে কথা না বললে জানা যাবে না। হয়তো এটা চোরদের রেবারেবি। জিপটা গত রাত্রে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে নীচে তাকাল সে। জায়গাটা বাঁধানো না হওয়ায় জিপের চাকার দাগ এখনও রয়ে গেছে। সে মন দিয়ে চাকার দাগগুলো লক্ষ্য করল। ডান দিকের একটা চাকার তলায় নিশ্চয়ই খানিকটা অংশ কাটা রয়েছে কোনও কারণে। ছাপটা পড়ার সময় সেই অংশ মাটিতে চেপে বসেনি।

অর্জুন ধীরে-ধীরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই সকালেও চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। রোদ উঠেছে বেশ মিঠে। এমনকী, সমুদ্রতীর চেহারাও ঝকঝকে দেখাচ্ছে। ওদিকের ফুটপাথ ধরে একজন সর্দারজি স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে হাঁটছেন। ওদের দেখে বড় লাগল অর্জুনের। এই বিদেশে একজন ভারতীয়কে দেখলে আত্মীয় বলে মনে হয়। চণ্ডীগড় আর জলপাইগুড়ি যেন পাশাপাশি হয়ে যায়।

পেট ভর্তি, শরীরে আরাম, অর্জুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর পায়চারি করার মতো হাঁটতে-হাঁটতে একটা প্লে হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল। এই সকালেই বেশ ভিড় জমে গেছে সেখানে। ভেতরে ঢুকে মজার খেলাগুলো দেখতে লাগল সে। একটা বস্ত্রের মধ্যে ছোট-ছোট নানান প্রয়োজনের জিনিস আছে। একটা দশ পেনির কয়েন গর্তে ফেললে চিমটে নেমে আসবে। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চিমটে দিয়ে যে-কোনও একটা জিনিস তুলে নাও। চিমটেটা আপনি উলটো দিকে চলে গিয়ে গর্ত দিয়ে জিনিসটা বের করে দেবে। দেখা যায় যেসব জিনিসের দাম দশ পেনির কম সেগুলোকেই ধরা সম্ভব হয়। বেশি দামের জিনিসগুলোকে স্পর্শ করেই চিমটেটা পিছলে যায়। অর্জুন সরে এল। একটা বিরাট টেবিল টেনিসের মতো বোর্ডে দশটা প্লাস্টিকের ঘোড়া একসঙ্গে দৌড়ছে। দশ পেনি ফেলে পছন্দমতন ঘোড়ার নাস্বারের বোতাম টিপে দেখতে হবে কে জিতছে। জিতলে এক-দেড় পাউন্ড পর্যন্ত পাওয়া যাবে। যন্ত্রচালিত এই ঘোড়দৌড় দেখতে বেশ ভিড়।

এইসময় অর্জুন মেয়েটিকে দেখতে পেল। সেই মেয়েটি যে সমুদ্রের ধারে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কালো মেয়েটি ওর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সে বসে আছে একটা চেঞ্জ কাউন্টারে। যাদের দশ পেনির দরকার তারা ওর কাছে গিয়ে পাউন্ড ভাঙিয়ে নিচ্ছে। কাউন্টার ফাঁকা হতে অর্জুন এগিয়ে গেল। গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, “কেমন আছেন?”

মেয়েটি গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, “ভাল। কত পাউন্ড ভাঙাবেন আপনি?”

“একটাও না। সেদিন আমাকে সাবধান করে দেবার জন্য ধন্যবাদ।”

“আমি যা শুনেছিলাম তাই বলেছি। লোক দুটোকে আজ সকালেও আমি দেখেছি। ইয়েস স্যার?” মেয়েটি পাউন্ড ভাঙাতে আসা এক বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়াল। অর্জুন সরে এল। দু’পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। কোনও সন্দেহজনক মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ল না।

মিসেস গ্রান্ট পৌঁছবার আগেই ওরা ভাড়া মেটাতে মিসেস ব্রাউনের অফিস-ঘরে পৌঁছল। গম্ভীর মুখে নোটগুলো নিয়ে মহিলা অর্জুনকে বললেন, “আজ তোমরা বোস্টন ফিরে যাচ্ছ?”

অর্জুন জবাব দিতে গিয়ে মুখ তুলতেই চমকে উঠল। দেওয়ালে একটা বাঁধানো ছবি। সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, “ছবিটা কার?”

মিসেস ব্রাউন কাঁধ ঝাঁকালে, “লোকটার সঙ্গে এককালে আমার বিয়ে হয়েছিল।”

“উনি।” ইতস্তত করল অর্জুন।

“না-না। সেটা হলে তো খুশি হতাম। জোচ্চুরি করে জেলে গিয়েছিল। ছাড়া পাওয়ার পর আমার এখানে এসেছিল। আমি ঢুকতে দিইনি। ওরকম হাড়বজ্জাত লোক আমি জীবনে দেখিনি।”

মেজর হতভম্ব হয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখ গোল হয়ে এসেছিল। অর্জুন তাঁর কনুই ধরে প্রায় টানতে-টানতে বাইরে বের করে আনল। মেজর বললেন, “আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।”

অর্জুন হাসল, “তা হলে বুঝলেন, উনি খামোখা আপনাকে অপছন্দ করেননি।”

“হ্যাঁ হে। অবিকল আমার মতো দেখতে?”

“গায়ের রংটা ছাড়া।”

“তুমি ভাবতে পারো, আমার মতো দেখতে একটা লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে?”

প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, “সামনের দিকে নয়, আমাদের সামনেই।”

লোকটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার চোখ মেজরের দিকে। মেজর যেন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আর অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। দুটো মানুষ প্রায় এক রকমের দেখতে হয় কী করে? স্বাস্থ্য, দাড়ি, চশমা। শুধু চুলের স্টাইল আর গায়ের রংটাই যা আলাদা। মানুষটি কিন্তু কথা বলল না। মেজরকে দেখতে-দেখতে পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেল। এবং তারপরেই মিসেস ব্রাউনের চিৎকার শোনা গেল, “আবার এসেছ? কতবার বলেছি যে, তোমার ছায়া মাড়াতে চাই না। না, না, একটা পেনিও পাবে না। জোচ্চোরদের সঙ্গে আমি কথা বলি না। এটা আমার পয়সায় কেনা, তোমার কোনও অধিকার নেই এখানে।”

মেজর মাথা নাড়লেন, “এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই চলো।”

অর্জুন বলল, “বেরিয়ে যাবেন কি? মিসেস গ্রান্টের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না?”

“অ। তা হলে তুমি একটা কাজ করো। আমাদের জিনিসপত্র বাইরে নিয়ে এসো। চমৎকার রোদ উঠেছে। সমুদ্রের হাওয়াটাও বেশ ভাল। আমি ওখানে দাঁড়াচ্ছি।” মেজর কথা শেষ করেই হনহনিয়ে এগিয়ে গেলেন।

অনেক কষ্টে হাসি চাপল অর্জুন। মেজর মিসেস ব্রাউনের ভয়ে আর গেটের এপাশে থাকতে চাইছেন না, অথচ মুখে সেটা স্বীকার করবেন না। এদিকে মিসেস ব্রাউন তখনও চিৎকার করে যাচ্ছেন। নিজেদের ঘরে যাওয়ার পথে

অর্জুন দেখল ডাইনিং রুমের সামনে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। একা। যেন ওখানে দাঁড়িয়েই গালাগালগুলো শুনছে। অর্জুনকে দেখে লোকটা হাসল, “গুডমর্নিং। পাকিস্তানি?”

“নো, ইন্ডিয়ান।” অর্জুনের ইচ্ছে হল লোকটার সঙ্গে কথা বলতে।

“দিস ইজ মিস্টার ব্রাউন। হোয়াট ইজ দি নেমে অব ইওর ফ্রেন্ড?”

“মেজর।”

“মেজর। মিলিটারি ম্যান?”

“হি ওয়াজ।”

লোকটা, যার নাম মিস্টার ব্রাউন, চোখ বড় করল। আর সেই সময় মিসেস ব্রাউন বেরিয়ে এলেন, “ওঃ! তুমি আবার ওই ভাল ছেলেটার মাথা খাচ্ছ?” প্রশ্নটা শেষ হবার আগেই মিস্টার ব্রাউন সুড়সুড় করে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল। মিসেস ব্রাউন কোমরে হাত দিয়ে যেন পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আড়চোখে মেজর মিস্টার ব্রাউনকে বেরিয়ে আসতে দেখে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সমুদ্রের গা ঘেঁষে একটা ট্রাম ছহু করে বেরিয়ে গেল। ঠিক তারই মতন দেখতে একটা লোক এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়। ব্রাউন যে সোজা তার সামনে এসে দাঁড়াবে, তা তিনি ভাবেননি, “হ্যালো, তোমার বয়স কত?”

খুব খেপে গেলেন মেজর, “কেন? আমার বয়সে তোমার কী দরকার? এটা একটা প্রশ্ন হল?”

“তুমি দেখছি বেশ মেজাজি লোক। আমি না চেষ্টা করেও রাগ করতে পারি না।”

মেজর মুখ ফেরালেন। সত্যি, মনে হচ্ছে তিনি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রাউন হাসল, “আমার বউটিকে দেখলেন? ও খুব রাগী। তবে ব্যবসাটা ভাল বোঝে। আপনি যে আমার লাইনের লোক সেটাও কিন্তু ওই চেহারার মিলের মতো তাজ্জব ব্যাপার।”

“লাইনের লোক? কে লাইনের লোক? আমি জোচ্চোর? জেল খেটেছি? অ্যা? এ বলে কী?”

“আমার বউ-এর মতো চৈঁচাচ্ছেন কেন? লাইনের লোক না হলে দুটো টিকিটকি কাল থেকে তোমাকে ফলো করছে কেন? সাধারণ লোককে কেউ ফলো করে?” ব্রাউন দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসল।

“বাঃ। কী মজা! তোমাকে কে না কে ফলো করেছে আর আমি লাইনের লোক হয়ে গেলাম?”

“দ্যাখো বাপু, আমি মিথ্যে বলছি না। গত এক বছরে কোনও জোচ্চুরি করিনি। আগের সব ঝামেলা অনেকদিন আগেই চুকিয়ে ফেলেছি। ফলো করার মতো গুরুত্ব কেউ আমায় দেবে না। হঠাৎ গতকাল থেকে দেখছি আমার

পেছনে টিকটিকি লেগে আছে। এখন কারণটা বুঝতে পারছি। ওরা আমাকে তুমি বলে ভুল করেছে। তুমি লাইনের লোক না হলে ওরা তোমায় খুঁজবে কেন?” পিটপিট করে তাকাল ব্রাউন। মেজর মুখে হাত বোলালেন। দাড়ি অসমান হয়ে গেছে। তিনি জিপ্সেস করলেন, “ওদের কোথায় দেখেছ?”

“এই তো, পথে এসো ব্রাদার। একটা ফাইভি ছাড়া আগে।”

“ফাইভি?” মেজর হাঁ।

“বেশি বলিনি। মাত্র পাঁচ পাউন্ড। বউয়ের কাছে গিয়েছিলাম, হাত উপুড় করল না।”

“আমি তোমাকে খামোখা পাউন্ড দিতে যাব কেন?”

“এক লাইনের দোস্ত বলে। কেসটা কী? কী ফাঁসিয়েছ? যদি একা না সামলাতে পারো তো আমাকে বলো। এ-তল্লাটের সব দু-নম্বরীদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে।” ব্রাউন মাতব্বরের মতো জানাল।

এইসময় জিনিসপত্র নিয়ে অর্জুন বেরিয়ে এল। মালপত্র তেমন ভারী নয়, কিন্তু দুটো এক রকমের মানুষকে দূর থেকে কথা বলতে দেখে সে গুণ্ডলোকে নীচে নামিয়ে রেখে একমুহূর্ত দেখল। মেজর তাকে দেখামাত্র দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে ফেললেন, “এই ব্রাউন লোকটা একটা জোচ্চোর। কিন্তু ও বলছে আমি ভেবে কারা নাকি ওকে অনুসরণ করছে।”

অর্জুন আবার ব্রাউনের দিকে তাকাল। লোকটা পকেটে হাত রেখে এইদিকে বোকা-বোকা মুখে তাকিয়ে আছে। ওর মনে হল ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মেজর এবং তাঁর সম্পর্কে যারা কৌতূহলী তারা তো ব্রাউনকে দেখে ভুল করতেই পারে। এক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, কৌতূহলীরা ব্ল্যাকপুলের লোক নয়, তা হলে এই ভুল সহজে করত না।

অর্জুন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তখনই মিসেস গ্রান্ট এসে গেলেন। তিনি এলেন তাঁর বান্ধবীর গাড়িতে চেপে। ওঁদের দেখে দরজা খুলে কাছে এসে বিহ্বল গলায় বলে উঠলেন, “কী সর্বনাশের ব্যাপার বলো তো! কে না কে মেয়ে আমার গাড়ি চুরি করে অ্যাকসিডেন্ট করল? মেয়েটার নাকি এখনও জ্ঞান ফেরেনি। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই।”

অর্জুন গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল, “আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।”

মিসেস গ্রান্ট অর্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে গুরুত্বটা অনুমান করে নীচে নেমে এলেন। মিনিট-তিনেক কথা বলার পর তিনি রাজি হলেন, “আমার বান্ধবীকে বলছি। ওর সঙ্গে ওই ব্যাকের ম্যানেজারের ভাল আলাপ আছে। লকার খুলতে গেলে খাতায় সই-সাবুদ করতে হয়। সমস্ত ব্যাপারটা ম্যানেজারকে জানিয়ে করাই ভাল।”

অর্জুনের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না। ম্যানেজারকে জানালেনই তিনি পুলিশ

ডাকতে পারেন। পুলিশ তখন জানতে চাইতে পারে, কেন এতসব ঘটনার কথা তাদের জানানো হয়নি? লকারে কী রয়েছে সেটাও তারা ইচ্ছে করলে জানতে না দিতে পারে। সে এ-ব্যাপারটা বলতে মিসেস গ্রান্ট বললেন, “চলো, আগে আমরা ব্যাঙ্কে যাই, তারপর অবস্থা দেখে ঠিক করা যাবে।”

অর্জুন এবার তার আপত্তির কথা জানাল, “আমি ব্যাঙ্কটা চিনি। আপনারা গাড়িতে যান, আমি হেঁটে যাচ্ছি। বেশি দূর নয়, ঠিক পৌঁছে যাব।”

“সে কী! গাড়ি থাকতে তুমি হাঁটবে কেন? এ কেমন কথা?”

অর্জুন তখন ইশারায় দূরে দাঁড়ানো ব্রাউনের প্রতি ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। করা মাত্রই মিসেস গ্রান্টের চোখ গোল হয়ে গেল। তিনি দ্রুত মেজরের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই মেজরের মুখটায় একটা নার্ভাস ভাব ফুটে উঠল। অর্জুন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “আমি ওঁর সঙ্গে হেঁটে যাব। মেজর আপনাকে যেতে-যেতে ওর গল্প বলবেন।”

মেজরের ইচ্ছে ছিল না অর্জুনকে একা ব্রাউনের সঙ্গে ছেড়ে দিতে। ওই জোচ্ছোরটার সঙ্গে অর্জুনের যাওয়ার প্রয়োজনই বা কী তা ওঁর মাথায় ঢুকছিল না! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মালপত্র গাড়িতে চাপিয়ে মিসেস গ্রান্ট এবং তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, “আমি যাচ্ছি, কারণ আমি খুব উত্তেজিত। কদিন একদম ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছি লকারে কী আছে। কিন্তু এখন আর তর সইছে না। সাবধানে এসো। লোকটাকে একটাও পয়সা দেবে না।”

গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর অর্জুন ব্রাউনের পাশে দাঁড়াল, “মিস্টার ব্রাউন, আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত?”

“মোটাই না। তোমার বন্ধুরা সব কোথায় গেল, তুমি গেলে না?”

“না। ওদের কাজের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।” অর্জুন হাসল, “আমি একটু শহরটা ঘুরে দেখতে চাই।”

ঠোট ওলটাল ব্রাউন, “শহরটা দেখার মতো নয় হে। এই সমুদ্রের ধারের রাস্তা আর দোকানপাট, ব্যস, এই হল ব্ল্যাকপুল। স্টেশনটাও দেখার মতো নয়। তুমি কি চাইছ আমি তোমার সঙ্গে যাই?”

“আপনার যদি খুব আপত্তি না থাকে। একজন পরিচিত মানুষ সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে।”

“আরে বাবা, আপত্তি করতে যাব কেন? তুমি আমাকে একটা লেট ব্রেকফাস্ট খাওয়াবে নিশ্চয়ই। লাঞ্চের আগে ঘোরা শেষ হবে না। আর বিকেলে নিশ্চয়ই দশটা পাউন্ড হাতে না দিয়ে তুমি পারবে না। চলো যাচ্ছি। আচ্ছা, এই যে প্লে হাউসগুলো দেখছ, খবরদার ঢুকো না। খাঁটি জোচ্ছুরির জায়গা। দশ পি দশ পি করে এক পাউন্ড খরচ হয়ে যাওয়ার পর তুমি হয়তো দশ পি ফেরত পেলো। কফি খেলে কেমন হয়?”

ডান দিকেই একটা কফি কনার। পঁয়তাল্লিশ পেনি দিয়ে এক কাগজের কাপ কফি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ওই টাকায় দশ কাপ কফি পাওয়া যেত। তা ছাড়া খানিক আগে খাওয়া হয়েছে, অর্জুনের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। সে দোকানদারকে একটা কফি দিতে বললে দোকানদার চোখ কুঁচকে ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যালো স্যাম, কিছু করছ মনে হচ্ছে?”

ব্রাউন চটপট জবাব দিল, “এই আর কি। ট্যুরিস্টদের গাইড করছি।”

লোকটা যেন কথাগুলো পছন্দ করল না। কিন্তু আর কথা বাড়াল না। দাম মিটিয়ে কফিটা ব্রাউনকে নিতে দিল অর্জুন। আর তখনই ব্রাউন বলল, “তোমাদের বন্ধুটি, ওই যাকে আমার মতো দেখতে, তার ব্যবসাটা কী বলো তো?”

“ব্যবসা? উনি তো ব্যবসা করেন না?”

“করে। তুমি চেপে যাচ্ছ। টিকটিকি ঘুরছে পেছনে। এমনি-এমনি?” লোকটা কফি শেষ করল, “শোনো, আমার একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাও, তা হলে ভাল কামানো যেতে পারে।”

অর্জুন হেসে ফেলল, “কী ভাবে?”

“আমার ব্যবসায় ওকে সবাই আমি বলে ভুল করবে। সেই ফাঁকে বাইরে থেকে আমি কাজটা করলেও কেউ আর আমাকে সন্দেহ করবে না।” কথাগুলো বলতে-বলতে ব্রাউন ফুটপাথ ঘেঁষে হাঁটছিল, “তবে ওকে চুরট খাওয়া ছাড়তে হবে। আমার লাইনের সবাই জানে আমি চুরট খাই না। যা হবে তার অর্ধেক আমার, অর্ধেক তোমাদের।” মনে-মনে আচমকা হিসাব করতে লাগল ব্রাউন। রাস্তাটা পার হবার জন্যে অর্জুন পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ মনে হল, একটা গাড়ি খুব দ্রুত ছুটে আসছে। কিছু বোঝার আগেই সে দু’পা পিছিয়ে আসতে গাড়িটা ব্রেক কবল। চাকাটা ইচ্ছেকরে ডান দিকে বেঁকতে-বেঁকতে বাঁ দিকে মোড় নিতেই ব্রাউন পড়ে গেল মাটিতে। কিছু বোঝার আগেই লোক দুটো নেমে এল জিপ থেকে। ব্রাউনকে তুলে নিল ধরাধরি করে। চিৎকার করে বলল, “হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি।” তারপরে উধাও। ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে অর্জুনের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাওয়া জিপটার দিকে তাকিয়ে থেকে অর্জুনের তখনও মাথা ঝিমঝিম করছিল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল অথচ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসা মানুষেরা সামান্য চঞ্চল হল না। শুধু একটা বিশাল চেহারার পুলিশ সামনে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, “তোমার বন্ধু?”

কী উত্তর দেবে ঠাहर করতে পারল না অর্জুন। শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে বলল, “না। একটু আগে আলাপ হয়েছে।”

পুলিশটা কাঁধ নাচাল, “হি ইজ লাকি। কেন যে লোকে অন্ধ হয়ে রাস্তা পার হয়।” উদাস-উদাস মুখ করে লোকটা আবার চলে গেল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে এই ঠাণ্ডাতেও মুখ মুছল অর্জুন। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ব্রাউনকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ওরা যদি ব্রাউনের পুরনো শত্রু হয় তা হলে বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি মেজর ভেবে ব্রাউনকে নিয়ে যায়? চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র সে কেঁপে উঠল। ভুলটা ওদের খুব শিগগির ধরা পড়বে। অর্জুন দ্রুত রাস্তার ওপারে চলে এল। ট্রামটা থামতেই তাতে সে উঠে বসল। বসার জায়গা পেয়েও বাইরের দৃশ্য দেখার মতো মন ছিল না। যারা তাদের পেছনে লেগেছে তাদের চেহারা বা হৃদিস জানা নেই। প্রোফেসর হ্যাচ নামক মানুষটি যে এই ঘটনার সঙ্গে কতটা জড়িত তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। সে কি ভুল করল? পুলিশটাকে কি জানানো উচিত ছিল ওরা ব্রাউনকে ইলোপ করেছে? লোক দুটো কি শুধু জিপে চেপে তাদের অনুসরণ করেছে, নাকি রাস্তাতেও ওদের কেউ-কেউ ছিল! অর্জুন কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। দূর থেকে ব্যাক্সটাকে দেখতে পেয়ে সে নেমে পড়ল।

ব্যাক্সের সামনের পার্কিং লটে মিসেস গ্রান্টের বান্ধবীর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তার খানিকটা পেছনে মেজর দুটো বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ফুটবল খেলছেন রবারের বল নিয়ে। অর্জুনকে দেখে খেলা ছেড়ে এগিয়ে এলেন হাসতে-হাসতে, “এককালে খেলতাম, বুঝলে।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওঁরা কোথায়?”

“ব্যাক্সের ভেতরে। তোমার সঙ্গীটিকে দেখছি না?”

অর্জুনের ব্রাউনের ব্যাপারটা বলতেই মেজরের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, “সর্বনাশ! তুমি পুলিশকে কিছু বলোনি? অতবড় একটা হুমদো লোককে দিনদুপুরে ধরে নিয়ে গেল?”

হুমদো শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র অর্জুনের হাসি পেল। শব্দটাতো মেজরের ক্ষেত্রের প্রযোজ্য। চেহারা যেহেতু দুজনের একইরকম। মেজর বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি হাসছ? হাসতে পারছ?”

তখনই মিসেস গ্রান্ট তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে ব্যাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন। অর্জুনের বুকের ভেতর ড্রাম বাজতে লাগল। দুই প্রৌঢ়া কাছে এসে দাঁড়াতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী হল?”

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বলল, “ম্যানেজার খুব ভাল মানুষ। তিনি বললেন অন্যের লকার আমরা খুলতে পারি না। কিন্তু যেহেতু লকারের মালিক গতবছর ভাড়া দেননি তাই ওঁরা তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি ফেরত এসেছে। এ-অবস্থায় ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে তিনি লকার খুলছেন। কিন্তু কিছু দিতে পারবেন না সেখান থেকে। আমরা কেন ইন্টারেস্টেড তাও জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, ভদ্রলোক মিসেস গ্রান্টকে ওই চাবি দিয়ে এসেছিলেন বোস্টনে গিয়ে।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “তারপর?”

মিসেস গ্রান্ট পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন, “লকারে কোনও টাকাকড়ি-গহনা ছিল না। শুধু একটা কাগজ ছিল। আমি সেটাকে কপি করে নিয়ে এসেছি।”

হঠাৎ অর্জুনের নজর পড়ল একটা জিপ বাঁক ঘুরে এ-পথে আসছে। সে চিৎকার করে মেজরকে বলল, “চটপট গাড়ির পেছনে চলে যান।” প্রায় মেজরের হাত ধরে সে টেনে নিয়ে এল গাড়ির পেছনে।

মিসেস গ্রান্ট কী করবেন ঠিক করার আগেই জিপটা তীব্র গতিতে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন ভদ্রমহিলার হাসি শুনতে পেল। মুখ বের করে সে দেখতে পেল জিপের আরোহী এক মহিলা এবং দুটি বাচ্চা। সে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই মিসেস গ্রান্ট হাসতে-হাসতে বললেন, “জিপটাকে এত ভয় পেলে কেন?” অর্জুন লজ্জা পেল, “ঠিক এইরকম জিপ খানিক আগে মিস্টার ব্রাউনকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের বোধহয় এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না।”

অতএব ওরা রওনা হল। মিসেস গ্রান্ট তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে যাবেন হাসপাতাল পর্যন্ত। সেখানকার থানার অফিসারের সঙ্গেও দেখা করবেন তাঁরা। মেজর আর অর্জুন বাস ধরবেন ওখান থেকে। জিপের আতঙ্ক থেকে মেজর খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। পেছনের সিটে অর্জুনের পাশে বসে চুপচাপ ইংল্যান্ডের গ্রাম, খামার, মাঠ দেখছিলেন। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিচু গলায় মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, ওরা আমাকে ইলোপ করতে চাইবে কেন? আমি ওদের কোনও পাকা ধানে মই দিয়েছি?”

অর্জুন কোনও উত্তর দিল না। মেজর একটা নিশ্বাস ফেলে পেছনের দিকে তাকালেন। ব্ল্যাকপুল ছেড়ে গাড়ি এবার হাইওয়ের দিকে এগোচ্ছে। ওদের পেছনের গাড়িগুলোকে খুব নিরীহ দেখাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছিল, মেজর কাউকে সন্দেহের বাইরে রাখছিলেন না। ব্যাপারটা মিসেস গ্রান্টও লক্ষ করেছিলেন। মুখ ফিরিয়ে তিনি অর্জুনকে ইশারা করলেন। ব্যাপারটা বোঝার আগেই অর্জুন শুনল মিসেস গ্রান্ট মেজরকে বলছেন, “আমি জানতাম আমি অভিযাত্রী। কোনও কিছুতেই ভয় পান না। কিন্তু এখন দেখছি আপনি খুব ভিত্ত।”

“আমি ভিত্ত!” মেজর হঠাৎ হাহা করে এমন হেসে উঠলেন যে, মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী পর্যন্ত চমকে উঠলেন। মেজর বললেন, “একমাত্র আরশোলা আর টিকটিকি ছাড়া আর কিছুতেই আমার ভয় নেই।”

সঙ্গে-সঙ্গে মিসেস গ্রান্টের চোখ বিস্ফারিত হল, “মাই গড।”

মেজর একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, “তার মানে?”

মিসেস গ্রান্ট অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ও অর্জুন, ইউ মাস্ট হেল্প হিম। তুমি ওর পাশে বসে আছ। ওর পকেট থেকে প্রাণীটিকে বের করে দাও।” কথাটা কানে যাওয়ামাত্র মেজরের দাড়ি ঠেকল বুকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে

তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর শরীর শক্ত হয়ে গেল, চোখ বিস্তারিত। অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না। মেজরের বুক শুধু কলমের মাথা ছাড়া অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব সে দেখতে পেল না। ততক্ষণে মেজর কথা বলছেন। গলার স্বর ভয়ে বিকৃত, “অ-অ অর্জুন, টিকিটিকটিকে পকেট থেকে ফেলে দাও!” বলতে-বলতে তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। অর্জুন মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকাল। ওঁর মুখে দুষ্টমির হাসি। আর তখনই কাণ্ডটা করলেন মেজর। বাঁ হাতের এক থাবায় কলমটাকে তুলে বাঁ দিকে ছুড়ে ফেললেন জানলা গলিয়ে। গাড়ি চলছিল জঙ্গুলে এলাকা দিয়ে। মিসেস গ্রান্ট চিৎকার করে উঠলেন, “আরে আরে, আপনি কলমটাকে ফেলে দিলেন?”

“কলম! আমার বুক পকেটে টিকিটিকি উকি মারছিল আর আপনি বলছেন কলম?”

খঁকিয়ে উঠলেন মেজর। মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছেন। অর্জুন হেসে ফেলল, “আপনার বুক পকেটে টিকিটিকি আসবে কেমন করে?”

“সেটা অবশ্য একটা কথা, কিন্তু এসেছিল তো!”

“না, আসেনি। আপনার কলমটাকে উনি ম্যাজিকে টিকিটিকি বানিয়ে দিয়েছিলেন।”

তৎক্ষণাৎ আঁতকে উঠলেন মেজর। বাঁ হাতে বুক পকেটটা চাপড়ে নিলেন। তারপর দরজা খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লেন। মেজরকে পেছনের দিকে ছুটে যেতে দেখে অর্জুনও নামল। খুব নির্জন জায়গাটা। জঙ্গুলে এবং ওপাশে তাকালে জনবসতির চিহ্ন দেখা যায় না। মিসেস গ্রান্ট টেঁচিয়ে বললেন, “আই অ্যাম সরি। মেজরকে তাজা করার জন্যে কাণ্ডটা না করলেই হত। আমরা একটু এগিয়ে পার্কিং প্লেসে গাড়িটা রাখছি। এখানে থাকলে পুলিশ ধরবে।”

অর্জুন হাত নাড়তে গাড়িটা ফার্লং-দুই এগিয়ে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল। হুশহাশ করে গাড়ি যাচ্ছে। পাশাপাশি আটটা বিপরীতমুখী গাড়ি ছুটে যাচ্ছে মসৃণভাবে। এমন দৃশ্য পশ্চিমবাংলায় চিন্তা করা যায় না। এখানে কেউ আচমকা গাড়ি ঘুরিয়ে ট্র্যাফিক জ্যাম করে না, পার্কিং প্লেস ছাড়া গাড়ি দাঁড় করায় না। অর্জুন দেখল মেজর প্রায় মাটি হাতড়ে কলম খুঁজছেন। পাশে দাঁড়িয়ে নজর বোলাতে-বোলাতে সে জিজ্ঞেস করল, “খুব দামি কলম?”

মেজর মুখ না তুলে জবাব দিলেন, “কলম ইজ কলম। কিন্তু এরকম বোকাটে রসিকতা করার কোনও মানে হয়?” ছোঁড়ার সময় যাকে টিকিটিকি মনে হয়েছিল, ঝোপেঝাড়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যে রীতিমত কষ্টকর তা বুঝতে সময় লাগল মেজরের। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে হতাশ গলায় উচ্চারণ করলেন, “যা, অত রেয়ার পয়জনটা হারিয়ে ফেললাম।”

“পর্যজন ? আপনি কি বিষের কথা বলছেন ?”

“হ্যাঁ হে। আমি একটা অন্ধ, প্যাঁচা, বুদ্ধ বোকা।” বিড়বিড় করলেন মেজর। ওঁর দাড়ি এখন অবিন্যস্ত। তাতে মোটা আঙুলগুলো সাঁতার কাটছে।

অর্জুন এবার হতভম্ব, “কলমে বিষ মানে ?”

“খুব সিম্পল ব্যাপার। আমি কলমের ভেতরে বিষ রেখেছিলাম। বছর-দুয়েক আগে আমাজনে নৌকো বাইতে-বাইতে দেখেছিলাম একটা হাতি মরে পড়ে আছে তীরে। কাছে গিয়ে কোনও ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম না। অথচ হাতিটা খুবই কম বয়সী। আমার আদিবাসী গাইড বলল, ওটা মরেছে র‍্যাটল স্নেকের কামড়ে। অনেক চেষ্টার পর আমি বিশ ফোঁটা র‍্যাটল স্নেকের বিষ জোগাড় করেছিলাম। খুব দামি জিনিস হে। কোথায় যে ফেললাম!”

মেজরের নিশ্বাস পড়ল শব্দ করে।

“কিন্তু অত দামি জিনিস কলমের ভেতরে রাখতে গেলেন কেন ?”

“সিম্পল ব্যাপার। আত্মরক্ষার অস্ত্র। মুখটা খুলে নিবটা যদি শত্রুর শরীরে ঢুকিয়ে দিই, তা হলেই সে চলে পড়বে। ওই কলমে আমাকে কখনও লিখতে দেখেছ ? নেভার।”

জীবনে এরকম অস্ত্রের নাম শোনেনি অর্জুন। এবং এটা মেজরের মাথাতেই আসা সম্ভব। ওদিকে তখন মিসেস গ্রান্টের গাড়ি থেকে হর্নের আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্জুন বলল, “চলুন।”

“যাব মানে ? কলমটাকে ফেলে রেখে যাব ?” বলতে-বলতে মেজরের চোখের দৃষ্টি স্থির হল, “অর্জুন, দ্যাখো তো ওটা কী ?”

মুখ তুলে অর্জুন দেখতে পেল একটা গাছের ডালে কলমটা আটকে আছে। মেজর চলন্ত গাড়ি থেকে যাকে ছুঁড়েছিলেন, সে মাটিতে পড়েনি। অর্জুন ঘাড় নাড়তেই মেজর ছুটে গিয়ে গাছটাকে ঝাঁকাতে লাগলেন। আর এই সময় প্রচণ্ড শব্দ করে একটা কালো পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল পাশের হাইওয়েতে। চটপট দুটো পুলিশ অফিসার নেমে পড়ল, “এই যে কী করছ তোমরা ? এদিকে এসো। কে তোমরা ? ধান্দাটা কী বলো ?” ওরা এগিয়ে এল কাছে।

মেজর তেমন পাস্তা না দিয়ে হাত তুলে ওপরের ডালটা দেখালেন, “আমার কলমটা ওখানে ?” অফিসার দুজন মুখ তুলে কিছু না দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে ইশারায় কথা বললেন। তারপর একজন জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কী বললে ? কলম ?”

গাছ ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে মেজর বললেন, “ঠিকই শুনেছ। কলম।”

দ্বিতীয় অফিসার ছকুমের ভঙ্গিতে বলল, “অ্যাঁই, উঠে এসো। তোমাদের থানায় যেতে হবে।” মেজর তখন হতাশ চোখে ওপরের দিকে তাকাচ্ছেন। এত ঝাঁকুনিতেও কলমটা পড়ছে না। মুখ নামিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, “মামার ৩৬০

বাড়ি আর কি ! কোনও অপরাধ করিনি আর থানায় নিয়ে যাবেন ! কার পাকা ধানে আমরা মই দিয়েছি হে ?”

“হাইওয়ের পাশে নেমে যাওয়া বেআইনি । তার ওপর কোনও মতলবে গাছ ঝাঁকাচ্ছ তাও জানতে হবে । একটু আগে তোমার মতো একটা লোককে... ।” অফিসার থেমে গেল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে কলমটা নেমে এল । সোজা মেজরের কাঁধে লেগে ছিটকে পড়ল অর্জুনের সামনে । মেজর ‘পেয়েছি’ বলে চিৎকার করে কয়েক পা লাফিয়ে এসে ওটাকে তুলে নিলেন । তাঁর মুখে এবার খুশি । একবার কাঁধটা হাতের টোকায় ঝেড়ে নিয়ে বললেন, “ভাবো অর্জুন, কলমটা মুখ-খোলা অবস্থায় ওপর থেকে এখানে পড়েছিল । ওঃ । এতক্ষণে সব শেষ । জীবন বড় ছোট হে । চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে ।”

দ্বিতীয় অফিসারটি দ্রুত এগিয়ে এলেন কাছে । তারপর মুখ লাল করে বললেন, “দেখি কী জিনিসের বাহানা করছিলে ?”

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন, “না । এটা দেওয়া যাবে না ।”

“যখন আইন কিছু দেখতে চায় তখন তুমি দেখাতে বাধ্য ।” অফিসার তার কোমরের রিভলভারে হাত দিল । মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন । প্রথম অফিসারটি ওপর থেকে চিৎকার করল, “বব, ব্রিং দ্যাট পেন । মনে হচ্ছে ওর ভেতর কোনও রহস্য আছে ।”

কলমটা হাতে নিয়ে দু-একবার উলটে-পালটে দেখে অফিসার ওদের ইঙ্গিত করল অনুসরণ করতে । অর্জুনের হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল । এর মধ্যে তার নজরে এসেছে, যে-আঙুলে কলমটাকে ধরেছে অফিসার, তার ওপরে সদ্য শুকিয়ে-আসা একটা ক্ষতের দাগ । যদি নিব ওখানে লাগে অথবা কলমে লিক থাকে ত হলে আর দেখতে হবে না । এই সময় মিসেস গ্রান্ট গাড়িটা নিয়ে পিছিয়ে এলেন, “কী হল আপনাদের ? কলমটা পেলেন ?”

অফিসার জিজ্ঞেস করল, “ম্যাডামের পরিচয় ?”

মিসেস গ্রান্ট নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, “এঁরা আমার বন্ধু ।”

“হতে পারেন । কিন্তু এঁদের আমরা থানায় নিয়ে যাচ্ছি ।”

মিসেস গ্রান্টের কোনও কথাই ওরা শুনল না । পুলিশের গাড়ির বদলে অবশ্য মিসেস গ্রান্টের গাড়িতে ওদের উঠতে দেওয়া হল । মিসেস গ্রান্ট কালো গাড়িটাকে অনুসরণ করলেন । মেজর খুব উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “মিসেস গ্রান্ট, হাইওয়ে থেকে নেমে আমরা কি কোনও অন্যায় করেছি বলে মনে হচ্ছে আপনার ?”

মিসেস গ্রান্ট মাথা নাড়লেন, “মোটাই না । তবে ওরা আপনাকে গাছ ঝাঁকতে দেখে হয়তো সন্দেহ করেছে ।”

“সন্দেহ ? কিসের সন্দেহ ! ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রের, মানুষের স্বাধীনতার সম্মান দেওয়া হয় বলে এতদিন জানতাম । এ যে দেখছি ফ্যাসিস্ট সরকারের

চেহারা।” মেজর হুকার ছাড়লেন। মিসেস গ্রান্ট বোঝাবার চেষ্টা করলেন, “কোথাও কোনও ভুল হয়েছে। একটু অপেক্ষা করুন, দেখাই যাক না কী বলেন ওঁরা!”

“আমাদের সময়ের কোনও দাম নেই? কী ভেবেছে ওরা? আমরা ক্ষতিপূরণ চাইব।” মেজর বিড়বিড় করলেন। কিন্তু অর্জুনের চোখে তখন অফিসারের আঙুলের শুকনো ক্ষত ভাসছিল। র‍্যাটল স্নেকের বিষ যদি ওখানে লাগে! সে নিচু গলায় মেজরকে সে-কথা বলতেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বাংলায় বললেন, “তুমি শুকনো ক্ষত দেখেছ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল। মেজর বললেন, “আমাদের উচিত এখনই লোকটাকে সতর্ক করে দেওয়া।”

“কিন্তু কলমের মধ্যে বিষ আছে জানতে পারলে ওদের সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে।” অর্জুন জানাল।

“বেড়ে যাবে? জেল হয়ে যাবে হে। যদি বলি কলমটা আমার অস্ত্র, তা হলে ওটা বেআইনি অস্ত্র। কোনও লাইসেন্স নেই। যদি বলি, র‍্যাটল স্নেকের বিষ রেখেছিলাম শখে পড়ে, তা হলে জিজ্ঞাসা করবে এয়ারপোর্টে ডিক্লেয়ার করেছিলাম কি না? উত্তর শুনে সঙ্গে-সঙ্গে জেলে পাঠিয়ে দেবে আমাকে।” মেজর অত্যন্ত বিষণ্ণ গলায় কথাগুলো বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। যেহেতু কথাবার্তা বাংলায় হচ্ছিল, তাই মিসেস গ্রান্টের পক্ষে মানে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি এবার মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “আমি সত্যি খুব দুঃখিত। আপনার সঙ্গে টিকটিকির রসিকতা না করলে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হত না।”

এটা সম্ভবত মেজরের মনের কথা, তাই তিনি কোনও প্রতিবাদ করলেন না। পুলিশের গাড়িটার নির্দেশ অনুসরণ করে ওরা শেষ পর্যন্ত পুলিশ-স্টেশনে পৌঁছে গেল। অর্জুন দেখল লোকটা এখনও মরেনি, তবে কলমটা হাতেই ধরে রেখেছে। ওই কলম খুলে লিখতে গেলে কাগজে কীরকম দাগ পড়বে? বিষের রং তো নীল হয়। তা হলে নীলচে লেখা ফুটবে?

ওদের থানার ভেতরে নিয়ে আসা হল। জলপাইগুড়ির থানার তুলনায় একে তো হোটেল-হোটেল মনে হচ্ছে। বাইরের বোর্ডে প্রচুর ছবি টাঙানো। ওপরে ‘ওয়ান্টেড’ লেখা। অফিসার-ইন-চার্জ-এর টেবিলে পৌঁছে দেখল রোগা, লম্বা এক ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। কলমটা তাঁর সামনে রেখে পেট্রল-কারের অফিসার অভিযোগ পেশ করল, “সার, এই লোকটিকে লক্ষ্য করুন। তিন নম্বর হাইওয়ের পাশে একটা গাছ ঝাঁকাচ্ছিল গাড়ি থেকে নেমে। আমরা চার্জ করতে অজুহাত দিল ও নাকি এই কলমটাকে খুঁজছিল।”

অফিসার-ইন-চার্জ নির্লিপ্ত মুখে কলমটাকে দেখলেন, “এর মধ্যে কী আছে? হিরে না ড্রাগ?”

মেজর বললেন, “নাথিং। এটা একটা কলম। আর আমরা রেসপেক্টেবল

ট্যুরিস্ট । ”

“শো মি ইওর আইডি । ” ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন ।

মেজর পকেট থেকে তাঁর পাশপোর্ট এবং আন্তর্জাতিক অভিয়াত্রী সঙ্কেত কার্ড বের করে দেখালেন । সেটাকে উলটে-পালটে দেখে অফিসার-ইন-চার্জ জিঙ্গেস করলেন, “আপনি গাছে কলম খোঁজার অভিযান করেন । ইনি কী করেন ?” প্রশ্নটি অর্জুনকে দেখিয়ে । অর্জুন তার পাশপোর্ট বের করে টেবিলে রাখতেই মেজর যোগ করলেন, “ও খুব প্রতিভাবান প্রাইভেট ডিটেকটিভ । ”

বাঁ হাত দিয়ে পাশপোর্টগুলো ঠেলে দিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, “এইসব ফালতু লোককে আমি আমার এলাকায় দেখতে চাই না । প্রাইভেট ডিটেকটিভ ! তা হলে আমরা আছি কী করতে ! ”

তারপর তিনি কলমটা তুলে নিলেন । অর্জুনের বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে লাগল । এই সময় মিসেস গ্রান্ট বললেন, “স্যার, আমি এই দেশের একজন নাগরিক, খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হয় । আমি বলছি এরা নির্দোষ এবং আমার বন্ধু । ”

ততক্ষণে কলমটা খুলে ফেলেছেন ভদ্রলোক । অর্জুন দেখল সাধারণ চেহারার নিবওয়ালা কলম । তবে নিব পয়েন্টেড । একটা কাগজ টেনে নিয়ে অফিসার জিঙ্গেস করলেন, “মহাশয়ার পরিচয় ?”

মিসেস গ্রান্ট যখন পরিচয় দিচ্ছেন, তখন কাগজে ফ্যাকাসে একটা রেখা তুলল নিব । পরিচয়টা শুনে মুখ তুললেন অফিসার-ইন-চার্জ, “ওঃ, আপনার নাম আমি শুনেছি । কিন্তু আপনি কী বলতে চান জানি না । খামোখা একটা বাজে কলমের জন্যে কেউ গাছ ঝাঁকায় ?”

মিসেস গ্রান্ট বললেন, “কম দামি কখনও কারও প্রিয় হতে পারে । একটু ঝাঁকিয়ে নিন । ” অফিসার-ইন-চার্জ মেঝেতে কলমটা ঝাঁকালেন । অর্জুনের মনে হল জলীয় কিছু ছিটকে পড়ল নীচে । সে মেজরের মুখের দিকে তাকাল । দাড়ি-গোঁফ থাকা সত্ত্বেও সেই মুখে যেন সন্তান-হারানোর বেদনার ছাপ । আমাজনের তীর থেকে সংগ্রহ করা বিষের কী দুর্দশা । অফিসার-ইন-চার্জ আবার লিখতে গেলে দাগ ফুটল না । রেগেমেগে কলমের মুখটা বন্ধ করে ঝুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি জানলা দিয়ে বাইরে । সঙ্গে-সঙ্গে মেজর উঠতে যাচ্ছিলেন । অর্জুন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর পাশে । চটপট সে মেজরের হাত আঁকড়ে ধরতেই ভদ্রলোক কোনওমতে নিজেকে স্থির করলেন । অফিসার-ইন-চার্জ মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার দুই বন্ধুকে তাড়াতাড়ি দেশে ফেরত পাঠান । একবার ইংল্যান্ডে এলে তো কোনও ভারতীয় ফিরতে চায় না । এরা ক্রমশ বদলা নিতে ইংল্যান্ডকেই দখল করে নেবে । ” এই পেট্রল-কারের অফিসার এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের কানে ফিসফিস করে কিছু বলতেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন । তাঁর চোখ এবার মেজরের ওপর ।

৩৬৩

কিছুক্ষণ দেখার পর মাথা দুলতে লাগল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হাতের ইশারা করলেন মেজরকে, “ইউ ফলো মি।”

ব্যাপারটা এমন নাটকীয় যে, মেজর খুব ঘাবড়ে গেলেন। অর্জুনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি উঠে দাঁড়াতেই অর্জুন বলল, “চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।”

ওরা এগিয়ে যেতেই আর-একজন অফিসার মিসেস গ্রান্টদের হাত তুলে অপেক্ষা করতে বললেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এক সরু প্যাসেজ দিয়ে কিছুটা হেঁটে মাঝারি ঘরের সামনে ওরা পৌঁছে গেল অফিসার-ইন-চার্জের পেছনে-পেছন। ঘরটার দরজায় তালাচাষি লাগানো। দরজার ওপরে একটা চৌকো থোপ, তাতে শিক লাগানো। সেখানে মুখ লাগিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ জড়ানো ইংরেজিতে ধমকালেন। অর্জুনের মনে হল, তিনি যেন কাউকে ডাকলেন। একটু বাদেই মিস্টার ব্রাউনের মুখ সেখানে দেখা গেল। কপালে শুধু একটা প্লাস্টার সাঁটা। ওদের দেখে খুব রেগে গেল লোকটা। আচমকা চিৎকার করে উঠল, “ইউ, ইউ, ফর ইউ দে হ্যাভ ডান দিস।”

অর্জুন ব্রাউনকে লকআপে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাউন যখন খুব উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলছিল, তখন শিকের ফাঁক গলে থুতু এসে ছিটকে লাগল মেজরের মুখে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “কী! এত বড় স্পর্ধা! তুমি...তুমি থুতু ছিটোলে?”

“অ্যা?” ব্রাউন চোখ পিটপিট করল, “আমি থুতু ছিটিয়েছি? কী মিথ্যুক লোক এটা?”

অর্জুনের হাসি পেয়ে গেল। দুটো মুখ দেখতে অবিকল একরকম। যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেজর কথা বলছেন। আর এইরকম উত্তেজনার মুহূর্তে মেজরকে দেখলে টিনটিন কমিকসের ক্যাপ্টেন হ্যাডকের কথা মনে আসে চট করে। হঠাৎ মেজর পরিষ্কার বাংলায় তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই উজবুকটা আমাকে অপমান করছে আর তুমি হাসছ অর্জুন?”

অফিসার-ইন-চার্জ হাত তুললেন, “তুমি এদের চেনো?”

ব্রাউন বলল, “দেখেছি। আমার বউয়ের হোটেলের ছিল। ওই ছেলেরা খুব ভাল। ওর সামনে থেকেই লোকগুলো আমাকে ইলোপ করেছিল। জিজ্ঞাসা করে দেখুন।”

“বাট হোয়াই? তুমি এমন কোনও ডিউক নও যে, তোমাকে কেউ ইলোপ করতে যাবে?”

“আমাকে করেছিল নাকি? ওই দেড়লটাকে করতে গিয়ে আমাকে ভুল করে নিয়ে গিয়েছিল।”

“এ যা বলছে তা সত্যি জেন্টলম্যান?” অফিসার-ইন-চার্জ প্রশ্ন করলেন অর্জুনকে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে মাথা নাড়তেই তিনি আবার ঝুঁকে অনুসরণ করতে বলে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। চেয়ারে বসে প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে দুটো ভাঁজ করে নৌকো বানাতে-বানাতে জিজ্ঞেস করলেন, “নাউ, তোমরা আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছ। পুরো ঘটনা খুলে বলো।”

মিসেস গ্রান্ট চুপচাপ বসে ছিলেন সেখানে। ভদ্রলোক যেভাবে কাগজ ভাঁজ করছেন, তাতে বুকের ধুকপুকনি শুরু হয়ে গেল অর্জুনের। র্যাটল স্নেকের বিষ এত তীব্র যে, শুকনো অবস্থাতেও হাতে লেগে গেলে এবং সেই হাত জিতে ঠেকলে একই প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে শুনেছে সে। ওই কাগজে লেখার চেষ্টার সময় কি বিষ লেগে যায়নি? সে যতটা সম্ভব গল্পটা শোনাল। মিসেস গ্রান্টের গাড়িটাকে অ্যাকসিডেন্ট করতে দেখে তারা হাসপাতালে গিয়েছিল। সেখানে যে শুয়ে ছিল, তাকে দেখতে এই ভদ্রমহিলার মতো নয় বলে সন্দেহ হতে সে আর মেজর ব্ল্যাকপুলে ফিরে এসেছিল। এসে জেনেছে মিসেস গ্রান্টের গাড়িটা চুরি গেছে কিন্তু তাঁর কিছু হয়নি। সেই রাতে হোটেলে কিছু সন্দেহজনক লোককে দ্যাখে তারা। এবং এই ঘটনাটা জেনে গেছে বলে একদল লোক তাদের মুখ বন্ধ করতে চায় বলে সন্দেহ হয়েছিল। তাইই ব্রাউনকে মেজর বলে সন্দেহ করেছিল।

ঘটনাটা শুনে অফিসার-ইন-চার্জ জিজ্ঞেস করলেন, “এত ঘটনা পুলিশকে রিপোর্ট করেননি কেন?”

এবার মিসেস গ্রান্ট কথা বললেন, “ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখার জন্যে আমি ওঁদের রিপোর্ট নিয়ে ওই হাসপাতালে যাচ্ছিলাম।”

অফিসার-ইন-চার্জ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাবলেন, “ব্রাউনকে কিছুক্ষণ আগে আমরা ওই হাইওয়ের পাশে পেয়েছিলাম। ও অজ্ঞান হয়েছিল। একই গল্প শুনিয়েছে সে, অবশ্য প্রথমটা বলেনি জানত না বলে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনার গাড়ি চুরি করে অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে তার কী লাভ।” অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, “চলুন, আপনাদের নিয়ে ওই হাসপাতালে যাই। দেখি কে সত্যি বলছে।”

ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। অফিসার নিজের গাড়ির দিকে যেতেই মেজর ছুটে চলে গেলেন জানলার নীচে। পড়ে থাকা কলমটিকে তুলে ভূপ্তির হাসি হাসলেন। তাই দেখে অফিসার মস্তব্য করলেন, “মনে হচ্ছে ওই বস্তুর সঙ্গে আপনার কোনও স্মৃতি জড়িয়ে আছে।”

মেজর মাথা নাড়লেন, “অব কোর্স। আমাজন, আমাজন।” আর তখনই ঘরের ভেতর থেকে একটা সেপাই বারান্দায় বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলল, “অফিসার, আমাদের বেড়ালটা এই ঘরে এসে আচমকা মরে গেল।”

গাড়ি থেকে মুখ বার করে অফিসার-ইন-চার্জ ধমকে উঠলেন, “ফালতু কথা, বেড়াল আচমকা মরে নাকি!”

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে কলমটা আঁকড়ে ধরলেন ।

মৃত বেড়ালটাকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা সেপাই । তাই দেখে অফিসার-ইন-চার্জ গাড়ি থেকে যেন ছিটকে দৌড়ে এলেন, “ও, মাই গড ! হু কিলড্ হিম ?” বেড়ালটাকে হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখলেন তিনি, “উদ্ভ-এর কোনও চিহ্ন নেই । কী ঘটেছিল ঠিকঠাক বলো তো ?”

সেপাইটা বলল, “বেড়ালটাকে ঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম । তারপর আর খেয়াল করিনি । হঠাৎ দেখলাম, পড়ে গিয়ে উলটে গেল । ডেড ।”

“কোনখানটায় ?” অফিসার-ইন-চার্জ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ।

“আপনার টেবিলের ঠিক পাশে ।”

বেড়ালটা ফেরত দিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ বিড়বিড় করলেন, “বেড়ালও কি হার্টফেল করে ? উঃ, আজ সকালে থেকে একটার-পর-একটা বেয়াড়া ব্যাপার হচ্ছে । ভাল করে এর সমাধির ব্যবস্থা করবে, বুঝলে । মন খুব খারাপ হয়ে গেল হে ।”

মেজর এতক্ষণ অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনছিলেন কথাগুলো । তাঁর বাঁ হাত সমানে বুকপকেটের কলমটাকে আঁকড়ে রয়েছে । একফাঁকে ফিসফিসিয়ে বললেন, “বরাত ভাল, তাই বেড়ালের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা গেল । আহা, অবোধ প্রাণীটা শহিদ হল ।”

অফিসার-ইন-চার্জ সবাইকে ইশারা করে গাড়ির দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারকে হুকুম দিলেন, “ব্রাউনটাকে বের করে আনো তো ! ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাই ।”

ব্রাউনকে হঠাৎ কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্জুন বুঝতে পারছিল না । মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন । মেজরের সঙ্গেও আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না । কিন্তু মেজরই বললেন, “ওই ফেরেবাজ লোকটাকে খামোখা লক-আপ থেকে কেন বের করল বলো তো ? ঠিক তোমার মতো দেখতে আর-একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাবতে পারো ?”

অর্জুন কোনও জবাব দিল না । গাড়ি চলছে হাইওয়ে দিয়ে পুলিশ-কারকে অনুসরণ করে । বিপরীতমুখী গাড়ির ভিড় এখন বেড়েছে । কেউ-কেউ ক্যারিয়ারে লৌকা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে । ক্যারাভান চোখে পড়ল কয়েকটা । রাস্তার পাশে লেখা রয়েছে, এদিকে বাঁক নিলে রেস্টুরেন্ট এবং পেট্রল-পাম্প পাবেন । এর খানিকবাদেই হাসপাতালের চিহ্নটা দেখতে পাওয়া গেল । পুলিশের গাড়িটা সেদিকে বাঁক নিতেই ওরাও হাইওয়ে ছেড়ে নেমে এল ।

গাড়ি থেকে নেমে একজন অফিসার ছুটে গেল ভেতরে । অফিসার-ইন-চার্জ টেলিফোন তুলে গাড়িতে বসেই কারও সঙ্গে কথা সেরে ৩৬৬

নিলেন। ব্রাউন পেছনে চুপচাপ বসে। টেলিফোন নামিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, “এটা আমার জুরিসডিকশনে নয়। তোমাদের, মানে উনি যদি সত্যিকারের মিসেস গ্রান্ট হন, তবে ওঁকে লোকাল থানায় যেতে হবে। তার আগে আমার...”

অফিসার-ইন-চার্জের কথা শেষ হবার আগেই সেই অফিসারটি ফিরে এল। এসে জানাল, “যার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, তাকে দেখতে হলে মর্গে যেতে হবে। বোচারা বেঁচে নেই।”

অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, “এইমাত্র লোকাল থানা বলল সেই কথা। লেটস গো।”

জলপাইগুড়ির মর্গের ধারেকাছে গেলেই গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবে পেটে থাকলে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে পা বাড়াতে ইচ্ছে করছিল না অর্জুনের। মৃত্যু মহিলাটিকে দেখে তার কী লাভ? কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছিল না সে। অথচ যে-ঘরটায় তারা পৌঁছল তাকে মর্গ বলে কিছুতেই মনে হচ্ছিল না। ছিমছাম সুন্দর একটা কাচের এপাশে ওরা দাঁড়িয়ে। ওপাশে নম্বর-লেখা লকারের মতো ট্রে রয়েছে ঠাণ্ডা ঘরে। মর্গের ইন-চার্জ অফিসারের নির্দেশে বোতাম টিপতেই সেই ট্রে বেরিয়ে এল, যাতে মিসেস গ্রান্টের গাড়ি-চোর শুয়ে আছে। অফিসার-ইন-চার্জ তার সঙ্গীর দিকে তাকালেন। লোকটা চিনতে না পারার ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল। এবার তিনি মিসেস গ্রান্টকে প্রশ্ন করলেন, “আপনি একে কখনও দেখেছেন?”

যদিও কোনও গন্ধ নেই এবং শায়িতা মেয়েটির মাথায় সুন্দর ব্যান্ডেজ করা, তবু মিসেস গ্রান্ট নাকে ক্রমাল চেপে রেখেছিলেন। সে অবস্থায় তিনি মাথা নেড়ে না বললেন। অর্জুন দেখল, মেয়েটির বয়স বেশি নয় এবং ঠোঁটের ওপরে একটা জড়ুল আছে। এই সময় পেছন থেকে ব্রাউনের গলা ভেসে এল, “ও মাই গড।”

অফিসার-ইন-চার্জ ঘুরে দাঁড়ালেন, “ইয়েস? সামনে এগিয়ে এসো ব্রাউন। ডু ইউ নো হার?”

চোখ গোল করে ব্রাউন এগিয়ে এল কাচের দেওয়ালের সামনে। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। অফিসার-ইন-চার্জ খুশি হলেন, যেন এই উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রাউনকে লক-কাপ থেকে বের করে এনেছেন এই ভঙ্গিতে অন্য অফিসারকে নড করে ব্রাউনের কাঁধে হাত রাখলেন, “হু ইজ শি?”

ব্রাউন জিভ চাটল। নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, “হার নেম ইজ স্ট্রেন্জি। আই মেট হার টোয়াইস।”

“কোথায় ব্রাউন? বলে ফ্যালো চটপট।”

“একবার ম্যাগেস্তারে আর একবার এই দু’দিন আগে ব্ল্যাকপুলে।”

“কী করত ও?”

“যোগাযোগ ।”

“কী ধরনের যোগাযোগ ?”

“আমি ঠিক জানি না । দিব্যি করে বলছি । ও অনেক ওপরের ডালের পাখি ছিল ।”

“ব্ল্যাকপুলে ওকে কার সঙ্গে দেখেছ ?”

“ও একটা জিপে করে যাচ্ছিল । জিপের ড্রাইভারকে আমি চিনি না । ওকে দেখে আমার খুব আগ্রহ হয় । আমার কাছে একটাও পাউন্ড ছিল না, নইলে ট্যাকসি নিয়ে ফলো করতাম ।”

ব্রাউনের কথা শেষ হতেই মর্গের কেয়ারটেকারকে ট্রে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার ইঙ্গিত করে অফিসার-ইন-চার্জ ঘুরে দাঁড়ালেন, “লুক ব্রাউন । তোমার বিরুদ্ধে আপাতত আমার কোনও অভিযোগ নেই । কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি গম্ব পেয়েছিলাম, যা আমি অপরাধীদের গায়ে পেয়ে থাকি । তোমার কি খুব শখ হচ্ছে এখানকার কোনও খালি ট্রেতে শুয়ে পড়তে ?”

“ও, নো ।” ব্রাউন দ্রুত মাথা নাড়ল ।

“তোমার সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি কিছু জালিয়াতি আর জুয়ো খেলে পয়সা উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তেমন কোনও বড় কুকর্ম এখনও করেনি । অতএব ওই ট্রেতে যদি শুতে না চাও তা হলে সত্যি কথাটা গুছিয়ে বলো ।” বুকের ওপর দু’হাত ভাঁজ করলেন অফিসার-ইন-চার্জ ।

ব্রাউন ঠোট চাটল । এটা সম্ভবত লোকটার মুদ্রাদোষ । তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, “আমরা কি এই হতচ্ছাড়া জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি ?”

মাথা নেড়ে অফিসার-ইন-চার্জ দলটাকে নিয়ে বাইরে এলেন । তারপর মিসেস গ্রান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, “গাড়িটাকে আপনি নিজে একবার শনাক্ত করে আসুন ম্যাডাম । ইনশিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে তো আপনাকেই কথাবার্তা বলতে হবে । লোকাল পুলিশ-স্টেশনে ওটা রাখা আছে । পরে যদি কোনও প্রয়োজন পড়ে তা হলে আমরাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব ।”

মিসেস গ্রান্ট মেজরের দিকে তাকালেন । এখনও মেজরের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝেননি অফিসার-ইন-চার্জ । তিনি বললেন, “আপনি অফিসার, ইতিমধ্যে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার বন্ধুদের অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছেন । ওঁর সঙ্গে মিস্টার ব্রাউনের শুধু চেহারার মিল এবং উনি গাছ ঝাঁকছিলেন এটা কোনওভাবেই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না । উনি কি আমার সঙ্গে যেতে পারেন ?”

“এক মিনিট !” বলেই অফিসার-ইন-চার্জ ব্রাউনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, “স্ট্রেঞ্জার পুরো নাম কী ?”

“আমি জানি না অফিসার । লোকে ওকে ওই নামেই ডাকত । আসলে ও

যাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত তারা অনেক গভীর জলের মাছ। আমার সাধ্য ছিল না ওর কাছে পৌঁছবার।” সরল গলায় বলল ব্রাউন।

“কাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত? নামগুলো বলো চটপট।”

“একজনের নামই মনে আছে। কুঁজো-হারিস। সাপের বিষের ব্যবসা করত সে।”

কথাটা শোনামাত্র মেজর আবার বুকপকেটে হাত দিলেন। অফিসার-ইন-চার্জ জিজ্ঞেস করলেন, “এই কুঁজো-হারিসকে তুমি চিনলে কী করে?”

ব্রাউন হাসল। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাঠি বের করে দাঁতে চাপল, “ওকে সার ম্যাঞ্চেস্টারে সবাই চেনে। যারা সাপের বিষের ছোবল নিয়ে নেশা করে, তারা তো বেশি করে চেনে। ব্ল্যাকপুলে আমার যখন কিছু হল না তখন ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়েছিলাম ভাগ্য ফেরাতে। কিন্তু পাত্তাই দিল না কেউ। তাই এবার ব্ল্যাকপুলে ফিরে এসে স্ট্রেঞ্জিকে দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম আমি। মনে হল ওর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলে কাজের কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু পকেটে পয়সা ছিল না যে ফলো করব। তা ছাড়া জিপে কোনও মেয়ে বসে থাকলে আমার খুব অস্বস্তি হয়।”

“জিপটার মালিক কে তুমি জানো?”

“না। ব্ল্যাকপুলের কেউ নয়।”

এক মুহূর্ত ভাবলেন অফিসার, “ব্রাউন, তোমার কথায় যদি একটাও মিথ্যে থাকে, তা হলে একটা করে হাড় জমা রাখতে হবে তোমাকে। ওরা জিপে তুলে কী বলেছিল তোমাকে?”

ব্রাউন হাসল, “তিনবার বলেছি সার।” তারপরেই অফিসার-ইন-চার্জের মুখের দিকে তাকিয়ে চটপট গভীর হয়ে গেল, “গাড়িতে তুলেই একজন আমার কোমরে নল ঠেকাল। চাপা গলায় বলল, চিৎকার করলেই পেট ফুটো করে দেবে। আর-এটা লোক ব্যস্ত হয়ে বলল, ছোকরাটাকে তুলে আনা হল না কিন্তু। ড্রাইভ যে করছিল সে বলল, ওকে নিয়ে মাথা ঘামাব কেন, এই সাহায্য করবে। তারপর ওরা আমাকে নিয়ে এল সমুদ্রের ধারে শহর ছাড়িয়ে। গাড়ি খামিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করল, আপনার পাশপোর্ট? আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার কোনও পাশপোর্ট নেই। গলার স্বর শুনে সম্ভবত ড্রাইভারের সন্দেহ হল। সে নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী? নাম বলতেই আমার দাড়ি ধরে টানল। আমি চিৎকার করে উঠতেই সে ছেড়ে দিয়ে আবার গাড়িতে উঠল। কোনও কথা না বলে হাইওয়েতে এসে এক ধাক্কায় আমাকে রাস্তার পাশে ফেলে দিতে বলল সঙ্গীদের। অন্য কেউ হলে মরে যেত। কিন্তু চলন্ত গাড়ি থেকে পড়েও আমি মরিনি একটু কায়দা জানার জন্যে। অবশ্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।”

অফিসার-ইন-চার্জ মৃদু হাসলেন, “নাঃ, তোমার স্মৃতিশক্তি দেখছি বেশ ভাল। প্রথমবারে যা বলেছ তা থেকে সরে আসোনি। কিন্তু স্ট্রেঞ্জি কেন মিসেস গ্রান্টের গাড়ি চুরি করতে গেলেন?”

“আমি জানি না সার। বিশ্বাস করুন।”

ব্রাউনকে ছাড়া হল না। কিন্তু মেজরকে আর কামেলায় পড়তে হল না। অফিসার-ইন-চার্জ শুধু বললেন তিনি যেন যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই মেজরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই কারণে মেজর যেখানে থাকবেন তার কাছাকাছি পুলিশ-স্টেশনের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে কথা বলেন। যাওয়ার আগে ব্রাউন নিচু গলায় অর্জুনকে বলল, “এরা আমাকে ফরনাথিং হ্যারাস করছে। কিন্তু ইয়ং ম্যান, তুমি সাবধানে থেকো। সাম হাউ তোমাকে আমার ভাল লেগে গেছে বলে সাবধান করে দিচ্ছি।”

মেজরের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মাথা থেকে এক আকাশ ওজন যেন নেমে গেল। তিনি হাইওয়ের দিকে ছুটে-যাওয়া পুলিশের গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন,

“কী বিড়ম্বনা বোলা তো। ঠিক বললাম তো, কথাটা বিড়ম্বনাই তো?”

এই পরিস্থিতিতে একটি বাংলা শব্দের ঠিক প্রয়োগ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে পারে? মেজরের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, মানুষটির মন সত্যি শিশুর মতন। কিন্তু গুঁর পকেট থেকে বিষকলম সরিয়ে ফেলা উচিত। আবার কোথেকে ওটাকে কেন্দ্র করে বিপদ ঘাড়ে এসে পড়ে তা কে জানে! চোখের সামনে সেই মৃত বেড়ালটা যেন ঝুলছে। কিন্তু কথাটা সরাসরি বললেও বিপদ।

লোকাল পুলিশ-স্টেশনটিও আগেরটির প্রতিচ্ছবি। তবে এর অফিসার-ইন-চার্জ বেশ খোলামেলা লোক। মিসেস গ্রান্টের পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক বললেন,

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, আপনি ওই গাড়িতে ছিলেন না।”

গাড়িটা রয়েছে পুলিশ-স্টেশনের পেছনে একটা চালাঘরের নীচে। সেদিকে তাকিয়ে মিসেস গ্রান্ট গালে হাত রাখলেন। গুঁকে এখানে অনেক সময় কাটাতে হবে এখন। কীভাবে গাড়ি চুরি গেল, কখন জানতে পারলেন, পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন কি না থেকে শুরু করে ইনশিওরেন্স কোম্পানি পর্যন্ত হাজার প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করাতে হবে তাঁকে।

অর্জুন আর ভেতরে গেল না। পুলিশ-স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে মেজর বললেন,

“বেলা তো পড়ে আসছে। এবারে মার্শালের ওখানে যাওয়ার বাস ধরলেই তো হয়!”

অর্জুনও তাই চাইছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের লকারে যে বস্তুটি আবিষ্কার করে এনেছেন মিসেস গ্রান্ট, সেটির হদিস না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যাওয়া উচিত হবে না। মিসেস গ্রান্ট ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু সেটা করতে হলে সন্ধে হয়ে যাবেই। তার চেয়ে এখানে কোনও থাকার জায়গা আছে কি না খুঁজে-পেতে দেখা দরকার।

সেটের সন্ধান পাওয়া গেল। একজন কনস্টেবল জানাল, হাইওয়ের মুখেই ডান হাতে একটা মোটেল আছে। তবে সেখানে খাবারদাবার পাওয়া যায় না। মেজর কনস্টেবলকে বললেন, “দয়া করে মিসেস গ্রান্টকে বলবেন একটু অপেক্ষা করতে। আমরা পাশের সুপার মার্কেট থেকে ঘুরে আসছি।”

গাড়িতেই জিনিসপত্র রেখে ওরা খালি হাতে বের হল। চারপাশ ফাঁকা। শেষ বিকেলের আলোয় হাইওয়ে-ফেরত গাড়িগুলোকে দেখা যাচ্ছে। সুন্দর রাস্তায় দু-তিনজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল না। এমনকী, সুপার মার্কেট যেন ফাঁকা। বোস্টনের সুপার মার্কেটের সঙ্গে এর কোনও পার্থক্য নেই। মেজর চলে এলেন রেডিমেড খাবারের ব্লকে। অর্জুন ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পারস্পরিক বিশ্বাস কতটা থাকলে এমন দোকান চালানো যায়। পশ্চিমবাংলায় এইরকম অভ্যাস তৈরি করতে অনেক সময় লাগবে। এবং এইসময় সে জিপটাকে দেখতে পেল। মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁক নিয়ে সোজা সুপার মার্কেটের সামনে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিপের দরজা খুলে দু'জন লোক দু'পাশ থেকে নামল। একজন স্বাস্থ্যবান, মাথায় টাক, অন্যজন দোহারা লম্বা এবং মাথায় বাঁকানো ব্যালকনি-টুপি। গাড়ির দরজা চাবি দিয়ে লোক দুটো এগিয়ে আসছিল সুপার মার্কেটের দিকে। দোহারা চেহারার লোকটার হাঁটার ভঙ্গি দেখে অর্জুন দৌড়তে লাগল। প্রসাধনের ব্লক পেরিয়ে, কাঁচা সবজি ডিঙিয়ে সে মেজরের সামনে পৌঁছে গেল। মেজর ততক্ষণে বুড়ি-ভর্তি করে নানান খাবারের প্যাকেট নিয়ে কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছিলেন। ওকে দেখামাত্র বললেন, “একটু দুধও নিয়ে নিলাম, বুঝলে। চকোলেট দেওয়া।”

অর্জুন ওকে টেনে একটা সেলফের আড়ালে নিয়ে এল, “সেই জিপের মালিক আর তার সঙ্গী এই সুপার মার্কেটে ঢুকছে। আপনাকে ওরা চিনতে পারবেই। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়তে হবে।”

“অ্যা! ওরা এখানে?” মেজর প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, “লুকোব কী হে? ব্যাটারের ধরে পুলিশের কাছে তুলে দিই চলো। কোথায় ওরা?”

অর্জুন মেজরের কনুই ধরল, “ওসব করতে যাবেন না। ওদের বিরুদ্ধে আমরা কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারব না। আপনি ওই পেছনের দরজা

দিয়ে বেরিয়ে যান। আপনার দাড়ির জন্যে ওরা আপনাকে সহজেই চিনতে পারবে। আমি এগুলো নিয়ে কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি।”

মেজর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন কান দিল না। শেষপর্যন্ত মেজর বাঁ দিকে পা বাড়ালে সে ট্রলিটাকে ঠেলতে-ঠেলতে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে চলল। হয়তো এটা অসময়, তাই সুপার মার্কেটে ক্রোতা হাতে গুনে পাওয়া যাবে। অর্জুন দেখতে পেল লোক দুটো পাশাপাশি এগিয়ে আসছে প্যাসেজ দিয়ে। সে দাঁড়িয়ে গিয়ে সামনের সেলফ থেকে কুকুরের খাবারের টিন তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। লোক দুটো ওর মুখ দেখতে পাবে না সরাসরি। তাকে আমলও দিল না ওরা। সোজা এগিয়ে গিয়ে রেডিমেড খাবারের ব্লকে গিয়ে থামল। কুকুরের খাবারের টিনটা হাতে নিয়ে অর্জুন আড়চোখে দেখল, দোহারা চেহারার লোকটির হাতের ছড়ি বারংবার পায়ের পাশে মৃদু আঘাত করে যাচ্ছিল। তার নির্দেশে টাক-মাথা খাবার নিচ্ছে। অর্জুন আর দাঁড়াল না। কাউন্টারে দাম মিটিয়ে ট্রলি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার মুখে আড়চোখে সে দেখে নিল ওরা এখনও কাজ শেষ করেনি। এবং ওখান থেকেই সে মেজরকে দেখতে পেল। দূরে দাঁড়িয়ে তিনি হাত নাড়ছেন। ওরা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখতে পাবে ঠিক। অর্জুন হাত নেড়ে মেজরকে সরে যেতে বলতেই তিনি যেন খতমত হয়ে দ্রুত এগিয়ে পার্কিং লটের দিকে চলে এলেন। অর্জুন দেখল, ও একেবারে উলটো বুঝলি রাম-এর অবস্থা। সে ট্রলির বুড়ি থেকে প্যাকেটগুলো বের করে হনহনিয়ে চলে এল পার্কিং লটে। এখানে এখন দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির সংখ্যা গোটা পনেরোর বেশি হবে না। সে চিৎকার করে মেজরকে বলল, “ওই ভ্যানটার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকুন। ওরা আসছে।”

ঘাড় ঘুরিয়ে অবশ্য এখনও ওদের বেরিয়ে আসতে দেখল না।

মেজর তার কথা শুনেছেন। অর্জুন দেখল একমাত্র ভ্যানটার পেছনে যাওয়া ছাড়া এখানে ওদের নজর এড়িয়ে থাকা যাবে না। প্যাকেটগুলো নিয়ে সে চলে এল জিপটার পাশে। কাচের জানলা দিয়ে তাকাতেই সে চমকে উঠল। পেছনের সিটের ওপর সেই সাপের বুড়িটা রয়ে গেছে। অথচ আজ সে গাড়ির কাছে পৌঁছনো সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র আওয়াজ করছে না প্রাণীগুলো। ওরা কি তবে বুড়ির মধ্যে নেই? অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোক দুটো সুপার মার্কেটের দরজা দিয়ে বের হচ্ছে। সে চটপট জিপের পিছনে চলে এল। মাল রাখার একটা খোপ পেছনে রয়েছে যা এখন তালাবদ্ধ। ওরা নিশ্চয়ই কিনে আনা জিনিসপত্র রাখতে গাড়ির পেছনে আসবে। অর্জুন ঘুরে ডান দিকের চাকার কাছে চলে এসে বাতাস বের হবার মুখটা প্রাণপণে খুলতে লাগল। শেষ মুখটা ঘুরবার আগেই সে ছিটকে সরে এল পাশের গাড়ির পিছনে। ওরা

ততক্ষণে চলে এসেছে। দোহারা লোকটা জিপের পেছনে এসে জড়ানো গলায় কিছু বলতেই প্যাকেট হাতে লোকটা চাবি ঘোরাল। অর্জুন যে গাড়ির পাশে লুকিয়েছিল সেটা খুব নিচু। হাঁটু মুড়ে বসতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। দোহারা লোকটা চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। অর্জুন যথাসম্ভব নিজেকে লুকিয়ে মাঝে-মাঝে নজর রাখছিল। খোপের দরজা খুলে লোকটা একটা সুটকেস বের করে নীচে রেখে খাবারের প্যাকেটগুলো সেটার ভেতর ঢুকিয়ে আবার ঢাকনায় তাল লাগাল। তারপর ফিরে যাওয়ার সময় সুটকেস তুলতেই ওটা চওড়াভাবে অর্জুনের চোখের সামনে এক মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই সরে গেল। ওরা সুটকেসটা সিটের পাশে রেখে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অর্জুনের বুকের ভেতর তখন ড্রাম বাজছে। সুটকেসের ওপর স্পষ্ট লেখা দেখতে পেয়েছে, স্ট্রেক্স। ওটা স্ট্রেক্সের সুটকেস! স্ট্রেক্সের সুটকেস এদের সঙ্গে কেন? শুধু এই কারণেই তো ওদের ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়! চাকার মুখ ভাল করে খোলা হয়নি, নইলে গাড়িটা দাঁড়িয়ে যেত এতক্ষণে, আর এইসময় অর্জুন পিঠে কারও হাতের ছোঁয়া পেল। মেজর মনে করে মুখ ফেরাতেই লোকটা চোখ ছোট করে তাকাল, “হোয়াট হ্যাপেনড মাই ডিয়ার বয়? আমার এলাকায় কেউ নাক গলাক তা আমি একদম পছন্দ করি না যে।”

বেশ রোগা, চোয়াল-ভাঙা লোকটার পরনের কোটটায় বেশ কয়েকটা ফাটল, রংচটা প্যান্ট আর পায়ের জুতোর অবস্থা খুবই করুণ। কিন্তু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং কথা বলার মধ্যে দিব্যি মাতব্বর। অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “আমি তো কারও এলাকায় কিছু করতে আসিনি!”

হঠাৎ লোকটা খিকখিক করে হেসে উঠল, “ইয়ার্কি। নিজের চোখে দেখলাম, গাড়ির চাকার হাওয়া লোপাট করছ। কিন্তু কেন? কারও জানলা খোলা থাকলে যিদে পেলে আমি এক-আধটা প্যাকেট তুলে নিই, কিন্তু চাকার হাওয়া খুললে কী লাভ হবে বুঝতে পারছি না। যাহোক, এবার কেটে পড়ো চাঁদ। খুব ভাগ্য যে, টায়ার ফেঁসে যায়নি, নইলে ড্রাইভারকে বলে দিতাম তোমার কীর্তির কথা।”

“কেন বলতেন?” অর্জুনের বেশ মজা লাগছিল লোকটার কথা বলার ধরনে।

“বকশিশ দিত।” লোকটা হাত বাড়াল, “সিগারেট আছে?”

আর এই সময় মেজর চলে এলেন কাছে। লোকটা দেখে একটুও পাত্তা না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “চলে যেতে দিলে কেন? ধরে পুলিশে হ্যান্ডওভার করার সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিত হয়নি।”

অর্জুন বলল, “কিছু করার ছিল না। ওরাই যে আমাদের পেছনে লেগেছে, তার কোনও প্রমাণ নেই। অন্তত এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই।

চলুন।” ওরা কথা বলছিল বাংলায়। চোয়াল-ভাঙা লোকটা জুলজুল করে দেখছিল ওদের, এবং কথাবার্তার অর্থ অবশ্যই বুঝতে পারছিল না। এবার ওদের চলতে দেখে এগিয়ে এল চটজলদি, “হেই জেন্টলমেন, অন্তত একটা পাউন্ড ছাড়ো।”

মেজর প্রায় মারমুখী হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, “কে হে তুমি? তোমাকে খামোখা পাউন্ড দিতে যাব কেন? যাও, নিজের কাজ করো গিয়ে।”

লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে খিকখিক করে হাসল আবার, “ওই লোক দুটোকে দেখে অমন চোরের মতো লুকিয়েছিলে কেন? ঠিক আছে। আমি পুলিশ-স্টেশনে যাচ্ছি। গিয়ে বলব, তোমরা কী করছিলে।”

মেজর লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু অর্জুনের মনে হল, এই উটকো ঝামেলার জন্য পুলিশ-অফিসাররা তাদের সন্দেহের চোখে দেখবেনই। সে একটু নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, “তোমার কথা পুলিশ-অফিসাররা শুনবে বলে মনে করো?”

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল, “তা শুনবে না। আমাকে তো ওখানে ঢুকতে দিতেই চায় না। তবু বলব। চেষ্টায়ে বলব, যাতে ওরা তোমাদের ব্যাপারটা জানতে পারে।”

পুলিশ-স্টেশনের সামনে মিসেস গ্রান্ট এবং তার বান্ধবী দাঁড়িয়ে আছেন। রোদ নেই, ছায়া আরও ঘন হয়েছে। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে বলল, “চেষ্টায়ে আমাদের বিরুদ্ধে বলে পাউন্ড পাবে?”

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল লোকটা, “না। পাব না।”

মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন, “কেন ওর সঙ্গে কথা বলে মেজাজ খারাপ করছ?”

অর্জুন হাসল, “না, মেজাজ খারাপ হবে কেন? আপনি মিসেস গ্রান্টদের সঙ্গে কথা বলুন। আজ রাতে আমরা এখানকার মোটেলেই থাকব। আমি আসছি।”

মেজর খুব বিরক্ত মুখে এগিয়ে গেলে অর্জুন লোকটাকে বলল, “আমরা চোর-বদমাশ নই। তুমি সত্যি পাউন্ড রোজগার করতে চাও? আমি কাউকে ভিক্ষে দিই না। তবে তুমি যদি কাজ করে দাও, তা হলে আমি তোমাকে দুটো পাউন্ড দিতে পারি।”

“কাজ! না, না, পরিশ্রম করা আমার দ্বারা চলবে না।”

“সেটা তোমার সমস্যা! বুঝতেই পারছ, চোর হলে আমরা পুলিশ-স্টেশনে আসতাম না। এখন তুমি বলার আগেই আমরা মিথ্যে বলে তোমায় বিপদে ফেলতে পারি।”

লোকটা ঠোঁট ওলটাল। “বিপদে কী ফেলবে? পুলিশ যদি ক’দিন লক-আপে রাখে, তা হলে তো আমারই মজা। খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না। তা কাজের কথাটা কী বলছিলে?”

অর্জুন লোকটাকে ভাল করে লক্ষ করল। প্রচণ্ড সেয়ানা। কিন্তু দাগি অপরাধী নিশ্চয়ই নয়, নইলে এই পুলিশ-স্টেশন পর্যন্ত আসতে সাহস করত না। সে বলল, “তুমি তো তখন আমাদের লক্ষ করছিলে, কিন্তু গাড়িতে যারা মালপত্র তুলল তাদের ভাল করে দেখছ?”

“তা দেখব না? লম্বা লোকটাকে মনে নেই, তবে ওর সঙ্গীটা, ওকে তুলব না। আমাকে যদি একটা ঘুসি মারে নিষ্যাত উড়ে যাব।” লোকটা চোখ বন্ধ করে বলল, “আর হ্যাঁ, গাড়টাকেও মনে রেখেছি।”

“ভাল। আমার মনে হচ্ছে ওরা আজ এই অঞ্চলেই থাকবে। কোথায় আছে খোঁজ নিয়ে যদি আমাকে জানাও, তা হলে দু’ পাউন্ড পাবে। আমরা এখানকার মোটোলে উঠছি।”

লোকটা সেই বিরক্তিকর খিকখিক হাসিটা হাসল। “হেই মিস্টার, তুমি আমাকে খাটিয়ে কেটে পড়ার মতলব করছ না? এখানে তিনটে মোটেল আছে। তার কোনটায় তোমরা থাকবে?”

অর্জুন বিপাকে পড়ল, “এখনও ঠিক করিনি ভাই।”

লোকটা মুখ এগিয়ে আনল, “তা হলে তোমাকে একটা কথা বলি। ভুলেও জ্যাকের ওখানে উঠো না। ও আমার কাজিন। আসলে সম্পত্তিটা আমারই ছিল, ও নিয়ে নিয়েছে। আমার ঢোকা নিষেধ। এবার রইল ‘রিসর্ট’ আর ‘ভ্যালি ভিউ’। রিসর্টে বড়লোকেরা ওঠে। তোমরা বরং ভ্যালি ভিউতে উঠো। চারজন আছ তো! ঠিক আছে, আমি খবর দিয়ে রাখছি।”

“না, না, তোমাকে খবর দিতে হবে না।”

“আশ্চর্য! তুমি তো খুব বাজে লোক! খবর দিলে তোমরা যে ভাড়া দেবে, তার একটা কমিশন মোটেলের মালিক ম্যাস আমাকে দেবে। তোমাদের কী ক্ষতি হল?” লোকটা পিছু ফিরে কয়েক পা হেঁটে চিৎকার করল, “হেই ম্যান, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।”

“অর্জুন।”

“ও-ও—!” লোকটাকে হতাশ দেখাল। তারপর বলল, “ওই মোটিকাটার নাম কী? তোমারটা আমি উচ্চারণ করতে পারছি না।”

“মেজর!” উত্তর দিয়ে অর্জুন হেসে ফেলল। লোকটা এবার খুশি হল, “দ্যাটস গুড।”

মিসেস গ্রান্ট চাইলেন সেদিনই বোন্টনে ফিরে যেতে। কারণ তার বাস্কাবীর পক্ষে বিনা নোটিসে বাইরে রাত কাটানো সম্ভব নয়। পুলিশ-স্টেশনের বামেলা আপাতত মিটলেও ওঁকে হয়তো আবার এখানে আসতে হবে। গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগিয়ে তিনি রাস্তার একপাশে সেটাকে দাঁড় করালেন। এখন ঘড়ি অনুযায়ী রাত নেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখানে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর

অনেকক্ষণ নেভানো আলোয় পৃথিবী দৃশ্যমান থাকে। মিসেস গ্রান্ট তাঁর ব্যাগের ভেতর থেকে ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে-আসা কাগজটা বের করলেন, “ইটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে, একটা ম্যাপ এবং কিছু কোড লেখা আছে এতে। তোমরা কি ইন্টারেস্টড?”

অর্জুন হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। খুব আগ্রহ নিয়ে সে চোখ রাখল মিসেস গ্রান্টের কপি করে নিয়ে আসা লেখাটার ওপর। মেজর নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তার পাশে বসে ছিলেন। এমনকী, কাগজটার দিকে তাকাচ্ছিলেনও না। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে অর্জুন ভাঁজ করে কাগজটা বুক-পকেটে রাখল। মিসেস গ্রান্ট সামনের সিটে বসে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, “তোমরা কি আজ ব্ল্যাকপুলে ফিরে যাবে?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না, না। আমরা আর পিছু ফিরব কেন? এখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে মিস্টার মার্শালের ওখানে চলে যাব।”

“তা হলে তোমাদের জন্যে একটা হোটেলের ব্যবস্থা করতে হয়।” গাড়ি চালু করলেন মিসেস গ্রান্ট।

অর্জুন তাঁকে চটপট জানিয়ে দিল, “হোটেল নয়, মোটেল।”

আসলে সে মোটোলে কোনওদিন থাকেনি। হোটেল এবং মোটেলের পার্থক্য নিজের চোখে দেখাও হয়নি। ভারতবর্ষে মোটেল বলে কোনও থাকার জায়গা চালু আছে কি না তাও তার জানা নেই। সে মিসেস গ্রান্টকে বলল, “এখানে তিনটে মোটেল আছে। আপনি ভ্যালি ভিউ-তে চলুন।”

এবার মেজর নড়েচড়ে বসলেন, “আরে! তুমি নাম জানলে কী করে?”

অর্জুন হাসল, “জেনে ফেলেছি।”

মিসেস গ্রান্টের বান্ধবী বেশির ভাগ সময় চুপ করে থাকেন। এবার তাঁর বন্ধুকে বললেন, “শুনেছি এখানে একটা ভাল জায়গা আছে রিসর্ট নামে।”

অর্জুন বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয় ভ্যালি ভিউতে থাকাটাই সুবিধেজনক।” পথের পাশে লাগানো বোর্ডে চিহ্ন দেওয়া আছে আশেপাশে কী পাওয়া যাবে। কাউকে জিজ্ঞেস না করেই সেই চিহ্ন দেখে মিসেস গ্রান্টের গাড়ি এসে থামল ভ্যালি ভিউ মোটেলের সামনে। একটা ছোট লন, কিছু গাড়ি এবং দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পেছনে একতলা আউট হাউস গোছের বাড়ি। ওপরে লেখা, ‘মোটেল ভ্যালি ভিউ’।

জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলে মিসেস গ্রান্ট বললেন, “আমি কাল সকাল ছুঁটায় টেলিফোন করব। যদি কোনও সমস্যা হয় তা হলে আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবে।” বলতে-বলতে তিনি ব্যাগ খুললেন, “মেজর, আমার শুভেচ্ছার নিদর্শন তোমার বুকে রেখে দিও।”

অর্জুন দেখল, একটা লাল গোলাপ ভদ্রমহিলা মেজরকে দিলেন ব্যাগ থেকে

বের করে। গাড়িটা চলে গেলে ওরা জিনিসপত্র নিয়ে মোটেলের অফিস-রুমে চলে এল। অর্জুন দেখল মেজর বারংবার গোলাপের ঘ্রাণ নিয়ে বলছেন, ‘বিউটিফুল’।

এই সময় একটা লোক হাহা করে হেসে উঠল। অফিসঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বিশাল চেহারার লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। লাল গেঞ্জি, হাতে নানান উলকি। লোকটা হাসি থামিয়ে বলল, “হেই মিস্টার, প্যাকেটের বাইরে গন্ধ পাচ্ছ? দিনদুপুরে আর-একটা মাতাল এল।” মেজর খুব খেপে গেলেন, “কী, আমি মাতাল? আমাকে মাতাল মনে হচ্ছে?”

এইরকম গায়ে পড়া রসিকতায় অর্জুনও বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু মেজরের দিকে তাকিয়ে সে অবাক। এতক্ষণ মেজরের হাতে যা গোলাপ বলে মনে হচ্ছিল, তা লাল মোড়কের চকোলেটে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এবং তখন মেজরও সত্যিটাকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তিনি অর্জুনকে বললেন, “যাওয়ার আগে এই ম্যাজিক-রসিকতা করে গেল? হাইওয়ায়ে শিক্ষা হয়নি। কিন্তু তুমি বুঝতে পেরেছিলে এটা ফুল নয়?” অর্জুন মাথা নাড়ল।

হোটেলের চেয়ে বেশ শস্তা। ওই উলকি-পরা লোকটাই ম্যানেজার। খাতায় নামটাম লিখে দেওয়াল থেকে একটা চাবি বের করে মেজরের সামনে রেখে সে বলল, “চারজন ইন্ডিয়ানের আসার কথা ছিল। যার একজনের নাম মেজর। দু’জন কমে গেল কেন? আমি ফোর-বেডেড রুম রেখেছিলাম।”

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেজর ঝুঁকে দাঁড়ালেন টেবিলের ওপর, “আমার ডাকনাম জানলে কী করে হে? না অর্জুন, মনে হচ্ছে এখানেও গোলমাল আছে।”

অর্জুন হাসল, “আপনি কি স্যাম?”

“ইয়েস।” ম্যানেজার হাসল, “ইউ মেট টিম? টিম দ্য বেগার?”

লোকটার নাম তা হলে টিম? অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

স্যাম বলল, “টিম ফোনে তোমাদের কথা বলেছিল। কিন্তু দু’জন কমে যাওয়াতে আমার ঝামেলা বাড়ল। কবে যাবে তোমরা এখান থেকে?”

“কাল সকালেই।” অর্জুন জানাল। লোকটাকে ওইরকম চেহারা সত্ত্বেও তার মন্দ লাগছে না। “এদিকে ভারতীয়রা কদাচিৎ আসে। আমার মায়ের বাবা অনেকদিন সিমলায় ছিল। ইউ নো সিমলা। ইনফ্যান্ট মাই মাদার ওয়াজ বর্ন দেয়ার। খোঁজ নিলে দেখবে আউট অব টেন ব্রিটিশ ফ্যামিলিজ অন্তত দুটো ফ্যামিলির লোক ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল।” স্যাম হাসল। অর্জুনের একটু রাগ হল কথাটা শুনে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করেছিল এই কথাটা কি একটু ঘুরিয়ে বলে লোকটা খোঁচা দিল। সে ওই কথা তুলতে স্যাম হাত নাড়ল,

“আরে ম্যান, তোমার পূর্বপুরুষরা বোকামি করছিল বলে আমার পূর্বপুরুষরা সুবিধে পেয়েছিল। তোমার পূর্বপুরুষরা ইউনাইটেড ছিল না বলেই অমন কাণ্ড ঘটেছিল। আমাদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?”

চাবি নিয়ে নম্বর খুঁজে-খুঁজে শেষ ঘরটিতে যখন ওরা ঢুকল, তখন সঙ্গে পেরিয়ে গিয়েছে। বাইরে পাতলা অন্ধকার ফিনফিনে মশারির মতো টাঙানো। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। ঘরের ভেতরটা আহামরি নয়। দুটো বিছানা আছে বটে, কিন্তু তার অবস্থাও জলপাইগুড়ির হোটেলের তুল্য। একটা রুম-হিটার রয়েছে। মেজর ধরাচুড়ো ছেড়ে বিছানায় শরীর ফেলতে সেটা প্রতিবাদ করে উঠল। গায়ে না মেখে মেজর বললেন, “খুব টায়ার্ড! আজ সারাদিন যা ধকল গেল! খাবারগুলো খেয়ে সাততড়াতাড়ি শুয়ে পড়া যাক।”

ক্লান্তি লাগছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল খাবারের। টয়লেটের বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে গরমজলের দেখা পেয়ে খুশি হল অর্জুন। ঘরে ফিরে এসে সুপার মার্কেট থেকে কিনে আনা খাবারগুলো নিয়ে বসে সে মেজরকে জিজ্ঞেস করল, “মিসেস গ্রান্টের এনে দেওয়া কাগজটা সম্পর্কে আপনি তখন একটুও ইন্টারেস্ট দেখালেন না যে!”

একমুখ খাবার চিবোতে চিবোতে মেজর বললেন, “তোমার সেকেন্ড হ্যান্ড জুতো কেনার পর থেকেই একটার পর একটা ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে। মার্শালের কাছে আমার পৌঁছানোর কথা কবে আর আমি এখন কোথায় আছি!”

অর্জুন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, তাঁর সঙ্গে ইন্টারেস্ট না নেওয়ার কী আছে?”

“আরে! জুতো কেনার পর থেকেই কেউ না কেউ আমাদের বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে। তারা আছে অথচ সামনাসামনি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারছি না। এরকম কাঁহাতক ভাল লাগে!” মেজর খেয়ে যাচ্ছিলেন।

“আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না।” শান্ত মুখে অর্জুন বলল।

“তোমাকে তো বুদ্ধিমান বলে জানতাম হে। আজ সুপার মার্কেটের সামনে বদমাশটাকে পেয়েও তুমি ছেড়ে দিলে কেন? ল্যাঠা চুকে যেত ওদের পুলিশের হাতে তুলে দিলে!” মেজরের মুখ এবার ভারী। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল সত্ত্বেও সেই অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি।

“আপনাকে তো বলেছি কারণটা। প্রথমটা ওদের ধরা আমাদের দু'জনের পক্ষে কতটুকু সম্ভব হত, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, ওদের দোষী করার মতো কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।”

মেজর মাথা ঝাঁকালেন, “যাই বলো, তারপর থেকেই আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। কী লেখা আছে কাগজটাতে?”

অর্জুন বাঁ হাতে বুক পকেট থেকে কাগজটা বের করে সামনে রাখতেই মেজর এঁটো হাতে ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। আলোর দিকে কাগজটা ধরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “ইউরেকা! এই লেখাটা নিষাতি ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল। ইয়েস। ইন্ডিয়া, মানে, যদি বাংলাদেশে যায়, তা হলেও অবাক হবার কিছু নেই।”

অর্জুন হতভম্ব, “ওই কোড-ল্যান্ডুয়েজ পড়ে এত কথা জেনে ফেললেন?”

“ওহো অর্জুন, তুমি যদি পরিষ্কার দেখতে পাও, তা হলে আমার অভিজ্ঞতার দাম থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যে-অভিযাত্রী মানুষটি এই নোট লিখে গেছেন, তিনিও চাননি সাধারণ মানুষ চট করে বুঝে নিক তিনি কী বলতে চাইছেন।” মেজর ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছিলেন। কাগজটা হাতে নিয়ে প্রথমে জানলার দিকে তাকালেন, তারপর দরজার। এবার ঠোট চাটলেন। তারপর নিচু গলায় অনুরোধ করলেন, “অর্জুন, সাবধানের মার নেই। এসব নিয়ে আলোচনা করার আগে দরজা-জানলার ওপারে কেউ আড়ি পেতেছে কি না দেখে নেবে?”

অর্জুনের এবার মজা লাগল। এতক্ষণ বাদে মেজর যেন একটু ফর্ম ফিरे পেয়েছেন। সে উঠে জানলার ওপাশে কাউকে দেখতে পেল না। মেজর বলে উঠলেন, “দরজাটা, মনে হচ্ছে, দরজার বাইরে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে।”

হাসি চেপে অর্জুন দরজা খুলল। এবং তার নজরে এল লম্বা বারান্দা দিয়ে কেউ একজন হেঁটে আসছে। অর্জুনকে দেখতে পেয়ে লোকটা হাত তুলল, “হেই ম্যান?”

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, “হেলো!” ঘরের ভেতর থেকে মেজর বলে উঠলেন, “দ্যাখো, আমার সিক্সথ্ সেল বলছিল কেউ আড়ি পেতে শুনছে। লোকটা কে?”

ততক্ষণে টিম এসে পড়েছে কাছে, “এবার দুটো পাউন্ড দাও।”

অর্জুন বলল, “আগে কী কাজ করেছ বলো, তারপর ভাষা বাবে।”

টিম হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠল, “ওসব ভাবাবাবির মধ্যে আমি নেই। তুমি আমাকে একেবারে সাপের গর্তে পাঠিয়েছিলে। তোমাদের কথা ওখানে বলে আমি আরও বেশি রোজগার করতে পারতাম। নেতাহ ওই মোটাকাটা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলল। দাও, দাও।”

ততক্ষণে মেজর এসে দাঁড়িয়েছেন অর্জুনের পাশে। টিমকে দেখেই তাঁর মেজাজ চড়ল, “ও। তুমি? তখন থেকে আমাদের পেছনে লেগেছ। আড়ি পেতে কথা শোনা হচ্ছিল? তোমাকে আমি পুলিশের হাতে যদি না তুলে

দিই !”

অর্জুন তাড়াতাড়ি বাধা দিল, “মেজর প্লিজ। ইনি আড়ি পাতেননি। আমিই একটা কাজে ওকে পাঠিয়েছিলাম। ঠিক আছে টিম, বলো কী খবর?”

“না। আর না। যথেষ্ট হয়েছে। এই দেড়েলটা আমাকে অপমান করেছে।”

“তুমি ভুল ভাবছ। আসলে উনি একটু উত্তেজিত ছিলেন।”

টিম হঠাৎ মেজরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। ওর দৃষ্টি মুখ থেকে সরছিল না। মেজর খুব অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আরে, আমার দিকে ওভাবে তাকাবার কী দরকার?”

টিম নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, “আমি কাউকে বলব না। তোমার দাড়ি কি নকল?”

“নকল? আমার দাড়ি নকল? এ হতভাগা বলে কী?” মেজর আঁতকে উঠলেন।

টিম মাথা নাড়ল, “কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক তোমার মতো দেখতে একটা লোককে আমি ‘ভিলেজ পাব’-এ দেখে এলাম। দুটো মানুষের চেহারা একরকম হয় না। নিশ্চয়ই একজন আর-একজনকে নকল করছে।”

অর্জুন বলল, “তা হলে পুলিশ ওকে আর ধরে রাখেনি। এ-দেশের পুলিশ দেখছি আগেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। ছেড়ে দাও এসব কথা, টিম, বলো কী খবর?”

“পাঁচ পাউন্ড লাগবে। তার এক পেনি কম নয়। এই লোকটা আমাকে অপমান করেছে।”

“পাঁচ পাউন্ড? আমার বাড়ি।” খেঁকিয়ে উঠলেন মেজর। অর্জুন অনেক চেষ্টায় মেজরকে শান্ত করে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে টিম বলল, “আমাদের সরকারের কী হাল! নইলে এইরকম বদমেজাজি লোককে কী করে ভিসা দেয়! তুমি ভাল ব্যবহার করছ বলে কথা বলছি। পাঁচ পাউন্ড দাও, তারপর খবর শুনবে। আজকাল মানুষকে বিশ্বাস করি না।”

অর্জুন ঝুঁকি নিল। পাঁচটা পাউন্ড বের করে এগিয়ে ধরতেই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল টিম। নোটটা দেখে ভাঁজ করে কোমরের কাছে তৈরি করা পকেটে গুঁজে ফেলল। তারপর বলল, “ওই ঢ্যাঙা লোকটা হল হ্যাচ। ও নাকি প্রোফেসর। ওর সঙ্গীটির পরিচয় জানি না। দু’জনে এক ঘরে ওঠেনি। গাড়ি থেকে মালপত্র নিয়ে সঙ্গীটা প্রোফেসরের ঘরে রেখে এসেছে।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওরা কোথায়, মানে কোন হোটেলে উঠেছে?”

টিম হাসল। তারপর বলল, “একটু সামনে এগিয়ে বাঁ দিকে তাকালেই জিপটাকে দেখতে পাবে।”

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, “তার মানে? এই মোটেলেই উঠেছে?”

টিম বলল, “চোখ মেলে হাঁটো ছোকরা । তা হলে অবশ্য আমি পাঁচ পাউন্ড পেতাম না । দশ আর এগারো নম্বর ঘর । কোথাও না পেয়ে তোমায় খবর দিতে এসে এখানেই পেয়ে গেলাম । গুড নাইট ।” শিস দিতে-দিতে লোকটা চলে গেল ।

দরজাটা বন্ধ করে অর্জুন বলল, “দারুণ ব্যাপার । যারা আমাদের অনুসরণ করছে, তারা এই মোটেলই রয়েছে । ওদের নেতার একটা জিপ আছে, একটি স্বাস্থ্যবান দেহরক্ষী আর পোষা সাপ সঙ্গে রাখছে ।”

মেজর মাথা নাড়লেন, “তা হলে এরা তারা নয় ।”

“মানে ?” অর্জুন মেজরের এত নিশ্চিত হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না ।

“মনে করে দ্যাখো, বোল্টনের কাছে হাইওয়ের ডিপার্টমেন্টাল শপে দু’জন লোক জুতোর সন্ধানে এসেছিল । তাদের চেহারার সঙ্গে এদের কোনও মিল নেই । জিপে যে কাণ্ডটা ঘটল সেখানে আরও বেশি লোক ছিল । সেইরাতে সমুদ্রের ধারে আলোর সঙ্কেত দেখে তোমার কি মনে হয়নি একটা বড় দলের কাজ এটা ?” দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে চোখ বন্ধ করে কথাগুলো বলছিলেন মেজর ।

“কিন্তু মেজর, জিপটা প্রোফেসর হ্যাচের । তিনি মিসেস গ্রান্টের কথা বলছিলেন । ব্র্যাকপুলের হোটেলে উনি বলেছেন যে, ওঁর বাড়ি বোস্টনে । সেই জিপের মধ্যে আমি সাপের গর্জন শুনেছি । এখন জিপটা দাঁড়িয়ে আছে, এই মোটেলের পার্কিং লটে ।” অর্জুন বোঝাতে চাইল ।

মেজর চোখ খুললেন, “তাও তো বটে । তোমার কথাটা মেনে নিলে বুঝতে হবে, একটা বড় দল ওই জুতোর ভেতর রাখা কাগজটার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে । কিন্তু বাকিরা কোথায় ?”

“এখানে কি থাকার জায়গার অভাব ?”

“তা হলে তো পুলিশকে জানাতে হয় ।”

“কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন ?” অর্জুন হাসল, “তার চেয়ে এক কাজ করুন । সোজা প্রোফেসরের দরজায় নক্ করে জিজ্ঞেস করুন যে, কেন তিনি আমাদের সঙ্গে ছাড়ছেন না ?”

“মাথা খারাপ । ভদ্রলোক যখন সাপ পোষেন !”

“আপনি সাপকে খুব ভয় পান ?”

“বিন্দুমাত্র নয় । আমার সঙ্গেই বিষ আছে দেখছ ।”

“তা হলে এসব কথা ছেড়ে দিন । এরা তো সরাসরি আমাদের ওপর হামলা করছে না ! এবার আসুন, ওই কাগজটিতে কী লেখা আছে, শোনা যাক !”

“কেউ যদি আড়ি পেতে শোনে ?”

নিজের ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি আর কলম বের করে মেজরের দিকে এগিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, “বাংলায় লিখে দিন। এখানে কেউ পেলেও মানে বুঝতে পারবে না।”

খুশি হয়ে মিসেস গ্রান্টের কপি করে আনা কাগজটা সামনে রেখে কলম খুললেন মেজর। কিন্তু তারপরেই ঊঁর মুখ বাচ্চা ছেলের মতো হয়ে গেল। তিনি বললেন, “কিন্তু, অর্জুন, বাংলা লিখতে গেলেই যে গোলমাল হয়ে যায় আমার। খুব বানান ভুল হয়।”

অর্জুনের হাসি পেল। মেজর দীর্ঘদিন বিদেশে আছেন, ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু জলপাইগুড়ির অনেক শিক্ষিত মানুষ কোনও কিছু লিখতে গেলে বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। সে বলল, “ভুল বানান বুঝতে আমার অসুবিধে হবে না।”

মেজর এবার একবার কাগজ দেখছেন, চিন্তা করছেন, তারপর সেটাকে নিজস্ব বাংলায় অনুবাদ করছেন। অর্জুন চুপচাপ দেখাচ্ছিল। মেজর যে-অর্থ তৈরি করছেন, সেটা সত্যি কি না তা এই মুহূর্তে বোঝার কোনও পথ নেই। থাকলে কপি করে আনা কাগজটা ছিড়ে ফেলা যেত।

ইশারায় মেজর এমনভাবে ডাকলেন যেন ঘরের মধ্যেই অনেকজোড়া কান খাড়া হয়ে আছে। অর্জুন উঠে ডায়েরিটা তুলে নিল। সমুদ্র বানানে দীর্ঘ-উকার আছে। লেখাটা ঠিকঠাক বুঝতে একটু সময় লাগল। সমুদ্র। বড় ঢেউ। উত্তর দিকে একঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড়টানা নৌকোর। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর। মে মাসে সূর্য মাথার ঠিক ওপরে আসে সাড়ে বারোটায়। ডুবুরি। পাথরটা নড়েনি নোয়ার আমল থেকে। জাহাজ-বাঁধা পাথর। সুড়ঙ্গটা তার তলায়। ঢুকবে একটা মানুষ।

দু'বার পড়ল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, “সমুদ্রটা কোথায়?”

“তা তো লেখা নেই। ফ্যাদম নটগুলো ফালতু লেখা। আসল মানেরটা এই।”

“কিন্তু তা থেকে তো জায়গাটা বোঝা যাবে না। যিনি এত সতর্ক, তিনি এই সূত্র না রেখে যাবেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।” অর্জুন মাথা নাড়ল।

“তুমি কি বলতে চাইছ আমি অর্থ বুঝতে পারিনি। দ্যাখো অর্জুন, তোমার বয়স কম হলেও অনুসন্ধানের ব্যাপারটা ভাল বোঝো, কিন্তু সেই বোঝাটায় তো এখনও ম্যাচিওরিটি আসেনি। তুমি বলতে চাইছ আমার অভিজ্ঞতার কোনও দাম নেই?” মেজরকে খুব অখুশি দেখাচ্ছিল।

“আপনার অভিজ্ঞতাকে আমি অবজ্ঞা করব কেন? আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। পৃথিবীর কত রহস্যময় জায়গায় আপনি গিয়েছেন। আপনার কি কখনও মনে হয়েছে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি না?”

“না, না। তা মনে হয়নি অবশ্য। কিন্তু ওই কাগজটায় যে কোডগুলো

ব্যবহার করা হয়েছে তা আমার খুব পরিচিত। তুমি মার্শালের সঙ্গে আলাপ হলে ওকে দেখিও, সে-ও একই কথা বলবে।”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু মেজরের ব্যাখ্যা সে মন থেকে নিতে পারছে না। একটি মানুষ কিছু দামি জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। তারপর তাঁর মনে হয়েছে, যদি পৃথিবীতে না থাকেন তবে একটা সূত্র রাখা দরকার সেটা উদ্ধার করার। তিনি সূত্রটি ব্যাকের লকারে রেখে লকারের চাবি নিজের বাড়ির বাগানে গাছের কোটরে রেখে দিয়েছেন, যাতে সহজে কারও হাত না পড়ে। এবার সেই গাছের কোটরের বিবরণ সাক্ষেতিক ভাষায় লিখে নিজের জুতোর তলায় গোপন গর্ত করে রেখে দিয়েছিলেন। এত সতর্কতা যিনি পছন্দ করেছিলেন, তিনি চাননি চট করে কেউ ওই লকার পর্যন্ত পৌঁছে যাক। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে লকারটার হদিস পাবে তাকেও তিনি বিভ্রান্ত করবেন কেন? অতগুলো পরীক্ষায় পাশ করে যে এল, তাকে তিনি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবেন গুপ্তধন পেতে গেলে কী করতে হবে। সমুদ্র। বড় টেউ। উত্তর দিকে দাঁড়ানো নৌকায় এক ঘণ্টা যেতে বলেছেন তিনি। কিন্তু কোন সমুদ্র? তার কোন তট থেকে? এরকম ভুল কেউ করে? আর আকাশ এবং মাটি সমান দূরত্বে যে-কোনও সমুদ্রে গেলেই পাওয়া যাবে। মাথার ওপরে সূর্য আসার ব্যাপারটা কোনও মানে তৈরি করে না। শুধু সমুদ্রে ডুব দিয়ে একটা বিশাল প্রাচীন পাথরের সন্ধান করতে হবে যার তলায় সুড়ঙ্গ রয়েছে, এই খবরটাই ঠিকঠাক। কিন্তু শেষের এই খবর সম্বল করে তো এগোনো যায় না। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল মিসেস গ্রান্টরা ব্যাক্সে যখন লকার থেকে মূল কাগজটা বের করে নকল করছিলেন, তখন কোনও শব্দ ভুল করে বাদ দেননি তো! ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মেজর এর মধ্যে প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকছেন। অর্জুন উঠে নকল করে আনা কাগজটি আবার দেখল। টানা ইংরেজি নয়। যে-শব্দগুলো আছে তা ইংরেজির মতো, কিন্তু মেজর বলেছিলেন পুরনো ইংরেজি। একটা পালতোলা নৌকোর ছবি আঁকা আছে। টানা পড়তে চাইলে কোনও মানে তৈরি হয় না।

ঘুম ভাঙল নাক ডাকার শব্দেই। অর্জুন মুখ থেকে কন্ডল সরিয়ে সময় বুঝতে পারল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে অবাক। সাড়ে আটটা বাজে। এবং তখনই খিটোকে টের পেল। দরজা-জানলা বন্ধ, কিন্তু ঘরটাই যেন বরফ হয়ে আছে। সে বিছানা থেকে নেমে কাঁপতে-কাঁপতে বাথরুমে গেল। বাথরুমের জানলার পরদা সরিয়ে মনে হল পৃথিবীটা ছায়া-ছায়া, কোথাও আলোর চিহ্ন নেই।

তৈরি হয়ে অর্জুনের মনে হল, মেজরকে আর একটু ঘুমোতে দেওয়া যাক। বয়স হয়েছে, এখন তো একটু বিশ্রাম দরকার। সে দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়াল। আকাশে চাপ-চাপ ময়লাটে মেঘ। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিও হয়ে গেছে একটু

আগে। সূর্যদেবের কোনও চিহ্ন নেই। কেমন একটা আলসেমিতে জড়ানো চারধার। জলপাইগুড়ির বর্ষাকালেও এমন ভিজে সকাল আসে না। কিছু খাওয়া দরকার এবং আসার সময় মেজরের জন্যে প্যাকেট নিয়ে আসতে হবে। মোটেল ছেড়ে বারটায় বেরোলেই চলবে। ওয়েদার খারাপ বলে নিশ্চয়ই এখানে বাস বন্ধ হয় না।

কয়েক পা হাঁটতেই পার্কিং লটটা নজরে এল। বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে, কিন্তু প্রোফেসর হ্যাচের জিপ নেই। অর্জুন চারপাশে তাকাল। তাদের অনুসরণকারীদের কথা সে একদম ভুলে গিয়েছিল। ওরা কি ভোরবেলায় চলে গেছে? ওরা কি টের পায়নি যে, একই মোটলে তারাও আছে। সতর্ক পায় হাঁটতে-হাঁটতে সে রিসেপশনে এসে এক বয়স্কা মহিলাকে দেখতে পেল। রেজিস্টারে কিছু লিখছিলেন, ওকে দেখে হেসে বললেন, “গুড মর্নিং!”

অর্জুন বলল, “গুড মর্নিং। আচ্ছা, এখানে খাবারের দোকান কোথায়?”

“কী খাবে?”

“ব্রেকফাস্ট।”

“গেট পেরিয়ে বাঁ দিকে মিনিট-তিনেক গেলেই রেস্টুরেন্টের সাইন দেখতে পাবে।”

“কাল যে ভদ্রলোক রিসেপশনে ছিলেন, তিনি কখন আসবেন?”

“বারোটোর পর।”

“ও। তার আগেই অবশ্য আমরা বেরিয়ে যাব। আচ্ছা, প্রোফেসর হ্যাচরা কি চলে গেছেন?”

“প্রোফেসর হ্যাচ?”

“যিনি জিপে এসেছিলেন?”

“ও। হ্যাঁ। একটু আগেই ওরা বেরিয়ে গেলেন।” মহিলা বললেন, “আপনি ওঁকে চেনেন?”

“না। তবে নাম শুনেছি।”

“ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন পরে আবার এখানে এলেন।”

আগে বুঝি খুব আসতেন?”

“দু-তিন বছর আগে।”

মহিলার কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন গেটের দিকে হাঁটা শুরু করতেই কনকনে হাওয়ার মধ্যে পড়ল। যদিও বৃষ্টি নেই, তবু ঠাণ্ডা যেন হাড়ের ভেতরে ঢুকছে। প্রোফেসর হ্যাচ দু-তিন বছর আগে খুব আসতেন এখানে। যে অভিযাত্রীটু গুপ্তধন রেখেছেন, তিনি গত হয়েছেন ওই সময়েই। তা হলে কি সমুদ্রটা এই তল্লাটেই। হ্যাচ যেটা আন্দাজ করতে পারছেন, কিন্তু সঠিক হদিস পাচ্ছেন না।

ব্যাপারটা ভাবতে-ভাবতে রেস্টুরেন্টের কাঁটা চামচের সাইনবোর্ড দেখতে

পেল। রাস্তা ছেড়ে সে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। এই ঠাণ্ডার সকালে কোনও খন্দের নেই। বৃদ্ধ দোকানদার মাথা নাড়লেন। মেনুবোর্ড দেখে অর্জুন দু'পাউন্ডের মধ্যে খাবারের অর্ডার দিয়ে কোণার টেবিলে বসল। এখান থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। এবং সেই ভিজে রাস্তায় একটিও মানুষ নেই। কাউন্টারে বৃদ্ধের মাথার ওপর টি-ভি চলছে। বিবিসির খবর হচ্ছে সেখানে। অর্জুন কিছুক্ষণ মন দিয়ে খবর শোনার চেষ্টা করল। রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো তার মোটেই ভাল লাগে না। সে আবার রাস্তার দিকে তাকাল। এখানকার মানুষেরা কি কাজ আর বাড়ি ছাড়া কিছু বোঝে না? এইসময় খাবার দিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। অর্জুন তাঁকে একই খাবার প্যাক করে দিতে বলল। খিদেটা জব্বর। খাওয়া প্রায় শেষ করে নিয়ে মুখ তুলতেই সে টিভিতে সমুদ্র দেখতে পেল। অস্থির ঢেউগুলো পেরিয়ে একটা স্পিড বোট ছুটে যাচ্ছে। তিনি খবর পড়ছিলেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছে না এখন, কিন্তু গলা শোনা যাচ্ছে। স্পিডবোটটা গিয়ে একটা ছোট লঞ্চার গায়ে লাগল। বোট থেকে দু'জন সেখানে উঠে গেলেন। একজনের হাতে সানগান আর টেপ রেকর্ডার। অন্যজনের হাতে টিভি-ক্যামেরা। সংবাদপাঠককে বললেন, “আমাদের প্রতিনিধিরা মিস্টার মার্শালের সঙ্গে কথা বললেন। মিস্টার মার্শাল বললেন, “এবার টিভি-তে এক ইংরেজ স্ট্রোডের মুখ, ‘হ্যাঁ, শাক। এই তল্লাটের সমুদ্রে শার্ক এসেছে। প্রথম দিকে দিনের বেলায় আসত। এখন রাত্রে হানা দিচ্ছে। এর ফলে আমার গবেষণার কাজ খুব ব্যাহত হচ্ছে।”

প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, “মিস্টার মার্শাল, আমরা জানি আপনি মুক্তো নিয়ে রিসার্চ করছেন। এত জায়গা থাকতে এই সমুদ্রকে বেছে নিলেন কেন?”

“আমার জানা ছিল এই সমুদ্রে কোনও সামুদ্রিক জন্তুর উৎপাত নেই। দাঁড়ানা নৌকোয় চেপে চমৎকার ঘুড়ে বেড়ানো যায়। কিন্তু হঠাৎ সেখানে কী করে শার্ক ঢুকল বুঝতে পারছি না।”

মিস্টার মার্শালের বয়স হলেও স্বাস্থ্যটি ভাল। মুখে চাপ লাল দাড়ি। সংবাদ-পাঠক অন্য বিষয় নিয়ে বলা শুরু করতেই প্রায় লাফিয়ে উঠল অর্জুন। ওই মার্শাল নিশ্চয়ই মেজরের বন্ধু। মেজর বলেছিলেন তাঁর বন্ধু মুক্তো নিয়ে গবেষণা করছেন। অর্জুন দ্রুত কাউন্টারে চলে গিয়ে দাম মিটিয়ে প্যাকেট নিয়ে প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে চলে এল মোটেলে।

মেজর দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুব বিরক্ত। অর্জুনকে দেখামাত্র টেঁচিয়ে উঠলেন, “বাঃ। আমাকে কিছু না বলে তুমি উধাও?”

“আপনার জন্যে খাবার আনতে গিয়েছিলাম।”

“তা যাও। যাওয়ার আগে পকেটে পাউন্ড আছে কি না দেখে যাবে তো? হুটহাট বেরিয়ে গেলেই হল?”

অর্জুন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, “আমার মানিব্যাগ তো সঙ্গেই রয়েছে।”

মেজর এবার হো হো করে হাসলেন, “ও! আমার টাকায় খেতে ইচ্ছে করছিল বুঝি?”

“আমি আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“বাঃ। তুমি এই নেংটি ইদুরটাকে পাঠাওনি আমার কাছ থেকে দশ পাউন্ড চেয়ে?”

“নেংটি ইদুর?”

“ওঃ। কাল যে তোমার দূতের কাজ করেছিল। লোকটা এসে বলল, “তাড়াতাড়ি দশ পাউন্ড দিন, উনি খাবারের দোকানে আটকে আছেন।”

“লোকটা বলল আর আপনি দিয়ে দিলেন?”

“মানে? তুমি ওকে পাঠাওনি দশ পাউন্ডের জন্যে?”

“না। আমি কাউকে পাঠাইনি।”

“সে কী! আমি তো ওকে সন্দেহ করিনি একফোঁটাও।”

দশ পাউন্ড কম কথা নয়। খাবার খেতে বসেও মেজরের চোখ দেখার মতো ছিল। বারংবার বলে যাচ্ছিলেন, “লোকটা বেমালুম ঠকিয়ে দিল আমাকে? বুঝলে হে, দেখার চোখটাই বড়, অভিজ্ঞতার বড়াই করে কোনও লাভ নেই। ও হ্যাঁ, দশ পাউন্ড নিয়ে চলে গিয়েও লোকটা আবার ফিরে এসেছিল। ওই খামটা দিয়ে গিয়েছে। বলেছে তুমি এলে তোমায় দিতে।”

টেবিলের ওপর রাখা ছোট খামটা দেখল অর্জুন। এই মোটেলের রিসেপশনে যে খামগুলো রাখা আছে তারই একটা দিয়ে গেছে লোকটা। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে খামটা তুলে বুঝল ভেতরে কাগজ আছে। সে কাগজটা বের করতেই খুব খারাপ হাতের লেখায় লোকটার বক্তব্য পড়ল, “ডিয়ার মিস্টার ব্রাদার অব মেজর। তোমার দাদাকে ঠকিয়ে আমি দশ পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি না। তোমরা যাদের ভয় পাচ্ছ তারা আজ সকালেই সমুদ্রের দিকে রওনা হয়েছে। এই খবরটার দাম দশ পাউন্ডের বেশি হবে। কী বলো? নীচে কোনও নাম-সই নেই।” অর্জুন হেসে ফেলল। সুপারমার্কেটের সামনে যে লোকটা প্রায় ভিক্ষে করে কাটায়, তারও রসিকতা করার ক্ষমতা আছে। খেতে-খেতে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “হাসছ যে?” অর্জুন চিঠিটা এগিয়ে দিল।

বাসে পাশাপাশি দুটো সিট পাওয়া যায়নি। মোটেল থেকে বেরোবার পথে অর্জুন মেজরকে বি বি সির খবরটার কথা বলেছিল। মেজর খবরটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, “দুর! এখানে শার্ক আসবে কোথেকে? মার্শালের বড় সন্দেহবাতিক। আর ওকে তো আমি চিনি, সবসময় নিজের পাবলিসিটি চায়। তুমি ঠিক বুঝেছ ওই মার্শাল?”

অর্জুন বলল, “মুক্তোর গবেষণা করছেন। মুখে লাল দাড়ি, ভাল স্বাস্থ্য।”

“মিলছে। তা স্বাস্থ্য ওর কী এমন ! পাঁচ বছর আগে আমাকে দেখলে বুঝতে পারতে স্বাস্থ্য কাকে বলে !” মেজর গর্বিত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন।

জানলা দিয়ে ইংল্যান্ডের গ্রামের খেত দ্রুত সরে-সরে যেতে দেখল অর্জুন। চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ চলকে উঠল যেন। বিবিসির প্রতিনিধির কাছে মার্শালসাহেব আজ বলেছেন, “আমার জানা ছিল এই সমুদ্রে কোনও সামুদ্রিক জন্তুর উৎপাত নেই। দাঁড়টানা নৌকোয় চেপে চমৎকার ঘুরে বেড়ানো যায়।” দাঁড়টানা নৌকোর কথা হঠাৎ বললেন কেন মার্শালসাহেব ! লকারের কাগজটিতেও তো দাঁড়টানা নৌকোর কথা বলা আছে। আজকের পৃথিবীতে যখন এতরকমের আধুনিক জলযান তৈরি হয়েছে তখন সমুদ্রে দাঁড়টানা নৌকোর ঘোরাফেরার কথাটা কি স্বাভাবিক ? নাকি ওই অঞ্চলে দাঁড়টানা নৌকোয় ঘুরে বেড়ানোই রেওয়াজ ! তা হলে মার্শাল সাহেব এখন যে সমুদ্রে মুক্তো নিয়ে গবেষণা করছেন সেই সমুদ্রের কথাই কি লকারে রাখা কাগজটাতে বলা হয়েছে ! প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে সে একটু এগিয়ে বসা মেজরের দিকে তাকাল। মেজর এই দুপুর বেলাতেও ঘুমাচ্ছেন। পাশে-বসা এক ভদ্রলোক আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, “কোনও প্রবলেম ?”

অর্জুন প্রশ্ন শুনে নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বলল, “না, না তো।”

তখনই তার গুরু অমল সোমের একটা কথা খেয়াল হল। “কখনওই ওয়ান প্লাস ওয়ান করে কোনও সিদ্ধান্তে বাঁপ দিয়ে এগিয়ে না।” পৃথিবীর অনেক সমুদ্রেই হয়তো দাঁড়টানা নৌকো চলে। অর্জুন অলস হয়ে আবার বাইরের দিকে তাকাল। হঠাৎ দূরে সবুজ, জমাট সবুজের গালচে ছড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হল। জানলার কাচ বন্ধ। বাস বাঁ দিকে যখন ঘুরছে তখন ওটা হারিয়ে যাচ্ছে। আবার ডানপাশে ফিরতেই ওটা অনেক কাছে এগিয়ে আসছে। সবুজ গালচে যে সমুদ্রের চেহারা তা বুঝতে পেরে উত্তেজনাটা আবার ফিরে এল। এত শান্ত সমুদ্র, যেন ব্ল্যাকপুলকেও হার মানায়। কিন্তু যত বাস এগিয়ে যাচ্ছিল, তত ছোট-ছোট ঢেউ দেখতে পেল সে। এবং সেই ঢেউয়ের পালতোলা দাঁড়টানা ছোট-ছোট নৌকো মোচার খোলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। বাসের টার্মিনাসে পৌঁছে গেলে যাত্রীরা যখন নামতে শুরু করেছে, তখন দুপাশে হাত ছুঁড়ে মেজর হাই তুললেন। তুলে ঘোষণা করলেন, “এসে গেছি, বুঝলে !”

অর্জুন খানিকটা পেছনে ছিল। মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন মেজর। বাসের প্রায় সব লোক নেমে গেছে। অর্জুন এগিয়ে মেজরের পাশে পৌঁছতেই তিনি বললেন, “একটু আগে একটা মারাত্মক স্বপ্ন দেখলাম। তাই, বলছি কি, লকারের কাগজে যাই লেখা থাক তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে কী লাভ ! আমরা তো ইংল্যান্ডে গুপ্তধন খুঁজতে

আসিনি।”

“কী স্বপ্ন দেখেছেন?”

“খুব খারাপ। তারপর ধরো, স্বপ্নটাকে মিথ্যে করে আমরা এককাঁড়ি মণিমুক্তো পেলাম খুঁজে। কিন্তু লাভ হবে কিছু! এ-দেশের কাস্টমস তার একরস্তু নিয়ে যেতে দেবে না। শুধু-শুধু পরিশ্রমই সার হবে। তার ওপর জীবনের ঝুঁকি।” খুব গভীরভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন কথাগুলো মেজর। অর্জুন হাসল, “আমরা তো এখনও পর্যন্ত সমুদ্রটার হৃদস পাইনি। অতএব ওসব চিন্তা করে লাভ কী? স্বপ্নে কি নিজেকে মৃত দেখলেন?”

করণ ভঙ্গিতে দু'বার মাথা নাড়লেন মেজর।

অর্জুন বলল, “উঠুন, নিজের মৃত্যু স্বপ্নে দেখলে আয়ু বেড়ে যায়।”

“সত্যি বলছ? কিন্তু তা হলে তো সবাই নিজের মৃত্যু স্বপ্ন দেখত।”

অর্জুন হেসে ফেলল, “আপনি বুঝি ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারেন?”

“তা পারি না।” এবার মেজর লাফিয়ে উঠলেন সিট থেকে, “এত তাড়াতাড়ি মরব না বলছ?” সেই সময় একজন যুনিফর্মপরা লোক দরজায় মাথা গলাল, “জেন্টলমেন, টিকিটের দাম কি এখনও ওঠেনি বলে তোমাদের মনে হচ্ছে?”

তড়িঘড়ি মালপত্র নিয়ে নেমে এল ওরা। সামনেই একটা বাড়ি। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, “মার্শাল সাহেবের ওখানে পৌঁছতে গেলে কি করতে হবে জানেন?”

মেজর বললেন, “অবশ্যই। জেটিতে চলো।”

পা বাড়তে গিয়েই অর্জুন মেজরের হাত শক্ত করে চেপে তাঁকে আটকে দিল, প্রোফেসর হ্যাচের জিপ সামনের রাস্তাটা দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল।

জিপটি হ্যাচের কি না সে-বিষয়ে যখন অর্জুন একটু দ্বিধাগ্রস্ত, ঠিক তখনই একজনের ওপর নজর পড়ল। এখানকার সমুদ্রের জল নীল নয়। একটা সবজে ছায়া যেন জলের ওপর নেতিয়ে রয়েছে। আর সেই কারণেই সমুদ্রটাকে কীরকম বিমর্ষ দেখাচ্ছে। হাওয়ায় ওঠা ছোট-ছোট ঢেউ যেন জলের ওপর গড়িয়ে চলেছে সমানে। সমুদ্র ঢুকে এসেছে অনেকটা ভেতরে। যেন ইংরেজি ইউ অক্ষরের ভেতরের খালি জমিটা সমুদ্রের দখলে। নানান ধরনের পাল-তোলা নৌকো এই তিন দিক বন্ধ সমুদ্রের বুকে মহানন্দে ভাসছে। পাড়ে লোকজন বেশি নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে এলোমেলো। অর্জুন লোকটাকে দেখেই এবার চিনতে পারল।

মেজরও দেখেছিলেন ওকে। দেখে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, “হতভাগাটা এখানে এল কোথেকে? আবার হাত নাড়া হচ্ছে।”

সত্যিই ব্রাউনকে দেখলে মেজর বলে চমৎকার ভুল হয় । শুধু চামড়ার রংটা যদি কিছুদিন হাজারিবাগে থেকে পালটে আনতে পারত, তা হলে আর কথাই ছিল না । বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছতেই ব্রাউন বলল, “মিসেস গ্রান্ট বললেন তোমরা এখানে এসেছ । পথে কোথায় ফেঁসেছিলে হে ?”

মেজর চটপট ধমকে উঠলেন, “তাতে তোমার কী দরকার ? আমরা যেখানে যাচ্ছি তোমার সেখানে যাওয়া আমি মোটেই পছন্দ করছি না । আর পুলিশগুলো হয়েছে এমন, হট করে ছেড়ে ছিল দ্যাখো । আরও দিন-দশেক আটকে রাখলে কী ক্ষতি হত ?”

ব্রাউন বলল, “হত । আমাকে দু’বেলা খাওয়াতে হত । আমি তো তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা খরচ বাঁচাল । চারধারে এখন বাজেট কমানোর ব্যাপার চলছে ।”

অর্জুন শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, “এখানে আপনি কী করছেন মিস্টার ব্রাউন ?”

“তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি । কাল থেকে এই বাসস্ট্যান্ডেই ঘোরাফেরা করছি ।”...

“কিন্তু কেন ?”

ব্রাউন তার দাড়িতে হাত বোলাল । চোখ পিটপিট করে মেজরকে দেখল । তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল, “তোমাকে আমার বেশ ভাল লেগে গিয়েছে বলে বলছি । আমি টের পেয়েছি তোমাদের সঙ্গে একটা ক্রাইম জড়িয়ে আছে ।”

“কী ? আমরা ক্রিমিনাল ?” মেজর চিৎকার করে উঠলেন ।

হাত তুলে তাকে থামাল ব্রাউন । তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই শিশুটিকে কেউ কখনও শাস্ত হয়ে থাকবার উপদেশ দেয়নি কেন বলো তো । আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের পেছনে নিশ্চয়ই কোনও ক্রিমিনাল গ্যাং লেগেছে । নইলে ব্ল্যাকপুলের রাস্তা থেকে একইরকম চেহারার জন্যে ভুল করে আমায় জিপে তুলে নিয়ে যেত না । ওদের কাছে রিভলভার ছিল । তারপর ধরো স্ট্রেঞ্জির কথা । স্ট্রেঞ্জিকে কেউ মেরে ফেলেছে । ম্যাগ্‌স্টারে তো দেখেছি স্ট্রেঞ্জির কী খাতির ! ও দলে থাকলেই পয়সা । পুলিশকে আমি বলিনি, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যারা মেরেছে তারা স্ট্রেঞ্জি ভেবে মারেনি । গাড়িটা যে স্ট্রেঞ্জি চালিয়ে যাচ্ছে তা তারা জানতই না । ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছে মিসেস গ্রান্ট চালাচ্ছেন । কারণ মিসেস গ্রান্ট আমাকে গতকাল বলেছেন চুরি যাওয়ার আগে তিনি গাড়ি চালিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল শপে গিয়েছিলেন লোশন কিনতে । অতএব ক্রিমিনালরা মিসেস গ্রান্টকেই মারতে চেয়েছিল । কেন ? তার সঙ্গে ওদের কোনও শত্রুতা তো নেই । পরে বুঝলাম যেহেতু উনি

৩৮৯

তোমাদের বন্ধু এবং গাড়িটা নিয়ে এদিকেই আসছেন বলে মনে হয়েছিল, তাই অ্যান্ড্রিডেন্টটা ঘটিয়ে দিল ওরা। আমার নাম যে কেন শার্লক হোমস্ হল না কে জানে!”

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেজর বললেন, “অনেক বকেছ। এবার বিদেয় হও।”

“বিদায় হতে তো আসিনি এতদূর!”

“মানে? তুমি কি আমাদের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকতে চাও?”

ব্রাউন চোখ পাকাল, “দ্যাখো বুড়ো, আমাকে রাগিয়ে দিও না বলে দিচ্ছি। রেগে গেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমার হাতে কোনও কাজ নেই। যাকে বলে অথণ্ড অবসর। এইরকম সময়ে আমি ক্রাইমের গন্ধ পেয়েছি। এখন আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাই কী করে? তা ছাড়া তুমি তো খুব অকৃতজ্ঞ মানুষ। ছিছিছি।”

মেজর এবার একটু ঘাবড়ে গেলেন, “মানে? তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হতে যাব কেন খামোখা?”

“একশোবার কৃতজ্ঞ হবে।” ধমকে উঠল ব্রাউন, “তোমার মতো দেখতে বলেই তো ওরা আমাকে জিপে তুলছিল, বন্দুক ঠেকিয়েছিল। তোমার জন্যেই তো গাড়ি থেকে পড়তে হয়েছিল আমাকে। অজ্ঞান না হয়ে আমি তো মরেও যেতে পারতাম। কৃতজ্ঞ হবে না? যদি আমার বদলে তোমাকে নিয়ে যেত ওরা, মানে আমি যদি না থাকতাম তা হলে এতক্ষণে তোমার সাইজের কফিনের বাস্ খুঁজতে হিমশিম হতে হত এই ছেলেটাকে, তা জানো?”

মেজরের মুখের চেহারা এখন এমন যে না হেসে পারল না অর্জুন। দু’জন প্রায় এক চেহারা এক উচ্চতার মানুষ মুখোমুখি স্থির। মনে হচ্ছে আয়নায় এ-ওকে দেখছে। সে বলল, “কিন্তু মিস্টার ব্রাউন, আমরা এখানে এসেছি মেজরের এক বন্ধুর অতিথি হিসাবে। তিনি সমুদ্রের জলে রিসার্চ করছেন। সেখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব?”

ব্রাউন চোখ ছোট করে তাকাল, “এর সেই বন্ধুটির সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?”

“না, তা নেই।” অর্জুন মাথা নাড়ল।

“তিনি কি তোমাকেও নেমস্তন্ন করেছেন?”

“না তা করেননি।” সত্যি কথাটা না বলে পারল না অর্জুন।

“তোমাকে তো আমার বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়েছিল। আরে তুমি যদি বিনা নেমস্তন্নে যেতে পারো, তা হলে আমি পারব না কেন? দু’জনের যেখানে জায়গা হয় তিনজনেরও হয়।”

মেজর এবার আপত্তি করলেন, “না, হয় না। অর্জুন আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে যাব কেন, অ্যাঁ? চিনি না জানি না, রাস্তার লোককে ৩৯০

নিয়ে যাব সঙ্গে ?”

ব্রাউন দাড়িতে হাত বোলাল, “বড্ড কথা খরচ হচ্ছে। শোনো হে, ব্রাউন কখনও অপমান হজম করে না। শেষ নিশ্বাস যতক্ষণ না পড়বে ততক্ষণ আমি বদলা নেবই।”

মেজর এবার ঘাবড়ে গেলেন, “আমি আবার অপমান করলাম কখন ?”

“তুমি কেন করবে ? ওই লোকগুলো। খামোকা আমাকে জিপে তুলল, পিঠে নল ঠেকাল আর তারপর জিপ থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। এটা আমি এমনি-এমনি হজম করব ? প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না।” ব্রাউন এমন জোরে কথা বলল যে ওপাশের ফুটপাথে দাঁড়ানো কয়েকটা বাচ্চা চমকে এদিকে ফিরল। মেজর বললেন, “বেশ তো, প্রতিশোধ নাও না, আমাদের সঙ্গে কেন ?”

“কারণ তোমরা হলে টোপ। ওরা আবার তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসবেই। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকলে ওদের হৃদিস পাব। নইলে কোথায় খুঁজে মরব ওদের ?”

ব্রাউনকে এতক্ষণে বেশ পছন্দ হল অর্জুনের। লোকটা একটু গোলমেলে, বউ তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে, ছোটখাটো অপরাধ করেছে কিন্তু মানুষ হিসেবে মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। জলপাইগুড়ির অনেক ছোটখাটো ক্রিমিনাল তার সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক রাখত। তারা কোথায় কী করছে তারাই জানে, কিন্তু অনেক ব্যাপারে তাকে সাহায্য করত। সে মেজরকে অনুরোধ করল, “খুব অসুবিধে হবে কি মিস্টার ব্রাউন সঙ্গে গেলে ?”

মেজর বললেন, “বুঝেছি। ক’বার তোমার প্রশংসা করতেই গলে গিয়েছে। আরে মার্শাল থাকে সমুদ্রের ধারে। হোটেলে তো নয়। বলছ যখন তখন চলুক। তুমি ছেলেমানুষ বুঝবে না। যার বউ বাড়ির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক কি না... !”

মেজর কথা শেষ করার আগেই ব্রাউন অর্জুনের হাত জড়িয়ে ধরল, “আমি বাজি রেখে বলতে পারি এই লোকটা এখনও বিয়ে করেনি, না ?” অর্জুন মাথা নাড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর গলায় ব্রাউন ঘোষণা করল, “বিবাহিত মানুষদের ব্যাপারে আনাড়ি লোকের মন্তব্য করা আমার একেবারে অসহ্য !”

দেখা গেল ব্রাউন এই তল্লাটটা মোটামুটি চেনে। ক্রিমিনালদের খোঁজে গতরাতে এখানে এসে সে নাকি কোনও হোটেলে ওঠেনি। হোটেলের খরচ চালাবার পয়সা তার পকেটে নেই। রাত হলে একটা বাংলাবাড়ির দরজায় নক করেছিল। অর্জুনকে ব্রাউন বলেছিল, “এই ব্যাপারটা অনেক সময় খুব কাজে আসে। পাঁচটা দরজায় নক করলে একটা বাড়িতে ভাল ব্যবহার পাওয়া যায়। আমি তো ভাই পরিষ্কার বলি, এখানে এসে আমার পার্স হারিয়েছি, হোটেলে

যাওয়ার উপায় নেই, রাতটা যদি দয়া করে থাকতে দেন তা হলে উপকৃত হব। তবে হ্যাঁ, বেশি রাত হলে লোকজন সন্দেহ করে। এসব করতে হয় সন্ধে-সন্ধে নাগাদ। বেশির ভাগই আউট-হাউসে থাকতে দেয়, কেউ-কেউ অবশ্য গ্যারাজে, যদিও কম্বল দেয় ঠাণ্ডার জন্যে। কপাল ভাল থাকলে খাবারও জুটে যায়।”

লোকটাকে ভাল লেগেছিল অর্জুনের। প্যাঁচানো লোক হলে এমন সরল গলায় নিশ্চয়ই কথা বলত না। অর্জুনের মনে হল একেই বলে ভ্যাগাবন্ড। ওরা জলের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। মেজর সামনে হাঁটছিলেন। তাঁর হাতে একটা কাগজ। সম্ভবত সেইটাতে মিস্টার মার্শালের ঠিকানা লেখা। এরমধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছেন তিনি হৃদিস। ব্রাউন যতবারই ঠিকানা জানতে চেয়েছে তিনি নির্বাক থেকেছেন। ব্রাউনের সঙ্গে তিনি কোনও সমঝোতা করে চলবেন না এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

পালতোলা নৌকোগুলোর দিকে তাকিয়ে মেজর বললেন, “অর্জুন, এসো, টু-সিটার নৌকোটা ভাড়া করা যাক। মার্শালের কাছে পৌঁছতে হলে শুনলাম নৌকো ছাড়া কোনও উপায় নেই। ও নাকি একটা দ্বীপের মতো জায়গায় ক্যাম্প করেছে।”

অর্জুন হেসে বলল, “টু-সিটার কেন? মিস্টার ব্রাউন তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।”

“টু-সিটারের ভাড়া কম হত।” উদাস গলায় জানালেন মেজর।

“ছাই হত।” ফুট কাটল ব্রাউন, “ওটা তো খেলনা। বন্দর থেকে বেরোলেই উলটে যায়। মিস্টার মার্শাল দ্বীপে থাকেন? এখানে তিনটে বড় দ্বীপ আছে। যে-কোনও এঞ্জিনওয়ালা নৌকো নিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে কোন দ্বীপে ভদ্রলোক আছেন। টু-সিটার নৌকায় দ্বীপে যারা পৌঁছয় তাদের ট্রেনিং আলাদা। দাঁড়াও আমিই ডাকছি।” ব্রাউন একটানা কথাগুলো বলে চিৎকার-চোঁচামেচি করে একটা মোটরবোটওয়ালাকে ডাকল। লোকটার গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি, মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি, বয়স হয়েছে। ব্রাউনের বক্তব্য শোনার পর লোকটা মাথা নাড়ল, “মার্শাল খুব কড়া লোক। আমাকে বলেছে ওই দ্বীপে যেন বিনানুমতিতে আমি এখান থেকে লোক নিয়ে না যাই। অফিসারদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে ওর।”

মেজর দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন উদাসীন ভাব দেখিয়ে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, “কড়া মানুষ? কড়া? আমার চেয়েও? নেমস্তন্ন করেও নিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা রাখেনি, আমি ওকে কড়া হওয়া কাকে বলে দেখাব। বলো আমরা মোটরবোটে যাব!”

ড্রাইভার ইতস্তত করছিল, তাকে বুঝিয়ে বলা হল মেজর মিস্টার মার্শালের বন্ধু। অতএব লোকটা রাজি হল। দর-কষাকষি করে ব্রাউন ভাড়া কমিয়ে

মেজরকে শুনিয়ে বলল, “আমি অন্তত পনেরো পাউন্ড বাঁচিয়ে দিলাম। এইটে খেয়াল রাখলেই খুশি হব।”

মেজর জবাব দিলেন না। মোটরবোটে চারজন লোক চমৎকার বসতে পারে। মেজর একা একা বসেছেন, উলটো দিকে অর্জুন ব্রাউনের পাশে। সবুজ জলের তিন পাশে সাজানো রেস্টুরেন্ট, দোকানপাট দেখতে দেখতে ওরা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আকাশ এখন ঘোলাটে। নৌকায় বসে থাকতে চমৎকার লাগছিল। হঠাৎ মেজর বললেন, “অর্জুন, তোমার ওই কোড ল্যান্ডুয়েজটা মনে আছে তো? চারপাশে নজর দাও। আমরা তো শুধু প্রকৃতি উপভোগ করব বলে ট্যুরিস্ট হিসেবে আসিনি।”

মেজর এখানেই থামলেন বলে অর্জুন খুশি হল। মার্শালের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি বেড়ানো, তা হলে এসব কথা কেন উঠছে, প্রশ্নটা করতেই পারে ব্রাউন। কিন্তু দু'জনের সম্পর্কটা এখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে কেউ কারও কথা তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করবে না।

অর্জুন লাইনগুলো আর একবার মাঝে-মাঝে আওড়ে নিল। সমুদ্র। উত্তর দিকে এক ঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড়-টানা নৌকোর। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর! মে মাসে সূর্য মাথার ওপরে আসে ঠিক সাড়ে বারোটায়। ডুবুরি। পাথরটা নড়েনি নোয়ার আমল থেকে। জাহাজ-বাঁধা পাথর। সুড়ঙ্গটা তার তলায়। ঢুকবে একটা মানুষ।

না। কোনও শব্দ সে ভুলে যায়নি। হাত বাড়িয়ে সমুদ্রের জল ছোঁয়ার চেষ্টা করল অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সতর্ক করল ব্রাউন, “না। ওটা কোরো না।”

ব্রাউন মুখ ঘুরিয়ে নিল, “কী দরকার।”

অর্জুন অবাক হল, “ওখানে তো কোনও হিংস্র জন্তু আছে বলে মনে হয় না।”

“জন্তুর কথা বলছি না।” ব্রাউন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল, “আমার ভয় লাগে। মানে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, সাঁতারটা শেখার সময় পাইনি। ওই মাথামোটাটাকে খবরটা জানিয়ে দিও না।” অর্জুনের বেশ মজা লাগল। সাঁতার সে নিজেও জানে না। তিস্তানদীতে সাঁতার শেখার প্রশ্ন নেই। করলাতে অবশ্য শেখা যেত। কিন্তু জলের নাম শুনলেই মা আঁতকে উঠতেন। কিন্তু সে কিছু বলল না। এতক্ষণ তারা ইউ শেপের বাইরে চলে এসেছে। সমুদ্র এখানে শান্ত। তাদের মোটরবোট সশব্দে জল কাটতে-কাটতে বেরিয়ে যাচ্ছে। পেছনে জলের ওপর যেন দাগ রেখে যাচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞেস করল, “আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?”

মেজর চোখ বন্ধ করে বললেন, “উত্তর দিকে।” বলেই এমন ভাবে লাফিয়ে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকাতে লাগলেন যে, নৌকোটা দুলে উঠল এবং ড্রাইভার

চিৎকার করে উঠল। ব্রাউন কোনওমতে টলতে-টলতে সামলে নিয়ে বলে উঠল, “অদ্ভুত তো ! উত্তর দিক বলেই পৃথিবীতে কেউ এমন লাফায় তা জন্মে শুনিনি। এখনই আমি জলে পড়ে যাচ্ছিলাম।”

মেজর যেন এসব কথা শুনতেই পেলেন না। এবার হতাশ গলায় বললেন, “সমুদ্র এত বড় যে, ঠিক কোনটা উত্তর দিক বোঝাই মুশকিল। সূর্যটা কোথায় বলো তো?” তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। ব্রাউন জবাব দিল, “সমুদ্রের ঠিক ওপরে।”

মেজর ঘুরে আঙুল তুললেন, “লুক, ওই ভাল ছেলেটার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পেরেছ। ক্রিমিনাল দেখতে চেয়েছিলে না? আমিই ক্রাইম করে তোমাকে দেখিয়ে দেব ক্রিমিনাল কাকে বলে। আমি যখন কথা বলব তখন একদম বকবক করবে না।”

“জলে না ডাঙায়?” ব্রাউন অত্যন্ত নিরীহ গলায় প্রশ্ন করল।

মেজর এর জবাব দিলেন না। পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাওয়ার দাপটে কিছুতেই চুরুটে আগুন লাগছিল না।

এখন ওরা স্টিমারঘাটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। সমুদ্রের রঙে অতি সামান্য নীল মিশেছে। আশেপাশে অবশ্য অনেক রঙিন পালতোলা নৌকো ভাসছে। ওপাশের আকাশ যেন জলেই ঢুকে গিয়েছে। স্টিমারঘাটা কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা কি যে গতিতে মোটরবোট ছুটছে তার কারণে? হঠাৎ অর্জুন বলে উঠল, “দাঁড়-টানা নৌকোয় এলে হত।”

মেজর মুখ ফেরালেন, “তখন তো বলেছিলাম টু-সিটার নাও। তুমি রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে ভিড় বাড়ালে আর দাঁড়-টানা নৌকোয় কী করে উঠবে?”

অর্জুন উত্তর দিকে তাকাল। দাঁড়-টানা নৌকোয় একঘণ্টা কাটালে মোটরবোটে কতক্ষণ লাগবে? এ হিসেব তার জানা নেই। সূর্য মাথার ওপরে সাড়ে বারোটায় আসবে কিন্তু যখন সূর্যকে দেখাই যাবে না তখন আর সেটা বোঝার উপায় কী! তা ছাড়া যে কোনও সমুদ্রের উত্তর দিকে চললেই যদি লকারে লেখাটা সত্যি হয়ে যেত তা হলে তো কথাই ছিল না।

হঠাৎ ড্রাইভার বলল, “ওই যে দ্বীপ।”

সমুদ্রের ওপর যেন পটলের মতো ডাঙা-জঙ্গল আচমকা আঁকা হয়েছে। অর্জুন দেখল দ্বীপটার কাছেপিঠে কোনও নৌকো নেই। দ্বীপে কোনও মানুষ আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। এখন বালির চর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মোটরবোট একটা বড় পাথরের গায়ে লাগিয়ে ড্রাইভার বলল, “এখানে আপনাদের নামতে হবে। পাথরগুলোর ওপরে পা ফেলে দ্বীপে নেমে যান।” সে হাত বাড়াল টাকার জন্য। মেজর বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “মার্শাল এখানে ল্যান্ডিং-এর কোনও ব্যবস্থা করেননি?”

“করেছেন। তবে সেটা দ্বীপের ওপাশে। আমার স্টকে যা তেল আছে ওপাশে গেলে আর ফিরে যেতে পারব না।” টাকাটা গুনে নিয়ে ওদের পাথরের ওপর তুলে দিয়ে ড্রাইভার বোট নিয়ে ফিরে গেল। খুব সন্তুর্পণে ভেজা পাথরের ওপর পা রেখে এরা এগোচ্ছিল। প্রথমে মেজর, মাঝখানে অর্জুন, শেষে ব্রাউন। পাথরগুলোর গায়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ায় জল ছিটকে উঠছে। হঠাৎ পেছন থেকে ব্রাউন প্রায় গোঁগোঁ করে চিৎকার করে উঠল। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল ব্রাউন হাত তুলে একশো ফুট দূরের সমুদ্র দেখাচ্ছে। সেখানে একটা হাঙরের বিশাল পাখনা তখন জলে ডুবে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মেজর চিৎকার করে উঠলেন, “শার্ক, শার্ক! ওটা শার্ক।”

ব্রাউনের গলায় এবার শব্দ ফুটল, “ওই শব্দটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। শার্ক!”

ততক্ষণে জলের নীচে হারিয়ে গেছে জন্তুটা। সমুদ্রের চেহারা ওইখানে আবার নিরীহ। অর্জুন বলল, “বাপ্‌স! কী বিশাল হাঙর। পাখনাটাই যদি অত বড় হয়!”

মেজর গম্ভীর হলেন, “সিনেমা দ্যাখোনি? হাঙরকে নিয়ে সিনেমা হয়েছিল। একটা ছোট লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়েছিল। নোকোফোকো তো ওর কাছে খেলনা।”

অর্জুন দেখল তাদের মোটরবোট এখন দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় হাঙরটা ওকে তাড়া করেনি। পাথর টপটে টপকে তীরে এসে মেজর বললেন, “ওই লোকটা তখন তোমার একটাই উপকার করেছিল। তোমাকে জলে হাত দিতে নিষেধ করেছিল। অবশ্য তারপর মেয়েদের মতো কানে-কানে কথা বলে আমার সিমপ্যাথি হারিয়েছে।”

ব্রাউন বলে উঠল, “হু কেয়ার্স! তোমার সিমপ্যাথির জন্যে যেন আমি বসে আছি!”

মেজর অবাক হয়ে বললেন, “তাজ্জব ব্যাপার তো। দয়া করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি অথচ কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। এ দেখছি সেই ছুঁচোর মতন।”

“ছুঁচো? কোন ছুঁচো?” ব্রাউন চোখ ছোট করল।

“বুঝলে অর্জুন, একবার আমি বেইরুটে মাসখানেক ছিলাম বাড়ি ভাড়া করে। হঠাৎ একদিন রাস্তায় একটা এই টাইপের লোক এসে বলল, ‘আপনাকে দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। আমি আপনার সঙ্গে যাব। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়।’

“আপনি যেখানে যাবেন।

“আমি বাড়িতে ফিরছি।

“চলুন। আমিও যাই। আমার নাম ফুরাদ।

“তা বেশ, কিন্তু তুমি খামোকা আমার বাড়িতে যাবে কেন? আমি তোমাকে

চিনিই না।

“তাতে কী! চিনে নিতে অসুবিধে নেই। ফুরাদ নির্বিকার হয়ে বলছিল।

“মনে হল লোকটা ঠাট্টা করছে। এ-দেশে বোধ হয় এই ধরনের ঠাট্টার চল আছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে বাড়িতে এলাম। দেখি ফুরাদও আসছে। একদম বাড়ির দরজাতে ও পৌঁছে গেল। খুব চোঁচামেচি করলাম। লোক জমে গেল, কিন্তু ফুরাদ কোনও কথা বলছে না। এদিকে পাবলিক আমাকে বলতে আরম্ভ করেছে, “আপনি আচ্ছা লোক তো, একটা মানুষ আপনার কোনও ক্ষতি না করে সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে, শুধু এই কারণে এমন খেপে গেলেন?”

“একজন পুলিশ-অফিসার এসে জানতে চাইল আমার সমস্যা। তাকে সব বললাম। সে ফুরাদকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই লোকটা যদি আপনাকে খারাপ কথা বলে থাকে, তা হলে এখনই ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাব।

“বলতে বাধ্য হলাম সে খারাপ কিছু বলেনি।

“অপমান করেছে?”

“না।

“তা হলে দয়া করে রাস্তায় ভিড় জমাবেন না। এটাও একটা অপরাধ। সবাই চলে গেল, কিন্তু ফুরাদ রইল দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকান সময় সে ঢুকতে চাইলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু জানলা দিয়ে দেখলাম সে বসে আছে দরজার সামনে আর রাস্তা দিয়ে যে মানুষ যাচ্ছে তাকেই বলছে, “কী করব ভাই, এই বাড়ির ভাড়াটে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন। ব্যবহারেই তো মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়।

“বোঝা অবস্থা। দশ-বারোবার একই কথা শুনতে-শুনতে মাথা গরম হয়ে গেল। শেষে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম, “ফুরাদ। কী চাও তুমি?”

“ভেতরে গিয়ে আরাম করতে।

“রাগের মাথায় ওকে ভেতরে আসতে বলতেই যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে বলল, “আপনি যদি চা বানান তা হলে আমারটাও নেবেন।

“তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারবে না অর্জুন। খুন না করলে ওর হাত থেকে যেন নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। ছুঁচোটাকে আমাকে বাধ্য হয়ে গিলতে হয়েছিল।”

মেজর থামতেই ব্রাউন বলল, “অনেকক্ষণ থেকে মনে হচ্ছিল, এবার বুঝতে পারলাম। তুমি ফুরাদকে খুন করেছ!”

“তোমার মাথা! দ্বিতীয় দিন রাতে আমার জামাকাপড় ব্যাগে ভরে ফুরাদ যখন ঘুমোচ্ছে তখন বেরুইট থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আর ওই শহরে কখনও যাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু কি জানতাম ইংল্যান্ডেও আর

এক ফুরাদ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে !”

অর্জুন বলল, “আপনার গল্পটা খুব সুন্দর। কিন্তু এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব ?”

অতএব বালির চর ভেঙে হাঁটা শুরু হল। বিচিত্ররঙা কাঁকড়াগুলো তাদের আওয়াজ পেয়ে ছোট্টাছুটি আরম্ভ করে দিল। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। আর এই সময় সূর্যদেব দেখা দিলেন। ঠিক মাথার ওপরে নয়, তিনি এখন পশ্চিমে ঢলেছেন। চড়াই ভেঙে ওপরে উঠে এসে ওরা খানিকটা জঙ্গল এবং গাথুরে জায়গা দেখতে পেল। কোনও মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মেজর বললেন, “মার্শালটা কোথায়? আমাদের ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গেল তো? একবার প্রশান্ত মহাসাগরের খুনে দ্বীপে আমি সাতদিন আটকে ছিলাম।”

ব্রাউন হঠাৎ বলে উঠল, “নো মোর স্টোরিজ।”

মেজর থমকে দাঁড়ালেন। সম্ভবত আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে গল্প বলতে বাধা দেয়নি। হয়তো একটা বিশ্লেষণ ঘটত, তার আগেই জঙ্গল ফুঁড়ে একটি লোক বেরিয়ে এল। চেহারা দেখে মনে হয় পুলিশ কিংবা মিলিটারিতে কাজ করেছে কিছুদিন। লোকটা বেশ কঠোর মুখে ওদের দেখে বলল, “তোরা কেন এখানে এসেছ? অনুমতি ছাড়া এখানে প্রবেশ নিষেধ।”

অর্জুন বলল, “অনুমতি কার কাছে নিতে হবে?”

লোকটা তখন মেজর আর ব্রাউনের চেহারা দেখছে। উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, “দু’জনে এক মেক আপ নিয়েছ কেন? এটা কি নাটক করার জায়গা? নাউ, গেট লস্ট, এই দ্বীপ থেকে এখনই চলে যাও।”

এবার মেজর গলা তুললেন, “চলে যাব? চলে যাওয়ার জন্যে এত দূরে এসেছি! আমাকে নেমস্তন্ন করে ডেকে এনে অপমান করা হচ্ছে? তুমি কে হে?”

“আপনাকে এখানে আসার জন্যে নেমস্তন্ন করা হয়েছে?” লোকটি যেন অবাক।

“আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার বললে বুঝতে পারো না কেন?”

“বেশ। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। এবং জেন্টলমেন, আপনারা দয়া করে এখানেই অপেক্ষা করুন। এই দ্বীপের ভেতর এলোমেলো ঘুরে বেড়াবেন না।” লোকটা ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন, তারপর চোঁচিয়ে বললেন, “আমাকে একা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?”

“নিরাপত্তার প্রয়োজনে।” লোকটা উত্তর দিল।

অতএব ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মেজর রওনা হলেন। ব্রাউন বলল, “এই জঙ্গলে না দাঁড়িয়ে চলো সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি। যেমন তোমার মেজর আর তেমন তার বন্ধু।”

অর্জুনের এই ব্যাপারটা ভাল লাগল না। মেজরকে ওরা এভাবে ছেড়ে না দিলেই পারত। সে বলল, “মিস্টার ব্রাউন, যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে আসছি।”

ব্রাউনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মেজর যে-পথে গিয়েছিল, সে সেই পথে পা বাড়াল। শুকনো পাতা আর মাথা পর্যন্ত বেড়ে ওঠা গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে সে এগোতে লাগল। পায়ে চলার পথ একটা আছে বটে কিন্তু সেই পথেই লোকটা মেজরকে নিয়ে গিয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। মিনিশ-দশেক যাওয়ার পর লোকজনের গলা শুনতে পেল সে। পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল একটা মাঠের মতো জায়গায় অনেকগুলো ক্যাম্প খাটানো রয়েছে। কিছু লোক এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মেজরকে নজরে পড়ল না। কয়েকটা ছোট-ছোট হালকা নৌকা মাটিতে রাখা আছে।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে প্রচণ্ড আঘাত পেতেই জিনিসপত্র নিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে অর্জুন। উঠে বসার চেষ্টা করতেই কেউ তাকে পেড়ে ফেলল। অর্জুন দেখল শক্ত চেহারার একটা লোক তাকে মাটিতে চেপে ধরে চিৎকার করছে। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাম্প থেকে লোকজন ছুটে এল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অর্জুনকে ওরা নিয়ে এল ক্যাম্প চত্বরে। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত গলায় কথা বলছিল। ইতিমধ্যে তার জিনিসপত্র হাটকানো হয়েছে। পাশপোর্ট বের করে ওরা চেহারাটা মিলিয়ে নিল। এবং তখন সেই লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। অর্জুনকে দেখে খুব রেগে গিয়ে বলল, “আমি তোমাদের অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কে তুমি? কার হয়ে এখানে এসেছ?” আর একটা লোক তার পাশপোর্ট এগিয়ে দিল, “হি ইজ ইন্ডিয়ান।”

“আই সি। ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।”

অর্জুন নিজেই উঠতে পারল। যদিও তার কাঁধে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু সেটাকে এই মুহূর্তে আমল দিল না। ওরা ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। মোটরবোটের ড্রাইভার তাদের সাবধান করে দিয়েছিল, এই দ্বীপে লোকজনকে নিয়ে আসার নিষেধ আছে। পাহারাদারির এই নমুনা সেই কথাটাকেই প্রমাণ করে। মিস্টার মার্শাল একজন অভিযাত্রী, বিজ্ঞানী। তিনি কেন এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন? হয়তো মোটরবোটের ড্রাইভার মার্শালের নামটা গুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে তার আর একটা কৌতূহল তৈরি হল। এই লোকগুলো এমন দ্বীপে গোপনে কী কাজ করছে?

তাঁবুর ভেতর ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেল অর্জুন। একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন মেজর। কিন্তু তাঁর মুখে প্লাস্টার আঁটা। হাত-পা বাঁধা নয় কিন্তু তিনি অসহায়ের মতো হাত নেড়ে বোঝালেন তাঁর কিছুই করার নেই। লোকটা বলল, “কোনও মানুষ যে এমন চৈতাত্যে পারে আমার ধারণা ছিল না। তাই ওঁর মুখ বন্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু উনি যদি ওই চেয়ার ছেড়ে একবার

ওঠেন তা হলে হাঙর দিয়ে খাওয়ানো হবে । মনে হচ্ছে তোমার মুখ বন্ধ করার কোনও প্রয়োজন হবে না । ওইখানে বসতে পারো । ”

একটা কাঠের বাস্কর ওপরে বসিয়ে দিল ওরা অর্জুনকে । এইসময় মেজর কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু নাক দিয়েই শব্দ বের হল । ওঠার চেষ্টা করেই আবার বসে পড়লেন । লোকটা এবার অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়াল, “তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কী ?”

অর্জুন বলল, “ওঁর বন্ধুর নেমস্তুলে উনি এসেছেন, সঙ্গে আমাকে এনেছেন । ” মেজর কথাটা শুনে মাথা নাড়লেন । লোকটা জিজ্ঞেস করল, “বন্ধুর নাম কী ?”

“পুরো নাম জানি না । উপাধি হল মার্শাল । ”

উত্তরটা শুনে লোকটা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল । তারপর বলল, “তোমাদের কিছুক্ষণ এই তাঁবুতেই থাকতে হবে । বাইরে বেরোবার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বে । ”

ব্রাউন উসখুস করছিল । দ্বীপটা খুব বড় নয় । জঙ্গল-জানোয়ার আছে বলে মনে হচ্ছে না । মেজর এবং অর্জুনকে যেতে দেওয়ার পর তার খুব একা-একা বোধ হল । জঙ্গলের মধ্যে না দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চলে এল সে । এখান থেকে কোনও স্থলরেখা দেখা যায় না । সূর্য ওঠার পর হাওয়ার তেজ বেড়েছে । ফলে ঢেউগুলো বেশ ফুলে উঠছে । কাল রাত থেকে তেমন খাওয়াদাওয়া হয়নি । ভেবেছিল ওই লোক দুটোকে জপিয়ে খাবার কেনাবে । কিন্তু মেজর এমন ঝামেলা শুরু করল যে, মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তার । ওরা কিছু না বললেও ব্রাউন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে শুধু বেড়াবার জন্য এখানে কেউ আসে না । যাদের পেছনে লোক লেগে গেছে তাদের নিশ্চয়ই কোনও গোপন ব্যাপার আছে । ছোটখাটো কিছু অপরাধ মার্শাল করেছে । কিন্তু বড় অপরাধ করতে সাহস হয় না এবং ইচ্ছাও করে না । কিন্তু ওর কেবলই মনে হচ্ছিল এই লোক দুটোর সঙ্গে লেগে থাকলে তার আখেরে লাভ হবে । যদি ফালতু কিছু টাকা ম্যানেজ করা যায়, তা হলে কিছুদিন নিশ্চিন্ত । অতএব এখন তার উচিত এদের সাহায্য করা । হাঁটতে-হাঁটতে একটা গাড়ির সামনে চলে এল ব্রাউন ।

তার চোখ ছোট হয়ে এল । দু’ধারে জঙ্গল নিয়ে জল ঢুকে এসেছে অনেকটা ভেতরে । সেখানে অবশ্য ঢেউ ওঠার কথাও নয় কিন্তু একটা চওড়া কাঠের পাটাতন ভাসছে । পাটাতনটা লোহার শেকলে বাঁধা । মাটি থেকে পা ফেললেই ওই পাটাতনে ওঠা যায় । জিনিসটাকে খাড়ির মধ্যে জঙ্গলের আড়ালে প্রায় লুকিয়েই রাখা হয়েছে । ব্রাউন বুঝতে পারল এই পাটাতন নিয়ে যেহেতু সমুদ্রে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয় তাই যারা এটাকে ব্যবহার করে তারা

অন্য কাজে লাগায় । কাজটা কী ওর মাথায় ঢুকছিল না ।

এইসময় একটা মোটরবোটের আওয়াজ কানে এল ব্রাউনের । সে চটজলদি নিজেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল । শব্দটা বাড়তে-বাড়তে কাছে এসে গেল । এবার মোটরবোটটাকে দেখতে পেল সে । সমুদ্র থেকে খাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল । ব্রাউনের খুব কৌতূহল হচ্ছিল এগিয়ে গিয়ে খাড়ির সামনে দাঁড়াতে । সে উসখুস করছিল । এমন সময় পিঠে একটা ভারী থাপ্পড় পড়তেই ঘুরে দেখল স্বাস্থ্যবান একটা লোক তার কাঁধটাকে যেন মুঠোর মধ্যে পুরে নিয়েছে । ব্রাউন আত্ননাদ করে উঠল, “এ কী হচ্ছে ? আমাকে তো এখানেই অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে ।”

“কে বলেছে ?” লোকটা নিষ্ঠুর গলায় জানতে চাইল ।

“নাম জানি না । আমার সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে গিয়েছে ।”

“চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো । আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখা হচ্ছিল । কথাগুলো যদি মিথ্যা হয় তা হলে খাড়িতে ডুবিয়ে রাখব ।” লোকটার কথা শেষ না হওয়ামাত্র দু’জন লোক খুব দ্রুতপদে খাড়ি থেকে উঠে এল । তাদের একজনের বয়স নিখাত ষাটের কাছাকাছি । অন্যজন যুবক এবং স্বাস্থ্যবান । ওরা বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল । ব্রাউনের কাঁধ ধরে থাকা লোকটি চৈচিয়ে উঠল, “এখানে তিন নম্বরটাকে পেয়েছি বস ।”

শব্দ চেহারার ঐশ্বর্য চকিতে ঘুরে দাঁড়াল । ব্রাউন দেখল, সঙ্গী যুবকটি যেভাবে সতর্ক হল তাতে বোঝা যায় ওর রীতিমত প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে । হঠাৎ ঐশ্বর্য চিৎকার করে উঠল । তারপর দু’হাত বাড়িয়ে ছুটে এল । ব্রাউন কিছু বোঝার আগেই তাকে দুহাতে জড়িয়ে প্রায় নাচতে লাগল লোকটা, “ও আমার মাথামোটা, ও আমার ছাগলদাড়ি, শেষ পর্যন্ত এখানে আসার সময় হল তোমার ? উঃ, কী যে ভাল লাগছে । আমি কবে থেকে তোমাকে আশা করে আছি ।”

আদরের বহর দেখে পেছনের লোকটা তার কাঁধ ছেড়ে দিয়েছিল । ব্রাউন হতভম্ব । লোকটা করছে কী ! উচ্ছ্বাস কমে এলে লোকটা ব্রাউনের হাত জড়িয়ে ধরল, “কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে ? মোটরবোটে ? আহা, আগে জানলে আমিই তোমার আসার ব্যবস্থা করতাম ।”

ততক্ষণে মাথায় ভাবনাটা এসেছে । এই লোকটা তাকে মেজরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে না তো ! সে কিছু বলার আগেই লোকটা তার হাত ধরে হাঁটতে লাগল । পেছন থেকে সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি বলে উঠল, “সার, ক্যাম্পে আরও দু’জন আছে ।”

“আরও দু’জন ? মেজর, তোমার সঙ্গে আর কারা এসেছে ?”

এবার ব্রাউন মাথা নাড়ল, “আমি এতক্ষণ আপনকে বলতে পারছিলাম না সার, আমি মেজর নই । তিনি ভেতরে গেছেন । মানে তাঁকে ভেতরে নিয়ে

মাওয়া হয়েছে।”

“অ্যাঁ !” লোকটা ব্রাউনের হাত ছেড়ে ছিটকে সরে গেল, “তা হলে তুমি কে ?”

“আমি ব্রাউন। মেজরের সঙ্গে এসেছি।”

মুখে হাত দিল লোকটা, “তাই তো। আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। মেজর হলে এতক্ষণ মেশিনগান চালাত। ওকে ধরে নিয়ে এসো। যদি জালিয়াতি হয় তা হলে ওর ব্যবস্থা তোমরা করবে।” কথা শেষ করে লোকটা দ্রুত পা চালাল। ব্রাউনের কনুই খপ করে ধরল সেই স্বাস্থ্যবান। প্রায় ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল তাকে।

দরজার দিকে তাকিয়ে মেজর বিকট শব্দ করে উঠলেন। যেহেতু মুখ বন্ধ, নাক দিয়ে ছাড়া আওয়াজ করা সম্ভব নয়, তাই সেটা খুব করুণ শোনা। দরজা দিয়ে ছুটে এসে আচমকা থমকে দাঁড়াল মার্শাল। সন্দেহের চোখে মেজরকে দেখতে লাগল। মেজর তখন হটফট করছেন। মার্শালের ইস্তিতে ওর সঙ্গে তাঁবুতে ঢোকা একটা লোক মেজরের মুখ থেকে প্লাস্টার সরিয়ে নেওয়ামাত্র চিৎকার শুরু করল, “বদমাশ, জলদস্যু, নচ্ছার, নেমস্তন্ন করে আমাকে এভাবে অপমান করা ?”

সঙ্গে-সঙ্গে দু’হাত তুলে চিৎকার করে উঠল মার্শাল, “আর ভুল হয়নি। এ একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট মেজর।” বলে নিজেই ওঁর বাঁধন খুলে জড়িয়ে ধরলেন। মেজর তখনও চিৎকার করে যাচ্ছিলেন। তাঁর রাগ কমছিল না। মার্শাল সেই অবস্থায় বললেন, “আমার জায়গায় থাকলে তুমিও এই কাণ্ড করতে। ঠাণ্ডা হয়ে বোসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।”

মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন। চোখ বন্ধ করে আছে অর্জুন, ব্যথাটা তখনও মালুম দিচ্ছে।

মেজর চিৎকার করে বললেন, “তুমি, তুমি জানো এই ছেলেটার হাল কী করেছে তোমার লোকজন ? মেরেই ফেলত বোধ হয় ! মার্শাল, তুমি না বিজ্ঞানী ? রিসার্চ করছ ? ছি, ছি, ছি। কে ভেবেছিল তুমি কতগুলো গুণ্ডা নিয়ে এখানে রিসার্চ চালাচ্ছ ! না, না, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।”

মার্শাল দাড়িতে হাত বোলাল কয়েক সেকেন্ড। তারপর অর্জুনের কাছে এসে বলল, “সরি ব্রাদার। আমার মনে হচ্ছে তুমিই সেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, যার কথা মেজর আমায় লিখেছিল। আমি সত্যি দুঃখিত। ব্যাপারটা মনে না রাখলেই খুশি হব।” অপরাধীর মতো ভঙ্গি ছিল কথাগুলো বলার সময়। হঠাৎ সচেতন হয়ে জিজ্ঞেস করল, “তা হলে ওই ভদ্রলোক কে ? ওকে তো আমি মেজর বলেই মনে করেছিলাম।”

সঙ্গে-সঙ্গে মেজরের গলা থেকে ব্যঙ্গ ছিটকে উঠল, “মনে করেছিলে ?

আহা, আর তুমি নিজেকে আমার বন্ধু বলে দাবি করো না । ওই বদমাশ আর আমি এক হয়ে গেলাম ?”

“বদমাশ ?” মার্শাল যেন হতভয়, “কী আশ্চর্য ? এই লোকটা তো ঠিক তোমার কার্বনকপি । ও কি তোমাদের সঙ্গে আসেনি ?”

মেজর কিছু বলার আগেই অর্জুন জবাবটা দিল, “মিস্টার ব্রাউন আমাদের সঙ্গে এসেছেন ।”

“মিস্টার ব্রাউন তোমাদের বন্ধু ?”

মেজর মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বললেন, “নো, নেভার । উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ।”

“তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ব্রাউনকে তুমি পছন্দ করছ না !”

“একশোবার । যেমন এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যদি সবচেয়ে অসহ্য বলে কাউকে মনে হয়, সে হল তুমি ? উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না এমন অভ্যর্থনা ।”

মার্শাল পকেট থেকে একটা দামি চুরুট বের করে সামনে ধরল, “টানো ।”

“এটা কী ?”

“তুমি এককালে এই চুরুট খুব পছন্দ করতে । মেজর শান্ত হও । আমি ক্ষমা চাইছি । কী অবস্থায় পড়ে এমন ব্যবস্থা নিয়ে থাকতে হচ্ছে তা যদি জানতে, তা হলে আমার ওপর এত রাগ করতে না ।” মার্শালের মুখে আবার বিমর্ষ ছাপ এল ।

“সেটা বলে ফেললেই হয় । দ্যাখো মার্শাল, যতদিন তুমি আমার সঙ্গে বা নিজে পৃথিবীর চারপাশে কোনও কিছু আবিষ্কারের নেশায় অভিযানে বের হতে ততদিন তুমি ছিলে আমার চেনা । এই বড়লোক হবার নেশায় মুক্তোর ব্যবসায় নেমে সর্বনাশ হয়েছে তোমার ।” মেজর চুরুট ধরিয়ে একটা আরামের টান দিলেন ।

মার্শাল একজন সহকারীকে চটপট কফি বানাতে হুকুম দিয়ে বললেন, “সব বলব তোমাদের । আমি খুব উত্তেজনায রয়েছি । যে-কোনও মুহূর্তে আমার প্রাণসংশয় হতে পারে । এখানে যারা রয়েছে তারা আমার কর্মচারী । মাইনে পায় । এদের কাছ থেকে সবসময় সততা আশা করা যায় না । তোমরা এসে পড়লে যেশাসের দয়ায় । কিন্তু ওই লোকটা, যার নাম ব্রাউন, তাকে নিয়ে কী করবে ? ওকে ফেরত পাঠিয়ে দেব ?”

মেজর মুখ খোলার আগেই অর্জুন জবাব দিল, “উনি খুব খারাপ লোক নন । থাকুন না, অবশ্য যদি আপনার কিছু আপত্তি না থাকে ।”

“তোমাদের সঙ্গে এসেছে । আমি ততক্ষণই আপত্তি করব না, যতক্ষণ সে আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে না ।” এইসময় কেউ একজন ডাকতেই মার্শালসাহেব দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল ।

এখানে সারাদিন খুব হাওয়া বইল। যাকে বলে সামুদ্রিক বাতাস, তাই। তাঁবু কাঁপিয়ে দিচ্ছিল বারংবার। অর্জুনদের জন্যে আর-একটি তাঁবু পাতা হয়েছে। সেটিতে রয়েছে অর্জুনের সঙ্গে ব্রাউন। মেজর আছেন তাঁর পুরনো বন্ধু মার্শালের তাঁবুতে। অভিমানের পালা চুকে যাওয়ার পর দুই বন্ধু এখন এক। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরেও অর্জুনের শরীরে অস্বস্তি ছিল। ব্রাউন কিন্তু পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি অবাক হল অর্জুন। মেজরের সঙ্গে অন্তত ষাট ভাগ মিল রয়েছে। কোটি-কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে সৃষ্টির সময় ঈশ্বরেরও তো ভুলচুক হতে পারে। কত আর নতুন ছাঁচ পাবেন তিনি। কখনও-কখনও একই মুখ পৃথিবীর দুই প্রান্তে ছেড়ে দেন। যে ছেলেটি জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ে, তার মতো দেখতে অবিকল একজন হয়তো রয়েছে কোনও এক্সিমোদের ইগলুতে। জীবনে তাঁদের দেখাদেখি হওয়ার কোনও সম্ভাবনার কথা ঈশ্বর চিন্তা করেননি। কিন্তু কারও যদি পায়ের তলায় সরষে লাগানো থাকে তো এই মেজর-ব্রাউনের মতো কাণ্ড হয়ে যেতে পারে।

তিনটে নাগাদ অর্জুন তাঁবু থেকে বের হল। সামনেটা ফাঁকা। সমুদ্রের গর্জন কানে আসছে। ওপাশে মেজরদের তাঁবুর পাশাপাশি আরও কয়েকটা। অর্জুন স্থির দাঁড়িয়ে চারপাশ লক্ষ্য করছিল। এখনও মার্শাল বলেনি এমন কঠোর নিরাপত্তার কারণ কী! অতএব প্রহরী রয়েছে কাছেপিঠে। ওরা হয়তো অর্জুনকে স্বাধীনভাবে ঘুরতে দেবে না। কিন্তু কেন? অর্জুন বড়-বড় পা ফেলে মার্শালের তাঁবুতে ঢুকল। মার্শাল নেই। মেজরের নাক ডাকছে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে সে চটপট পেছন দিকে চলে এল। চারপাশেই জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা। তবু প্রহরী বলে কাউকেই নজরে পড়ছে না। সমুদ্রের দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ একটা শিশু বাজল। তারপরেই একটা লোক যেন ম্যাজিকের মতো উদয় হল, “সার, সমুদ্রের দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না।”

“কেন?” অর্জুনের চমক লাগল।

“মিস্টার মার্শাল আমাদের সেইরকম নির্দেশ দিয়েছেন।”

“ওদিকে গেলে কী হবে?”

“হয়তো আপনাদের নিরাপত্তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।”

“কিন্তু ভাই, আমরাও তো সমুদ্র ডিঙিয়ে এখানে পৌঁছেছি। কোনও বিপদ হয়নি।” অর্জুন ইচ্ছে করেই কথা চালাতে চাইল। কিন্তু লোকটা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, “এসব ব্যাপার নিয়ে আপনি বরং মিস্টার মার্শালের সঙ্গে আলোচনা করুন। আমাদের কর্তব্য করতে দিন।”

অতএব অর্জুনকে ফিরতে হল। মার্শালের তাঁবুতে ঢুকে সে মেজরকে জাগাল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেজর ছোট চোখে ওকে দেখলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন, “আহা, তোমার জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে। একটু আরাম

করে ঘুমোতেও পারো না । ”

“এই দ্বীপে এখন আপনি আর মিস্টার ব্রাউন ঘুমোচ্ছেন । দু’জনের মিল খুব । ”

“সে ঘুমোচ্ছে কেন ?” মেজাজ চড়ে গেল মেজরের, “এতে ঘুমোবার কী আছে । আচ্ছা অর্জুন, এই উটকো লোকটাকে খামোকা আমার সঙ্গে রাখছ কেন ? ওকে দেখলেই আমার কেমন একটা অস্বস্তি হয় । তা ছাড়া মার্শালের এখানে পৌঁছে যাওয়ার পর আর আমাদের ওকে কোনও দরকার নেই । বউ যাকে ঢুকতে দেয় না বাড়িতে তাকে তুমি আদর করছ । ”

“মিস্টার মার্শালের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর আমরা কি নিশ্চিত ?” অর্জুন নিচু গলায় প্রশ্ন করল । যদিও তার কোনও দরকার ছিল না । এই তল্লাটে বাংলা বোঝার মতো মানুষ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না ।

মেজর বললেন, “কী বলছ তুমি ? মার্শাল আমার কত দিনের বন্ধু । তার নিয়ন্ত্রণে আমি তোমায় নিয়ে এখানে এসেছি । এখানে আমাদের ভয় কী ? ”

“সেটা এখনও বুঝতে পারছি না । কিন্তু এই তাঁবু থেকে বেশি দূরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । ”

“কে নিষেধ করেছে ?” মেজর ততক্ষণে তাঁবুতে রাখা বালতির জলে মুখ ধুয়ে নিচ্ছেন ।

“মিস্টার মার্শালের নির্দেশে তাঁর কর্মচারীরা । ”

তোয়ালেটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে মেজর গলা তুলে বললেন, “দেখি, কে আমাদের আটকায় ? চলো আমার সঙ্গে । ”

প্রায় ঘোঁত-ঘোঁত করেই মেজর তাঁবু থেকে বের হলেন । বেশি দূর যেতে হল না । প্রহরী ওই একই গলায় মনে করিয়ে দিল ব্যাপারটা । মেজর শূন্যে হাত ছুঁড়লেন, “ডেকে নিয়ে এসো মার্শালকে । কোথায় সে ? ”

“সার, উনি এখন সমুদ্রের তলায় । ”

“আমি কোনও কথা শুনতে চাই না । হয় তাকে এখনই চাই, নয় আমাদের যেতে দিতে হবে । ”

“কিন্তু সার, আপনি তো একটু আগে একই কথা বলে সমুদ্রের ধারে গেলেন । ”

“আমি ? একটু আগে ? তুমি একটি বোকা । একটু আগে আমি ঘুমোছিলাম । ”

“সে কী ! মিনিশ-দেশে আগে আপনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন । আমি আপত্তি করতেই ঠিক এইভাবে মার্শালসাহেবের নাম করে গালাগালি করলেন । বাধ্য হয়ে আমি আপনাকে ছেড়ে দিলাম । আপনি বলেছিলেন সমুদ্রের জল মুখে না দিলে আপনার গলায় ব্যথা হয় । ” প্রহরীটি নিবেদন করল ।

“সমুদ্রের জল মুখে...পাগল ! দেওয়া যায় নাকি ? ওই নুন-জল ? গুল

মারার জায়গা পাওনি ? তোমার নাম কী হে ? মার্শালের কাছে তোমার নামে রিপোর্ট করব আমি । ” গর্জে উঠলেন মেজর ।

অর্জুন তাঁর হাত ধরল, “মাথা ঠাণ্ডা করে শুনুন । ”

“মাথা আর ঠাণ্ডা রাখা যাচ্ছে না অর্জুন । আমাদের এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত । ”

“এখনই গিয়ে লাভ হবে না । মিস্টার ব্রাউন ফিরে আসুন আগে । ”

“মিস্টার ব্রাউন ? ”

“মনে হয় তিনিই সমুদ্রের জল দেখতে গিয়েছেন । লোকটা তাকে ‘আপনি’ বলে ভুল করছে । ”

সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠলে মেজর, “আমি তোমাকে বলেছিলাম, ওকে বিদায় করো । শুনলে না । এখন দেখেছ কাণ্ড । সব জায়গায় আমার চেহারার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে । ”

“সব জায়গায় নেননি । ব্ল্যাকপুলে ব্রাউন না থাকলে প্রতিপক্ষ আপনাকেই জিপে তুলে নিয়ে যেত । আপনার জন্যেও ওঁকে বিপদে পড়তে হয়েছে । ”

“কে মাথার দিব্য দিয়েছিল সঙ্গে ঘুরতে ! ” মেজর গলা নামালেন, “ঠিক আছে, এখন তুমি আমাদের কী করতে বলো ? ”

“আপাতত চলুন, তাঁবুতে ফিরে যাই । মার্শালসাহেব এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা যাবে । ” অর্জুন আর ঝামেলা বাড়াতে চাইল না ।

মেজরকে তাঁর তাঁবুতে রেখে অর্জুন নিজেরটায় ফিরে এল । এত সতর্কতার কোনও কারণ সে খুঁজে পাচ্ছিল না । মার্শালসাহেব কী বলে দেখে তবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । হ্যাঁ, ওর আমন্ত্রণ রাখতেই মেজর আমেরিকা থেকে এখানে এসেছেন । কিন্তু সেইসঙ্গে লকারের সাক্ষেতিক ব্যাপারটাও তো রয়ে গেছে । সেটাকে শেষ অবধি না জেনে চলে যাওয়া চলবে না । এইসময় দরজায় শব্দ হল ।

এখন ঘন বিকেল । মিস্টার ব্রাউন চোরের মতো তাঁবুতে ঢুকছিল, কিন্তু ধাক্কা লেগেছে দরজায় ।

“কোথায় গিয়েছিলেন ? ”

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল ব্রাউন । তারপর মুখ বের করে আশেপাশে দেখে নিল । শেষে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অর্জুনের পাশে বসল, “এখানে তো ভয়াবহ ব্যাপার । ”

“কেন ? ”

“ওরা আমাদের সমুদ্রের ধারে যেতে দিচ্ছিল না । মার্শালের নাম করে টোঁচামেচি করতে অ্যালাউ করল । কিন্তু সঙ্গে একটা লোক ছিল । তাকে মিথ্যে বললাম, গলায় ব্যাথা, সমুদ্রের জলে কুলকুচি করব, কিন্তু ডান দিকের সমুদ্রের ধারে সে কিছুতেই যেতে দেবে না । বাঁ দিকে কিছুটা যাওয়ার পর সে বলল,

সোজা এগিয়ে যেতে, সেখানে সমুদ্র পাব। যত ইচ্ছে কুলকুচি করে যেন একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসি। সে এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। মানে ওর বাইরের জায়গাটায় কোনও কিছু লুকোবার নেই। তা আমিও প্রথমে শিস দিতে-দিতে এগিয়ে চুপ মেরে গেলাম। যখন বুঝলাম কেউ আর অনুসরণ করছে না, তখন গাছের আড়ালে-আড়ালে সমুদ্রের ধারে চলে গেলাম। অনেক ভেবেচিন্তে একটা লম্বা গাছে উঠে বসলাম। মিনিট তিরিশেক পর হঠাৎ দেখি সমুদ্রের জল তোলপাড় করে একটা ইয়া বড় হাঙর মুখ তুলেই নেমে গেল। অতবড় হাঙর আমি জীবনে দেখিনি। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। গাছের ডালে বসে থেকেও ভাবলাম এখান থেকে মোটরবোটে আর কিছুতেই ফিরে যাব না। আসার সময় বোধহয় হাঙরটা ধারেকাছে ছিল না। এইসব ভাবছি হঠাৎ আমার পাশের ডালে খট করে শব্দ হল। চমকে তাকিয়ে দেখি ডালটা ভেঙে গেছে। কেউ কিছু ছুঁড়ে ডালটাকে ভেঙেছে। অথচ কাছেপিঠে মানুষ নেই। আমি প্রায় লাফিয়েই নীচে নেমে পড়ে যেতে লাগলাম।” ব্রাউন একটানা বলে গেল।

“প্রহরীটা যেখানে ছিল সেখান থেকে ওই জায়গাটা কত দূরে?”

“সিকি মাইল হবে।”

“সিকি মাইল আপনি দৌড়লেন?”

“হ্যাঁ। প্রাণের দায়ে। কারণ ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি কেউ সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল।”

“প্রহরীকে কিছু বললেন?”

“না। বললে কী থেকে কী হয়ে যায়! ব্যাটা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অবশ্য ওদিকে আমি কিছু দেখেছি কি না, তা আমি স্রেফ মিথ্যে বললাম।”

“আপনি নিশ্চয়ই তখন হাঁপাচ্ছিলেন?”

“হ্যাঁ। তার কারণও জিজ্ঞেস করেছিল। বললাম, হার্টের ট্রাবল আছে।”

“আমাকে পথ চিনে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন?”

“হ্যাঁ।” বলেই দ্রুত মাথা নাড়ল ব্রাউন, “না।”

“মানে?”

“বাবা, আমার একটাই প্রাণ। এটাকে খোয়াতে চাই না।”

“দেখুন মিস্টার ব্রাউন, আপনাকে এই দ্বীপে কেউ পছন্দ করছে না। আমরা মেজরের সঙ্গী হয়ে এসেছি, তিনি পর্যন্ত নন। এর ওপর যদি মার্শাল জানতে পারেন আপনি অত দূরে গিয়ে গুলি খেতে-খেতে বেঁচে গেছেন, তা হলে আর দেখতে হবে না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।”

“আমি তো করব না বলিনি। কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে...!”

“ধরুন আপনাকে কেউ দেখতে পাবে না, রাতের অন্ধকারে যদি যাই?”

“সেটা হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কী ঘটছে? আমি বুঝতেই পারছি

না।”

“সেটা আমিও বোঝার চেষ্টা করছি। আপাতত আপনি তাঁবুতেই থাকুন। রাত নামলে আপনার সঙ্গে দেখা করব। মেজর বলে আপনাকে দ্বিতীয়বার ভুল করলে সেটা খারাপও হতে পারে। আচ্ছা, আপনি এর আগে শার্ক দেখেছেন?”

মাথা নাড়ল ব্রাউন, “প্রচুর।”

সন্ধের পর মার্শাল মেজর এবং অর্জুনকে বোঝাচ্ছিল, তোমরা আমাকে ভুল বুঝে না। আমি যখন প্রথম এই দ্বীপে আসি, তখন আমার সঙ্গে জনাচারেক সহযোগী ছিল। জলের তলায় মুক্তো নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম আমরা। তীরের লোকজনও সেই খবর জানত কিন্তু কেউ বিরক্ত করেনি। এরপর হঠাৎই আমাদের হুমকি দেওয়া হল উড়ো চিঠিতে, যেন অবিলম্বে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাই। প্রথমে ব্যাপারটাকে পাত্তা দিইনি। হঠাৎ একদিন সমুদ্র থেকে ফিরে এসে দেখি কেউ এসে আমাদের টেন্ট জ্বালিয়ে জিনিসপত্র ভেঙে রেখে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে পুলিশকে খবর দিলাম। তারা তাদের মতো তদন্ত করল। করে জেটির একজন গুণ্ডাকে ধরল। সে বলেছিল এই কাজ করার জন্যে তাকে টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিনিয়োগকারীকে সে চেনে না। জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর লোকটার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল। এরপর এক রাতে আমার এক সহকারীকে গুলি করা হল। গুলি ভেসে এসেছিল দ্বীপের বাম প্রান্ত থেকে। ছেলেটির হাতে গুলি লাগে। তখন আমি একটা এজেন্সির শরণাপন্ন হলাম। এখানে যে সমস্ত গার্ড দেখছি, তারা ওই এজেন্সির লোক। কয়েকবার এদের সঙ্গে গুণ্ডাদের লড়াই হয়েছে। তারা এগোতে পারেনি। এদের আমি যে হুকুম দিয়েছি তা আমাকেও মান্য করতে হবে, এজেন্সির সঙ্গে আমার চুক্তি সেইরকম। ওরা তোমাদের কীরকম পরিস্থিতিতে বাধা দিয়েছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। কিন্তু ব্রাউন লোকটাকে ওরা এসকর্ট দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিল আমার বিশেষ বন্ধু ভেবে ভুল করে। একে যেতে নিষেধ করে। নইলে ওর জীবন বিপদগ্রস্ত হতে পারে।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এই গুণ্ডাগুলো কারা?”

“ব্যাপারটা রহস্যময়। মনে হচ্ছে এই সমুদ্রে আমি কাজ করি ওরা চায় না। হয়তো ভেবেছে সমুদ্রের তলায় প্রচুর মুক্তো আছে। আমাদের তাড়ালেই সেগুলো পাবে।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “সমুদ্রে মুক্তো পাচ্ছ না?”

“আরে না। আমি সেই চেষ্টাও করিনি। এখানকার সমুদ্রের জলে মুক্তোর শার্পনেস বেড়ে যায়। আর্টিফিসিয়াল মুক্তোর চাষ পৃথিবীর সব দেশেই হয়। আর্টিফিসিয়াল মুক্তো আর অরিজিনাল মুক্তোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে।

মুক্তো নিয়ে যারা চাষ করেন, তাঁরা এসব জানেন। সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু এখনও অরিজিনাল মুক্তোর দামই বেশি। আমি বিনুকের বুক মুক্তো জন্মাবার আগেই একটা রিঅ্যাকশান সৃষ্টি করতে চাইছি, যার ফলে মুক্তোর রং পালটে যেতে বাধ্য। রেড পার্ল-এর রং টকটকে লাল করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হতে যাচ্ছে। কিন্তু গুণ্ডাদের উপদ্রব য়েই কমল, অমনি আর-এক ঝামেলা শুরু হয়েছে। সমুদ্রে কখনও শার্ক কেউ দ্যাখেনি। একটি অতিকায় শার্ককে প্রায় ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। আজ দুপুরেই সেইরকম খবর পেয়ে আমি সমুদ্রে নেমেছিলাম।”

অর্জুন মন দিয়ে শুনছিল। জিজ্ঞেস করল, “আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?”

“হ্যাঁ। তার চেহারা এত বিশাল যে, ছোট লঞ্চকেও ডুবিয়ে দিতে পারে। আমরা সহযোগীরা মানুষকে ভয় পায়নি কিন্তু ওই দানবটার ভয়ে চট করে কেউ জলে নামতে চাইছে না।”

“আপনি কীভাবে জলের নীচে কাজ করেন?”

“আমার একটা ছোট সাবমেরিন আছে। নীচে নেমে যাওয়ার পর ডুবুরির পোশাক পরে অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে কাজ শুরু করি।”

অর্জুন ভাবল মার্শালকে ব্রাউনের দেখা শার্কটার কথা বলবে কি না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখাই ঠিক করল। সে জিজ্ঞেস করল, “পুলিশকে জানাননি কেন?”

“জানাতে পারতাম। তবে সে-ক্ষেত্রেও আর-এক ধরনের লোভ কাজ করছে?”

“লোভ?”

“হ্যাঁ। মেজর জানে আমি আসলে অভিযাত্রী। এতবড় একটা শক্তি আমার কাছাকাছি ঘুরছে, যার অস্তিত্ব কয়েকশো বছর আগে ছিল, তাকে পুলিশ দিয়ে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে না। দানবটাকে যদি আমি জ্যান্ত ধরতে পারি তা হলে সবচেয়ে খুশি হবে।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “সেই চেষ্টা করেছ?”

“করেছি। কয়েকবার ঘুমপাড়ানি বুলেট ছুঁড়েছি। দানবটার চামড়া এত শক্ত যে, বুলেটে কোনও কাজই হয়নি। চোখে মারতে পারলে হত। কিন্তু অত সুন্দর দানবের চোখ যদি নষ্ট করে দিই, তা হলে ওর কী থাকল। যা হোক, তোমরা কি আমার সঙ্গে জলের নীচে নামতে চাও?”

মেজর বুক ফুলিয়ে বললেন, “অবশ্যই।”

“মৃত্যুভয় আছে কিন্তু।” সতর্ক করল মার্শাল।

“ওটা আমাকে দেখিও না।” মেজর হাসলেন, “দানবটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।”

অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আজ রাত্রেই একবার ব্রাউনকে নিয়ে দ্বীপের ওদিকটায় যেতে হবে। গুগুরা থাকলে শার্ক কেন আসবে? ব্যাপারটা কি নেহাতই কাকতালীয়?

প্রোফেসর হ্যাচ মূর্খ মানুষ নন। সাপ পোষেন। সেই সঙ্গে শক্তিমান মানুষজন। তিনি কেন এই সমুদ্রসৈকতে আসবেন? শুধু অর্জুনদের অনুসরণ করে এলে নিশ্চয়ই তাদের পেছনে রেখে আগে এখানে আসতেন না। সেই হোটেল থেকে অর্জুনরা অন্য কোথাও চলে গেলে অধ্যাপক তার খোঁজ পেতেন না। উনি নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছেন, তাদের কাছে এমন কিছু জিনিস আছে যা তাঁর খোঁজার পরিশ্রম লাঘব করে দিতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, একমাত্র ব্ল্যাকপুলের রাস্তা থেকে ব্রাউনকে মেজর ভেবে তুলে নেওয়া ছাড়া তিনি কখনওই সরাসরি আক্রমণ করেননি।

কিন্তু এই সমুদ্রে কেন প্রোফেসর হ্যাচ আগ বাড়িয়ে এলেন? পাল-তোলা নৌকোর দৃশ্যটা মনে পড়তেই উত্তেজিত হল অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে অমল সোমের সতর্কবাণী স্মরণে এল, কোনও ঘটনার দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দিও না। কিন্তু তা হত্বেও ওর মনে হল, মার্শাল এখানে মুক্তো নিয়ে গবেষণা করুক তা যারা চায় না, তাদের মধ্যে হ্যাচও আছেন। হয়তো এই সমুদ্রে তারা নিরিবিলিতে কোনও কাজ করতে চায়। অবশ্য এসবই সত্যি হবে যদি মার্শাল মিথ্যে না বলে। অর্জুন কোন কূল পাচ্ছিল না।

রাত দশটা বাজলে দ্বীপে কোনও মনুষ্য-কণ্ঠ শোনা গেল না। শুধু হাওয়ার সঙ্গে গাছপাতার সংঘাতের শব্দ দ্বিগুণ হয়ে বাজছিল। রাতের খাওয়া শেষ করেই ব্রাউন কবল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। লোকটাকে তখন কিছু বলেনি অর্জুন। চারপাশ আরও শব্দহীন হয়ে এলে সে ব্রাউনের ঘুম ভাঙাল। কবল সরিয়ে অবিকল মেজরের মতো মুখভঙ্গি করে ব্রাউন জিজ্ঞেস করল, “কী হল, অ্যাঁ?”

একই ধরনের মুখের গড়ন এবং দাড়ি মাঝে-মাঝে অর্জুনকেও বিভ্রান্ত করে। সে গভীর গলায় বলল, “চোঁচাবেন না। উঠে পড়ুন। চুপচাপ।”

ব্রাউনের তবু হুঁশ ঠিক হচ্ছিল না। মাথা তুলতে-তুলতে বলতে লাগল, “এইসব ইয়ার্কির কোনও মানে হয়! সবে হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটু দু-চোখ বুজেছি, আর অমনি...! না হয় আমি একটু গায়ে পড়েই দলে ঢুকছি, তা বলে মার্করাতির ঘুমোতেও পারব না?”

কথা বলার ধরনে হাসি পাচ্ছিল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, “হাড়ভাঙা খাটুনি কখন খাটলেন?”

“বাঃ। তোমরা যখন মার্শালের তাঁবুতে আড্ডা মারছিলে আমাকে বাদ দিয়ে তখন?”

“কীরকম?”

“আমি ওদের বললাম, জগিং করব।”

“কাদের?”

“এই মার্শালের পাহারাদারদের। বললাম জগিং না করলে শরীর খারাপ হয়। তা ওরা বলল, আমি এই তাঁবু থেকে কিচেন পর্যন্ত জগিং করতে পারি। মেনে নেমে নিলাম। একবার সেই ফাঁকে কিচেনে ঢুকে চিকেন স্যাভুইচ খাচ্ছি এমন সময় কুকটার নজরে পড়লাম। ও ব্যাটা আমাকে দেখে হতভম্ব। ম্যাঞ্জেস্টারের একটা রেস্টুরেন্টে রান্না করত। রেস্টুরেন্টের মালিক খুন হবার পর তিনজনের সঙ্গে পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করে। তিন বছর ঘানি ঘুরিয়েছে ব্যাটা। সেই শ্রীমান আমাকে দেখে হাতে-পায়ে ধরেছে। বলেছে যত ইচ্ছে খাও, কিন্তু মার্শালকে বোলো না। আমি এখন ভাল হতে চাই।”

“আপনি তো কিছু বলেননি?”

“না। ভেবে দেখলাম, মানুষকে ভাল হবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই যেমন তোমরা দিচ্ছ।”

ব্রাউন নিজের বুকের ওপর একটা আঙুল রেখেই মাথা নাড়ল, “কিন্তু তাই বলে ঘুম ভাঙানো ভারী অন্যায়।”

“খাওয়া তা হলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম?”

“না। কুক আমাকে নিয়ে গেল ওর তাঁবুতে। এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে গেলে প্রথম তাঁবু। গিয়ে বলল, “আসুন আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে গল্প করি। সেটা যে কী পরিশ্রমের!”

“কী গল্প করলেন?”

“এই মার্শাল লোকটার সঙ্গে যারা আছে, তারা সবাই বড়লোক হতে চায়। খিনুকের এক্সপেরিমেন্ট সফল হলেই সব ক’টা ঝাঁপিয়ে পড়বে। খবরটা গুরুত্বপূর্ণ নয়?”

অর্জুন হাসি চাপল, “তা বটে। কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু বলল না?”

“হ্যাঁ। ওকেও বন্দরে যেতে দেয় না। সমুদ্রে নামতে দেয় না দিনের বেলায়।”

“রাত্রে?”

“দেয়। একবার সব কাজ শেষ করে স্নান করতে দেয়।

“সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে হয়ে গেছে।”

ব্রাউন কাঁধ ঝাঁকিয়ে নীরবে বলল, সে জানে না।

অর্জুন বলল, “উঠুন, বেরোব।”

“বেরোব? এত রাত্রে?”

“আপনাকে আমি বলেছিলাম।”

“হ্যাঁ। কিন্তু এখন কোথায় যাব আমরা?”

“যেখানে দিনের বেলায় গিয়েছিলেন। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।”

“কিন্তু ওরা যে পাহারা দিচ্ছে !”

“দেখাই যাক না । পোশাক পরে নিন ।”

অনিচ্ছুক ঘোড়া নিয়ে দৌড়নো যায় না । বেরোবার আগে প্রতিপদে এক-একটা ওজর দেখিয়েছিল ব্রাউন, অর্জুন শোনেনি । তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছিল ওরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে । বালির ওপর চুপচাপ বসে ছিল মিনিটখানেক । দিনের বেলায় দেখেছে পাহারাদারগুলো জায়গা ভাগ করে চক্রাকারে ঘোরে । সমুদ্রের গর্জন এখন তীব্রতর মনে হয়েছে । মনে হচ্ছে বাঁ দিকেও সমুদ্র আছে । অর্জুন পাতলা অন্ধকারে কাউকে দেখছিল না । বাঁ দিকে সেই কুকুর তাঁবুটা খুব ঝাপসা নজরে আসছে । এই সময় সে শিস শুনতে পেল । ওপাশ থেকে তৎক্ষণাৎ শিস ভেসে এল । এদিকের লোকটা এবারে গলা তুলে বলল, “আমি এসে গিয়েছি ।”

ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, “ধন্যবাদ ।” এবং তখনই দুটো লোককে মিলিত হতে দেখল অর্জুন । পাহারাদার বদল হচ্ছে ? ও পাশের লোকটা চলে গেল ডান দিকের তাঁবুর দিকে । অর্জুন চটপট ব্রাউনকে খোঁচা দিয়ে কুকুর তাঁবুর দিকে চলে এল । ব্রাউনও এল একটু থপথপ করে । তাঁবুর দরজায় পৌঁছে সে ব্রাউনকে ফিসফিস করে বলল, “কুককে বলুন, আপনার সমুদ্রে স্নান করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পাহারাদার রাজি হবে না । তাই সে পাহারাদারকে কথা বলে কিছুক্ষণ যেন আটকে রাখে । রাজি না হলে মার্শালকে বলে দেবার ভয় দেখাবেন ।”

“কিন্তু এখন আমি কিছুতেই সমুদ্রের জলে নামব না ।” হাঁটুতে ভর করে বসে ব্রাউন মাথা নাড়ল ।

“আপনাকে নামতে হবে না ।” অর্জুন ওকে ঠেলল, “যান চটপট ।”

তাঁবুটা ছোট । কুক একা থাকে কি না তাও জানা নেই । অর্জুন দেখল, ব্রাউন বালির ওপর প্রায় গড়িয়ে তাঁবুর তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল । সে বাইরে তাকাল । অন্ধকার এখন কিছুটা সহনীয় । কুকুর চাপা গলা কানে এল, “আপনি ? কী আশ্চর্য ! এখানে কেন ?”

ব্রাউন খুব নিচুস্বরে বোঝাতে লাগল কেন এসেছে । তার শরীর জ্বলছে, একবার সমুদ্রে স্নান না করলে চলছে না । অথচ পাহারাদাররা জানলে অনুমতি পাওয়া যাবে না । কুককে একটু সাহায্য করতেই হবে, নইলে বন্ধু কিসের ! কুক বলল, মার্শাল জানতে পারলে তার চাকরি চলে যাবে । তা ছাড়া যে সমুদ্রে হাঙর আছে, সেখানে স্নান করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষ করে যখন বন্দুক নিয়ে কেউ পাহারা দিচ্ছে না । ব্রাউন জানাল, সেক্ষেত্রে মার্শাল এখনই জেনে যাবে তার কুকুর পরিচয় । চাকরি তাতেও থাকবে না ।

তাঁবুর ভেতর শব্দ হতে অর্জুন হামাগুড়ি দিয়ে সরে দাঁড়াল । কুককে দরজা

খুলে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। পেছন-পেছন ব্রাউন। দরজায় পৌঁছেই নিল ডাউন হয়ে বসে পড়ল ব্রাউন। আর তখনই চিংকার উঠল, “হু ইজ দেয়ার?”

“দিস ইজ মি, ইওর কুক।”

“কুক? হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দেয়ার?”

“নাথিং। শুধু খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে।”

“ফানি ম্যান। হোয়াটস্ দি ট্রাবল উইথ ইউ?” ওপাশের অন্ধকার ফুঁড়ে অস্ত্র হাতে একটি মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। অর্জুন দেখল কুক নিজে একটা সিগারেট মুখে নিয়ে আর-একটা পাহারাদারকে দিল। অর্জুন দেখল কুক নিজে একটা সিগারেট মুখে নিয়ে আর-একটা পাহারাদারকে দিল। অর্জুন আবার হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করল। আরও খানিকটা খোলা জায়গা দিয়ে ওদের যেতে হবে। গাছতলায় সে যখন পৌঁছল, তখন তার সামনে আর-একটি লোক। ঠিক অর্জুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। অর্জুন ডান হাতের ধার দিয়ে ওর ঘাড়ের কোপ মারল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা কাটা কলাগাছের মতো নেতিয়ে পড়ল। ওকে টেনে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অস্ত্রটা নিল সে। এটা রিভলভার, বন্দুক কিংবা রাইফেল নয়। এটার ব্যবহারও সে জানে না। অতএব একটা ভারী জিনিস বহন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ব্রাউন ইতিমধ্যে লোকটার কোমর-পকেট হাতড়ে একটা ছুরি বের করে অর্জুনকে দিল। ধন্যবাদ জানাতে গিয়েও পারল না সে। কারণ ব্রাউন আরও কিছু পকেটে ঢুকিয়েছে এবং সেগুলো পাউন্ড হওয়া অসম্ভব নয়।

মিনিট-তিনেক নির্বিঘ্নে চলে এল ওরা জঙ্গলে-জঙ্গলে। যে এজেন্সির ওপর মার্শাল ভরসা করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই অপদার্থ নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন একই কাজ মানুষকে অনেক সময় শিথিল করে। তা ছাড়া দুর্ভাগ্য নেহাতই প্রবল না হলে ওই লোকটি অর্জুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকত না। হয়তো অন্ধকারে নিজেদের তাঁবু থেকে বাইরের দিক দিয়েই আক্রমণ আসতে পারে বলে পাহারাদার আশঙ্কা করেছিল। আক্রমণটা ভেতর থেকেই আসবে তা সে বুঝতে পারেনি। সাধারণত এরকম আঘাতে ঘণ্টা-তিনেকের আগে চেতনা স্বচ্ছ হয় না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কোন দিকে গিয়েছিলেন?”

ব্রাউন চারপাশে তাকাল। এর মধ্যে একবার আছাড় খেয়ে বেচারার কনুই ছড়েছে। সেখানে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, “নাঃ। এদিকে তো আসিনি।”

“কোন দিকে গিয়েছিলেন?”

“সমুদ্রটা কাছে ছিল। মানে যে গাছে আমি উঠেছিলাম, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল।”

“আপনি বলেছিলেন বাঁ দিকে এসেছিলেন, এখন আমরা বাঁ দিক দিয়েই এলাম।”

“কিন্তু সমুদ্র না থাকলে আমি কী করব?”

অর্জুন আর কিছু বলল না। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে আসায় ভুল হয়েছে বলে মনে হল। মিনিট-দশেক এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে সে কোনও জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব টের পেল না। এবং এই সময় ওরা সমুদ্র দেখতে পেল। অন্ধকারে একমাত্র আওয়াজ ছাড়া সমুদ্রের চেহারা বড় শান্ত দেখায়। যেন কালচে-সবুজ জলরাশি দিগন্ত ছুঁয়ে গেছে। অর্জুন ব্রাউনের দিকে তাকাতেই সে মাথা নাড়ল, “না। এই সমুদ্র নয়। অবশ্য সব সমুদ্রই আমার একরকম লাগে।”

“গাছটাকে খুঁজুন, কী গাছ ছিল?”

“দূর! আমি গাছের নাম বলতে পারতাম না বলে স্কুলে কম নম্বর পেতাম।”

অর্জুন হতাশ নিশ্বাস ফেলল। তারপর বালির আড়াল রেখে হাঁটুতে লাগল সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। শীত করছে খুব। হাওয়া বইছে সপাটে। ব্রাউন জিজ্ঞেস করল, “আমরা কোথায় যাচ্ছি?”

“নরকে।”

“ও!”

মাথা পেছনে বালির পাহাড়ের আড়াল, সামনে সমুদ্র। জিরোবার জন্যেই ওরা বসেছিল। অর্জুন দিক বোঝবার চেষ্টা করল। শেষমেষ মনে হল, তারা যদিকে মুখ করে বসে আছে, সেদিকে সমুদ্রের উত্তর দিক। আর তখনই তার নজর পড়ল একটা নৌকো সমুদ্রের গভীর থেকে এগিয়ে আসছে। ব্রাউনকে সতর্ক করল। পেছন থেকে তাদের দেখা না গেলেও ওই নৌকোয় বসে তাদের লক্ষ করা অসম্ভব নয়। প্রায় বালির ওপর শুয়ে পড়ল ওরা। ব্রাউন ফিসফিস করে বলল, “সাহস খুব। এত রাতে দাঁড়ানা নৌকো চালাচ্ছে।”

“অর্জুন কিছু বলল না। নৌকোটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু’জন দাঁড় টানছে, একজন বসে। ঠিক ওদের সামনে দিয়ে আর একটু বাঁ দিকে এগিয়ে যেতেই যেন হুইসল বাজল। এবং তারপরেই নৌকোটা একটা খাড়ির ভেতরে ঢুকে চোখের আড়াল হয়ে গেল। অর্জুন বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত। এরা অবশ্যই মার্শাল সাহেবের লোক নয়। দ্বীপের এই দিকটা কি অন্য কেউ দখল করেছে? মার্শালের লোকজন তো ইচ্ছে করলেই দিনদুপুরে এদের আবিষ্কার করতে পারে। সে ব্রাউনকে বলল, “আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। আমি আসছি।”

“কোথায় যাচ্ছ? আমার মাটিতে একা বসে থাকতে ভয় লাগবে।”

“তা হলে কাছেপিঠের কোনও গাছে উঠে বসুন।”

“সেটা একটা ভাল ব্যাপার। দাঁড়াও, আগে আমি গাছে উঠি, তারপর তুমি যেও।”

বালির পাহাড় ডিঙিয়ে পেছনে এসে খানিকটা হাঁটতেই একটা বড় গাছ পাওয়া গেল। ব্রাউন চটজলদি ওপরে উঠতে লাগল। পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়েই সে নেমে এল খানিকটা, “এই পেয়েছি। এই গাছটাতেই তখন আমি উঠেছিলাম।”

“বুলেট-ভাঙা ডালটা এখনও আছে।” ফিসফিস শব্দটাও যেন জোরে শোনাল।

অর্জুন নিশ্বাস বন্ধ করে চারপাশে নজর বোলাল। বিরোধীপক্ষের ঘাঁটি কি খুব কাছে! ওপর থেকে নেমে আসছিল ব্রাউন। অর্জুন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, “কী হল?”

“যদি আবার গুলি আসে?”

“একই গাছে দু’বার উঠবেন কেউ ভাববে না। তা ছাড়া রাত্রে ওখানেই আপনি সেফ।”

“বলছ?” প্রশ্নটি করেই উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে ব্রাউন আবার ওপরে উঠে গেল। অর্জুন আবার বালির পাহাড় ভেঙে নেমে এল সমুদ্রের ধারে। তারপর আড়াল রেখে এগিয়ে গেল সামনে। মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর সে ফাঁড়িটাকে দেখতে পেল। ওর ভেতরেই নৌকো ঢুকেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। এভাবে এগিয়ে যেতেও আর সে সাহস পাচ্ছিল না। মাথার ওপর জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেখানে এসে দাঁড়ালে যে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। বালির পাহাড়ের আড়ালটা আর এখানে নেই। আর তখনই সে মানুষের কথাবার্তা শুনতে পেল। কেউ কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। অর্জুন সেসবের কিছুই বুঝতে পারল না। এই সময় নৌকোটা বেরিয়ে এল। এবার দুটো লোক চালাচ্ছে আর দুজন বসে রয়েছে। মনে হল আগের লোকটি যেন কাউকে নিতে এসেছিল।

অর্জুন বালির ওপর শুয়ে পড়ে নৌকোটাকে দেখল। ওরা দ্রুত অন্ধকার সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সময় শিস শুনতে পেল। শিসটা এগিয়ে আসছে। তারপরেই মূর্তিটাকে দেখতে পেল সে। কাঁধে লম্বা বন্দুক ঝুলিয়ে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রের ধারে। নৌকোটার চলে যাওয়া দেখছে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে হাত-পনেরো দূরে। যদি ওখান থেকে তাকে দেখতে পায় তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। অর্জুন চুপচাপ পড়ে রইল।

কোথাও কি কুকুর ডাকছে? একটানা। এই দ্বীপে কুকুর আসবে কোথেকে! সামনের লোকটা সমুদ্র দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসছে। এখন হাত-আটেক ব্যবধান। হঠাৎ ওপরে আর একটি স্বর বাজল, “মাইক, জ্যাক হঠাৎ খুব খেপে গেছে।”

“মাইট বি হি ইজ হাংরি।”

“নো। আমি একটু আগে ওকে খেতে দিয়েছি। ও কিছু গন্ধ পেয়েছে।”

“গন্ধ? এই রাত্রে ওরা কখনও নিজেদের এলাকা থেকে বের হয় না। ঠিক আছে, মাইককে ছেড়ে দাও। দেখি ও কী খুঁজে পায়।”

“বাঃ চমৎকার। বিকেলে একবার ছেড়ে দিয়েছিলাম। ধরতে প্রাণ বের করে দিয়েছিল। তুমি বরং ওর চেন নিয়ে একটা সার্ভে করে এসো।”

“ডু ইট ইওরসেলফ্। সব-সময় মনে রাখবে, আমি তোমার সিনিয়ার।”

“ওকে। আমি আজ করছি। কিন্তু মনে রেখো এই শেষবার।” লোকটা সম্ভবত চলে গেল। কারণ তখনই মাইক নামের লোকটা ওপরের দিকে মুখ তুলে চেষ্টা করেছিল, “হেই, তুমি কি আমাকে শাসাচ্ছ? মনে রেখো, তোমার শাসানিকে আমি তোয়াক্কা করি না।” কিন্তু ওপর থেকে উত্তর এল না। কথা বলতে বলতে মাইক চলে এসেছিল। হাত-চারেকের মধ্যে। তার মুখ এখন উর্ধ্বমুখী। কিছুটা উত্তেজনার কারণে সে মুখ নামিয়েও বিড়বিড় করল।

অর্জুন কাঁটা হয়ে শুয়েছিল। এখন তার আর কিছুই করার নেই। এবং তখনই মাইক অশ্রুটে কিছু বলে উঠে এক লাফে তার পাশে এসে দাঁড়াল। অর্জুন চাপা গলায় প্রশ্ন শুনল, “হু আর ইউ?”

অর্জুন উত্তর দিল না। সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। অমল সোম বলেছিলেন, সাপও ফণা তোলে কিন্তু নড়াচড়া না দেখা পর্যন্ত ছোবল মারে না। গুলি করার আগে মাইকেরও একটা প্রস্তুতি প্রয়োজন। এবং তখনই কোমরের নীচে একটা লাথি এসে পড়তেই গড়িয়ে গিয়ে স্থির হয়ে গেল অর্জুন। প্রাণপণে নিশ্বাস আটকে সে পড়ে রইল।

“ডেড?” মাইক বিড়বিড় করল। তারপর রাইফেল বালির ওপর রেখে অর্জুনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। ওর একটা হাত নাকের নীচে অনুভব করল অর্জুন। নিশ্বাস পড়ছে কি না পরীক্ষা করছে। এবং সুযোগটা হাতছাড়া করল না অর্জুন। দ্রুত পা গুটিয়ে মাইক সতর্ক হবার আগেই জোড়া লাথি কষাল ওর বুকে। সঙ্গে-সঙ্গে ছটকে গেল মাইক। স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে পড়ে থাকা রাইফেল তুলে তার বাঁট দিয়ে লোকটার মাথায় আঘাত করল সে। মাইক চিৎকার করে বাধা দিতে গিয়েও পারল না। দ্বিতীয় আঘাতেই জ্ঞান হারাল।

আর সেই সময় কুকুরের চিৎকার প্রবল হল। কুকুরটা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। রাইফেল নিয়ে দৌড়তে লাগল অর্জুন। বালির পাহাড়টার কাছে এসে সে নিশ্বাস ফেলল। সাক্ষাৎ-মৃত্যুর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসার পর তার নিশ্বাস কিছুতেই সহজ হচ্ছিল না। কুকুরের আওয়াজটা কমে গিয়েছিল। অর্জুন চারপাশে তাকাল। ওরা নিশ্চয়ই মাইককে এখনই আবিষ্কার করবে। ওদের দলে ক’জন আছে বোঝা যাচ্ছে না। রাইফেলটায় গুলি আছে কি না চট করে যাচাই করে নিঃসন্দেহ হল। অন্তত মরে যাওয়ার আগে পাল্টা আক্রমণ

করার একটা সুযোগ রইল। কুকুরের ডাক আবার কাছাকাছি চলে এসেছে।

হঠাৎ সমুদ্রের জলে আলোড়ন হল। এবং তারপরেই দম বন্ধ হয়ে গেল অর্জুনের। সমুদ্রের জল উত্তাল করে একটা বিশাল জন্তু মুখ তুলেছে। তার লেজের আঘাতে অনেকটা জল ছিটকে আকাশে উঠে গেল। জন্তুটা আবার ডুবে গেল জলের তলায়। এই কি সেই দানব-হাঙুরটা, যার কথা মার্শাল বলছিল? সমুদ্রের মধ্যে ওর সামনে পড়লে এক মুহূর্ত লাগবে না নিশ্চয় হতে। অর্জুনের মাথা অকেজো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই কুকুরের বীভৎস চিৎকার ছুটে এল তার দিকে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে বালির আড়ালে হাঁটু মুড়ে বসল। ওপাশে কুকুর আর এপাশে জলদানব, যার দেখা প্রথমে পাবে তাকে লক্ষ্য করেই গুলি চালাবে সে।

কুকুরটাকে সামলাতে পারছিল না পাহারাদার। মাঝে-মাঝেই শিস দিয়ে তাকে শাস্ত হতে হুকুম করছে সে। কিন্তু তাকে প্রচণ্ড জোরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে জন্তুটা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে লোকটা ডাকতে লাগল, “মাইক! মাইক! কাম কুইক!”

অর্জুন এবার ওদের দেখতে পেল। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়েছে ওরা। ওর হাতে কুকুরের চেইন। জন্তুটা একবার জঙ্গলের দিকে আর একবার অর্জুন যেদিকে দাঁড়িয়ে সেদিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। লোকটা আবার ডাকল, “মাইক!” সাড়া পেয়ে কুকুরটাকে টানতে-টানতে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল। এবং এইসময় সে মাইকের শরীর দেখতে পেল, “ওঃ গড!”

মাইককে দেখছিল কুকুরটা। তার গতিও একমুখী হওয়ায় প্রহরীর কোনও অসুবিধে হল না। মাইকের শরীরের পাশে পৌঁছে কুকুরটা একবার শূঁকে নিয়ে দ্বিগুণ শব্দ করতে লাগল। জন্তুটার চেহারা বেশ ভীতিকর। যদি ছাড়া পায় তা হলে গুলি চালানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু প্রহরী কুকুরকে ছেড়ে দিল না এবং মাইকের শরীরের পাশ থেকে সরেও এল না। অর্জুন দ্রুত জঙ্গলে ঢুকে গেল। নির্দিষ্ট গাছটির নীচে পৌঁছেতই ওপর থেকে ব্রাউনের গলা ভেসে এল, “কুকুর ডাকছে কেন?”

“চটপট নেমে আসুন।”

অর্জুন কথা শেষ করা মাত্র সরসর করে নীচে নেমে এল ব্রাউন। অর্জুনের মনে হল এই একটা জায়গায় মেজরের সঙ্গে ব্রাউনের পার্থক্য রয়েছে। মেজর শারীরিক দিক দিয়ে ব্রাউনের মতো এত ফিট নন। নীচে নেমেই ব্রাউন বলল, “তুমি কি সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলে? শার্কটাকে দেখেছ? ইটস এ মনস্টার। ওঃ।”

অর্জুন বলল, “তাড়াতাড়ি ফিরে চলুন। আমাদের নিজস্ব প্রহরীরা কী অবস্থায় আছে কে জানে।” হাঁটতে-হাঁটতে ব্রাউন বলল, “ওরা আর যাই হোক আমাদের তো গুলি করবে না। একটু বকাঝকা করবে, বড়জোর কাল সকালে

এই দ্বীপ থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে। তার বেশি কিছু তো করবে না।”

ক্যাম্পে ঢোকান আগে সেই প্রহরীটিকে তখনও অচৈতন্য দেখল ওরা। ব্রাউন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “মরে যাবে না তো?” অর্জুন ওর নাকের নীচে হাত রেখে নিশ্বাস পরীক্ষা করে বলল, “কোনও চাপ নেই।” কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরী ওদের পথ আটকে দাঁড়াল, “কে?”

ব্রাউন জবাব দিল, “আমরা। মিস্টার মার্শালের গেস্ট।”

লোকটা আগ্নেয়াস্ত্র উচিয়ে সামনে এল, “তোমরা? তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?”

“বেড়াতে। ঘুম আসছিল না, তাই।” ব্রাউন ভিজ়ে বেড়ালের মতো জানাল।

“কিন্তু এখান থেকে বাইরে গেলে কী করে?”

“পায়ে হেঁটে। দেখছই তো।”

“কী আশ্চর্য! আমি তোমাদের যেতে দেখলাম তো! ওপাশে আর কেউ বাধা দেয়নি?”

“না! আমরা ভাবলাম আজ বোধহয় পাহারা নেই।”

“মাই গড! কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? জানো, আজ রাত্রে খুন হয়ে যেতে পারতে।”

“খুন তো হইনি। দেখতেই পাচ্ছ।”

প্রহরীটি আরও একটু এগিয়ে এল, “স্যাম তোমাদের বাধা দেয়নি? ওপাশে ওর দেখা পাওনি?”

“না! তা ছাড়া আমরা চোর না ডাকাত যে, বাধা দেবে!”

“ব্যাটা নির্যাত্তি ঘুমোচ্ছে। শোনো, একটা অনুরোধ করব। তোমরা যে ঘুরতে বেরিয়েছিলে, তা কারও কাছে গল্প কোরো না। তা হলে এজেন্সি আমাদের ছিড়ে খাবে। বুঝলে?”

ওরা মাথা নেড়ে নিজেদের তাঁবুতে চলে এল। ফেরামাত্র ব্রাউন চলে গেল বিছানায়। আর সিগারেট ধরাল অর্জুন। সমস্ত ব্যাপারটা কীরকম রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কঠোর নিরাপত্তা নিয়ে মার্শালসাহেব দ্বীপের এ-প্রান্তে মুক্তো পরীক্ষা করছেন। আর রাত নামলেই দ্বীপের ওপাশে আগ্নেয়াস্ত্র আর কুকুর নিয়ে অন্য দল পাহারা দেয়। নৌকোয় চড়ে দাঁড় বেয়ে কারাই-বা মাঝরাত্রে সমুদ্রে যাচ্ছে? এত বড় একটা হাঙর যে সমুদ্রে ঘোরাফেরা করে সেখানে নৌকো বাইতে ওরা কেন ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু ওপাশে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ প্রায়। হঠাৎ অর্জুনের মস্তিষ্কের কোনও কোষে যেন আলো জ্বলে উঠল। উত্তর দিকে এক ঘন্টা দাঁড়াটানা নৌকোয় গেলে মে মাসে সূর্যদেব যেখানে মাথার ওপরে আসেন ঠিক সাড়ে বারোটায়, মাটি আর আকাশ যেখানে সমান দূরে অবস্থান

করে, সেখানে পৌঁছানোর জন্য নৌকোটা চেষ্টা করছে না তো ? কিন্তু মধ্যরাতে সূর্য পাবে কোথায় আর সময়টা তো মে মাস নয় । তা হলে ?

ব্রেকফাস্টের পর মার্শাল ওদের নিয়ে বের হলে । ব্রাউনের যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই । মার্শালের অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল সে, “জলের নীচে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে । হোক না সাবমেরিন, তবু জলের নীচে তো বটে । অনেকের যেমন বেশি উচুতে উঠলে মাথা ঘোরে, তেমনই জল আমি সহ্য করতে পারি না ।” মেজর খুশি হলেন ব্রাউন যাচ্ছে না বলে । দু’পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, “বাহাদুর বটে ।”

তাবুতে ফেরার আগে ব্রাউন অর্জুনকে চাপা গলায় জানিয়ে দিগে গেল, “পৈতৃক প্রাণটা হারাতে চাই না ভাই । ওই বিশাল হাঙরটার মুখোমুখি হলেই তোমার গিয়েছ । তোমার দেশে কাকে কী খবর দিতে হবে তা একটা কাগজে লিখে দিয়ে গেলে বুদ্ধিমানের কাজ করবে ।”

অর্জুন হেসে বলেছিল, “হাঙরটা বোধহয় হিংস্র নয় । দাঁড়টানা নৌকোকে যখন কিছু বলেনি, তখন সাবমেরিনকে কেন বলবে ।”

পাহারাদারদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে এল ওরা । কাল যেদিকে গিয়েছিল অর্জুন, এটা তার ঠিক উলটো দিক । সাবমেরিন এখন জলের ওপর ভাসছে । ওরা ভেতরে ঢুকে গেলে সেটি দরজা বন্ধ করল । খুব ছোট হলেও বড় কাজের, তথ্যটা জানাল মার্শাল । ওরা যেখানে বসেছিল তার তিন পাশে বুলেটপ্রুফ-জাতীয় কাচ । ধীরে-ধীরে যান নীচে নেমে যাচ্ছে । অর্জুনের এই অভিজ্ঞতা প্রথম । মেজর বললেন, “এটা আমার তৃতীয়বার । একবার অতলাস্তিকে ছিলাম দিন-তিনেক । ফ্যান্টাস্টিক ।”

জলের নীচের জগৎটা কি জলের ওপরের জগতের চেয়ে বেশি রহস্যময় । এখন ওরা যে-স্তরে রয়েছে সেখানে সূর্যের আলোর প্রতিফলন পৌঁছে যাচ্ছে । ফলে একটার পর একটা ঝাপসা দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ছে । ইঞ্চি থেকে এক-হাতি মাছেরা সঙ্গ ছাড়ছে না । খুব মজা লাগছিল অর্জুনের । সাবমেরিনটি চালাচ্ছিল যে লোকটি তাকে মার্শাল মাঝে-মাঝে নির্দেশ দিচ্ছিলেন । এবার ঘুরে বসে বললেন, “তোমরা কি জানো, কীভাবে বিনুকের বুকে মুক্তো জন্মায় !” মেজর বললেন, “কীভাবে আর, প্রকৃতি দিয়ে দেয় ।”

মার্শাল মাথা নাড়লেন, “না । মুক্তো শরীরে আসে বাইরে থেকে । অবশ্য আসার সময় তা মুক্তো থাকে না । বিনুকের শরীর খুব নরম । সেটাকে বাঁচাতে কনচিওলিন নামক এক পদার্থ দিয়ে সে তার খোলটি তৈরি করে । বিনুক যখন খাবার খায়, তখন ওই খোলের ফাঁক দিয়ে যদি কোনও কাঁকর ঢুকে পড়ে তখন তার শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় । সেই কাঁকর বা বালিকণাকে ঘিরে ফেলতে সে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তরল রস ঢালতে থাকে । অনেকটা আবরণ পড়ে গেলে

তার ব্যথা কমে আসে আর কার্বনেটের আবরণ জমে জমে বালিকগাটি একসময় মুক্তোয় পরিবর্তিত হয়। শুধু বালিকগা নয়, যে-কোনও জিনিস ওই শরীরে ঢুকলেই এমন কাণ্ড ঘটতে পারে। পারস্য উপসাগর আর মান্নার উপসাগরে মুক্তো বেশি পাওয়া যায়। ওখান থেকে আমি প্রচুর পিঙ্কটাডা ভালগারিস কিনুক আনিয়েছি এখানে। এই প্রজাতির কিনুকে বেশি মুক্তো পাওয়া যায়। মেক্সিকোতেও এক ধরনের কিনুক পাওয়া গেছে, যার মুক্তোর রং উজ্জ্বল কালো।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “সব কিনুকে মুক্তো হয় না কেন?”

মার্শাল বললেন, “মুক্তোওয়ালা কিনুকের চেহারা হল বাঁকাচোরা। নদী বা পুকুরে যেসব কিনুক পাওয়া যায় তা হল ইউনিও গোষ্ঠীর।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “লাল রঙের মুক্তো চাইছ কেন?”

“টকটকে লাল মুক্তো নেই বলে। মেক্সিকোতে কালো মুক্তো, অস্ট্রেলিয়ান মুক্তো রুপোলি, জাপানি মুক্তো সাদাটে-সবজে, ভারতীয় মুক্তো হালকা গোলাপি। কিন্তু টকটকে লাল কোথাও নেই। কীভাবে করছি জানতে চেষ্টা না। তবে এখনও কয়েকটা বড়-বড় খাঁচা দেখবে। বাঁ দিকে, হ্যাঁ। দেখতে পারছ? ওই খাঁচায় আমার কিনুকরা রয়েছে। তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে ওদের শরীরে মুক্তো দেখার জন্যে।”

“তিন বছর? সে তো অনেক সময়।” মেজর বলে উঠলেন।

“তার অনেকটাই তো পার করে দিলাম।” বলতে-বলতে চিৎকার করে উঠলেন মার্শাল। জলের ভেতর শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে খাঁচাগুলো। হয়তো বয়া জাতীয় কিছু দিয়ে তাদের ভাসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশ-কয়েকটা খাঁচা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। তার ভেতরে একটিও কিনুক নেই। উত্তেজিত মার্শালের নির্দেশে চালক সাবমেরিনটি নিয়ে গেল খাঁচার পাশে। চটপট পাশের ঘরে চলে গেলেন মার্শাল। তারপরই সাবমেরিন দুলে উঠল। অর্জুন লক্ষ করল ডুবুরির পোশাক পরে মার্শাল সাঁতরে ভাঙা খাঁচাগুলোর কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। সাধের জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয় মার্শালের এখন সেই অবস্থা। নিশ্চয়ই সেই হাঙরটা আবার হানা দিয়েছে এখানে।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “হাঙরটা আবার এখন আসতে পারে না?”

চালক মাথা নাড়ল, “পারে। মিস্টার মার্শাল ঝুঁকি নিচ্ছেন।” সে ধীরে-ধীরে যানটি নিয়ে এল খাঁচার পাশে। মার্শাল অদৃশ্য হয়ে গেলেন চোখের সামনে থেকে। এবং তার এক মিনিটের মধ্যেই সেই ডুবুরির পোশাকেই মুখোশ খুলে ঘরে ঢুকে চোঁচাতে লাগলেন, “উই মাস্ট কিল হিম। কাল রাতে এসে আবার নষ্ট করে গিয়েছে। আমার পেছনে লেগেছে জানোয়ারটা। একবার যদি সামনে পেতাম তা হলে দেখিয়ে দিতাম বাছাধনকে। উঃ, ভাবতে পারো আমার এতদিনের পরিশ্রমের অর্ধেকটা এইভাবে বানচাল করে দিল হাঙরটা!”

মেজর জিঞ্জেস করলেন, “ভাঙা খাঁচায় একটাও বিনুক নেই?”

“তুমি তো বেজায় আহম্মক ! পাখির খাঁচা খোলা রাখলে সে তোমার জন্যে সেখানে বসে ডিম পাড়বে ? জলের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে বিনুক, সে কি আর থাকে ? প্রতিটি বিনুককে কী সুন্দর অপারেশন করে মুক্তো তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিলাম । দিব্যি বেঁচে ছিল ওগুলো ।”

মার্শাল কথা শেষ করতেই চালক চিৎকার করে উঠল, “হে বস্ । লুক । হি ইজ দেয়ার ।”

ওরা জলের মধ্যে দেখতে পেল হাঙরটাকে । এত বিশাল এবং বীভৎস হাঙর স্বপ্নেও দ্যাখেনি অর্জুন । হাঙরটা রয়েছে একশো ফুট ওপরে । তাই ঝাপসা লাগছে ওর শরীর । কিন্তু জল পরিষ্কার থাকায় আদলটা বোঝা যাচ্ছে । চূপচাপ সেটা যেন লক্ষ করছে এই যানটাকে । মার্শালসাহেব সঙ্গে-সঙ্গে পাগল হয়ে গেলেন যেন । চালককে বললেন, “আমি যেভাবে বলব সেইভাবে চালাবে ।” তারপর দৌড়ে ঢুকে গেলেন পাশের ঘরে । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নির্দেশ এল, “কোনাকুনি ওর দিকে চলো ।”

চালক বলল, “বস । ইট উইল বি ডেঞ্জারাস ।”

“যা বলছি তাই করো ।”

অতএব আমাদের যানটি কোনাকুনি চলল । হাঙরটির হাঁ-মুখ দেখা যাচ্ছে । চোখ জ্বলছে । বাঘ যেমন শিকারের ওপর লাফাবার আগে শরীর টানটান করে নেয়, এও কি তাই করছে ? হঠাৎ জলের ভেতর তীব্র কম্পন উঠল । হাঙরটা সামান্য নড়ল মাত্র । পর পর দু’বার । চালক বলল, “বস, গুলি করে খেপিয়ে দিচ্ছেন ।”

এবার হাঙরটি এগোতে লাগল । সেই বীভৎস মুখগহ্বর মৃত্যুর আগেও ভুলতে পারবে না অর্জুন । মেজর চিৎকার করে ভিরমি খেয়েছেন । সঙ্গে-সঙ্গে যান ঘুরিয়ে তীব্র বেগে পেছন ফিরেছে চালক । মার্শালের আদেশের জন্যে সে আর অপেক্ষা করেনি । কিছুটা পথ তাড়া করে এসেছিল হাঙরটা । তারপর পলায়নকারীর প্রতি নিতান্ত অবহেলাতেই সে থেমে গেল । যাওয়ার আগে জলে যেভাবে আলোড়ন তুলল তাতে জানিয়ে দিল শক্তির বিচারে একটা কুকুর হাতির সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল ।

সাবমেরিন থেকে লঞ্চে উঠে তাঁবু পর্যন্ত মেজর কথা বলার শক্তি হারিয়েছিলেন । মার্শাল গুম হয়ে রইলেন । শুধু শেষ মুহূর্তে চালককে ডেকে বলেছিলেন, “থ্যাক্স । কিন্তু এই ঘটনার কথা আর কেউ জানতে না পারে । মনে রেখো ।”

তাঁবুতে ঢুকে মার্শাল কাঁচা ব্রান্ডি মেজরকে দিলেন গ্লাসে ঢেলে, নিজেও নিলেন । অর্জুনকেও অফার করেছিলেন তিনি, কিন্তু সে মাথা নেড়ে খাবে না বলল । এই সময় ব্রাউন এসে দাঁড়াল তাঁবুর দরজায়, “ও, সেলিব্রেট করা ৪২০

হচ্ছে। আমি কি বাদ যাব?”

মার্শালের মেজাজ খুব খারাপ থাকারই কথা, তিনি বোতলটা ছুঁড়ে দিলেন ব্রাউনের দিকে। দক্ষ গোলকিপারের মতো ব্রাউন সেটাকে ধরে ফেলল। তারপর ছিপি খুলে খানিকটা ঢেলে দিল গলায়। অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল। এখনও মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়নি। মেজর কথা বলছেন না, ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তার ওপর মার্শাল তাঁকে আহ্বানক বলে গালাগাল দিলেন, একটা প্রতিবাদ করেননি মেজর। এটাও অস্বাভাবিক। হাঙরটার বিশাল চেহারা, বীভৎস হাঁ যেন অর্জুনের চোখের সামনে ঝরঝর ঘুরে আসছিল। ইচ্ছে করলে প্রাণীটি এতক্ষণে তাদের গিলে ফেলতে পারত।

মার্শাল ব্রাভি শেষ করে বললেন, “আমি আজই পোর্ট পুলিশের কাছে যাব। ওটাকে মারতেই হবে।”

“আপনি কি গুলি করেছিলেন?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ। দু’বার। যেন লোহাকে গুলি করছি। কী ভয়ঙ্কর, এর পর তো ওখানে গিয়ে কাজ করাই অসম্ভব হয়ে গেল। একটা খাঁচা এখনও আস্ত আছে, তাও নষ্ট করবে ব্যাটা।”

“কিন্তু পোর্ট পুলিশের দিকে যেতে হলে তো এদিকের সমুদ্র ডিঙোতে হবে।” আচমকা বলে উঠল ব্রাউন। তার হাতে এখনও ব্রাভির বোতল।

“ওপাশের সমুদ্রে কোনও ভয় নেই।” “আপনারা কি দানবটাকে দেখেছেন আজ?”

অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই খুব খুশি হল ব্রাউন, ভাগ্যিস যাইনি। তখনই আমার মন কু গাইছিল। কিন্তু মিস্টার মার্শাল এখানে আসার সময় ওই সমুদ্রেও আমরা হাঙরের পাখনা দেখেছি। ভয় নেই বলবেন না।”

কথাটাকে সমর্থন করল অর্জুন, “হ্যাঁ। একটা হাঙরকে জলে যেতে দেখেছি। তবে সেটা এইটে কি না জানি না।”

মার্শালসাহেব চিন্তিত হলে, “এখানে এখন একটাই হাঙর ঘুরছে। তবে ও এখনও পর্যন্ত কোনও নৌকো অথবা লঞ্চ আক্রমণ করেনি। আমাকে যেতেই হবে।”

মার্শাল বোধ হয় তার প্রয়োজন করতেই বেরিয়ে গেলেন। মেজরের গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছে। ব্রাউন এগিয়ে এসে তাতে আবার খানিকটা ঢেলে দিল। অর্জুন আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেজর তাকে বাঁ হাত তুলে থামালেন, “আই নিড ইট। একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলাম। ওঃ, কী ভয়ঙ্কর। ব্রাউন, তুমি যদি জন্তুটাকে দেখতে।”

“আমি দেখতে চাই না। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তোমরা দেখেছ। নইলে এই ব্রাভি কপালে জুটত না। কিন্তু আমি এখানে আর থাকতে চাই না। তোমরা কেউ বলতে পারো হাঙররা বালির ওপরে উঠে আসতে পারে কি না?”

ব্রাউনের কথা এর মধ্যেই সামান্য জড়িয়েছে। হঠাৎ মেজর বললেন, “সত্যি, আমাদের আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। ওই দানবটার সঙ্গে লড়াই করার কোনও ক্ষমতাই আমাদের নেই। আর একটু ব্রাভি!”

ব্রাউনের দিকে গ্লাসটা উচিয়ে ধরলেন মেজর। অর্জুন তাবু থেকে বেরিয়ে এল।

বালিতে একা অন্যমনস্ক অর্জুন হাঁটছিল। দেখল মার্শাল ফিরে আসছেন। মুখোমুখি হতেই মার্শাল বললেন, “গত রাতে কেউ আমাদের এক পাহারাদারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে। বেচারি এখনও কথা বলতে পারছে না। ওকে নিয়ে বন্দরে যাচ্ছি। একইসঙ্গে জলে আর ডাঙায় আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে দেখছি।” হনহনিয়ে নিজের তাবুর দিকে চলে গেলেন মার্শাল।

অথাৎ কেউ তাদের কাল রাতে বাইরে যাওয়ার কথা ফাঁস করেনি। কিন্তু অর্জুনের খুব খারাপ লাগছিল। কে এত জোরে মেরেছে? লোকটা এমন অসুস্থ হোক তা তো সে চায়নি। কিন্তু অবস্থা এমন যে, এ-ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। মার্শাল এটাকে ডাঙায় বাইরের আক্রমণ বলে ভাবছেন। হঠাৎ অর্জুনের মাথায় অন্য চিন্তা এল। এই দ্বীপের উলটো দিকে যারা দিনে লুকিয়ে থাকে রাতে কুকুর নিয়ে পাহারা দেয় দাঁড়টানা নৌকোয় স্বচ্ছন্দে সমুদ্রে ঘোরাফেরা করে, তারা কী করে হাঙরের উৎপাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে? যেখানে দানবটা মার্শালের মুক্তোর খাঁচা তছনছ করছে সেখানে ওরা স্বচ্ছন্দে দাঁড় বাইছে? হাঙরটার সঙ্গে এমন সমঝোতা হল কী করে?

সে দৌড়ে মার্শালের তাবুতে ফিরে এল। মেজর তখন তুরীয় মার্গে বিচরণ করছে। নেশা হয়েছে ব্রাউনেরও। পোশাক বদলে এসে মার্শাল বললেন, “আমার অভিযাত্রী-বন্ধুকে বলো সন্ধের মধ্যে আমি ফিরে আসব।”

মেজর মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, “কী, আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে? বেশ, আই উইল নেভার গো ব্যাক। আমি হাঙরটাকে মারব। হাঙর দেখানো হচ্ছে আমাকে!”

মার্শাল কাঁধ বাঁকালেন। টেবিল থেকে একটা ব্যাগ তুলে নিলেন, “ব্রাউনকে নিয়ে তুমি তোমার তাবুতে ফিরে যাও। মেজর এখানেই থাকুক।”

“যাচ্ছি। কিন্তু মিস্টার মার্শাল, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।” অর্জুন অত্যন্ত নম্র গলায় বলল।

মার্শাল ঘুরে দাঁড়ালেন, “বলো।”

“তার আগে বলুন, যারা আপনাকে এখানে থেকে চলে যাওয়ার জন্যে শাসাত তারা এখন আর কিছু বলছে না?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“না। হঠাৎই তারা চুপ করে গিয়েছে। বোধ হয় জেনে গেছে হাঙরটার কথা। ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এক শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়েছে আমাকে।”

“দ্বীপের উলটো দিকটায় যান না কেন আপনারা ?”

“আমি শুধু এই দিকটায় কাজ করব বলে সরকারের অনুমতি নিয়েছি।”

“আপনি যদি আমাকে ওইদিকে যাওয়ার অনুমতি দেন তা হলে হয়তো আমি কোনও সূত্র খুঁজে পেতে পারি।” অর্জুন উৎসুক চোখে তাকাল।

“হাঙর যে উভচর জন্তু তা ওরা বলতে পারে, কারণ নেশা করেছে। তুমি বলছ কী করে ? ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করো, আমি গ্রহরীদের বলে দিচ্ছি।” হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন মার্শাল।

অর্জুন এখন অত্যন্ত উল্লসিত। তার মন বলছে দিনের আলোয় দ্বীপের উলটো দিকে সে কোনও সূত্র খুঁজে পাবেই।

বুনোগাছে লতা বুলছে। ঝোপঝাড় দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে। মাঝে-মাঝে খানিকটা জায়গায় বালির টিপি আর সমুদ্রের এলোমেলো হাওয়া ছাড়া দ্বীপটার কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। অর্জুন সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। মার্শালসাহেবের এলাকা সে ছাড়িয়ে এসে একটা ঝাকড়া গাছের তলায় এখন দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই সমুদ্র। শান্ত, চুপচাপ। অথচ এই জলের গভীরে সেই দানব-হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, দানবটা মার্শাল সাহেব ছাড়া আর কারও ক্ষতি করছে না। কেন ? ওর সমস্ত রাগ কি কেবল ঝিনুক-চাষির বিরুদ্ধে ? ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। হাঙরটাকে দেখলে বেশ খুনে বলেই মনে হয়। যারা নৌকায় সমুদ্রে ঘোরে তাদের ছেড়ে দেবার পাত্র ও নয়। অথচ তাই ঘটছে। নাকি জলের ওপরে যারা থাকে তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না দানবটা ? হাঙরের চরিত্র নিয়ে সে কখনও পড়াশুনো করেনি, অতএব মাথা ঘামিয়ে কোনও ফল হবে না।

গত রাত্রে তারা এই পথ দিয়েই এসেছিল। অর্জুন সতর্ক পায়ে এগোল। বালিতে জুতোর ছাপ পড়ছে। পথ চিনে ফিরতে অসুবিধে হবে না যদি হাওয়ায় দাগ না মুছে যায়। গতরাতে ব্রাউন যে গাছে আশ্রয় নিয়েছিল সেটাকে দেখতে পেল সে। ব্রাউনের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে এখানেই তাকে মারার জন্যে গুলি ছুঁড়েছিল কেউ। অর্জুন মাটিতে বসে পড়ল। চারপাশে সতর্ক চোখে তাকাল। কোনও সন্দেহজনক উপস্থিতি চোখে পড়ছে না। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না তাও বুঝতে পারছে না। সে মাথা নিচু করে হেঁটে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মিনিট-তিনেক সেখানে অপেক্ষা করার পর বুঝতে পারল ধারেকাছে কেউ নেই। অতএব তাকে যেতে হবে সেই খাঁড়ির দিকে যেখানে গতরাতে গিয়েছিল।

ঝোপঝাড় আড়ালে রেখে এগোতে অর্জুনের সময় লাগল। মাঝে-মাঝে যখন ন্যাড়া বালি আসছিল তখনই বিপত্তিতে পড়ছিল সে। অনেক সময় নিয়ে চারপাশ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে সে দ্রুত খোলা জায়গাটা পার হচ্ছিল। এখন সমুদ্রের গর্জন আরও বেড়েছে। হাওয়াতেও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি।

হঠাৎ অর্জুন স্থির হয়ে গেল। তার চোখ লোকটার পিঠে আটকে গেল। দ্বীপের দিকে পেছন ফিরে লোকটা সিগারেট খাচ্ছে একমনে। সে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। ওপাশে যেতে হলে ওই লোকটাকে না ডিঙিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এবং তারপরেই লোকটার কোলের ওপর রাখা মেশিনগানের মুখ চোখে পড়ল তার। ঝোপের মধ্যে মেশিনগান নিয়ে যে বসে থাকে, সে কখনও মিত্র হতে পারে না। পাহারাদারির কাজে যখন মেশিনগান লাগছে তখন প্রতিপক্ষ নিজেদের কাজটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। অর্জুন দেখল লোকটা সিগারেটে শেষ টান দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর মেশিনগান নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ শক্ত চেহারা। দেখলেই মনে হয় পুলিশ কিংবা মিলিটারিতে চাকরি করত নিষাতি। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে দেখল। অর্জুন বসে আছে ঠিক হাত-দশেক দূরে। তার সামনে ঝোপের আড়াল। নিচু হয়ে এগিয়ে না এলে দেখার সম্ভাবনা কম। এবং এখন মোটেই নড়াচড়া করা চলবে না। লোকটা মেশিনগানের স্ট্যাপ কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। এবং তখনই অর্জুন ঠিক পায়ের পাশে সরসর আওয়াজ শুনতে পেল। মুখ ঘুরিয়ে বালির দিকে তাকাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল। চোখ বিস্ফারিত এবং প্রতিটি নার্ভ আচমকা অবশ হয়ে গেল। পায়ের ঠিক এক হাত দূরে বালিতে গর্ত ছিল। সেই গর্ত থেকে সরসর করে কুৎসিত চেহারার সাপ বেরিয়ে আসছে। সাপটা অর্ধেক শরীর বের করে তাকে দেখতে পেয়ে একটু স্থির হল। অর্জুনের চোখ থেকে চোখ সরাল না কিছুক্ষণ। খুব ছিপছিপে আর সর্বাস্থে কালচে চাকা দাগের সাপটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে শরীরটাকে টেনে বের করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

অর্জুনের ধাতস্থ হতে সময় লাগল। এরকম সাপ সে কখনও দ্যাখেনি। চেহারা দেখে বিষধর কি না বোঝা মুশকিল। কিন্তু অর্ধেক বেরনো অবস্থায় সাপটা যদি ওকে কামড়াত তা হলে হয়তো ভয়েই মরে যেত। এই ঠাণ্ডাতেও শরীর ঘামে নেয়ে উঠেছিল। স্নায়ু অবশ হয়ে আসতে ঠাণ্ডা বাতাসে শীতভাবটা ফিরে এল দ্বিগুণ হয়ে। পরিত্যক্ত গর্তটা দেখল সে। ওর কোনও সঙ্গী যদি ভেতরে থাকে এবং এখন তার বেরনোর সময় হয়ে পড়ে তা হলে সে অর্জুনকে দয়া দেখাবেই এমন কথা নেই। সাপের গর্তের পাশ থেকে সরে যাওয়া দরকার। অর্জুন সামনের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেল। লোকটা অনেকটা এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসেছে। বসে মেশিনগানটা আকাশের দিকে উচিয়ে উড়ন্ত সি-গালকে টিপ করছে। একঘেষেয়মিতে ভুগলে মানুষ কত কী না করে। লোকটা টিপ করছে, কিন্তু গুলি ছুঁড়ছে না। অর্জুন অতি সন্তুর্ণণে ডান দিকে সরে যেতে লাগল। তারপরে আর-একটা ঝোপের আশ্রয় নিতেই সে সাপটাকে দেখতে পেল। শরীর বেঁকিয়ে সেটা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। এবং একসময় খোলা জমিতে লোকটার সামনে গিয়ে পড়ে থমকে

দাঁড়াল সাপটা। লোকটা তখনও আকাশে নজর করছে। ওকে সতর্ক করা দরকার। হাজার হোক, একটা মানুষ অজান্তে সাপের কামড়ে মারা যাবে এটা কাম্য নয়। এইরকম ভাবতে-না-ভাবতেই অর্জুন অভাবনীয় দৃশ্যটি দেখল। আচমকা লেজের ডগায় শরীরের ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল সাপটা। প্রায় এক মানুষ লম্বা হয়ে বিশাল ফণা ছড়িয়ে নিয়ে হিসহিস শব্দ করে দুলতে লাগল। সেই শব্দেই সম্ভবত লোকটা চোখ নামাল। এবং সাপটা যখন ছোবল মারার জন্যে মুখ নামাচ্ছে তখনই সে ট্রিগার টিপল। ফটাফট-ফটাফট গুলির আওয়াজে নির্জন দ্বীপটার নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল। আর সাপটা ছিটকে পড়ল একপাশে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল লোকটা। ওই মুখে এখনও রক্ত নেই। কিন্তু সাপটাকে দেখামাত্র যেভাবে সে ট্রিগার টিপেছে তাতে গুলি চালানোর ব্যাপারে খুব প্রফেশনাল বলে মনে হল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে সাপটাকে লাথি মারতেই সেটা চিত হয়ে গেল। মেশিনগানের নল দিয়ে সাপটাকে টেনে তুলে লোকটা ডান দিকে হাঁটতে লাগল। অর্জুন চটপট ওকে অনুসরণ করছে। যে ভঙ্গিতে বাঘ মারার পর শিকারি শিকারের সামনে দাঁড়িয়ে ফোটা তোলে প্রায় সেই ভঙ্গিতেই লোকটা সাপটাকে বুলিয়ে নিয়ে হাঁটছিল। ফলে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না তা দেখার মতো হুঁশ তার ছিল না। মিনিট-তিনেক হাঁটার পর লোকটাকে শিস দিতে শুনল। এবং তখনই ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, “কী হয়েছে? গুলি চালালে কেন?”

অর্জুন দেখল লোকটা নীচে নেমে যাচ্ছে। একেবারে শেষ আড়ালের আশ্রয় নিয়ে অর্জুন খাঁড়টাকে দেখতে পেল। খাঁড়ির ভেতর নামতে-নামতে লোকটা জবাব দিল, “খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। দ্যাখো এটাকে।” মেশিনগান নেড়ে সে মরা সাপ ছুঁড়ে ফেলল। লাফিয়ে সরিয়ে নিল প্রাণকামী নিজে। তারপর সাপটাকে দেখে বলল, “ইউ আর লাকি, বাডি।”

“ওখানে নিশ্চয়ই ওর জোড়া আছে।”

“তা থাকুক, কিন্তু বস্ খুব রেগে গিয়েছে ফ্যারিং-এর জন্যে। শব্দ করতে নিষেধ করেছিল।”

“আই উইল ফেস হিম। নাউ, ইট’স ইওর টার্ন। আমার ডিউটি আওয়ার্স শেষ।” লোকটা এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়জনকে মেশিনগান দিল। তারপর কোনও কথা না বলে খাঁড়ির ভেতর গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটি বুঁকে আর একবার সাপটাকে দেখল। মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তারপর হেলতে-দুলতে অর্জুনকে বাঁ দিকে রেখে মিলিয়ে গেল লোকটা জঙ্গলের ভেতরে। এখন কী করা যায়? খাঁড়ির মধ্যে ঢুকলে লুকোবার কোনও জায়গা থাকবে না। সাধ করে ধরা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। অর্জুন কাছাকাছি একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখে উঠে বসল তাতে। যতটা সম্ভব

উঁচুতে উঠে দুই ডালের জোড়ে শরীর রেখে দুপাশে পা ঝুলিয়ে দিল। ওপাশের একটা ডালকে টেনে এমনভাবে নীচে নামিয়ে আনল যাতে মাটি থেকে মুখ তুলে কেউ তাকে দেখতে না পায়। এবার সামনের পাতাগুলো সুবিধেমতো সরিয়ে নিল সে। খাঁড়ির মুখ এবং জল পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। এইভাবে বসে সারাদিন থাকলেও কোনও অসুবিধে হবে না।

এখন দুপুর বারোটা। ব্রাউনের উপদেশমতো বেশ কয়েকটা চিজের টুকরো নিয়ে এসেছিল পকেটে করে। তারই একটা মুখে দিল। সমুদ্র এখন সামনে। সাপটা কি সমুদ্রে যাচ্ছিল? গর্ত থেকে বেরোবার সময় যদি ফণা তুলত, তা হলে তার এ-জীবনে জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া ঘুচে যেত। সাপগুলো কেমন লেজের ওপর দাঁড়ায়! একটু সচকিতে হয়ে গাছটাকে দেখল। সাপ তো গাছেও ওঠে। দ্বিতীয়বার যে ভাগ্য তার ওপর সদয় হবে এমন আশা করা উচিত হয়।

পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ, অর্জুন দিক চিনতে পারল। তার সামনের সমুদ্রই উত্তর দিকের। ছোট-ছোট ঢেউ। এখান থেকে যদি কেউ দাঁড়টানা নৌকোয় সোজা যাওয়া শুরু করে তা হলে কি সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে মে মাসে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে আসে বেলা বারোটায়। মে মাসের সময় পাওয়া গেলে আগুপিছু মাসগুলোর হিসেব বের করে নেওয়া অসুবিধের কিছু নেই। লকারে পাওয়া লেখাটার সূত্র যাই থাক না কেন সেটা যে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করতে হবে তার প্রমাণ তো এখনও পাওয়া যায়নি। অমল সোম থাকলে মাথা নাড়তেন, “সত্যসন্ধানী না হয় ফুটপাতে খাঁচায় পাখি নিয়ে গিয়ে বসো। পৃথিবীতে যেন আর সমুদ্র নেই আর তাতে উত্তর দিক বলে কিছু নেই। তোমার যে জায়গাটা ইচ্ছে হল সেটাই সঠিক জায়গা? প্রমাণ নেবে না?”

মনে-মনে একটা প্রমাণ মাথা চাড়া দিচ্ছে। মার্শালসাহেব এসেছেন মুক্তো নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু এই গুণ্ডাবাহিনী এসেছে কী উদ্দেশ্য! অথচ এক দ্বীপে থেকেও সরাসরি সংঘর্ষে যাচ্ছে না। যেভাবে এরা নিজেদের গোপন করে রাখছে, তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, এদের কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্য রয়েছে, যার গুরুত্ব কম নয়। সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে লোকগুলো খামোকা এখানে এসে লুকিয়ে থাকবে কেন? অর্জুন যখন এইসব ভাবছিল, তখন খাঁড়ির ভেতর থেকে কয়েকজন লোক উত্তেজিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল। প্রথম লোকটাকে চিনতে পারল অর্জুন। ওকে সাপটা আর একটু হলেই ছোবল মারত। উত্তেজনা ওরই বেশি। দ্বিতীয়, তৃতীয় লোকটির সঙ্গেও অস্ত্র রয়েছে। চতুর্থ লোকটিকে দেখে চমকে উঠল সে। ব্ল্যাকপুলে প্রোফেসরের সঙ্গে যে শক্তিশালী লোকটিকে সে দেখেছিল, মোটেলে যাওয়ার আগে সুপার মার্কেট থেকে প্রোফেসরের সঙ্গে বের হতে যাকে দেখেছিল, সেই লোকটি গম্ভীরভাবে এদের অনুসরণ করছে। উত্তেজিত প্রহরী খানিক হেঁটে হাত বাড়িয়ে সাপটাকে

দেখাল। অর্জুন বুঝল গুলি ছোঁড়ার ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে। স্বাস্থ্যবান লোকটা দু'হাতে বুকে ভাঁজ করে সাপটাকে দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ে ওটার লেজ ধরে টেনে তুলে আবার খাঁড়ির ভেতরে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। বাকি দলটি এবার ওকে অনুসরণ করল। প্রহরীটিকে এখন বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

অর্জুনের মনে পড়ল প্রোফেসর হ্যাচের জিপে একটা ঝুড়ির মধ্যে সাপ ছিল। সাপ পোষার বাতিক আছে লোকটার। বালির গর্ত থেকে উঠে-আসা সাপ নিশ্চয়ই প্রোফেসরের পোষা নয়। প্রোফেসর তাঁর সঙ্গী নিয়ে এই দ্বীপে এসেছেন। এখন তো পরিষ্কার যে, হাইওয়ের ডিপার্টমেন্টাল শাপের সেকেন্ডহ্যান্ড কাউন্টারে পুরনো জুতো কেনার চেষ্ঠা থেকে পর পর ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে প্রোফেসরের উদ্দেশ্য কী! এত জায়গা থাকতে প্রোফেসর এই দ্বীপকে বেছে নিয়েছেন, তখন লকারের কাগজের লেখাটাকে এখন থেকেই প্রয়োগ করা উচিত। অন্তত প্রোফেসর হ্যাচের উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। তারপরেই মনে হল প্রোফেসর কী করে জানবেন লকারের কাগজের সাক্ষেতিক শব্দাবলীর কথা! জুতোর পকেটে কাগজ দেখে পোড়ো বাড়ির গাছের কোটর থেকে লকারের চাবি সংগ্রহ করে ব্যাক থেকে লকার খুলিয়ে অর্জুনরা সাক্ষেতিক তথ্য সংগ্রহ করেছে। এগুলোর কোনওটাই প্রোফেসর হ্যাচ পাননি, তা হলে তিনি এখানে কী করছেন। উদ্দেশ্য কি অন্য-কিছুর?

সারাটা দিন গাছের ওপর কাটল অর্জুনের। এর মধ্যে একবার মাত্র প্রহরী পালটেছে। বিকেল নাগাদ একটা দাঁড়টানা নৌকো ফিরে এল সমুদ্র থেকে। তাতে দু'জন দাঁড়ে রয়েছে, একজন মাঝখানে পায়ের ওপর পা তুলে বসে। সমুদ্র থেকে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে গেল সেটা। লোকটাকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না অর্জুনের। প্রোফেসর হ্যাচ। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। যদি কোনও উপায় থাকত তা হলে অর্জুন খাঁড়ির ভেতরে ঢুকত। কিন্তু সে সাহস পাচ্ছিল না। অমল সোম বলতেন, পরিণতি জেনেও দুঃসাহস দেখায় নির্বোধরা।

সন্ধে হওয়ার আগে গাছ থেকে নামবে না বলে ঠিক করেছিল অর্জুন। দিনের আলোয় অযথা ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। আকাশে এখন মেঘ জমছে। বৃষ্টি নামলে নিউমোনিয়া হবেই। কী করা যায় ঠাণ্ডার করতে পারছিল না সে। হঠাৎ একটা অতি চিংকারে সে প্রবলভাবে নাড়া খেল। শব্দটা আসছে খাঁড়ির ভেতর থেকে। কারও ওপর সাজঘাতিক অত্যাচার না করলে এই ধরনের আত্ননাদ করা সম্ভব নয়। বাইরের লোক তো কেউ ওখানে ঢোকেনি। অর্জুন আত্ননাদের মাথা-মুণ্ড বুঝতে পারছিল না। কয়েকবার হয়ে সেটা থেমে গেল। প্রোফেসর হ্যাচের ফেরার পর যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন তিনি কাউকে শাস্তি দিলেন। এই সময় প্রথম প্রহরী টলতে-টলতে বাইরে

বেরিয়ে এল। তার কপালের কিছুটা তখনও রক্তাক্ত। দাঁড়াতেও পারছে না সঠিকভাবে। আর ওর পেছনে সেই বলবান লোকটি।

ধমকের গলায় সে হুকুম করল, “যাও। ওকে চলে আসতে বলো। রাত দুটো পর্যন্ত তুমি আবার ডিউটি করবে। তোমার ভাগ্য ভাল যে, প্রোফেসর আজ অস্ত্রের ওপর ছেড়ে দিলেন।”

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল, “কিন্তু আমি গুলি না করলে সাপটাই আমাকে যে খতম করত।”

“করলে করত। তুমি নিজেকে অন্যভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করোনি কেন? সাপ প্রোফেসরের প্রিয় জীব। সাপ মেরে তুমি তাঁর কাছ থেকে বাহবা পেতে পারো না। চোন্দ পুরুষকে ধন্যবাদ দাও এখনও বেঁচে আছে বলে। গো। কুইক।” আহত প্রহরী হড়বড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে বলবান মানুষটি ফিরে গেল। আরও মিনিট-তিনেক পরে দ্বিতীয় প্রহরীটি খালি হাতে ফিরে এল। অর্জুন পাথরের মতো বসে ছিল গাছের ডালে। সাপকে মেরে ফেলার জন্যে প্রোফেসর হ্যাচ নিজের দলের লোককে এমন শাস্তি দিলেন? মানুষের প্রাণ ঠাঁর কাছে সাপের চেয়ে মূল্যহীন। এই মানুষ তো যা-ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু কুকুরটা কোথায়? এত কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে অথচ কুকুরটার ডাক একবারও কানে আসেনি।

অর্জুন ধীরে-ধীরে গাছ থেকে নামল। এখন অন্ধকার নেমে আসছে। যেভাবে এসেছিল ঠিক সেইভাবে সে ফিরে যাচ্ছিল। সমুদ্রের ধারের ঝোপগুলোকে আড়াল করে সে হাঁটছিল। হঠাৎ খাঁড়ির মুখে একটা তীব্র আলোড়ন হল। যেন জলের তলায় বিরাট কিছু নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর সোঁটা জলের আড়ালে থেকেই সমুদ্রের জলে মিলিয়ে গেল। প্রায় মিনিট-তিনেক বাদে অর্জুন প্রহরীটিকে দেখতে পেল। আবছা অন্ধকারে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। মেশিনগান কোলের ওপর রাখা। লোকটাকে খুবই কাহিল দেখাচ্ছিল। নিঃশব্দে ওর পেছন ঘুরে জায়গাটা পেরিয়ে এল অর্জুন। সারাদিন গাছের ওপর বসে থাকার জন্য এখন খুব কাহিল লাগছে। মাথার ভেতরটা বিম্বিম্ব করছে।

মার্শালসাহেবের অনুরোধে গতকাল জল-পুলিশ এ-তল্লাট চষে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও হাঙুর তো দূরের কথা, ভয়ঙ্কর কোনও জলজন্তুর সন্ধান পায়নি। মার্শালের তাই মন খারাপ। পুলিশ-সুপার তাকে অনুযোগ করে গেছেন এমন বেহিসেবী অভিযোগ করার জন্যে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথাটা পরিষ্কার হল অর্জুনের। চা খাওয়ার পর বিছানায় ফিরে এল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে পুরো ব্যাপারটা যখন ভাবতে চেষ্টা করছে, তখনই ব্রাউন এল, “কাল তো আমি ভাবলাম তোমার ডেড বডি খুঁজতে বের হতে হবে। আচ্ছা ব্যাপারটা কী বলো তো? রহস্যটা খুব দানা বেঁধেছে অথচ কুল পাচ্ছি না। তুমি যাদের

দেখতে গিয়েছিলে তারা কে ?”

“খুব নিষ্ঠুর লোক । সাপ মারলে মানুষকে শাস্তি দেয় ।”

“সে কী ! এত সাপের বন্ধু ! তোমাকে মেজর একবার তাঁবুতে ডাকছেন ।”

“কেন ?”

“আরে কাল সন্ধ্যে হয়ে গেলেও তুমি ফিরছ না দেখে সব কথা ওদের বলতে বাধ্য হলাম । হাজার হোক তোমার জন্যেই কয়েকদিন ভালমন্দ খেতে পাচ্ছি । তোমার কোনও খারাপ হোক এ তো আমি চাইতে পারি না । ধর্মে সইবে না ।” ব্রাউন বলল ।

“মিস্টার মার্শালকেও আপনি পরশু রাতের কথা বলেছেন ?”

“কী করব ! আমি যখন মেজরকে বলছিলাম তখন মার্শাল সেখানে ছিল তো । তা ছাড়া ওরই তো আগে শোনা উচিত । আমরা তো ওরই অতিথি । লোকটার মন খুব খারাপ । পুলিশ হাঙরটাকে কোথাও খুঁজে পেল না । এমন ট্রেইন্ড হাঙর আছে বলে কখনও শুনিনি ।”

ব্রাউনের কথা শেষ হওয়া মাত্র অর্জুন উঠে বসল । যে চিন্তাটা মাথায় পাক খাচ্ছিল অথচ স্পষ্ট হচ্ছিল না, ব্রাউন তা নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছে । ট্রেইন্ড হাঙর । যে লোক সাপ পুষতে পারে সে তো হাঙরকেও পোষ মানাতে পারে । কাল সন্ধ্যাবেলায় জলের তলায় তোলপাড় করে খাঁড়ি থেকে হাঙরটা বেরিয়ে যায়নি তো । আর খাঁড়ির ভেতরে লুকিয়েছিল বলেই জলপুলিশ সমুদ্রে ওকে খুঁজে পায়নি । উত্তেজিত হয়ে অর্জুন হাত বাড়িয়ে দিল, “ধ্যাক্ষ ইউ, মিস্টার ব্রাউন । আপনি অনেক করলেন !”

হতভম্ব ব্রাউন হাত স্পর্শ করল, “আমি আবার কী করলাম ?”

জবাব না দিয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল । মেজর আর মার্শাল ওঁদের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন । মেজর অর্জুনকে দেখে বললেন, “গতকাল তুমি খুব টায়ার্ড ছিলে বলে আর প্রসঙ্গ তুলিনি । কিন্তু অর্জুন, আমাকে না জানিয়ে তুমি অ্যাডভেঞ্চার করছ এটা ওই আরশোলার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে হল আমায় ?”

“অ্যাডভেঞ্চার নয়, বিপদ আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এখানে এসেছে । আপনাদের জানানোর আগে নিজে নিঃসন্দেহ হতে চাইছিলাম ।” অর্জুন বলল ।

“বিপদ ? এখানে আবার কিসের বিপদ ?” মেজর খিচিয়ে উঠলেন ।

“মিস্টার মার্শাল, এখানে আপনি কতদিন আছেন ?”

“বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল ।”

“দ্বীপের ওপাশে যারা আছে তাদের সম্পর্কে আপনি নিরাসক্ত কেন ?”

“আমার কী প্রয়োজন ! আমি আমার কাজ করছি । ওরা সেই কাজে যতক্ষণ নাক না গলাচ্ছে, ততক্ষণ ওদের নিয়ে ভাবার কী আছে ?”

“আপনি প্রোফেসর হ্যাচ নামের কাউকে চেনেন ?”

মার্শালের কপালে একটু ভাঁজ ফুটল। তারপর মাথা নেড়ে হাসলেন, “না। অবশ্য পুরো নাম বললে সুবিধে হত। হ্যাচ নামে দু’জনকে চিনি। একজনের অভিযাত্রী হবার খুব শখ ছিল। সেটা অনেকদিন আগের কথা। আর-এক হ্যাচ বিমা কোম্পানির দালালি করে। কেন বলো তো ?”

“না। কিছু নয়। আমি প্রোফেসর হ্যাচ নামের কাউকে খুঁজছি যিনি সাপ ভালোবাসেন, আবার হাঙরও ভালোবাসেন বলে মনে হচ্ছে।” অর্জুন যেন নিজের মনে বলল।

মার্শাল কাঁধ নাচালেন।

মেজর বললেন, “মার্শাল এখান থেকে ফিরে যাবে ঠিক করেছে। ওর সমস্ত কাজ ভঙুল হয়ে গেছে। তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমরা আজই এখান থেকে ফিরব।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না। মার্শালসাহেব যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি আরও দিন-তিনেক এখানে থাকতে চাই।”

অর্জুনের কথা শুনে মার্শালের চোখ ছোট হল, “তোমার উদ্দেশ্যটা কী ? কেন এখানে থাকতে চাইছ ?”

অর্জুন হাসল, “একজন সত্যসন্ধানী হিসেবে আমি সত্যের স্বরূপ দেখতে চাই।”

মার্শাল জিজ্ঞেস করলেন, “তার মানে ? এখানে অসত্য কোথায় ? আমার এতদিনের পরিশ্রম একটা হাঙর নষ্ট করে দিল। আমাকে বাধ্য করছে গবেষণা গুটিয়ে নিতে। জল-পুলিশকে জানিয়ে বেইজ্জত হলাম। এসব কি মিথ্যে ?”

“না। আমি আপনার ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি না।”

“তা হলে ?”

“রহস্য নিশ্চয়ই আছে। আর সেটা আগে থেকে প্রকাশ করতে বলবেন না দয়া করে।”

এইসময় পেছনে দাঁড়ানো ব্রাউন বলে উঠল, “রহস্যের গন্ধ না পেলে কে আসত এখানে ?”

“চোপ !” মেজর এবার বিরাট ধমক দিলেন, “তোমার জন্যেই ছেলোটা বিপদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। দ্বীপের ওপাশে হনুমানের মতো গাছের ওপর লেজ গুটিয়ে বসতে বলেছিল কে ? গুলিটা গাছে না বিঁধে মাথায় ঢুকলে খুশি হতাম আমি।”

“কী, আমাকে হনুমান বলা হচ্ছে ? মুখে যা আসছে তাই বলা ? আমি হনুমান হলেও তুমিও তো তাই। যতসব বদমাশদের সঙ্গে সময় কাটাতে হচ্ছে আমাকে,” ব্রাউন বলল।

অর্জুন মার্শালকে বলল, “তিনদিন থাকতে দিন আমাদের। তিনদিন বাদে

না-হয় ফিরে যাবেন। এই দ্বীপের ও প্রান্তে প্রোফেসর হ্যাচ কেন ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন, সেই সত্যটি আমায় উদ্ঘাটিত করতে হবে। একটা লোক দলবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়ির মধ্যে খামোখা থাকতে পারে না। তার ওপর লোকটা অত্যন্ত নির্ভুর প্রকৃতির।”

মেজর বললেন, “লেটস গো। চলো, আমরা দলবঁধে গিয়ে লোকটাকে ওর ধান্দার কথা জিজ্ঞেস করি। মার্শালের মন ভেঙে গেছে। এখন আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না।”

মার্শাল মাথা নাড়লেন, “না। ওদিকে যাওয়া চলবে না। তোমাদের কথাটা বলিনি। কিছুদিন আগে সরকারি দফতর থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল, একজন অধ্যাপক দ্বীপের উলটো দিকে সমুদ্রের জল নিয়ে গবেষণা করবেন। তিনি সেটা নির্বিশেষে করতে চান। আমি বা আমার কেউ তার এলাকায় যেন প্রবেশ না করি, কারণ তিনি সেটা পছন্দ করছেন না। আর আমার গবেষণার কাজে তিনি ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। এই অবস্থায় আমি ওদিকে যেতে পারি না।”

শেষ পর্যন্ত মার্শাল স্থির করলেন, অর্জুনের কথামতো আরও তিনদিন এখানে কাটিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এখন ঘড়িতে ন’টা পনেরো। সে মার্শালকে জিজ্ঞেস করল, “আপনার একটা দাঁড়-টানা নৌকো আমি ধার নিতে পারি?”

মার্শাল বললেন, “স্বচ্ছন্দে। কিন্তু হাঙরটার কথা ভুলে যেও না।”

দশটা নাগাদ অর্জুন রওনা হল। ব্রাউন দু’হাত নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল। তার জীবনের দাম আছে। যেখানে হাঙরটা হাঁ করে আছে সেখানে যেচে সে তার মুখের ভেতর ঢুকতে চায় না। আর ব্রাউনের বক্তব্যই যেন মেজরকে উদ্বুদ্ধ করল অর্জুনের সঙ্গী হতে। নৌকোটা মাঝারি। মেজর আর অর্জুন দু’পাশে বসে দাঁড় টানছিল। কাজটা অর্জুন এই প্রথম করছে না। জলপাইগুড়ির করলা নদীতেও সে এর আগে নৌকো বেয়েছে। দিনবাজারে পুলের নীচ থেকে কিড সাহেবের ঘাট পর্যন্ত। কিন্তু এটা সমুদ্র এবং তলায় একটা দানব হাঙর রয়েছে। বুকের ভেতর শিরশিরে ভয় মুখ গুঁজেই ছিল। ঠোঁটে চুরুট চেপে দু’হাতে দাঁড় টানছিলেন মেজর। সেই অবস্থায় বললেন, “চেহারা একরকম হতেই পারে, কিন্তু অভ্যাস, সাহস ওই ছুঁচোটা পাবে কোথেকে? নৌকো চালানো আমার কাছে কিছু নয়। একবার ব্ল্যাক সি’তে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা নৌকো বেয়েছি। কিন্তু এবার বলো তো হে, আমরা যাচ্ছি কোথায়?”

“আপনি একদম ভুলে গিয়েছেন। উত্তর দিকে একঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড়-টানা নৌকোর। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর! মে মাসে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে আসবে সাড়ে বারোটায়।”

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “ওই প্রোফেসর

হ্যাচটা কি আমাদের বোন্টন থেকে ফলো করে আসছিল ?”

“ব্ল্যাকপুলের পরে আর করেননি ?”

“কিন্তু এটাই যে সেই সমুদ্র তা কী করে জানলে ?”

“নিশ্চিত নই । তবে লক্ষণ দেখে অনুমান হচ্ছে মাত্র ।”

“আমরা কি উত্তর দিকে যাচ্ছি ।”

“হ্যাঁ । এবং এখনও কোনও হাঙর দেখিনি ।”

“ইয়ে, মার্শালিকে কি লকারের লেখাটার কথা বলব ? ও আমাদের হোস্ট ।”

“দাঁড়ান । সময় হোক । নিশ্চয়ই বলা যাবে । আপনি ডান দিকে ঝুঁকে বসবেন না । হ্যাঁ, ঠিক আছে । আজকের আবহাওয়াটা কিন্তু চমৎকার,” অর্জুন বলল ।

মাঝখানে সরে এসে মেজর বললেন, “এখন কিন্তু মে মাস নয় ।”

“তার জন্যে যোগ-বিয়োগের অঙ্কটা করতে হল । এবার বেশ বড়-বড় ঢেউ আসছে ।”

“ঢেউয়ের বিরুদ্ধে শক্তি দেখাতে নেই । জাস্ট নৌকোটাকে সোজা রাখতে চেষ্টা করো ।”

প্রতি মুহূর্তে অর্জুনের মনে হচ্ছিল, ডুবে যাবে । একদম না ভেবেচিন্তে আসা হয়েছে । নৌকোটা জলের ওপর উঠছে আবার ঢেউয়ের টানে নেমে যাচ্ছে । সমস্ত শরীরে শিরশিরে অনুভূতি । মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর মনে হল, সমুদ্র আবার শান্ত হল । কিন্তু ওই পাঁচ মিনিট যেন কাটতেই চাইছিল না ।

ঘড়িতে যখন নৌকো বাওয়ার সময় এক ঘণ্টা পার হল, তখন অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল । সূর্য মাথার ওপরে মোটেই নেই । ওপাশের দ্বীপের গাছপালা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । ওপাশে সমুদ্রের ওপরে যেন আকাশ খুব কাছাকাছি নেমে এসেছে । না । আরও যেতে হবে । এইবার মনে ভয় এল । হাঙরটা সামান্য ঝুলেই দেখতে হবে না । হাঙরটা কি ওর স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করবে ? জলের ওপরের কাউকেই তো আজ পর্যন্ত বিরক্ত করেনি । আর এমন হতে পারে, দানবটা এখন খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছে । ওকে ডিঙিয়ে যখন হ্যাচের নৌকো যাওয়া-আসা করে নির্বিঘ্নে, তখন নৌকের ওপরে রাগ নেই বলেই ধরে নেওয়া যায় । হঠাৎ মেজর বললেন, “শাবাস বাঙালি !”

অবাক হয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তার মানে ?”

“এই বয়সের এক বাঙালি তরুণ ইংল্যান্ডের সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে, ভাবা যায় ?”

“আপনি তো বাঙালি, কত অ্যাডভেঞ্চার করেছেন জীবনে !”

“হ্যাঁ । কিন্তু জানো, দেশের মানুষ আজ পর্যন্ত কোনও স্বীকৃতি দিল না । বড় দুঃখ হয় ।”

অর্জুন ঘড়ি দেখল । বারোটো বাজতে পনেরো । এখন দ্বীপটাকে অস্পষ্ট

দেখাচ্ছে। এত বড় সমুদ্রে আর কেউ নেই। সময় মিলিয়ে ও শেষ পর্যন্ত মেজরকে নৌকো থামাতে বলল। এখন মাথার ওপরে সূর্য। মাটি যতদূরে, ওপাশের আকাশ ঠিক ততদূরে। অবশ্য এতেই আনন্দিত হবার কিছু নেই। পৃথিবীর যে-কোনও সমুদ্রে গিয়ে এইরকম জায়গায় পৌঁছনো যায়। সে মেজরকে বলল, “আপনার তো সমুদ্রের অভিজ্ঞতা আছে। এই জায়গাটা দ্বিতীয়বার আসতে পারবেন?”

“এই নৌকো বেয়ে? কক্ষনো না।” মেজর ঘনঘন মাথা নাড়লেন।

“না, নৌকো বেয়ে নয়। ধরুন, লঞ্চই এলাম। জায়গাটা চিনতে পারবেন তখন?”

মেজর চারপাশে মুখ ফেরালেন। বিড়বিড় করে কী সব হিসেব করলেন। তারপর বললেন, “পারব। কোনও গোলমাল নেই।”

“তা হলে চলুন ফিরে যাই।”

“সে কী! খুঁজবে না?”

“ডুবুরির পোশাক আনিনি। আর সেটা করায় বেশ ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যেত।”

“তা হলে ফালতু আনলে কেন?”

“জায়গাটাকে আবিষ্কার করতে। আবিষ্কার করে চিনে রাখতে প্রোফেসর হ্যাচ শুধু এই জায়গাটাকে খুঁজে বের করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। এখানে আর বেশি সময় আমাদের থাকা উচিত হবে না। যদি কেউ দ্বীপ থেকে দূরবীনে আমাদের লক্ষ্য করে, তা হলে কিছু একটা আন্দাজ করতে পারবে।”

অর্জুনরা ফেরার সময় আবার ডেউয়ের পাল্লায় পড়ল। দু’জনেই ভিজে একশা হয়ে গেল। কিন্তু সেই জলদানবটা তাদের নৌকো উলটে দিল না। ওরা স্বচ্ছন্দেই তীরে ফিরে আসতে পারল। ব্রাউন আর মার্শাল দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওরা নৌকো থেকে নামতেই মার্শাল জিজ্ঞেস করল, “তোমাদের মতলব কী ছিল বলো তো? এত কষ্ট করে অত দূরে গেলে আর ফিরে এলে, যাওয়ার দরকারটা কী ছিল?”

ব্রাউন হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল, “কেমন শকুনভেজা ভিজছে দ্যাখো।”

দাড়ি থেকে জল মুছছিলেন মেজর। থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ভেজা? কাকভেজা বলে একটা কথা আছে জানতাম, শকুনভেজা জীবনে শুনিনি। দাঁড়াও, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।” মেজরের কথা শেষ হওয়া মাত্র ব্রাউন একেবারে পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করল। অর্জুন মেজরকে বাধা দিল, “ছেড়ে দিন তো। আপনার ওষুধের স্টকে এর কোনও প্রতিবিধান আছে?” নিজের হাতের চেটো দেখাল অর্জুন। সেখানে বড়-বড় ফোসকা মাথাচাড়া দিয়েছে সবে। মেজর হাসলেন, “আছে। একটু জ্বালাবে। নভিসদের হয়।”

“আপনার হাতে হয়নি ?”

“দ্যাখো ।” মেজর বীরত্বের ভঙ্গিতে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে চমকে উঠলেন, “সে কী !” তাঁর হাতেও ছোট-ছোট ফোসকা । কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেজর বললেন, “আসলে দাঁড়টাই খারাপ ছিল । তাঁবুতে চলো, ওষুধ লাগাই ।”

মেজরকে অনুসরণ করার সময় অর্জুন এক চোখে মার্শালকে দেখল । কোনও মানুষের অমন সন্দেহজনক দৃষ্টি এর আগে সে কখনও দ্যাখেনি ।

সারাটা দিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলেন মেজর আর পানীয় খেলেন । তাঁর গায়ে-হাতে নাকি বেদম ব্যথা । ব্যথার কারণেই ওই পানীয় দরকার । অনভ্যাসে অর্জুনেরও শরীরে ব্যথা হয়েছে । দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর সে ওদিকের বালুতটেই ঘুরে বেড়াল । এখন প্রহরীরা আর তাকে বাধা দিচ্ছে না । কাজ বন্ধ করে ফিরে যাওয়ার লুকুম হওয়ায় তাদেরও কর্তব্য আর তেমন কঠোর নয় । ওপাশে, বন্দরের দিকে সমুদ্রে সারাদিন ছোট-ছোট নৌকো ভাসল । গরমের সময় ব্রিটিশরা নৌকো চড়তে খুব ভালবাসে । হাঙরটা জলের তলায় রয়েছে । জল-পুলিশ যাই বলুক, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করা যায় না । অথচ জলবিহার করছে যারা, তারা কোনও দুর্ঘটনায় পড়ছে না । হোক ওটা বন্দরসংলগ্ন সমুদ্র, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে তো হাঙরের সামনে কোনও বাধা ছিল না । এইটেই অর্জুনকে খুব ভাবাচ্ছিল । যে সাপকে পোষ মানাতে পারে সে কি হাঙরকেও পারে ? পোষমানা হাঙরটা কি তাই খাঁড়ির মধ্যে থাকে ? অর্জুনের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল । এরকম ঘটনা কে কবে শুনেছে ?

সন্ধের মুখে মার্শাল এলেন হস্তদণ্ড হয়ে । অর্জুন তখন সমুদ্রের ধারে চুপচাপ বসে ছিল । এসে বললেন, “ভেবেছটা কী ? অ্যাঁ ?”

অর্জুন লোকটার পরিবর্তন দেখে একটু অবাক হল । মার্শাল বললেন, “এইমাত্র আমি আমার বন্ধুর কাছে শুনতে পেলাম, কেন তোমরা সকালে নৌকায় বেরিয়েছিলে । মেজর আমার কাছে এসব চেপে গিয়েছিল । নেহাত চেপে ধরতেই সব বলে ফেলল । তোমরা আমার কাছে বেড়াতে আসোনি । তোমাদের মতলব ছিল অন্যরকম ।”

মেজরের ওপর প্রচণ্ড রেগে গেল অর্জুন । পানীয় মানুষের সর্বনাশ করে এটাও আর-একটা প্রমাণ । ব্যাপারটা তিনি ব্রাউনকেও বলে বসতে পারেন । মার্শাল তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন, “বুঝতেই পারছ আমি খুব অপমানিত বোধ করছি । এই কারণেই তুমি আরও তিনদিন থেকে যেতে চাইছিলে ? একা-একাই গুপ্তধন বের করতে পারবে ? খুব সাহস তোমার, না ?”

অর্জুন হাসবার চেষ্টা করল, “দেখুন, আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন । মেজর আপনাকে যে কথাগুলো বলেছেন, তা নেশার ঘোরে বলেছেন । গুপ্তধনের একটা খবর আমরা পেয়েছি কিন্তু কোন সমুদ্রে সেই গুপ্তধন লুকোনো রয়েছে, তা জানি না ।”

“তুমি খুব চতুর । তুমি ইন্ডিয়ায় থাকো । যদি কিছু লুকোতে হয় সেটা ইন্ডিয়ায় না লুকিয়ে ইংল্যান্ডে লুকোতে আসবে । যিনি কাণ্ডটা করেছেন তিনি এই অঞ্চলের লোক । একসময় আমরা কত অভিযানে বেরিয়েছি । এই সমুদ্র ছাড়া অন্য কোথাও সে লুকোতে যাবে না ।”

অর্জুনের মাথার ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেল যেন । সে হাসল, “ওঃ, খুব ভাল হল । আপনি যখন ওঁকে চিনতেন তখন খুব সুবিধে হবে যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি ।”

একটু খুশি হলেন যেন মার্শাল, “চিনতাম মানে ? ভাল করে চিনতাম । হ্যাঁ, আমিও শুনেছিলাম, সে কিছু দামি জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখেছে । রাখতেই পারে । আমি কৌতূহলী হইনি । তা কোথায় রেখেছে, কী রেখেছে, বলো তো ?”

“মেজর আপনাকে বলেননি ?”

“আরে কী একটা কথা কবিতার মতো বলছিল । যার কোনও মানেই হয় না । নেশার ঘোরে ও কবিতাটাই সম্ভবত গুলিয়ে ফেলেছে । চিরকালই একরকম । তবে তুমি যদি আমাকে বলতে তাহলে সাহায্য করতে পারতাম । এদিকের সমুদ্র তো আমার জানা ।” মার্শাল হাসলেন ।

অর্জুন দ্বিধায় পড়ল । এখন এই ভদ্রলোককে না জানিয়ে উপায় নেই । সূত্র অনুযায়ী সন্ধান করতে গেলে ওঁকে জানিয়েই করতে হবে । অন্য কোনও একটা ভান দেখিয়ে করা যেত যদি মেজর নেশার ঘোরে ফাঁস না করে দিতেন । অতএব সে জুতো-রহস্য থেকে শুরু করল । কীভাবে বোন্টনে আসার পথে হাইওয়ের ওপর ডিপার্টমেন্টাল দোকানে জুতোটাকে পেয়েছিল । জুতোর লুকনো গর্ত থেকে কাগজ আবিষ্কার করেছিল । কাগজের সূত্র অনুসরণ করে একটি প্রায় পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি থেকে লকারের চাবি উদ্ধার করেছিল এবং সব শেষে লকার থেকে জ্যাকের নির্দেশসূচক কাগজ নিয়ে এখানে এসেছে তার বিশদ জানাল । শুধু কাগজের নির্দেশের কথাগুলো একটু গোলমাল করে দিল । সমুদ্র । উত্তর দিকে একঘণ্টা যাত্রা । যেখানে মাটি যতদূর আকাশ ততদূর । নভেম্বরে সূর্য মাথার ঠিক ওপরে আসে বেলা বারোটায় । ডুবুরি । সুড়ঙ্গটা তার তলায় ।

যে মাসের বদলে নভেম্বর, সাড়ে বারোটার বদলে বারোটাই । নোয়ার আমল থেকে না-নড়া জাহাজ বাঁধা পাথরটার কথা সে উল্লেখই করল না । অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে শুনছিলেন মার্শাল । অর্জুন শেষ করতে তার মুখের আলো নিভে এল, “ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না হে ।”

“আমি বুঝতে পারছি না । এখানে ডুবুরি আছে ?”

“তা থাকবে না ! বন্দরে গণ্ডায়-গণ্ডায় ডুবুরি আছে । কিন্তু তারা কী করবে ?”

“সেটা একটা কথা ।”

“তোমরা আজ সকালে নৌকো নিয়ে সমুদ্রের ওখানে গিয়ে কী করছিলে ?”

“খুঁজছিলাম । জায়গাটা ঠিক কোথায় হবে...” অর্জুন কথা শেষ করতে পারল না । মার্শাল হেসে গড়িয়ে পড়লেন, “জলের ওপরে ভেসে তুমি নীচের ব্যাপার বুঝবে ! আরে এই সমুদ্রের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি খুঁজে মরেছি আমি ।” বলেই থেমে গেলেন ।

“প্রতিটি ইঞ্চি মাটিতে আপনি কী খুঁজেছেন ?” অর্জুন চটপট প্রশ্ন করল ।

“মানে, যেখানে-সেখানে তো মুক্তোর চাষ হয় না । তার জন্যে ভাল জায়গা চাই, যেখানে বিনুকগুলো ভাল থাকবে । সেইজন্যেই জায়গা খুঁজতে হয়েছিল আমাকে । ঠিক আছে, মাথার মধ্যে নিয়ে নিলাম সূত্রটা । রাতভর ভেবে কাল সকালে তোমাকে বলব ।” আচমকা আলোচনায় যবনিকা টেনে দিয়ে মার্শালসাহেব তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

পরিবর্তনটা লক্ষ করে অর্জুনের মনে হল, মানুষের মনের চেহারাটা বোঝার মতো যন্ত্র যদি আবিষ্কার করা যেত তা হলে পৃথিবীর অনেক সমস্যার যেমন সমাধান হত, তেমনি সেটা বাড়তও । আর তখনই ব্রাউন ঢুকল । সটান অর্জুনের কাছে এসে নিচু গলায় বলল, “তুমি একটা হাঁদারাম । মার্শালকে সব কথা বলে দিলে ? এখন বুঝবে মজা । এমন কাজ কেউ কখনও করে ? আর ওই ছমদো গোরিলাটার অত পানীয় খাওয়া কেন, যদি নেশার ঝোঁকে পেট থেকে কথা চালান করে দেয় ?”

“আপনি কী ব্যাপারে কথা বলছেন ?” অর্জুন নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করল ।

“আঃ । ওই গুপ্তধনের ব্যাপারটা !” ব্রাউন হাসল, “আমার এখন মনে হচ্ছে মার্শালের ওসব মুক্তো-ফুক্তো ফালতু ব্যাপার । গুপ্তধনের সন্ধানেই এই দ্বীপে বাসা বেঁধেছে । আর শুধু মার্শালই নয়, ওই ওপাশে হ্যাচ না ফ্যাচ, কী নাম যেন বললেন, সেও দলবল নিয়ে একই ধান্দায় এসেছে । উঃ, রহস্যের গন্ধ গেলে আমার পাকস্থলী পর্যন্ত চনমনে হয়ে ওঠে ।”

“অতসব কথা আপনি জানলেন কী করে ?”

“তাঁবুর বাইরে থেকে তোমার আর মার্শালের কথা কান পেতে শুনে ফেললাম । তুমি বলতে পারো অন্যের কথা না বলে শোনা অন্যায়, কিন্তু না শুনলে তো তোমাকে সাবধান করতে পারতাম না । সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানো, ওই হাঁদারাম গোরিলাটা গুপ্তধন খুঁজতে এসে নাক ডাকাচ্ছে । কথাগুলো বলে ব্রাউন ফিসফিস করে বলল, “আমি বলছিলাম আজ রাতেই বেরিয়ে পড়া ভাল ।”

“কোথায় ?”

“গুপ্তধন খুঁজতে ।”

“কীভাবে যাবেন ! এখন তো মাথার ওপরে সূর্য নেই ।”

অর্জুন আর কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। পুরো ব্যাপারটা যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে মার্শাল জেনেছেন, এবার ব্রাউন জানল। এতগুলো লোভী লোককে সামলে গুপ্তধন খোঁজা সহজ কাজ নয়। সে অন্ধকারে পায়চারি করতে-করতে এগিয়ে যেতেই একটি শরীর দেখতে পেল। লোকটা বেশ হস্তদস্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মার্শালকে চিনতে অসুবিধা হল না। অর্জুন সন্তর্পণে ওকে অনুসরণ করল। তারপরই দেখল, মার্শাল একা নন। ওঁর সঙ্গে একজন প্রহরীও রয়েছে। দুজনে একটা স্টিমবোটে উঠে ইঞ্জিন চালু করলেন। মুহূর্তেই বোটটা ঘুরে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলল। যে মার্শাল নিজেই বলেছেন, সমুদ্রে এখন রাতে চলাফেরা ঠিক নয়, সেই মার্শাল চললেন কোন উদ্দেশ্যে! অর্জুন পেছনে নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে দেখল, ব্রাউন এসে দাঁড়িয়েছে। ব্রাউন বলল, “আজ রাতে আর ঘুম হবে না দেখছি।”

“কেন?”

“মার্শাল বন্দরে কেন যাচ্ছে বুঝতে পারছ না? ডুবুরি আনতে।”

অর্জুন হেসে ফেলল। সে যে সূত্র দিয়েছে তাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও জায়গা বুঝতে পারবে না। অতএব ডুবুরি আনিতে মার্শাল কিছুই করতে পারবেন না। ঘণ্টা-তিনেক বাদে মার্শাল ফিরে এলেন। সঙ্গে একটা কাঠের বাস্ক। তৃতীয় কোনও ব্যক্তি নেই।

মার্শালের চেহারা যেন আচমকা পালটে গিয়েছে। বেশ হাসিখুশি, সেই চিন্তিত ভঙ্গিগুলো আর নেই। মেজরের সঙ্গে তো বটেই, অর্জুনকে ডেকে-ডেকে খোশগল্প করেছেন। তবে ব্রাউন সম্পর্কে উনি দূরত্ব রেখেই চলছেন। সম্ভবত, মেজর যেহেতু ব্রাউনকে পছন্দ করেন না, মার্শালও মেনে নিচ্ছেন না। এমনকী, আগামীকাল যে অভিযান হবে তার আলোচনাও এমনভাবে হল যখন ব্রাউন ধারে-কাছে নেই। আলোচনা শেষ হলে প্রশ্ন উঠল ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কি না। মেজর মাথা নেড়েছিলেন, “সঙ্গী নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কি না। মেজর মাথা নেড়েছিলেন, “সঙ্গী হয়ে গেলেই ও ভাগ চাইতে পারে। একটা পথের উটকো লোককে খামোখা ভাগ দিতে যাব কেন?” মেজর এমনভাবে কথা বললেন যেন গুপ্তধন পেয়েই গেছেন। মার্শাল ইতিমধ্যে মেজরের কাছে বিশদ জেনেছেন। যদিও মেজর অর্জুনকে আলাদা বলেছেন ব্যাক্সের লকারে পাওয়া কাগজের লেখার সবটুকু তাঁর মনে নেই বলে তিনি মার্শাল অনেকবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও এগিয়ে যাওয়ার পথটা বলতে পারেননি পুরো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ব্রাউনকে বলা হবে তারা যাচ্ছে সেই হাওরটাকে মারতে, যে মার্শালের মুক্তো নিয়ে গবেষণা বানচাল করে দিচ্ছে। এই ঝুঁকির কাজে যদি সে সঙ্গী হতে চায় তো আসতে পারে।

রাতে নিজের তাঁবুতে শুয়ে অর্জুন ব্রাউনের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল।

ইতিমধ্যে সে বুঝে গিয়েছে লোকটা মোটেই ধূর্ত নয়, বোকা-চালাক বলা যেতে পারে। এবং বাউগুলে। কিন্তু মার্শালকে সে বুঝতে পারছে না। মেজরের মুখে ওই গোপন খবরটা শোনার পর লোকটা হাবভাবই পালটে গেল? মার্শাল বলেছেন যে, হাঙরটাকে জন্ম করতে এক কাঠের বাস্প অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন যার ফলে এগিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। তাই যদি হয়, মার্শাল এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন কেন? তাঁর মুক্তো ধ্বংস করছে হাঙরটা অথচ তিনি অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রতিরোধ করেননি কেন? একই দ্বীপের ওপাশে কিছু লোক মতলব নিয়ে সমুদ্রে ঘুরছে আর এপাশে মার্শাল মুক্তোর চাষ ছেড়ে নড়ছেন না। এ-দুটোর মধ্যে যোগসূত্র আছে কি?

রাত তিনটের সময় ঘুম ভাঙল অর্জুনের। ব্রাউন এখন নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। সে জামাকাপড় পরে বাইরে বের হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মেজরদের তাঁবু ঘুমন্ত। এখনও সমুদ্রের ওপর অন্ধকার স্থির। মাথার ভেতরে টিপটিপে যন্ত্রণা হচ্ছে। অস্বস্তি বেড়ে গেলে এমন হয়। এই সময় একটি লোককে সমুদ্র থেকে উঠে আসতে দেখল। ওদিকটা উঁচু থাকার জন্য চট করে দেখা যায় না। লোকটা কাছে এলে সে মার্শালকে চিনতে পারল। পেরে সরাসরি বলল, “আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে!”

“আরে তুমি? ঘুম ভেঙে গেল! একটু আগে দেখে এলাম ঘুমাচ্ছ!”

“আমাকে ঘুমন্ত দেখতে আসার কি কোনও কারণ ছিল?”

“তোমাকে নয় হে! তাঁবুতে তো আর একজন আছে। আসলে আমি আমার সাবমেরিনে অভিযানের মালপত্র তুলে দিলাম। ব্রাউন সেটা দেখুক। আমি চাইনি।”

অন্ধকারে লোকটার অভিব্যক্তি ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “সাবমেরিন থেকে জলের তলায় হাঙরটার সঙ্গে কীভাবে লড়াই করবেন?”

“সেইটেই সমস্যা। আমারটা যাকে বলে ফাইটার সাবমেরিন নয়। ভেবেছি ওটাকে দেখলেই ওপরে উঠে আসব চটপট। তাড়া করে যেই জলের ওপরে মাথা তুলবে তখনই গ্রেনেড ছুঁড়ব। আমার সাবমেরিনের ছাদটা খুব দ্রুত খোলা যায়।”

“গুলি চালানো যাবে না ভেতর থেকে?”

“কী করে যাবে? বললাম না, ওটা ফাইটার নয়।”

“যদি হাঙরটা ওপরে না উঠে আসে?”

“হুঁ। সেটাই সমস্যা। যাক, সমস্যা নিয়ে আগেই মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। আচ্ছা, কোড ল্যান্সুয়েজটা ঠিক কী ছিল বলো তো?” মার্শাল আচমকা প্রশ্ন করলেন।

“কেন?” অর্জুনের গলার স্বর পালটে গেল।

“না, মানে, শুনলাম জুতোর গর্ত থেকে কাগজটা বের করেছিলে তুমিই। যা কিছু পরের ঘটনা তা তোমার জন্যেই ঘটেছে। আর আমি তোমাদের এই দ্বীপে আশ্রয় শুধু দিচ্ছি না, অভিযানেও সাহায্য করছি। তা হলে দাঁড়াল, তুমি আর আমি মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছি। অতএব আমাদের মধ্যে একা আন্তরস্ট্যাপ্তিং থাকা ভাল।”

“কিছু মনে করবেন না, আমি তো আপনাকে ভাল করে জানি না।”

“অ।”

“তা ছাড়া শুধু মুক্তো নিয়ে আপনি এখানে গবেষণা করছেন এটাও অবিশ্বাস্য।”

“কেন?”

“এই সমুদ্রের জল ও ব্যাপারে আপনাকে খুব বেশি সাহায্য করবে না।”

হঠাৎ মার্শালের গলায় বরফ মিশল, “তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছ?”

“কাদের সঙ্গে?”

“এই দ্বীপের ওপাশে যারা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে।”

“না। কিন্তু আপনারা একই দ্বীপে এইরকম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আছেন কী করে? আপনারা দু’দলই কি সমুদ্রের তলায় কিছু খুঁজছেন?”

মার্শাল হাসলেন, “বয়সের তুলনায় তুমি দেখছি বেশি বুদ্ধি ধরো। তবে কথা হল কোনও কিছুরই বেশি ভাল নয়। মেজরকে কথা দিয়েছি যখন তখন কাল অভিযানে যাব। তবে সেটা শুধু কালকের জন্যেই। তোমরা বিকেলেই ফিরে যাও।” মার্শাল কথাগুলো বলে চলে যাচ্ছিলেন, অর্জুন তাকে পিছু ডাকল, “মিস্টার মার্শাল, কাল নয়, আমরা আজই অভিযানে যাচ্ছি। ভোর হতে যখন বাকি নেই তখন আপনারদের মতে তো ‘আজ’ শুরু হয়ে গিয়েছে।”

মার্শাল কোনও জবাব না দিয়ে নিজেদের তাঁবুর দিকে চলে গেলেন।

অর্জুনের আর সন্দেহ রইল না। দ্বীপের ওপাশে প্রোফেসর আর এপাশে মার্শালসাহেব সমুদ্রের মধ্যে যা খুঁজছেন সেটার সূত্রই সে লকারে পেয়েছে। কিন্তু এই সমুদ্রই যে ওই অনুসন্ধানের জায়গা তা নিয়ে অর্জুনের ধন্দ ছিল। অন্তত এখন এদের খোঁজাখুঁজি দেখে সেটা কমে গেল। অত সাবধানে যিনি লকারে কাগজ রেখেছিলেন তিনি প্রোফেসর এবং মার্শালসাহেবের পরিচিত ছিলেন? ওর ওই কাণ্ডকারখানার খবর কি এঁরা দু’জনেই রাখতেন? ফলে লোকটির মৃত্যুর পরে এঁরা অনুসন্ধানে নেমে পড়েছেন? লোকটি অভিযাত্রী ছিল। মেজরের কথা মানলে মার্শালসাহেবও অভিযাত্রী। অতএব যোগসূত্র থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা বোকামি হবে। জলপাইগুড়িতে অমলদা এইরকম ভাবে দেখলে কিছু বলতে না কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছলে হাসতেন।

তাঁবুতে ঢুকে অর্জুন দেখল ব্রাউন তখনও ঘুমোচ্ছে। অনেক বড় চেহারার

মানুষও ঘুমোলে ছেলেমানুষের ভঙ্গি করেন। হঠাৎ ওর মনে হল ব্রাউন কি প্রোফেসরের লোক? তাদের ওপর নজর রাখার জন্যে প্রোফেসর ওকে পাঠিয়েছেন? মিসেস ব্রাউনের হোটেলেরই তো সে প্রোফেসরকে প্রথম দেখে। তা হলে মেজর ভেবে ভুল করে ব্রাউনকে ভুলে নিয়ে যাওয়ার গল্প সাজানো? মাথার ভেতরে সব কিছু উলটো-পালটা হয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন সন্তপণে এগিয়ে গিয়ে ব্রাউনের বোঁচকাটায় হাত দিল। তাঁবুর ভেতর যে আলোটা জ্বলছে তার শক্তি খুবই কম। বোঁচকাটা পরীক্ষা করলে ব্রাউনের পরিচয় পাওয়া যাবে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সে হাত সরিয়ে নিল। ব্রাউন যদি প্রোফেসরের চর হয় তা হলে কিছুতেই কথায়-কথায় মেজরের সঙ্গে ঝামেলা করত না। মেজরের সঙ্গে ভাব জমাবার কোনও চেষ্টা তো নেইই, বরং একই চেহারার মানুষ তাকে শাসাচ্ছে এটা ব্রাউন সহ্য করতে পারে না। বিশেষ উদ্দেশ্য থাকলে সেটা পারত।

অর্জুন ব্রাউনকে ডাকল, “মিস্টার ব্রাউন!”

দ্বিতীয় ডাকেই চোখ খুলল ব্রাউন, “ও, তুমি! সকাল হয়ে গিয়েছে?”

“না। আপনার সঙ্গে কথা ছিল।”

“ভীষণ ঠাণ্ডা বাইরে, আমি যদি এভাবে শুয়ে-শুয়েই কথা বলি?”

“ঠিক আছে। শুনুন, আমরা সকাল আটটায় অভিযানে বের হচ্ছি।”

“ওই হাঙরটাকে মারতে? আমি ওর মধ্যে নেই। ডাঙায় যে-কোনও ব্যাপারে আমাকে পাবে, কিন্তু জলে? অসম্ভব?” ব্রাউন পিটিপিট করে তাকাল কথাগুলো বলে।

“কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। যদিও বাকি দু’জন সেটা চাইছে না।”

“চাইছে না? শুভ। ওরা দেখছি আমার প্রকৃত হিতৈষী।”

“আপনি ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনুন। আমার মনে হয়েছিল আপনি আমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখেছেন। আপনি না গেলে আমি বিপদে পড়ব।”

“তা হলে যাওয়ার কী দরকার, যেও না। চুকে গেল।”

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। লোকটাকে সব কথা খুলে বলা উচিত নয়। আবার না বললেও সাহায্য পাওয়া যাবে না, যেভাবে হাঙরভীতিতে রয়েছে। মেজর আছেন, কিন্তু আর একজন সঙ্গী চাই মার্শালের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে।

সে বলল, “মিস্টার ব্রাউন, আমরা হাঙর শিকারে যাচ্ছি না।”

“তা হলে? যাচ্ছ কোথায়? কাল মার্শাল একটা বাস্তব এনেছে, জানো? তাতে কী আছে বলা তো? ওই হাঙরটাকে বধ করবার অস্ত্রশস্ত্র।”

“হতে পারে। কিন্তু আমরা যাচ্ছি অন্য উদ্দেশ্যে।”

এবার উঠে বসল ব্রাউন, “তাই বলা। আমি গোড়া থেকেই রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিলাম। কিন্তু ভাই, এই বালি আর জলে মালকড়ি আমদানির সম্ভাবনা যখন

নেই, তখন আমিও নেই। কাল ফিরে যাওয়ার পর তো তোমরা হাওয়া হয়ে যাবে আর আমি আবার ভাসব। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এসব কথাই ভাবছিলাম।”

“ভাগ্য যদি ভাল হয় তা হলে আপনাকে আর ভাসতে হবে না।”

“মানে?” এক লাফে বিছানা থেকে নেমে এল ব্রাউন। এইসময় ঠাণ্ডার চিন্তাও তার মাথায় রইল না। অর্জুন হাসল, “আপনাকে এর বেশি কিছু বলব না।”

হঠাৎ অর্জুনের হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলল ব্রাউন, “ব্রাদার, আমার খুব কষ্ট। কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। আমার স্ত্রী তো নয়ই। জীবনে একবার অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলেছিলাম বলেই এই দুর্দশা। কাউকে দোষ দিই না আমি। কিন্তু আজ এখানে কাল ওখানে করে ভেসে বেড়াতে ভাল লাগে, বলো? প্রায়ই আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। সেদিন আর সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীর কাছে ফিরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে থাকতে দিলে প্রমাণ করব আমি মানুষটা খারাপ নই। তা সে কথাই শুনতে চাইল না। তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ আর ভেসে বেড়াতে হবে না।”

“না, আমি কথা দিচ্ছি না। তবে ভাগ্য ভাল হলে ওরকম আশা করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা, এই অভিযানে বিপদ আছে।”

“বিপদ? আমাকে বিপদের ভয় দেখিও না ব্রাদার। যে উন্নতির আশুনে পুড়ে মরছে তাকে গরম তেল আর কী করতে পারে। ঠিক হ্যাঁ, আমি আছি।”

সকাল আটটায় মেজর সমুদ্রের গায়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “উঃ, কী সুন্দর। কী মহান। তাকালেই বুক ভরে যায়।”

পেছন থেকে ব্রাউন ফোড়ন কাট, “ফুলের বুকেই পোকা থাকে।”

মেজর থিচিয়ে উঠলেন, “কী থাকে সেটা আমি বুঝব। তুমি বলার কে? মাতব্বরি আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। এই পাজিটাকে সঙ্গে নেওয়ার যে কী দরকার ছিল তা জানি না।”

মার্শাল বললেন, “তোমার গোয়েন্দা-বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করো।”

অর্জুন কোনও জবাব না দিয়ে ব্রাউনকে ইশারা করল আর না মুখ খুলতে। সবাই এখন তৈরি। মার্শালের লোকজন ভাসমান সাবমেরিনটিকে শেষবার পরীক্ষা করে নেমে এল। মার্শাল বললেন, “বন্ধুগণ, এবার যাত্রা শুরু করা যাক।”

হঠাৎ মেজর হাত তুললেন, “মার্শাল, একটা কথা। জলের তলায় বিয়ার খাওয়া যাবে?”

মার্শাল হাসলেন, “তোমার জন্যে কোনও না নেই।”

“থ্যাক ইউ।” মেজর যেভাবে পা ফেলে এলেন, তাতে মনে হল হিটলার

প্যারিসে নামছেন। সাবমেরিনের ভেতরের আসনগুলো বেশ আরামদায়ক। এটি জলের নীচে যখন চলে তখন ওপরের ছাদ বন্ধ থাকে। জলের ওপরে উঠে এলে লম্বা নৌকো হয়ে যায়। দুটো বড় চোঙা আছে বাতাস ঢোকার জন্যে। এ ছাড়া অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে প্রয়োজনের জন্যে। মার্শাল বসলেন না স্টিয়ারিং-এ। যদিও চারজনের জন্যেই এর ওজন বরাদ্দ তবু তিনি একজন ড্রাইভার নিলেন কর্মচারীদের মধ্যে থেকে। চারজনের বেশি হয়ে গেছে বলে মেজর আপত্তি তুলেছিলেন। মার্শাল হেসে সেটা বাতিল করলেন, “জুনিয়র ডিটেকটিভের অনারে আমরা না হয় নিয়ম ভাঙলাম। অবশ্য মালপত্র ও মানুষের সম্মিলিত ওজন এর বহনক্ষমতার অনেক নীচেই রয়েছে।”

চালু হল ইঞ্জিন। এখন এটি আর সাবমেরিন নয়। সাতসকালেই মেজর বিয়ারের ক্যানে ঠোট দিলেন। আড়চোখে একবার ব্রাউনকে দেখলেন, তারপর বললেন, “সমুদ্রে বসে বিয়ার খেতে আমার চিরকালই ভাল লাগে। সবার মগজে তো এসব ঢুকবে না।”

ব্রাউন কথা বলে বসল, “বিয়ার পুরুষমানুষের পানীয় নয়।”

“কী? এত বড় কথা? আমি পুরুষ নই?” গর্জন করে উঠলেন মেজর।

“আমি ওসব কিছুই বলিনি। বিয়ার নিয়ে কথা বলেছি।” ব্রাউনের মুখ নির্বিকার।

চটপট হাত তুলেন মার্শাল, “তা যাই বলো মেজর, তোমার যা শরীর, তাতে আমি বলি কি, বিয়ারের বদলে স্কচ খাওয়া উচিত। গতকাল তোমার জন্যে দুটো ভাল বোতল এনেছি। সারপ্রাইজ দেব বলে বলিনি।”

রাগটা টুক করে গিলে ফেললেন মেজর, “তুমি হোস্ট, তোমার কথা আলাদা। বলছ যখন তখন খাব কিন্তু সেটা অন্য কারও উপদেশ শুনে নয়।”

মার্শাল চটপট একটা গ্লাস, এক জাগ বরফের টুকরো আর দু-দুটো স্কচের বোতল বের করে দিল। অর্জুনের ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। এইরকম সময় মেজরের এইসব খাওয়া উচিত হচ্ছে না। বিয়ার খেলে ঝঁব কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু দু-দুটো স্কচ হাতের মুঠোয় পেলো কী হবে কে জানে।

মার্শাল বললেন, “এবার বলো কোনদিকে যেতে হবে?”

প্রশ্নটা অর্জুনকেই করা। সে চারপাশের শাস্ত্র সমুদ্রের দিকে তাকাল। মেজর বললেন আগ বাড়িয়ে, “জায়গাটা মেপে এসেছি। সোজা উত্তর দিকে চলো।”

মার্শাল ড্রাইভারকে সেই নির্দেশ দিলেন। অর্জুন একটু ধন্দে পড়ল। কাগজে লেখা ছিল দাঁড়-টান নৌকায় এক ঘণ্টার পথ। সেটা ঠিক কোন্ জায়গা থেকে নৌকো যাত্রা শুরু করেছিল তার ওপর নির্ভর করছে। যদিও গতকাল মেজর নিশ্চিত হয়েছিলেন জায়গাটা দেখে কিন্তু সেটাই সঠিক জায়গা কি না তা কে বলতে পারে।

ভাঙা-ভাঙা ঢেউয়ের ওপর তরতর করে ভেসে যাচ্ছিল যানটা। ইঞ্জিনের মৃদু শব্দে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যাচ্ছিল সাগরপাখিরা। অর্জুন দেখল ব্রাউন একদৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ জিজ্ঞেস করতেই চোখ না সরিয়ে ব্রাউন জবাব দিল, “তোমরা কেউ হাঙরটার কথা মনে রাখছ না, এটা ঠিক ব্যাপার নয়। যদি এসে যায় তা হলে কী করব বুঝতে পারছি না।”

অর্জুন বলল, “এখন পর্যন্ত তো ওটা কোনও নৌকোকে জলের ওপর উঠে এসে আক্রমণ করেনি। ওটার খবর মার্শালসাহেব ছাড়া আর কেউ পায়নি এর আগে।”

ব্রাউন যেন স্বস্তি পেল একটু। কাঠ-কাঠ ভাবটা কমিয়ে বলল, “করেনি বলে যে করবে না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।” সে মুখ ফিরিয়ে মেজরকে দেখল, “ভর-সকালবেলায় পিপেটা মদ খাচ্ছে। অথচ বললেই হয়েনার মতো আওয়াজ তুলবে। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?”

মার্শালের হাতে এখন দূরবীন। তিনি জলের ওপর দৃষ্টি বোলাচ্ছিলেন। ব্রাউনের প্রশ্নটা এড়াতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কিছু দেখতে পাচ্ছেন?”

“না। নাথিং। কিন্তু মেজর, তোমার সেই জায়গাটা থেকে আমরা কত দূরে আছি?”

মেজরের তৃতীয় গ্লাস ততক্ষণে শেষ হবার মুখে। গাঢ় গলায় বললেন, “অর্জুন, বলে দাও।”

অর্জুন বলল, “জলের গায়ে তো দাগ দেওয়া যায় না, আমার কাছে তাই সব জায়গা একইরকম লাগছে। কাল ঠিক কোথায় এসেছিলাম তাও বুঝতে পারছি না।”

কথা শেষ করে সে দেখল মার্শালের মুখের পেশী বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে মার্শালের সাহায্য লাগবেই। লকারের কাগজের নির্দেশ একা অনুসরণ করা অসম্ভব। সে তাই কথাগুলো জুড়ল, “কাগজে লেখা আছে এক ঘণ্টা দাঁড় টেনে নৌকায় উত্তর দিকে যেতে হবে। মে মাসে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে আসে সাড়ে বারোটায়।”

“মে মাস? মে মাসের অঙ্ক এখন মিলবে কী করে?”

এই সময় মেজর চিৎকার করে উঠলেন, “স্টপ, স্টপ। আঃ, ইঞ্জিন বন্ধ করো।”

মার্শালের ইঙ্গিতে ড্রাইভার যানটাকে অচল করল। বিড়বিড় করে কীসব অঙ্কের হিসেব করে গেলেন মেজর। তারপর বললেন, “জল নিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসো না হে। জলই আমার জীবন।” গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন, “আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি। কিন্তু আরও ডান দিকে সরতে হবে।”

ডান দিকে মিনিট-দুয়েক যাওয়ার পর সবাই মেজরের দিকে তাকাল। তিনি

তখন নতুন করে প্লাসে স্কচ ঢালছেন। মার্শাল জিজ্ঞেস করলেন, “কী হল?”

মেজর নির্বিকার মুখে বললেন, “কী আর হবে! শরীরটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছি একটু।” এইসময় অর্জুন দেখতে পেল দূরে একটা মোটরবোট জল চিরে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছে। মার্শাল এবার অর্জুনের দিকে এগিয়ে এল, “সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। পকেট থেকে কাগজটা বের করে আমার হাতে দাও।” মার্শালের প্রসারিত হাত এখন অর্জুনের সামনে।

কোনও প্রতিবাদ না করে কাগজটা দিয়ে দিল অর্জুন। সেটা চোখের ওপরে ধরে হতভম্ব হয়ে গেল মার্শাল, “আরে, এ কী ভাষায় লেখা?”

অর্জুন বলল, “বাংলা।”

“ওঃ।” ডান হাত দিয়ে কাগজ ধরে রাখা, বাঁ হাতে ঘুসি মারল মার্শাল, “তোমরা লকারে বাংলা লেখা কাগজ পেয়েছিলেন?”

“না। ওটা বাংলায় অনুবাদ করে নিয়ে ছিড়ে ফেলেছি।”

“তা হলে দয়া করে এটাকে আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করে দাও।”

“সেটাই তো দিচ্ছিলাম, আপনি ব্যস্ত হলেন।” অর্জুন কাগজটা ফেরত দিল। এক পলক দেখে নিয়ে পড়ল, “সমুদ্র। উত্তর দিকে এক ঘণ্টা যাত্রা। গতি দাঁড়-টানা নৌকোর। যেখানে মাটি যতদূর, আকাশ ততদূর! মে মাসে সূর্য মাথার ঠিক ওপরে আসে সাড়ে বারোটায়।”

“দূর! এ থেকে কী করে বুঝলে জায়গাটা এই সমুদ্রেই?”

“অনুমান।”

“কী থেকে অনুমান করছ? একটা মাথামুণ্ড ক্ল থাকতে হবে তো?”

“উনি তো এই সমুদ্রের ধারেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন।”

“তা কাটিয়েছেন।” বলেই সামলে নিলে মার্শাল, “কিন্তু কোন পয়েন্ট থেকে এক ঘণ্টা দাঁড়-টানা নৌকোয় যেতে হবে?”

“তা লেখা নেই।”

বিরক্ত মার্শাল চোখ বন্ধ করলেন, “আর কী লেখা আছে?”

অর্জুন পড়ল, “ডুবুরি। পাথরটা নড়েনি নোয়ার আমল থেকে। জাহাজ-বাঁধা পাথর।”

“ডুবুরি? পাথর?” মার্শালের চোখ খুলল।

মেজর বললেন, “নোয়ার আমলেও তো জাহাজ ছিল। সেই জাহাজই বাঁধা হত ওই পাথরে। সেই পাথর এখনও টিকে আছে। কী বড় পাথরই বোঝো!”

এইসময় মেজর চিৎকার করে উঠলেন, “ইউরেকা। পেয়েছি। এখানেই সমুদ্রের ওই দিকটায় ডুবোপাহাড় আছে। সেই কারণেই জাহাজ এড়িয়ে যায় ওই অঞ্চল। শুনেছি আগে সমুদ্রের জল এদিকে কম ছিল। জাহাজ থেমে যেত ওপাশেই।”

মার্শালকে খুব খুশি মনে হচ্ছিল। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, “পেটের জল ছাড়া বাইরের কিসসু বোঝো না মেজর। লম্বা-লম্বা কথা। ডুবোপাহাড়টা এখান থেকে অন্তত আধমাইল দূরে। আর উনি এতক্ষণ ডান দিক দেখছিলেন।”

মেজর কিছুই জবাব দিলেন না। সম্ভবত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশি মন্যপান করে তিনি প্রতিবাদের শক্তি খুঁজে পেলেন না। শুধু এমন ভঙ্গিতে হাসলেন যেন কোনও অবোধ শিশুর কথা শুনছেন। ততক্ষণে মেজরের নির্দেশে যানের মুখ ঘুরেছে। সিকি মাইল অতিক্রম করার পর দেখা গেল মোটরবোটটা এদিকে ছুটে আসছে। মোটরবোটে পাইলট ছাড়াও দুজন লোক রয়েছে। প্রায় পাশাপাশি এসে সেটা দাঁড়িয়ে গেল। একটা লোক চিৎকার করে বলল, “এখানে কী চাই তোমাদের? বেশ তো ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে।”

মার্শাল রাগী গলায় বললেন, “তোমরা জিজ্ঞেস করার কে হে? জলপুলিশ নাকি?”

“তাদের বাবা। শোনো, ভাল চাও তো এই এলাকা থেকে কেটে পড়ো।”

মার্শাল বললেন, “কারণটা জানতে পারি?”

“আমরা সরকারকে টাকা দিয়েছি এই এলাকায় মাছ ধরব বলে। কোনওরকম গোলমালে লোক এখানে ঢুকুক আমরা চাই না। যাও, ভাগো জলদি।” লোকটার শাসানি শেষ হওয়ামাত্র মেজর হুকার দিয়ে উঠলেন জড়ানো গলায়, “অ্যাঁই! আমাকে শাসানো হচ্ছে? পাজি, বদমাশ, ছুঁচো। জল তোদের পৈতৃক সম্পত্তি? আমাকে জল চেনাতে এসেছ!” আর তখনই ব্রাউন অর্জুনকে আঁকড়ে ধরল। লোক দুটো একইসঙ্গে ব্রাউন আর মেজরকে দেখছে। ব্রাউন ফিসফিস করে বলল, “যারা আমাকে জিপে তুলেছিল তাদের মধ্যে ওই লোক দুটো ছিল। দিব্যি করে বলছি।”

লোক দুটোর একটা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে বোটের ওপরে। গম্ভীর গলায় সে বলল, “তোমরা আমাদের উত্তেজিত করছ। ওই হেঁতকাটাকে গুলি করে ফেললে কিন্তু আমরা চুপ করে থাকব না। তোমরা কি বাবে?”

মার্শাল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন বোট ঘোরাতে। ফিরে আসার মুখে মেজর সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিলেন। দুটো মাস্তানের হুমকিতে রণে ভঙ্গ দেবার পাত্র তিনি নন। তাঁকে হেঁতকা বলল অথচ কেউ প্রতিবাদ করল না। এইসব।

মার্শাল কোনও কথা বললেন না। মেজর আসার পর অর্জুনকে বললেন, “মাতালদের নিয়ে জলের নীচে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমনিতেই একজন চেনা হয়েছে। মেজরকে তীরে নামিয়ে দিচ্ছে।”

এবার মেজর উঠে দাঁড়ালেন, “মানে? আমি মাতাল? আমাকে সঙ্গে নিয়ে

যাওয়া বোকামি ? জল চেনাচ্ছ ? দ্যাখো মার্শাল; তোমার মতলব আমার ভাল লাগছে না । ”

“এর মধ্যে মতলব আবার কোথায় দেখলে ?”

“আমি তীরে নামছি না । ” মাথা নাড়লেন মেজর, “সেই সেকেন্ডহ্যান্ড জুতো কেনা থেকে আমরা একটার পর একটা বামেলা সামলাচ্ছি আর উনি শেষবেলায় এসে মাতব্বরি করছেন । আর যাবেই-বা কী করে ? দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল তো ?”

মোটর বোট এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে । কিন্তু অর্জুন লক্ষ করেছিল, ওদের কাছে দূরবীন আছে । অর্থাৎ ওরা এখনও তাদের ওপর নজর রাখছে । প্রোফেসরের লোকজন আজ হঠাৎ জল পাহারা দিচ্ছে কেন ? নাকি রোজই দেয়, তার চোখে পড়েনি । ক্রমশ ওরা এমন একটা জায়গায় চলে এল যেখান থেকে আর মোটরবোট নজরে পড়ার কোনও সুযোগ নেই । মার্শাল সবাইকে সতর্ক হতে বললেন । ধীরে-ধীরে মাথার ওপর ছাদ উঠে এল দুপাশ থেকে । দুটো চোঙা ওপরে উঠে এল । ড্রাইভার আলো জ্বালিয়ে দিতেই অর্জুন বুঝল যানটা সাবমেরিন হয়ে জলের তলায় নেমে যাচ্ছে । মার্শাল দ্রুত নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভারকে । এবার সবাই কাচের ওপাশে জল দেখতে পেল । দৃষ্টি সইয়ে নেবার পর এক ঝাঁক মাছের সঙ্গে প্রথম মোলাকাত হল ওদের । সাবমেরিনটা খুব বড় নয় । নৌকো হিসেবে মাঝারি মনে হলেও এর ভেতরে দুটো ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে । জল কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিন ডুবোপাহাড়ের উদ্দেশ্যে । মার্শাল এবার বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বললেন, “আমার কাছে কয়েক সিলিন্ডার অক্সিজেন আছে । এখন পর্যন্ত আমরা ওপর থেকে অক্সিজেন পাচ্ছি । কিন্তু নিরাপত্তার কারণেই স্পটের কাছাকাছি পৌঁছে চোঙা দুটো নীচে নামিয়ে ফেলতে হবে । তোমাদের মধ্যে কে কে সাঁতার জানো ?”

মেজর হাত তুললেন । কিন্তু তাঁর অন্য হাতের গ্লাসটা খুব কঁপে উঠল । মার্শাল তাঁকে লক্ষ না করে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হবে গোয়েন্দা, জলের তলায় কিছু খুঁজতে এসেছ সাঁতার না জেনে ! তাজ্জব ব্যাপার । ”

জলপাইগুড়ি শহরে দু-দুটো নদী থাকলেও তিস্তায় সাঁতার শেখার কোনও সুযোগ নেই । শীতকালে জল থাকে না বললেই চলে, গ্রীষ্মকালে সেখানে নামার সাহস অল্পলোকের হয় । সাঁতার শেখে সবাই করলা নদীতে । তা কয়েক বছর শ্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জল নষ্ট হতে বসেছে । মাকে এড়িয়ে অর্জুন কিছুদিন হাত-পা ছুঁড়েছিল । জলের ওপর শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখতে পারত । কিন্তু করলায় সাঁতার কাটা আর ইংল্যান্ডের সমুদ্রে সাঁতারানো এক ব্যাপার কেন হবে ! সে হেসে মার্শালকে বলল, “আমি কোনও কাজ একদম না জেনে হাত দিই না । ”

মার্শালের চোয়াল শক্ত হল । তিনি ঘুরে বসলেন সামনের দিকে । অজস্র

জলজ লতায় শরীর বাঁচিয়ে সাবমেরিনটা ছুটে যাচ্ছে। সাবমেরিন থেকে একটা তীব্র আলো সামনের জলের দেওয়াল ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ছে। মার্শাল এবার গতি কমাতে বললেন। ধীরে ধীরে চোখের সামনে ডুবোপাহাড়টা ভেসে উঠল। আলো নিভিয়ে সাবমেরিন একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। জলের ফুট দশেক নীচে মার্শাল সেটাকে স্থির করতে বললেন। প্রায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এবার মার্শাল অর্জুনের দিকে ঘুরে বসলেন, “এইটেই তোমার সেই ডুবোপাথর যা নোয়ার আমল থেকে নড়েনি। চালু গল্প হল, এখানেই একসময় জাহাজ নোঙর করত। এবার কী করতে হবে বলে ফেলো।”

“আপনি এখানে এর আগে এসেছেন?”

“একবারই। সাবমেরিন থেকেই দেখেছি।”

“পাথরটা কত বড়?”

“খুব বড় বলে মনে হয় না।”

“আমরা একবার পাক দিতে পারি?”

“পারি। তবে মনে রেখো জলের ওপরে পাহারাদার রয়েছে।” মার্শাল কাঁধ নাচালেন, “তুমি একেবারে মুঠো খুলবে না তা হলে। বেশ কিন্তু এই দুটো বোঝাকে সঙ্গে আনার কোনও দরকার ছিল না।”

সত্যি, মেজর এখন দেওয়ালে হেলান দিয়ে পড়ে রয়েছেন। এতদিন অর্জুন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আছে কিন্তু কখনও এমন বেহেড মাতাল হতে দেখেনি। সে হাত বাড়িয়ে মেজরের মুঠো থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিতে যেতেই মেজর চোখ বন্ধ করেই বলে উঠলেন, “উহ। আমি সব শুনতে পাচ্ছি। জবাব দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না বলেই চুপ করে বসে আছি। তবে যে যাই বলুক, আমি বাবা এখান থেকে নড়ছি না।”

সাবমেরিনটা তখন সম্ভূর্ণ পাহাড়ের দশ ফুট দূর ঘেঁষে চলতে আরম্ভ করেছে। পাহাড়টার গায়ে শ্যাওলা খিকখিক করছে। বোঝাই যাচ্ছে কেউ ওখানে কয়েক বছরের মধ্যে পা দেয়নি। সতর্ক চোখ রাখছিল অর্জুন। পাহাড়ের তলায় একটা সুড়ঙ্গ থাকার কথা।

“সাবমেরিনটাকে আর একটু নীচে নামাবেন?”

“কেন? মরার ইচ্ছে হয়েছে?” মার্শাল চিৎকার করলেন, “আরও নীচে নামলে কোথাও যদি ঠোঁকর খায় তো দেখতে হবে না। এটার দাম কত জানো?”

অর্জুন জানে না। জলপাইগুড়ির ছেলের সাবমেরিনের দাম জানার কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে জানাল, “একটা সুড়ঙ্গের খোঁজ করতে হবে যেটা পাহাড়ের তলায় রয়েছে।”

“সুড়ঙ্গ? মাই গড!” মার্শাল একটু ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে নিচু গলায় কিছু

বললে, সে মাথা ফিরিয়ে অর্জুনকে দেখল। তারপর সাবমেরিনটা ধীরে-ধীরে নীচে নামতে লাগল। এখন পর্যন্ত অক্সিজেন জোগাচ্ছে। ক্রমশ বাইরের পৃথিবীটা বাপসা হয়ে গেল। সূর্যের আলো এতটা জল ভেদ করে নীচে নামতে পারছে না। ফলে আবার সাবমেরিনের আলো জ্বলে উঠল। প্রচুর মাছ ছুটোছুটি করছে। তাদের অনেকের চেহারা অর্জুন এ-জীবনে দেখেনি। অক্টোপাসের মতো শুঁড়অলা একটা ছোট্ট প্রাণীকে প্রায় দৌড়ে পালাতে দেখল সে পাহাড়ের খাঁজে। এর মধ্যে প্রায় তিনভাগ পাক দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত যা-কিছু হচ্ছে তার সবটাই অনুমাননির্ভর। এই ডুবোপাহাড়টা কাগজে লেখা নোয়ার পাথর নাও হতে পারে। এই সমুদ্রটাও ভুল জায়গা প্রমাণ হতে বেশি দেরি নেই। কিন্তু অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল তারা ঠিক পথেই এগোচ্ছে। পাহাড়টা বেশি উচু নয়। জলের গভীরতা ধরলে চল্লিশ ফুটের বেশি নয়। অথচ জলের মধ্যে এটাকেই কী বিশাল লাগছে। হঠাৎ মার্শালসাহেব চিৎকার করে উঠলেন। যান থেমে গেল। অর্জুনও সুড়ঙ্গটাকে দেখতে পেল। যদিও সুড়ঙ্গ না বলে গর্ত বলাই ভাল। গর্তের মুখটাতে আর একটি পাথর আছে, কিন্তু সেটা মুখটাকে ঢেকে দেয়নি। মার্শাল জিজ্ঞেস করলেন, “কী হে ? এইটেই তো ?”

অর্জুন উত্তেজিত হয়ে বলল, “লেখা আছে একজনই ঢুকতে পারবে। মুখটাও তো সেইরকম।”

মার্শাল বললেন, “চলো, বাকিটা দেখি। যদি আর-একটা দেখতে পাই।”

“বাকি পাহাড়টা চট করেই ফুরিয়ে গেল। মার্শাল জিজ্ঞেস করলেন, “সুড়ঙ্গের পন কাগজে কী লেখা আছে ?”

“সেটা সুড়ঙ্গের ভেতর গিয়েই বলব।”

মার্শাল হাসলেন, “কিন্তু ব্রাদার, এবার যে আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে।”

এবার ব্রাউন চিৎকার করে উঠল, “মানে ? এত কষ্ট করে খুঁজে পাওয়ার পর ফিরে যাব মানে ? ইয়াকি পেয়েছ ? একবার ফিরে গেলে তুমি আর আমাদের এখানে নিয়ে আসবে ? সুড়ঙ্গটা জেনে নিয়ে আমাদের কাটিয়ে দেবার মতলব ?”

মেজর চোখ বন্ধ করেই বললেন, “এই প্রথম লোকটাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হল।”

মার্শাল কাঁধ নাচালেন, “ওয়েল, জেন্টলমেন, তোমরা আমাকে অপমান করছ। এইরকম অবস্থায় তোমাদের সঙ্গে কাজ করা ঠিক হবে কি না আমাকে ভাবতে হবে। উই আর গোয়িং ব্যাক।”

ঠিক সেই সময় ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল। চিৎকার জ্বিটকে উঠল ব্রাউনের মুখ থেকেও সেই বিশাল হাঙরটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাওয়ার পথ আটকে। মার্শাল চাপা গলায় বললেন, “জামা প্যান্ট খুলে নাও।” তারপর

দ্রুত হাতে অস্ত্রিভেন মাস্কগুলো একটা বাস্স থেকে বের করে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিলেন। একমাত্র মেজর ছাড়া সবাই সেই নির্দেশ পালন করল হাঙরটার দিকে নজর রেখে। হাঙরটা একটুও নড়ছে না। অর্জুন তৈরি হতে-হতে ডাকল, “মেজর, মেজর!”

মেজর চোখ বন্ধ করে বললেন, “জ্বালিও না। আমি একটা কবিতা মনে করার চেষ্টা করছি। আবার আসিব ফিরে ধানসিড়ি...ধানসিড়ি...আঃ কী যেন লাইনটা?”

মার্শাল তৈরি হয়ে নিলেন সবার আগে। তারপর ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। অর্জুন তাঁকে অনুসরণ করল। বাস্স খুলে বন্দুক বের করছেন তখন মার্শাল। বন্দুকগুলো বিশেষভাবে তৈরি। অর্জুনের দিকে একটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, “এই গ্রেনেডের ব্যাগ কোমরে বেঁধে নাও। দশটা করে গ্রেনেড আছে এক-একটা ব্যাগে। বন্দুকের ঢাকনা খুলে এখানে গ্রেনেড বসিয়ে দেবে। তারপর ট্রিগার টিপলেই ওটা ছুটে যাবে। লক্ষ্যবস্তুর গায়ে আঘাত না লাগা পর্যন্ত বিস্ফোরণ হবে না।”

প্রচলিত চেহারার বন্দুক বা রাইফেলের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। অর্জুন একটার বদলে দুটো ব্যাগ নিল। সে শার্ট খুলেছিল, কিন্তু প্যাণ্ট খোলেনি। ফলে কোমরের বেণ্টে ব্যাগ দুটোকে বেঁধে নিতে অসুবিধে হল না। ব্যাগের মুখে ইলাস্টিক দেওয়া। হাত ঢুকিয়ে একটা গ্রেনেড বের করে বন্দুকের খোপে পুরে নিল। ততক্ষণে মার্শালসাহেব পেছনের দরজা টেনে দিয়ে অস্ত্রিভেন-মাস্ক পরে নিয়ে সামনের দরজা খুলতে চেষ্টা করছেন। অস্ত্রিভেন-মাস্ক মুখে বেঁধে নিতে বেশ কসরত করতে হল অর্জুনকে। মার্শালের দেখাদেখি সিলিন্ডার চালু করতে স্বস্তি এল। একজিট হোল দিয়ে মার্শাল যখন বাইরে বেরোচ্ছেন তখন জল আছড়ে পড়ল ঘরে। কোনও কিছু চিন্তা না করে অর্জুন মার্শালকে অনুসরণ করল। যা জল ঢোকার ঢুকে গেছে ততক্ষণে কিন্তু মার্শাল বাইরে থেকে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলেন। জলের মধ্যে অস্ত্রিভেন-সিলিন্ডার পিঠে বুলিয়ে অদ্ভুত রোমাঞ্চ হচ্ছিল অর্জুনের। তারা রয়েছে সাবমেরিনটার পেছনের দিকে। আর হাঙরটাকে শেষবার দেখেছিল সামনের দিকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে। মার্শাল সন্তুর্ণণে সাবমেরিনের দেওয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

জলের মধ্যে ভেসে থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না অর্জুনের। যতটা ঠাণ্ডা লাগার কথা, ততটা লাগছে না। যদিও হাঙরটার জন্যে উত্তেজিত হওয়ায় ঠাণ্ডা বোধটাই ওর কাজ করছিল না। অর্জুন সাবমেরিনের আওতা থেকে সরে চলে এল পাহাড়ের গায়ে। একটা বড় পাহাড়ের আড়ালে আসতেই সে হাঙরটাকে দেখতে পেল। লেজ নেড়ে সেটা পেছনে সরে যাচ্ছে। আর তখনই বিস্ফোরণটা ঘটল। মার্শাল তাঁর বন্দুকের ট্রিগার টিপছেন। প্রচণ্ড ঢেউ

উঠল, জলের ভেতর একটা ঝাঁকুনি বয়ে গেল আর হাঙরটার লেজের কাছে ঘোলাটে কিছু তৈরি হল মাত্র। কিন্তু অর্জুন অবাক হয়ে দেখল কিছুই হল না হাঙরটার। অর্থাৎ মার্শালের ছোঁড়া গ্রেনেড হাঙরের চামড়া ভেদ করতে পারল না। এই প্রথম হাত-পা ঠাণ্ডা লাগল অর্জুনের। সে দেখল সাবমেরিনটাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে ড্রাইভার। সম্ভবত যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে সে জেনে নিয়েছে। মার্শালকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। আর সাবমেরিন ঘোরানো মাত্র হাঙরটা পাক খেয়ে ছুটে আসতে লাগল বিশাল হাঁ করে। অর্জুন পাথরের আড়াল থেকে ট্রিগার টিপল সেই হাঁ লক্ষ করে। গ্রেনেডটা ছুটে যাওয়ার সময় এমন ঝাঁকুনি হল যেন কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হল তার। আবার সেই একই আলোড়ন, শব্দতরঙ্গ শুবে নেওয়া জলে একই কাঁপুনি। শুধু হাঙরের মুখটা বন্ধ হল এবং প্রায় অর্জুনের দশ হাত দূরে এসে ওটা গতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাবমেরিনটা ততক্ষণে সরে গিয়েছে অনেকটা। একটা বিশাল হাঙরকে এত কাছ থেকে অর্জুন স্বপ্নেও দ্যাখেনি। পাথরটার আড়ালে নিজেকে যতটা সম্ভব ঢেকে রেখেছে সে। হাঙরটা নিশ্চয়ই তার অস্তিত্ব বুঝতে পারেনি। কিন্তু প্রথম গ্রেনেডটা না হয় লেজে লেগেছিল, তারটা তো সরাসরি মুখের ভেতরে আঘাত করেছে বলে মনে হচ্ছে। কোথাও আঘাত না করলে জলে অনুরণন ছড়াত না। অথচ হাঙরটা রয়েছে স্থির। যেন বুঝতে চেষ্টা করেছে তার আক্রমণকারী কোথায় লুকিয়ে আছে। অর্জুন কাঁপা হাতে দ্বিতীয় গ্রেনেডটা বন্দুকে ভরল। তারপর মাস্কের আড়াল থেকে হাঙরটাকে লক্ষ করে চমকে উঠল। কোনও হাঙরের পেটের কাছে জোড়ের দাগ থাকে নাকি! অপারেশনের পর সোলাইয়ের দাগ যেমন মানুষের শরীরে থেকে যায়, তেমনি নীচ থেকে ওপরে একটা দাগ উঠে গেছে। সে ওই দাগটাকে লক্ষ করে গ্রেনেড ছুঁড়তেই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। তীব্র আঘাতে দাগের জায়গাটা ফাঁক হয়ে গেল। যদিও সেটাকে জুড়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে হাঙরটা। তারপরেই হাঙরের মুখ থেকে একটা নীল ধারা ছিটকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবখানে। সেই নীলে মাছ বা কোনও জলজ প্রাণী ধরা পড়তেই মরে তলিয়ে যেতে লাগল। নীল ঢেউটা স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে আসতে লাগল পাহাড়ের দিকে। অনর্গল নীল ছড়াচ্ছে হাঙরটা। ওই নীল মানে বিষ। প্রায় মেঘের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে সবখানে। একটা মেঘ ধেয়ে আসছে অর্জুনের দিকেও। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে হবে। অর্জুন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করতেই সম্ভবত হাঙরটা তাকে দেখতে পেল। এইসময় আর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সম্ভবত কোনও আড়াল থেকে মার্শাল গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। সেটি এসে লেগেছে হাঙরটার চোখে। অর্জুন দ্রুত নীল ঢেউ এড়িয়ে একটা পাথরের আড়ালে পৌঁছে মুখ ফিরিয়ে বন্দুকে গ্রেনেড ভরতে-ভরতে হতভম্ব হয়ে গেল। হাঙরটার পেটে জোড় লাগেনি। আর ওটা

দুটো স্টিলের পাত ছাড়া কিছু নয় ।

ব্যাপারটা বুঝতে পারা মাত্র অর্জুন হাঙর মনে হওয়া যানটির খোলা পেট লক্ষ করে বন্দুকের ট্রিগার টিপল । ধাতব পাতে তৈরি পেট আরও নড়বড়ে হয়ে গেল প্রায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বোঝা যাচ্ছিল না ওটা হাঙর নয়, ডুবোজাহাজ বা ডুবোনৌকো, তাকে হাঙরের আদল দেওয়া হয়েছে । বস্তুটি ধীরে ধীরে জলের বুকে নেমে যাচ্ছে এখন । সেই নীল বিষ ছড়ানোও বন্ধ হয়েছে । মাটির ওপরে কেউ যদি বিশ্বের ধোঁয়া ছুঁড়ে দেয়, তা হলে পালাবার পথ থাকে না । চোখেও দেখা যায় না সব সময় । কিন্তু জল নিজেই ওর অগ্রগতিকে কিছুটা প্রতিরোধ করে, না পারলেও চেহারাটা ধরিয়ে দেয় আর এই কারণেই অর্জুন নিরাপদে চলে আসতে পেরেছিল ।

কিন্তু এবার কী করণীয় ? ওই বিরাট হাঙর-মার্কা ডুবোজাহাজটির পেটে নিশ্চয়ই মানুষ আছে । এবং সব-কিছু যদি মিলে যায় তা হলে প্রোফেসর হ্যাচ এবং তাঁর বাহিনীর থাকার কথা । কিন্তু কেউ বেরিয়ে আসছে না যন্ত্রটা থেকে । অথচ ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, ওটি অকেজো হয়ে গিয়েছে । কোনও নড়নচড়ন নেই । অর্জুন মার্শালসাহেবকে খোঁজার চেষ্টা করল । ভদ্রলোককে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না ।

জলের তলায় অক্সিজেন মাস্ক এবং পিঠে সিলিন্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম । অস্বস্তিটা আক্রমণের ভয়েই দূর হয়ে গিয়েছিল । এখন খেয়াল হল সিলিন্ডারে কতটা অক্সিজেন আছে তাই তার জানা নেই । ফট করে যদি শেষ হয়ে যায়, তা হলেই চিন্তির । সমুদ্রের মতো নীচ থেকে ওপরে ওঠার আগেই দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে হবে । কিন্তু অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল, হাঙর-মার্কা যন্ত্রটার কাছে যেতে । কোথায় যেন পড়েছিল বিখ্যাত ইংরেজি ছবি ‘জ’স’-র জন্যে অনেক লক্ষ ডলার খরচ করে একটা হাঙর বানানো হয়েছিল—বলত কম্পিউটার । সে এমন অভিনয় করেছিল যে, পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষ তাকে আসল না নকল বুঝতে পারেনি । প্রোফেসর হ্যাচ কি সেইরকম একটা সমুদ্রের জলে ছেড়ে রেখেছেন ?

ঠিক এইসময় বিপরীত দিক থেকে একজনকে সাঁতরে আসতে দেখল অর্জুন । ভারী শরীর, মুখ. তো দেখার উপায় নেই । লোকটা বোধ হয় হাঙর-মার্কা যন্ত্রটাকে আগে লক্ষ করেনি । সেটাকে দেখামাত্র পড়ি কি মরি করে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল । মার্শাল সাহেব নন এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত । যন্ত্রটার ওপাশ থেকে কি কেউ বেরিয়েছে ? তাই যদি হয় তা হলে যন্ত্রটাকে ভয় পাবে কেন ? অর্জুন ধীরে-ধীরে এগোল । পাথরের ফাঁক দিয়ে সে লোকটার পেছনে পৌঁছে যেতেই ব্রাউনকে বুঝতে পারল । ব্রাউন সামান্য ফাঁক দিয়ে যন্ত্রটাকে বুঝতে চেষ্টা করছে । অর্জুন কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারল এটা বোকামি । গ্যাসে মুখোশ পরে জলের ভেতর কথা বলা যায় না । স্পর্শ

করল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে পেছন ফিরে কোমর থেকে ছোট ছুরি বের করে উচিয়ে ধরল ব্রাউন। এক ঝটকায় কিছুটা পিছিয়ে গেল অর্জুন। ব্রাউন কি তাকে চিনতে পারছে না? ওর তো জলের নীচে নামার কথা ছিল না। ব্রাউন নড়ছে না। তার ছুরি সতর্কভাবে উচিয়ে রয়েছে। অর্জুন চটপট শ্যাওলা লেগে-থাকা পাথরের গায়ে নিজের নাম ইংরেজিতে লিখল আঙুল দিয়ে। সেটাকে লক্ষ করে ছুরি খাপে ঢুকিয়ে ছুটে এল ব্রাউন। হাত জড়িয়ে ধরার সময় অর্জুন সতর্ক হল। আবেগে যদি গ্যাস-মুখোশ খুলে দেয় তা হলে আর দেখতে হবে না। ব্রাউন কি কিছু বলার চেষ্টা করছে? অর্জুন ওর হাত ধরে টানল। ব্রাউন ইঙ্গিতে যন্ত্রটাকে দেখাতেই অর্জুন নিজের বন্দুকটা তুলে ধরে বোঝাল যে ও-ই কাণ্ডটা করেছে। ব্রাউন তার পিঠ চাপড়াল।

না, আর সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। যন্ত্রটা ওরকম নিশ্চল হয়ে আছে হয়তো বিশেষ মতলব নিয়ে। কাছে যাওয়ামাত্র আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। তার চেয়ে ওটা যখন চূপচাপ আছে তখন যে কাজের জন্যে এখানে নামা তাই করা দরকার। অর্জুন ব্রাউনকে ইশারা করল অনুসরণ করতে। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল পাহাড়ে গা ঘেঁষে।

এবং এই সময় তারা মার্শালকে দেখতে পেল। মার্শাল উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। বোঝাল সে পাহাড়ের ওপাশটা দেখে এসেছে। এবং তারপরেই সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। মার্শালের হাতের বন্দুকটা ব্রাউনের দিকে তাক করা। অর্জুন দ্রুত মাঝখানে চলে এসে বন্দুক নাড়তে লাগল। মার্শাল স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ব্রাউনের পরিচয়। সে এখানে ওর উপস্থিতি মোটেই পছন্দ করেনি। শেষ পর্যন্ত ঘাড় শক্ত করে মেনে নিল, নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ অর্জুনের মাথায় অন্য মতলব এল। সে মার্শালকে দাঁড়াতে বলে ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে এল সেই পাথরটার কাছে যেখান থেকে যন্ত্রটাকে দেখা যায়। ইশারায় ব্রাউনকে সেখানেই লুকিয়ে যন্ত্রটার ওপর নজর রাখতে বলল সে। ব্রাউনের মোটেই ইচ্ছে ছিল না একা থাকার কিন্তু মার্শালের বন্দুক উচিয়ে তোলা দেখার পর আর সে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছিল না।

অর্জুন ফিরে এসে মার্শালকে দেখতে পেল না। সে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে শুরু করল। নিশ্বাসের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ একঝাঁক ছোট মাছকে সামনে দিয়ে যেতে দেখল সে। মাছগুলো যেন তাকে লক্ষ করেছে। ডান দিকে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের ভেতর ঢুকে গেল। অর্জুন আরও একটু এগোতেই নিচু হতে বাধ্য হল। পাগলা কুকুর তাড়া করলে যেভাবে মানুষ ছোট্টে সেইভাবে মাছগুলো ছোট্টে বেরিয়ে এসে ছত্রাকার হয়ে যে-যার মতো চলে গেল। এবং যেখানে তারা ঢুকেছিল এবং বেরিয়ে এসেছিল সেখান দিয়ে খুব জোর একটি মানুষ যাওয়া-আসা করতে পারে। কাগজের লাইন দুটো মনে পড়ল। সুডঙ্গটা তার তলায়, ঢুকবে একটা মানুষ। অর্জুন উত্তেজিত হল। তা ৪৫২

হলে কি এই পথটার কথাই কাগজে লেখা রয়েছে ! মাছগুলো যদি ওদিকে না যেত তা হলে সে হয়তো লক্ষ্যই করত না । অর্জুন সুড়ঙ্গের মুখটায় চলে আসতেই কাঁচা দাগ দেখতে পেল । বছরের পর বছর সেখানে জলজ উদ্ভিদ অথবা শ্যাওলা জমা হচ্ছিল, সেখানে যেন কারও হাত-পায়ের স্পর্শ পড়েছে । নইলে শ্যাওলাগুলো যেমন ঘষটে গেল কী করে ? চিন্তিত হল সে । খুব সাবধানে সুড়ঙ্গের ভেতর শরীরটা গলিয়ে দিল অর্জুন । সুড়ঙ্গটা সোজা নয় যে, সামনের কিছু দেখতে পাবে । বন্দুকটাতে উচিয়ে রাখল হাঁটার সময় । দু' পা দূরের বাঁকের আড়ালে কী রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না । কিন্তু মার্শালের দেওয়া এই বন্দুকের যা ক্ষমতা তাতে এখানে এই বন্ধ জায়গায় ট্রিগার টিপলে পাহাড়টার কিছু অংশ মাথার ওপর খসে পড়তে পারে । তবু আক্রমণকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে তা ছাড়া অন্য উপায় নেই । অন্তত কুড়ি পা এ-বাঁক ও-বাঁক করে হলঘরের মতো একটা জায়গায় পৌঁছতেই অর্জুন মার্শালকে দেখতে পেল । ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে মার্শাল এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে । তার বন্দুকটি শক্ত হাতে ধরা । জলের শব্দে চকিতে পেছনে ঘুরল মার্শাল । তারপর বন্দুক নামাল । নামিয়ে ইশারা করল ; এর পর কী ? এরপরে কী করতে হবে তা অর্জুনেরও জানা নেই । কাগজে কিছু লেখা ছিল না । যিনি লিখেছেন, তিনি সুড়ঙ্গ পথটা বাতলে দিয়ে আগন্তুকের বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন হয়তো । অর্জুন ইশারায় জানাল সে কিছু জানে না ।

ভেতরটা অনেক বেশি পরিষ্কার । খোলা সমুদ্রের কাদা-পলি যেহেতু এখানে আসতে পারে না তাই একটা ঝকঝকে ভাব চারধারে । কিন্তু এইরকম বন্ধ জায়গায় তো গভীর অন্ধকার হবার কথা । অর্জুন ওপরের দিকে তাকালো । কেমন সাদাটে দেখাচ্ছে । ওপর থেকে কি আলো আসার কোনও পথ আছে ? ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে ডুবোপাহাড়ের পেটের ভেতরে । অতএব আলো আসবে কী করে ? অর্জুন ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করল । আর তখনই মনে হল মাছগুলোর পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি । ওরা নিশ্চয়ই মার্শালকে দেখে ভয় পেয়েছিল ।

অনেকটা ওপরে ওঠে আসার পর অর্জুন থমকে দাঁড়াল পাহাড়ের খাঁজে পা রেখে । যেখান থেকে আলোটা আসছিল সেই জায়গায় যেন কিছুই আড়াল পড়েছে । একটা বিপদের গন্ধ পেল সে । আলোটা কি কৃত্রিম ? তাদের আগেই কি কেউ এই গুহাটাকে খুঁজে বের করে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছিল ? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল অর্জুন । সে নিজের শরীরটাকে পাহাড়ের খাঁজের ভেতর মিশিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়াল । শেষ পর্যন্ত অন্ধকার নেমে এল চারধারে । এক হাতের মধ্যে জলের ভেতর কী আছে দেখা যাচ্ছে না । নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ যেন কানে আসছে এখন । নীচে মার্শাল এখন কী করছে ঈশ্বর জানেন । ইঠাৎ অর্জুনের মনে হল কেউ যদি এই গুহার মুখে নীল বিষ-গ্যাস

চুকিয়ে দেয় তা হলে ?

সে এবার বোকামিটা বুঝতে পারল। যদি শরীরের চামড়ার ক্ষতি করে তা হলে আলাদা কথা কিন্তু অক্সিজেন-মাস্ক যতক্ষণ নাকে আছে ততক্ষণ তো ওটা নিশ্বাস বন্ধ করতে পারবে না। তা ছাড়া জলের ভেতর একমাত্র সামুদ্রিক প্রাণী ছাড়া ওই বিশেষ দমবন্ধ হয়ে মরার আশঙ্কার কারও নেই। তা হলে যন্ত্রটা থেকে নীল বিষ-গ্যাস ছাড়ল কেন ?

প্রায় মিনিট-তিনেক এভাবে কেটে যাওয়ার পর প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল চারধারে। অর্জুনের পায়ের তলার পাহাড় কেঁপে উঠল। পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিল সে। ওপরের ছাদের কাছে কোনও কিছু এমন আঘাত করেছে যে, টুকরো পাথর আর বালি খসে পড়তে লাগল। অর্জুন অনুমান করল মার্শাল তাঁর বন্দুকের ট্রিগার টিপেছেন। অঙ্ককারকে ভয় পেয়ে না তাকে লক্ষ্য করে সেটাই বুঝতে পারছে না সে। যাই হোক না কেন এখনই বেরিয়ে আসার চিন্তাটা ত্যাগ করা উচিত। তা ছাড়া বেরিয়ে কোথায় যাবে সে ? এই কালো অঙ্ককারে গুহার সেই মুখটাই খুঁজে পাবে না যেখান দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। অর্জুনের মনে পড়ল অক্সিজেন সিলিন্ডারটার কথা। আর কতক্ষণ সে নিশ্বাস নিতে পারবে জানা নেই। যদি আচমকা অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় তা হলে চিরকালের জন্যে ওই পাহাড়ের পেটে পড়ে থাকতে হবে। নিজের হঠকারিতার জন্যে কাউকে দায়ী করার কোনও মানে হয় না। আর এই সময় হঠাৎই একটা আলো নীচ থেকে ওপরে উঠে এল। কেউ টর্চ জ্বালালে এইভাবেই আলো পড়ে। আলোটা একাধিক হল। ওটা পড়ছে ওপরের ছাদে। যেন কিছু লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে। অর্জুন মাথা উঁচু করে তাকাল। ছাদের পাথরের অনেকটা চাঙড় নেই। এবং সেখানে কিছু ছেঁড়া রবারের তার বুলছে। তার মানে এখানে আগেই মানুষ এসেছে। মার্শালের কাছে টর্চ ছিল না। নীচ থেকে যারা টর্চ জ্বালছে তারা অবশ্যই অন্য লোক। মার্শালের কী হল ? অর্জুন নীচ থেকে একটা আলোকে ওপরে উঠে আসতে দেখল। ক্রমশ আলোটা এগিয়ে এসে তাকে ছাড়িয়ে ছাদের দিকে চলে গেল। অর্জুন বুঝল লোকটা মেরামতির চেষ্টা করছে। অর্থাৎ তারগুলো এরা ছেঁড়েনি। যে আলোড়ন হয়েছিল, ছাদের যে চাঙড় খসে পড়েছিল, তা নিশ্চয়ই মার্শালের বন্দুক ছোঁড়ার কারণেই ঘটেছিল। এখানে ঢোকান পর ওপর থেকে যে আলো সে ছড়াতে দেখেছে তা নিশ্চয়ই কৃত্রিম আলো এবং এখন যারা সারাচ্ছে তাদেরই তৈরি করা। অর্জুন দেখল নীচ থেকে এখন একটা আলো ওপরে উঠে আসছে। তাদের অনেক আগেই এই সুড়ঙ্গ এবং পাহাড়ের পেটের গর্ত আবিষ্কৃত হয়েছে আর যারা সেটা করেছে তারা বেশ তৈরি হয়ে এসেছে। প্রোফেসর হ্যাচ। এই হাঙর-মার্ক যন্ত্রটিও নিশ্চয়ই প্রোফেসরের তৈরি। শত্রুপক্ষ অনেক বেশি চতুর এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারে পারদর্শী।

অর্জুন দেখল, ওপরে যে লোকটা মেরামত করছিল, সে নেমে আসছে। তীব্র আলো যা ওর টর্চ থেকে বের হচ্ছিল অর্জুনের শরীরের প্রান্ত ছুঁয়ে নীচে নেমে গেল। এবার নীচে দুটো টর্চের আলো। সম্ভবত লোকটা তারগুলো জুড়তে পারেনি অথবা আলোর যন্ত্রটা এমন বিকল হয়ে গিয়েছে যে, ওখানে পৌঁছে সারানো অসম্ভব। অর্জুন মুখ নামিয়ে ওদের দেখছিল। শরীর বোঝা যাচ্ছে না টর্চের আলোর ঔজ্জ্বল্যে। এবং ওদের একজনের আলো যখন ঘুরে মার্শালের শায়িত শরীরের ওপর পড়ল তখন সে কঁপে উঠল। মার্শালের শরীর নিশ্চল। একটা হাত এসে ওর গ্যাস-মুখোশ খুলে নিল একটানে। এবার কিছুটা ঘোলাটে হলেই মার্শালের মুখটা দেখতে পেল সে। মার্শাল মৃত। লোক দুটো আলো নিয়ে সরে সরে যেতে লাগল। গুহাটায় আবার অন্ধকার নেমে আসছে। অর্জুন বুঝতে পারছিল ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন এইখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে সাবধানে নীচে নামতে লাগল। যারা বেরিয়ে যাচ্ছে তারা কোনও ফাঁদ পেতেছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। ওরা কি দুজনকেই এখানে ঢুকতে দেখেছিল? তা দেখে থাকলে ওরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। তা ছাড়া একটি মৃতদেহের সঙ্গে জলের ভেতরে কাটানো অর্জুনের শরীরে কাটা দিল। নীচে নেমে এসে ও একমুহূর্ত দাঁড়াল। এখন চারপাশ ঘুটঘুট অন্ধকারে ঢাকা। অর্থাৎ হয় ওরা সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে নয় ওর জন্যে ওত পেতে রয়েছে। অর্জুনের হঠাৎ নিশ্বাস নিতে অসুবিধে শুরু হল। তবে কি অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছে। সে সুড়ঙ্গের মুখটা আন্দাজ করে এগিয়ে চলল দ্রুত। যেন অনন্তকাল চলা, সুড়ঙ্গটা শেষ হচ্ছেই না। অর্জুনের বুকে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। যেন একটা লোহার বল চেপে বসেছে সেখানে। তার চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে আসছিল। কোনও মতে বাইরে এসে শেষ শক্তি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইল। সিলিন্ডারের অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান হারাবার আগে অর্জুনের চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেল।

ধীরে-ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে দুলতে দুলতে অর্জুনের মনে হল সে জলের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। এবং তখনই শরীর গুলিয়ে উঠল। পেটের নাড়িভুঁড়ি পাকিয়ে উঠে মুখ থেকে একরাশ জলীয় পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে এল। অর্জুন চোখ মেলল।

ঝাপসা-ঝাপসা মুখগুলো তাকে দেখছে। এসব কাদের মুখ! হঠাৎ মুখে মাথায় গরম একটা ভাপ লাগল। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। খুব আরাম হচ্ছে, এই ভাপ পেয়ে। দ্রুত শরীরে শক্তি ফিরে আসছে। কেউ একজন জোর করে তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে কিছু গলিয়ে দিল। জিভ গলা বেয়ে সেটা শরীরে নামছে। ওয়ুধ? শরীরটাকে গরম করতে-করতে নামছে তরল পদার্থটা। অর্জুন বুকভরে নিশ্বাস দিল। বুকে এখনও টনটনে ব্যথা। অর্জুন আবার

ঘুমিয়ে পড়ল ।

কতটা সময় কেটে গেছে অর্জুনের খেয়াল নেই । যখন চেতনা এল তখনই তার শরীর কঁকড়ে উঠল । যেন মাথার পাশে একটা রাগী সাপ ফোঁস-ফোঁস শব্দ তুলে যাচ্ছে । ঝট করে সে উঠে বসতেই ঝুড়টাকে দেখতে পেল । শব্দটা আসছে ওই ঝুড়ি থেকেই । সে মুখ তুলে তাঁবু দেখতে পেল । এখন কি বাইরে রাত নেমেছে ? নইলে তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বলছে কী করে ? সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই বসে পড়তে বাধ্য হল । তার পায়ে একটা লোহার চেন বাঁধা । চেনটার অন্য প্রান্ত একটা বড় বাজের সঙ্গে জোড়া । সে কোথায় এখন ? শেষ যে ছবিটা মনে আসছে তা হল জলের ভেতরে তার বুকে অসম্ভব যন্ত্রণা এবং সমুদ্রের ওপরের আকাশটা কিছুতেই দৃশ্যমান হচ্ছিল না । আর যাই হোক, সে মার্শালসাহেবের ক্যাম্পে নেই এখন । তখনই তার চোখের সামনে মার্শালের মৃতদেহ ভেসে উঠল । লোকটা কি অসহায় হয়ে পড়েছিল গুহার ভেতরে । কিন্তু তার তো মারা যাওয়া অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা ছিল । কেউ নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করেছে । কে ? সেই লোক দুটো ? যারা মার্শালকে মেরেছে ? এই সময় সাপটা এমন জোরে ঝুড়ির ঢাকনায় ছোবল মারল যে, সেটা কঁপে উঠল । আর আপনাআপনি একসটা ভয়াব্র চিৎকার ছিটকে বের হল অর্জুনের গলা থেকে । শরীর গুলিয়ে উঠল, তার কি জ্বর হয়েছে ?

এই সময় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল । লম্বা রোগা, মাথায় বারান্দাটুপি, মুখে পাইপ একটা লোক এসে দাঁড়াল তাঁবুর দরজায়, “সো ইউ আর অলরাইট ?”

লোকটা হাসল, “আমাকে ধন্যবাদ দাও তোমাকে জল থেকে তুলে আনার জন্যে । ইংল্যান্ডের সামুদ্রিক প্রাণীগুলো একটা এশীয়কে খাওয়ার স্বাদ থেকে অবশ্য বঞ্চিত হল তার কারণে ।”

অর্জুন লোকটাকে চিনতে পারল, তবু জিজ্ঞেস করল সে, “আপনি কে ?”

“তোমার উদ্ধারকর্তা । তুমি কি একটু কৃতজ্ঞ বোধ করছ ?”

“নিশ্চয়ই ।”

“বাঃ, খুব ভাল । কাগজটায় কী লেখা ছিল তা এবার মনে করে বলো ।”

“কোন কাগজ ?”

লোকটা, অর্জুন বুঝে নিয়েছে, ইনিই প্রোফেসর হ্যাচ, গভীর মুখে সাপের ঝুড়ির সামনে এগিয়ে গেলেন । দুবার মৃদু শিশ দিলেন । সঙ্গে-সঙ্গে সাপটা তার ফোঁসাফোঁসানি বন্ধ করল । ঝুড়িতে হাত রেখে প্রোফেসর অর্জুনের দিকে না তাকিয়ে বললেন, “দেখা গেল এই রাগী সাপটাও কী রকম বাধ্য । অবাধ্যতা আমি সহ্য করতে পারি না । এ সাপ কেবলমাত্র আমার প্রতিই অনুগত । একে ঝুড়ি থেকে বের করে তোমার কোলের ওপরে ফেলে দিলে কীরকম বোধ করবে ? এত বড় একটা সমুদ্রে তোমার শরীর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে কি

মনে হয় না তোমার ?”

“আমাকে মেরে ফেলার জন্যে নিশ্চয়ই আপনি উদ্ধার করেননি ?”

“ভুল। তোমাকে উদ্ধার করেছি প্রয়োজনে, সেটা না মিটলে তোমাকে আর কী দরকার ? যখন তোমার জ্ঞানহীন শরীরটাকে এখানে আনা হচ্ছিল, তখন আমার একজন কর্মচারী তোমায় দেখে ঠিক এই সাপটার মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বেচারাকে তুমি এমন নাজেহাল করেছিলে যে, আমার কাছে প্রচণ্ড শাস্তি পেয়েছিল। সে বদলা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তুমি অজ্ঞান ছিলে তাই আমি তাকে নিবৃত্ত করেছিলুম। কাগজে কী লেখা ছিল ?”

প্রোফেসর হ্যাচ এবার অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

“আপনি যখন ওই সুড়ঙ্গ এবং গুহার মধ্যে যেতে পেরেছেন তখন মনে হচ্ছে কিছুই আপনার অজানা নেই। তা হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?”

“তোমার মনে হওয়ার সঙ্গে বাস্তবের মিল নাও থাকতে পারে খোকা। গত দু' বছর ধরে আমি আমার সর্বস্ব ব্যয় করে যাচ্ছি ওটি অনুসন্ধানের জন্যে। কারণ আমি মনে করি ওই সম্পদের অংশ আমার আছে। মার্শাল মুখটা কী মনে করত নিজেকে, তা সেই জানত। সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এখানে বসল মুক্তো চাষ করতে। জীবনে যে একটা মুক্তো হাতে নিয়ে দেখেনি সে করবে মুক্তো চাষ। আর এই সমুদ্রের জলে মুক্তোর চাষ হয় ? এত জায়গা থাকতে ও এখানটা বেছে নেওয়াতে আমার সুবিধে হল। ওর কাছে খবর ছিল সম্পদটা এখানকার সমুদ্রেই লুকানো আছে। মুক্তো চাষের নাম করে ও সাবমেরিনে চেপে অঙ্কের মতো সমুদ্র হাতড়াত। চিরদিনই মাথা মোটা ছিল ওর। কিন্তু আমার সুবিধে করে দিল।”

“কী করে ?”

“প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার স্বভাবে পড়ে না খোকা।”

“আপনি ওই সাপটাকে পুষেছেন কেন ?”

“বড্ড বেয়াড়া তো তুমি !” প্রোফেসর হাসলেন। একটা হাত ঝুড়ির ওপর রেখে নিজের মনেই বললেন, “সাপ আমার বড় প্রিয়। নিরীহ, চুপচাপ সাপ নয়, রাগীগুলো। ওদের ফোঁসফোঁসানি না শুনতে পেলে আমার নার্ভ উত্তেজিত হয় না।”

“মার্শালকে মারলেন কেন ?”

“প্রশ্ন কোরো না। জুতোর গর্তে তুমি কাগজ পেয়েছিলে। সেই কাগজ দেখে লকারের চাবি। ব্যাঙ্ক খুব অন্যায় করেছে তোমাদের লকারের ভেতরের কাগজটা দেখিয়ে। সেই ম্যানেজারটাকে সাসপেন্ড করিয়েছি, কারণ লোকটা আমাকে কাগজ দেখাতে চায়নি। অথচ সেই কাগজ দেখার অধিকার আমারই সবচেয়ে বেশি। কারণ যে ওই সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে

আমি কাজ করেছিলাম।” প্রোফেসর এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। আচমকা বুড়িতে আঘাত করামাত্র ভেতরের সাপটা তীব্র শব্দ তুলল।

“কাগজে কী লেখা ছিল?”

“আপনি গুহাটাকে ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?” অর্জুন ইচ্ছে করে সময় নিচ্ছিল।

“তন্নতন্ন করে। কোথাও বাস্কট পাইনি।”

“কিসের বাস্কট?”

“কাঠের বাস্কের ওপরে টিনের পাত মোড়া। জলে পচে যেতে অনেক সময় লাগবে। হিরেগুলো আছে তার মধ্যে।”

“কোথাকার হিরে?” অর্জুন বুঝতে পারছিল জ্বর আসছে শরীর কাঁপিয়ে।

“ওঃ, তুমি আমাকে প্রশ্ন করেই যাচ্ছ।” প্রোফেসর এগিয়ে এলেন দ্রুত পায়ের। পকেট থেকে একটা সরু কাঁটাওয়ালা গ্লাভস্ বের করলেন। অর্জুন দেখল গ্লাভসটার আঙুলের ওপরে বড় জোর সিকি ইঞ্চি ধারালো কাঁটা। সেটা পরে নিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কাগজে কী লেখা ছিল?”

অর্জুন মাথাটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কী করে জানলেন যে, কাগজে যা লেখা ছিল তা আমিই জানি।”

“মার্শালের ক্যাম্পের সব খবর আমার কাছে আসত।”

অর্জুনের মনে হল এখন এই পরিস্থিতিতে কাগজে যা লেখা ছিল তার কোনও গুরুত্ব নেই। প্রোফেসর তো নিজেই সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। সে লাইনগুলো পর পর বলে গেল। সুড়ঙ্গটা তার তলায়, ঢুকবে একটা মানুষ, অর্জুন এখানেই থামতে প্রোফেসর উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তারপর?”

“আর কিছু লেখা ছিল না।” অর্জুন মাথা নাড়ল। এখন আর কথা বলতে শরীর চাইছিল না।

“তুমি মিথ্যে কথা বলছ।” হঠাৎ প্রোফেসরের হাত অর্জুনের মুখের ওপর নেমে এল। তিনি আঘাত করলেন না, শুধু হাতের উলটো পিঠটা চেপে ধরলেন। অর্জুন মুখ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলে বললেন, “কোনও লাভ হবে না। এখন আদর করছি, মুখ সরাতে চেষ্টা করলে আঘাত করব। কাগজে আর কী লেখা ছিল?”

“বিশ্বাস করুন আর কিছু ছিল না।” অর্জুন ফ্যাকাসে গলায় বলল।

“কাগজটা যে ভদ্রমহিলা কপি করে এনেছিলেন তিনি ঠিকঠাক কাজটা করেছিলেন?”

“মনে হয়। যদিও জিজ্ঞেস করিনি।”

তা হলে গুহার ভেতরে গিয়ে কী খুঁজছিলে?”

“চেষ্টা করেছিলাম যদি কিছু খুঁজে বের করা যায়।” অর্জুন নিজের শক্তি

ফিরে পেতে চাইছিল।

প্রোফেসর আর দাঁড়ালেন না। ঝড়ের মতো তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর অর্জুনের মনে হল প্রোফেসরের কাছে তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল। নিজের স্বার্থেই লোকটা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, জল থেকে উদ্ধার করেছিল। এখন তাকে মেরে ফেলতে একটুও অসুবিধে নেই। প্রচণ্ড হতাশা ওকে ঘিরে ধরল। অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক না হয়ে জলে নামা খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল। মার্শালও তো তার সঙ্গেই জলের ভিতর ছিল। উদ্বেজনা তারও কি সময় হিসাব করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল?

কিন্তু এভাবে অসহায়ের মতো মরা চলবে না। হঠাৎ ওর মেজর আর ব্রাউনের কথা মনে পড়ল? ওরা কি তাকে খোঁজার চেষ্টা করছে না?

অর্জুন সাপের ঝুড়িটার দিকে তাকাল। ঝুড়িটা তার নাগালের মধ্যে। কিন্তু ওটা দিয়ে সে কী করতে পারে? ঢাকনা খুলে দিলে সাপটা নিশ্চয়ই তাকে কামড়াবে। সে চারপাশে তাকাল। তারপর ঝুঁকে একটা বড় কাঠের টুকরো তুলে নিল। কানের কাছে অনবরত ফোঁসফোঁসানি—শুধু মৃত্যুচিন্তা ডেকে আনে। সাপটাকে ছেড়ে দিলে যদি কামড়াতে আসে তা হলে এই কাঠ দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করবে কিন্তু ওই রাগী শব্দ শুনতে আর রাজি নয়। অর্জুন চার ফুট লম্বা কাঠের ফালিটা দিয়ে ধীরে-ধীরে ঝুড়ির আংটাটা খুলে ফেলল। সাপটার গর্জন আরও বেড়েছে। এক ঝটকায় ঝুড়িটার ডালা খুলে ফেলে সেটাকে বিপরীত দিকে ঠেলে দিল সে যতটা পারে। প্রায় স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে নামল সাপটা। মাটিতে পড়েই একেবারে লেজের ওপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ফণা মেলে দুলতে লাগল। সাপটা যদি ওখান থেকেই ছোবল মারে তা হলে অর্জুনের শরীর পেয়ে যাবে। কাঠটাকে শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরে রইল অর্জুন। যত দ্রুত গতিতেই সাপটা ছোবল মারুক সে ওকে আঘাত করবেই। আর এই সময় তাঁবুর বাইরে একটা গলা শোনা গেল, “ও কে বস্। ইটস মাই প্লেজার।”

শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র অর্জুন দেখল সাপটা ফণা নামিয়ে নিচ্ছে। দ্রুত শরীরটা নীচে নামিয়ে ডান দিকে চলে গেল। একটা বড় কাঠের বাজের ওপাশে গিয়ে সেটা আশ্রয় নিল। আর তখনই লোকটা ঢুকল। অর্জুন ওকে চিনতে পারল। সমুদ্রের ধারে একেই সে বেইজ্জত করেছিল। তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটা হলদে দাঁত বের করে বলল, “এবার তোমাকে পেয়েছি বাছাখন। বস্ বলেছে তোমাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। নাউ ডিসাইড ইওরসেল্ফ, তুমি কীভাবে মরতে চাও।”

অর্জুন লোকটাকে দেখল। কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বেস্তের সঙ্গে একগোছা চাবি রিঙে ঝুলছে। ওই চাবিগুলোর একটাতে কি তার পায়ের তাল্লা খুলবে? সে হাসতে চেষ্টা করল, “এ বিষয়ে কথা বলা দরকার। তোমার হাতে

সময় আছে ?”

লোকটা অবাক হল, “বাঃ, তোমার নার্ভ আছে দেখছি।” সে তাঁবুর ভেতর ঢুকে একটা বাস্‌ টেনে নিয়ে দু’ পা ফাঁক করে বসল, “কী কথা বলবে ?”

“আমাকে ছেড়ে দেওয়া যায় ?”

“এক লক্ষ পাউন্ড দিলেও না।” লোকটা হাসল।

অর্জুন দেখল লোকটা সেই বাস্‌টা টানেনি যেটার পেছনে সাপটা লুকিয়েছে। আর হত্যা করার সুযোগ পেয়েও এমন আনন্দিত যে, পাশেই সাপহীন বুড়িটা যে পড়ে আছে তা লক্ষ্যই করছে না। লোকটা বলল, “গুলি করব না, তাতে যন্ত্রণা পাবে না। তোমার হাতের একটা নার্ভ কেটে দেব। রক্ত বের হবে আর তুমি একটু একটু করে মারা যাবে। তোমার হাতে ওটা কী ? কাঠের টুকরো ? কী করবে ওটা দিয়ে ? হা হা হা।”

অর্জুনের খুব রাগ হয়ে গেল। সে কাঠের টুকরোটাকে সেই বাস্‌টার দিকে ছুঁড়ে দিল যেটার কাছে সাপটা আশ্রয় নিয়েছে। লোকটা বলল, “বাস্ ! ওই বাস্‌টার ওপর এত রাগ কেন তোমার ?” বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল।

দু’পা পিছিয়ে বাস্‌টার পাশে ঝুঁকে কাঠটা কুড়িয়ে নিতে গিয়েই আঁতকে উঠল। অর্জুন দেখল লোকটার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। প্রচণ্ড ভয়ে সে ছিটকে আসতে চেষ্টা করল অর্জুনের দিকে। কিন্তু তার আগেই রাগী সাপটা ছোবল মেরেছে তাকে, পর পর দু’বার। লোকটা মুখ হাঁ করল। কিন্তু চিৎকার করার সুযোগ পেল না। সাপটা তখন দ্রুতবেগে ছুটে গেল তাঁবুর দরজার দিকে। অর্জুন দেখল লোকটা তার এক ফুট দূরে পড়ে আছে নিঃশাড়ে। এটা কী সাপ ? ওর বিষ এত দ্রুত কাজ করল ? বিস্ময়িত চোখে অর্জুন দেখল প্রথম ছোবল পড়েছে লোকটার কানের নীচে। এতক্ষণ যে তর্জনগর্জন করেছিল সে এখন নিঃশাড়।

মিনিট-দুয়েকের মধ্যে অর্জুন তাঁবুর দরজায় চলে এল। শরীরে এখনও রক্ত-চলাচল স্বাভাবিক নয়। একটু ঘোর লাগছে হাঁটার সময়। কিন্তু লোকটার কোমর থেকে খুলে নেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র তাকে নবীন শক্তি জোগাচ্ছে। এটা সেই খাঁড়ি। দু’পাশে বুনো ঝোপঝাড়। তাঁবুগুলো এমনভাবে সেই সব ঝোপকে আশ্রয় করে পাতা হয়েছে যাতে বাইরে থেকে চট করে বোঝা যাবে না। অর্জুন সাপটার জন্যে চোখ বোলাল। সাধারণত ছোবল মারার পর ওরা কিছুটা নিস্তেজ হয়। কিন্তু ওই ঝোপঝাড়ে আশ্রয় পেতে ওর অসুবিধে হবে না।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই অর্জুন ওদের দেখল। প্রোফেসর হ্যাচ চারজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। তাদের মধ্যে সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি রয়েছে যাকে প্রোফেসরের সঙ্গে সুপার মার্কেটে দেখতে পেয়েছিল। ওদের কাছে ধরা না দিয়ে এপাশ দিয়ে যাওয়া যাবে না। অর্জুন বিপরীত দিকে তাকাল। সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে। এখন যদি লুকিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে

মার্শালের ক্যাম্পে পৌঁছনো যায়, সেই চেষ্টাই করা উচিত। পাঁচজন লোকের সঙ্গে তার একার পক্ষে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অর্জুন পিছু হটতে লাগল আর এইসময় কুকুরের চিংকার শুরু হয়ে গেল। সেই কুকুর যাদের চেনে বেঁধে প্রহরীরা পাহারায় বেরোয়। অর্জুন পড়ি কি মরি করে দৌড়ল। পেছনেও পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে তবে সেটা খুব হালকা। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল একটা রাগী চেহারার কুকুর দূরত্ব কমাচ্ছে। যেভাবে ছুটন্ত ইঁদুরের পেছনে লাফাবার সময় বেড়ালের মুখে ফুটে ওঠে জেদ ঠিক সেইভাবে ও এগিয়ে আসছে। এখন সামনে জল, পেছনে জঙ্গল আর রাগী কুকুর। যে গতিতে দৌড়েছিল প্রায় সেই গতিতেই অর্জুন জলের ভেতরে নেমে গেল। বুক পর্যন্ত যাওয়ার পর তার খেয়াল হল সে বেশিক্ষণ সাঁতরাতে পারবে না। এটা দ্বীপের সেইদিক, যেখানে বড় পাথর থাকায় মোটরবোট পর্যন্ত তীরে ভিড়তে পারে না। অর্জুন একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে যাওয়া মাত্র মানুষের গলা শুনতে পেল। কুকুরের আচরণ অনুসরণ করে প্রোফেসরের লোকজন পৌঁছে গিয়েছে। অর্জুনের শরীরের নিম্নাংশ জলের তলায়। কনকনে টেউ এসে পড়ছে সেখানে। দুই হাতে পাথর আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। পায়ের ওজন যার ওপরে সেখানেও শ্যাওলা। কুকুরের ডাক মাঝে-মাঝে এপাশ-ওপাশ ছুটে যাচ্ছে। মুখ বের করে দেখার সাহস অর্জুনের হচ্ছিল না। মিনিট দু-তিন পরে হঠাৎ পেছনে সমুদ্রের ওপরে ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল সে। আর সেটা শোনামাত্র কুকুরগুলোকে শাস্ত করতে অনেক শিস বাজতে লাগল। অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে অনন্ত জলরাশির ওপর একটা ছোট লঞ্চকে এগিয়ে আসতে দেখল। ওটা আসছে দ্বীপেই। কিন্তু এই তীরে নয়। ক্রমশ ডানদিক দিয়ে ঘুরে গেল লঞ্চটা। আর ওপাশের তীরের হই-হট্টগোল এখন একদম থেমে গেল।

দশ মিনিট পরে, যখন কোমর থেকে পা পর্যন্ত প্রায় অসাড় তখন অর্জুন পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। টলতে টলতে জল ভেঙে শুকনো ডাঙায় পা দিয়ে সে অসহায় চোখে চারপাশে তাকাল। কেউ কোথাও আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওই লঞ্চটা দেখে কি প্রোফেসর হ্যাচের লোকজন নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে? লঞ্চটা কার? অর্জুন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

উত্তেজনা এবং দীর্ঘসময় অনাহারে অর্জুনের পেটে ব্যথা শুরু হল। সে বালির ওপর বসে রইল কিছুক্ষণ। ব্যথা সামান্য কমতে ও যে-পথ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই পথে এগোল। ভেজা জামা-প্যান্ট আরও শীত তৈরি করছে হাওয়ার সঙ্গে মিশে। হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটাকে জল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল সে। সেটিকে নিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে এগোচ্ছিল।

হ্যাচের তাঁবুগুলো নেই। বোঝা যায় এখানে কেউ বা কারা তাঁবু গেড়ে কিছুদিন ছিল। কিন্তু মালপত্রসমেত সব-কিছু উধাও। খাড়ির পাশের

জঙ্গলটাকে ভাল করে দেখল সে । এবং তখনই কিছু ব্যবহার-করা মালপত্র সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেল । একটা আপেল জুসের টিন অটুট রয়ে গেছে সেখানে । ফেলে দেওয়ার সময় ওরা আর যাচাই করেনি প্রত্যেকটা । শুধু লোকচক্ষুর আড়ালে ফেলতে হবে বলেই জঙ্গলে ফেলা । বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অর্জুন টিনের মুখটা খুলতে পারল । অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সে ক্যানটাকে যখন খালি করল তখন পেট অনেকটা ভর্তি ।

প্রোফেসর হ্যাচ সদলে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছেন । কিন্তু কোথায় ? মানুষটার যে চেহারা সে দেখেছে, তাতে গুপ্তধন উদ্ধার না করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পাত্র বলে মোটেই মনে হয় না । অর্জুন সমুদ্রের তীর ধরে এগোল । খানিকটা যেতেই সে সেই পথটা চিনতে পারল যেটা দিয়ে মার্শালের ক্যাম্প থেকে প্রথম দিন ব্রাউনের সঙ্গে এসেছিল । অর্জুন দৌড়তে চাইল । মিনিট-দুয়েকের মধ্যে সে লঞ্চটাকে দেখতে গেল । মার্শালসাহেবের ক্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে । ক্রমশ ওদের স্পষ্ট দেখতে পেল সে । মেজর একজন ইউনিফর্ম পরা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন । ব্রাউন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । লোকজন ক্যাম্প তুলে লঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে জিনিসপত্র । অর্জুনের মাথা টলছিল, দৃষ্টি মাঝে মাঝে অস্বচ্ছ হয়ে আসছে । খানিকটা ঘুরে জঙ্গল পেরিয়ে অর্জুন ডাকল, “মিস্টার ব্রাউন !”

প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে তাকাল ব্রাউন । তারপর বুকফাটানো চিৎকার করে ছুটে এসে দু’হাতে জড়িয়ে ধরল অর্জুনকে, “ও বেঁচে আছে, ও বেঁচে আছে, ও ভগবান !”

মেজর তাঁর ভারী শরীর নিয়ে ছুটে এলেন, “আহ্ কী আশ্চর্য, চেপেই ছেলেটাকে মেরে ফেলবে যে । ছেড়ে দাও, চব্বিশ ঘণ্টা কোথায় ছিল সেটা জানা দরকার ।”

কিন্তু ব্রাউন তাকে ছাড়তেই মেজর তাকে জড়িয়ে ধরলেন । অত বড় মানুষটার চোখে এখন জল, গলায় কান্না, “ও অর্জুন, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না ।”

“এখন তো আমি ঠিক আছি ।”

“না, মোটেই ঠিক নেই । তোমার শরীরে প্রচণ্ড টেম্পারেচার । জামা-প্যান্ট ভিজ়ে কেন !”

অর্জুন এতক্ষণে অস্বস্তিটাকে টের পেল । চোখ-মুখ গরম হয়ে গিয়েছে । দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে খুব । মেজর ওকে ধরে ধরে লঞ্চে নিয়ে গেলেন, “মার্শাল তো ফিরল না, কী হয়েছে জানো ?”

অর্জুন ফিসফিসিয়ে বলল, “তিনি আর ফিরবেন না ।”

মেজর একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন, “ওঃ । আমরা ওঁর তাঁবু, মালপত্র বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ।”

অর্জুনকে একটা ডেকচেয়ারে শুইয়ে দেওয়া হল। সেইসময় ইউনিফর্ম-পরা লোকটি উঠে এলেন ব্রাউনের সঙ্গে। ব্রাউন তাঁকে বোধ হয় অর্জুন সম্পর্কে বোঝাচ্ছিল। লোকটি প্রথমেই ভেজা পোশাকটা পালটাতে বললেন। শুকনো পোশাকে কঞ্চল মুড়ি দেবার পর অর্জুনের আরাম হল।

অফিসার জিগ্গেস করলেন, “আপনার কি কথা বলার মতো হচ্ছে আছে?”

অর্জুন হাসতে চেষ্টা করল, “বলুন।”

“ডুবো-পাহাড়ের নীচে কী ঘটেছিল?”

“সেটা অনেক বড় গল্প।”

“ও, মিস্টার মার্শাল কোথায়?”

“ডুবো পাহাড়ের নীচের গুহায় ওর মৃতদেহ পড়ে আছে।”

“হত্যাকারী কারা?”

“প্রোফেসর হ্যাচ আর তাঁর সঙ্গীরা।”

“গুপ্তধন কি ওরা পেয়েছে?”

“না। তবে নিশ্চয়ই আবার চেষ্টা করবে।”

“ঠিক আছে। এখন বিশ্রাম নিন। পরে অনেক কথা বলতে হবে।”

অফিসার উঠে গেলেন। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। জ্বরটা যেন ছুঁ করে বেড়ে যাচ্ছে। মেজর তার পাশে বসে রয়েছেন, ব্রাউন পায়ের কাছে। সে চোখ খুলল আবার। ব্রাউন বলল, “কী ভয়ানক লাল হয়েছে চোখ, ওষুধ যা আছে সঙ্গে...!”

মেজর বললেন, “কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা হাসপাতালে পৌঁছে যাব। ডাক্তারের কাজ ডাক্তাররাই করবে।”

অর্জুন বলল, “গুপ্তধনটা ডুবো পাহাড়ের নীচেই পড়ে রইল কিন্তু!”

মেজর বললেন, “হুম।”

“সেকেন্ডহ্যান্ড জুতোর গর্তে কাগজটা আমরাই খুঁজে পেয়েছিলাম।” অর্জুন বিড়বিড় করল।

মেজর বললেন, “ভুলে যাও ওসব কথা। ধরা যাক গুপ্তধন পেলাম আমরা। ব্রিটেনের ধনসম্পত্তি ব্রিটিশ সরকার আমাদের নিয়ে যেতে দিত? কক্ষনো না। ওরাই আমাদের দেশ থেকে সব মণিমুক্তো নিয়ে এসেছে, নিজেরটা কেন হাতছাড়া করবে। মিছিমিছি পরিশ্রম হত। বুঝলে? ভুলে যাও।”

কথাগুলো অর্জুনের কানে ভাল করে ঢুকছিল না। সে বলল, “ওগুলো পেলে গরিব মানুষের খুব উপকার হত। আমি জানি প্রোফেসর আবার চেষ্টা করবে কিন্তু কখনও খুঁজে পাবে না।”

“কী করে বুঝলে?” মেজর জানতে চাইলেন।

“ওরা অনেক দিন ধরে ডুবো পাহাড়টাকে খুঁজছে। যিনি ওটাকে লুকিয়ে

রেখেছেন তিনি শেষটা বলে যাননি । মনে হয় প্রোফেসর ওঁকে খুন করেছিলেন না জানতে পেরে । আর আপনার বন্ধু মার্শালও ওটার খোঁজে এখানে ছিলেন । মুজো চাষ ভাঁওতা । ”

মেজর মাথা নাড়লেন, “কারেক্ট । এই সন্দেহটা আমিও করেছিলাম । ”

অর্জুন হাঁ করে নিশ্বাস নিল, “কিন্তু আমি হেরে গেলাম । ”

এই প্রথম কথা বলল ব্রাউন, “মোটাই না । গুপ্তধন যত দামী হোক তোমার প্রাণের চেয়ে মূল্যবান নয় । আমরা সেটাকে ফিরে পেয়েছি । কী বলো মেজর ? ”

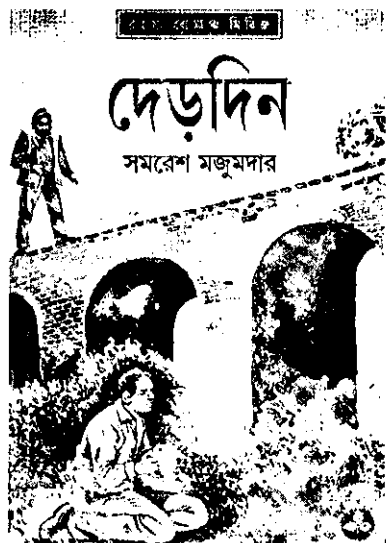
মেজর হঠাৎ উঠে ব্রাউনের হাত আঁকড়ে ধরলেন, “ক্ষমা করো । ”

ব্রাউন খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেন ? ”

“তুমি একটা সত্যিকারের মানুষ সেটা ওই কথায় প্রমাণ করলে, তাই । ”
মেজর গদগদ গলায় বললেন ।

বন্দর এগিয়ে আসছে । লঞ্চ সিটি বাজাল । অফিসার এগিয়ে এলেন, “আমি অয়ারলেসে কথা বলেছি । অ্যান্ডুলেন্স আসছে । ”

মেজর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তীব্রগতিতে একটা অ্যান্ডুলেন্স ছুটে আসছে বন্দরের দিকে । অর্জুনের বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “থ্যাক্স ইউ, অফিসার । ”



দেড়দিন

জিনসের প্যান্ট আর ব্যাগি শার্ট পরে সাইকেল চালাচ্ছিল অর্জুন। এখনও জলপাইগুড়িতে তেমন শীত পড়েনি। গরমটা নেই এই যা। এই সময় একটু বৃষ্টি হবার অপেক্ষা। তারপর কয়েক মাস ধরে হাড় কাঁপাবে। এখন হাওয়ায় একটা মিষ্টি আরাম। কদমতলার মোড়ে এই সকালে তেমন ভিড় নেই। বেলা বাড়লেই রিকশার দাপটে পথ চলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় এই তল্লাটে।

মোড়টা পার হতেই অর্জুন দেখল, জগুদা মর্নিং ওয়াক শেষ করে ফিরছেন। ছোটখাটো এই মানুষটি এই সেদিনও অর্জুনের জন্য চাকরির খুব চেষ্টা করেছিলেন। দেখতে পাওয়া মাত্রই জগুদা হাত তুললেন, “কোথায় চললে?”

“এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।” অর্জুন সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল।

“আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তখন তোমার চাকরি না হয়ে খুব ভাল হয়েছে। একবার একটা চাকরিতে ঢুকলে ভবিষ্যৎ বারোটা। চাকরিতে ঢুকলে তোমার ইউরোপ-আমেরিকায় যাওয়া হত না। ভাবতে পারা যায়, আমাদের মতো আর্থিক অবস্থার পরিবার থেকে তোমার মতো বয়সের কেউ ও দেশে বেড়াতে যাচ্ছে? একবার মালবাজারে চলে এসো।”

“আপনি কি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছেন?”

“না। শনি-রবিবার এখানে থাকি। একটা ইন্টারেস্টিং কেস হচ্ছে ওখানে।”

“কী রকম?” অর্জুন কৌতূহলী হল।

জগুদা আশেপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, “এসো, চা খাওয়া যাক।”

কদমতলার মোড়েই যে ভাঙাচোরা চায়ের দোকানে জগুদাকে অনেক দিন আড্ডা মারতে দেখেছে, অর্জুন সেখানেই গেল। সব চায়ের জল গরম হচ্ছে। বেষ্টিতে আরাম করে বসে জগুদা বললেন, “আমাদের ব্যান্ক-লোনের জন্যে রোজ একগাদা দরখাস্ত পড়ে। বাছাই করে জামিনদার রেখে উপযুক্ত লোককে আমরা ধার দিই। ব্যবসা করে তাদের সেই টাকা শোধ করে দেওয়ার কথা।

কিন্তু সস্তর ভাগ মানুষ পুরো টাকা শোধ দেয় না । ”

ঘটনাটা সবাই জানে । এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কেস কী আছে বুঝতে পারছিল না অর্জুন । সে নড়ে-চড়ে বসল । অমল সোমের কাছে যাওয়ার কথা আছে । কাল রাত্রে হাবুকে দিয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছেন ।

জগুদা বললেন, “এদের ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি । কিন্তু সম্প্রতি আর-এক ধরনের লোনের জন্যে মানুষ আসছে । তুমি হয়তো জানো, ব্যাঙ্কে সোনার গয়না রেখে লোন পাওয়া যায় । সুদ সমেত সেই টাকা শোধ করে দেওয়ামাত্র গয়না ফেরত দেওয়া হয় । তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে, এমন সব মানুষ গয়না রেখে লোনের জন্যে আসছে, তাদের দু’ বেলা পেট ভরে খাওয়ার অবস্থা নেই । লোকগুলো হঠাৎ গয়না পেল কী করে কে জানে ?”

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এই লোকগুলো কারা ?”

“কাছেপিঠের আদিবাসী মানুষ । ”

“চা-বাগানে কাজ করে ?”

“না, না । সেটাই বিস্ময়ের । চা-বাগানে যারা কাজ পায় না, ঝুপড়ি বেঁধে জঙ্গলে বা রাস্তার ধারে থাকে, ঠিকাদারদের কাছে কাজ করে, তারাই আসছে সোনার গয়না নিয়ে । আর ওই গয়নাগুলো সব এক ধরনের, আঙুলের রিং । খাঁটি সোনার । ”

“পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস অথবা জামিনদার আছে ?”

“দরকার নেই । তিন-চার ভরি সোনার গয়না থাকলে ব্যাঙ্ক কোনও প্রশ্ন করবে না । মজার কথা হল, যদি বেশি গয়না থাকত, তা হলে তার সোর্স নিয়ে পুলিশকে তদন্ত করতে বলা যেত । প্রশ্ন করলে বলে কয়েক পুরুষ ধরে নাকি ওরা ওই গয়না রেখেছিল । কিন্তু গত তিন মাসে দু’শো পঁচিশজন লোক তিন ভরি থেকে সাড়ে তিন ভরি করে গয়না বন্ধক রেখে পঁচাত্তর ভাগ টাকা ধার নিতে এল, এটা নিশ্চয়ই অভিনব ব্যাপার । তুমি কী বলো ?”

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে অদ্ভুত ধোঁয়াটে লাগল অর্জুনের । সে জিজ্ঞেস করল, “ঠিক কত ভরি সোনার গয়না আপনারা পেয়েছেন ?”

“টোটাল ছ’শো দশ ভরি । পাকা সোনা । আংটি কিংবা বালা । প্রায় দু’ কোটি টাকা । আমাদের ব্রাঞ্চের ক্ষমতা মাঝারি । অত ধার দেওয়ার ক্ষমতা নেই । আর ব্যক্তিগতভাবে সোনার পরিমাণ এত কম, কিছু করতেও পারা যাচ্ছে না । ”

“এত সোনা কী করে ওদের হাতে আসছে, অনুমান করছেন ?”

জগুদা মাথা নাড়লেন, “না । আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । লোকাল থানার ও. সি-কে বলেছিলাম । দু’-তিন ভরি সোনার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন না, যদি কেউ অভিযোগ না করে যে, সে ওই গয়না হারিয়েছে । ব্যাঙ্ক তো গয়না খাঁটি জেনেই খালাস । তাই তোমাকে বলেছিলাম, কেস খুব ৪৬৮

ইন্টারেস্টিং। পারলে চলে এসো মালবাজারে।”

চা খাওয়া হয়ে যেতে জগুদার কাছ থেকে বিদায় নিল অর্জুন। সত্যিই ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। কোনও মানুষ বোধহয় এইভাবে নিজের গোপন সোনার গয়না ব্যাঙ্কে রেখে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে চান, যা প্রকাশ করলে আয়কর দপ্তরের জেরার সামনে পড়তে হবে। এ অনেকটা কালো টাকাকে সাদা করে নেওয়া। কিন্তু তা-ই বা হবে কী করে? যার সঞ্চয়ে অত সোনা রয়েছে; যে বুদ্ধি খরচ করে নিঃস্ব লোকগুলোকে পাঠিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করে নিচ্ছে—সে ইচ্ছে করলে দেশের যে-কোনও কালোবাজারে বিক্রি করে পুরো টাকা পেত। লোকগুলোকে নিশ্চয়ই কিছু দিতে হচ্ছে কাজ করার জন্যে। তা ছাড়া ধার তো নিজের নামে পাচ্ছে না, তাই আয়কর দপ্তর থেকে নিস্তারও পাবে না। কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটা। সাইকেল চালিয়ে হাকিমপাড়ায় চলে এল অর্জুন।

এই সকালে বাগানে কাজ করছিলেন অমল সোম। গেট খোলার শব্দ পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অর্জুন লক্ষ করল, অমলদার পরনে ইস্ত্রি-ভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি। বেশ সৌখিন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার হাসছ যে?”

অমলদার সঙ্গে তরল কথা কখনও বলেনি অর্জুন। আজও বলতে বাধল। গভীর হয়ে বলল, “কিছু নয়। কাল রাত্রে হাবুর হাতে আপনার চিঠি পেলাম।”

“হ্যাঁ। তোমার হাতে এখন কোনও কেস আছে?”

“বাঃ, কেস থাকলে আপনি জানতে পারতেন না?” অর্জুনের গলায় একটু অভিমান।

“কী জানি। এখন তো তোমার নামডাক হয়েছে। আমার খুব ভালই লাগে। চা খাবে?”

“না। একটু আগে জগুদা খাওয়ালেন।”

“জগুদা?”

“কদমতলায় থাকেন। মালবাজারের ব্যাঙ্কে কাজ করেন।”

“তোমার হাতে যখন কোনও কেস নেই, তখন তুমি আমার একটা উপকার করতে পারো। দিল্লিতে আমার এক পুরনো ক্লায়েন্ট থাকেন। ভদ্রলোককে কোটিপতি বললে কম বলা হবে। লোকটি ভাল। কোনও সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর মেয়ে স্কুলের ওপরের দিকে পড়ে। সে তার তিন বন্ধুর সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে আসছে। সেই সঙ্গে ডুরার্সের ফরেস্টে দু’-তিন দিন থাকতে চায়। ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করেছেন, ওরা যে ক’ দিন উত্তর বাংলায় থাকবে, তত দিন যদি ওদের জন্যে একটি ভাল গাইডের ব্যবস্থা করি, যে ওদের নিরাপত্তার ভার নিতেও পারবে, তা হলে ভাল হয়। ওঁর বাসনা ছিল

আমি যদি কয়েকটা দিন ওদের সঙ্গে থাকি। তা আমি ভাবলাম, অল্পবয়সী মেয়েদের মানসিকতা বা স্বভাবের সঙ্গে আমার ধরনটা ঠিক মিলবে না। ওরাও একজন বয়স্ক মানুষকে সব সময় কাছে থাকতে দেখে অস্বস্তি বোধ করবে। তার চেয়ে তুমি যদি যাও, তা হলে খুব ভাল হয়। খরচের জন্যে ভেবো না। ওঁর মেয়ের নাম নন্দিনী। তার হাতে একটা আলাদা প্যাকেটে তোমার খরচের টাকা থাকবে।”

অমলদা কথা শেষ করা মাত্র হাবু চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। তার হাতে এক কাপ চা। অর্জুনকে দেখে জিভ বের করল সে। অর্জুন হাত নেড়ে নিষেধ করল। সে চা খাবে না। হাবু কথা বলতে পারে না। কানেও কম শোনে, কিন্তু ওর বোধশক্তি, বুদ্ধি, গায়ের জোর খুব। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওরা কবে আসছে?”

“আজই। বাগডোগরায় দিল্লি ফ্লাইটে। তুমি বেশি সময় পাবে না তৈরি হতে।”

অর্জুনের প্রস্তাবটা মোটেই ভাল লাগল না। কোনও থ্রিল বা রহস্য নেই। চারটে বড়লোকের মেয়েকে পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। মেয়ের বন্ধু যখন, তখন নিশ্চয়ই মেয়ে। মেয়েদের সঙ্গে থাকার কোনও মানেই হয় না। আর ওদের বাবা-মা কী করে কোনও গার্জেন ছাড়াই এত দূরে আসতে দিচ্ছে! অর্জুনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অমল সোম বললেন, “না, তোমার ওপর আমি কাজটা জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই না। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।”

অর্জুন নাড়া খেল। আজ পর্যন্ত সে কখনও কোনও অবস্থায় অমল সোমকে অস্বীকার করেনি। তাঁর যে-কোনও অনুরোধই অর্জুনের কাছে আদেশ। আজ পিছিয়ে যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না। যত খারাপ লাগুক, কাজটা তবু সে করবে। অর্জুন বলল, “না, অমলদা, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমার যেতে কোনও আপত্তি নেই।”

শিলিগুড়িতে বাস থেকে নেমে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যাওয়া খুব ঝামেলার। কোনও বাস নেই সরাসরি। বাগডোগরা শহর থেকে, অবশ্য যদি শহর বলা যায়, রিকশা নিয়ে কয়েক কিলোমিটার পথ ডিঙিয়ে তবে এয়ারপোর্ট চত্বরে পৌঁছনো যায়। যাত্রীদের নিজের গাড়ি না থাকলে ট্যাকসি কিংবা অটো ভাড়া করেন। অর্জুনের মনে পড়ল, বিদেশের সব শহরেই এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাতায়াত করে এয়ারলাইনসের বাস। সেটা নিশ্চয়ই এখানে পাওয়া যাবে। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিয়ে অর্জুন চলে এল সিনক্রেয়ার হোটেল। ওর সামনেই এয়ারলাইনসের অফিস। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হল সে। শিলিগুড়ি শহর থেকে সে রকম কোনও ব্যবস্থা নেই এয়ারপোর্টে যাওয়ার।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। সময় বেশি নেই। সিনক্রেয়ার হোটেলটা শিলিগুড়ি শহরের বাইরে। ভুল হয়ে গেল। বাসস্ট্যান্ড থেকে চেষ্টা করলে হয়তো শেষারে ট্যাকসি পাওয়া যেত। অর্জুন ঠোট কামড়াল। এই সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন সুট-পরা এক ভদ্রলোক। ঘড়ি দেখলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রাইভেট ট্যাকসি পার্কিং লট থেকে গড়িয়ে এল। ড্রাইভার মুখ বের করে বলল, “বলিয়ে সাব, কাঁহা যানা হ্যায়।”

“এয়ারপোর্ট। জলদি।”

“ষাট রুপিয়া ওয়ান ওয়ে।”

“ঠিক হ্যায়।” ভদ্রলোক পেছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলেন। অর্জুন আর ইতস্তত করল না। দৌড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, “আমাকে দয়া করে এয়ারপোর্ট নিয়ে যাবেন? আমি কোনও ট্রান্সপোর্ট পাচ্ছি না।”

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কিন্তু সেই সময় ড্রাইভার বলল, “নিয়ে নেব স্যার?”

ভদ্রলোক যেন অনিচ্ছায় মাথা নাড়লেন। গাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল। অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল। লরি, টেম্পো, মিনিবাস ছুটে যাচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে। বাঁ দিকে চা-বাগান। শেষ পর্যন্ত বাগডোগরা বাজার হয়ে বাঁ দিকে সংরক্ষিত এলাকায় তারা ঢুকে পড়ল। একজন সাত্রী দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ করার জন্য। ইচ্ছে হলে গাড়ি থামিয়ে প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু করল না। অর্জুন দেখল, এয়ারফোর্সের লোকজন সাইকেলে চেপে ফিরছে।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টটাকে দেখে চট করে এয়ারপোর্ট বলেই মনে হয় না। যদিও প্রচুর গাড়ি রয়েছে, হলঘর, কাউন্টার, সিকিউরিটি এনক্লোজার এবং রেস্টুরেন্ট আছে, কিন্তু তবু এয়ারপোর্ট বলে মনে হয় না। সব কিছুই শিথিল, ঘরোয়া। ট্যাকসি থেকে নেমে সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, “কত দিতে হবে?”

“দশ টাকা।”

অর্জুন টাকাটা দিয়ে আর দাঁড়াল না। ছুটে হলঘরে ঢুকে কাউন্টারের কাছে পৌঁছে দেখল, দিল্লি ফ্লাইট ঠিক সময়ে আসছে। অর্থাৎ আর মিনিট-দশেক বাকি। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ফ্লাইট পৌঁছে গেলে মেয়েগুলো নিশ্চয়ই ওর জন্যে দাঁড়াত না। তখন অমলদাকে কী কৈফিয়ত দিত সে?

সিগারেট ধরাল অর্জুন। বাড়ি ফিরে খুব অল্প সময় পেয়েছে তৈরি হবার। নিউ ইয়র্ক থেকে কেনা ব্যাগটায় জামাকাপড় পুরে চলে এসেছে কোনও মতে। আবার দাড়ি রেখেছে সে। কত সুন্দর দাড়ি। অনেকটা তরুণ রবীন্দ্রনাথের মতো। ফলে দাড়ি-কাটার বামেলায় পড়তে হয় না আজকাল। অর্জুনের খেয়াল হল, তাড়াহুড়োতে নীল বাহারি জ্যাকেটটা ফেলে এসেছে বাড়িতে। ওটা পরলে তাকে খুব সুন্দর দেখায়।

সিগারেটে টান দিতে-দিতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল অর্জুন। সর্বনাশ হয়ে গেছে। অমলদাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, নন্দিনীকে দেখতে কী রকম! কীভাবে সে চিনবে তাকে! যদি চারজন মেয়েকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, তা হলে নাই...! যদি চারজন মেয়ের বদলে দু'জন ছেলে, দু'জন মেয়ে হয়? অর্জুন সিগারেট নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল সে। এই সময় বাইরের আকাশে প্লেনের গর্জন শোনা গেল। যে সব মানুষ এয়ারপোর্টে এসেছেন, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অর্জুন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। প্লেন নীচে নেমে এল। রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে দম নিয়ে বাঁক খেয়ে শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি এসে থেমে যেতেই সিঁড়ির গাড়ি দৌড়ে গেল। যাত্রীরা নামতে আরম্ভ করলেই অর্জুন প্রত্যেককে লক্ষ্য করতে লাগল। এবং এই সময় পনেরো-ষোলো বছরের প্যান্ট শার্ট পরা চারটে মেয়েকে ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে আসতে দেখল। মেয়েগুলো সুন্দরী কিন্তু পুতুল-পুতুল নয়। হাঁটার ভঙ্গিতে সপ্রতিভতা পরিষ্কার। অর্জুন দেখল, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুরা আগত যাত্রীদের আপ্যায়ন করে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা গেট পেরিয়ে এসে চার পাশে তাকাতে লাগল। অর্জুন আরও একটু অপেক্ষা করল। ওরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলছে। দিল্লির মেয়ে বাঙালি হবে না এমন ভাবার কোনও কারণ ছিল না। অথচ অর্জুন তাই ভেবেছিল। একটি মেয়ে বলল, “স্ট্রেঞ্জ! সামওয়ান শুড কাম। ড্যাড টোল্ড মি লাইক দ্যাট।”

দ্বিতীয়জন ইংরেজিতে জবাব দিল, “না এলে আমরা অনন্তকাল বসে থাকতে পারি না। লেটস গো।” ওরা কোনও বড় লাগেজ আনেনি। যে-যার হাতের ব্যাগ তুলে নিল বিরক্ত মুখে। এবার অর্জুন এগিয়ে গেল, “নমস্কার।”

ওরা চারজন খতমত হল এক মুহূর্তের মতো। সামনের মেয়েটি মুখে বিরক্তি নিয়ে বলল, “ইয়েস?”

অর্জুন গম্ভীর হয়ে ইংরেজিতে বলল, “আমার নাম অর্জুন। দিল্লি থেকে মিস্টার রায় আমার সিনিয়র অমল সোমকে চিঠি দিয়েছেন।” অমলদার দেওয়া চিঠিটা এগিয়ে ধরল অর্জুন। ওই চিঠি মিস্টার রায় অমলদাকে পাঠিয়েছিলেন।

মেয়েটি চিঠি নিয়ে খুলে ফেলল খামটা। একবার আগাগোড়া তাকিয়ে নিয়ে আবার ফেরত দিয়ে বলল, “আমি নন্দিনী। আমরা ভেবেছিলাম কেউ হয়তো আসেনি। হোটেল কত দূরে?” অর্জুন মাথা নাড়ল, “দুঃখিত, এখানে হোটেল নেই। আধঘণ্টার গাড়ির দূরত্বে শিলিগুড়ি শহর। সেখানে যেতে হবে।”

অন্য একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, “আমরা আজই দার্জিলিং যেতে পারি না?”

“পারেন।” অর্জুন ওদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ট্যাকসিওয়ালারা ছুটে এল। সবাই ওদের নিয়ে যেতে চায়। সে একটু দরাদরি করতে চাইল। এই সময় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন মেয়েদের কাছে। কথা বলার জন্য

অর্জুন খানিকটা দূরে ট্যাকসিগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে দেখতে গেল। পেয়ে চমকে উঠল। এই লোকটির সঙ্গেই সে সিনক্রেয়ার হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে এসেছিল। ইনিই ট্যাকসিটাকে ভাড়া নিয়েছিলেন। সে বুঝতে পারছিল না তার সঙ্গী মেয়েদের সঙ্গে ওঁর কী দরকার। মনে পড়ল, এয়ারপোর্টে আসার সময় ইনি সঙ্গে কোনও লাগেজ আনেননি। অর্থাৎ ইনি যাত্রী নন, কাউকে নিতে এসেছেন। তিনশো টাকায় দার্জিলিং-এ যাওয়া রফা করে অর্জুন ফিরে আসতেই নন্দিনী বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ আক্লল, উই ক্যান টেক কেয়ার অব আওয়ারসেলফ। আপনি যে খবর পেয়ে আমাদের জন্যে এসেছেন, তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।”

ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোয়াল শক্ত। তিনি বললেন, “তোমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত। এই সব এরিয়া শান্তিপূর্ণ নয়। এখানে তোমরা খুব সেফ নও।”

নন্দিনী হাসল, “সে সব খবরের কাগজেই পড়েছি। তা ছাড়া এসকর্ট হিসেবে এই ভদ্রলোক আছেন। বাবা এঁদের ওপর খুব নির্ভর করেন।”

ভদ্রলোক অর্জুনের দিকে তাকালেন, “আপনি...আপনাকে একটু আগে লিফট দিয়েছি না?”

“ঠিকই।” অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর নন্দিনীকে বলল, “দার্জিলিং-এ যেতে হলে এখনই রওনা হওয়া উচিত। ট্যাকসি ঠিক হয়ে গিয়েছে।”

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা হই-চই করে ট্যাকসিটার দিকে এগিয়ে গেল। সবাই জানালার পাশে জায়গা চায়। ডিকিতে ড্রাইভার হাতব্যাগগুলো রেখে দিতেই অর্জুন পা বাড়তে যাচ্ছিল। এই সময় ভদ্রলোক ওকে থামালেন, “ইয়েস ইয়ংম্যান, আমি কি তোমার পরিচয় জানতে পারি? এই মেয়েরা আমার পরিচিত। তুমি কোথায় থাকো?”

“জলপাইগুড়ি শহরে। আমার নাম অর্জুন।”

“কী করো তুমি?”

“কিছু না।” কথাটা বলে অর্জুন ট্যাকসির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পেছনে তিনজন বসেছে, ড্রাইভারের পাশে যে মেয়েটি বসেছে তার নাম জানা নেই। বসতে হলে তাকে সামনে বসতে হবে। মেয়েটি দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল, “আপনি নিশ্চয়ই দার্জিলিং-এ অনেক বার গিয়েছেন। তাই ভেতরে বসতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।”

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে মাঝখানে বসতেই ট্যাকসি ছাড়ল। মেয়েরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। এই চিৎকারের অর্থ অর্জুন বুঝল না। প্রায় চার-পাঁচবার চিৎকারটা করে নন্দিনী বলল, “আপনার নামটা কী যেন?”

“অর্জুন।”

“ও, মহাভারাতা? ও. কে! শুনুন, আমরা এ রকম আওয়াজ মাঝে-মাঝেই

করি। আপনি কিছু মনে করবেন না। শুধু রিলে করে যান রাস্তাটা। আমরা শুনে চিনব।”

এয়ারপোর্টের চৌহদ্দি থেকে ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ামাত্র নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, “আরে, এখানে কি পাহাড় নেই?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না। পাহাড় পাবেন শিলিগুড়ি ছাড়ালে। এই জায়গাটার নাম বাগভোগরা। এর কাছাকাছি আছে ফাঁসিদেওয়া, যেখানে সত্তর দশকের আন্দোলন শুরু হয়েছিল।”

নন্দিনীর বাস্কবীদের নাম ইতিমধ্যে শুনে-শুনেই জেনে গিয়েছিল অর্জুন। রোগা মেয়েটি, যার চোখে চশমা, চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা, জিজ্ঞেস করল, “আন্দোলন? কিসের আন্দোলন?”

এই মেয়েটির নাম টিনা। অর্জুন বুঝল, এরা প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনাবলী সম্পর্কে নেহাৎই অজ্ঞ। আর অত কথা বোঝাবার সময় এবং ইচ্ছে দুটোই এখন নেই। সে বলল, “একটা রাজনৈতিক আন্দোলন।”

টিনা বলল, “ওঃ, আমরা রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড নই।”

অর্জুন হাসল, “আপনারা কিসে-কিসে ইন্টারেস্টেড?”

“স্পোর্টস, ক্রাইম ফিকশন, মিউজিক আর অ্যাডভেঞ্চার।” নন্দিনী জবাব দিয়েই জানতে চাইল, “আপনি? আচ্ছা আপনার বয়স কত?”

“তেইশ।”

“তা হলে কুড়ি বছর আগের ঘটনা আপনি জানলেন কী করে?”

“যে ভাবে আমরা মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার কথা জেনে থাকি।”

“আ-চ-ছা! হ্যাঁ, আপনার কিসে ইন্টারেস্ট?”

“সত্যসন্ধান।”

“হোয়াটস দ্যাট?”

“যে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর মনে হয় রহস্য লুকিয়ে আছে অথবা আপাতভাবে কোনও রহস্য নেই বলে মনে হলেও কয়েকটা ব্যাপারে খটকা থাকে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে আমার ভাল লাগে, তা ছাড়া ওটা এখন আমার পেশা।”

“মাই গড! আপনি ডিটেকটিভ?”

“ঠিক তা নয়। আমি সত্যসন্ধান করি মাত্র।”

সঙ্গে-সঙ্গে কান ফাটানো সেই চিংকারটা ছিটকে বেরোল মেয়েদের মুখ থেকে। অর্জুনের কান লাল হয়ে গেল। এরা কি তাকে অবিশ্বাস করছে? ট্যাকসির ড্রাইভার পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল। নন্দিনী বলল, “ওঃ দারুণ! আমরা তা হলে একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে থাকব। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, ডিটেকটিভ হবার পক্ষে যে বয়সটা দরকার, সেটা হতে অনেক দেরি আছে। বিদেশি উপন্যাসে এত ইয়ং ডিটেকটিভ—‘হার্ডি বয়েস’ বা ‘ফেমাস ফাইভ’-দের

তো ম্যাচিওরড বলা যায় না । ”

অর্জুন বলল, “আমি জানি না । তবে একটা তদন্তের ব্যাপারে আমি ইংল্যান্ড আর আমেরিকায় গিয়েছিলাম, সেখানে কিন্তু বয়স নিয়ে ঝামেলা হয়নি । ”

সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল । চারটে মেয়েই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল । যেন তারা নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না । টিনা অবিশ্বাসী-গলায় জিঙ্গেস করল, “আপনি স্টেটসে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন ? ”

“হ্যাঁ । একটা লাইটার নিয়ে সমস্যা হয়েছিল । ”

নন্দিনী চোখ কপালে তুলল, “ও মাই গড ! মনে পড়েছে । কাগজে পড়েছিলাম, একজন তরুণ ভারতীয় গোয়েন্দা স্টেটসে গিয়ে ক্যান্টার করেছে । সেই লোক আপনি ? ”

এই সময় ড্রাইভার হাইওয়ে থেকে গাড়ি বাঁ দিকের কয়েকটি রূপড়ি দোকানের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল । অর্জুন জিঙ্গেস করল, “কী ব্যাপার ? ”

“তেল নেব স্যার । ”

“তেল ? এখানে পেট্রল-পাম্প কোথায় ? ”

“দু’ নম্বর তেল । এক নম্বর কিনলে পোষাতে পারব না । এরা পাঁচ টাকা লিটার নেয়, তিন টাকা সত্তর কম । একশো টাকা দিন । অ্যাডভান্স । ”

অর্জুন হতভম্ব । সে কোনও দিন এই ঘটনা চোখে দেখেনি । এই বেআইনি তেল কিনতে দেওয়াটা এক ধরনের অন্যায়কে সমর্থন করা । সে মাথা নাড়ল, “আপনি যদি আমাকে না জানিয়ে তেল নিতেন, তা হলে আমার কিছু বলার ছিল না । কিন্তু জানতে পারার পরে এখান থেকে আপনাকে তেল নিতে দিতে পারি না । ”

“আমি জানাতে গেছি নাকি ? আপনিই তো জানতে চাইলেন । ”

“আপনার একবারও মনে হচ্ছে না, এই গরিব লোকগুলো সস্তায় তেল দিচ্ছে কী করে ? ”

“চোরাই তেল । প্রাইভেট কিংবা কম্পানির গাড়ির ড্রাইভারেরা লুকিয়ে তেল বিক্রি করে দেয় এদের কাছে হাফ দামে । ওরা আবার আমাদের কাছে বিক্রি করে । ”

“এই সব গরিব মানুষগুলোর ক্ষমতা আছে তেল কিনে ব্যবসা করার ? ”

“তা জানি না । হয়তো পেছনে কেউ আছে, সেই টাকা ঢালছে । আমার কী দরকার ও সব, আমি তেল পাচ্ছি, তাই ঢের । ”

ওরা যখন কথা বলছে, সেই সময় দু’জন আদিবাসী মহিলা এগিয়ে এসেছে গাড়ির কাছে । তাদের একজন জিঙ্গেস করল, “ক’ লিটার লাগবে ? ”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “তেল লাগবে না । চলুন, সামনের পাম্প থেকে নেবেন । ”

ড্রাইভার একটু ভাবল। তারপর বলল, “তা হলে আমাকে মাপ করবেন। আমি দার্জিলিং যেতে পারব না। কথাটা সরাসরি বলে দেওয়াই ভাল।”

“তা, এই কথা এয়ারপোর্টেই বলেননি কেন?”

“আমি তো যেতেই চেয়েছিলাম। কে জানত, আপনি এমন ঝামেলা করবেন?”

অর্জুন পেছনে তাকাল, “আপনারা কী চাইছেন?”

টিনা বলল, “আপনাকে আমি সাপোর্ট করছি।”

নন্দিনী বলল, “কাছাকাছি কোনও পুলিশ স্টেশন নেই?”

এবার ড্রাইভার হাত জোড় করল, “মাপ করবেন দাদা, আপনারা পুলিশে খবর দিলে কী হবে জানি না, তবে এই লাইনে ট্যাকসি চালানো আমার বন্ধ হয়ে যাবে। দয়া করে গরিবের ভাত মারবেন না।”

ড্রাইভার আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ি চালু করল। নন্দিনী মস্তব্য করল, “এখানে পা দিয়েই করাপশন দেখলাম। আপনি তো সত্যসন্ধানী, এর একটা বিহিত করুন, তেল কম্পানি থেকে নিশ্চয়ই ফি পাবেন।”

অর্জুন জবাব দিল না। হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ পড়ায় সে বলল, “ওইটে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি।”

মেয়েরা দেখল। কিন্তু কোনও মস্তব্য করল না। শিলিগুড়িতে পৌঁছে বাঁ দিকে না ঘুরে ট্যাকসি শহরের দিকে যেতে লাগল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি সত্যিই দার্জিলিং-এ যাবেন না?”

ড্রাইভার কথা না বলে মাথা নেড়ে ‘না’ বলল।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। লোকটাকে আর অনুরোধ করবে না বলে ঠিক করল। সে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের প্রোগ্রামটা যদি আমাকে খুলে বলেন।”

নন্দিনী বলল, “কোনও স্টিরিও-টাইপ প্রোগ্রাম নেই। ঘুরব, হই-হই করব।”

“আপনারা কি আজ রাতে শিলিগুড়িতে থাকতে চান?”

নন্দিনী ঘাড় ঘুরিয়ে দু’ পাশের রাস্তাঘাট দেখল। তারপর বলল, “এইটেই শিলিগুড়ি? না-না, এটা তো ঘিঞ্জি শহর। দার্জিলিং যদি না যাওয়া যায়, তা হলে কোনও নির্জন জায়গায় যাওয়া যায় কি না ভেবে দেখুন।”

ততক্ষণে গাড়ি ‘এয়ার ভিউ’ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্জুন ড্রাইভারকে বলল, “আপনি কি দয়া করে আর-একটু এগিয়ে যাবেন?”

লোকটি কথা শুনল যেন অনিচ্ছায়। বিশেষ একটি বাড়ির সামনে গিয়ে অর্জুন ভাড়া মিটিয়ে দিল। সিনক্রেয়ার হোটেল থেকে সেই ভদ্রলোক এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় যে ভাড়া দিয়েছিলেন, তার থেকে দশটা টাকা বেশি দিল শহরে ঢোকার বাড়তি পথটুকু আসার জন্যে। অর্জুন মেয়েদের বলল, ৪৭৬

“আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন !”

পুনম নামের মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাচ্ছেন ?”

“ওপরে টুরিস্ট-ব্যুরোর অফিস। আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক আছেন চার্জে, ওঁর সঙ্গে কথা বললে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।”

মেয়েদের নিয়ে অর্জুন ওপরে উঠে এল সৰু সিঁড়ি বেয়ে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার ভট্টাচার্য আছেন ?”

“ও পাশের ঘরে।” ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন। টুরিস্ট-ব্যুরোর এই অফিসারের সঙ্গে অর্জুনের আলাপ হয়েছিল অমল সোমের মাধ্যমে। খুব ভদ্র মানুষ, নিয়মিত সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। দরজায় দাঁড়ানো মাত্র তিনি চিংকার করলেন নিজের চেয়ারে বসে, “আরে অর্জুনবাবু যে, এসো এসো। হঠাৎ শিলিগুড়িতে, কী ব্যাপার ?”

অর্জুন ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দিল। ওরা কেন এসেছে, তাও জানাল।

সব শুনে মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন, “দেখুন, আপনারা এসেছেন উত্তর বাংলা দেখতে। আমি সাজেস্ট করব, প্রথমেই দার্জিলিং-এ না গিয়ে আপনার ডুয়ার্সটা দেখুন।”

“ডুয়ার্স ?” টিনা জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ। উত্তর বাংলার আসল সৌন্দর্য যেখানে, জঙ্গল।”

“ওহ্ ফ্যান্টাস্টিক !” নন্দিনী বলে উঠল, “কিন্তু জঙ্গলে আমরা থাকব কোথায় ?”

“প্রত্যেকটা ফরেস্ট বাংলায় আমাদের একটা করে ঘর আছে।” মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন, “কিন্তু সেগুলোতে ব্যবস্থা আমি আগামী কাল থেকে করে দিতে পারব। আজকের রাতটা আপনারা মালবাজার টুরিস্ট লজে থাকুন। আমি টেলিফোন করে দিচ্ছি, যাতে দুটো ডাবল আর একটা সিঙ্গেল রুম আপনারা পান।”

মেয়েরা রাজি হয়ে গেল। মিস্টার ভট্টাচার্য ওদের ট্যুর-প্রোগ্রাম করলেন। সেই রাত ওরা থাকবে মালবাজার টুরিস্ট লজে। পরের দিন যাবে চাপড়ামারি ফরেস্টে। সেখানে একটা রাত থেকে তার পরের দিন যাবে গরুমারি ফরেস্টে। গরুমারি থেকে ওরা যাবে হলং ডাকবাংলোতে। সেখান থেকে সোজা শিলিগুড়িতে ফিরে এসে দার্জিলিং-এর বাস ধরবে। প্রোগ্রাম তৈরি করে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের সঙ্গে কী রকম লাগেজ আছে ?”

টিনা বলল, “জাস্ট এই ব্যাগগুলো।”

“ও, তা হলে ভালই হল। এখনই বাসে রওনা হয়ে যান। ট্যাকসি ভাড়া করে খরচ বাড়ানোর দরকার নেই। আমি সমস্ত ফরেস্ট বাংলায় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

বাইরে বেরিয়ে এসে অর্জুন জিঞ্জেস করল, “আপনারা নিশ্চয়ই বাসে যেতে পারবেন না। চলুন, ট্যাকসি দেখি।”

টিনা বলল, বাসে বসার জায়গা পেলে ট্যাকসি নেওয়ার কী দরকার? আমরা বাসে গেলে লোক্যাল মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি।”

অর্জুন হাসতে গিয়ে সামলে নিল। দিল্লির এই মেয়েরা জিন্সের প্যান্ট আর শার্ট পরে এসেছে। স্থানীয় মানুষেরা ওদের কিছুতেই সহজ মনে নিতে পারবে না। মেলামেশা তো দূরের কথা!

সেবক রোড হয়ে যে সব বাস মালবাজার দিয়ে ডুয়ার্সে যায়, তার একটাতে উঠে বসল ওরা। বসার জায়গা পাওয়া গেল। মেয়েরা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল লেডিস সিটে বসে। অর্জুন পেছনে জায়গা পেয়েছিল। সে ভাবছিল, অমলদা তাকে অদ্ভুত এক বামেলায় ফেলে দিয়েছেন। এই মেয়েগুলোকে ডুয়ার্স ঘুরিয়ে দেখানো মানে কিছুটা সময় নষ্ট করা। তার মনে পড়ল অমলদা বলেছিলেন, নন্দিনীর বাবা খরচ চালানোর জন্যে একটা খাম মেয়ের হাতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এতক্ষণে একবারও নন্দিনী সেই প্রসঙ্গ ওঠায়নি। আর লজ্জায় অর্জুন নিজেও বলতে পারেনি।

বাসে তেমন ভিড় নেই। বাস ছাড়ার মুহূর্তে অর্জুনের নজর পড়ল একটা ট্যাকসির দিকে। এইমাত্র এসে দাঁড়াল সেটা। ড্রাইভারটা যেন পরিচিত। তারপরেই খেয়াল হল, ওই ট্যাকসিতে চড়ে সে আজ এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। এবং তখনই দেখতে পেল ভদ্রলোককে। নন্দিনীর সঙ্গে এঁর একটা আলাপ হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক এখানে কী করছেন। পেছনের দরজা খুলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগলেন তিনি, আর অর্জুনদের বাসটা চলা শুরু করল।

লোকটার সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। ওর হাবভাব মোটেই ভাল লাগছে না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই চিন্তাটা মাথা থেকে সরে গেল। মেয়েরা চিৎকার করে জানতে চাইছে ওটা কী নদী, এটা কোন পাহাড়, আর সে পেছনে বসে জানিয়ে যাচ্ছে। বাসের অন্য যাত্রীরা কৌতুক বোধ করছিল। অর্জুন দেখল, তাদের অনেকেই মেয়েদের কৌতুহল মেটাচ্ছে আগ বাড়িয়ে। সে খুশি হল, আর চৈতাত হচ্ছে না। সেবক ব্রিজ পেরিয়ে বাসটা যখন পাহাড় থেকে নেমে ওদলাবাড়ি-বাগরাকোট দিয়ে ছুটেছে, তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন। অর্জুন টাকার কথা চিন্তা করছিল। এর মধ্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর টাকা নিয়ে সে বের হয়নি। এবার মুখ ফুটে চাইতে হবে। এই সময় নন্দিনী গলা তুলে জানতে চাইল, “কোথাকার টিকিট কাটতে হবে?”

অর্জুন গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল, “আমিই কাটছি।”

মালবাজারের বাসস্ট্যাণ্ডে বাস দাঁড়াতেই অর্জুন টুরিস্ট লজটা দেখতে পেল। দেখেই বেশ পছন্দ হয়ে গেল। এমন সুন্দর ডিজাইনের বাংলোবাড়ি দেখলেই থাকতে ইচ্ছে হয়। মেয়েরাও দেখে বেশ উত্তেজিত। একটা মাঠ

পেরিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসকে ডান হাতে রেখে ওরা টুরিস্ট লজে পৌঁছে গেল। পুনম বলল, “ফ্যান্টাস্টিক। এ রকম জায়গায় এমন বাংলা, ভাবা যায়? আমাদের থাকতে দেবে তো?”

অর্জুন হাসল, কিন্তু কোনও জবাব দিল না। ভট্টাচার্যদা যখন আশ্বাস দিয়েছেন, তখন এরা বিমুখ করবে না। দোতলার বারান্দায় চেয়ার সাজানো। সেখান থেকেই মেয়েরা দূরের পাহাড়, মাঠ, চা-বাগান আর ডুবন্ত সূর্য দেখতে পেল। ওরা তিনখানা ঘর পেল। জানা গেল, শিলিগুড়ি থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নন্দিনী আর টিনা এক ঘরে, পুনম আর চিকিৎসিক দ্বিতীয়তায়, আর কয়েকটা স্টেপ ওপরে একটা ঘরে অর্জুন ঢুকে পড়ল। ব্যাগটাকে রেখে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল জানালা খুলে দিয়ে। আকাশে এখন লাল রং ছড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, তার পাহারা দিতে আসাই সার হবে, এই সব মেয়ে এমন-কিছু লবঙ্গলতিকা নয়, নিজেদের ঝুঁকি নিজেই নিতে পারে। এই ঘরে দ্বিতীয় বিছানাটি খালি। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নিশ্চয়ই এই সঙ্কের সময়ে কেউ এসে উঠবে না মালবাজারে...। হঠাৎ মাথার ভেতর জগুদার মুখ ভেসে উঠল। একেই কি কাকতালীয় ব্যাপার বলে? আজ সকালে যখন কদমতলার মোড়ে জগুদার কাছে সোনা বিক্রির গল্প শুনছিল, তখন বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, তাকে এই মালবাজারে সঙ্কেবেলায় আসতে হবে। জগুদা তাকে একবার এখান থেকে ঘুরে যেতে বলেছিলেন। মনে হয়, আজ রাত্রে জগুদা জলপাইগুড়ি থেকে এখানে আসবেন না। ব্যাঙ্ক খোলার আগেই কাল সকালের ফাস্ট বাস ধরে পৌঁছে যাবেন। কাল তাদের যাওয়ার কথা চাপড়ামারি আর গরুমারা ফরেস্টে। এ-বাত্তায় জগুদার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া সে এসেছে পাহারাদার হিসেবে, সোনার উৎস সন্ধান করতে নয়।

এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন মার্কিনি কায়দায় উচ্চারণ করল, “ইয়া।”

সঙ্গে-সঙ্গে চারটে মেয়ে একসঙ্গে ঢুকে পড়ল ঘরে। পুনম ছুটে গেল জানালায়, “কাম হিয়ার, এখান থেকে সূর্য-ডোবা দেখা যাচ্ছে।”

“আমি সান-সেট দেখতে ভালবাসি না। আমি প্রেফার করি সান-রাইজ।” চিকিৎসিক বলল।

ওরা ঘরে ঢুকতেই অর্জুন উঠে বসেছিল। মেয়েরা দুটো খাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। শুধু নন্দিনী টেবিলের উপর উঠে বসে চেয়ারে পা তুলে দিল। অর্জুন লক্ষ করল, এর মধ্যেই ওরা পোশাক পালটে ফেলেছে। প্যান্ট ছেড়ে ম্যাকসি পরেছে চারজনেই। তাদের রং খুব জোরদার।

নন্দিনীর কাঁধে একটা সরু স্ট্র্যাপের চামড়ার ব্যাগ। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, “এখন আমাদের প্রোগ্রাম কী? নিশ্চয়ই বাংলায় বসে থাকার জন্যে আমরা এত

দূর আসিনি ?”

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। সে বলল, “মুশকিলে ফেললেন, এ সব জায়গায় সন্ধে নামতেই ভূতেদের রাজত্ব হয়ে যায়। তখন কেউ বাড়ির বাইরে বের হয় না।”

“ভূত ? দারুণ ব্যাপার। আই রেড লট অব ঘোস্ট স্টোরিস।” টিনা বলল।

অর্জুন তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাল, “না, না, মানে, ভূত বলতে আমি অন্ধকার মিন করেছি। সন্ধের পর কেউ এখানে পথে বের হয় না।”

“কেন ?” নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

“রাস্তায় তেমন আলো নেই, কিছু দেখা যায় না। দেখার জিনিসও বিশেষ কিছু নেই মালবাজারে। আজকের রাতটা রেস্ট নিয়ে কাল যেখানে যাব...।”

“শুনুন মিস্টার মহাতারতা ! আমরা এখানে ঘরে বসে থাকার জন্যে আসিনি। আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে। অন্তত ঘন্টা-খানেক হাঁটব আমরা। রাত্রের গাছপালা, তার সৌন্দর্য দেখব। শুনেছি সাইকেলেরও একটা সাউন্ড আছে। সেটা জানতে চাই। কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু খাওয়া দরকার।”

অর্জুন খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, “আপনারা লাউঞ্জে অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।”

“কেন ?” চিক্কি বলল, “আপনি আবার সাজগোজ করবেন নাকি ? এই পোশাকেই চলুন। বললেন তো রাস্তায় লোক থাকে না রাত্রে, দেখবে কে আপনাকে ?”

এমন কথা কোনও মেয়ের মুখে কখনও শোনেনি অর্জুন। তার চেনাজানা চৌহদ্দিতে অল্পবয়সী মেয়ের সংখ্যা খুব কম। যারা আছে তারা কথা গিলতে পছন্দ করে, কথা বলতে নয়। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে বলল, “চলুন, আপনারাও কি এই পোশাকেই যেতে পারবেন ?”

নন্দিনী লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামল, “ইয়েস জনাব। রাত্রে তো কেউ আমাদের সাজ দেখবে না।”

শুধু চা-টোস্ট আর ওমলেট পাওয়া গেল লজের ক্যান্টিনে। তাই খেয়ে ওরা যখন নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে, তখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল। ভদ্রলোক ফিরছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, “এই সময়ে চললেন কোথায় ?”

নন্দিনী জবাব দিল, “ঘুরতে।”

“ও। যেতে হলে বাঁ দিকে যান, দোকানপাট কিছু পাবেন, ডান দিকে না যাওয়াই ভাল।”

ওরা নেমে এল মাঠে। নন্দিনী বলল, “আমরা ডান দিকেই যাব।”

অর্জুন বলল, “শুনলেন তো ম্যানেজারের কথা।”

“দূর । দোকানপাট দেখতে কি আমরা দিল্লি থেকে আসছি !”

অগত্যা বড় রাস্তায় উঠে ওরা ডান দিকে এগোল । এদিকে আলো নেই । নন্দিনীর হাতে টর্চ ছিল । পুনম বলল, “দারুণ লাগছে । কী রোমান্টিক ব্যাপার ।”

চিকি বলল, “এক-আধটা ভূত থাকলে ভাল হত ।”

টিনা নির্জন অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে গান ধরল, “ইয়ে রাত ভিগি ভিগি ।”

অর্জুনের ভাল লাগছিল । এই রকম বাঁধন-হারা উচ্ছলতায় ডুবে যাওয়া তার ওই বয়সে হয়নি । অথচ এরা তার থেকে এমন কিছু ছোট নয় । টিনা গান গাইছে আর বাকি তিনজন তালি অথবা টর্চ বাজিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে । মেয়েটার গলা ভাল । ডান দিকে পার্কটাকে রেখে ওরা মিনিট দশেক হাঁটল । এখন অন্ধকারে জোনাকি ছবি আঁকছে । মাঝে-মাঝে একটা-দুটো গাড়ি তীব্র আলো জ্বেলে ছুটে যাচ্ছে । সেই সময় অন্ধকার এবং নির্জনতা ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে । নন্দিনীর গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল, “হরিবল । এভাবে হাঁটা যায় ? কোনও নির্জন রাস্তা নেই ? ওই তো ও দিক দিয়ে একটা রাস্তা গিয়েছে ।”

অনুমতির অপেক্ষা না করে মেয়েরা নেমে পড়ল হাইওয়ে ছেড়ে । বাঁ দিকে জঙ্গলের জন্যে আরও অন্ধকার । অর্জুনের পছন্দ হচ্ছিল না ওরা ওই দিকে যাক । সে বলল, “একটা কথা জিঞ্জেস করছি, আপনাদের সাপের ভয় নেই তো ?”

“সাপ ? ওরে বাবা ! এখানে সাপ আছে নাকি ?”

“প্রচুর । নর্থ বেঙ্গলের সাপ বিখ্যাত ।”

সঙ্গে-সঙ্গে চারটে গলা থেকে একসঙ্গে চিৎকার ছিটকে বেরোল । সবাই দ্রুত পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করল । তড়িঘড়ি বড় রাস্তায় পৌঁছে নন্দিনী বলল, “আগে বলবেন তো ?”

“বলার সুযোগ পেলাম কোথায় ?”

হঠাৎ টিনা প্রশ্ন করল, “আপনি গুল মারছেন না তো ?”

অর্জুন কিছু বলার আগেই দু'জন মানুষ তাদের সামনে এসে নমস্কার করল । জায়গাটা অন্ধকার । তবু যেটুকু বোঝা যায় তাতে অর্জুনের মনে হল, এরা চা-বাগানের শ্রমিক অথবা কোনও কন্সট্রাক্টরের কাছে কাজ করে । অর্জুন জিঞ্জেস করল, “কী চাই ?”

একজন হিন্দিতে বলল, “সাব—আপনারা বস্তিতে যেতে গিয়েও ফিরে এলেন, তাই এলাম ।”

“হ্যাঁ । ওদিকটায় বড় অন্ধকার ।”

“জি সাব । গরিব লোকের বস্তি, তাই আলো জ্বলেনি । আপনারা মালবাজারে নতুন ?”

“হ্যাঁ, আজ বিকেলে এসেছি, কাল সকালে চলে যাব।”

“তা হলে সাব, মেমসাহেবদের বলবেন—আমাদের যেন একটু কৃপা করেন।”

“কী কৃপা?” নন্দিনী জিজ্ঞেস করল।

“মেমসাব, আমরা খুব গরিব। কাজকর্ম নেই। ঘরে যা ছিল, তা বিক্রি করে এত দিন চালিয়েছি। কিন্তু আর পারছি না।”

নন্দিনী বলল, “উফ। যেখানে যাব, সেখানেই এই প্রবলেম। আমি ভিক্ষে দিই না।”

“না মেমসাব। আমরা ভিক্ষে চাই না। আমার ঘরে তিন পুরুষের জমানো একটু সোনা আছে, এত-দিন অনেক অভাবেও বিক্রি করিনি, তাই কিনে যদি আমাদের বাঁচান।”

“সোনা?” চিকি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ, মেমসাব।”

“খাঁটি না নকল? আমরা সোনা চিনি না।”

“কসম খেয়ে বলছি মেমসাব। আমরা গরিব মানুষ, ব্যবসাদার নই।”

পুনম জিজ্ঞেস করল, “সোনা থাকলে গয়নার দোকানে গিয়ে বিক্রি করছ না কেন?”

“ঠিক দাম দেয় না মেমসাব। তা ছাড়া বলে, আমরা চুরি করেছি, পুলিশে ধরিয়ে দেবে।”

ততক্ষণে অর্জুনের মাথার ভেতরে জগুদার কথাগুলো কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এই মালবাজারের ব্যাঙ্কে হাজার-হাজার টাকার সোনা জমা দিয়ে গরিব মানুষগুলো টাকা ধার নিয়ে যাচ্ছে। এটা জগুদার কাছে রহস্য বলেই মনে হয়েছে। এই লোক দুটো কি সেই দলের? অর্জুন এখনই কথা বাড়াতে চাইল না। সে বলল, “শোনো, এই অন্ধকারে কথা বলে লাভ নেই। তা ছাড়া আমাদের কাছে কত টাকা আছে তাও দেখতে হবে। তুমি বরং ঘন্টাখানেক বাদে সোনা নিয়ে টুরিস্ট লজে এসো। আমি সামনেই থাকব। তখন কথা বলা যাবে।”

নন্দিনী ইংরেজিতে বলল, “আপনি কেন মিছিমিছি ডাকছেন? আমি সোনা কিনতে একদম ইন্টারেস্টেড নই। ও সব বিশ বছর আগে মেয়েদের শখ ছিল।”

অর্জুন হেসে বলল, “আমি ইন্টারেস্টেড।”

নন্দিনী শুধু মস্তব্য করল, “স্ট্রেঞ্জ।”

এর পরে সোনাটা খাঁটি কি না এ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। টুরিস্ট লজের কাছে এসে নন্দিনী ঘুরে দাঁড়াল, “আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ড্যাডি একটা খাম দিয়েছিলেন, বলেছিলেন মিস্টার সোম অথবা তাঁর লোক

এয়ারপোর্টে এসে যদি আমাদের রিসিভ করেন, তা হলে তাঁর হাতে যেন খামটা দিয়ে দিই। আমাকে ওটা খুলতে বিশেষ করেছিলেন। আপনি জানেন ওতে কী আছে? মিস্টার সোম কি আপনাকে বলেছেন?”

অর্জুন স্বস্তি পেল, “ব্যাপারটা যখন আপনাকে উনি জানাননি, তা হলে আমি জানব কী করে। ওটা সম্ভবত মিস্টার রায় আর মিস্টার সোমের ব্যক্তিগত ব্যাপার।”

মেয়েরা যে-যার ঘরে চলে গেলে অর্জুন লাউঞ্জে চেয়ার টেনে বসল। ও-পাশের একটা চেয়ারে এক প্রৌঢ় বসে ছিলেন। দূরে মালবাজার বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে। এই সময় নন্দিনী আবার ফিরে এল। খামটা দিয়ে বলল, “আপনার ঘরে গিয়ে দেখলাম দরজা বন্ধ। এখানে একা বসে বোর হচ্ছেন কেন? ওহো, সেই লোক দুটোর জন্যে অপেক্ষা করছেন?”

অর্জুন হাসল, জবাব দিল না।

এই সময় ওপাশের টেবিলের লোকটি বলে উঠলেন, “কী ব্যাপার? এক্সকারণেশন? এক কলেজ থেকে আসা হচ্ছে? গুড গুড।” প্রশ্ন আর উত্তর তিনি একই সঙ্গে দিলেন।

নন্দিনী লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি এখানে থাকেন?”

“নো নো। আমি শহরে থাকি না। শহরে এক দিনের বেশি থাকলেই আমার মনে অ্যালার্জি বের হয়। কোথেকে আসা হচ্ছে?”

“ডেললি।”

“গুড। অ্যাডভেঞ্চার করতে চাও তো আমার ওখানে চলে এসো। এখান থেকে কিছু দূর গেলেই ফুন্টসিলিং বলে একটা জায়গা পড়বে। সেখানকার ‘কাফে দ্য মাউন্টেন’-এ আমার খোঁজ করলেই তোমরা হাদিস পেয়ে যাবে। আমার নাম রতনলাল গুপ্ত। ও হ্যাঁ, জায়গাটা ভুটানে। অর্থাৎ, তোমাদের এক রকম বিদেশ ঘোরাও হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। নো ভিসা।” উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে।

“দারুণ ব্যাপার!” নন্দিনীর মুখে-চোখে উৎসাহ, “আমার মনে হচ্ছে ওঁর ওখানে গেলে খুব মজা হবে। ফুন্টসিলিং-এর কাছাকাছি কি আমরা যাচ্ছি?”

“হ্যাঁ। কিন্তু উনি বললেন শহরে এক দিনের বেশি থাকলে ওঁর অ্যালার্জি হয়, অথচ ফুন্টসিলিং পুরোদস্তুর শহর।” অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ডিনার করবেন কখন?” নন্দিনী ঘড়ি দেখল, “এই সঙ্গে বেলায়?”

অর্জুন বলল, “বেশি রাত করবেন না।” নন্দিনী চলে গেল। অর্জুন সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা নিতেই নীচের সিঁড়িতে সেই দুটো লোক হাতজোড় করে এসে দাঁড়াল। অর্জুন সোজা হয়ে বসল, “ও, এসো তোমরা।”

যে লোকটা তখন বেশি কথা বলছিল, সে দু’ হাত জড়ো করেই জিজ্ঞেস করল, “ওপরে যাব স্যার? কেউ কিছু বলবে না তো?”

“না না, কেউ কিছু বলবে না, উঠে এসো ।”

লোক দুটো সামনে এসে দাঁড়াল । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তোমাদের কাছে সোনা আছে, নাকি সোনার গহনা ? নিয়ে এসেছ ?”

“হ্যাঁ সাব । সোনার গহনায় খাদ থাকে বলে আমাদের পূর্বপুরুষ সোনার কাঠি করেছিল । আপনি যদি বলেন, তা হলে এখানে বের করতে পারি ।”

অর্জুন ইশারা করতেই লোকটা ধুতির খুঁট খুলে একটা ছোট্ট কাপড়ের ব্যাগ বের করল । জলঢাকা হাইড্রোইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্টের আলো এত টিমটিমে যে, অর্জুনকে চোখ বড় করতে হল । কাপড়ের ব্যাগটা সস্তপর্শে খুলে একটা সোনালি কাঠি বের করল লোকটা । করে অর্জুনের হাতে দিল । প্রথম দর্শনেই অর্জুনের মন বলল, জিনিসটা খাঁটি সোনা । কিন্তু সত্যিই কি সোনা ? সে হাতের তালুতে কাঠিটাকে রেখে এবার নাচাল । তারপর জিজ্ঞেস করল, “কতখানি সোনা আছে এতে ?”

“সাব, এক ভরি ।”

“কী করে বুঝব ?”

“আপনি যে-কোনও সোনার দোকানে গিয়ে যাচাই করতে পারেন ।”

“এখন কি সোনার দোকান খোলা পাব ?”

“তা হয়তো পাবেন না ।”

সঙ্গের লোকটা বলল, “লালচাঁদের দোকান খোলা আছে ।”

“মালবাজারে ক’টা সোনার দোকান আছে ?”

“বেশি না সাব ।”

“তুমি কী করে জানলে এতে এক ভরি আছে ?”

“সাব, আমার বাবার কাছে শুনেছি ।”

অর্জুন লোকটার মুখের দিকে তাকাল । কী সাবলীল ভঙ্গিতে মিথ্যে কথা বলছে । যদি থিয়েটারে নামত, তা হলে নিশ্চয়ই নাম করত । সে বলল, “পয়সা দিয়ে জিনিস কিনছি, সোনার মতো জিনিস, যাচাই না করে তো কিনতে পারি না ।”

“আপনি এটা নিয়ে লালচাঁদের দোকানে চলে যান সাব ।”

“তুমি সঙ্গে যাবে ?”

“না সাব । আমি গেলে সন্দেহ করবে । আজীবাজে কথা বলবে ।”

“তা হলে তুমি আমার হাতে বিশ্বাস করে সোনা ছেড়ে দেবে ?”

“আমরা গরিব মানুষ, কিন্তু মানুষ চিনি সাব ।”

অর্জুন এক সেকেন্ড সিগারেট টানল । সোনার কাঠি তার হাতের মুঠোয় । এটা তার কেস নয় । সে এসেছে মেয়েদের পাহারাদার হিসেবে, স্বর্ণ-রহস্য সন্ধানে নয় । অতএব এ-নিয়ে কথা বলে কোনও লাভ নেই । সে বলল, “ঠিক আছে, কাল সকালে তোমরা এসো । আমি দেখতে চাই সোনাটা খাঁটি কি

না।”

“আপনি তখন বললেন, কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবেন?”

অর্জুন লোকটার দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “তোমার নাম কী?”

লোকটা হকচকিয়ে গেল। সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারপর যেন বাধ্য হয়েই বলল, “মাংরা।”

অর্জুন হাসল, “আচ্ছা। মাংরা ভাই, এই সোনা যদি খাঁটিও হয়, তবু তো সাধারণ মানুষের সন্দেহ যাবে না। তার চেয়ে তোমরা যদি এই সোনা নিয়ে ব্যাঙ্কে যাও, তা হলে ব্যাঙ্ক এটা জমা রেখে তোমাদের ধার দেবে। এতে সুবিধে হল যখন তোমরা টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে, তখন ব্যাঙ্ককে ধার শোধ করে দিলে পরিবারের গয়না ফেরত পেয়ে যাবে।”

মাংরা মাথা নাড়ল, “না সাব, আমরা পড়তে-লিখতে জানি না। ব্যাঙ্কে যেতে ভয় লাগে। আপনাদের ভদ্রলোক বলে মনে হওয়ায় সাহস করে এসেছি।”

“এটা কত দাম পেলে বিক্রি করবে?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“এক ভরি আছে। সোনার যা দাম, তাই দিন।”

“সোনার দাম কত?”

মাংরা তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। স্পষ্ট হল সে বুঝতে পারছে না অর্জুনকে। তারপর বলল, “আপনি যদি মেমসাহেবদের জিজ্ঞেস করেন, তা হলেই জানতে পারবেন।”

“আজকালকার মেমসাহেবরা সোনার খবর রাখে না।” সে কাঠিটাকে আবার দেখল। তারপর মনে-মনে ভাবছে এমন ভঙ্গি নিয়ে বলল, “জিনিসটা সত্যি সুন্দর। এ রকম গোটা চারেক পেলে ঠাকুরের জন্যে মুকুট তৈরি করতে পারতাম।” কথাগুলো বলতে-বলতেই সে চোখের কোণে তাকিয়ে ছিল। মাংরা আর তার সঙ্গী দৃষ্টি বিনিময় করল। লোক দুটো সত্যিই বুদ্ধিমান। কোনও মন্তব্য করল না। অর্জুন সোনার কাঠি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “মাংরা ভাই, আজকের রাত্রেই জন্যে তুমি দশটা টাকা নিয়ে যাও। কাল সকাল সাতটায় নিয়ে এসো, দিনের আলোয় দেখে তারপর দাম করব।”

মাংরা মাথা নাড়ল, “না সাব, দশ টাকা এখন দিতে হবে না। আমি কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব।” সোনার কাঠিটা ফেরত নিয়ে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে সঙ্গীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই সময় একটা গাড়ির হেডলাইট মাঠ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল টুরিস্ট লজের দিকে। লজের সামনে পৌঁছেই পেছনের দরজা খুলে কেউ নামল। নেমেই মাংরাকে জিজ্ঞেস করল, “ইয়ে টুরিস্ট লজ হ্যায়?”

“জি মালিক।”

“তুমলোগ কোন হো ?”

“মুখে সবকোই মাংরা পুকারতা । বলদেবজী মুখে আচ্ছাসে জানতা ।”

“কোন বলদেব ?” লোকটি বিরক্তি হল, “ক্যা ফালতু বকোয়াস করতা হ্যায় তুম । যাও, ভাগো ইহাসে ।” কথা শেষ করে লোকটি বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলেন । ঠিক তখনই লজের ম্যানেজার এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে । ভদ্রলোক তাঁর দিকে তাকিয়ে নীচ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, “ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার কোথায় ?”

“আমিই ম্যানেজার ।”

“আপনার এখানে ঘর খালি আছে ? আই নিড এ রুম, সিঙ্গেল রুম ।”

ঠিক তখনই অর্জুন সোজা হয়ে বসল । লোকটিকে দেখেই চমকে উঠেছে সে । চটপট চেয়ার ছেড়ে ভেতরে চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল । লোকটি তখন ম্যানেজারকে কিছু বলতে-বলতে ওপরে উঠে আসছে । মনে হল, তাকে লক্ষ করার অবকাশ পায়নি ।

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় চুপচাপ বসে রইল অর্জুন কিছুক্ষণ । অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট ধরাল । এটাও কি কাকতালীয় যোগ ? লোকটা নিশ্চয়ই মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল । ধরা যাক, নিজের কোনও কাজে সেখানে গিয়ে হয়তো মেয়েদের দেখতে পেয়েছিল । কিন্তু শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ডে কার খোঁজে যাবে এমন লোক ? আর উত্তর বাংলার এত জায়গা থাকতে এই মালবাজারে রাস্তির বেলায় এসে ট্যুরিস্ট লজে উঠবে কেন ? এমন হতে পারে, বাস ছেড়ে যাওয়ার অনেক বাদে লোকটি খবর পেয়েছিল, চারটে মেয়ে (এই মেয়েদের বর্ণনা মনে রাখতে কারও অসুবিধে নেই), আর একটা ছেলে মালবাজারের বাসে উঠে চলে গিয়েছে । খবর পেয়ে, এখানে চলে আসা অসম্ভব নয় । হয়তো এখনও জানে না কোথায় উঠেছে ওরা ! এমন হতে পারে পথে যে কয়েকটা জায়গা পড়েছে তার সব-ক’টাতাই খোঁজ নিতে-নিতে এসেছে যে, তারা সেখানে নেমেছে কি না । ফলে মালবাজারে পৌঁছতে দেরি হয়েছে । এই সব ভাবনা যদি সত্যি হয় তা হলে লোকটা এখনও জানে না এই ট্যুরিস্ট লজেই মেয়েরা রয়েছে । অবশ্য ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললেই জেনে যাবে এক মুহূর্তে । এত ঘন ঘন সিগারেট খায় না অর্জুন, তবু সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল । মানুষটার পরিচয় জানা দরকার ।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অর্জুন মাথা নাড়ল । এই লজে যদি ঘর থাকে, তা হলে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করারও দরকার হবে না । রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা লেখার সময় ভদ্রলোক দেখতে পাবেন চারটি মেয়ে দিল্লি থেকে এখানে এসে উঠেছে । সে ঘর থেকে বেরিয়ে সরু প্যাসেজে দাঁড়িয়ে দু’ পাশে তাকাল । ভদ্রলোক ঘর পেলেন কি না বোঝা যাচ্ছে না । সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল মেয়েদের ঘরের দিকে । পাশাপাশি দুটো ঘর । একটা ঘর থেকে হঠাৎই সেই

বিশ্রী চিংকার ভেসে এল। অর্থাৎ চারজন একই ঘরে রয়েছে। অর্জুন দরজায় নক করল।

হাসি থামছিল না, কিন্তু একটি গলায় প্রশ্ন হল, “হু ইজ দেয়ার?”

“অর্জুন।”

দরজা খুলল পুনম। খুলে ওকে দেখে খুশি হল, “ও, আপনি! ওয়েলকাম।”

ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল অর্জুন। চারটে মেয়ে সম্ভবত দুটো বিছানায় ভাগাভাগি করে শুয়েছিল। নন্দিনী ছাড়া বাকি দু’জন উঠে বসেছে, পুনম নন্দিনীর পাশে গিয়ে বসল। অর্জুন দুটো চেয়ারের একটাকে টেনে নিয়ে বলল, “নন্দিনী, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।”

নন্দিনীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, “কী ব্যাপার?”

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি তিনজন পরস্পরকে ইশারা করল। অর্জুন বলল, “না, না, আপনারা থাকতে পারেন। সত্যি বলতে কী, কারও বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।”

টিনা বলল, “ও জরুরি, কিন্তু প্রাইভেট নয়।”

অর্জুন বলল, “নন্দিনী, আজ এয়ারপোর্টে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন, তিনি কে? কীভাবে ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়?”

নন্দিনী উঠে বসল, “কেন বলুন তো?”

“দুটো ঘটনা ঘটেছে। ভদ্রলোক উঠেছেন শিলিগুড়ির একটা নামী হোটেল। জলপাইগুড়ি থেকে আসতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে আমি ওঁর গাড়িতে লিফট নিই। আমরা যখন শিলিগুড়ি থেকে বাসে উঠি, তখন ওই ভদ্রলোক ট্যাকসি নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসেন। সেখানে কী করেছেন আমি জানি না, কারণ বাস তখনই ছেড়ে দিয়েছিল। আর-একটু আগে সেই একই ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এই ট্যুরিস্ট লজে জায়গা খুঁজতে এসেছেন। তাই আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে কৌতুহলী।” অর্জুন একটানা কথাগুলো নন্দিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে গেল।

“ভার্মা-আক্সল এই লজে এসেছেন?” নন্দিনী বিস্মিত।

“হ্যাঁ। এই ভার্মা-আক্সল কে?”

“আমার বাবা এককালে নেপাল এবং বার্মায় এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস করতেন। তখন ভার্মা-আক্সল বাবার পার্টনার ছিলেন। আমার মা ওঁকে ঠিক পছন্দ করতেন না বলে আমি এড়িয়ে যেতাম। বাবার সঙ্গে বিজনেস নিয়ে কিছু মত-বিরোধ হতে বাবা বিজনেস বন্ধ করে দিলেন। তারপরও অবশ্য দিল্লিতে গেলে ভার্মা-আক্সল আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন। ব্যস, এইটুকু।”

“মিস্টার ভার্মা শেষ কবে দিল্লি গিয়েছিলেন?”

“সপ্তাহখানেক আগে উনি আমাদের দিল্লির বাড়িতে এসেছিলেন।”

“তখন কি আপনার বাবা ঠুঁকে বলেছিলেন যে, আপনি এ দিকে আসছেন?”

“আমি জানি না।”

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “কিছু মনে করবেন না, আমি যদি জানতে চাই, আপনার বাবা কী করেন, তা হলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন?”

“না, না। বাবা এখন আর ব্যবসা করেন না। উনি কোনও কোনও কম্পানিতে টাকা ইনভেস্ট করেন আজকাল।”

“উনি কি মিস্টার ভার্মার কোনও বিজনেসে টাকা দিয়েছেন?”

“আপনাকে একটু আগে বললাম, বাবার সঙ্গে মিস্টার ভার্মার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়াতে তিনি বিজনেস বন্ধ করে দিয়েছেন। আসলে বাবা ঠুর কাছে অনেক টাকা পান।” নন্দিনী বলল, “সেটা সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি।”

“কীভাবে?”

“গত সপ্তাহে যখন ভার্মা-আঙ্কল আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন বাবার সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। আমি পাশের ঘরে ছিলাম বলে শুনে পেরেছিলাম।”

“কী বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল?”

“বাবা টাকা ফেরত দিতে বলেছিলেন। ভার্মা-আঙ্কল সেটা দিতে চাননি। এই নিয়ে ঝগড়া। টাকার অ্যামাউন্ট আমি জানি না।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, আপনি বলদেব নামে কাউকে চেনেন?”

“বলদেব! না তো।”

অর্জুন হাসল, “নন্দিনী, আপনার ভার্মা-আঙ্কলের ব্যাপারসম্পার আমার ঠিক ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে উনি আপনার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।”

“হোয়াট ডু ইউ মিন?”

“ঠিক বোঝাতে পারব না। হয়তো উনি আপনাকে বিপদে ফেলতে পারেন।”

“হোয়াই?”

“আমি বিশ্বাস করি, উনি আপনাকে অনুসরণ করছেন। ঠুর সম্পর্কে সাবধান হতে হবে।”

“কীভাবে?”

“আমার কথা আপনারা শুনবেন?”

“কী বলছেন, তার ওপর নির্ভর করছে।”

“আজ রাত্রে ডিনার আপনারা যে-যার ঘরেই করুন। আমি বা লজের বেয়ারা ছাড়া আর অন্য কেউ ডাকলে আপনারা দরজা খুলবেন না।”

“বেশ। কিন্তু কাল সকালে কী হবে?”

“সকাল হতে এখনও অনেক দেরি আছে ।”

“বেশ, তাই হবে ।” নন্দিনী মুখ ফেরাল, “গার্লস, শুনলে তো ?”

পুনম একটু রাগত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, “হু ইজ দিস ম্যান, যার ভয়ে আমাদের এইভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে । এটা খুব সরল প্রশ্ন, তাই না ?”

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “উত্তরটা নন্দিনী দিতে পারেন । আমরা যদি একটা রাত অপেক্ষা করি, তা হলে ক্ষতি কী ।” অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দেখল বেয়ারা প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে আসছে । সে লোকটাকে ডাকল, “শোনো, আজ রাত্রে এই দুটো ঘরে ডিনার এনে দেবে । দিদিমণিরা ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে যাবেন না ।”

“ঠিক আছে সাব ।”

“আর-একটা কথা, মিস্টার রতনলাল গুপ্ত কোন ঘরে আছেন ?”

“চার ।” বেয়ারা চলে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়াল, “এখানে সাড়ে নটার মধ্যে ডিনার খাওয়া হয়ে যায় । আপনি কি ঘরে থাকবেন ?”

“তুমি আমার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে যেও ।”

“আপনারা কি এখানে কালকে থাকবেন ?”

“তাই তো ইচ্ছে আছে ।”

বেয়ারা চলে গেলে অর্জুন সতর্ক পায়ে হাঁটতে লাগল । ভাৰ্মা যদি সামনে পড়েন, তা হলে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলবেন । ফেললে কী করতে পারেন ? না, এই রকম জেদের কোনও অর্থ হয় না । ভদ্রলোককে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ।

চার নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াল অর্জুন । দরজা বন্ধ । সে মৃদু টোকা দিল । ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না । অর্জুন হতাশ হল । তবু দ্বিতীয়বার শব্দ করল অর্জুন । এবং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল । পাজামা-পাঞ্জাবি পরে মিস্টার গুপ্ত বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে । তাঁর হাতে একটা খোলা কলম ।

“হু আর ইউ ? কী দরকার ?”

লোকটার গলার স্বর শুনে অর্জুন থমকে গেল । সে বলল, “আপনাকে বিরক্ত করেছি বলে দুঃখিত । ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি ।”

“দাঁড়াও । তুমি একটু আগে লাউঞ্জে বসে ছিলে, তাই তো ? দিল্লি থেকে এসেছ ?”

“প্রথমটা ঠিক । কিন্তু মেয়েরা দিল্লি থেকে এসেছেন, আমি জলপাইগুড়ির ছেলে ।”

“ও । কী দরকার ?”

“এখন থাক । আপনি সম্ভবত লিখছিলেন, আমি জানতাম না ।”

“ভেতরে এসো ।” রতনলাল গুপ্ত সরে দাঁড়ালেন দরজা থেকে । ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে । সেখানে টেবিলের ওপর লাইন-টানা ফুলস্কেপ

কাগজ, যার অর্ধেকটা লেখা হয়ে আছে। দরজা ভেজিয়ে বিছানায় একধারে বসল অর্জুন।

রতনলাল বললেন, “তোমাকে ‘তুমি’ বলছি বলে কিছু মনে করছ?”

“না, না।”

“গুড। কী নাম তোমার?”

“অর্জুন। আপনি কি কিছু লিখছেন?”

“হ্যাঁ। আমার আত্মজীবনী। তোমরা হয়তো হাসবে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব জীবন আছে। সেই জীবনে নানান গল্প আছে। আমিও ব্যতিক্রম নই। সারা জীবন জঙ্গল আর পাহাড়ে কাটিয়েছি। আমার এক পরিচিত বন্ধুর বন্ধু বাংলা ভাষায় গল্প লেখেন। জঙ্গলের গল্প। তাঁর সঙ্গে একবার লালজির ওখানে আলাপ হয়েছিল। লালজিকে চেনো? অত বড় জঙ্গল-প্রেমিক খুব কম দেখেছি আমি। তা, তখন সেই সাহিত্যিক আমাকে বলেছিলেন, আমরা তো বাইরে থেকে বেড়াতে এসে যা দেখি, তাই লিখি। আপনারা তো ভেতরে রয়েছেন, একটু-আধটু লিখে ফেললে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবে সবাই। কথাটা মনে ধরেছিল হে। তাই এখন কলম ধরেছি।”

রতনলাল গুপ্ত একনাগাড়ে বলে গেলেন।

অর্জুনের ভাল লাগল মানুষটাকে।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, এই রকম ভঙ্গিতে রতনলাল জিজ্ঞেস করলেন, “তা কী কারণে আমার ঘরে আসতে হল, সেটা এখনও বলোনি তুমি?”

“আমরা যদি আগামীকাল সকালে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি?”

“পারবে না।” খুব দ্রুত মাথা নাড়লেন রতনলাল গুপ্ত।

“কেন?”

“আমি বের হব ভোর পাঁচটায়, যখন পাখি ডাকবে। তোমাদের নিশ্চয়ই তখন মধ্যরাত।”

“না, কাল ভোর পাঁচটায় বেরোতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না।”

চোখে চোখ রাখলেন রতনলাল, তারপর সপ্রশংস ভঙ্গি নিয়ে মাথা নাড়লেন।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “আপনার গাড়িতে আমাদের পাঁচজনের জায়গা হবে কি?”

“আমার গাড়ি একটা স্টেশন ওয়াগন। এখান থেকে বেরিয়ে একটা গ্যারাজ পাবে বাঁ দিকে। সেখানে সেটা দাঁড়িয়ে আছে। দু’-একটা কাজ ড্রাইভার করিয়ে নিচ্ছে ওখানে। বুঝতেই পারছ, স্টেশন ওয়াগনের পেটে পাঁচজন কিছুই নয়।”

“নমস্কার। তা হলে কালই দেখা হবে।” অর্জুন হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল। চারপাশ নিস্তব্ধ।

কাঠের এই টুরিস্ট লজে নিশ্চয়ই কেউ চলাফেরা করছে না, হলে শব্দ বাজত। কাল ভোরে যদি চলে যেতে হয়, তা হলে ম্যানেজারকে হিসেব মিটিয়ে দেওয়া দরকার। অর্জুন পা বাড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে ফিরে এল মেয়েদের দরজায়। নন্দিনীর ঘরে মৃদু শব্দ করল। কেউ সাড়া দিল না। দ্বিতীয় বারেও না। অর্জুন আস্তে দরজা ঠেলল। দরজা খুলে গেল। জিনিসপত্র চারপাশে ছড়ানো, কিন্তু ঘরে কেউ নেই। সে বিস্মিত হল। এরা গেল কোথায়? দ্বিতীয় ঘরটিতেও কেউ নেই। ফাঁপরে পড়ল অর্জুন। এমন কথা ছিল না। সে মেয়েদের বারংবার বলে দিয়েছিল ঘর ছেড়ে না বেরোতে। কোথায় খুঁজবে এদের সে? এমন সময় পায়ের আওয়াজ উঠল। অর্জুন দেখল দু'হাতে দুটো ট্রেতে খাবারের প্লেট নিয়ে বেয়ারা আসছে। সে জিজ্ঞেস করল, “এই দুই ঘরের মেমসাহেবদের তুমি দেখেছ? মানে, কোথায় গিয়েছে, জানো?”

“না সাব। খাবার কি ঘরে দিয়ে যাব?”

“হ্যাঁ, দিয়ে ঢেকে রাখো।” অর্জুন দাঁড়াল, যতক্ষণ লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে না যায়। সে বাইরের দিকে যাওয়ার সময় ভাবল একটা টর্চ নিয়ে এলে হয়। প্রথমবার ওটার কথা খেয়াল ছিল না। তার সুটকেসের কোণে একটা টর্চ তো থাকার কথা। অর্জুন উলটো দিকে ফিরল। নিজের ঘরের দরজা টানা ছিল। বাইরে থেকে। কিন্তু সেটা এখন ভেতর থেকে বন্ধ। অর্জুন নক্ করতেই নন্দিনীর গলা পাওয়া গেল। সে জানতে চাইছে কে এসেছে। অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল, “খুলুন, আমি।”

টিনা দরজা খুলতেই নন্দিনী বলল, “স্যরি। আপনাকে না জানিয়ে এই ঘর দখল করেছি।”

অর্জুন দেখল, দুটো খাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মেয়েরা তাস খেলছে। সে খুব বিরক্ত হল, “আপনারা কাজটা ঠিক করেননি। আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম ঘর থেকে না বেরোতে।”

“ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকেছি।”

“নিজেদের ঘরে ফিরে যান, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।”

নন্দিনী উঠে বসল, “লুক মিস্টার মহাভারত! আপনি তখন থেকে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমরা বেড়াতে আসিনি, কোনও ক্রিমিনালের ডেরায় ঢুকে পড়েছি। আমি এখনই ভার্মা-আক্সলের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করছি, কেন তিনি আমাদের অনুসরণ করছেন বা আদৌ করছেন কি না?”

“উনি স্বীকার করবেন বলে মনে করছেন?”

“অস্বীকার করলে সব সমস্যা মিটে গেল।”

অর্জুন হাসল, “আপনি আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই একটা বিকল্প ব্যবস্থা করেছি। আপনারা তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। কাল ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে সবাই উঠে

পড়ব। ঠিক পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে এই লজ ছেড়ে সামনের একটা গ্যারাজে যাব। পাঁচটায় গাড়ি ছাড়বে। পরিষ্কার?”

টিনা প্রায় চিৎকার করে উঠল, “ইম্পসিবল! আমি অত সকালে উঠতেই পারব না।”

“এটা আপনাদের ওপরে নির্ভর করছে। চেষ্টা করলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।”

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, “আমরা কেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি?”

“আমরা যে চলে যাচ্ছি, তা মিস্টার ভার্মাকে জানতে দিতে চাই না।”

“উনি জানেন যে, আমরা এখানে রয়েছি?”

“জানাটা অস্বাভাবিক নয়।”

নন্দিনী তার পকেট থেকে একটা পার্স বের করে চারটে একশো টাকার নোট এগিয়ে ধরল, “তা হলে পেমেন্ট করে দিন।”

“এত লাগবে না।”

“ব্যালান্সটা রেখে দেবেন। খরচ তো আপনিই করবেন। আমার কাছে টাকা আছে, যখন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।”

“টাকাটা আপাতত আপনাকে দিতে হবে না। মিস্টার রায় যে খামটা আপনার হাতে পাঠিয়েছেন, তাতে কিছু টাকা আছে। অবশ্য সেটা মিস্টার অমল সোমের পারিশ্রমিক। আপাতত আমি সেখান থেকেই খরচ করছি। যান, নিজেদের ঘরে চলে যান।”

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মেয়েরা একে একে উঠে যেতেই, বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ম্যানেজার সাহেব কোথায়?”

“দু’ নম্বর ঘরে।”

“দু’ নম্বরে কে আছেন?”

“ওই যে, এক সাহেব একটু আগে এলেন।”

“ঠিক আছে, কিন্তু ম্যানেজার সাহেবকে এখনই আমার একটু দরকার।”

“ডেকে দেব?”

“দাও।”

খাবার ঢাকা দিয়ে বেয়ারা চলে গেলে অর্জুন খাম থেকে টাকা বের করে ঘরের বাইরে পা দিল। বেয়ারার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে সে দোতলায় চলে এল। দু’ নম্বর ঘরের দরজায় বেয়ারা মৃদু শব্দ করল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্জন ভেসে এল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কেউ চিৎকার করেই দরজা খুলে চোস্ত হিন্দিতে ধমক দিল, “কী চাই এখানে? এত বার বলে দিলাম ম্যানেজারকে, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। কেন এসেছ, কী চাই?”

এই সময় ম্যানেজার ছুটে এলেন, “আরে কী হয়েছে? কেন দরজায় নক করছ?” তারপর ঘরের দিকে ফিরে বললেন, “আই অ্যাম সরি মিস্টার পুরি।

আর এমন হবে না । ”

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল । আর কিছুটা দূরে দাঁড়ানো অর্জুন হতভম্ব । মিস্টার পুরি ? সে কি ঠিক শুনল ? অসম্ভব । সে স্পষ্ট দেখেছে মিস্টার ভার্মাকে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে । কিন্তু ততক্ষণে বেয়ারা ম্যানেজারকে বোঝাচ্ছে, কেন সে দু’ নম্বরের দরজা নক্ করেছিল । ম্যানেজার অর্জুনকে দেখে নিয়ে বেয়ারাকে বললেন, “দু’ নম্বরের ঘরে কেউ যেন আজ রাত্রে না যায় । ” তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এনি প্রব্লেম ?”

অর্জুন এগিয়ে এল, “আমি বিল ক্রিয়ার করতে চাই । ”

“কেন ? আপনারা কাল ব্রেকফাস্ট নেবেন না ? ”

“না । ”

ম্যানেজার আর কথা বাড়ালেন না, “আসুন । ”

ভদ্রলোককে অনুসরণ করল অর্জুন । খাতা বের করে ম্যানেজার বিল কাটলেন । টাকা মিটিয়ে দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওই ভদ্রলোক অত বিরক্ত হলেন কেন ? ”

কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যানেজার, “মানুষের ধরন এক-এক জনের এক-এক রকম । ”

“কী নাম ভদ্রলোকের ? ” অর্জুন খাতা দেখল প্রশ্ন করেই । ম্যানেজার জবাব দেবার আগেই সে নাম পড়ে নিয়েছে, এস এম পুরি, পাটনা ।

“উনি কি এখনই এলেন ? ”

“হ্যাঁ, এই একটু আগে । ”

অর্জুন তার আগের নামটি পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগে ম্যানেজার খাতাটা বন্ধ করে দিয়েছেন । বেশি কৌতূহল দেখানো এক্ষেত্রে সমীচীন হবে না ভেবে অর্জুন সরে এসে লাউঞ্জে দাঁড়াল । তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, ভার্মাই এখানে নাম পালটেছেন । এবং যদি কোনও লোকের বদ মতলব না থাকে, তা হলে সে নাম পালটায় না ।

অন্ধকার মাঠ, দূরের হাইওয়ের আলো, মাঝে-মাঝে ছুটে যাওয়া লরির হেডলাইট দেখতে দেখতে অর্জুনের এক-ধরনের অস্বস্তি শুরু হল । মাংরা লোকটা সোনা বিক্রি করতে এসেছিল । এবং এখন চোখ বন্ধ করেই বলা যায়, সোনাটা মাংরার পৈত্রিক সম্পত্তি নয় । অর্থাৎ, এই রকম ‘মাংরা’-দের পেছনে কেউ আছেন, যাঁর সোনা পালটে টাকা পাওয়া দরকার । অবশ্যই এই সোনা কালো পথে পাওয়া, তাই ন্যায্য দামে বিক্রি করার সাহস তাঁর নেই । কিন্তু মাংরাদের তিনি সংগঠিত করলেন কী করে, এটাই ভাবার কথা । কাল সকালে এখানকার পাট চুকিয়ে চলে গেলে এই ব্যাপারটার সঙ্গেও তার সম্পর্ক চুকে যাবে । অর্জুন ঠিক করল, জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে অমল সোমকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবে । যদি তখনও খুব দেরি না হয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই

অমলদা অনুসন্ধান করতে পারেন ।

অর্জুন সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল । বাঁ দিকে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে । লজের আলো ওর গায়ে পড়েছে । ট্যাক্সির ভেতরে কেউ নেই । কিন্তু নম্বরের প্লেটটা ভাল করে দেখে অর্জুন লজের দিকে তাকাল । না, আর কোনও সন্দেহ নেই, ভার্মাই লজে এসেছেন । এই ট্যাক্সি তাদের নিয়ে এয়ারপোর্ট ছুটেছিল, এটাই শিলিগুড়ির বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়েছিল ।

অর্জুন অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে হাইওয়ের দিকে হাঁটতে লাগল । বাসস্ট্যাণ্ডে এখন কোনও মানুষ নেই । এমন কি, চায়ের দোকানের রুপড়িগুলো পর্যন্ত ঝাঁপ-ফেলা । অর্জুন হাইওয়ে ধরে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল । গ্যারেজের মুখে হাজারক রুলছে । স্টেশন ওয়াকনটাকে নজরে পড়ল, এটি রতনলাল গুপ্তর বাহন নিশ্চয়ই । গ্যারাজের পাশেই একটা লাইন হোটেল । এ রকম জায়গায় বলদেব নামের লোকটার খবর পাওয়া যেতে পারে, যে মাংরা আর ভার্মাসাহেবের মধ্যে সংযোগ রেখে চলে ।

গোটা পাঁচেক লোক বেষ্টিতে বসে থাকছিল । এ সব জায়গায় দিশি-বিদেশি পানীয় রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্যেই বিক্রি হয় । বেশির ভাগ খদ্দেরই ড্রাইভার । দূর-পাল্লার লরি থামিয়ে তারা খাওয়া-দাওয়া করতে আসে । অর্জুন ঢুকতেই একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এল, “বলিয়ে সাব ।” এবং তখনই সে সেই ড্রাইভারকে দেখতে পেল । মন দিয়ে রুটি-মাংস খাচ্ছে । অর্জুন ছেলটাকে হাত নেড়ে ‘না’ বলে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল । লোকটা আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে খাবারে মন দিতে গিয়ে আবার মুখ ফেরাল, “খুব চেনা লাগছে ।”

অর্জুন হেসে সিগারেট ধরাল, “আজ আপনার গাড়িতে আমি এয়ারপোর্ট-এ গিয়েছিলাম ।”

লোকটার মনে পড়ল, ‘ওহো ! হ্যাঁ । আসলে এত প্যাসেঞ্জার রোজ তুলি, কিন্তু আপনি এখানে ? কখন এলেন ?”

“এই তো একটু আগে । আপনি ভাড়া নিয়ে এসেছেন বুঝি ?”

“হ্যাঁ । একটা বড় পার্টি পেয়েছি । সেই ভদ্রলোক—যিনি এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন । এখন ডেইলি বেসিসে গাড়ি নিয়েছেন, পেট্রল-মবিল ওঁর ।”

“শিলিগুড়ি থেকেই চলে এলেন ?”

“না । এখানে-ওখানে উনি কাজ মেটাতে মেটাতে আসছেন ।”

“ব্যবসায়ী ?”

“তাই মনে হয় ।” ড্রাইভার খেতে খেতে বলল, “আমি তো বুঝতেই পারছি না, কী কাজ । প্রায়ই গাড়ি দাঁড় করিয়ে, দশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার জন্যে উধাও হয়ে যান । আমাকে অবশ্য অ্যাডভান্স দিয়েছেন, টাকা মার যাওয়ার কোনও ভয় নেই ।”

“এখান থেকেই ফিরে যাবেন ?”

“জানি না ভাই । বলেছেন গাড়িতেই শুতে । হট করে নাকি প্রয়োজন হতে পারে ।”

অর্জুন বুঝল, লোকটাকে ভার্মাসাহেব অন্ধকারে রেখেছে । এর কাছে নতুন কোনও খবর পাওয়া যাবে না । হঠাৎ লোকটা জিজ্ঞেস করল, “আপনি কিছু খাবেন না ?”

“নাঃ, আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি । লোকটাকে আমি চিনি না, নামটা জানি, বলদেব—এ রকম নামের কোনও লোককে এখানে দেখেছেন ? মানে, কেউ যদি ডেকে থাকে নাম ধরে ।” অর্জুন আন্দাজে একটা টিল ছোঁড়ার চেষ্টা করল ।

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, “না, আমি শুনতে পাইনি । বলদেব কি পাঞ্জাবি ?”
“হ্যাঁ ।”

“না, কোনও পাঞ্জাবিকে তো এখানে আমি আসার পর দেখিনি ।”

অর্জুন মাথা নাড়ল । তারপর, “আচ্ছা, চলি,” বলে উঠে এল বাইরে ।

ভোর সাড়ে চারটের সময় দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের । বিছানায় শুয়েই সে সময়টা দেখল, তারপর তড়াক করে উঠে পড়ল । এই সময় দ্বিতীয়বার শব্দ হল । অর্জুন এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে অবাক হল । নন্দিনী দাঁড়িয়ে আছে বাইরে বেরোবার পোশাকে তৈরি হয়ে । হেসে বলল, “মিস্টার মহাভারতা, আর মাত্র আধঘণ্টা দেরি আছে ।”

“অনেক ধন্যবাদ । আমি এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি ।” অর্জুন ব্যস্ত হল ।

“আমরা চারজনই তৈরি । যদি অনুমতি দেন, তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়তে পারি । গাড়িটা গ্যারাজে থাকবে বলেছিলেন, গ্যারাজটা কোন দিকে ?”

অর্জুন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল । এখনও পৃথিবী জুড়ে ঘন অন্ধকার । সে মাথা নাড়ল, “একটু অপেক্ষা করুন । বাইরে এখনও আলো ফোটেনি, আমরা একসঙ্গে যাব ।”

“আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন । আমরা যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক । বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয় । তা ছাড়া আমি ক্যারাটে জানি ।”

“খুবই ভাল কথা । তবু জায়গাটা আপনাদের অচেনা । আলোও নেই । পথ গুলিয়ে ফেললে মিস্টার রতনলাল গুপ্ত আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না ।”

“রতনলাল গুপ্ত ?”

“কাল রাতে লাউঞ্জে বসে ছিলেন যে ভদ্রলোক ।”

“আচ্ছা । আমরা তাঁর গাড়িতে যাচ্ছি ? উনি কোথায় ?”

“আমাদের সঙ্গে গাড়িতেই ওঁর দেখা হবে ।”

নন্দিনী হাসল, “আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান । তৈরি হয়ে নিন ।”

পাঁচটা বাজতে দশে অর্জুন মেয়েদের নিয়ে বের হল। সে প্রত্যেককে সাবধান করে দিয়েছিল, যাতে কাঠের মেঝেতে পায়ের শব্দ না হয়। কোনও অভিথির ঘুম ভাঙতে চায় না সে। ধীরে ধীরে ওরা লাউঞ্জের মুখে চলে এল। একটা হলদেটে বাল্ব জ্বলছে লাউঞ্জের মুখে। লজের কেউ জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। অর্জুন চাপা গলায় বলল, “আমি আগে লাউঞ্জ পার হয়ে যাচ্ছি। আপনারা পর-পর নিশেদে চলে আসুন।”

অর্জুন গিয়ে ট্যাক্সির পিছনে দাঁড়াল। ভেতরের সিটে ড্রাইভার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ট্যুরিস্ট লজটাকে এখন ভৌতিক বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ একটি ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ওটা কত নম্বর ঘর, বুঝতে পারছে না অর্জুন নীচ থেকে। যদি মিস্টার ভার্মা জেগে ওঠেন, তা হলে এই চুপিসাড়ে চলে যাওয়ার কোনও মানে থাকবে না। অর্জুন প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করেই লক্ষ করল, মেয়েরা একে একে নিশেদে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল। সে আর দাঁড়াল না। ঠোঁটে একটা শব্দ করে এগিয়ে গেল অন্ধকার মাঠের দিকে। মেয়েরা আসছে পেছনে। কেউ কোনও কথা বলছে না। সম্ভবত অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছে ওরা। বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছানো মাত্র অর্জুনের কানে মোটরবাইকের আওয়াজ ভেসে এল। মোটরবাইক আসছে শিলিগুড়ির দিক থেকে। সাধারণত এত রাতে—যেহেতু এখনও অন্ধকারই, তাই রাতই বলা উচিত—কেউ ডুয়ার্সের রাস্তায় মোটরবাইক চালায় না। অবশ্য কাছেপিঠের চা-বাগান থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনে কেউ ওই সময় বেরোতে পারে। ওরা হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। পিচের রাস্তা আলোকিত করে ছুটে আসছে। অর্জুন মেয়েদের ইশারা করল চায়ের দোকানের বুপড়ির পেছনে দাঁড়াতে। মোটরবাইকটা হাইওয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলে আবার হাঁটা শুরু করবে ওরা। অন্তত ওর হেডলাইটের আলোয় নিজেদের আলোকিত করার কোনও মানে হয় না। দূর থেকেও জেগে-থাকা কেউ সেটা দেখে বুঝতে পারবে।

মোটরবাইকটার স্পিড কমতে লাগল। শেষ পথটুকু বরাবর আলোকিত করে সেটা নেমে এল হাইওয়ে থেকে, মাঠের ভেতরে ঢুকে সোজা ট্যুরিস্ট লজের সামনে গিয়ে থামল।

অর্জুন অবাক হল। এই ভোরের আগে কে এল লজে মোটরবাইক চালিয়ে? পাশ দিয়ে লোকটা যখন মাঠে নামল, তখন স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে ওর সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই। তা হলে এখনই কী প্রয়োজন পড়তে পারে? এই সময় পুনম বলল, “আমাদের কি দেরি হয়ে যাচ্ছে? পাঁচটা বাজতে আর মাত্র দু’মিনিট বাকি আছে।”

ওরা দৌড়তে লাগল। হাইওয়েতে পায়ের শব্দ বাজল। পূর্বের আকাশ একটা নীল ছোপ মাখতে আরম্ভ করেছে। গ্যারাজের বাইরে দাঁড়িয়েছিল গাড়িটা। তার গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল এক নেপালি ড্রাইভার।

অর্জুন তার সামনে পৌঁছে বলল, “মিস্টার গুপ্ত এখনও আসেননি ?”

ড্রাইভার জবাব দেবার আগেই পেছন থেকে গলা শোনা গেল, “গুড মর্নিং ।”

ওরা পাঁচজন পেছন ফিরে দেখল একটা বড় ব্রিফকেস হাতে নিয়ে মিস্টার গুপ্ত আসছেন । তিনি যখন গাড়ির সামনে এলেন, তখন কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটা । রতনলাল গুপ্ত আবার বললেন, “গুড মর্নিং এভরিবডি ।”

মেয়েরা প্রায় একই সঙ্গে জানান দিল, “গুড মর্নিং ।”

রতনলাল বললেন, “কাঞ্চা, পেছনের দরজা খুলে দাও, এঁরা আমাদের সঙ্গে যাবেন ।” তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলেন, “খুব অবাধ হয়ে গেলাম । ইয়ং লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান যে এত সময়-মাফিক বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে, তা আমি ভাবিনি ।”

মেয়েরা হাসল । অর্জুন কিছু বলল না ।

স্টেশন-ওয়াগনটা একটু নিজস্ব ধরনের । ড্রাইভারের সিটের পাশে দু’জন বসতে পারে । পেছনে ড্রাইভারের দিকে মুখ ফেরানো সিটে বারোজনের অবলীলায় বসে যেতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয় । রতনলাল মেয়েদের দু’জনকে সামনে বসতে, বললে নন্দিনী আর চিকি সেখানে উঠে পড়ল । পেছনের সিটের মাঝখানে বসল অর্জুন । দুটো মেয়ে দু’ দিকের জানালায় । স্টেশন-ওয়াগনের আরও পেছনে জিনিসপত্র জুপ হয়ে রয়েছে । গাড়ি ছাড়ল ।

সবে ভোর হচ্ছে । সূর্যদেব এখনও দেখা দেননি । কিন্তু অন্ধকার ফরসা হতে আরম্ভ করেছে । হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে স্টেশন-ওয়াগন । দু’ পাশের গাছগুলো থেকে অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে । অর্জুন পেছনে তাকাল । সূর্য ওঠার আগের আলোয় মায়াবী হয়ে শূন্য রাজপথ পড়ে আছে । কাউকে সে অনুসরণ করতে দেখল না । রতনলাল গুপ্ত হাসি-হাসি মুখে বসে আছেন । নন্দিনী ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই সব নদী কি বর্ষার সময় ফেরোসাস হয়ে যায় ?”

স্টেশন-ওয়াগন তখন একটা শুকনো নদীর ওপর পাতা ব্রিজ পেরিয়ে ছুটছিল । রতনলাল বললেন, “মাই ডিয়ার ইয়ং লেডিস, যদি অনুমতি দাও তা হলে বলি, বর্ষাকালে এই সব নদীর চেহারা সুন্দর হয়ে যায় । এখন তো হাড়-জিরজিরে, নুড়ি আর পাথরের ফাঁকে তিরতিরে জল । দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায় ।”

চালসা পেরিয়ে খুনিয়ার মোড়ে পৌঁছনো মাত্র সূর্যদেব দেখা দিলেন । গাড়ি থামাতে বললেন রতনলাল, “বাঁ দিকের রাস্তাটা দ্যাখো কী সুন্দর । দু’ পাশে ঘন জঙ্গল আর মাঝখানে সরু পিচের রাস্তাটা চলে গেছে ঝালং বিন্দু পর্যন্ত । জলঢাকা হাইড্রো-ইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্ট সেখানে । এই জঙ্গলটার নাম চাপড়ামারি ।”

অর্জুন নামটা কানে যাওয়ামাত্র সোজা হয়ে বসল, “আরে, আমাদের তো

এখানেও থাকার কথা ছিল। চাপড়ামারি ফরেস্ট বাংলাে।”

রতনলাল গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, “তা হলে এখন তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে?”

মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অর্জুন বলল, “হলং-এ।”

“হলং তো ফুন্টসিলিং-এর মুখে। যাওয়ার পথে নামিয়ে দিতে পারি।”

অর্জুন চিন্তায় পড়ল। শিলিগুড়ির টুরিস্ট ব্যুরোর ভট্টাচার্যদা বলেছিলেন চাপড়ামারি, গরুমারা এবং হলং-এ তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে। যত দূর মনে হচ্ছে, কথা ছিল মালবাজারেই খবরটা পাওয়ার। কিন্তু ম্যানেজার তো কিছুই জানাননি এ-ব্যাপারে। যদি এমন হয় উনি ভেবেছেন...যা ভাবুন তিনি, লিফট যখন পাওয়া, গিয়েছে একেবারে হলং চলে যাওয়া যাক।

পথে বিনাগুড়ি নামের একটা জায়গায় গাড়ি থেমেছিল। চা খাওয়া হল। অর্জুন আশ্বস্ত হল এই কারণে যে, জায়গাটা চোখে পড়ার মতো নয়। চার-পাঁচটা দোকান দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না কারও।

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, “ডুয়ার্স কি এটাকেই বলে?”

রতনলাল বললেন, “হ্যাঁ। জঙ্গল, নদী, চাষের জমি নিয়েই ডুয়ার্স।”

বীরপাড়ার পাশ দিয়ে মাদারিহাট হলে এল গাড়িটা। রতনলাল জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের কোথায় ব্যবস্থা হয়েছে? বাইরের বাংলাটাকে বলে ‘মাদারিহাট ফরেস্ট বাংলাে’ আর জঙ্গলের ভেতরে ছয় কিলোমিটার গেলে ‘হলং রেস্টহাউস’।” বলতে বলতে গাড়িটা একটা গেটের সামনে দাঁড়াল। এখানে রাস্তা বাঁক নিয়েছে। ডান দিকে ঝিঝি ডেকে চলেছে ছায়া-ছায়া জঙ্গলে একটানা। কেমন রহস্যময় চার ধার। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা নুড়ির রাস্তা চলে গেছে। তারই মুখটি পোল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, যাতে বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। এক পাশে পাহারাদারদের ঘর। একজন লোক গাড়ি থামতেই বাইরে এসেছিল। রতনলাল অর্জুনকে বললেন, “ওখানে গিয়ে অনুমতি নাও ভেতরে যাওয়ার জন্যে।”

অর্জুনের হাটতে ভাল লাগল। সে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, “হলং কি এই রাস্তায় যাব?”

লোকটা মাথা নাড়ল, “রেস্ট হাউসে থাকবেন?”

“হ্যাঁ।”

“পাশ দিন। খাতায় এনট্রি করতে হবে।”

“পাশ? আমাদের সঙ্গে তো পাশ নেই। টুরিস্ট অফিসার বলেছেন এখানে আমাদের ব্যবস্থা থাকবে।”

এই সময় রতনলাল গুপ্ত নেমে এলেন। তাঁকে দেখামাত্র লোকটি কপালে হাত ঠেকাল। রতনলাল বললেন, “এদের জন্য ব্যবস্থা আছে। পরে খাতায় নোট করো। এখন গেট খুলে দাও, আমার তাড়া আছে।”

লোকটা চটজলদি গেট খুলে দিল। নন্দিনী বলল, “আপনাকে তো ও বেশ খাতির করে। একটুও প্রতিবাদ করল না।”

রতনলাল বললেন, “দীর্ঘকাল এক সঙ্গে থাকলে গাছেরাও বন্ধু হয়ে যায়।”

দু’ পাশে জঙ্গল, নুড়ি বিছানো পথ, পাখির ডাক আর মাঝে-মাঝে বাঁদরের দর্শন, বেশ ভাল লাগল হুৎ-এ পৌঁছতে। এবার ডান দিকে পর-পর কয়েকটা কাঠের বাড়ি, কোয়ার্টার্স এবং বনবিভাগের সাইনবোর্ড। দু’জন ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে আসছিলেন। রতনলাল তাঁদের দেখে গাড়ি থামাতে বললেন। ওঁরা থেমে গিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাতে রতনলাল গাড়ি থেকে নামলেন, “নমস্কার, মিস্টার বিশ্বাস। ভাল তো? জঙ্গলের খবর কী?”

“ভাল।” মিস্টার বিশ্বাস এগিয়ে এলেন। অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা।

“আমার কিছু তরুণ বন্ধু এসেছেন। শিলিগুড়ির ট্যুরিস্ট অফিসার কথা দিয়েছেন জায়গা করে দেবেন।”

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “তিনটে ঘর তো? টেলিফোন পেয়েছি। রুম নম্বর পাঁচ ছয় সাত আপনাদের জন্যে অ্যালট করা আছে।” শেষ কথাগুলো অর্জুনের দিকে তাকিয়ে, “আপনারা চেক ইন করে যান, পরে খাতায় সই করবেন।”

রতনলাল বললেন, “ইনি রেঞ্জার, এখানকার কর্তা।”

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “কী যে বলেন। আপনার মতো জঙ্গলকে যদি ভালবাসতে পারতাম, তা হলে গর্বিত হতাম।”

“ভাই, জঙ্গলে চাকরি করতে গেলে জঙ্গলকে ভালবাসতেই হবে। কিছু দিন থাকলে অবশ্য জঙ্গল আপনাকে জোর করে ভালবাসবে। ইনি কে?”

“ওহো, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার আহমেদ। থানার চার্জ নিয়ে জয়েন করেছেন। আর ইনি রতনলাল গুপ্ত। এঁর পরিচয় কি আপনি শুনেছেন মিস্টার আহমেদ?”

পুলিশ অফিসার যে এমন রূপবান হয়, তা অর্জুনের জানা ছিল না। মিস্টার আহমেদ দু’ হাত যুক্ত করে নমস্কার করলেন, “অবশ্যই। আমি এর আগে লাটাগুড়িতে ছিলাম। তখন উনি লালজির সঙ্গে গুরুমারা ফরেস্টে গিয়েছিলেন।”

রতনলাল বললেন, “হ্যাঁ। আমারও মনে পড়েছে। আপনার চেহারা একবার দেখলে ভোলা সম্ভব নয়। তা এখানকার খবর কী?”

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “এখন আমাদের নিরাপদে রাখার দায়িত্ব মিস্টার আহমেদের ওপর। জানেন তো, আমরা এখন কী রকম আতঙ্কে আছি!”

রতনলাল কিছু বললেন না। গাড়ি একটা সাঁকো পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। দু’ পাশে ঘন জঙ্গল। ডান দিকে আর-একটা রাস্তা বেঁকে গিয়েছে। সোজা পৌঁছে গেল গাড়িটা লন পেরিয়ে বাংলোর নীচে। গাড়ি থেকে নেমে পুনম চৈচিয়ে উঠল, “বিউটিফুল।”

সত্যিই সুন্দর। অর্জুনও মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবির মতো তিন তলা কাঠের বাংলা। বাংলা থেকে কিচেনে যাওয়ার জন্যে একটা ঘেরা প্যাসেজ। ও পাশে লনের শেষে একটা ছোট্ট ঝরনা। ঝরনার গায়েই সুন্দর একটা ঘাসের মাঠ, যার মাঝখানে নুনের মাটি রাখা হয়েছে জস্ট-জানোয়ারের স্বাদ পালটানোর জন্যে। আর চার পাশের ঘন জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে পাখির চিংকার, ঝিঝির টানা শব্দ। দু'জন বেয়ারা ছুটে এসেছিল গাড়ির শব্দ শুনে। নন্দিনী তাদের বলল “রুম নম্বর পাঁচ, ছয় আর সাত।”

লোক দুটো ইতস্তত করছিল, কাগজ ছাড়া সম্ভবত এখানে ঘর দেওয়া হয় না। অর্জুন বলল, “রেঞ্জার সাহেব আমাদের নম্বরটা বলে দিয়েছেন।”

এবার কাজ হল। মেয়েরা রতনলালের কাছে বিদায় নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে তিনি বললেন, “চলি ভাই, আমার একটু দেরিই হয়ে গিয়েছে।”

অর্জুন বলল, “আপনি আমাদের খুব উপকার করলেন। আপনার সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি আরামে এখানে পৌঁছতে পারতাম না।”

রতনলাল হাত তুলে ওকে থামতে বলে গাড়িতে উঠে বসলেন। তারপর মুখ বের করে বললেন, “আমার সন্দেহ, কোনও ঝামেলা এড়াতেই তোমরা এত ভোরে মালবাজার ছেড়ে এসেছ। আমি জানতে চাই না সেটা কী। কিন্তু ইফ এনি প্রবলেম সোজা ফুন্টশিলিং-এর কাফে দ্য মাউন্টেন-এ আমার খোঁজ করো।”

অর্জুন দেখল, গাড়িটা বেশ দ্রুতই বাংলার লন থেকে বেরিয়ে গেল। তার সুটকেস বেয়ারা তুলে নিয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল সে। দোতলায় বাঁক নেবার মুখে অর্জুন এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলার পরনে পা-ঢাকা ম্যাক্সি। কিন্তু দৃষ্টি অদ্ভুত। এমন দৃষ্টি বড় একটা চোখে পড়ে না। যেন এক্স-রে আই দিয়ে বুকের হাড় পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জুন তিন তলায় উঠে এল। পাঁচ-ছয় নম্বর ঘর দুটি মেয়েরা দখল করে নিয়েছে। সাত নম্বরের সামনে বেয়ারাটি দাঁড়িয়েছিল। অর্জুনকে দেখামাত্র কপালে হাত ঠেকাল, “ব্রেকফাস্ট লাগবে স্যার?”

“কী পাওয়া যাবে?”

“টোস্ট, ওমলেট, ফিশ ফ্রাই, চা।”

“সাবাস। জলদি করো। পাঁচ, ছয়, সাত নম্বরের জন্যে।”

অর্জুন ঘরে ঢুকল। এটিও ডাবল-বেড রুম। বাথরুম চমৎকার। পাখা, আলো আছে। বিছানা ধবধবে। আর কী চাই? জুতো পরেই শুয়ে পড়ল অর্জুন। এখন অন্তত এই সকালটায় মেয়েদের বিশ্রাম করা উচিত। কাল অত রাত অবধি জাগার পর আজ রাত থাকতেই তৈরি হয়েছে সবাই। ক্লান্ত না হয়ে কেউ পারে?

এখন তার বন্ধ চোখের পাতায় পর-পর অনেকগুলো মুখ। ভার্মা কি তাদের খোঁজ পাবেন? না, কোনও চান্স নেই। তারা মালবাজার থেকে ট্রান্সপোর্ট ভাড়া করলে তবু একটা সুযোগ থাকত। লোকটাকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। যদি দিল্লির ব্যবসায়ী হয়, তা হলে নর্থ বেঙ্গলের গরিবদের মধ্যে সোনা ছড়াতে আসবে কেন? আর ট্যুরিস্ট-লজের পুরি নামের লোকটাই বা কে? অমন মেজাজ দেখাতে গেলেন কেন বেয়ারার ওপর। ঘরের দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক কী করতে পারেন? ভোরের মোটরবাইক-আরোহী কার কাছে এসেছে? যদি ওদের দু'জনের একজন হয়, তা হলে কি তিনি মিস্টার পুরি? এ ক্ষেত্রে ভার্মার ওপর থেকে সন্দেহ তুলে নিতে হয়।

অর্জুন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেয়ারার ডাকে ঘুম ভাঙল। লোকটা ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখ ধুয়ে এসে ব্রেকফাস্ট খেল। পরিমাণ কম নয়। মুখ তুলে জানালা দিয়ে তাকাল। এক-পাল হনুমান ঝরনার ও পারের ঘাসের জঙ্গলে বসে আছে। একজন বসেছে নুনের ঢিবির ওপর। যেন সে সভাপতি, আর তার বক্তৃতার শ্রোতা সবাই। দৃশ্যটি বড় ভাল লাগল। অর্জুনের ঘুমের রেশটা তখনও কাটেনি। সে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল জুতো খুলে। সেটা খোলামাত্র বেশ আরাম হল।

চারটে মেয়ে একঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট করল। জঙ্গলের এত ভেতরে এমন ভাল খাবার ওরা মোটেই আশা করেনি। নন্দিনী বলল, “চল, একটা চক্কর দিয়ে আসি।”

টিনা চশমা ঠিক করতে করতে বলল, “আমাদের গাইড কী বলে দ্যাখো।”

চিকি ঠোট বাঁকাল, “আমরা বাচ্চা নাকি? এমনিতে মাঝরাতে ঘুম ভাঙাল ফালতু ভয় দেখিয়ে। আমরা এখানে কোনও বিপদে পড়ব না। শুধু জঙ্গলের বেশি ভেতরে না গেলেই হল।”

চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে অর্জুনের ঘরের দিকে তাকাল। দরজা ভেজানো, কিন্তু সে দিকে ওরা পা বাড়াল না। নীচে নেমে ওরা বাংলা থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের রাস্তাটা ধরল। সুনসান নির্জন পথ, পাখির চিংকার ছাড়া এখন বাতাসের শব্দ বাজছে গাছের ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়। রোদ-ছায়ায় জাফরি-কাটা পথে হাঁটতে ওদের খুব ভাল লাগছিল। দেখতে দেখতে বাংলা এবং আশেপাশের কোয়াটার্স চোখের আড়ালে চলে গেল। এখন শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। ওরা একটা ছায়াঘন কালভার্টের ওপর এসে দাঁড়াল। নন্দিনী বলল, “কী দারুণ রোমান্টিক জায়গা!”

চিকি বলল, “আমি একটা গান গাইব?”

টিনা বলল, “গাইলে হিন্দি ছবির হিরোইনের মতো নেচে-নেচে গাইতে হবে।”

পুনম কালভাটের তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া সরু কালো জলের ধারাটিকে দেখল। জঙ্গলের অন্ধকারে যেখানে ধারাটি ঢুকে গেছে সেখানে বাঁশের জঙ্গল, পাতাগুলো জল ঢেকে রেখেছে। কেমন গা-ছমছমে রহস্য ওখানে।

চিকি ততক্ষণে লাফ দিয়ে কালভাটের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। তারপর এক হাত আকাশে তুলে একটি জনপ্রিয় হিন্দি ছবির গান ধরল। অবিকল নায়িকাদের ভঙ্গি করে সে এমনভাবে নাচতে লাগল নিজের গানের সঙ্গে যে, মেয়েরা হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহ জানাচ্ছিল। নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে চিকি নানান জায়গায় দৌড়াচ্ছিল। শেষে তরতর করে নেমে গেল পাথরে পা ফেলে ঝোঁরা জলের ধারে। তার ভঙ্গি এখন নায়িকাদের গানের শেষ পর্বের মতো। শরীর টো-এর ওপর রেখে শরীর ঘোরাচ্ছে সে। মেয়েরা কালভাটের ওপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে চিকিকে উৎসাহ দিচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে চিকি কালভাটের নীচের দিকে তাকাতেই তার গলার গান বন্ধ হয়ে গেল। হাত উঠল মুখের ওপর, চোখ বিস্ফারিত হল, কিন্তু সেটা মাত্র দু'-তিন সেকেন্ডের জন্য। আচমকা একটা তীব্র চিংকার ছিটকে এল তার গলা থেকে। নন্দিনী চৈতন্যে উঠল, “কী হল ? এই চিকি ?”

ভূত দেখার মতো দৌড়ে চিকি পাথরগুলো ডিঙিয়ে ওপরে উঠে এল। তার মুখ এখন একদম সাদা। বন্ধুরা দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। নন্দিনী ওর মুখ ধরে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ?”

চিকির কথা বলতে সময় লাগল। সে কোনও মতে বলতে পারল, “ভূত।”

“ভূত ?” হ্যাঁ হয়ে গেল তিনজন, নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, “কী যা তা বলছিস ?”

চিকি বাঁ হাত বাড়িয়ে ঝোঁরাটাকে দেখাল, “ওই যে ওখানে !”

ওরা কালভাটের তলা দিয়ে বয়ে-যাওয়া কালো জলের ঝোঁরা দেখল। নন্দিনী হেসে উঠল, “দূর ! ভূত বলে কিছু আছে নাকি ?”

চিকি তখন ঢোক গিলছে। কথা বলার ক্ষমতা ভাল করে পাচ্ছে না বেচার। একটু আগে যে মেয়ে নাচ-গান করছিল, সে এখন রক্তশূন্য।

পুনম জিজ্ঞেস করল, “ভূতটা কোথায় ?”

চিকি কাঁপা গলায় জবাব দিল, “নীচে, কালভাটের নীচে।”

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর চিকিকে ওপরে রেখে পাথরে পা ফেলে নীচে নামতে লাগল। ওরা কেউ কোনও কথা বলছিল না। গভীর মুখে জলের ধারে পৌঁছে মুখ ফেরাতেই হতভম্ব হয়ে গেল তিনজনে। কালভাটের নীচে একটা মানুষ বসে আছে পাথরে হেলান দিয়ে। সে যে মৃত, তা বলে দেওয়ার দরকার হয় না। সঙ্গে-সঙ্গে পুনম আর টিনা ছুটতে লাগল ওপরে। নন্দিনী সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। লোকটার শরীরের নিম্নাংশ জলের মধ্যে, শ্রোত বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। উদ্ভাঙ্গি শুকনো।

পরনে খুব মলিন ধূতি আর গেঞ্জি । এ দিকের কোনও শ্রমিক হবে । মুখ-চোখ বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না । নন্দিনী চার পাশে তাকাল । কোথাও কেউ নেই । জঙ্গলের জীবন নির্বিঘ্নে চলছে । সে ধীরে-ধীরে উপরে উঠে আসতেই পুনম বলল, “লেটস্ গো ব্যাক ।”

নন্দিনী বলল, “আমাদের উচিত এখনই পুলিশকে খবর দেওয়া ।”

“পুলিশ ? পুলিশ কোথায় পাব ?”

“কেন ? সেই যে অফিসার—যিনি রেঞ্জারের সঙ্গে তখন ছিলেন ।”

ওরা কেউ আর ওখানে দাঁড়াতে চাইছিল না । দ্রুত সবাই হাঁটতে লাগল টুরিস্ট বাংলোর দিকে । মোড় ঘোরার আগে নন্দিনী একবার পেছন ফিরে তাকাল । জঙ্গল চিরে পেছনে পড়ে থাকা পথটা চমৎকার শান্ত । চোখ ফিরিয়ে নেবার আগে সে চমকে উঠল । চিৎকার করে বলল, “লুক্ !”

ওরা তিনজনেই ভয়াব্র চোখে পেছন ফিরল । কিন্তু ততক্ষণে প্রাণীটি রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছে । ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার দেড়শো গজ দূরে ঘটনাটা ঘটল । টিনা জিজ্ঞেস করল, “কী বল তো ?”

চিকি অস্ফুটে বলল, “গোরিলা । আই অ্যাম শিওর ।”

পুনম বলল, “ভ্যাট ! ইন্ডিয়ান ফরেস্টে গোরিলা পাওয়া যায় না । বোধ হয় ভালুক ।”

নন্দিনী যতটুকু দেখেছে, ওরা তা দেখেনি । ভালুক হলে কি ওভাবে হাত তুলে দৌড়ে যায় ? প্রাণীটি কালচে লোমশ । কিন্তু দৌড়োবার ভঙ্গিতে নিজেকে গোপন করার প্রয়াস আছে । তা ছাড়া লম্বায় অতটা উঁচু কি ভালুক হয় ? যদিও এত দূর থেকে উচ্চতা মাপা শুধু দৃষ্টি দিয়ে অসম্ভব । কিন্তু এই জঙ্গলে যদি একটা অচেনা প্রাণী ওই চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা হলে নিরস্ত্র হয়ে হাঁটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

টুরিস্ট বাংলোর সামনে এসে পুনম বলল, “চল, অর্জুনকে বলি ।”

নন্দিনী মাথা নাড়ল, “হোয়াই ? আমরাই তো রেঞ্জারকে রিপোর্ট করতে পারি ।”

বাকি রাস্তাটুকু চুপচাপ কাটিয়ে ওরা গেট খুলে রেঞ্জারের অফিসে ঢুকল । এখন আর সকাল নেই । ডুয়ার্সের দুপুর মোটেই আরামদায়ক নয় । চার পাশে জঙ্গল থাকায় অবশ্য একটা ছায়া-ছায়া প্রলেপ তার ওপর পড়েছে । রেঞ্জার নেই । এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক বাসি খবরের কাগজ পড়ছিলেন । ওদের দেখে আমতা-আমতা করে বললেন, “স্যার নেই । মাদারিহাটে গিয়েছেন ।”

“কখন ফিরবেন ?” নন্দিনী জিজ্ঞেস করল ।

“বিকলে ।”

“মাদারিহাট মানে যে রাস্তা দিয়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকলাম ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ ।”

“কিন্তু আমাদের যে খুব জরুরি কথা বলার ছিল। এখনই!”

লোকটি উঠল। রেঞ্জারের টেবিলে একটা টেলিফোন রয়েছে। সেটির রিসিভার তুলে ঘন ঘন ট্যাপ করতে করতে অপারেটরকে পেল। একটা নম্বর পেয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসল, “কপাল ভাল থাকলে স্যারকে পেয়ে যাব। হ্যালো, হলং রেঞ্জ অফিস থেকে বলছি। রেঞ্জার সাহেব আছেন? নেই। বেরিয়ে গিয়েছেন? কোথায়? আরে, হ্যালো, হ্যালো!” লোকটি কিছুক্ষণ চিৎকার করল। তারপর রিসিভার নামিয়ে মাথা নাড়ল, “নাঃ, স্যার বেরিয়ে গিয়েছেন!”

“তা হলে আপনি চলুন। আপনি তো এখানে কাজ করেন?” নন্দিনী বলল।

“হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় যাব?”

“জঙ্গলে।”

“জঙ্গলে? না, না, হাতির পিঠে ছাড়া জঙ্গলে যাবেন না। তা ছাড়া এখন জঙ্গলে খুব গোলমালে ব্যাপার হচ্ছে। হুটহাট যাবেন না।”

“কী গোলমাল?”

“রাষ্ট্রবিরোধী সমাজবিরোধীরা জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে।”

মেয়েরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। নন্দিনী বলল, “শুনুন, আমরা একটু আগে বাংলার পিছন দিকের রাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। যেতে-যেতে যে কালভার্টটা পড়ে, তার নীচে একটা ডেডবডি দেখতে পেয়েছি। মনে হচ্ছে, লোকটাকে কেউ খুন করেছে। এই ব্যাপারটা আপনাদের জানাতে এসেছিলাম।”

“কী? খুন? আবার?” লোকটি হাঁ হয়ে গেল।

“মানে? এখানে কি এর আগেও খুন হয়েছে?”

“হ্যাঁ। দিন-দশেক আগে জঙ্গলের ও পাশে একটা গ্রামের লোককে কেউ খুন করে ফেলে দিয়ে যায়। একটা বুড়ো বাঘ তার পেটের কিছুটা খেয়ে রেখে যায়।”

“তা হলে তো বাঘে মেরেছিল।” পুনম বলল।

“না, ম্যাডাম। লোকটার গলা ছুরি দিয়ে অর্ধেক কাটা ছিল। কোথায় বললেন? কালভার্টের নীচে? আবার বামেলা শুরু হল।” লোকটা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলল, “হ্যালো অপারেটর, থানায় দিন। জলদি। হ্যালো, থানা, বড়সাহেব আছেন? নেই? শুনুন হলং রেঞ্জ অফিস থেকে বলছি। আবার একজন খুন হয়েছে। তিন নম্বর কালভার্টের তলায় ডেডবডি। একজন না চারজন মহিলা, না না মহিলা খুন হয়নি, দাঁড়ান...” রিসিভারে হাত-চাপা দিয়ে লোকটা জিঞ্জিস করল, “যে খুন হয়েছে, সে ছেলে না মেয়ে?”

“আপনাকে তখন বললাম একটা লোক পড়ে আছে।” নন্দিনী গভীর মুখে বলতেই সে আবার রিসিভার থেকে হাত সরাল, “ছেলে। ছেলে খুন হয়েছে।”

রিসিভার নামিয়ে রেখে লোকটা যেন কিছুটা স্বস্তি পেল। তারপর বলল, “একটা খুন মানে কত ঝামেলা জানেন? ঘন ঘন পুলিশ আসবে। আপনাদের কাছেও যাবে। আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে কোনও গার্জেন নেই?”

“আছেন। তিনি বাংলাতে বসে আছেন।”

“তিনি দ্যাখেননি ডেডবডি? তা হলে পুলিশকে আমি আর আপনাদের কথা না বলে তাঁর নাম বলে দিতাম। পুলিশ আর আপনাদের জিজ্ঞাসাবাদ করত না?”

নন্দিনী বলল, “না, তিনি দ্যাখেননি। আচ্ছা, আর-একটা কথা বলুন তো। এই জঙ্গলে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা কালো লোমশ কোনও প্রাণী আছে, যে দু’পায়ে হাঁটতে পারে? খুব জোরে হাঁটে?”

লোকটি আঙুল তুলে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো জীবজন্তুর ছবি দেখাল, “এই সব প্রাণী এখানকার জঙ্গলে আছে।”

ওরা উৎসুক হয়ে তাকাল। বাঘ, বাইসন, গণ্ডার, বুনো শূয়োর, হাতি থেকে আরম্ভ করে বন-মুরগি, সাপ ছড়িয়ে আছে জঙ্গলে, কিন্তু সেই বিদঘুটে প্রাণীর ছবি দেওয়ালে টাঙানো নেই। নন্দিনী মাথা নাড়ল, “এই ছবির বাইরের কোনও জন্তু জঙ্গলে নেই বলতে চাইছেন?”

লোকটি বলল, “ম্যাডাম, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে সব জন্তুর ছবি পাঠিয়েছে, তার বাইরে কিছু না থাকারই কথা। তবে কাউকে যদি না বলেন যে আমি বলেছি—তা হলে বলতে পারি, আছে। এ রকম গভীর জঙ্গলে অনেক রকম জন্তু হঠাৎ-হঠাৎ দেখা যায়, যার নাম খাতায় লেখা নেই।”

“যেমন?”

“একটা জন্তু আছে জানেন, যার গায়ে বড়-বড় আঁশ, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, কী নাম জানি না। বুনো কুকুর আছে কয়েকটা। খুব ভয়ঙ্কর।”

“লোমশ প্রাণী মানুষের মতো হাঁটে—তেমন কিছু?”

“মাল্হত একবার বলেছিল, কিন্তু আমরা কেউ চোখে দেখিনি।”

“কী বলেছিল মাল্হত?”

“জঙ্গলের ভেতরে সকালে যখন ভিজিটার্সদের নিয়ে যায়, তখন একদিন হাতির পিঠে বসে একটা গোরিলার মতো প্রাণী দেখেছিল। এক পলক। সে কথা শুনে রেঞ্জার সাহেব বলেছিলেন, নির্যাৎ ভালুক। আমি অবশ্য এত দিন এখানে আছি, কিন্তু কোনও ভালুক দেখিনি।”

নন্দিনীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘড়িতে এখন প্রায় বারোটো। যদিও কারও খিঁদে পায়নি। এই জায়গাটায় সম্ভবত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের

বাড়ি-ঘর রয়েছে। ফলে একটা পাড়া-পাড়া ভাব। ওরা চুপচাপ হাঁটছিল। পুনম বলল, “বেশ থ্রিলিং ব্যাপার, না রে?”

টিনা বলল, “অদ্ভুত তো! একটা লোক খুন হল, আর তুই থ্রিলড হচ্ছিস?”

এই সময় ওরা অর্জুনকে দেখতে পেল। পায়ে চপ্পল, পরনে একই শার্ট-প্যান্ট। দূর থেকে তাকে দেখে নন্দিনী বলল, “গাইডবাবু। এখন খুঁজতে বেরিয়েছেন! নিশ্চয়ই আমাদের বলবেন, কেন ঠুঁকে না জানিয়ে বেরিয়েছি!”

মুখোমুখি হতেই অর্জুন কিছু বলার আগেই নন্দিনী বলল, “আচ্ছা মানুষ তো আপনি, ঘরের দরজা বন্ধ করে থেকে গেলেন?”

“দরজা বন্ধ? কই না তো! খোলাই তো ছিল!”

“কী করছিলেন এতক্ষণ?”

“আপনারা যে বেরিয়ে পড়বেন, তা বুঝিনি। কোথায় গিয়েছিলেন?” অর্জুন চট করে বলতে চাইল না যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার বলার মধ্যে এমন সারল্য ছিল যে, নন্দিনী আর খেলাতে চাইল না। দু’ নম্বর কালভার্টের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ওকে সব কথা খুলে বলল।

শুনতে শুনতে অর্জুনের মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে বলল, “আপনারা বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, রতনলালবাবুকে ফরেস্ট অফিসার আর ও.সি. বলেছিলেন, এখানকার আবহাওয়া ঠিক নেই। আমি একটু আগে বেয়ারাদের কাছে জানতে পারলাম, কিছু অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্ট এই জঙ্গলে বাসা বেঁধেছে। তারা বাংলা পুড়িয়ে দেয়, ডাকাতি করে। তাদেরই কেউ হয়তো খুন হয়েছে। তাই ও রকম জায়গায় একা যাওয়া ঠিক হয়নি।”

“যে লোকটি খুন হয়েছে, সে নেহাতই গ্রাম্য মানুষ।”

“হতে পারে। এ-নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।” অর্জুন বলল, “চলুন, স্নান করে খেয়েদেয়ে রেস্ট নিন। বিকেলের পর থেকে অনেক রকম জন্তু আসে সামনের ঘাসের জঙ্গলে নুন খেতে।”

ওরা হাঁটছিল বাংলোর দিকে। কিন্তু এরই মধ্যে অর্জুনের কৌতূহল হচ্ছিল। গ্রাম্য ঝগড়ায় অবশ্য কোনও গ্রামের মানুষ খুন হতে পারে, কিন্তু তার শরীর কেন জঙ্গলের ভেতরে কালভার্টের নীচে পাওয়া যাবে? খুনি কি হত্যাকাণ্ড লুকিয়ে ফেলতে লোকটাকে ওখানে নিয়ে এসে খুন করেছে? কিন্তু এত ঘন ঘন এখানে হত্যাকাণ্ড হবেই বা কেন? অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, “কী হল আপনার?”

“আমি একবার কালভার্টটার কাছ থেকে ঘুরে আসছি।” অর্জুন বলল।

টিনা মাথা নাড়ল, “না, প্লিজ, একা যাবেন না।”

অর্জুন হাসল, “আমার কিছু হবে না।”

“কিন্তু ওখানে নাম-না-জানা একটা বন্যজন্তু দেখেছি আমরা।”

“সেটাই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। জলদাপাড়ায় গুণ্ডার, বাইসন, হাতি আর কয়েকটা বাঘ ছাড়া কোনও বড় প্রাণী নেই বলে শুনেছিলাম। আপনারা ঘরে গিয়ে স্নানটান করুন। আমি ঘুরে আসছি।”

টিনা বলল, “আপনার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের দেখাশোনা করা। ওখানে গিয়ে যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়, তা হলে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।”

অর্জুনের মনে হল, কথাটা ঠিক। কিন্তু তার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা মেয়ের গাইড হতে সে কি কখনও চেয়েছিল? ম্যানেজারি করা? মালবাজারে সোনার ব্যাপারটা, এখানে খুন—এ সব তাকে উপেক্ষা করে থাকতে হবে? একজন সত্যসন্ধানী হয়ে সেটা করা কতখানি বেদনাদায়ক, তা এরা বুঝবে কী করে? সে কাঁধ নাচিয়ে বাংলোর ভেতরে ঢুকল। মেয়েরা কলবল করতে-করতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে জিপটাকে দেখতে পেল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছিল সেটা। হঠাৎ বাংলোর মুখটায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মিস্টার বিশ্বাস নেমে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, “কোনও অসুবিধে হয়নি তো?”

জবাব না দিয়ে অর্জুন হাত তুলে দাঁড়াতে বলল। প্রায় দৌড়েই সে জিপের কাছে পৌঁছে বলল, “একটু আগে আপনাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। ও, আপনিও আছেন?” জিপের ভেতরে বসা মিস্টার আহমেদের দিকে তাকিয়ে বলল অর্জুন, “খুব ভাল হল, আপনাকে থানাতে ফোন করা হয়েছে।”

“কী ব্যাপার বলুন তো?” মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন অবাক হয়ে।

“আপনাদের জঙ্গলে একটা ডেডবডি দেখেছে মেয়েরা।”

“ডেডবডি? কোথায়?” মিস্টার আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন।

“তিন নম্বর কালভার্টের নীচে।”

“সে কী!” মিস্টার বিশ্বাস হতভম্ব, “মেয়েরা সেটা দেখল কী করে?”

“বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিল। তারপরেই আপনার অফিসে রিপোর্ট করেছে।”

“আপনিও দেখেছেন?”

“না। আমি তখন বাংলায় ছিলাম।”

মিস্টার বিশ্বাস জিপে উঠে বসলেন, “ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও।”

অর্জুন এগিয়ে গেল, “কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?”

“আমরা অফিসিয়াল ডিউটিতে যাচ্ছি।”

“আমি জানি। আপনি বোধ হয় মিস্টার অমল সোমের নাম শুনেছেন! আমি তাঁর সহকারী। আমার নাম অর্জুন।”

“অর্জুন ?” মিস্টার আহমেদ বললেন, “আপনিই লাইটার প্রবলেম সলভ করেছেন ? খুঁটিমারি রেঞ্জের প্রবলেমটাও কি আপনারই সলভ করা ?”

অর্জুন বিনীত হাসি হাসল। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “তাই বলুন। উঠে পড়ুন ভাই। আপনার পরিচয় তো জানতাম না। তা, এই মেয়েদের সঙ্গে কী করে এলেন ?”

“এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট।” গাড়িতে উঠতে-উঠতে অর্জুন বলল।

মিস্টার আহমেদ হাসলেন, “আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে।”

বিশ্বাস বললেন, “তা তো হল। কিন্তু আবার কী বামেলায় পড়লাম বলুন তো !”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ক’ দিন আগে যে লোকটা খুন হয়েছে, তার কোনও কিনারা হল ?”

মিস্টার আহমেদ চলন্ত জিপে বসে বললেন, “মনে হচ্ছে পলিটিক্যাল মার্ডার। এ সব এলাকায় প্রচুর উগ্রপন্থী শেপ্টার নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ থেকে খুন হওয়া আশ্চর্যের নয়।”

অর্জুন কোনও কথা বলল না। আজকাল পলিটিক্যাল মার্ডার বলে অনেক খুনের তদন্ত চাপা দেওয়া যায়। আর তদন্ত করে সুরাহা না পেলে ওই শব্দ দুটো বলে পাশ কাটাতে অসুবিধে হয় না। দু’ পাশে জঙ্গল রেখে জিপ থামল তিন নম্বর কালভার্টের পাশে। টপাটপ জিপ থেকে নেমে পড়লেন অফিসাররা। অর্জুন তাঁদের অনুসরণ করল। পাথর ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে জলের কাছে পৌঁছে এপাশ-ওপাশ তাকিয়েও কোনও মৃতদেহের দর্শন পাওয়া গেল না। মিস্টার বিশ্বাস অর্জুনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “কোথায় দেখেছিল বলুন তো ?”

“কালভার্টের নীচে।”

“ওখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।”

সত্যি কিছুই নেই। অর্জুন পাথরে পা ফেলে এগিয়ে গেল কালভার্টের নীচে। মৃতদেহ থাকলে তাদের দেখে লুকিয়ে পড়ত না। মিস্টার আহমেদ দূরে দাঁড়িয়ে হাসলেন, “আপনার সঙ্গিনীরা বোধহয় ‘হার্ডি বয়েস’ কিংবা ‘ফেমাস ফাইভ’ পড়ে খুব ?”

অর্জুন প্রতিবাদ করল, “না। ওরা তেমন বাচ্চা নয়।”

“তা হলে হ্যাডলি চেজ কিংবা জেমস বন্ড ?”

অর্জুন জবাব দিল না। মেয়েরা বলেছিল, মৃতদেহের অর্ধেকটা জলে ডোবা ছিল। সে এগিয়ে গেল জলের কাছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা পাথরের অনেকটা ভিজে রয়েছে। আশে পাশের সব ক’টা পাথরের ওপরই শুকনো খটখটে। অর্জুন পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পাথরের ওপরের ধুলোয় একটা ঘষটানো দাগ। তারপরেই পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। একটুখানি ধুলোমাটির

ওপর একজোড়া পা। অর্জুন হাত নেড়ে অফিসারদের কাছে ডাকল। মিস্টার বিশ্বাস আসতে-আসতে বললেন, “কোনও লোক টায়ার্ড হয়ে হয়তো কালভার্টের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল, দড়িকে সাপ ভেবেছে মেয়েরা।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “কিন্তু এখান থেকে কাউকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মিস্টার আহমেদ, আপনি এই জায়গাটা ভাল করে দেখুন।” সে তার সন্দেহের কারণ আরও বিশদভাবে বলল। পুলিশ-অফিসার সেটা শুনে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, “আপনার কথা সত্যি হলে এখানে একটা ডেডবডি ছিল এবং মেয়েরা আবিষ্কার করার পর কেউ সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।”

অর্জুন জলের ও পাশের জঙ্গলটাকে দেখছিল। ঝোঁরার জল খুব বেশি নয়। মাঝে-মাঝে হাঁটুর বেশি নয়। যে কেউ ও পার থেকে এসে...। না, ওপার থেকে নয়, মাটির দাগ বলছে যে কোনও ভারী জিনিসকে এ পাশেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ দিকে ঘাসের ওপর পায়ের চাপ এখনও মিলিয়ে যায়নি। সে ঘাসের দাগ দেখে আরও একটু এগোল। এখান থেকে হাঁটলে রাস্তায় গিয়ে উঠতে হবে। কোনও পথ নেই। লতা-ঘাস আর মাটির ওপর পায়ের ছাপ স্পষ্ট। পা বেশ গভীর হয়ে মাটিতে বসে ছিল। সে মিস্টার আহমেদকে সেখানে ডেকে দেখাল।

এবার ধীরে-ধীরে ওরা পাহাড়ে চড়ার কষ্ট করে রাস্তায় উঠে এল। মিস্টার আহমেদ বললেন, “কিন্তু অর্জুনবাবু, আমরা নিজেরাই এই পথে উঠতে যে কষ্ট করলাম, তাতে কি আপনার মনে হচ্ছে কেউ আর একটা ডেডবডি নিয়ে উঠতে পারবে?”

“লোকটা যদি প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়?”

“এ দিকের সমস্ত শক্তিশালী মানুষের ঠিকানা পুলিশের খাতায় লেখা আছে।”

“যদি মানুষ না হয়?”

“তার মানে?” এবার মিস্টার বিশ্বাস ঘুরে দাঁড়ান।

“আপনার জঙ্গলে এমন একটা প্রাণীকে মেয়েরা আজ দেখেছে, যার আকৃতি অনেকটা গোরিলার মতো, লম্বায় অন্তত ফিট পাঁচেক। ওরা অবশ্য অনেক দূর থেকে দেখেছে।”

হোহো করে হেসে উঠলেন মিস্টার বিশ্বাস। সামনের একটা গাছ থেকে এক ঝাঁক টিয়া আকাশ সবুজ করে উড়ে গেল ভয় পেয়ে। বিশ্বাস বললেন, “এই জঙ্গলে গোরিলা? আপনার সঙ্গিনীদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হনুমান ছাড়া কিছু নেই। আর হনুমানদের পক্ষে একটা মানুষের শরীর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।”

অর্জুন কথাটার প্রতিবাদ করতে পারল না। সে জানে, ওই রকম জন্তুর

এখানে থাকার কথা নয়। তবু রাস্তা পেরিয়ে ও জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর মনে হল, জঙ্গল সরিয়ে কেউ হয়তো ও পাশে নেমে গিয়েছে। এখনও গাছপালা নিজেদের ডালপাতা স্বাভাবিক করেনি। সে দাগ লক্ষ করে নেমে পড়ল। বিশ্বাস বললেন, “ওভাবে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। সাপ থাকতে পারে।”

আহমেদ বললেন, “ওয়াইস্ট গুজ চেজ করছেন আপনি?”

কিন্তু চার-চারটে মেয়ে মিথ্যে দেখতে পারে না। মিনিট-পনেরো খোঁজাখুঁজি করার পর সে পাখিদের চিৎকার শুনতে পেল। একটা গাছের ডালে পাখিরা অনবরত চিৎকার করে যাচ্ছে। এখন অর্জুনের চার পাশে ঘন জঙ্গল। রাস্তা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ায় সে অফিসারদের দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল আশে পাশে কেউ আছে। এই মনে হওয়াটার কোনও কারণ নেই, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন সাবধান করে দিচ্ছিল অর্জুনকে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই ওপর থেকে একটা ভারী জিনিস ঝাঁপিয়ে পড়ল মাথার ওপরে। পড়ে যেতে যেতে অর্জুন পরিত্রাহি চিৎকার করল। চোখ বন্ধ হবার আগে একটা লোমশ পেট-বুক নজরে এল।

চোখ মেলতেই বিশ্বাসের মুখ দেখতে পেল অর্জুন। ঝুঁকে পড়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছিল আপনার?”

অর্জুন মাথা তুলতে গিয়ে ঘাড়ে প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করল। তবু সে উঠে বসল। ঘাড় এবং কোমরে ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে অর্জুন সেটা সহ্য করতে চাইল। তাকে এখন তুলে নিয়ে আসা হয়েছে রাস্তায়। আর তখনই একটা জিপকে দ্রুত গতিতে আসতে দেখা গেল উলটো দিক দিয়ে। মিস্টার আহমেদ বললেন, “থানা থেকে ফোর্স আসছে মনে হচ্ছে।”

অর্জুন বলল, “প্লিজ, আপনারা এ পাশের জঙ্গলটা ভাল করে খুঁজে দেখুন। আমাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। আচমকা।”

আহমেদ সজাগ হলেন, “ক’জন ছিল?”

“একজনই। একটা লোমশ বুক-পেট। আর কিছু দেখতে পাইনি।”

জিপটা থামতেই আহমেদ তাদের নির্দেশটা জানিয়ে দিলেন। মিনিট-দশেকের মধ্যে পুলিশদের চিৎকারে জানা গেল, ওরা ডেডবডি খুঁজে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা লম্বা গাছের ডালে শরীরটাকে ঝুলিয়ে ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। পরিষ্কার রাস্তায় শুইয়ে দেওয়া হল মৃতদেহকে। কোনও লোমশ জন্তুর চিহ্ন এই জঙ্গলের ধারে-কাছে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিষয় বেড়ে যাচ্ছিল অর্জুনের। সে ভুল করছে না। জন্তুটা ওখানে ছিলই। নন্দিনীরা ঠিকই দেখেছিল। নিশ্চয়ই লোকজন দেখে সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে, যে-কোনও জন্তুর পক্ষে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

মিস্টার বিশ্বাসের কথা কানে এল, “এই লোকটাকে এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না। আপনারা কেউ চিনতে পারছেন একে?”

পুলিশ কোনও উত্তর দিল না। আহমেদ জিপের ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, ফরেস্ট অফিসের কোনও দারওয়ানকে তুলে আনতে। জিপ বেরিয়ে গেল।

অর্জুন দেখল, লোকটি এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন। ওর ধূতি এবং পা এখনও ভিজ। তার মানে মেয়েরা ভুল দেখেনি। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃতদেহটাকে কালভার্টের নীচ থেকে ওই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হল কেন? কে বা কারা এই কাজটা করল?

অর্জুন ভিড় থেকে সরে এল। ধীরে-ধীরে কালভার্টের সামনে দাঁড়াল। তিরতির করে ঝোরার জল বয়ে যাচ্ছে। এখানকার পৃথিবী বেশ শান্ত। খুনটা এখানে হয়নি। হলে মৃতদেহের আশ পাশে রক্তের চিহ্ন দেখা যেত। আচ্ছা, মৃতদেহে কি রক্তের দাগ রয়েছে? সে দ্রুত চলে এল মৃতদেহের পাশে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

আহমেদ জিজ্ঞেস করল, “কী দেখছেন?”

“লোকটা মরল কীভাবে?”

“বুঝতে পারছি না। অ্যাপারেন্টলি কোনও ক্ষত চোখে পড়ছে না।”

অর্জুন শরীরটার পাশে বসে পড়ল। মৃতদেহ দেখে মনে হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা আগেও লোকটা বেঁচে ছিল। পচন শুরু হলেও সেটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। পোস্টমর্টেম না করলে বোঝা যাবে না। এই জঙ্গলে সেটা ঠিক-মতো করার ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে।

এই সময় জিপ ফিরে এল। ফরেস্ট অফিসের একজন গার্ড জিপ থেকে নেমে মিস্টার বিশ্বাসকে সেলাম করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “দ্যাখো তো, চেনো কি না?”

লোকটাও এ-দেশীয়। দু’বার তাকাতে হল না তাকে, “হাঁ সাব। ওই উত্তর দিকের গ্রামে থাকে। হাটে-হাটে ঘুরে তামাক বিক্রি করে।”

“ওর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল?”

“দু’-একবার কথা বলেছিলাম।”

“এই জঙ্গলে ও কেন এসেছে বলতে পারো?”

“না সাব।”

“ঠিক আছে, তুমি যাও।”

মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। আহমেদ যাওয়ার আগে বলে গেলেন যে, তিনি বিকেলে আসবেন একবার। বিশ্বাসের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরছিল অর্জুন। ওঁর ধারণা: জঙ্গলে আশ্রয় নিতে-আসা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ ঘটায় ওরাই খুন করে রেখে গেছে। অর্জুন একমত হল না। সেরকম কিছু ঘটলে সামনাসামনি ক্ষত দেখা যেত, রক্ত ছড়িয়ে থাকত।

কিন্তু মিস্টার বিশ্বাস অন্য কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে হত্যার জন্য জঙ্গলের এত ভেতরে আসার প্রয়োজন পড়বে না। তা ছাড়া ওই লোমশ জঙ্গুর গল্প নেহাতই গল্পো। প্রতি বছর এই সব জঙ্গলে ভাল করে সার্ভে করা হয়। থাবা গুনে বাঘের সংখ্যা সঠিকভাবে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে অমন জঙ্গু সবার চোখের আড়ালে থেকে যাবে এমন হতেই পারে না। মেয়েরা ভুল দেখেছিল আর অর্জুন সেটা নিয়ে বেশি ভেবেছিল বলে একটা বড় হনুমানকেও ওই কল্লনায় ঝাঁকে ফেলেছে। কিন্তু তার কাছে একটাই বিস্ময়, মৃতদেহটা জায়গা বদলাল কী করে? মেয়েরা যে ওটাকে কালভার্টের নীচে দেখেছিল, তা অস্বীকার করার তো উপায় নেই। ভদ্রলোক বললেন, “একেই হাজারটা ঝামেলা নিয়ে আছি, তার ওপর আর একটা যোগ হল।”

বাংলার কাছাকাছি এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওই লোকটার গ্রামে কি খোঁজ-খবর করতে যাবেন? আমার এ-ব্যাপারে কৌতুহল হচ্ছে।”

“ওটা পুলিশের কাজ। আমার এলাকা নয়। তবে যখন আপনি ইন্টারেস্টেড, তখন আহমেদকে বলতে পারি আপনার কথা।”

মিস্টার বিশ্বাসের কাছে বিদায় নিয়ে বাংলায় ঢুকল অর্জুন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় দোতলার খোলা দরজাটি চোখে পড়ল। সেই মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁ-দিকের নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন অর্জুনের দিকে। অর্জুন মাথা নিচু করে ওপরে উঠে এল। এই ভদ্রমহিলা কে? উনি কি একা আছেন? কোনও পুরুষসঙ্গী ছাড়া এত গভীর জঙ্গলে কেউ বেড়াতে আসে না। মিস্টার বিশ্বাসকে পরে ঐর কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। ইনি কেন সারাক্ষণ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকবেন?

নন্দিনীরা নিজেদের ঘরেই ছিল। ওদের বিরক্ত না করে অর্জুন নিজের ঘরে ঢুকল। শরীরে ঘাম জমছে। ব্যাগ থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি বের করে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। বেশ বড় বাথরুম। শাওয়ার রয়েছে। পাশে খোলা জানালা দিয়ে জঙ্গলটা দেখা যাচ্ছে। খুব কাছে। দাড়ি কামাতে-কামাতে অর্জুন জঙ্গুটার কথা ভাবছিল। মৃতদেহকে ও-ই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, মেয়েরা মৃতদেহ আবিষ্কার করার পর জঙ্গুটা সেটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনও শোনেনি। মৃতদেহ খেতে আগ্রহী জঙ্গুরা কি দুই পায়ে চলে, যত দূর মনে পড়ছে, দুই পা যারা ব্যবহার করে, তারা নিরামিষাশী হয়। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করেছিল সে। খামোকা জড়িয়ে যাচ্ছে কি কোনও ঝামেলায়? সে এসেছে চারটে মেয়েকে গাইড করতে। এ সব কেস নিয়ে মাথা ঘামাতে সে আসেনি। স্নান শেষ করে মাথা মুছতে-মুছতে সে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জঙ্গলের ওপরে এখন কড়া রোদ। হঠাৎ অর্জুন চমকে উঠল। তার মনে হল, ৫১২

সামনের গাছগুলোর আড়াল থেকে কেউ বেরিয়ে এসেছিল, তাকে দেখামাত্র চট করে সরে গেল। সে ঠিক দেখেছে। কেউ একজন—তার চেহারা স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু সে ধরা দিতে চায়নি। এখনই যদি দৌড়ে ওখানে যাওয়া যেত তা হলে...না, জামাকাপড় পরতে-পরতে ও উধাও হয়ে যাবে। ব্যাপারটা মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। একটা লোক খামোকা কেন তাকে দেখে লুকোতে যাবে? ও কি লুকিয়ে কাউকে দেখতে এসেছিল? এখানকার সাধারণ মানুষ জঙ্গলের এত গভীরে আসে না। যে এসেছে, তার নিশ্চয়ই বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটা কী? একবার মনে হল মেয়েদের সাবধান করা দরকার। এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। দরজা খুলে দেখল, লাঞ্চার ট্রে হাতে বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, “সবকোই কো খানা হো গিয়া সাব।”

“ওই মেমসাহেবরা খেয়েছে?”

“জি সাব।”

লোকটা টেবিলে খাবার রাখল। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তুমি এই বাংলায় কদিন আছ?”

“পাঁচ সাল সাব।” লোকটা জবাব দিল।

“আচ্ছা, দোতলায় এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। উনি কি একা আছেন?”

“হাঁ সাব। মেমসাব এক সাব কা সাথ আয়া থা। সাব গিয়া শিলিগুড়ি। মেমসাব ইহাঁ আকেলা হ্যায়। ঘরসে নেহি নিকলাতা।”

“কোথেকে এসেছেন উনি?”

“নেহি জানতা সাব।”

“আচ্ছা, আর একটা কথা, গত পাঁচ বছরে এই বাংলায় কোনও গোলমাল হয়েছে? এই ধরো চুরি-চামারি, খুন-খারাপি?”

“নেহি সাব। বিলকুল নেহি হুয়া।”

“ঠিক আছে, তুমি পরে এসে ট্রে নিয়ে যেও।”

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বিছানায় শুয়ে যেই সে সিগারেট ধরিয়েছে, অমনি মেয়েরা এল। নন্দিনী বলল, “বেয়ারার কাছে শুনলাম ভোরবেলায় হাতির পিঠে জঙ্গল ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যাব।”

“যাবেন।”

“আগে থেকে সেটা জানাতে হবে না?”

“জানিয়ে দেব।”

চিকি বলল, “আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?”

“ডেডবন্ডি দেখতে।”

“ও, আপনি তো গোয়েন্দা।”

“না, আমি সত্যসন্ধানী।”

নন্দিনী বলল, “আপনি কি ওই রেঞ্জারের দেখা পেয়েছিলেন ?”

“ওঁর সঙ্গেই গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি বলছেন, আপনারা যে লোমশ প্রাণীটিকে দেখেছেন—এই জঙ্গলে সে রকম প্রাণী নেই।”

“মিথ্যে কথা।” ফুঁসে উঠল নন্দিনী, “আমরা স্পষ্ট দেখেছি।”

“যাক। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।”

“কিন্তু আমরা এখানে খুব বেশি বোর হচ্ছি।” পুনম বলল।

“মানে ?”

“চার পাশে জঙ্গল। ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। এ জন্যে নিশ্চয়ই দিল্লি থেকে এত দূরে আমরা আসিনি। এর চেয়ে বেশি পয়সা দিয়ে দার্কিলিং-এ গেলে আমরা বেশি আনন্দ পেতাম। সেখানে অনেক-কিছু দেখার আছে।”

“অবশ্যই। দার্কিলিং হলং-এর থেকে অনেক বেশি আকর্ষক। তবে এখানে যে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাবেন, তা কিন্তু দার্কিলিং-এ নেই। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলব, যে-খুনটা আজ এখানে হয়েছে, আজই হয়েছে ধরে নিচ্ছি, সেই পরিত্রেক্ষিতে আপনাদের কোনও এসকর্ট ছাড়া জঙ্গলে ঢুকে পড়া ঠিক হবে না।”

নন্দিনী ভূ কোঁচকাল, “কেন ?”

“জঙ্গলে কিছু উগ্রপন্থী আশ্রয় নিয়েছে। তারা বোধহয় আপনাদের উপস্থিতি ভাল চোখে নেবে না। তা ছাড়া, ওই মৃতদেহটি নিশ্চয়ই আরও অনেক ঝামেলা ডেকে আনবে।”

টিনা বলল, “তা হলে আজই এই জঙ্গল ছেড়ে আমরা শহরে চলে যাচ্ছি না কেন ?”

“আপনারা যদি যেতে চান, তা হলে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।”

“না।” মাথা নাড়ল নন্দিনী, “এখানে এসে আমার খুব ভাল লাগছে। তোরা কি একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে ভয় পাচ্ছিস ?”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “অ্যাডভেঞ্চার মানে ?”

নন্দিনী বলল, “বাংলোর বেয়ারার কাছে জানতে পারলাম, এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। সেখানে রাত কাটালে নানা রকম জীবজন্তুকে খুব কাছ থেকে দেখা যায়, যাদের দিনের বেলায় দেখতে পাওয়া অসম্ভব। আজ রাত্রে আমরা সেখানে যাব।”

চিকি বলল, “লেটস্ গো।”

মেয়েরা ঘাড় নেড়ে দরজার দিকে এগোতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাচ্ছেন ?”

“একটু হাটব।” নন্দিনী ঘুরে দাঁড়াল, “জঙ্গলে এসে ঘরে বসে থাকব নাকি ?”

সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, “অত ভোরে উঠেছেন, তার ওপর আজ

রাত্রিও জেগে থাকতে হবে, দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীর ঠিক থাকত ।”

“ওঃ, মিস্টার গাইড, আমরা কি খুব শিশু, কী মনে হয় আপনার ?” কথাটা বলে নন্দিনী হাসতে-হাসতে মেয়েদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ।

বেশ রাগ হল অর্জুনের । অত্যন্ত অবাধ্য মেয়েগুলো । তার কথা যদি শুনতেই না চায়, তা হলে সে আছে কেন ? অথচ ওরা বাইরে ঘুরবে আর সে ঘরে বসে হাই তুলবে তাও হতে পারে না । কিছু হলে অমলদাকে কৈফিয়ত ত্তো তাকেই দিতে হবে ! সেজেগুজে বেরিয়ে এল অর্জুন । দোতলায় নামার সময় সে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজাটার দিকে তাকাল । পরদা ফেলা, কাউকে দেখা যাচ্ছে না ।

লনে নামতে-নামতে সে মেয়েদের দেখতে পেল । যাক বাবা, ওরা ফরেস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছে । ও দিকে কোনও বিপদ নেই । অর্জুন সেদিকেই হাঁটতে লাগল । মেয়েদের সঙ্গে তার দূরত্ব বেশ অনেকটাই । দু’ পাশে জঙ্গল । সামনে এক নম্বর কালভার্ট । হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল । একটা লোক কালভার্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে যে, সন্দেহ না এসে যায় না । অনেক সময় কিছু বদ প্রকৃতির লোক এমন কাণ্ড করে, কিন্তু লোকটা তো নেহাতই গ্রাম্য মানুষ । অর্জুনের ঝাপসা মনে পড়ল, স্নান করার সময় এক বলকে যে লোকটা গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিল তার পোশাকও এমন ছিল । অর্জুন চটপট একটা গাছের আড়ালে চলে গেল । লোকটা আর এগোচ্ছে না, কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাবছে । এই সময় ফরেস্ট অফিসের দিক থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসতেই লোকটা তিড়িং করে কালভার্টের দিকে চলে গেল । অর্জুন তাকে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ।

প্রাইভেট নয়, একটা ট্যাক্সি সোজা চলে গেল বাংলোর দিকে । পেছনে যে বসে আছে, তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল না । মনে পড়ে যাওয়াতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে আর-একবার নম্বরটা দেখতে চাইল । না শিলিগুড়ির সেই ট্যাক্সি নয় ।

অর্জুন লোকটিকে দেখল । নেই । একটু আগে যে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, তার চিহ্ন নেই এখন । ট্যাক্সির নম্বর দেখতে ঘাড় ঘোরাবার সময়েই লোকটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে । তাজ্জব ব্যাপার । অর্জুন আরও খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল গাছের আড়ালে । না, লোকটার কোনও চিহ্ন আর দেখা যাচ্ছে না । সে রাস্তায় নামল । সতর্ক চোখে কালভার্টটা পার হল । এটা বোঝাই যাচ্ছে, লোকটা রাস্তায় উঠে আসেনি । এখানে কালভার্ট ছাড়িয়ে ঝোরাটা বেশ চওড়া । পাশেই গভীর জঙ্গল । যে-কোনও মানুষ ওখানে নেমে গেলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব । ফরেস্ট অফিস পর্যন্ত হেঁটে এল অর্জুন । এখনই গাছের ছায়া ঘন হতে শুরু করেছে । তাদের আয়তনও বাড়ছে । কিন্তু আকাশে সূর্যদেব বহাল রয়েছেন । রেঞ্জারের অফিসে উঠে এসে অর্জুন দেখল, মিস্টার বিশ্বাস এর মধ্যেই স্নান করে ফিরে এসেছেন নিজের চেয়ারে । ফাইলপত্র খুলে

লেখালেখি করছেন। জুতোর শব্দ শুনে মুখ তুলে বললেন, “আসুন। ভালই হল, খাতায় নামধাম লিখে দিয়ে যান।”

খাতাটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি, “এটা নিয়ম। তবে ধাম যে সবাই ঠিক লিখে যান, তা নয়। মাস-তিনেক আগে শঙ্কর ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সপ্তাহখানেক ছিলেন। পেমেন্ট করার সময় দেখা গেল দেড়শো টাকা কম পড়ছে। বললেন, গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। সেটা আজও দিচ্ছেন। চিঠি দিয়েছি, ফেরত এসেছে।”

অর্জুন হেসে বলল, “না, আমরা পুরো পেমেন্ট করেই যাব।” নামধাম লিখে সে একটা নামের ওপর চোখ রাখল। মিস্টার পুরি। মালবাজারের সেই ভদ্রলোক, যিনি বেয়ারাকে ধমক দিয়েছিলেন দরজায় টোকা দেওয়ার জন্যে। ওই ভদ্রলোক এখানে কখন এলেন? সে প্রশ্নটা করল মিস্টার বিশ্বাসকে। তিনি বললেন, “ভদ্রলোক এই একটু আগে এসেছেন। ট্যাক্সিতে বাংলোর দিকে গেলেন।”

“এঁর ঠিকানা কী?”

“ওটা জিজ্ঞেস করবেন না। ব্যাপারটা সরকারি, এটুকু বলতে পারি।”

“সরকারি মানে?”

“কিছু-কিছু অফিসার অথবা সরকারের বড় কর্তার সুপারিশে কোনও-কোনও মানুষ আসেন, যাঁদের ডিটেলস আমরা ওই খাতায় লিখে রাখি না।”

অর্জুন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আর যাই হোক, মিস্টার পুরি তা হলে সন্দেহভাজনদের লিস্টে পড়ছেন না। সে সিগারেট ধরাল, “আচ্ছা মিস্টার বিশ্বাস, এখান থেকে কিছু দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, সেখানে রাত কাটাতে গেলে কী করতে হবে? শুনেছি, বন্যজন্তু দেখা যায় ওখান থেকে।”

“আপনারা যেতে চাইছেন ওখানে?”

“হ্যাঁ।”

“আজ রাতে আমি আপনাকে সিকিউরিটি দিতে পারব না।”

“ও।”

“আসলে আজ রাতে একটা বড় ধরনের রেইডের প্ল্যান আছে। মিস্টার আহমেদ আসবেন সন্দের পরেই। বুঝতেই পারছেন!”

“কী ধরনের রেইড?”

“আমাদের কাছে ডেফিনিট ইনফরমেশন আছে, একটি বিশেষ এলাকায় কিছু উগ্রপন্থী ঢুকেছে। এরা এসেছে পাহাড় থেকে পালিয়ে। মাঝে-মাঝে গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করে। জঙ্গলের কাঠ কেটে ফেলছে। এদের কাছে আধুনিক আর্মস প্রচুর পরিমাণে আছে। তবে যাওয়ার সময় আপনাদের আমরা ওয়াচ টাওয়ারে নামিয়ে দিয়ে যাব। একটাই শর্ত, সারা রাত আপনারা ওখানে বসে থাকবেন।”

“অসুবিধে হয় না তো ?”

“মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্যে মলম নিয়ে যাবেন, ব্যস ।”

অর্জুন ব্যবস্থাটা মেনে নিল । ওই মেয়েরা নিশ্চয়ই নাছোড়বান্দা হবে । অতএব এই ব্যবস্থাই ভাল । হঠাৎ তার মনে পড়ল । সে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা মিস্টার বিশ্বাস, টুরিস্ট বাংলোর দোতলায় একজন অবাঙালি টাইপের দেখতে ভদ্রমহিলা রয়েছেন । উনি কে বলতে অসুবিধে আছে ?”

মিস্টার বিশ্বাস মিটিমিটি হেসে ফেললেন, “এসেছেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা । এর মধ্যে মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন আবার এই ভদ্রমহিলাকেও দেখতে পেয়ে গেলেন !” ফাইল বন্ধ করলেন ভদ্রলোক, “ওঁদের নিয়ে বাংলোর লোকজনের কৌতূহল কম নয় । উনি মিসেস ভার্মা । দিল্লিতে বাড়ি । দিন-তিনেক আগে মিস্টার ভার্মার সঙ্গে এখানে এসেছেন বেড়াতে । এসেই প্রথম রাত্রে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল । ওটা বাংলোর বাবুর্চিরাও শুনতে পেয়েছিল । পরশু বিকেলে মিস্টার ভার্মা একটা জরুরি কাজে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন । আজই তো তাঁর ফেরার কথা ।”

“ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বের হন না ?” অর্জুনের অস্বস্তি শুরু হল ।

“না । বোধহয় একটু ভীর্ণ প্রকৃতির মানুষ ।” মিস্টার বিশ্বাস উঠে দাঁড়ালেন, “আমাকে একটু মাদারিহাট যেতে হবে, অর্জুনবাবু ।”

“খুব ভাল হল । আপনি যদি মাঝ-রাস্তায় আমাকে নামিয়ে দেন...”

“চলুন । মাঝ-রাস্তায় কেন ?”

“মেয়েরা ওই পথেই গিয়েছে ।”

“ওদের বলুন, ইচ্ছে করলে মাদারিহাটটা ঘুরে আসতে পারে । ফেরার সময় আমার গাড়িতেই ফিরবে । কোনও অসুবিধে নেই ।”

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে চেপে পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে অর্জুন যাচ্ছিল মিস্টার বিশ্বাসের সঙ্গে । দু’ পাশে জঙ্গল আছে বটে, কিন্তু তত ঘন নয় । অর্জুন সে দিক থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার বিশ্বাস, এ দিকে গ্রামের মানুষ অথবা স্টেডি চাকরি করে না এমন মানুষের জীবনে ইদানীং কোনও পরিবর্তন এসেছে কি ?”

“কী ধরনের পরিবর্তন ?”

“এই ধরুন, হঠাৎ অবস্থা পালটে যাওয়া, হাতে নগদ পয়সা আসা, বাড়িতে যে পারিবারিক সোনা ছিল তা ব্যাঙ্কে জমা রেখে ধার নেওয়া ।”

“পারিবারিক সোনা ? নাঃ ! সে তো বহু বছর আগেই শেষ । এরা সোনা কী রকম দেখতে, তা-ই জানে না । এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো ?”

“এমনি । মনে হল তাই ।”

এই সময় মেয়েদের দেখা গেল । মাঝ-রাস্তা জুড়ে গান গাইতে-গাইতে

চলেছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। গাড়ি দাঁড়াতে অর্জুন মুখ বাড়িয়ে বলল, “মাদারিহাট বেড়াতে যাবেন? তা হলে ঘুরে আসতে পারেন।”

মেয়েদের দ্বিতীয়বার বলতে হল না। কলবল করে উঠে বসল। তারপরেই ওরা মিস্টার বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে লাগল সমানে, মাদারিহাটে কী-কী দেখার আছে, কী জিনিস পাওয়া যায়? এখান থেকে ফুন্টসিলিং কত দূরে? আজ রাত্রে ওয়াচ টাওয়ারে যাবেই তারা।

এই সময় বিপরীত দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখা গেল। এদের ড্রাইভার গতি কমাল। মুখোমুখি হতেই অর্জুনের নিশ্বাস বন্ধ হল। ট্যাক্সির নম্বর তার চেনা। ড্রাইভার এবং ভাল করে দেখা না গেলেও, সওয়ারিকেও। পাশ কাটিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল। জঙ্গল পেরিয়ে চেক পোস্টের কাছে পৌঁছতে চৌকিদার সেলাম করে খুলে দিল লোহার পথ-নিরোধক পাইপটা। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, “একটু আগে কি মিস্টার ভার্মার ট্যাক্সি গেল?”

“জি সাব।” লোকটা মাথা নাড়ল।

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি মিস্টার ভার্মাকে চেনেন?”

“একটুখানি।” অর্জুন গম্ভীরমুখে জবাব দিল।

কথাগুলো শুনছিল মেয়েরা। নন্দিনী বলল, “স্ট্রেঞ্জ! উনি এখানেও?”

অর্জুন কথা বাড়াল না। মিস্টার বিশ্বাস ওদের মাদারিহাট বাজারের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, “আমি সাড়ে-পাঁচটায় ফিরব। তখন আপনারা এখানে থাকবেন। নিয়ে যাব। মনে রাখবেন, সন্দের পর জঙ্গল পেরিয়ে বাংলায় ফেরার জন্যে কোনও গাড়ি পাবেন না।”

তিনি চলে যাওয়ামাত্র নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার বলুন তো? আমরা যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই ভার্মা-আক্লল ধাওয়া করছেন কেন?”

“আমার মনে হয় উনি জানেন না, আপনারা এখানে আছেন। উনি এসেছেন ওঁর স্ত্রীর কাছে, যিনি আমাদের বাংলোর দোতলায় পরশু থেকে একা আছেন।”

“ভার্মা-আন্টি?” অবাক হয়ে বলে নন্দিনী।

“আপনি তাঁকে চেনেন?”

“হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন। উনি যে একই বাংলায় আছেন, তা তো আমি জানি না। আমার সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক।”

ওই রকম চাউনির কোনও মহিলা ভাল সম্পর্ক রাখতে পারেন শুনে অবাক হল অর্জুন। নন্দিনী তখন তার বন্ধুদের বলছিল, “ভার্মা-আন্টি দারুণ রান্না করে। কিন্তু আমার ভাবতে অবাক লাগছে, আমরা একই বাংলায় থেকেও সেটা জানি না।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওঁকে দেখতে কী রকম?”

“ঠিক মা-মা ধরনের । আই মিন, মাদারলি । একটু পুরনো দিনের মানুষ ।”

“খুব সুন্দরী ?”

“নট দ্যাট । শি ইজ নাইদার সুন্দরী নর স্মার্ট । আপনি আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের দেখেছেন ? ফুল অব স্নেহ !”

“বুঝতে পেরেছি ।” অর্জুন মুখে কিছু বলল না । কিন্তু সে আরও ধন্দে পড়ল । ওই মহিলাকে দেখলে কোনও মতেই মা-মা বলে মনে হয় না । একটি স্মার্ট আধুনিকা—যিনি সমস্ত পৃথিবীকে সন্দেহ করেন, এমন একটা ছবি মনে আসে । তা হলে নন্দিনীর বর্ণনার সঙ্গে ওঁর কোনও মিল নেই । তা হলে কি ভার্মসাহেব নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসেননি ?

ওরা মাদারহাটের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াল । এখান থেকে বাস ড্রয়ার্সের নানা অঞ্চলে যায় । শিলিগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ি শহরে ঘন ঘন বাস । আর ফুন্টসিলিং-এ পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটও যাবে না । মেয়েরা বায়না ধরল ফুন্টসিলিং-এ যাওয়ার । কিন্তু অর্জুন আপত্তি করল । ওখানে গেলে মিস্টার বিশ্বাসের গাড়ির লিফট পাওয়া যাবে না ।

ওরা যখন বাংলায় ফিরল, তখন জঙ্গলে সন্ধে নেমেছে । ঝাঁঝির ডাক শুরু হয়ে গেছে চার পাশে । ফরেস্ট অফিস থেকে বাংলার রাস্তায় আলো জ্বলছে । গাড়ি থেকে নেমে ওরা মিস্টার বিশ্বাসের নির্দেশ শুনল । রাত নটায় ওঁরা এখান থেকে বের হবেন । তার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে । প্রস্তুত থাকতে হবে সারা রাত জেগে থাকার জন্যে । উনি ফিরে গেলেন ।

অর্জুন নন্দিনীর সামনে দাঁড়াল, “শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে ।”

“বলুন ।” নন্দিনী সন্ধিগ্ধ চোখে তাকাল ।

“আপনি মিসেস ভার্মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না ।”

“কেন ?” প্রতিবাদের গলায় জিজ্ঞেস করল নন্দিনী ।

“এমনও হতে পারে, মিসেস ভার্মা পরিচয় দিয়ে এখানে যিনি আছেন, তিনি হয়তো ওঁর স্ত্রী নন । হয়তো অন্য কোনও আত্মীয়, কিংবা প্রয়োজন পড়েছে বলে ওই পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছেন ।” অর্জুন নিচু গলায় বলছিল ।

নন্দিনীর চোখ-মুখে বিস্ময় ঠিকরে উঠেছিল, “সে কী !” তারপর বাংলার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, “আমি যদি কোনওভাবে দূর থেকেও ওঁকে দেখতে পেতাম ।”

“সেই চেষ্টা না করাই ভাল ।” বলতে বলতে অর্জুন দেখল, শিলিগুড়ির সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার কিচেনের দিক থেকে বেরিয়ে আসছে । কথা না বাড়িয়ে অর্জুন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল । যেহেতু অন্ধকার নেমেছে এবং জলঢাকা থেকে পাওয়া বিদ্যুতের তেজ খুবই কম, তাতে লোকটা তাকে দেখতে পায়নি বলেই মনে হল তার । এখন দোতলার সেই ঘরটির দরজা বন্ধ ।

নিজের ঘরে ঢুকে স্বস্তি পেল সে। যদিও তার মনে হল, মেয়েদের বলে আসা উচিত ছিল, যে-যার ঘরে যেন ফিরে যায়। সে নিশ্চিত যে, মিস্টার ভার্মা তাদের খোঁজ পেয়ে এখানে আসেননি। তিনি যে মতলবেই শিলিগুড়ি শহরে গিয়ে থাকুন, মিসেস ভার্মা নামক মহিলাকে যেহেতু এখানে রেখে গিয়েছিলেন, তাই ফেরত আসতে হতই তাঁকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। মালবাজার ট্যুরিস্ট লজের সব ক'টি মানুষ যেন হলং-এ চলে এল কারও অদৃশ্য হস্তক্ষেপে।

খোলা জানালায় চেয়ার নিয়ে বসেছিল অর্জুন। আকাশটা যেন অন্য রকম। কেমন একটা আলো টুইয়ে আসছে সেখান থেকে। আজ কোন্‌ তিথি? এক-টুকরো চাঁদ সম্ভবত উঠে আসছে। ও পাশের জঙ্গলে নিশ্চিন্দ অন্ধকার। শুধু ঝাঁঝি ডাকছে, হাওয়া বইছে। এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন ঘরে ঢুকতে বললে দুপুরবেলার সেই লোকটা চায়ের ট্রে হাতে উদয় হল, “মেমসাব লোগ আট বাজে খানা খায়েগা। আপ?”

“সাড়ে আটটায়। কী খাওয়াবে?”

“চিকেন রোট আউর ভাজি।”

“খুব ভাল। মিস্টার পুরি কোন্‌ ঘরে আছেন?”

“দোতলামে। উও আব্ভি আ গিয়া।”

“তুমি খুব ভাল মানুষ। আচ্ছা, এখানকার গ্রামগুলোতে তুমি যাও?”

“জি সাব।”

“আজ যে লোকটা খুন হল, তাকে চেনো?”

“জি সাব।”

“চেনো?”

“জি সাব। আচ্ছা আদমি থা। লেकिन दो-तिन माहिना से उसको दिमाग खराप हो गिया था।”

“কী রকম?”

“হামকো বোলা, বাংলামে বড়া-বড়া আদমি আতা হয়, উনলোগ পুরানা সোনা চাহে তো মিল যায়েগা। সস্তামে। হাম বোলা, তুম পাগলা হো গিয়া।”

“তারপর?”

“উসকো বাদ নেহি আয়া ও।”

“ঠিক আছে, যাও।”

লোকটি চলে গেল, কিন্তু অর্জুনের মন জুড়ে তখন উত্তেজনা। জগুদা তাকে মালবাজারে যে সোনা বাঁধা-রাখার গল্প বলেছিলেন, সেটার সত্যতা সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। ব্যাপারটা মাদারিহাট, হলং-এ পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ, একটা বিরাট চক্র এর পেছনে কাজ করছে। কিন্তু যত সহজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, ঠিক তত সহজ নয়। একজন বা একদল মানুষের হাতে যদি চোরাই

সোনা এসে থাকে, তা হলে তাদের জানা আছে ন্যায্য দামে কী করে তা বিক্রি করতে হয়। কম দামে বিক্রি অথবা অল্প টাকায় বন্ধক রেখে লোকসান করবে কেন তারা। ব্যাপারটায় ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। আর আজ যে লোকটার মৃতদেহ পাওয়া গেল! সে নিশ্চয়ই এই সোনাচক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। কোনও রকম মতবিরোধ ঘটায় লোকটাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু সেই লোমশ জন্তুটাই সব হিসেবে গোলমাল করে দিচ্ছে।

অর্জুন সিগারেট ধরাল। চা খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখল, বাংলোর ওপর থেকে একটা সার্চলাইট ঝোরার ওপারের ঘাসের মাঠটাকে আলোকিত করছে—যেখানে নুনমাটি রাখা আছে। আর আচমকা আলো পড়ায় গোটা-বারো বিশাল চেহারার বাইসন মুখ তুলে তাকাল এ দিকে। আলোয় তাদের চোখ জ্বলতে লাগল। দৃশ্যটি সুন্দর। বাইসনগুলো এবার সরতে লাগল। যেন ছোট-ছোট টিলা ঢেউ-এর মতো চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। তখনই আলো নিবে গেল।

রাত পৌনে নটায় মেয়েরা তৈরি। নন্দিনী খুবই উত্তেজিত। সে নাকি সন্ধে থেকে দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় আধঘন্টা বাদে সেই বিশেষ ঘরের দরজা খুলে যে লম্বা মহিলাটি বেরিয়ে এসেছিল, তিনি সাত-জন্মেও মিসেস ভার্মা নন। এই সময় এক পাঞ্জাবি যুবক বাংলায় উঠে আসতে, ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। ওদের কথায় উত্তেজনা ছিল। সে আর-একটু সাহস দেখিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্ধকার থেকে এক ভদ্রলোক ওর দিকে এগিয়ে চাপা গলায় ইংরেজিতে বলেছেন, ‘গো ব্যাক টু ইওর রুম, ডক্ট ইনভাইট ট্রাবল।’ কথাটা শোনার পর নন্দিনী আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। কিন্তু নন্দিনী ভাবতে পারছে না, ভার্মা আঙ্কেল কেন অন্য মহিলাকে আন্টি সাজিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন। অর্জুনের মাথায় অন্য চিন্তা ঢুকল। যে ভদ্রলোক নন্দিনীকে সাবধান করে দিয়েছেন, তিনি কে? আর এই পাঞ্জাবি যুবকের নাম কি বলদেব?

অর্জুনেরা বাংলোর বাইরে এসে অপেক্ষা করছিল যেখানে হাতির পিঠে ওঠার সিমেন্টের সিঁড়ি রয়েছে। চিকি এবং টিনা সিঁড়ির ধাপে উঠে বসে ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “যে লোকটা আপনাকে সাবধান করল, তাকে দেখতে কেমন?”

“অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। গলা শুনেই আমার বুক টিপ-টিপ করছিল।”

ঠিক নট বাজতেই দুটো জিপ এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে। পেছনেরটা পুলিশে ভর্তি। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “কী, এখনও বলুন যেতে পারবেন কি না?”

“পারব না কেন ?” নন্দিনী জিজ্ঞেস করল ।

“সেকেন্ড থাটে যাওয়া ক্যানসেল হলেও হতে পারে । চলুন, উঠে পড়ুন ।”
বেশ কষ্ট করেই ওরা জিপে উঠল । কারণ পেছনেও দুজন পুলিশ অস্ত্র নিয়ে বসেছেন । মিস্টার আহমেদ বললেন, “আপনাদের সাহস খুব । দেখবেন, রাত্রে ওপর থেকে নীচে নামতে চেষ্টা করবেন না । একমাত্র সাপ ছাড়া কোনও বন্যজন্তু আপনাদের নাগাল পাবে না ওপরে বসে থাকলে ।”

পুনম চিৎকার করে উঠল, “সাপ ? ও মাই গড ।”

আহমেদ বললেন, “ভয় পাওয়ার কিছু নেই । সাপেদেরও কাজকর্ম আছে । সঙ্গে একটা লাঠি রাখলেই চলবে ।”

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “ওয়াচ টাওয়ারে লাঠি পাবেন, মশালও ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার আহমেদ, বলদেব নামের কোনও পাঞ্জাবি ছেলেকে আপনি চেনেন ?”

“কোন বলদেব ?”

“ঠিক জানি না । মালবাজারেও যার যাতায়াত আছে ।”

“ও, সাপ্লয়ার বলদেব । কেন বলুন তো ?”

“লোকটি কী রকম ?”

“ভাল । গরিব-দুঃখীদের খুব সাহায্য করে । কারও-কারও কাছে ও প্রায় দেবতার মতো । এখন পর্যন্ত নাথিং এগেইনস্ট হিম ।”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না । নিঃসাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুটো জিপ ছুটে যাচ্ছিল । এবার পরিষ্কার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তারা জঙ্গলে পথ ধরল । বিশ্বাস বললেন, “আমাদের যেতে হবে এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে । তখন আলো জ্বালা চলবে না । আপনাদের জন্যে দুশিষ্টা থাকল । একটা কথা, সিঁড়ির একেবারে শেষ পাঁচটি ধাপ ইচ্ছে করলে খুলে নেওয়া যায় । যদি তেমন প্রয়োজন মনে করেন সেটা করবেন ।”

জঙ্গলের ভেতরে খানিকটা খোলা জায়গার সামনে জিপ দুটো থামল । অর্জুন দেখল, তিনতলা উঁচু একটা ওয়াচ টাওয়ার । ওপরে ছাউনি রয়েছে । পাশ দিয়ে বাঁকানো সিঁড়ি পৌঁছে গেছে ছাউনিতে । মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের কাছে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আছে ?”

অর্জুন বলল, “ছোট টর্চ আছে ।”

“ওটা কাজে লাগবে না । আমাদের কাছে একস্ট্রা টর্চ আছে, এটা রাখুন ।”
মেয়েদের নিয়ে অর্জুন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেলে জিপ দুটো অন্ধকার চিরে ফিরে গেল । পুনম সঙ্গে দুটো চাদর এনেছিল । আট ফুট বাই সাত ফুট একটা ঘরে দুটো বেঞ্চি । ঘরের চার পাশে চারটে জানালা । অন্ধকার যতই গভীর হোক, কিছুক্ষণ তাকালে তার ভেতরে এক ধরনের আলো খুঁজে পায় চোখ । বেঞ্চিতে চাদর পেতে দিল পুনম । তারপর ব্যাগ থেকে মশার ধূপ বের করে
৫২২

দেশলাই ঠুকে জেলে এক কোণে রেখে দিল। অর্জুন ব্যাপার দেখে বলল, “যথেষ্ট ধন্যবাদ এসব ভাবার জন্যে।”

পুনম বলল, “আপনাকে আমি ধন্যবাদ দেব, যদি সিঁড়ির ধাপটা খুলে রাখেন। অন্ধকারে যদি সাপ ওপরে উঠে আসে, দেখতেও পাব না।”

অর্জুন এগিয়ে সিঁড়ির মুখটায় গেল। ইচ্ছে করে সে টর্চ জ্বালছিল না। সিঁড়ির হাতল ধরে সে একটু টানাটানি করতে সেটা নড়ে উঠল। এবার আর-একটু শক্তি প্রয়োগ করতেই সেটা খুলে এল। অর্থাৎ, সিঁড়ির স্ফেমগুলো খাপে-খাপে বসানো রয়েছে। খোলা ধাপগুলোকে সে ওপরে হেলান দিয়ে রাখল।

মেয়েরা ততক্ষণ আরাম করে বসেছে। টিনা বলল, “ফ্যান্টাস্টিক। আমার খুব উত্তেজনা লাগছে। ধরো, যদি একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আসে—উঃ।”

চিকি বলল, “আমি ভাবছি, যদি এখন টারজান আসত। ভাবা যায় না।”

অর্জুন জিভে শব্দ করল, “কোনও কথা নয়। আপনাদের বাক্য শুনলে কোনও জন্তু-জানোয়ার এ-তল্লাটেই আসবে না। এই মশার ধূপের গন্ধটা ওরা না-পেলে বাঁচি। অবশ্য যেভাবে হাওয়া বইছে, তাতে গন্ধ মাটিতে নামবে না।”

অর্জুন নন্দিনীর পাশের বেঞ্চিতে বসল। প্রায় পনেরো মিনিট চুপচাপ কাটল, কোথাও কোনও শব্দ নেই শুধু বাতাস গাছগুলোর মাথায় বিলি কেটে যাচ্ছে। এবার পুনম কথা বলল, “দূর! আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে!”

“জন্তুরা গান বুঝবে না।” অর্জুন চাপা গলায় বলল।

“এখানকার জন্তুরা বেরসিক। টিভি-তে ওয়াইল্ড অ্যানিমাল সিরিজ দেখেছিলাম, একটার পর একটা বন্যজন্তু গান গাইছে। টারজান ছবির গান।”

নন্দিনী বলল, “তোর গান শুনে সাপ উঠে আসতে পারে।”

পুনম চুপ করে গেল। আরও অনেকক্ষণ। অর্জুনের খুব ইচ্ছে করছিল সিগারেট খেতে। নাঃ, আজকাল খুব বেশি সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে যদি দিনে পাঁচটা খায়, তা হলে ষাট বছরে পৌঁছে পনেরোটা থাকবে। ইনজুরিয়াস টু হেলথ। আজ রাতে সে একটাও সিগারেট খাবে না।

হঠাৎ নন্দিনী তার হাতে মৃদু ধাক্কা দিল। হকচকিয়ে সে নীচের দিকে তাকাল। বড় বড় লাল চোখ জ্বলছে। চট করে মনে হয়, লাল ফুল ফুটে রয়েছে। অর্জুন টর্চ জ্বালল। সঙ্গে-সঙ্গে নীচের খোলা জমি আলোকিত—আর এক ডজন হরিণ অবাক চোখে এক পলক তাকিয়ে দে দৌড়-দৌড়! যেন রঙের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। নন্দিনী বলে উঠল, “বিউটিফুল।” অর্জুন টর্চ নিবিয়ে ফেলল।

এমনি করে রাত বারোটোর মধ্যে ঝাঁঝির ডাক শুনতে-শুনতে ওরা একটা ভালুক দেখল, একদল বাইসনকেও। বুনো শূয়ারগুলো ঝামেলা করল

কিছুক্ষণ। সব-শেষে এক জোড়া গণ্ডার। গায়ে আলো পড়া সত্ত্বেও তারা নড়তে চাইছিল না। যেন পৃথিবীর কোনও বস্তুকেই তাদের ভয় নেই।

মেয়েরা এ সব দেখে খুব আনন্দিত। নন্দিনী বলল, “এ বার বাঘ এলে ঝোলকলা পূর্ণ হয়। বাঘ আসবে মনে হয়?”

“এখানে খুব অল্প বাঘ আছে। দুটো শুনেছি বেশ বুড়ো।”

“উঃ, আপনি খুব বেরসিক।” নন্দিনী মন্তব্য করল।

রাত দেড়টা পর্যন্ত আর কোনও জন্তু এ-তল্লাটে এল না। অর্জুনের মনে হল, যারা টর্চের আলো দেখে গিয়েছে—তারা বাকি সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। হয়তো জন্তু-জানোয়াররা নিজেদের মধ্যে ইশারায় কথা বলতে পারে।

দেড়টার একটু আগে পুনম আর টিনা বেষ্টিতে শুয়ে পড়ল। ঘুমে নাকি ওদের চোখ জুড়ে আসছে। চিকি চাদরটা মেঝেতে পেতে বলল, তেমন কোনও ইন্টারেস্টিং জন্তু এলে ওকে যেন ডেকে দেওয়া হয়।

এখন ওয়াচ টাওয়ারে অর্জুন আর নন্দিনী জেগে আছে। চার পাশের অন্ধকার বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। অর্জুনের মনে হল, কারও পায়ের আওয়াজ হল। অর্জুন টর্চ নিয়ে সজাগ হল। আওয়াজটা সামনে এলে সে সুইচ টিপবে। এত কাছ থেকে বন্যজন্তু দেখা খুবই রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। সামনে আসামাত্র টর্চ জ্বালল অর্জুন। আর সঙ্গে-সঙ্গে জন্তুটা আলো লক্ষ্য করে ওপরের দিকে তাকাল। কিন্তু পাঁচ ব্যাটারির আলোর তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে মুখ নামিয়ে নিল। ততক্ষণে নন্দিনী অর্জুনের হাত আঁকড়ে ধরেছে। দু’পায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে জন্তুটা, সেটা গোরিলা নয়, কিন্তু বিশাল হনুমান বলতেই হবে। চোখে আলো পড়ায় জন্তুটা যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। আর তখনই একটা শিসের আওয়াজ কানে এল। সুইচ অফ করে দিল অর্জুন। মুহূর্তেই অন্ধকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল চারধার থেকে। চাপা গলায় নন্দিনী বলল, “সেই জন্তুটা।”

অর্জুনের কোনও সংশয় ছিল না। ইনিই আজ সকালে গাছের ডাল থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়েছিলেন। হনুমান এত বড় হয়, তার জানা ছিল না। এই হনুমান কি সেই মৃতদেহটাকে রাস্তা পার করে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? কার স্বার্থে? শিসটা এখন বেশ স্পষ্ট হচ্ছে। জঙ্গলে শব্দ হচ্ছে এগিয়ে আসার।

মানুষ আসছে। অর্জুন ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে তাকাল। হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় কারও, আর কথা বলে ওঠে, তা হলেই চিড়ির। নন্দিনী হাত সরিয়ে নিয়েছিল। সে ফিসফিস করে বলল, “অ্যালার্ট থাকুন, কথা বলবেন না।”

শিসটা খোলা জমিতে এসে থামল। অন্ধকার আবার মিইয়ে যাওয়ায় অর্জুন মানুষটার অবয়ব দেখতে পেল। এবং তারপরেই টর্চ জ্বলল। যে লোকটা টর্চ

জ্বলেছে, তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হনুমানটা তার উত্তেজনা লোকটার কাছে প্রকাশ করে যাচ্ছে। এবং তখনই আলো নিবে গেল।

ওয়াচ-টাওয়ারটা মাটি থেকে যে উচ্চতায়, তাতে রাত্রের অন্ধকারে নীচ থেকে কেউ ওপরে আছে কিনা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। টর্চ নিবে যাওয়ার পর জঙ্গল যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। যে এসেছিল, সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। তার অবশ্য কিছু করারও উপায় নেই, একমাত্র বসে লক্ষ্য করে যাওয়া ছাড়া। সে ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে তাকাল। জেগে উঠলে ওরাই বিপদ ডেকে আনতে পারে।

নীচে কোনও শব্দ নেই। যদি সেই লোকটা এখনও আড়ালে অপেক্ষা না করে থাকে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, অন্ধকার জঙ্গলে পথ চলতে সে খুবই ওস্তাদ। এই মুহূর্তগুলো খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। যে জানান দেবে, সে ধরা পড়ে যাবে। নন্দিনী বসে আছে পাথরের মতো। ব্যাপারটা তারও নজরে পড়েছে। মেয়েটার নার্ভ আছে, মনে-মনে স্বীকার করল অর্জুন।

মিনিট-তিনেক বাদে নীচের সিঁড়িতে শব্দ হল। খুব হালকা। কেউ কি উঠে আসছে? সাপ? অর্জুন সন্তর্পণে মাথা নোয়াল। এখন যদি নীচ থেকে কেউ টর্চের ফোকাস ফেলে, তা হলে সে ধরা পড়বে। কিন্তু একদলা অন্ধকার নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসছে। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে। বোধহয় সরাসরি উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

অর্জুন লম্বা লাঠিটা তুলে ধরল। যেই হোক, ওপরে উঠে এলেই আঘাত করবে। তার খেয়াল ছিল না যে, সিঁড়ির ওপরের কয়েকটা ধাপ খুলে রেখেছিল সে। ওই পর্যন্ত এসে জম্জটা যেন থমকে দাঁড়াল। হনুমানটাকে এবার স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এত বড় হনুমান কখনও দেখিনি সে। জম্জটাও যেন তাকে লক্ষ্য করল। তার পর সরসর করে নীচে নেমে গেল। যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে জম্জটা।

অর্জুনের উত্তেজনা সামান্য কমল। কয়েকটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল। এই জম্জটাকে চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছে যে-লোকটা, সে নীচেই দাঁড়িয়ে আছে। মৃতদেহ রাস্তার এ পাশে বয়ে নিয়ে আসা অত বড় হনুমানের পক্ষেও সম্ভব কি না সেটা ভাবনার ব্যাপার, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। ওই মৃতদেহের সঙ্গে এই হনুমান এবং তার মালিক জড়িত। লাঠিটাকে হাতছাড়া করছিল না অর্জুন। সময় কাটছে। একটু-একটু করে এক ঘণ্টা কেটে গেল। জঙ্গলের যে সব শব্দ মরে গিয়েছিল, সেগুলো আবার জীবন্ত হল। অর্জুনের বিশ্বাস, ধারে-কাছে আর কেউ নেই। যে এসেছিল, সে সতর্ক হয়ে ফিরে গিয়েছে।

এবার নন্দিনী চাপা স্বরে বলল, “কী ব্যাপার বলুন তো?”

অর্জুন বলল, “আজ রাতে আর কিছু দেখা যাবে বলে মনে হয় না।”

কিন্তু দেখা গেল। ভোরের সামান্য আগে জঙ্গলে শব্দ হতে লাগল। পুনম, চিকি টিনা উঠে বসেছে। চিকি বলল, “আঃ, কী ফাইন আকাশ। ওইটে শুকতারা, না?”

নন্দিনী চাপা শব্দ করল। ওরা চুপ করে গেল তৎক্ষণাৎ। তারপরেই দেখা গেল একদঙ্গল হাতি জঙ্গল মাড়িয়ে খোলা জমিতে চলে এল। গাছের ডাল-পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ওরা গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেল। পুনম বলল, “ফ্যান্টাস্টিক। এ রকম দৃশ্য দেখার জন্যে হাজার হাজার মাইল যাওয়া যায়।”

নন্দিনী হাই তুলল, “তোরা তো সারা রাত ঘুমিয়েই কাটালি।”

টিনা জিজ্ঞাসা করল, “আমরা কি কিছু মিস করেছি?”

“প্রচুর। দারুণ একটা নাটক হতে যাচ্ছিল। আমরা যে জন্তুটাকে কাল দেখেছিলাম, সেটা একটা হনুমান।”

“যাঃ।” তিনটে গলা থেকেই একসঙ্গে বিস্ময় ছিটকে এল।

ভোরের রোদ ফোটা মাত্র মিস্টার বিশ্বাস গাড়ি নিয়ে চলে এলেন। রাত জাগার চিহ্ন ওঁর সমস্ত শরীরে। সিঁড়ি লাগিয়ে সবাই নেমে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কী-কী জিনিস দেখতে পেলেন, বলুন!”

নন্দিনীরা উচ্ছ্বসিত গলায় জন্তুদের নাম বলে গেল। অর্জুন চুপ করে ছিল। মেয়েরা কথা শেষ করতে জিজ্ঞেস করল, “আপনার এক্সপিডিশনের খবর কী?”

“চারজন ধরা পড়েছে। ওরা প্ল্যান করেছিল, হলং ফরেস্ট বাংলাটাকে পুড়িয়ে দেবে। আপাতত আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চলুন ফেরা যাক।”

ভোরের জঙ্গলের একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে। রাত জাগার ক্লান্তি সত্ত্বেও সেটা বেশ ভাল লাগছিল। জিপ সোজা চলে এল বাংলোর লনে। মেয়েরা প্রথমে নামল। এবং তখনই নন্দিনী বলে উঠল, “মাই গড।”

জিপে বসেই অর্জুন দেখল, ভার্ম-সাহেব আর একটি পাগড়ি-পরা লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসছেন। নন্দিনীরা সঙ্গে সঙ্গে বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ভদ্রলোক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। বিশ্বাস বললেন, “কী ব্যাপার বলুন তো?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।” তা হলে আমার বাড়িতে চলুন। চা খেতে-খেতে শোনা যাবে।” জিপ চালু হতেই ভার্ম-সাহেব এ দিকে তাকালেন। জিপের ভেতর কারা আছে, তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় দূরত্ব এবং আড়ালের জন্য। কিন্তু অর্জুন ভার্ম-সাহেবের সঙ্গী পাঞ্জাবী যুবকটিকে দেখে নিয়েছে। ভার্ম-সাহেবকে যতটা চকচকে এবং টাটকা দেখাচ্ছে পাঞ্জাবি যুবকটিকে তার বিপরীত লাগছে। জামা-কাপড় এবং মুখে একটা তেলতেলে ধুলো মাখানো। রাত জাগলে যেমনটা হয়।

অর্জুন ঠোট কামড়াল।

মিস্টার বিশ্বাসের কোয়ার্টাসে পৌঁছে মুখ-হাত ধুয়ে ওরা বারান্দায় বেতের চেয়ার নিয়ে বসল। 'ভদ্রলোক একাই থাকেন। কিন্তু ব্যাচেলররা সাধারণত যেমন অগোছালো হয়, এই ভদ্রলোক তেমন নন। ভৃত্যকে চায়ের হুকুম দিয়ে তিনি ভেজা সকাল, ছায়া-ছায়া রাস্তা আর গাঢ় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কিছু আবিষ্কার করলেন নাকি?”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “শেষ কবে জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের পায়ের ছাপ গোনা হয়েছে?”

“বছরখানেক তো বটেই।”

“আপনি একটা খবর জানেন, এই জঙ্গলে এমন একটা হনুমান আছে, যে রোগা-পটকা মানুষের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে পারে।”

“ইমপসিবল।”

“অসম্ভব হলেও সেটা সত্যি।”

“আমি বিশ্বাস করি না। একটা গোরিলা, যেমন ধরুন গঞ্জের কিংকং যা পারে, কোনও হনুমান—তা সে যতই বড় হোক পারা সম্ভব নয়।”

“কিন্তু গতকাল মেয়েরা যে প্রাণীটিকে দেখেছিল, যে কিনা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে একটা ম্যাগনাম সাইজের হনুমান। রাত্রে তাকে আমরা ওয়াচ-টাওয়ারের সিঁড়িতে দেখতে পেয়েছি। হনুমানটা ট্রেইন্ড, একটি লোক ছিল সঙ্গে।”

“লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন?”

“না। হনুমানটা তাকে সতর্ক করে দিতেই সে আড়ালে চলে গিয়েছিল।”

একটু ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, “এমন হতে পারে, মেয়েরা হনুমানটাকে ঠিকই দেখেছিল। সে রাস্তা পার হয়ে মৃতদেহটি ঠিক আছে কি না দেখেছিল। তারপর তার মানুষ মনিব এসে ওটাকে তুলে ও পারের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখে। হতে পারে না?”

অর্জুনের মনে হল, হতেই পারে। সে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, “এতে বোঝা যাচ্ছে, কারও ইন্টারেস্ট আছে। আপনি, মৃত লোকটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন?”

“মিস্টার আহমেদ কাল রাত্রে বললেন, ওকে ছিনতাই করতে গিয়ে খুন করা হয়েছে। ওর কাছে পরিবারের অনেক পুরনো একটা সোনার গহনা ছিল। সেটা বিক্রি করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। এ দিকের গরিব মানুষের কাছে সোনা থাকাও মুশকিল।”

চা এসে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার ভার্মা, যিনি লনে পায়চারি করছিলেন একটু আগে, তাঁর সঙ্গে যে লোকটি ছিল, তাকে চেনেন?”

“কেন বলুন তো?”

“এই লোকটিও গত রাতে ঘুমায়নি। মিস্টার বিশ্বাস, আপনাকে একটু বিরক্ত করব?”

“বেশ তো। বলুন না।”

“মৃত মানুষটি যে-গ্রামে থাকে, সেখানে একবার যেতে পারি?”

“স্বচ্ছন্দে। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে। আপনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো?”

অর্জুন তাঁকে মালবাজারের ঘটনা, জগদার কাছে শোনা কাহিনী খুলে বলল। মিস্টার বিশ্বাস শুনতে-শুনতে মাথা নাড়ছিলেন। অর্জুন শেষ করল, “ব্যাপারটা বুঝুন। ওই মিস্টার ভার্মা কি মিস্টার পুরি এই বাংলাতেই আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছেন।”

“কিন্তু ভার্মা আসার আগেই খুনটা হয়েছে। আর ওঁর মতো একজন রেসপেক্টেড ভদ্রলোক জঙ্গলে ঢুকে গরিব মানুষকে খুনই বা করতে যাবেন কেন?”

“মিস্টার পুরি?”

“তিনিও তো বিকেল নাগাদ এসেছেন।”

“এই পুরি ভদ্রলোক কি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন?”

“আমি জানি না। খবর নিতে হবে।”

অর্জুন উঠে পড়ল। জিপ আসবে দশটা নাগাদ। তার আগে একটু বিছানায় গড়িয়ে তাজা হয়ে নেওয়া দরকার। পাখি ডাকছে দু’ পাশের জঙ্গলে। নুড়ি-বিছানো পথ দিয়ে অর্জুন বাংলার দিকে হাঁটছিল। এক নম্বর কালভার্টের কাছে পৌঁছে সে ঝোঁরার জলের দিকে তাকাল। তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে শ্রোত। পৃথিবী এখন চমৎকার। এখানে যে লোকটা গতকাল মেয়েদের অনুসরণ করতে-করতে জঙ্গলে মিলিয়ে গিয়েছিল—তার সঙ্গে ভার্মা-সাহেবের সঙ্গে লনে কথা বলতে আসা লোকটার চেহারার কোনও মিল নেই। গতরাতে জঙ্গলের ভেতরে যে টর্চ নিয়ে হনুমানটার সঙ্গে এসেছিল, তারা চেহারাও ভাল করে দেখতে পায়নি সে। অর্জুন কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করল। তারপর বাংলার দিকে পা বাড়াল।

লনে কেউ নেই। সেই ট্যাক্সি আর তার ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা অর্জুনকে দেখতে পেয়ে যে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছে, তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করল না সে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বেয়ারাটার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বলে দিল চটপট ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসতে।

রাত জাগলে ভোরবেলায় স্নান করলে শরীর অনেকখানি তাজা হয়ে যায়। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে জামা-প্যান্ট খুলতে-খুলতে সে কাগজটাকে দেখতে

পেল। তিন ভাঁজ কাগজটা মাটিতে পড়ে আছে। সম্ভবত ওপরের ভেটিলেটারের ফাঁক দিয়ে কেউ ফেলে দিয়েছে ঘরে। ওটা তুলে নিল অর্জুন। ইংরেজিতে লেখা, ‘তুমি কেন শুরু থেকে আরম্ভ করছ না?’ হাতের লেখা চেনার উপায় নেই, কারণ প্রতিটি অক্ষরই ইচ্ছে করে ক্যাপিটাল হরফে লেখা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার। সাধারণত শত্রুপক্ষের লোকেরা যদি অস্তিত্ব জেনে যায়, তা হলে হুমকি দেবার চেষ্টা করে। সরে না দাঁড়ালে মৃত্যু অনিবার্য—এমন কথাই লেখা থাকে। এ তো হুমকির বদলে উপদেশ। এই জঙ্গলে তার শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ আছেন নাকি? তিনি কেন চোরের মতো উপদেশ দেবেন?

ঘুম আসেনি। উত্তেজনা থাকলে রাত জাগার পরেই সকালে ঘুম পালিয়ে যায়। কিন্তু স্নান-খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ অবসাদ ছাড়া তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না।

জিপে ড্রাইভার ছাড়া কেউ নেই। ওর কাছেই শোনা গেল, রেঞ্জার মিস্টার বিশ্বাস এখন বিশ্রাম করছেন। অথচ এই ড্রাইভারটিকেই গত রাতে সে দেখেছিল—এর কি বিশ্রামের কোনও প্রয়োজন নেই? একটু খারাপ লাগল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি জানেন, আমি কোথায় যেতে চাই?”

“জানি স্যার। তবে গ্রাম পর্যন্ত জিপ যাবে না। একটু হাঁটতে হবে আপনাকে।”

অর্জুন মাথা নাড়ল। ক্রমশ জঙ্গলের গভীরতম অংশ পেরিয়ে জিপ চলে এল ফাঁকা জায়গায়। জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই গ্রাম শুরু হয়নি। গাড়ি গেল একটা ঘোরা পর্যন্ত। এখানে কোনও সাঁকো নেই। প্যান্টের নীচটা গুটিয়ে জল পার হল অর্জুন। পায়ে-হাঁটা পথ, এবড়ো-খেবড়ো। জঙ্গলে। জিপের পক্ষেও আসা সম্ভব ছিল না। মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর গোরুর গলার ঘণ্টা আর মুরগির ডাক শোনা গেল। শেষ পর্যন্ত গ্রামটাকে দেখতে পেল সে। খড়ের চাল, মাটির দাওয়া, কিছু কৃষিজীবী মানুষের বাস বোঝা গেল। গ্রামের মুখটাতেই একটা লোক সাইকেল নিয়ে খাঁকি হাফ-প্যান্ট আর শার্ট পরে দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে কিছু খালি গায়ের গ্রামের মানুষ। ওকে দেখতে পেয়ে লোকটা কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করল, “নমস্ते সাব। বড়া-সাব আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে সাহায্য করতে। আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। চার নম্বর বিটে আছি।”

অর্জুন তাকে নমস্কার করল, “এখানকার মানুষ জানে মৃত্যু ব্যাপারটা?”

“হ্যাঁ সাব। কালই খবর পেয়েছে। কিন্তু কেউ যায়নি।”

“যায়নি কেন?”

“গেলে তো মুশকিল। ডেডবন্ডি আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে নিয়ে যেতে

হবে পোস্টমর্টেম করতে । সেখান থেকে আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে । বেশ মোটা খরচ । এদের সেই সামর্থ্য নেই । না গেলে পুলিশই নিজে থেকে সে সব করিয়ে পুড়িয়ে দেবে ।”

খারাপ লাগল, কিন্তু খুব একটা অবাক হল না অর্জুন । ইতিমধ্যেই সে বুঝে গেছে, পেট ভরে খাওয়ার সামর্থ্যই এদের নেই । সে জিজ্ঞেস করল, “লোকটির ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রী নেই ?”

“আছে । আমি ওদের আপনার কথা বলে আটকে রেখেছি । আসুন সাব ।”

“আটকে রেখেছেন মানে ? কোথায় যাচ্ছিল ওরা ?”

“পেটের ধান্দায় । এক দিন বাড়িতে বসে-থাকা মানে পেটে দানাপানি না-দেওয়া ।”

অর্জুন লোকটিকে অনুসরণ করল । তাদের পেছন-পেছন গ্রামের লোকজন চলল । একটা জীর্ণ কুটিরের সামনে গিয়ে সে চার-পাঁচটা শীর্ণ বাচ্চা আর তাদের মাকে দেখতে পেল । মহিলাটির শরীরে শতচ্ছিন্ন শাড়ি এবং তারই আঁচল দিয়ে তিনি চোখ মোছার চেষ্টা করে যাচ্ছেন । বাচ্চাগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ।

পেছনে ভিড়টা আরও বেড়েছে । এই অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ কতটা ফলপ্রসূ হবে, তাতে সন্দেহ আছে । তবু সে জিজ্ঞেস করল, “যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি আপনার স্বামী ?”

মহিলা উত্তর দিলেন না । ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি কথাগুলো আদিবাসী ভাষায় উচ্চারণ করল । বাংলা ভাষার সঙ্গে কয়েকটা ক্রিয়াপদের তফাত ছাড়া তেমন পার্থক্য নেই ।

এবার মহিলা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন ।

“ওঁর সঙ্গে কারও ঝগড়াঝাঁটি ছিল ?”

মহিলা মাথা নাড়লেন, না ।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি বলল, “সাব, ওর পক্ষে এখন কথা বলা সম্ভব নয় । এত লোক দেখে লজ্জাও পাচ্ছে । ওর ভাসুরের সঙ্গে কথা বলুন । সে খুব ভাল মানুষ ।” বলে সামনে দাঁড়ানো এক শ্রৌটকে দেখিয়ে দিল । লোকটির পরনে খাটো ধুতি, খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত জমাট ধুলো । ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি তাকে কাছে ডেকে বাকিদের চিৎকার-চৈচামেচি করে দূরে সরিয়ে দিল । শ্রৌট নমস্কার করে কাছে এসে দাঁড়াল । অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, “এ রকম হবে তুমি জানতে ?”

শ্রৌট দুই হাত জড়ো করে দাঁড়াল, “আমি ভয় পেতাম ।”

“তোমার ভাই কী করত ?”

“আগে চাষ করত । কিন্তু তাতে ওর পেট, মন কিছুই ভরত না । শেষে

তামাক নিয়ে হাটে-হাটে ঘুরে বিক্রি করত। এতে কাঁচা পয়সা আসত ঘরে। তাই দিয়ে ধার শোধ করত। আমি বলতাম, ভগবান যা দিচ্ছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। বেশি লোভ করিস না। কিন্তু আমার কথা কানে তুলল না।”

“ওর অবস্থা কেমন ছিল?”

“আগে খুব খারাপ। এখন একটু ভাল হচ্ছিল।”

“তোমরা ক’ পুরুষ ধরে এখানে আছ?”

“অনেক-অনেক দিন।”

“এত অভাব যখন ঘরে, তখন সোনার গহনাটা কী করে থেকে গেল?”

শ্রীচ মুখ নামাল, “ঘরে কোনও সোনা দূরে থাক, রূপোও ছিল না। আপনি নিজের চোখেই আমাদের চেহারা তো দেখেছেন।”

“তুমি জানো, ও সোনা বিক্রি করতে গিয়েছিল?”

শ্রীচ উত্তর দিল না। কিন্তু চোরা-চোখে দূরে দাঁড়ানো গ্রামবাসীদের দিকে তাকাল। অর্জুন বলল, “তুমি এড়িয়ে যেও না। আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।”

শ্রীচ এবার গলা নামাল, “আমি তো ওই ব্যাপারেই সাবধান করেছিলাম। বেশি লোভ করিস না। কথাটা কানে নিলে এভাবে মরতে হত না।”

“সোনাটা ও পেয়েছিল কোথায়?”

“তা আমি জানি না। বলেনি আমাকে। কোনও এক হাটে কার সঙ্গে নাকি আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল এক ভরি সোনা যদি বিক্রি করে দেয়, তা হলে একশো টাকা পাবে।”

“কত টাকায় বিক্রি করতে বলেছিল?”

“তা আমাকে বলেনি ও।”

“সোনাটা তুমি দেখেছ?”

মাথা নাড়ল শ্রীচ, “একটা গোল আংটির মতো, কিন্তু ঠিক আংটি নয়।”

“এই গ্রামের আর কেউ সোনা বিক্রির ব্যবসায় নেমেছে?”

লোকটা চোরা-চোখে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল, “জানি না আমি।”

“তোমার কাউকে সন্দেহ হয়, যে ওকে খুন করতে যাবে?”

“না।”

অর্থাৎ, আর কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যাবে না। শ্রীচ ভয় পাচ্ছে। অর্জুনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ-গ্রামে আরও লোক আছে যাদের সোনা বিক্রির ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে। সে মনে মনে হতাশ হল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটি অবাক হয়ে শুনছিল এ সব কথা। শেষ হওয়ামাত্র বলল, “হায় বাপ। সোনা বিক্রি করার ক্ষমতা হয় এদের! হাঁ সাব, ধংমালি গ্রামের একটা লোক সোনার আংটি বিক্রি করতে গিয়েছিল মাদারিহাটে। লোকটার তিন কুলে কেউ সোনা দেখেনি। সবাই ভেবেছিল, চোরাই সোনা।

আসার পথে কারা যেন মারধোর করে সোনা কেড়ে নিয়েছে।”

অর্জুন জিঙ্গেস করল, “ধংমালি গ্রাম এখান থেকে কত দূরে?”

“সাইকেলে এক ঘণ্টা লাগবে।”

“জিপ যায়?”

“হ্যাঁ সাব।”

“আমাকে নিয়ে যাবেন?”

লোকটা মাথা নেড়ে এগিয়ে চলল। প্রায় বোবা হয়েই গ্রামের লোকগুলো তাদের যেতে দিল। ঝোরা পেরিয়ে জিপে উঠল অর্জুন। আর লোকটা তাদের সামনে সাইকেল চালাতে লাগল। ধংমালি গ্রামে যখন পৌঁছাল তারা, তখন সূর্যদেব মধ্যগগনে। জিপ ছেড়ে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গ্রামের মুখটায় পৌঁছে অর্জুন বলল, “আমি ভেতরে যাব না, আপনি ওকে ডেকে আনুন।”

মিনিট-পনেরো বাদে একটি উদ্ভ্রান্ত মানুষকে নিয়ে ফিরে এল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীটি। এনে আলাপ করিয়ে দিল।

অর্জুন তাকে বলল, “শুনলাম, আপনি সোনা বিক্রি করতে চান। আমি কিনব।”

লোকটা মাথা নাড়ল, “সোনা তো আর নাই।”

“বিক্রি করে দিয়েছেন?”

“না, যাদের সোনা তারা নিয়া নিল।”

“কেন?”

“আমারে মাদারিহাটে সবাই চোর ভাবছে, আমি বিক্রি কইরতে পারি নাই, তাই।”

“কার সোনা?”

“সে-কথা বলতে নারব বাবু। বললে আমাকে মেরে ফেলবে। কী পাপে যে রাজি হইছিলাম, এখন রাইতে ঘুম নাই, দিনে কাম কইরতে পারি না।”

“কাল যার মৃতদেহ জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে, তাকে চেনো?”

“চিনি বাবু। আমার স্যাঙাত ছিল। ওই তো আমারে নিয়া যায় সেখানে।”

“কোন খানে?”

“জঙ্গলের ভেতর। আর কিছু প্রশ্ন না করেন বাবু।”

“দ্যাখো, লোকগুলো অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছে। তুমি যদি সাহায্য করো, তা হলে ওই বদমাশ লোকগুলো শাস্তি পেতে পারে।”

“তার আগে আমারে মাইর্যা ফেলবে বাবু। হাতে-পায়ে ধইর্যা একবার বাইচ্যা আইছি। আমি যাই এখন।”

“ওদের মধ্যে কারও মোটরবাইক ছিল?”

“হ।” ঘাড়-নাড়ল লোকটা। তারপরেই খেয়াল হতে দ্রুত গ্রামের দিকে

পা চালাল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন জিপে উঠে বসল। রহস্য এবং তার সন্ধানের পথে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে সে, এমন মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে সতর্ক করল সে, এ সব নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কথা নয়। সে যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তাতে তার এখন বাংলায় থাকা উচিত।

জিপটা যখন গ্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢুকল, তখন অন্য-একটা চিন্তা তার মাথায় এল। সে যে এই দুটো গ্রামে এসেছে, খবরটা যাদের দরকার তারা পেয়ে যাবেই। সেটা পাওয়ার পর কী ঘটতে পারে। এই সময় দূরে একটা মোটরবাইকের আওয়াজ হল। আর আওয়াজটা এ দিকেই এগিয়ে আসছে। অর্জুন চটপট জিপের ড্রাইভারকে থামতে বলল। লোকটা ব্রেক কষতে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল, “আপনি আধ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলবেন একাই যাচ্ছেন।”

ড্রাইভার বলল, “এগিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমি এখানেই বনেটটা খুলে ইঞ্জিন দেখি। কেমন একটা সাউন্ড হচ্ছে।”

অর্জুন দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। বড় ঘাস আর শাল-সেগুনের গাছে জায়গাটা ছায়ায় মাখামাখি। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখল, ড্রাইভার বনেট খুলে ঝুঁকে ইঞ্জিন দেখছে। মোটরবাইকের আওয়াজ বাড়ছিল। অর্জুন রাস্তার খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল। ওখান থেকে বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধুলো উড়িয়ে মোটরবাইকটা চলে এল। যে চালাচ্ছে তার মাথায় হেলমেট, পেছনে আর-একজন বসে রয়েছে। জিপের কাছে এসে বাইকের গতি কমে এল। জিপটাকে ছাড়িয়ে আরও কিছুটা গিয়ে সেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বাঁক নিয়ে ঘুরে চলে এল জিপের গায়ে। শব্দ পেয়েই যেন জিপের ড্রাইভার মুখ তুলল। পেছনে যে বসে ছিল সে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ওস্তাদ? কোনও গোলমাল?”

ড্রাইভার বলল, “খুব গরম হয়ে গিয়েছিল।”

“তা তো হবেই।” লোকটা হ্যা-হ্যা করে হাসল, “চার পাশের হাওয়াই গরম।”

হেলমেটধারী হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, “বাকে নিয়ে গিয়েছিলে, সে কোথায়?”

“কাকে?”

“একটা বাঙালি ছোকরাকে। ন্যাকামি করো না।”

ড্রাইভার যেন মুশকিলে পড়ে গেল, “তিনি তো অনেক আগেই নেমে গিয়েছেন।”

“কোথায়?”

“ওই গ্রামের কাছেই ।”

“বেইমানি করো না ।”

“বেইমানির প্রশ্ন ওঠে না । আমি তোমার নুন খাইনি ।”

“তার মানে তুমি মিথ্যে বলছ ?”

“সেটা তুমি যা ভাবলে ভাল লাগে তাই ভাবতে পারো ।”

“এভাবে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না । ঠিক আছে ।” হেলমেটধারী পেছনের লোকটাকে কিছু বলতেই সে নেমে দাঁড়াল । মোটরবাইক চলে গেল গ্রামের দিকে । এবার লোকটি এগিয়ে এল জিপের কাছে, “আমাকে একটু ফরেন্স্ট বাংলায় পৌঁছে দাও ।”

“আরে এটা গবমেন্টের গাড়ি, পাবলিকের ওঠা নিষেধ ।”

“ছোড়ো ওস্তাদ । যে ছোকরাকে নিয়ে এসেছিলে, সেটাও পাবলিক ।”

“কে বলেছে তোমাকে ?”

“মালবাজার থেকে পেছন নিয়েছে । বস গোলমাল করতে চায় না বলে এখনও বেঁচে আছে । ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হল ?”

মোটরবাইকের আওয়াজ মিলিয়ে গিয়েছে । জঙ্গলের নিস্তব্ধতায় অর্জুন চটপট মতলব ঠিক করে ফেলল । লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে । কিন্তু ওর কাছে পৌঁছতে যে সময় লাগবে তাতেই ও দেখে ফেলবে তাকে । নীচ থেকে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে ডান দিকের জঙ্গলে ছুঁড়ল সে । ছড়মুড় শব্দ করে গাছপালায় আলোড়ন তুলে সেটা যখন নীচে পড়ল তখন ড্রাইভার আর লোকটা চমকে সে দিকে ফিরে তাকিয়েছে । লোকটা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী হল ?”

ড্রাইভার বলল, “হাতি নাকি ?”

“না, না । হাতি দূর থেকেই বুঝিয়ে দেয় ।”

“গিয়ে দ্যাখো না ।”

লোকটা সাহস দেখাল । সাবধানী পা ফেলে এগিয়ে গেল বিপরীত দিকে মুখ করে । আর তৎক্ষণাৎ গাছের আড়াল ছেড়ে অর্জুন চলে এল জিপের গায়ে । এসে নিজেই লুকিয়ে রাখল । লোকটার গলা শোনা গেল, “দূর, কিস্সু নেই । কিন্তু কিছু একটা পড়েছে । তোমার ইঞ্জিন যা ঠাণ্ডা হয়েছে, তাতেই চলতে হবে ওস্তাদ !” লোকটা ফিরে আসছিল ।

অর্জুন অপেক্ষা করছিল । লোকটা ড্রাইভারের সামনে এসে দাঁড়াতেই সে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল । আচমকা আক্রমণে লোকটা এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে, কথা বলার সুযোগ পেল না । তাকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে যখন অর্জুন পিঠের ওপর উঠে বসেছে, তখন লোকটার একটা হাত কোমরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল । সেটাকে মুচড়ে ধরতেই আত্ননাদ করে উঠল সে । কোমর থেকে একটা ধারালো ক্ষুর উদ্ধার করল অর্জুন । বাঁ পকেটে একটা লম্বা

মুখ-বন্ধ টিউব। ড্রাইভারকে সে বলল, “একটা দড়ি আছে?”

ড্রাইভার দেরি করল না। ভাল করে হাত-পা বেঁধে ওকে জিপে তোলা হল। জিপ চালু করতে অর্জুন টিউবটা সম্ভরণে খুলল। কিছু দিন আগে পর্যন্ত যে রকম সিরিঞ্জে টিকা দেওয়া হত, তারই একটা। ভেতরে তরল পদার্থ আছে। হাত-পা বাঁধা লোকটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সিরিঞ্জটাকে দেখছিল। অর্জুন চোখের সামনে থেকে সেটাকে নামিয়ে লোকটার হাতের দিকে নিয়ে যেতেই পরিব্রাহি চিৎকার করে উঠল সে, “না, না, আমাকে মেরে ফেলবেন না, পায়ে পড়ি আপনার, না!” তার চোখ দুটো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে যেন।

“এটা দিয়েই খুনটা করেছ?”

“আমি করিনি। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি।”

“কে করেছে?”

“আমি জানি না।” ঘন-ঘন মাথা নাড়ল লোকটা।

“তোমাকে বলদেব জিপের কাছে থেকে যেতে বলল কেন?”

লোকটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। অর্জুন সিরিঞ্জটা নাড়ল, “আমি পুলিশ নই। খুন করতে আমার কিন্তু অসুবিধে হয় না।”

“ও সন্দেহ করেছিল এই ড্রাইভার মিথ্যে বলছে।”

“তোমাদের বস কে?”

“আমি জানি না।”

“আমি বেশি কথা বলা পছন্দ করি না।”

লোকটা কঁকড়ে যাচ্ছিল। অর্জুন হাসল, “সোনাগুলো কোথেকে আসছে?”

“ইয়ে, নেপাল থেকে।”

“খাঁটি সোনা?”

“আমি জানি না।”

“এই সব গরিব লোকগুলোকে কেন ব্যবহার করছ? চোরাই সোনার তো অনেক চ্যানেল আছে বিক্রি করার। এদের জড়াচ্ছ কেন?”

“বস টাকা চায়। চটপট।”

“বস কে?”

“আমি জানি না।”

গাড়ি তখন কালভার্টের ওপর উঠে এসেছে। অর্জুন ড্রাইভারকে জিপ থামাতে বলল। সেটা থামতেই সে নীচে নেমে দাঁড়াল, “এই জায়গাটা খুব ভাল। তোমাকে মেরে কালভার্টের নীচে শুইয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না।”

“আমি ওকে মারিনি স্যার।” কঁকিয়ে উঠল লোকটা।

“কে মেরেছে?”

“বলদেব।” আচমকা বলে ফেলে চুপ করে গেল লোকটা।

“অবশ্য যে মরে গিয়েছে, তার জন্যে ভেবে কী হবে। হনুমানটা কার?”

“আমার ।”

“কোথায় পেয়েছ ?”

“কাশী থেকে এনেছিলাম । ইঞ্জেকশন দিয়ে বড় করেছি ।”

“বাঃ, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো । তোমাদের বস কে ?”

“আমি জানি না ।”

অর্জুন ড্রাইভারকে বলল হাত লাগাতে । লোকটাকে ধরাধরি করে কালভার্টের নীচে নিয়ে যাওয়া হল । একে এখনই পুলিশের হাতে তুলে দিলে, কিছুতেই মুখ খুলবে না এটা সে বুঝতে পেরেছিল । হয়তো পুলিশের হেফাজতে থাকলেও ওকে খুন করে ফেলা হবে । তা ছাড়া, জিপের ড্রাইভারেরও একাই ফরেস্ট অফিসে ফিরে যাওয়া উচিত । বলদেব ফিরে এসে খবর পেয়ে যাবেই, যা এখনই ওকে জানানো উচিত নয় । সে ড্রাইভারকে বলল, “আপনি জিপ নিয়ে অফিসে ফিরে যান । মিস্টার বিশ্বাসকে সমস্ত ঘটনা বলবেন । তিনি যেন এখনই মিস্টার আহমেদকে নিয়ে বাংলাঘর ঘেরাও করে রাখেন । আমি না ফেরা পর্যন্ত কেউ যেন বাংলার বাইরে যেতে না পারে ।”

“আপনি যাবেন না ?”

“আমি হেঁটে যাব । এখানে যেন কেউ না আসে ।”

ঘাড় নেড়ে ড্রাইভার জিপ নিয়ে চলে গেলে, অর্জুন কালভার্টের নীচে নেমে এল । সে দেখল, লোকটা গড়াতে গড়াতে জলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে । তাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল লোকটা । অর্জুন হাসল, “পালাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই । স্পষ্ট কথা বলছি । তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, তা হলে প্রাণে মারব না । নইলে তোমার লাশ এখানে পড়ে থাকবে ।”

লোকটা পিটিপিটি করে তাকাল ।

অর্জুন আবার জানতে চাইল, “তোমাদের বস কে ?”

“আমি জানি না ।”

অর্জুন সিরিঞ্জটা নিয়ে ঝুঁকে পড়ল, “আমি আর একবার প্রশ্ন করব ।”

“মেমসাহেব ।” ফ্যাস ফ্যাস শব্দ করল লোকটা ।

“মেমসাহেব ? কোন মেমসাহেব ?”

“আমি একবার দেখেছি । বলদেব সব জানে ।” এই সময় একটা খসখস আওয়াজ পেছনে হতেই অর্জুন তড়াক করে ঘুরে দাঁড়াল । ঠিক হাত-পাঁচেক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে হনুমানটা । এত বিশাল হনুমান সে কখনও দেখেনি । না, গোরিলার আকৃতি নিশ্চয়ই নয়, তবে অনায়াসে একটি মানুষকে ঘায়েল করতে পারে । হনুমানটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে হাত-পা বাঁধা লোকটার দিকে । যদি ও আক্রমণ করে, তা হলে এই সিরিঞ্জটা ছাড়া কোনও অস্ত্র অর্জুনকে সাহায্য করবে না । কিন্তু ওর শরীরে যা লোম, সিরিঞ্জ ঢোকানোর আগেই যা ক্ষতি হবার তা হয়ে যেতে পারে । কিন্তু আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ করা বুদ্ধিমানের ৫৩৬

কাজ। সিরিঞ্জটাকে উচিয়ে ধরে অর্জুন আক্রমণ করার ভঙ্গিতে এগোলে হনুমানটা এক লাফে খানিকটা সরে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড় পাথর তুলে নিল অর্জুন। এবং তখনই ক্ষুরটার কথা মনে পড়ল। ওটা তার পকেটেই রয়ে গেছে।

অর্জুন পাথর তুলতেই দড়িতে বাঁধা লোকটা অদ্ভুত সুরে শিস দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কালভার্টের থামের আড়ালে চলে গেল হনুমানটা। ওর কাছাকাছি শুধু পাথর হাতে যাওয়া বোকামি হবে। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, “ওটাকে তুমি ট্রেনিং দিয়েছ?”

আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছোট পাথর শাঁ করে অর্জুনের মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঝোরার জলে শব্দ তুলল। হনুমানটা পাথর ছুঁড়েছে। অর্জুন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে লোকটাকে বলল, “ওটাকে এখান থেকে চলে যেতে বলো, নইলে তোমাকে আমি খুন করব!”

লোকটা মাথা নাড়ল, “আপনি আমাকে খুন করতে পারেন না। ভদ্রলোকেরা খুন করতে পারে না।”

কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র অর্জুনের মনে হল, সত্যিই সে এখন বেশ অসহায়। যতই মুখে বলুক, ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর এই সত্যিটা এতক্ষণে লোকটা বুঝে গিয়েছে। এই সময় দূরে মোটরবাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে ওপরের রাস্তা ধরে। অর্জুন ঠিক করল, এই লোকটা যদি চেষ্টায়—তা হলে সিরিঞ্জ বসিয়ে দেবে, তারপর যা হয় হোক।

মোটরবাইকটা আরও এগিয়ে আসামাত্র শুয়ে-শুয়েই লোকটা শিস দিল। সঙ্গে-সঙ্গে হনুমানটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। একটুও ইতস্তত না করে অর্জুন ওকে লক্ষ করে পাথরটা ছুঁড়ল। এই আক্রমণের কথা হনুমানটার মাথায় আসেনি। সে লাফাতে-লাফাতে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল। পাথরটা আঘাত করল তার ঘাড়ের নীচে। সঙ্গে-সঙ্গে সে ছিটকে গেল খানিকটা। এবং সেই গতিতে গড়িয়ে গেল রাস্তার ওপরে। আর তখনই সশব্দে ব্রেক কষার আওয়াজ, হনুমানটার পরিব্রাহি চিৎকার কানে এল। অর্জুন দেখল, মোটরবাইকটা চালকহীন অবস্থায় কালভার্টের রেলিং-এর গায়ে এসে ধাক্কা খেল। তারপর তার সামনের চাকা শূন্য বনবন করে ঘুরতে লাগল।

“গুরু, বাঁচাও, গুরু, হাম নীচে হ্যায়, বাঁচাও।” পরিব্রাহি চিৎকার করে উঠল লোকটা। অর্জুন দ্রুত কালভার্টের থামের আড়ালে-আড়ালে খানিকটা ওপরে চলে এল। রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হনুমানটা। রক্ত বেরোচ্ছে তার শরীর থেকে। এ-পাশে মোটর বাইক আর উলটো দিকের আগাছার ওপর ধীরে-ধীরে উঠে বসছে হেলমেটধারী। নিশ্চয়ই সে চোট খেয়েছে। কিন্তু উঠে

বসার সময় লোকটির চিৎকার তার কানে যাওয়ায় সে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে। স্পিড বেশি থাকায় হনুমানটা যখন ব্যালাল হারিয়ে সামনে পড়েছিল, তখন লোকটাই আর ব্রেক কষার সময় পায়নি। এই লোকটিই নিশ্চয়ই বলদেব।

আড়চোখে অর্জুন দেখল, কালভার্টের নীচে শরীরে বাঁধন সত্ত্বেও লোকটা উঠে বসার চেষ্টা করছে। তার গলা থেকে একনাগাড়ে চিৎকার ছিটকে বেরোচ্ছে। ওর পক্ষে হাঁটা কোনও মতেই সম্ভব নয়। এবার নিশ্চয়ই বলদেব ওর উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে। এবং সে ক্ষেত্রে রিভলভারের সঙ্গে জেদ দেখানোর মতো বোকামি সে করতে পারে না। অথচ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য।

অর্জুন দেখল বলদেব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে রিভলভার হাতে। থুক করে থুতু ফেলল। এত দূর থেকেও অর্জুনের মনে হল থুতুর রং লাল। নিশ্চয়ই দাঁত ভেঙে গেছে পড়ার সময়। বাঁ হাতে চোট খেয়েছে, কারণ হাতটাকে বুকের কাছে তুলে ধরেছে। হঠাৎ বলদেব চিৎকার করে উঠল, “কাঁহা হ্যায় তুম, এ মূর্দাকা বাচ্চা!” গলার স্বরে জঙ্গল গমগম করতে লাগল। কালভার্টের নীচ থেকে লোকটা চৌচিয়ে উঠল, “নীচে। ঝোরাকা পাশ।”

বলদেব দু’ পা এগোল। তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেই অবস্থায় সে চৌচাল, “ইয়ার্কি মারহিস, অ্যাঁ। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? হনুমান লেলিয়ে দেওয়া? উঠে আয় বদমাশ।”

লোকটা কাতরে উঠল, “কী করে উঠব। আমার হাত-পা বাঁধা।”

পরস্পরকে না দেখেও এই যে কথাবার্তা—তা হিন্দিতে হচ্ছে। বলদেব সোজা হল, “কে বাঁধল তোকে? তোর কাছে কেউ আছে নাকি?”

“সেই চিড়িয়া। মেয়েগুলোর সঙ্গে এসেছে। ভড়কি দিয়েছে গুরু। এতক্ষণ আমাকে সিরিঞ্জ ঢোকাবার ভয় দেখাচ্ছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি না।”

অর্জুন দেখল, আহত হওয়া সত্ত্বেও এক-ঝটকায় নিজেকে তৈরি করে বলদেব ছুটে এল মোটরবাইকের কাছে। লোকটাকে এখন খুব ভিত্তি বলে মনে হচ্ছে। অর্জুন যেখানে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে বলদেব মাত্র হাত-দশেক দূরে। সে মোটরবাইকটাকে কোনও মতে সোজা করল। শরীরে প্রচুর শক্তি না থাকলে এই অবস্থায় ওটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাইকটার অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে গিয়েছে যে, হতাশায় ঠেলে দিল বলদেব ওটাকে। আবার কালভার্টের রেলিং-এর ওপর ঝপাং শব্দে পড়ল সেটা। এবার মুখ ঘুরিয়ে কতকটা নেমে এল লোকটা। আর-একটু এগোলেই অর্জুন ধরা পড়ে যাবে ওর চোখে। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি-পেটা শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্জুন বলদেবের পা এবং হাঁটু দেখতে পাচ্ছে এখন।

“তোকে ধরল কী করে?” চিৎকার ভেসে এল।

“পেছন থেকে । গুরু, দড়ি খুলে দাও ।”

“কী বলেছিস তুই ?”

“কিছু না, গুরু, কিছু না ।”

“মিথ্যে কথা বলিস না । সিরিঞ্জ পেয়েছে যখন, তখন তুই মুখ বন্ধ রাখিসনি ।”

“জিঞ্জেস করছিল, বস কে ?”

“কী বললি ?”

“মেমসাব । ব্যস ।”

সঙ্গে-সঙ্গে আত্ননাদ করেই নেতিয়ে গেল লোকটা । অদ্ভুতভাবে চিত হয়ে মুখ কাত করে পড়ে গেল । চোখ দুটো পলকেই স্থির, মুখ হাঁ । অর্জুন মুখ ফেরাল । হাঁটু এবং পা ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে গেল । অর্জুন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল । চোখের সামনেই একটা খুন হয়ে গেল । এই লোকটার কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু খবর পাওয়া যেত, যেটা বলদেব চাইছিল না । হনুমানটা নিশ্চয়ই এই লোকটারই পোষা । বেচারা বলদেবকে খবর দিতে গিয়ে প্রাণ হারাল । কিন্তু এই কালভার্টের নীচ থেকে বের হওয়া দরকার । অথচ বোঝা যাচ্ছে না বলদেব কাছে-পিঠে আছে কি না । সে যদি অপেক্ষা করে থাকে, তা হলে তার দশা ওই লোকটার মতেই হবে ।

হঠাৎ ‘ঝপাং’ শব্দ হতেই চমকে উঠল অর্জুন । মোটরবাইকটা ঠিক ঝোরার মাঝখানে পড়ে আস্তে-আস্তে তলিয়ে গেল । ওখানে জলের গভীরতা বড়জোর চার-পাঁচ ফুট । থামের আড়ালে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল, বলদেব টলতে টলতে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তা ধরে ।

একটু সময় নিয়ে সে কালভার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে এল । হনুমানটা পড়ে আছে রাস্তায় । মাথাটাই ফেটে গিয়েছে । মাথার তুলনায় শরীর বেশ বড় । রাস্তার যতটা সোজা দেখা যায়, বলদেব কোথাও নেই । এবং তখনই গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফরেস্ট অফিসের জিপটাকে দেখতে পেল অর্জুন । বেশ দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে । কালভার্টের সামনে এসে ব্রেক কষতেই মিস্টার বিশ্বাস লাফিয়ে নামলেন, “কী ব্যাপার ? আপনি কাকে ধরেছেন ? আরে ! এটা কী ?”

মিস্টার বিশ্বাস ছুটে গেলেন হনুমানটার কাছে । তাঁর সঙ্গী ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরাও বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল । অর্জুন জিঞ্জেস করল, “মিস্টার আহমেদ কি এসে গিয়েছেন ?”

মিস্টার বিশ্বাস মাথা নাড়লেন, “এখনও নয় । আপনি আসতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা শুনে না এসে পারলাম না ।”

তা হলে বাংলাে ঘেরাও করা হয়নি ? সর্বনাশ । বলদেব ও দিকেই গিয়েছে । অর্জুন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল, “আপনি জিপ ঘোরাতে বলুন ।”

“আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।” মিস্টার বিশ্বাস কথাগুলো বলতে-বলতে হাত নেড়ে ড্রাইভারকে ইশারা করলেন।

অর্জুন বলল, “আপনার এই জঙ্গলে আর-একজন খুন হয়েছে। একই জায়গায়। তৃতীয় খুন যাতে না হয়, তার জন্য আমাদের এখনই বাংলায় যাওয়া উচিত। ও হ্যাঁ, আপনি চটপট একবার কালভার্টের নীচ থেকে ঘুরে আসুন।”

মিস্টার বিশ্বাস ছুটে গেলেন। ফিরে এলেন একেবারে ঝড়ের মতো, “কী সর্বনাশ!”

অর্জুন জিপে উঠে বসল কিছু না বলে। মিস্টার বিশ্বাস সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, “ওকে খুন করল কে? আপনি?”

“আমার কাছে রিভলভার নেই মিস্টার বিশ্বাস।”

“না, মানে ড্রাইভারের কাছে শুনলাম...”

“সেটি এই জিনিস। এ-দিয়ে রক্ত বের হয় না, সাদা চোখে মৃত্যুর কারণ বোঝা যায় না। চলে আসুন চটপট। আমি মানুষ মারার অধিকারী নই, বাঁচানোর।”

জিপ ছুটে যাচ্ছিল বাংলোর দিকে। যতটা সংক্ষেপে সম্ভব অর্জুন মিস্টার বিশ্বাসকে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। শুনে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অর্জুন বলল, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিস্টার ভার্নার স্ত্রী হিসেবে যিনি এই বাংলায় আছেন, তিনিই ‘মেমসাহেব’ এবং এই চক্রান্তের মূল নেত্রী।”

মিস্টার বিশ্বাস কথা বললেন না। বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, ফরেস্ট বাংলোর একজন কর্মচারী ছুটতে-ছুটতে আসছে। জিপ থামাতে হল। লোকটা হাঁপাতে-হাঁপাতে যা বলল, তাতে বোঝা গেল একটু আগে একটা লোক বাংলায় ঢুকে ভার্মা-সাহেবকে কিছু বলতেই তিনি ও মেমসাহেব ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে চার বাচ্চা-মেমসাহেবের একজনকে বন্দুক দেখিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জিপ ছুটে এল বাংলোর লনে। অর্জুন দেখল, পুনম, চিকি, এবং টিনা ছুটতে ছুটতে আসছে। কথা বলার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়ল তারা। অর্জুন শুনল, সে বেরিয়ে যাওয়ার কিছু আগে নাকি নন্দিনী একাই গিয়েছিল ভার্মা-সাহেবের ঘরে। সে বন্ধুদের বলেছিল, লোকটার মুখোশ খুলে দেবে। ওরা তাকে অর্জুনের নিষেধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কথা শোনে নি নন্দিনী। সে অনেকক্ষণ ফিরছে না দেখে খোঁজ করতে গিয়ে শেষে দেখতে পেয়েছে, নন্দিনীকে রিভলভার দেখিয়ে ট্যাক্সিতে তুলেছে ওরা। কিছু করার আগেই ট্যাক্সি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার পুরি ঘরে আছেন?”

ফরেস্ট বাংলোর একটি বেয়ারা বলল, “নেই সাব। আধা-ঘন্টা আগে

নিকাল গিয়া ।”

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, “মিস্টার পুরি কি এ-ব্যাপারে জড়িত ?”

“আমি বুঝতে পারছি না । তবে লোকটার চাল-চলন সন্দেহজনক । আপনি এখনই পুলিশ-স্টেশনে টেলিফোন করুন । ওদের রাস্তায় আটকাতে বলুন ।”
অর্জুন ব্যস্ত হল ।

জিপ চলে এল ফরেস্ট অফিসে । দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলেন মিস্টার বিশ্বাস । মিনিটখানেক বাদে ফিরে এসে জিপে উঠলেন, “ড্রাইভার, চালাও । লাইন পাওয়া গেল না । ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি । আহমেদেরও তো এতক্ষণে এই রাস্তায় আসার কথা । ড্রাইভার, জোরে ।”

জিপ প্রচণ্ড গতিতে ছোট্টা শুরু করল ।

মিনিট-পাঁচেক যাওয়ার পর বিশ্বাস চমকে উঠলেন, “কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?”

অর্জুনের নজরে পড়েছে ততক্ষণে । একটা জিপ রাস্তা থেকে অনেকটা সরে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে উলটে যাওয়ার ভঙ্গিতে আটকে আছে । ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ থামানো মাত্র একজন পুলিশ ছুটে এল । ওটা যে মিস্টার আহমেদের জিপ, তা বুঝতে আর অসুবিধা নেই ।

পুলিশটি বলল, “ভাগ গিয়া সাব । লেकिन পাকাড় যায়ে গা ।”

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে, খুলে বলো ।”

লোকটা জানাল থানা থেকে যখন তারা আসছিল, তখন চেকপোস্টে এক ভদ্রলোক মিস্টার আহমেদের সঙ্গে কিছু কথা বলেন । তারপরেই মিস্টার আহমেদ ড্রাইভার ও দু'জন সেপাইকে নির্দেশ দেন জিপ নিয়ে বাংলায় এসে রেঞ্জার সাহেবকে খবর দিতে যে, তিনি চেকপোস্টেই অপেক্ষা করছেন । সেইমতো বেশ স্পিডে যখন তারা আসছিল, তখন এ দিক থেকে একটা ট্যাক্সি ঝড়ের মতো উড়ে আসে । ড্রাইভার ভেবেছিল ট্যাক্সি সাইড দেবে, কিন্তু সেটা দিচ্ছে না এবং সংঘর্ষ অনিবার্য দেখে বাধ্য হয়ে ড্রাইভার জিপ নিয়ে জঙ্গলে নেমে যায় । এতে একজন সেপাই আহত হয়েছে । তাকে নিয়ে অন্য সেপাই রওনা হয়ে গিয়েছে চেকপোস্টের দিকে ।

শোনামাত্র জিপ রওনা হল । কিছুক্ষণ বাদে মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “এই বাঁকটা ঘুরলেই চেকপোস্ট ।” তখনই ওরা সেপাই দুটোকে দেখতে পেল । একজন খোঁড়াচ্ছে ।

অর্জুন বলল, “তা হলে এখানেই গাড়ি থামান । ঠিক রাস্তার মাঝখানে ।” গাড়ি থামতেই ওরা নেমে পড়ল । আহত সেপাইটিকে গাড়িতে রেখে দিয়ে অস্ত্রধারীকে অর্জুন বলল অনুসরণ করতে । মিস্টার বিশ্বাস সঙ্গ নিলেন । গাড়ির রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে যেতে, চেকপোস্টের খানিকটা দূরে ট্যাক্সিটিকে দেখতে পেল ওরা । ট্যাক্সির মধ্যে দুজন বসে

আছে। ড্রাইভারও। চেকপোস্টের লোহার গেট বন্ধ। গেটের ওপাশে কয়েকজন পুলিশ আর ট্যাক্সির সামনে বলদেব। সামনে নন্দিনীকে রেখে দাঁড়িয়ে। এই সময় বলদেব চিৎকার করল হিন্দিতে, “আমি শেষ বার বলছি, গেট খুলে সরে না দাঁড়ালে এই মেয়েটার জান চলে যাবে।

এবার একজন চৌকিদার গোছের লোক গেট খুলে দিল। বলদেব এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে নন্দিনীকে ধরে ট্যাক্সির দরজায় চলে এল। তার পর চিৎকার করল, “চালাকির চেষ্টা করলে খুব খারাপ হবে।”

এই সময় একটা ফায়ারিং-এর আওয়াজ ভেসে এল। সেটা এত কাছে যে, অর্জুন চমকে পেছন দিকে তাকাল। ততক্ষণে মাটিতে পড়ে গিয়েছে বলদেব। আর তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে গিয়েছে খানিক দূরে। অর্জুন দৌড়ে রাস্তায় চলে এসে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপরেই শরীরটাকে গুটিয়ে বাঁ পাশে লাফাল। মিস্টার ভার্মার ছোঁড়া গুলিটা তার সামান্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় বার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলেন না ভদ্রলোক। মাটিতে পড়ে থাকা অর্জুন যখন দ্বিতীয় গুলির জন্য অপেক্ষা করছে তখন বিপরীত দিকের জানালা থেকে একটি হাত এগিয়ে এসেছিল মিস্টার ভার্মার দিকে, “নো মোর, আদারওয়াইজ্ ইউ উইল বি ডেড।” মিস্টার ভার্মার হাত থেকে রিভলভার পড়ে গেল।

অর্জুন চিৎকার করে উঠল, “অমলদা, আপনি?”

ততক্ষণে পেছন থেকে মিস্টার আহমেদ বেরিয়ে এসেছেন জঙ্গল থেকে। সেপাইরা ছুটে এল চেকপোস্টের আড়াল ছেড়ে। গাড়ি থেকে টেনে বের করা হল মিস্টার ভার্মা আর ‘মিসেস ভার্মা’ নামক মহিলাকে। নন্দিনীর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। আহমেদ পরীক্ষা করে বললেন, “লোকটা আগেই উন্ডেড ছিল। বাট হি ইজ ডেড।”

মিস্টার বিশ্বাস বললেন, “একটু আগে ও আর-এক জনকে খুন করেছে।”

“সে কী? কোথায়?” মিস্টার আহমেদ বললেন।

আধঘন্টা বাদে ওরা সবাই থানায় বসে ছিল মিস্টার আহমেদের টেবিলের সামনে। ইতিমধ্যে লোক পাঠানো হয়েছে কালভার্টের নীচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করতে। অমল সোম বললেন, “আগে অর্জুন, তোমার গল্পটা শোনা যাক।”

অর্জুন বিস্তারিত বলল।

আহমেদ বললেন, “আমরা খবর পেয়েছিলাম, সোনা বিক্রির ডেউ মালবাজারের দিকে লেগেছে। কিন্তু এ দিকটায় শুধু উগ্রপন্থীদের নিয়ে সময় কাটছিল আমার। উফ্!”

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, “এই সোনা ওরা পেত কোথায়?”

অমলদা উত্তর দিলেন, “যে-ভদ্রমহিলা এখানে ‘মিসেস ভার্মা’ পরিচয় দিয়ে ছিলেন, তিনি জন্মসূত্রে পারো-র মানুষ। পারো ভুটানের শহর। এই ভদ্রমহিলার দিল্লিতে যাতায়াত ছিল। কোনওভাবে ওঁর সঙ্গে মিস্টার ভার্মার আলাপ হয়। তখন নন্দিনীর বাবার সঙ্গে ব্যবসা-সম্পর্ক ছিল হওয়ায় মিস্টার ভার্মা বিপদে পড়েছিলেন। নন্দিনীর বাবার ওপর ওঁর খুব রাগ ছিল, কিন্তু সেটা বোঝাতেন না। উনি জানতে পেরেছিলেন নন্দিনীরা এ দিকে আসছে। হয়তো ওর বাবার কাছেই জেনেছিলেন তারিখ। পরে নন্দিনীর বাবার কোনও কারণে সন্দেহ হওয়ায় আমার এসকর্টের জন্য অনুরোধ করেন। এ দিকে মহিলা ভুটানের—কিন্তু ভুটানি নন। আমার ধারণা, তিব্বত থেকে পালিয়ে আসা লামাদের সোনা কোনওভাবে ওঁর কাছে চলে আসে। হয়তো ফাঁকি দিয়েই তিনি সেটা দখল করেন। ভুটানে থেকে সেই সোনা বিক্রি করা যেত না। ভারতবর্ষে এসে করতে হলে সরকার অনুমতি দিত না। নিজের অর্জিত সম্পত্তি না হলে মানুষ কম দামেও বিক্রি করে। মিস্টার ভার্মার সঙ্গে ওঁর চুক্তি হয়। এঁদের সঙ্গে বলদেব জোটে। সে এই এলাকায় বেশ কিছু দিন আছে। টাফ ম্যান। খোঁজ নিলে জানা যাবে, মিস্টার ভার্মার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ওই মহিলা কখনও গরুমারা, কখনও চাপড়ামারি, কখনও কালীঝোরা, কখনও ফুন্টসিলিং-এর বাংলো কিংবা হোটেলে থেকেছেন। মিস্টার ভার্মার বুদ্ধিতে বলদেব গরিব মানুষগুলোকে ব্যবহার করেছে। পুলিশ এদের জেরা করলে এ-ব্যাপারে বিশদ জানতে পারবে।”

“কিন্তু যে লোকটা আজ খুন হয়েছে, সে বলেছিল তাদের বস একজন মেমসাহেব। তার মানে এরা জানত?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“স্বাভাবিক। মিস্টার ভার্মা সমস্ত ডুয়ার্স ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলদেব মোটরবাইকে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই সঙ্গে। মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বে ছিল এই লোকটি। সে তো মেমসাহেবকে চিনবেই। তাকে তো পাহারাদারের কাজ করতে হত। এর আগে ছিল চাপড়ামারিতে। হনুমানটাকে চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছিল। চাপড়ামারির কিছু মানুষ একটা বনমানুষ দেখেছে বলে দাবি করে। সদ্য এ-তল্লাটে আসায় মিস্টার বিশ্বাসরা ওর সন্ধান পাননি।”

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন, “আমি আজই জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি মিস্টার আহমেদ। যদি কিছু প্রয়োজন হয়, জানাবেন।”

“অবশ্যই। আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না মিস্টার সোম।”

“আপনারা কি আগে পরিচিত ছিলেন?” অর্জুন খুব অবাক হচ্ছিল।

“হ্যাঁ। মানে গতকাল আমি যখন ফরেস্ট থেকে ফিরে আসি, তখন উনি থানায় এসে আলাপ করে গিয়েছিলেন।” মিস্টার আহমেদ বললেন।

থানার বাইরে এসে অর্জুন অভিমানে ফেটে পড়ল, “অমলদা, আপনি

‘মিস্টার পুরি’ নামে আমাদের ফলো করছেন, অথচ একবারও জানতে দেননি কেন ?”

অমল সোম অর্জুনের কাঁধে হাত রাখলেন, “তুমি শিলিগুড়িতে রওনা হওয়ার পর নন্দিনীর বাবার আর-একটা টেলিগ্রাম পাই। তিনি বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গে থাকি।”

“চলি। ভাল কাজ করেছ। তবে এখনই তোমার ফরেস্ট বাংলোতে ফিরে যাওয়া উচিত। নন্দিনীকে আমি সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার নিশ্চিত্তে ওদের দার্জিলিংটা ঘুরিয়ে দেখাও।” অমলদা গম্ভীর পায়ে গাড়িতে উঠলেন।

অর্জুন ঠোট কামড়াল। তার সব আছে, শুধু আর-একটু অভিজ্ঞতা দরকার। অমলদার মতো।

গ্রন্থ-পরিচয়

খুনখারাপি । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ । তৃতীয় মুদ্রণ—নভেম্বর ১৯৯৫ ।

পৃ. ১১২, মূল্য ২০.০০ ।

উৎসর্গ : বুবুনকে ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায় ।

সূচী : খুঁটিমারি রেঞ্জ, খুনখারাপি ।

সীতাহরণ রহস্য । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—১ বৈশাখ ১৩৯৩ । দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন ১৩৯৯ ।

পৃ. ১৬৮, মূল্য ২৫.০০ ।

উৎসর্গ : বাবি আর শাস্তকে ।

প্রচ্ছদ : জয়ন্ত ঘোষ ।

ভূমিকা :

পাক্দের নিয়ে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম । নাম দিয়েছিলাম, 'কালিম্পঙে সীতাহরণ' । তখনই মনে হয়েছিল কাহিনীটি শেষ হল না । তোমরা যারা আমার 'খুনখারাপি' পড়েছ তারা এতদিনে অর্জুনকে চিনে গেছ । ওই গল্পে অর্জুনরা যে কাণ্ড করেছিল তার জের টানতে গত পুজোয় আনন্দমেলায় লিখেছি 'চণ্ডীগড়ে গণ্ডগোল' । বই করার সময়ে মনে হল দুটো উপন্যাস একসঙ্গে থাকলে পুরো ছবিটা স্পষ্ট হবে । এখন তাই করা হল ।

লাইটার । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৮৭ । চতুর্থ মুদ্রণ—মার্চ ১৯৯৬ ।

পৃ. ১০৯, মূল্য ২৫.০০ ।

উৎসর্গ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রজ প্রতিমেষু ।

প্রচ্ছদ : অনুপ রায় ।

সূচী : লাইটার, দ্বিতীয় লাইটার ।

জুতোয় রক্তের দাগ । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৯৬ । দ্বিতীয় মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ ১৪০০ ।

পৃ. ১৭৬, মূল্য ৩৫.০০ ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায় ।

দেড়দিন । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৮৯ । তৃতীয় (নতুন) মুদ্রণ—জানুয়ারি ১৯৯৬ ।

পৃ. ১৪০, মূল্য ৪০.০০ ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায় ।



9 788172 156466

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~